বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
১২ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
২০৭এ, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

সূচনা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে বছর তিনেক আগে। দ্বিতীয় সংস্করণ যদি সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো যেত, তাহলে তা পুনর্মুদ্রণের বেশী কিছু হতো না। বিলম্বিত হলেও এ সংস্করণ-প্রকাশে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, নবলব্ধ ও পুনর্বার চিন্তিত যাবতীয় তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাবেশে এখন এ বইখানিকে প্রামাণ্য আলোচনাগ্রন্থে পরিণত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ থেকে পৃষ্ঠাসংখ্যা দু'গুণ এবং অধ্যায়-সংখ্যা দেড়গুণ বর্ধিত। বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান-প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে যাঁরা আরো বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করবেন, তাঁদের চিন্তাধারায় যদি এ গ্রন্থের মনন ও অনুভব কোনো সহায়তা করতে পারে, তাতেই লেখকের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-১৩০৬) ২৩শ ও ২৪শ অর্থাৎ সর্বশেষ সংখ্যাদুটিতে বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্বামীজীর দান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ভাষণের সমালোচনা উপলক্ষে। "১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সমালোচনা)" নামে এই লেখাটি খুব সম্ভব 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের লেখা। যতদূর মনে হয়, এই সমালোচনা-সূত্রেই দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন'-পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় কালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশবিশেষ "বাঙ্গালা ভাষা" নামে রূপান্তরিত হয়ে মুদ্রিত।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনার নিদর্শন 'উদ্বোধন'-পত্রিকা থেকে স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনাগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার সময়ে 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র স্বামী সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা। 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকার তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, 'পরিব্রাজকে'র ভূমিকার তারিখ ১লা মাঘ, ১৩১২, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম সংস্করণের স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দজীর নাম বা তারিখ না থাকলেও এটিও যে তাঁরই রচনা, তা ভাষাভঙ্গীর দ্বারা প্রমাণিত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের যথার্থ মূল্য-অনুধাবনে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ—দু'জনের অভিমতই বিশেষভাবে প্রণিধেয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনার নিদর্শন পাই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষের (১৩১৪ সাল) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। সাহিত্য-বিচারে অসাধারণ সিদ্ধির পরিচায়ক এ প্রবন্ধে লেখক শ্রীচট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও কাব্যকৃতির তুলনা-মূলক আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর কবিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার এই সূচনা।

'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প' এবং 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' রচয়িতা স্বামী প্রেমঘনানন্দ পরবর্তীকালে 'কিশোর বাংলা' নামে একটি শ্রেষ্ঠ কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় স্বামী প্রেমঘনানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় যথাক্রমে 'বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'স্বামীজীর বাংলা রচনা' এবং 'সাধু ও চলতি ভাষা' নামে তিনটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের দান সম্বন্ধে গবেষণাধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেন। লোকান্তরিত সাহিত্যসাধক স্বামী প্রেমঘনানন্দের সাহিত্যকীর্তির পুনরালোচনা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সংস্করণের সূত্রপাতে এই পূর্বসূরীদের কাছে লেখকের ঋণ বিশেষ-ভাবে স্বীকার্য। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের ভাবপ্রেরণা উপলব্ধির চিরন্তন দিশারী ভগিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ-হোমানলের এই শিখারূপিণীর উদ্দেশে বিবেকানন্দসাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই প্রণাম নিবেদিত।

অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রথম সংস্করণের 'সূচনা' এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত। বিশেষত সে 'সূচনা'র অন্তর্গত স্বামীজীর প্রথম জীবনে লেখা 'সংগীতকল্পতরু' নামে সংগীতসংকলনের ভূমিকা ও সংগীত-সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা অংশটি এ সংস্করণে পরিশিষ্ট (২) অধ্যায়ে পরিবর্ধিতরূপে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনাপ্রসঙ্গে এক বৎসরের কিছু বেশীকাল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নানা কেন্দ্রে অতিবাহিত করেছি। ১৩১৪-এর মে মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যসন্ধ্যায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বুধানন্দের সঙ্গে মায়াবতী যাত্রার সময় এ সংস্করণের কাজের সূত্রপাত। তারপর ১৩১৪-এর গ্রীষ্মাবকাশে বাগবাজারের উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং জুলাই মাসে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরে থেকে বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে এ সংস্করণে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ বইয়ের অধিকাংশই লিখিত এবং পুনর্লিখিত হয় নরেন্দ্রপুর

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিভবনে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূর্বোক্ত কেন্দ্রসমূহের প্রধান ও সহকারী কর্মিবৃন্দ সকলের কাছেই লেখক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রাচীন সন্ন্যাসীদের অন্যতম পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দ, মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণময়ানন্দ, আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের পরিদর্শক স্বামী ক্ষমানন্দ, বেলুড় মঠের স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী প্রথমানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী উমানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের শুভেচ্ছা ও নানাবিধ সহায়তা এ গ্রন্থের পরিমার্জনাকালে লেখককে নিশ্চিন্ত মনে বিবেকানন্দ-অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণা বর্তমান সংস্করণ-প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি।

এ সংস্করণে নবলব্ধ দুটি মূল্যবান উপাদানের আলোচনা লক্ষণীয়—প্রথমত স্বামীজীর লেখা "ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন" নামে অমূল্য রচনা ('সাধুগন্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত হার্বার্ট স্পেন্সারের Education গ্রন্থের বিবেকানন্দকৃত অনুবাদ 'শিক্ষা' গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনা ('অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এই বিস্মৃত অধ্যায় দুটির পুনঃসংযোজনার সৌভাগ্যের জন্য লেখক স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে এ দুটি রচনার পুনরাবিষ্কারের দাবী তাই সঙ্গত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আরো কিছু বিস্মৃত অধ্যায় যোগ্যজনের দ্বারা আবিষ্কৃত হবে—এই প্রার্থনা।

স্বামীজীর 'ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন' নামে অমূল্য দর্শনসূত্র কয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের সুযোগ্য কৃতী পুত্র বৈজ্ঞানিক ডঃ সুধীরনাথ সান্যালের স্নেহানুকূল্যে প্রাপ্ত। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীশিশিরেন্দু ভট্টাচার্য একাধিক মূল্যবান উপকরণ-সংগ্রহে অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিদর্শক শ্রীরাধাশ্যাম সাহা এবং বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ—দু'জনের অগ্রজপ্রতিম স্নেহ ও সৌজন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বেলুড় মঠের বর্তমান

গ্রন্থগারিক স্বামী ত্যাগানন্দজী লেখকের শিক্ষাগুরুদের অন্যতম। প্রথম সংস্করণের উপকরণ-সংগ্রহেও তিনি শুভেচ্ছা ও সহায়তার দ্বারা লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের পুথিশালার বিভাগীয় কর্মী শ্রীসুকুমার মিত্র লেখকের মতো অনেকেরই অগ্রজকল্প—তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বাগবাজারের রামকৃষ্ণ মঠ ও উদ্বোধন-কার্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কাছেই বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, আজ অবধি সে পাঠগ্রহণ চলেছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণেও সর্বত্র তাঁর প্রভাব ওতপ্রোত। তাছাড়া 'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও সহকারী সম্পাদক স্বামী জীবানন্দ, উদ্বোধন-কার্যালয়ের প্রকাশনা-বিভাগের স্বামী অতন্দ্রানন্দ এবং সামগ্রিকভাবে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের সকল সন্ন্যাসী ও ভক্ত কর্মিবৃন্দ নানাভাবে লেখককে প্রীতিপূর্ণ সহায়তার দ্বারা ব্রত-উদ্‌যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার আগেই বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অভাব অনেকেই বোধ করতে থাকেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনার যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হ'ল। বাংলার সাহিত্যিক ও অধ্যাপকবৃন্দ এ আলোচনায় অগ্রসর হয়ে এলে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রথম সংস্করণ 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র 'সূচনা' লেখা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সমাপ্ত হ'ল শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগীদের কাছে এ শুভসংযোগ তাৎপর্যমণ্ডিত।

বাংলা ও ভারতের এই চরম দুর্দিনে শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ রূপ্ লাভ করুক—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশের ইতিহাসে একদা অগণিত নক্ষত্রসমাবেশ ঘটেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রায় দেড়শো বছরের চিন্তাধারায় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতির নানামুখী আন্দোলন বাঙালীর মনন ও সাহিত্যে যে অসাধারণ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তা নিয়ে বিশ শতকের মধ্যাহ্নমুহূর্তে আমাদের একান্ত স্বাভাবিক গৌরববোধ নানা শতবার্ষিকী পালনের আয়োজনে প্রকাশিত। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা যখন রূপায়িত হতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমগ্র দেশের চিন্তা ও ভাবনা আর একবার স্বাধীনতার মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৬১ সালের চীন-ভারত সংঘর্ষ এবং ১৯৬১ সালের পাক-ভারত সংঘাতে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের ঐক্য দেখে ধারণা হয়, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার ঐতিহ্য আমরা এত অল্পদিনেই ভুলে যাই নি। তবু একথা সত্য যে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য আমাদের অনেক বেশী সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র অতীতের গৌরববোধ নয়, মহিমান্বিত বর্তমান এবং মহত্তর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসীর।

স্বাধীনতার শত্রু স্বৈরাচারীদের উদ্দেশে রাজা রামমোহন বলেছিলেন—'Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successfull.'[১] স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের সমর্থকেরা কোনদিন সফল হয় নি, এবং শেষ পর্যন্ত কোনদিনই সাফল্য লাভ করবে না।

কিন্তু এই শত্রুকে সম্পূর্ণ চিনতে পারা সব সময় সহজ নয়। ইংরেজ-রাজত্বে সুশাসনের ছদ্মবেশ ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের আপাত-

---

১ Calcutta Journal-এর সম্পাদক শ্রীবাকিংহামকে লেখা পত্রাংশ

প্রগতির উন্মাদনা আমাদের জাতীয় চেতনাকে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হতে দেয় নি। সাম্যবাদের ছদ্মবেশধারী সাম্রাজ্যক্ষুধাও তেমনি অনেকের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। আধুনিক জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফল হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের হীনমন্যতা আজও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান—একথা শিক্ষিতসমাজের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের বাইরের শত্রু ছিল ইংরেজ, অন্তরের শত্রু ছিল আমাদের অনিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়। চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের নানামুখী আন্দোলন সত্ত্বেও জীবনের উৎকর্ষ নির্ধারিত হ'ত পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে।

আমাদের জাতীয় চেতনায় সেই বিলুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন—"He is an atheist who does not believe in himself. The old religions said that he was an atheist, who did not believe in God. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself."[১]

"If you have faith in the three hundred and thirty millions of your mythogical gods, and in all the gods which foreigners have introduced into your midst, and still have no faith in yourselves, there is no salvation for you. Have faith in yourselves and stand upon that faith and be strong."[২]

"নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মমতে, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক ; নবীন ধর্ম বলে, নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক।

"পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও বিদেশীদের আমদানী যত দেবতা আছে—সকলের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও যদি তোমার নিজের উপর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কোন মুক্তি নেই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উঠে দাঁড়াও, বীর হও।" বিবেকানন্দের বীরবাণীকে অবলম্বন করে বাংলার স্বদেশী যুগ ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন অনেকখানি শক্তিসঞ্চয় করেছিল। পরানুবাদ ও পরানুকরণে নয়, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের মূল কারণ।

কিন্তু বিগত দুই দশকের চিন্তাজগতে বিবেকানন্দের মূল্যায়নে আধুনিক মনের কিছু কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনবিমুখ, ধর্মচিন্তা মধ্যযুগীয়, দেশপ্রেম—শুধু অতীতের স্মৃতিচারণ—এ জাতীয় সমালোচনায় চিন্তাশীল হিসাবে খ্যাতিমান দু'চারজনও যোগ দিয়েছেন। সমালোচনার স্বাধীন অধিকার স্বীকার করেও বলা যায়, এ ধরনের আলোচনায় ভারতবর্ষ বা ভারতীয় মনীষাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেই পার্থিব সুখসমৃদ্ধির বহিরাবরণ ভেদ করে জাতির অন্তরতম সত্তার বাণীমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই পর্যায়ক্রমে যাঁরা জীবনকে ক্রমবিকশিত রূপে দেখেছিলেন, তাঁরা ফুলকেই গাছের একমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন ফুলের পরিণতি যেমন ফলে, তেমনি সম্ভোগের পরিণতি পরিপূর্ণ ত্যাগে। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিতে নিরাসক্ত মনেরই অধিকার।

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।[1]—রবীন্দ্রনাথের পরিণত মানসের

১ 'সঞ্চয়িতা' : সেঁজুতি : জন্মদিন

এই উপলব্ধিই ভারতবর্ষের বাণী। যাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা, অধ্যাত্ম-সাধনা ও বৈরাগ্যের পরম উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অন্তরাত্মার পরিচয় কখনো পাবেন না—একথা নিশ্চিত। পৌরাণিক দেবদেবতার রূপান্তর হয়, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি দেশের ও জাতির মানসসম্পদ। যুগে যুগে তাই পুরাণকাহিনীর নব নব রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু পরমসত্যের জন্য মানুষের সর্বস্বত্যাগের আদর্শ চিরকালের অপরিবর্তনীয় আদর্শ। ওই মহত্তম আদর্শের স্পর্শ পাই বলেই মানবসভ্যতার যুগসঞ্চিত গ্লানি ও কলুষের ঊর্ধ্বে মানবাত্মার উদার উন্মুক্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাসী হতে পারি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও সভ্যতার তুলনায় ভারতবর্ষ এই সত্যটিকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। তাই পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর-পন্থায় চিরযাত্রী ভারতাত্মা আপন অন্তরে এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আলোকশিখাটি সদাজাগ্রত রেখেছে। কিন্তু বাস্তব জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ধর্মচেতনা কতখানি সহায়ক হয়েছে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে যে, বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সামনে রেখেই জীবনের প্রতিটি কর্তব্য অবিচল নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সাধন করাই ভারতবাসীর 'ধর্ম'। ব্রহ্মচিন্তা যাঁদের ধ্যানোপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই শুধু ঋষি নন, রাজর্ষি।

একটি আত্মবিস্মৃত জাতির সুপ্ত আত্মপ্রত্যয়কে জাগ্রত করার জন্য অতীতের গৌরবচেতনা নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন উনিশ শতকে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। আজকের দিনেও ভারতবাসীকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ শুধু আত্মসমাহিত ধ্যানের দেশ নয়, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামেরও দেশ। ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত সেই পুণ্যসংগ্রামের অমর কাহিনী। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে বিবেকানন্দ

নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আত্মবিস্মৃতি আমাদের জাতির স্বভাবজাত। তাই বিবেকানন্দের সাধনা ও সংগ্রামকে ভ্রান্ত বিকৃতির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার অপপ্রয়াস এদেশে অনায়াসে অঙ্কুরিত হতে পেরেছে। এমন সময় ইতিহাসের পটপরিবর্তন হ'ল। আমরা অনুভব করলাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের ইতিহাসেও ঘটে। অন্তত বাংলাদেশে ও সাহিত্যের মননভূমিতে আজ বিবেকানন্দের পুনরাবির্ভাবে সেকথা সুপ্রমাণিত। সাহিত্যের জগতে এই পুনরাবৃত্তির কারণ বোধ করি এই যে, মানবমনের চিরন্তন অনুভূতিগুলি নানা আকারে রূপান্তরিত হয় মাত্র, কখনো বিলুপ্ত হয় না। তাই দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থেকে, যুগে যুগে মানবসভ্যতার বিচিত্র প্রয়োজনে সাহিত্যের এক একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আগ্রহদীপ্ত পাঠকচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্তিমিত চেতনার অবসাদে যাকে অনায়াসে ভুলেছিলাম, নিষ্ঠুর সংঘাতের আলোকে তার মধ্যে আত্মীয়তম বন্ধুকে আবিষ্কার করা—ব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসে সুপরিচিত কাহিনী।

শতবার্ষিকী-পালনের উন্মাদনায় বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের পটভূমিতে আমরা যখন জাতির জীবনে একটি বলিষ্ঠ প্রাণদ বীরমন্ত্র অনুসন্ধান করে ফিরছি, তখন পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে একথা ভেবে আশ্বস্ত হতে পেরেছিলাম যে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যে ও জীবনাদর্শে আমরা আমাদের অন্বিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামচেতনার বাণী লাভ করেছি। এ মহাস্ত্র আমাদের উত্তরাধিকার—কেবল আলস্যে অবিশ্বাসে অলস ভাববিলাসে আমরা সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম।

সমগ্র দেশ জুড়ে আজ সাহিত্যিকসমাজের কাছে এই দাবি—জীবনযুদ্ধের মানস-অস্ত্র আমাদের চাই। কোমল হৃদয়াবেগের স্বপ্নাবেশ বাংলাসাহিত্যকে বড় বেশী আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজ

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অমরজীবনের অভয়বাণী কারা উচ্চারণ করবে? সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায় সর্বত্র আজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন-মন্ত্র উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের মানব-ইতিহাসে আর একবার এমন এক মহামুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দ ও তাঁদের অসংখ্য সেনাবাহিনী। আর একদিকে সামান্যসংখ্যক সেনামাত্রসম্বল বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণের মতো মহারথী-পরিবৃত মহাদম্ভী দুর্যোধন, অন্যদিকে নিরস্ত্র অর্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ। কর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের উদ্দেশ্যে সেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই উচ্চারিত হয়েছিল—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"
"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"
"হতো বা প্র্যাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীই ভারতবাসীর জীবন-দর্শন। সংগ্রাম তার কর্তব্য, কারণ, সংগ্রামই জীবন। জীবনের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসিত হয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্‌না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার বিদ্রোহ করবে। যেখানে struggle, যেখানে rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন—"সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ।"[১] [স্বামী-শিষ্য-সংবাদ।]

যুদ্ধ যেখানে সাম্রাজ্যক্ষুধার লুব্ধ বাহুবিস্তার, সেই মহাঅন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই মহাপুণ্য। ভারতবাসীর জীবনযুদ্ধের চিরসারথি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন—"এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা,

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ১২

ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহাউদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি, এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity (মজ্জাগত দুর্বলতা সম্পন্ন)—cracked brains (বিকৃত মস্তিষ্ক) অথবা fanatic (ধর্মোন্মাদ)। মহারজোগুণের উদ্দীপন ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।"[১] [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ]

জাতীয় চরিত্রে কোনো ভাবের সঞ্চার করতে হলে সেই জাতির জনমানসের ভাষায় সেটি করণীয়। তাই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রেরণায় জাতীয় চিত্তকে সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় স্বামীজীর রচনাবলীর একটি প্রধান বক্তব্য—"Weakness is sin"—দুর্বলতাই পাপ।[২] কায়িক ও মানসিক সব দুর্বলতার নিঃশেষ ক্ষয়ের জন্য জাতির উদ্দেশে তিনি যে সব অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন, আজ আমাদের জীবনে মননে সেই মন্ত্রমালা অনুক্ষণ স্মরণীয়।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বীরত্বের আর এক অনন্য আদর্শ কঠোপ-নিষদের নচিকেতা। পরমসত্য উপলব্ধির জন্য এই ঋষিবালক যেভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে জীবনের গভীরতম বাণী আহরণ করে এনেছিল, তার সেই শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীকতার কথা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় বারংবার উদাহৃত। সমগ্র উপনিষদ মন্থন করে জাতির পুনরুজ্জীবনের যে মন্ত্রটি বিবেকানন্দ সংগ্রহ করেছিলেন সেও এই "অভীঃ।" তিনি বলেছেন—" 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল 'অভীঃ অভীঃ।' সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১৬

২ তদেব, পৃঃ ৫৮

—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার।"[১]

'Kali the Mother' ও নাচুক তাহাতে শ্যামা'—কবিতা দুটিতে এই অভয়সত্তার বজ্রমন্ত্র কাব্যরূপ লাভ করেছে—

Who dares misery love
And hugs the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

*

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের যদি কোনো একটি মাত্র বাণী তাঁর সমগ্র সত্তার পরিচয় হয়ে থাকে, তবে তা ওই কটি অক্ষরে বিধৃত—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।"

জীবনের সর্বস্তরে এই সংগ্রাম—রণক্ষেত্রে, জীবনবিকাশে, অধ্যাত্মসাধনায়—সর্বত্র ভয় হতে অভয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। ক্ষয়ক্ষতি দুঃখমৃত্যুর মূল্য না দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করেছে, তা তো আমাদের জানা নেই। বরং বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে—"যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" বেদনাবহনের দায়িত্ব যার জীবনে যত বেশী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তার তত সার্থকতা। শতশতাব্দীর বেদনালাঞ্ছিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই মনুষ্যমহিমার উপলব্ধি এত গভীর। আবার এই ভারতবর্ষেই একদা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান ছিল স্বর্গলাভের পন্থা। কারণ, আসন্ন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েও শান্তি-বচনের সৌখীনতা কাপুরুষতারই নামান্তর। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে—

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৬

"আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না।···এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে···তবে মানুষ।" [পত্রাবলী][১]

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী থেকে বিবেকানন্দশতবার্ষিকীর মধ্যপথে ভারতভাগ্যের বিবর্তন একথা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমাদের জীবনে সাহিত্যে কোথায় একটা প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছিল। সংস্কৃতি-আসরের বর্ণচ্ছটা ও বিলাসভূষার চাকচিক্য ছিল, পৌরুষের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভাবালুতার দিক থেকে যতটা গ্রহণ করেছি, অকল্যাণের সঙ্গে তাঁর চিরসংগ্রামের বাণীকে তেমনভাবে স্মরণ করি নি। জাতীয় আদর্শের এই শূন্যতা-পূরণের স্বাভাবিক প্রয়োজনেই বিবেকানন্দ-জীবন ও সাহিত্যের অনুধ্যান আজ একান্ত প্রয়োজন।

আজ তাই বিবেকানন্দের রচনা ও বাণীর অনুধ্যানে আমরা এই দীপ্তসূর্যের বহ্নিতেজ আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত করব। তাঁর জীবনে, রচনায়, কথোপকথনে, পত্রাবলীতে যে বিদ্যুৎস্পর্শ নিহিত আছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহে মনে তার তীব্র গতিসঞ্চার আমাদের জীবনযুদ্ধের উপযুক্ত করে তুলবে—এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হব। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের "আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে পারবে।"[২] জীবনে তো বটেই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বামীজী এই প্রেরণাস্পন্দন এনে দিয়েছেন তাঁর চলতিভাষায় রচিত 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য', 'ভাব্‌বার কথা' ও পত্রাবলীতে, আবার গভীর মননের সংহত ভঙ্গিমায় ইতিহাসের দর্শন রচনা করেছেন

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪

'বর্তমান ভারতে'। তাঁর শৌর্যদৃপ্ত বাগ্ভঙ্গীর অপূর্ব উদাহরণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'। বাংলাভাষায় কোমলকান্তরূপের অন্তরালে যে এমন দৃপ্ত কঠোর শাণিত ইস্পাতের প্রখরতা আছে, সেকথা বিবেকানন্দ-সাহিত্যই আমাদের কাছে ঘোষণা করেছে। স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী কবিতায় জীবনের উপলবন্ধুর দুর্গম পথে অভিযাত্রী দুঃসাহসী মানবাত্মার জয়গান।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে উপনিষদের সেই জাগরণের বাণী আবার ধ্বনিত হোক—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা উপনীত হব। কারণ, বিবেকানন্দ এ দেশে জন্মেছিলেন।

বিবেকানন্দ ঃ মনন ও সাহিত্য

এ পৃথিবীতে নামকরণ ব্যাপারটা সব সময় আকস্মিক নয়, আমাদের অগোচরে ওর মধ্যে অনেক সময় জীবনের গভীরতম তাৎপর্য থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ—এ দুটি নামে যেমন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা, 'ব্রহ্মবাদিন', 'প্রবুদ্ধভারত' ও 'উদ্বোধন'—পত্রিকা তিনটির নামকরণেও তেমনি ভারতের ইতিহাসে স্বামীজীর প্রেরণার মূলমন্ত্রটি উচ্চারিত। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মুখপত্র এই ইংরেজী ও বাংলা মুখপত্র তিনটির নামকরণ স্বামীজী নিজেই করেছিলেন। জাতীয় জীবনে এই জাগরণের চেতনা-সঞ্চারই তো তাঁর ব্রত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে ভারতের নবজাগরণকে অনেকে এক মানদণ্ডে বিচার করতে যান। অথচ একথা সুবিদিত যে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব ইতিহাস, পরিবেশ ও মননের স্বাতন্ত্র্যে আপন আপন সংস্কৃতি গড়ে তোলে। সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখে বিচার করলে, তবেই আমাদের ইতিহাসজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চা পূর্ণতা লাভ করে। বিবেকানন্দের রচনাবলী এ বিষয়ে আধুনিক মানসের অন্যতম দিক্‌নির্দেশক।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (মাঘ, ১৩০৫) প্রস্তাবনায় স্বামীজী ইউরোপীয় ও ভারতের সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "······আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।······এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" উনিশ শতকের চিন্তাধারার একটি মূলসত্য স্বামীজী সঠিক অনুধাবন করেছিলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি বাঙালী-মনীষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই দুই সভ্যতার অন্তরঙ্গ সমন্বয়ে।

আধুনিকতার উন্মাদনায় কতবার আমরা অতীত ঐতিহ্যের সব

যোগসূত্র ছিন্ন করে সমুদ্রপারে পাড়ি জমাতে চেয়েছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন প্রচেষ্টা উনিশ থেকে বিশ শতকের বিভিন্ন পর্বে বারংবার দেখা দিয়েছে। জোয়ারের পর ভাঁটার টান যখন আসে, তখন আবার আমরা উপলব্ধি করেছি, সাহিত্যের জগতে নিছক আনকোরা নতুন বলে কিছু নেই, সব দেশের সব যুগের আধুনিকতাই ঐতিহ্যের নিগূঢ় সংযোগে সার্থক।

নবযুগের ভারতবর্ষ গঠনে স্বামীজী এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গ্রন্থচতুষ্টয়—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভাব্‌বার কথা'—এই প্রাচীপ্রতীচির সংঘাত ও সম্মেলনের পটভূমিতে রচিত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যও বিশ্ব-পরিক্রমায় যাত্রা করেছে, ভারত-সংস্কৃতি পেয়েছে বিশ্বসংস্কৃতির আসরে মহৎ মর্যাদার অধিকার।

রামমোহন, মধুসূদন, প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের ঐতিহ্য-প্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্যগুণগ্রাহিতার সূত্রপাত।[১] কিন্তু প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে স্বামীজীর সাধনা, উপলব্ধি ও শাস্ত্রচর্চার ব্যাপকতা অনেক বেশী। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার উত্তরাধিকার লাভের ফলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের এমন এক অন্তরঙ্গ ঐক্যসূত্র স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বারা বেদান্ত ও বিজ্ঞান একই লক্ষ্যের অভিমুখে মানবাত্মার পথ-নির্দেশ করেছে।

নবযুগের বেদান্ত-আন্দোলনের পথিকৃৎ রামমোহন। কিন্তু ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর মনেও সম্পূর্ণ সমাধান লাভ করে নি। সংস্কৃত কলেজের পঠনপাঠন-পদ্ধতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বেদান্ত-অধ্যাপনা সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটি স্মরণীয়—"Nor will youths be fitted to be better members of

১ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ দ্রঃ

Society by the Vedantic doctrines which teach them to belive, that all visible things have no real existence, that as father brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better…" (যে বেদান্তধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে দৃশ্যমান বস্তু-নিচয়ের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির যখন কোন প্রকৃত সত্তাই নেই, তখন তাদের প্রতি মমত্ববোধও অপ্রয়োজনীয়, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তাদের হাত এড়িয়ে আমরা জগৎ থেকে পালাতে পারি ততই ভাল, তার দ্বারা তরুণেরা যোগ্যতর সামাজিক হতে পারবে না।)[১]

বলা বাহুল্য, বেদান্তের মায়াবাদ এখানে দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করে নি, স্বয়ং রামমোহনও যে এ ব্যাখ্যা বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ আছে তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থের' ভূমিকায়। পূর্বপক্ষের 'ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না' এই আপত্তির উত্তরে ঐ ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, "তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্যসকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কিরূপে এ কথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না।"[২]

পরবর্তীকালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রটিতে রামমোহনের পূর্ব-পক্ষের যুক্তিকেই আপন যুক্তি হিসাবে পেশ করার কারণ ভারতবর্ষের

১. Life of Raja Rammohan Ray : Collet : p. 459 ('62 Edn)

২. রামমোহন গ্রন্থাবলী : বেদান্তগ্রন্থ (সাহিত্যপরিষৎ সং) : পৃঃ ৫

ঐহিক উন্নতিকল্পে তাঁর ব্যাকুল আগ্রহ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও বেদান্ত, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে এমন কোন বিরোধ দেখতে পান নি। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছতর—"Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita." চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশের প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু একথা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন অদ্বৈতবাদ। (স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী সংস্করণের সূচনায় ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা।)

অদ্বৈতবাদের এই পরম ঐক্যোপলব্ধির আলোকে স্বামীজী নতুন যুগের যে জীবনদর্শন উপস্থাপিত করলেন, তার ফলে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে যে সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি মানবজাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার সার্থক সূচনা ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলীতে।

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—"একথা অবিস্মরণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দই সর্ববস্তুতে একাত্মবোধ সহ অদ্বৈতবাদের সর্বোচ্চ মহিমা ঘোষণা করে তার সঙ্গে এই তত্ত্বটিও যোগ করেন যে হিন্দুধর্মে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি পর্যায় বা স্তর মাত্র--অদ্বৈতই এর লক্ষ্যস্থল।…এই উপলব্ধিই আমাদের গুরুদেবের জীবনে পরম তাৎপর্য আরোপ করেছে। কারণ, এক্ষেত্রে তিনি শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নয়, অতীত ভবিষ্যতের মিলন-তীর্থে পরিণত। বহু ও এক যদি সত্যই এক সত্তা হয়ে থাকে, তবে শুধু সব ধরনের সাধনাই নয়, সব ধরনের কাজ, সব প্রচেষ্টা ও সৃষ্টিই উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা।

"এর পর থেকে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে কোন পার্থক্যই রইল না। পরিশ্রমই প্রার্থনা। জয়ই ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। গ্রহণ ও আসক্তি, বর্জন ও ত্যাগের মতোই কঠোর দায়িত্ব।

"কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি-বর্জিত নয়, বরং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশক—এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান প্রচারকে পরিণত করেছে। তাঁর কাছে সন্ন্যাসীর কুঠরী বা মন্দিরের মতো কারখানা, পাঠকক্ষ, খেতখামার প্রভৃতিও মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনক্ষেত্র-রূপে সমান সত্য ও সার্থক পরিবেশ। মানুষের সেবায় ও ভগবানের উপাসনায়, বিশ্বাসে ও পুরুষকারে, সততা ও আধ্যাত্মিকতায় তাঁর কাছে কোন পার্থক্য নেই। এক হিসাবে তাঁর সব কথাই এই মূল প্রত্যয়ের ভাষ্যমাত্র।"[১]

বিবেকানন্দ-জীবনদর্শনের এই কেন্দ্রসত্যটি মনে রেখে নবযুগের বাঙালী তথা ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার কয়েকটি মূলসূত্র অনুধাবন করা যেতে পারে—সুস্থ সবল দেহ (muscles of iron and nerves of steel); সেই আশীষ্ঠ বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ঠ দেহে একটি বজ্রের উপাদানে গঠিত মন; জীবন-সংগ্রামে সদাসমুদ্যত "খাপখোলা তলোয়ারে"র ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়; স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সর্বস্বত্যাগী ভালোবাসা এবং বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যবোধ; প্রগাঢ় মননশীলতার সঙ্গে অপার হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ।

সাধারণত তাঁর আবেগদীপ্ত হৃদয়ধর্মী রচনাংশগুলিই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করলেও স্বামীজীর অধিকাংশ রচনাই মননধর্মী। তাঁর সুবিখ্যাত যোগচতুষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ ও ভাষণাবলীতে (বিশেষত জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ গ্রন্থে) আমাদের শাস্ত্রানুসারী ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি আধুনিক জীবনবোধের যে নিপুণ সমন্বয়সাধন করেছেন, তার দ্বারা তাঁর মনীষার অসাধারণত্বই প্রমাণিত। চিকাগো মহাসভায় প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণটি* থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর বক্তৃতা,

---

১. অনুবাদ: লেখককৃত।

* এর আগেও তিনি অন্যত্র ভাষণ দিয়েছেন, তবে সে সব বক্তৃতার পূর্ণরূপ আজ অবধি আমরা দেখতে পাই নি। চিকাগো মহাসভায় তাঁর প্রথম

রচনা ও কথোপকথনে তিনি ভারতবর্ষের যে অন্তরতম স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সে কেবল স্বদেশপ্রেমের গৌরব-গাথার ভারত নয়, মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মা। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সত্তা নয়, নিখিলমানবের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ উত্তর।

কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যের একান্ত অভাব সম্বন্ধে স্বামীজী তীব্রভাবে সচেতন। তবু স্বদেশী বা বিদেশী যে সব সমালোচক কেবল এই অবনতির দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেই ক্ষান্ত থাকেন, কেবলমাত্র নিন্দাদ্বারাই সংস্কার সাধিত হয় বলে মনে করেন, তাদের তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি। সমগ্র ভারতপরিক্রমা করে তিনি এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতের প্রাণসত্তা এখনো জাগ্রত। স্বামীজীর শিষ্য ও অনুরক্ত যে সব বিদেশী বা বিদেশিনী ভারতের সেবায় জীবনোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের এই প্রাণসত্তাকে তুলে ধরাই ছিল স্বামীজীর প্রধান কাজ। ভগিনী ক্রিস্টিন স্বামীজীর এই ভারততন্ময় ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"Our love for India came to birth, I think, when we first heard him say the word, 'India' in that marvellous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of five letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, heimweh and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic Power of creating love in those who heard it. Ever after, India became the land of heart's desire. Everything

---

ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ আমরা পেয়েছি। মনন ও সাহিত্যের সার্থক সমন্বয়ে এটি বিবেকানন্দ-রচনাবলীর যথার্থ সূচনা।

concerning her became of interst—became living—her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, her scriptures. And so began a new life, a life of study, of meditation." (Reminiscences of Vivekananda, pp : 157-58)*

ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, বিবেকানন্দের হৃদয় সমগ্র পৃথিবীকে একদিন আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিল। বিশেষ দেশ ও ধর্মের ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই সব দেশ ও সব ধর্মের অন্তরালে মানবতার অখণ্ড মহিমা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিবেকানন্দের ভারতচিন্তাকে কেবলমাত্র দেশপ্রীতির নিদর্শন মনে করলে তার ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করা হবে। India's Message to the World নামে তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে "এইখানেই মানবহৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবতা থেকে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত

* আমার মনে হয়, যেদিন তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠে India (ভারতবর্ষ) শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম, সেদিন থেকেই আমাদের হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠেছিল। ভারতবর্ষ—মাত্র পাঁচটি অক্ষরের একটি শব্দে এত কথা ভরা থাকতে পারে, একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে। ওই শব্দটির মধ্যে ছিল—ভালোবাসা, আবেগ, গর্ব, ব্যাকুলতা, পূজা, বিষাদ, শৌর্য, গৃহ-ব্যাকুলতা আর আবার ভালোবাসা। একটি সমগ্র গ্রন্থাবলীও কারো হৃদয়ে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত না। যারা তাঁর কণ্ঠে ওই শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছে, তাদের হৃদয়ে ভালোবাসাসৃষ্টির জাদুমন্ত্র নিহিত ছিল এই শব্দটির মধ্যে। তারপর থেকে ভারতবর্ষই হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের মানুষ, ইতিহাস, স্থাপত্য, আচার-আচরণ, নদী, পর্বত, সমতল, সংস্কৃতি, শাস্ত্র, অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা—প্রতিটি বিষয় তাদের কাছে সজীব আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। তখন থেকে ধ্যান ও মননের এক নতুন জীবন-চর্যার সূত্রপাত।

সবকিছুকে ধারণ করে আরো বিশাল অনন্তপ্রসারিত হয়ে উঠেছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করেছে, তার প্রতিটি স্পন্দনকে আপন নাড়ীর স্পন্দনরূপে অনুভব করেছে।" এই হিসাবে স্বামীজীর বেশীর ভাগ বাংলা ও ইংরেজী রচনা ও ভাষণই এই ভারত ও বিশ্বহৃদয়ের সংযোগসাধন প্রচেষ্টা। তার মূল সুরটি আধ্যাত্মিক। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম, বেদান্ত ও বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক—নানামুখী জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে অন্বয়সম্বন্ধ স্থাপন করাতেই বিবেকানন্দের মৌলিকতা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটিতে এই ভিন্নমুখী জিজ্ঞাসার স্বরূপ-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে ; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

"পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল ; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে ; মাটি, ...থর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ... রয়েছে ; অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন ...স্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত ..., তার নাম 'ব্রহ্ম'; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওর নাম দিলেন 'মায়া" অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।...এদের ...গিতই এটা এখন বুঝেছেন,—এদের রকম দিয়ে, জড়-...র দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বহু হল, একথা ... এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি ...তীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই খোঁজার ...ce)।"

অন্বেষণের আপাত বিপরীত এ দুটি পন্থা যে শেষ অবধি 'বহু'-র 'একে'র নিঃসংশয় উপলব্ধিতে বিলীন হবে, এ বিষয়ে স্বামীজী নিশ্চিত ছিলেন। তাই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্ত—"অপরা ও পরাবিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে; এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতাব তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।"[১]

['জ্ঞানার্জন'—ভাব্‌বার কথা]

জ্ঞানের রাজ্যের এই ঐক্যবোধকে বিবেকানন্দ প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যে পরিণত করেছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় এই সত্যটি ধরা দিয়েছে—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(সখার প্রতি)

বেদান্তের মননশীলতাকে মানবপ্রেমের কল্যাণবোধে রূপান্তরিত-করণের সাধনায় স্বামীজীর অপূর্বসিদ্ধির পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যে সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটেছে। আমেরিকা পরিভ্রমণান্তে এদেশে ফিরে এসে স্বামীজী যখন তাঁর অনুরাগী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন স্বভাবতঃই আমাদের প্রচলিত ধর্মধারণায় আঘাত লেগেছিল। বিবেকানন্দশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিকথায় এই চিন্তসংঘাতের একটি বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"একদিন মাষ্টার মহাশয়ের (কথামৃত-প্রণেতা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?' স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা ত নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির চেষ্টা কি?"[১]

মুক্তিপ্রচেষ্টাকে পর্যন্ত মায়ার গণ্ডীতে ফেলার কারণ, স্বামীজী নিজে ছিলেন জীবন্মুক্ত। অপরপক্ষে নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়ে শুদ্ধচিত্ত মানুষ যে ওই মুক্তি আপন অন্তরে আপনিই লাভ করে এও তাঁর সিদ্ধান্ত। সত্ত্বগুণাশ্রিত দু'চারজন ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সব মানুষকেই কর্মের দ্বারাই কর্মপাশমুক্ত হতে হবে, এই কথা জেনেই স্বামীজী লিখেছিলেন—"অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?"[২] ('বর্তমান সমস্যা'—ভাববার কথা)

এই মনোভাবের ফলে জাতীয়জীবনে রজোগুণের সংগ্রামীপ্রেরণা-সঞ্চারের অগ্নিবাণী তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ "বর্তমান ভারত" থেকে তাঁর সাধু গদ্যরীতি ও "পত্রাবলী" থেকে চলতি গদ্যরীতির রচনাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—"হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬
২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩২-৩৩

আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী…"[১]

"আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে—এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আসুন ! জয় কালী, জয় কালী ! মা নাববেনই নাববেন—মহাবলে সর্বজয় বিশ্ববিজয় ; মা নাবছেন। ভয় কি ? কাদের ভয়।…জয় কালী, জয় কালী।"[২]

বিশেষভাবে চলতি গদ্যের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাতের কারণও তাঁর সংগ্রামী প্রেরণা। তাই তো ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়—দাঁত পড়ে না।'[৩] একদিকে সংগ্রাম অন্য দিকে গণসংযোগ—বিবেকানন্দের আদর্শ চলতি গদ্য এ দুয়েরই উপযুক্ত বাহন। সাহিত্য, স্বদেশচিন্তা, অধ্যাত্মসাধন—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ নিজেকে ভারতবর্ষের চিরপদদলিত স্বজাতিলাঞ্ছিত জনসাধারণেরই একজন বলে মনে করেছেন। তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ অবধি যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা যে সাধারণের মুখের ভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন সে কথা 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উনিশ শতকের এই ব্রহ্মবিদ্ সাধকই আসন্ন শূদ্রযুগের নিশ্চিত ঘোষণা করেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে।

"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

২ তদেব : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০-৮১

৩ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বাঙ্গালা ভাষা : পৃঃ ৩৪

বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য-জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল।"[১]

"পরিব্রাজক" গ্রন্থে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের মধ্য থেকে "নূতন ভারতে"র আবির্ভাবের আহ্বান তো বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে পরিচিত শ্রমিক-বন্দনা। কিন্তু একথাও স্মরণীয়, ক্ষুধার সত্যকে স্বীকার করলেও বিবেকানন্দ ধর্মের সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সাধনায় আমাদের দিনযাপনের সংগ্রামের সঙ্গে চিরন্তনের ধ্যান এসে মিলেছে। সেদিক থেকে বিবেকানন্দ শুধু 'বর্তমান ভারতে'রই লেখক নন, ভবিষ্যৎ ভারতেরও স্রষ্টা।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৪১। প্রসঙ্গতঃ ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিচারণে স্বামীজীর একটি বক্তব্য স্মরণীয়—"The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China. I can't quite see which, but it will be either Russia or China." [Reminiscences of Swami Vivekananda : P. 203]

বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সাধারণত একমত। স্বামীজীর শৌর্যদৃপ্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনাবলীতে একটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী বা শৈলীর সৃষ্টি করেছে, যার তুলনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা বিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যে দুর্লভ। সংখ্যার বিচারে তাঁর বাংলা রচনা অত্যল্প ; কিন্তু সেই স্বল্পসীমার সমুজ্জ্বল দীপ্তিতেই বাংলা গদ্য বা কবিতা-সংকলনে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনার অজস্র বাংলা অনুবাদে যেভাবে তাঁর ভাবগম্ভীর ওজস্বিতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস দেখা যায়, তার ফলে এই অনুবাদ-সম্ভারও বাংলা সাহিত্যের শ্রদ্ধার সামগ্রী। 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বইয়ের অনেক অংশ যেভাবে চিন্তামূলক রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকরা বা সংবাদপত্র-সেবীরা ব্যবহার করে থাকেন, তাতে মনে হয় এসব বই যে মূলত অনুবাদ, সে কথা অনেকেই অবহিত নন। এ জন্য বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তাঁর স্ব-নির্বাচিত প্রথম অনুবাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কাছে চিরঋণে আবদ্ধ।

কালানুক্রমিকভাবে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের চারটি গদ্য-রচনা—'ভাব্‌বার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই সব কয়টিই 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষের মধ্যে প্রকাশিত। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বোধ হয় স্বামীজীর লেখা প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর আগে তিনি জনৈক বন্ধুর সংগীত-সংকলনগ্রন্থের একটি ভূমিকা[১] লিখেছিলেন।

১. শ্রীবৈষ্ণচরণ বসাক-সম্পাদিত 'সঙ্গীতকল্পতরু'। এছাড়া হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদও তিনি করেছেন বলে অনুজ মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ দুটিই তাঁর প্রাক্-সন্ন্যাস

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার আত্ম-প্রকাশ-উপলক্ষ্যে[১] স্বামীজী একটি 'প্রস্তাবনা' লেখেন, পরবর্তীকালে 'ভাব্‌বার কথা' নামে প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশের সময় 'প্রস্তাবনা'র নাম দেওয়া হয় 'বর্তমান সমস্যা'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোধর্মের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবনায় স্বামীজীর সিদ্ধান্ত—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজো-গুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

'উদ্বোধনে'র এই প্রস্তাবনা পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান; এই মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই স্বামীজীর সচেতন সাহিত্যপ্রয়াস। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে ও ভারতের কাছে বিশ্বকে উপস্থাপিত করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করে-ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পুণ্যব্রতই পালন করে গেছেন।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম বর্ষেই স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" ও "বিলাতযাত্রীর পত্র" (পরবর্তীকালে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত) বই দুটির অধিকাংশ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৬-৭) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূত্রপাত। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে স্বামীজীর আবির্ভাব সম্পূর্ণভাবেই এই মাসিক পত্রিকাটির উপলক্ষ্যে। প্রথম চার বৎসর এই পত্রিকার প্রধান এবং একমাত্র আকর্ষণই ছিল স্বামীজীর রচনাবলী।

শুধু গদ্যরচনা নয়, এই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতাও উদ্বোধনে প্রকাশিত—১. সখার প্রতি—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

যুগের রচনা। অনুসন্ধান করলে হয়তো এ যুগের আরো রচনার সন্ধান পাওয়া যাবে।

১ উদ্বোধন ১ম সংখ্যা, ১৩০৫ মাঘ। পাক্ষিক পত্রিকারূপে সূচনা।

২. নাচুক তাহাতে শ্যামা—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৩. গাই গীত শুনাতে তোমায়—৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। এর মধ্যে 'সখার প্রতি' কবিতাটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

এ ছাড়া স্বামীজীর রচিত দুটি ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত বাংলা কবিতার জগতে স্মরণীয় আসনের অধিকারী—"একরূপ-অরূপ-নাম বরণ" এবং "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ—"[১] গান দুটি সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর বিবেকানন্দের সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্বের রচনা। গান দুটিতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্পর্শ আছে।

বিবেকানন্দের বাংলা ও ইংরেজী পত্রাবলী পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পত্রলেখকের ব্যক্তিত্ব যে পত্রকে কী জীবন্ত ব্যক্তিত্বে ভাস্বর করে তোলে, তার আশ্চর্য উদাহরণ স্বামীজীর পত্রাবলী। বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণপরিচয় লাভের জন্য এই পত্রগুলি অমূল্য উপকরণ। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনাবলীর মতো এগুলি সচেতনমনের সৃষ্টি নয়, অথচ শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে সমান মর্যাদার অধিকারী, কোন কোন ক্ষেত্রে বরং বেশী বলেই মনে হয়।

যদিও রচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাহিত্যিকের পক্ষে কম কথা নয়, তবু যে লেখক ভাবের জগতে কোনো মৌলিক চিন্তা বা উপলব্ধির সঞ্চার করেছেন, তাঁর মূল্য গতানুগতিক সাহিত্য-সাধনার অনেক ঊর্ধ্বে। স্বামীজীর সাহিত্যকৃতি সেই মৌলিকতার অধিকারী। সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। চলমান জগৎ ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এই মননধর্ম সজীব ও গতিময়। তাঁর গদ্যগ্রন্থাবলীর পটভূমিতে এক বিরাট অনুভূতিশীল কবিহৃদয় মানবসভ্যতার পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাস-

১ উল্লেখিত গানদুটির পটভূমি-প্রসঙ্গে 'বাণী ও রচনা' নবম খণ্ড : পৃঃ ৯৯ এবং এই গ্রন্থের 'বিবেকানন্দের' কবিতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাঠে অভিনিবিষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কবির্মনীষীর সীমাবদ্ধ আত্মপ্রকাশে তাঁর অন্তরের বিপুল ভাবসম্পদের আভাসটুকু মাত্র আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তবু সেই স্বল্প পরিচয়ই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিস্ময়।

সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি বিবেকানন্দের আকৈশোর অনুরাগ। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্য—"বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় তাঁহার পঠিত কোরিওলেনাস এবং মিল্টন, বাইরন, হ্যামিল্টন প্রভৃতির পুস্তকগুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন-আবৃত্তি-পদ্ধতি তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। সেক্‌স্‌পীয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন···। বাইবল তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরেজী কাব্য তিনি প্রধান অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন।"

"বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরেমালিনীর কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর যাত্রা অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন।[১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ

---

১ ভারতচন্দ্রের কাব্যসম্বন্ধে স্বামীজীর পরবর্তীকালের মনোভাবপ্রসঙ্গে বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ডের পৃঃ ২১১ লক্ষণীয়। ঐ একই পৃষ্ঠায় মধুসূদন ও মেঘনাদবধকাব্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর অমর মন্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থের 'মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি জন্মেছিল।" দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি-তামাসার কথা হইলেই তিনি 'সধবার একাদশী'র কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। 'নীলদর্পণ' হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।··· স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা 'স্থদর্শন সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত।··· কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল···'ললিত-বিস্তর'খানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল।"[১]

উপরি উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলির সাহায্যে স্বামীজীর সাহিত্য-রুচি কতখানি প্রসারিত ছিল তার অনেকটা পরিচয় মেলে। ছাত্রাবস্থা থেকেই নরেন্দ্রনাথ বহুবিচিত্র জ্ঞান-আহরণে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে দর্শন ও শাস্ত্রচর্চাই তাঁর প্রধান আকর্ষণ হলেও নানামুখী জ্ঞানের প্রতি আজীবন ঝোঁক ছিল। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ বিশেষ লক্ষণীয়।

কিশোর বয়স থেকেই বিবেকানন্দের সাহিত্যানুরাগসম্বন্ধে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২] তখন দত্তপরিবার রায়পুরে ছিলেন। সেই সময় "একদিন তাঁহার পিতৃবন্ধু জনৈক খ্যাতনামা লেখক বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথও পিতার ইঙ্গিতে

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : ২য় খণ্ড : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃঃ ১৬২-৬৬ : প্রথম সংস্করণ।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর কতটা পরিচয় ছিল, তা বলা কঠিন। তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে রবীন্দ্র সংগীতের সংকলন, এবং 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তাঁর ভক্তিমূলক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া দেখে মনে হয়, প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর গদ্যভঙ্গী বা কবিতার গোত্র আলাদা। রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁর রচনায় অনুপস্থিত।

২ বিবেকানন্দ চরিত : ৪র্থ সং পৃঃ ২৭

আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহিত্যিকপ্রবর কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থই বালক অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস! আশা করি একদিন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইবে।" এই খ্যাতনামা লেখকটির পরিচয় আমরা জানি না; কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছে। বাংলাভাষার গঠনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের দান চিরস্মরণীয়। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধে বাংলা গদ্যের চলতিরূপের সপক্ষে যতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্তি দেখানো হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'সবুজপত্রের' আগে চলতি গদ্য সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ তাঁর 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অথবা তাঁর প্রথম জীবনের পত্রাবলীতে চলতি গদ্যের যে ভাবসুন্দর নম্রমাধুর্য ফুটে উঠেছে তার দ্বারা বাংলা গদ্য অনেক আগেই চলতিপথের যাত্রী হতে পারত।

কালানুক্রমিকভাবে বিবেকানন্দের চলতি গদ্য পরবর্তীকালের। তবু, বাংলা গদ্যে বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম জীবনের সবরকমের অনুভূতিকেই চলতিভাষায় রূপান্তরিত করার বিদ্রোহী সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। এবিষয়ে তাঁর যুক্তি আরো সুদূরপ্রসারী—"যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" "দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।" "চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?" (বাঙ্গালা ভাষা -ভাব্বার কথা) উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সমকালীন বাংলা গদ্যের রূপান্তরসাধনে যতটা কার্যকরী হতে পারত তা না হওয়ার কারণ বিবেকানন্দ কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মতবাদের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ সাধুবাদ তার অন্যতম প্রমাণ।[১]

---

১ "দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের (কুমুদবন্ধু সেন)

কিন্তু স্বামীজী নিজেও সবসময় এই চলতিভাষায় লেখেন নি। নিরন্তর সংস্কৃতশাস্ত্রাদির সাহচর্য ভাষার আর একটি গুণের প্রতিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত, শবরস্বামীর মীমাংসা-ভাষ্য, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা মনে থাকলে 'ভাব্‌বার কথা'র সাধুভাষায় লেখা প্রবন্ধাবলী অথবা 'বর্তমান ভারতে'র সাধুভাষা সম্বন্ধে বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

বিবেকানন্দের সাধুগদ্য সম্বন্ধে সে-যুগেই কেউ কেউ অতিরিক্ত কঠোরতার (কটমটে) অভিযোগ এনেছিলেন। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধটি যখন উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় তখনও এ অভিযোগ উঠেছিল। 'বর্তমান ভারত' সম্বন্ধেও এ ধরনের সমালোচনা যে দেখা দিয়েছিল, স্বামী সারদানন্দজী-লিখিত উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তার নিদর্শন আছে। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব অভিমত বাংলা-ভাষার দিক থেকে আজও চিন্তনযোগ্য—'এখনকার বাংলা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ

নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল!' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার কাছে আসছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্বপশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' "

করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—ভাষার ভিতর verbগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস? ঐরূপে ভাবের pause বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্বলতার চিহ্নমাত্র।' [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ][১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুযায়ী বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষার পরিবর্তন বিবেকানন্দও করেছেন—তবে তাঁর সাধু ও চলতি গদ্যের রূপের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। সাধুগদ্যে তিনি অতিমাত্রায় সংহত ও ঋজু। কিন্তু এই ঋজুতার ফলে ভাবপ্রকাশের এমন এক ঘনবদ্ধতা দেখা দিয়েছে যা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য-অনুযায়ী। অথচ সেই সুগভীর বাক্‌সংযমও অনুভূতির আবেগে মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদের মতো অমর কাব্যরচনা করেছে।

তরুণ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার আর একটি ঘটনার সাক্ষ্য আছে—তাঁর সহপাঠী শরৎচন্দ্রের (স্বামী সারদানন্দ) স্মৃতিকথায়—"ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের গুণানুবাদ শুনিবার কয়েকমাস পূর্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেইদিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে।"

শরৎচন্দ্রের এক সহপাঠী বন্ধু যৌবনের প্রথম ধাপে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। বন্ধুটি তখন এক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মাঝে মাঝে বাংলায় প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জনও চলেছে বলে শোনা যেত। বন্ধু সম্বন্ধে এ সব গুজবের সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের জন্য শরৎচন্দ্র সেদিন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। "ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪

আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটি গীতের একাংশ গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ, 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনয়নে দেখিতে পারিলাম না।[১]...কিছুক্ষণ পরে আমাদিগকে দুই একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্বোক্ত যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না। তথাপি সহসা বিদায় গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া সাহিত্যসেবী বন্ধু যুবকের সহিত ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাব প্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও মনুষ্যজীবনের যে কোনপ্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক (নরেন্দ্রনাথ) ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে সু বা কু যে কোনপ্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোনপ্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন 'চসর'

---

১ সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের অনেকের দৃষ্টিতেই রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী নীতিজ্ঞানের অন্তরায় ছিল।—লেখক

হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

উপসংহারে যুবক (নরেন্দ্রনাথ) বলিয়াছিলেন, "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শ-বিশেষকে প্রকাশ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শ-বিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগ সকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—They idealise what is apparently real.'[১] পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে—They want to realise the ideal.'[২] ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সেইজন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।"[৩]

সাহিত্যের ভাবাদর্শ সম্বন্ধে এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশই বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজী চরম আদর্শবাদী। বাস্তববাদী জীবন-জিজ্ঞাসা যেখানে মানুষের অন্নবস্ত্র ও বুদ্ধি-হৃদয়ের সামঞ্জস্য-সাধনে

১ আপাতবাস্তবকেই তাঁরা আদর্শায়িত করতে চান।

২ আদর্শকে তাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করতে চান।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ: পৃঃ ১৩৪-৩৮; ১৩৪২ সাল সংস্করণ।

ব্যস্ত, বিবেকানন্দ সেখানে আত্মার আলোকে জীবনের পরম সত্যটি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চান। তাই তাঁর কাছে উনিশ শতকের আর সব চিন্তানায়কের চেয়ে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণই আদর্শ পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অন্তর্লোকে তিনি কেবল ধর্মসাধনার সমন্বয় উপলব্ধি করেন নি, জীবন ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপেও লক্ষ্য করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য—যে সরল উপমাচিত্রল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছিলেন, সেই সহজ গভীর চলতিভাষার সৌন্দর্যানুরাগই বিবেকানন্দের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—"ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে! এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।" [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ][1]

উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত অধ্যাত্মসাধনার আন্দোলন কেবলমাত্র ধর্মজগতে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে ভাবধারা ও বাণীভঙ্গীর চিরনবীনতা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছে। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এসব বিষয়েই যে চলতিভাষায় সহজ ও সুন্দর প্রকাশ একান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভব—সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর দ্বারা সুপ্রমাণিত।

"ঈশ্বরলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য" এবং "খালি পেটে ধর্ম হয় না" —দুটো কথাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দ শুনেছিলেন। উপনিষদের অনুসরণে তাই তিনি বলেছিলেন—'মূর্খ দেবো ভব, দরিদ্র দেবো ভব।' বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় মানবসেবামূলক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান আজ ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে অধিকারের যে পার্থক্য বিবেকানন্দহৃদয়কে ব্যথিত

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ৯৩

করত, যে নূতন ভারত জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ি থেকে বেরুবে বলে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক রূপান্তর আজও আমাদের প্রতীক্ষিত।

উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে এক স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের অন্তরের পরিচয় লাভ করেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে বেশীর ভাগ মনীষীরাই নাগরিক সভ্যতার দৃষ্টিতে জনসাধারণকে পুথিপত্রের মধ্য দিয়ে দেখেছেন। বিবেকানন্দের মতো এমন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আর কেউ আসেন নি। এদেশের দারিদ্র্য-জীর্ণ দশার আসল কারণ যে শিক্ষার অভাব এই কথাটি স্বামীজীর বারংবার মনে হয়েছে—বিশেষ করে পত্রাবলীতে তিনি গণশিক্ষার কথা একাধিক ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন। চলতিভাষার প্রতি তাঁর একান্ত পক্ষপাতের কারণ এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত গণ-শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী।

বিবেকানন্দের চলিতভাষাশ্রয়ী সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মনে সহজেই আগ্রহ জাগে। কিন্তু তাঁর সাধুগদ্যে যথাসাধ্য ক্রিয়াপদ বিলোপের প্রস্তাবও আমাদের চিন্তনীয় আদর্শ। ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যেও সংস্কৃতের মতো এত বিশাল ও বিচিত্র শব্দসম্পদের তুলনা বিরল। স্বামীজীর চলতি ও সাধু দুই শ্রেণীর গদ্যই সংস্কৃত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ। বিশেষত তাঁর সাধুগদ্য যথাসম্ভব ক্রিয়াপদবর্জনের ফলে আরো বক্তব্যনিষ্ঠ ও অর্থগূঢ় হয়ে উঠেছে।

তাঁর গুরুভাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামীজীর সাধু গদ্যরীতির উত্তরাধিকার স্বামী সারদানন্দজীর রচনাশৈলীকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর চলতিভাষার ঐশ্বর্য মনীষী বিনয়কুমার সরকারের রচনা ও আলোচনায় প্রাণবেগ এনে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র গদ্য রচনাবলীতে চলতিভাষাও সংস্কৃত শব্দের নিপুণ প্রয়োগের ফলে কতটা সংহতগভীর হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন মেলে। বাংলা

ভাষায় বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত সাধু-গদ্যের সংহত ভঙ্গিমা যে এখনো উপযুক্ত উত্তরসাধকদের রচনায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র গদ্যরীতি তার উদাহরণ। এঁরা কেউই বিবেকানন্দের অনুসরণ করেন নি। তবু মননসাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাষাদর্শের মিল লক্ষণীয়। চলতিভাষাকেও গভীর মননের উপযোগী করতে হলে সংস্কৃত থেকে উপযুক্ত শব্দসন্ধান আমাদের করতেই হবে। তবে, অতিমাত্রায় শব্দকুহেলি-সৃষ্টির দিকে লেখকদের ঝোঁক না দেখা দেয় সে সম্বন্ধেও সতর্কতা প্রয়োজন।

*

বাংলা সাহিত্য ও বাংলার জাতীয় জীবনে দৃঢ়চিত্ত পৌরুষের বলিষ্ঠতাসঞ্চারী বীররসের কবিরূপে মধুসূদনকে স্বামীজী বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই সত্ত্বগুণের নাম ধরে নিরুদ্যম তমোগুণের জড়ত্ব তাঁর কাছে অসহ্য মনে হ'ত। বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে "আধ্যাত্মিক তন্দ্রা" ভেঙে বাঙালী জাতির জাগরণকে তিনি অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের অতিরিক্ত রসাবেশের প্রভাবে বাঙালীজীবনে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, সেকথা স্মরণ করে তিনি মহাবীর, শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—"কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?

····ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। 'মহাবীর, 'মহাবীর, ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম, শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে। যে সব music-এ (সংগীতে) মানুষের soft feelings (কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে সে-সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এই ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।"

[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ঃ উত্তরকাণ্ড][১]

মধুসূদনের মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত বীররসের উন্মাদনা কেন বিবেকানন্দকে এত আকর্ষণ করত, তার কারণ উপরি-উদ্ধৃত সংলাপ-বিবরণীতে সুপরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যে বীর ও রৌদ্ররসের সঞ্চারে স্বামীজীর দান এদিক থেকে অতুলনীয়। এই দুটি রসের পাশাপাশি ভয়ানকরসের প্রকাশ আছে তাঁর Kali the Mother (মৃত্যুরূপা মাতা) ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতা দুটিতে। অবশ্য ইংরেজী ও বাংলা অন্যান্য কবিতায় তিনি ধর্মাশ্রয়ী কবিদের মতো মূলত শান্তরসের অনুগামী। কিন্তু সে শান্তরস কঠোর বীর্য ও অপার সংগ্রামে দৃপ্ত—তাঁর Song of the Sannyasin (সন্ন্যাসীর গীতি) বা Song of the Free (জীবন্মুক্তের গীতি) এই জাতীয় শান্তরসের উদাহরণ।

অদ্বৈতআশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনী (The Life of Swami Vivekananda) গ্রন্থে কবিতা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার যেটুকু অংশ লিপিবদ্ধ তা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—'Poetry, because it is the language of ideals, made a strong appeal to Naren. Wordsworth was to him

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃ: ২১৯

the fixed star of the poetic firmament. Naren lived in the world of ideals, where history and philosophy and poetry and all the sciences are recognised as phases of Reality. He possessed a prophetic vision of learning, wherein thought was seen as subservient to the real purpose of life, the intellect being the fuel on which the soul fed and which it burned in its supreme effort to go ultimately beyond the intellect, beyond all thought.'[১]

উদ্ধৃত অংশটুকুর ভাষাভঙ্গী নিবেদিতার। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের সম্মিলিত রচনা এই জীবনীটিতে উদ্ধৃত মতামত আমরা প্রামাণ্য হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। স্বামীজীর কবিতা সম্বন্ধে মতামতেও আমরা আদর্শবাদী চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর নিজের কবিতায় তিনি বেদান্তের আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধির অনুভূতিকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন। এই ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনপথেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—"আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'" [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—উত্তরকাণ্ড]

১ 'কবিতা যেহেতু ভাবলোকের ভাষা, তাই নরেন্দ্রনাথের কাছে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ওয়ার্ডওসয়ার্থ ছিলেন তাঁর কাব্যপ্রেরণার ধ্রুবতারা। নরেন্দ্রনাথ সেই ভাবরাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, যেখানে ইতিহাস, দর্শন, কবিতা এবং বিজ্ঞান এক পরমসত্যের বিভিন্ন পর্যায়রূপে স্বীকৃত। জ্ঞানার্জন বিষয়ে তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যসাধনের অনুবর্তী ছিল মননপ্রক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার ইন্ধনস্বরূপ, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীতরাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পরমপ্রয়াসে সে ইন্ধনাগ্নির সার্থকতা।' (অনুবাদ লেখককৃত)

বিশ্বপ্রেমের অদ্বয় উপলব্ধিই বেদান্তের ব্রহ্মরূপে বিবেকানন্দের কবিতায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে বিবেকানন্দ তাঁর ইংরেজীভাষায় সাহিত্য-সাধনার মূল স্বরূপটি এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—"To put the Hindu ideas into English and then make out of dry philosophy and intricate mythology and queer, startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds, is a task which only those can understand who have attempted it. The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life; out of hopelessly intricate Mythology must come concrete moral forms and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. That is my life's work." "হিন্দুভাবধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও বিচিত্র মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা যা একদিকে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী হবে আবার অন্যদিকে উচ্চতম মনীষার উপযোগী হবে—এ এমন এক দুঃসাধ্য কাজ যে, যারা এ কাজে উদ্যোগী হয়েছে, তারাই তার মর্ম বুঝতে পারবে। বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে প্রতিদিনের জীবনে জীবন্ত ও কবিত্বমণ্ডিত করে তুলতে হবে; অসম্ভব জটিল পুরাণ-কাহিনীর মধ্য থেকে নৈতিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি চরিত্ররাশি আবিষ্কার করতে হবে; আর বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারোপযোগী মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করতে হবে, আর এসবই এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে।" (Letters of Swami Vivekananda; P. 302, 1948 Edn.)

স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী-সম্বন্ধেই উদ্ধৃত অংশটি প্রয়োজ্য হলেও তাঁর বাংলা ও ইংরেজী কবিতা প্রসঙ্গেই এ কথাগুলি বেশী খাটে। বিশেষত ঐ কথাটি লক্ষণীয়—

"The abstract Advaita must become living—poetic···" (বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে জীবন্ত কবিত্বময় হয়ে উঠতে হবে) —স্বামীজীর কবিতায় বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ কেবল "poetic" (কবিত্বময়) না হয়ে "poetry" (কবিতা) হয়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যোগসূত্র-স্থাপনের উপলক্ষ্যও একটি কবিতা। স্কটিশ চার্চ কলেজে F. A. (পরবর্তী ইণ্টারমিডিয়েট) পড়্‌বার সময় একদিন ইংরেজী ক্লাসের অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি তাঁদের ক্লাস নিতে আসেন। সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Excursion." আলোচনাপ্রসঙ্গে হেস্টি প্রকৃতিসৌন্দর্যধ্যানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধ্যান-তন্ময়তা (trance) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভের সৌভাগ্য এর আগেই হেস্টির ঘটেছিল। সেকথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, "Such an experience is the result of purity of mind and concentration on some particular object, and it is rare indeed, particularly in these days, I have seen only one person who has experinced that blessed state of mind, and he is Ramakrishna Paramahamsa of Dakhsineswar. You can understand if you go there and see for yourself,"[১] 'এ জাতীয় উপলব্ধি অন্তরের পবিত্রতা এবং বিষয়বিশেষে একাগ্র মনঃসংযোগের ফল। অবশ্য একান্ত দুর্লভ, বিশেষত আজকালের দিনে। মাত্র একজনকেই আমি এমন মহত্তম মানসিক স্তরে উত্তীর্ণ হতে দেখেছি, তিনি

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে তোমরা ব্যাপারটি বুঝিতে পারবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ শুধু সমাধি দেখলেন না, স্বয়ং অনুভব করলেন। সেই অনুভবের জগৎ থেকে সর্বজীবে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি সেবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'দরিদ্রনারায়ণ'।

বাংলা সাহিত্যের ঊষাকালে বৌদ্ধ সাধকেরা প্রজ্ঞা ও করুণার মধ্য দিয়ে প্রথম বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। নির্বাণ ও মানব-প্রেমের সেই সমন্বিত রূপ বাঙালী হৃদয়ের সহজাত ধর্ম। জ্ঞান ও ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম, আত্মস্থ সমাধি ও বিগলিত মানবপ্রেমের যুক্তবেণী-রূপে বিবেকানন্দ-সাহিত্য বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী।

কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ভক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল সর্বগ্রাসী। উনিশ শতকের সূচনায় রামমোহন সচেতনভাবে বাঙালীর মানস-গঠনের উপাদান আহরণের জন্য বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়াবেগমূলক ভক্তিতন্ময়তা থেকে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার দিকে বাঙালীমনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথম সাধুবাদ রামমোহনেরই প্রাপ্য। রামমোহনের অনুবর্তী ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু এই জ্ঞানযোগের আদর্শের চেয়ে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ভক্তিমূলক সাধনপন্থাই প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও অদ্বৈতবাদের ক্রমিক উপলব্ধি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে দেখা দিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার ইতিহাসে। বিবেকানন্দ এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর কবিতায় কালী থেকে ব্রহ্ম অবধি এক পরমসত্যের সাকার ও নিরাকার উভয়রূপে উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন।

তন্ত্রোক্ত কালিকাধ্যান, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ কবিদের রচিত মাতৃসংগীত—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আরাধ্যা ভবতারিণী স্বামীজীর কালী-কল্পনার পটভূমি হলেও এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাঁর কবিতায় মৃত্যুরূপা

মাতার ধ্যানে যে বীর ও ভয়ানক রসের সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা অনন্য উদাহরণ।

যে মহা-অন্ধকারের পটভূমিতে বিবেকানন্দের কবিতায় মহাকালীর আবির্ভাব সেই অন্ধকারের অনুভূতি বিবেকানন্দের কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থের 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' বক্তৃতাটিতে এই অন্ধকার-প্রসঙ্গে কবিতার ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজী একটি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। সাধারণত কবিরা প্রকৃতির রূপরেখায় তাঁদের অন্তরের অসীমানুভূতি প্রত্যক্ষ করে তোলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি বিখ্যাত অন্ধকার-বর্ণনার উদাহবণ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে স্বামীজী এ কথাটি প্রমাণ করেছেন—

(ক) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"

(খ) কালিদাসের 'মেঘদূত' থেকে "সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ"

(গ) মিলটনের "No light but rather darkness visible"

আমরা এর পাশাপাশি তাঁব "Kali The Mother"ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" থেকে দুটি উদাহরণ দিতে পারি—

(১) The stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness, vibrant sonant.
'নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,···

(২) অন্ধকার উগরে আঁধাব

এই অন্ধকার বর্ণনায় স্বামীজী বেদ ও উপনিষদের দ্বারা প্রত্যক্ষ-ভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের এই ভাবপ্রকাশকে স্বামীজী অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। তাঁর মতে বাইরের প্রকৃতির মধ্যে মানবহৃদয় কখনো আপন সম্পূর্ণ প্রকাশ খুঁজে পায় না। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি"[১]

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"[২]

কিন্তু বাক্যমনের অগোচর বলে ঋষিরা তাঁদের অনুভূতির প্রকাশচেষ্টা ছাড়লেন না। বরং আপন গভীরে ডুব দিয়ে পরমসত্যকে তাঁরা নতুন বাণীতে প্রকাশ করলেন। তখন—"জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আর রইল না। এমন কি, আত্মার বর্ণনায় তাঁরা নির্দিষ্ট গুণবাচক শব্দ পরিত্যাগ করলেন। অনন্তের ধারণার জন্য আর ইন্দ্রিয়ের সহায়তার প্রয়োজন রইল না।...আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় প্রকাশিত হতে লাগল যে উপনিষদের সেই শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ সেই অপূর্ব শ্লোকটি মনে করুন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।[৩]

জগতে আর কোন কবিতা এর চেয়ে গম্ভীর ভাবদ্যোতক?"

বিবেকানন্দের কবিতায় এমনি ইন্দ্রিয়াতীত ভাষায় কাব্যসৃষ্টির উদাহরণ—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।—বিখ্যাত গানটি।

অথবা তাঁর Peace কবিতাটি—

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

১ কেনোপষিৎ: ১।৩
২ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ: ব্রহ্মানন্দবল্লী: নবম অনুবাক।
৩ কঠ ২।২।১৫

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস।

আনন্দ যা হয় নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

(অনুবাদ : ব্রঃ পূর্ণ চৈতন্য)

উপলব্ধির এই অনন্ত আকাশে বিবেকানন্দের চিন্তা প্রসারিত।

অথচ দুঃখদৈন্য বেদনায় পীড়িত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা-সম্বন্ধেও বিবেকানন্দ-সাহিত্য বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন। জগৎ ও ব্রহ্মের এই প্রান্তিক উপলব্ধিকে এক প্রেমের সূত্রের গ্রথিত করে বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যে নবযুগের অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী প্রচার করেছিলেন, সেইটি স্মরণ করে আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পরিপূর্ণ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি—

"He who is in you and outside you
Who works through all hands,
Who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship, and break all other idols."

(The Living God)

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে
সব হাতে তাঁরি কাজ,
সব পায়ে তাঁরি চলা,
তারি দেহ তোমরা সবাই
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।

(জাগ্রত দেবতা : অনুবাদ : লেখককৃত)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(সখার প্রতি)

বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ

বৈদিক যুগ থেকে নব্যভারতীয় যুগ অবধি ভাষার কত রূপান্তরই না ঘটেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারা দুটি চিরকাল পাশাপাশি প্রবাহিত, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও সাধু আর চলতি—এ দুটি ধারা সাহিত্য-বহনের কর্মে নিয়োজিত। সংস্কৃতের চলিত রূপ থেকেই পাণিনির 'সংস্কৃত' উদ্ভূত। 'পালি' আর 'প্রাকৃত' জনসাধারণের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু মজা এই যে, একবার সাহিত্যের স্থায়ী মর্যাদা পেলেই চলতি ভাষার চালচালনও বনেদী হয়ে ওঠে। তখন সাহিত্যিক কথ্যভাষা আর সাধারণের মুখের ভাষার পার্থক্য বেড়েই চলে, যতদিন না নূতন কোন ব্যক্তি বা আন্দোলন ভাষায় আমূল পরিবর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে আসে।

যা এককালের চলতি ভাষা তাই আর এককালের কেতাবী ভাষা। নূতনকালের মানুষের কাছে সে ভাষার স্থাণুত্ব অসহ্য লাগে। প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি দেখা দেন টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা।

বিদ্যাসাগর-পূর্ব পণ্ডিতী বাংলায় সংস্কৃত শব্দের জটিলতাকে ভাষার গুণ বলে মানা হ'ত। তাই সেকালের কোন পণ্ডিত যখন কিছুটা বোধগম্য ভাষা লিখেছিলেন, তখন অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, "এ যে দেখছি বিদ্যাসাগরী বাংলা! এ যে বোঝা যায়!" পড়লেই যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে আর সাহিত্য হবে কেমন ক'রে! বাঙালী পণ্ডিতেরাই বিদ্রূপ করতে পারেন—"রঘুরপি কাব্যম্, তদপি চ পাঠ্যম্!" কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে যতই নমনীয় ও অভিজাত করবার চেষ্টা করুন না কেন, নব্য শিক্ষিত সমাজের কাছে সে ভাষাও অন্তরের দূরত্বে রইল। এ হেন সময়ে "আলালের ঘরের দুলালে"র

বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সংবর্ধনায় জাতীয় চিত্তের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হ'ল। বঙ্কিমের মতে: "বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ।" "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।" অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, আলালী ভাষার দুটি দিক—বর্ণনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ সাধু-গদ্যের কাঠামোই ব্যবহার করেছেন, আর কথোপকথনের বেলায় এনেছেন একেবারে মুখের ভাষা। এদিক থেকে আরো অগ্রসর হয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়। এই বইটিতে সর্বত্র নিরঙ্কুশভাবে উত্তর কলকাতার চলতি ভাষা ব্যবহৃত।

১৮৫৪ বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'শকুন্তলা'র প্রকাশকাল। ঐ সালেই হিন্দু-কলেজের দুটি প্রাক্তন ছাত্র রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের মিলিত চেষ্টায় প্রকাশিত হ'ল 'মাসিক পত্রিকা'—যার উদ্দেশ্য চলিত ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি। একই কালে একদিকে সংস্কৃত কলেজের আভিজাত্যমন্থর ধীরগতি, আর একদিকে হিন্দু কলেজের বিদ্যুৎ-চঞ্চল প্রগতি। কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪) আগে অবধি 'মাসিক পত্রিকা' বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রমমাত্র। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও উক্ত পত্রের প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা দু'জনে মিলে চলতি ভাষাকে পুরো সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার ফলে, সাধু-ভাষার সীমা আজ সংকীর্ণ, চলতি ভাষাই বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ততর রাজপথ। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র আগে আরো একজনের নাম স্মরণীয়। যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি যদি রচনা-বাহুল্যের অপেক্ষা না রাখে তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের হাতে চলতি গদ্যের যে বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে 'উদ্বোধনে'র প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৯), তা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই চোখে পড়বে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাব্‌বার কথা' এবং 'পত্রাবলী'—এই চারটিমাত্র বইয়ের মধ্য দিয়েই আমরা চলতি

গদ্যের শিল্পী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পার। কিন্তু তার আগে আর একটু পূর্বকথনের প্রয়োজন।

উনিশ শতকে যাঁরা সর্বপ্রথম এই চলতি ভাষার রাজপথ-নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও আছেন। কিন্তু এঁদের রচনায় চলতি ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নয়, অনেকটাই দৃষ্টান্তচ্ছলে। সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এই দুটি ছদ্মনামই এঁদের চলতি ভাষায় সাহিত্যকীর্তির স্বরূপ অনেকটা বলে দেয়। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করার প্রয়োজনেই এঁদের এই অদ্ভুত নামের আশ্রয় গ্রহণ। দু'জনেরই শরাঘাতের প্রধান লক্ষ্য কলকাতার 'বাবু'-সমাজ। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'বাবু' ইংরেজ-সমাগমে নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে হঠাৎ বড়লোক, কিন্তু দেশী বিদেশী কোন শিক্ষাই তাদের নেই। এমন একটি বাবুর বর্ণনা: "বাবুরামবাবু চৌগোপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা—ফুল-পুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান।" ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পর যে নতুন ধরনের 'বাবু' দেখা দিলেন, তাদের পরিচয় আছে হুতোমের নক্শায়: "আজকাল সহরের ইংরেজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন। প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট্'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ'।"

একদিকে এই জীবন-সমালোচনা, আর একদিকে জগতের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় সহাস্য দৃষ্টি—এ দুয়ের সম্মেলনে আলাল ও হুতোম উনিশ শতকের শিক্ষিতসমাজে অতি উচ্চ আসন অধিকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা উপন্যাসের পূর্ণতার সন্ধানী হ'ল। সেই সঙ্গে বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনাকে অনুসরণ ক'রে আলালী ও বিদ্যাসাগরী ভাষায় মধ্যপন্থাই বাংলা-সাহিত্যে আদর্শরূপে

স্বীকৃতি পেল। তার ফলে কথ্যভাষায় সাহিত্য-রচনার রেওয়াজ দেখা দিল না। "আলাল" ও "হুতোম" উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে রইল।

চলতি ভাষাকে সবরকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী ক'রে তোলবার কাজে আলাল বা হুতোমের দান খুব কম। যে ভাষা কেবলমাত্র রসিকতার জন্যেই মন হরণ করে, গভীর ভাবের মহলে তার যাতায়াত কম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।"[১] কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের রুচি হুতোমী ভাষাকে স্বীকার করতে চায় নি। বঙ্কিমের মতে, "...যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।"[২] এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, বিষয় অনুযায়ী ভাষার মাপকাঠিতে হুতোমই সার্থকতর। কারণ, হুতোমের বিষয়বস্তু সমগ্র জীবন নয়, জীবনের নক্‌শা। 'বিষবৃক্ষ' বা 'গোরা' নিশ্চয় এ ভাষায় লেখা যায় না। কিন্তু আলালী ভাষাতেও লেখা যায় না। সুতরাং চলতি ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে এলেও তার সাহিত্য-রূপের সঙ্গে মুখের কথার পার্থক্য থাকবেই। বিষয় অনুসারে সে পার্থক্য কম বা বেশি হতে পারে—এইমাত্র।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আবার স্মরণীয়—"...সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ ক'রে বাংলা গদ্যের এই

১, ২, ৩ বাঙ্গালা ভাষা (বিবিধ প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র

ক্লাসিক রীতি 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাবের আগে অবধি অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করেছে।

বাংলা-ভাষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে উনিশ শতকের পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে যখন এমনি পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে, সেই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতায় বাংলার চলতি ভাষা এক নূতন মহিমা লাভ করেছে। হুগলী জেলার গ্রাম্যটান মেশানো তাঁর সরল, অনতিমার্জিত, অথচ সত্যোপলব্ধিময় বাণী নব্যশিক্ষিতদের কানে অপূর্ব শোনালো। এভাষার সঙ্গে বাংলা গদ্যের দুই মহারথী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ভাষামাধুর্যের চেয়ে ভাবমাধুর্যের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে দিলেই কথ্যভাষাব ক্ষেত্রে তাঁব অসাধারণত্ব বুঝতে পারা যাবে।

"শ্রীবামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিল্‌লাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপের সময় একজন প্রশ্ন করলেন, "যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা ক'ন না?" এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ...যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৩য়

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো।

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ।"

ঈশ্বরলাভের উপায় আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রেকে বলছেন—"বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশাহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, "না, আমি মা'র কাছে যাব", সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই।···এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল-পথে তুলে লন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৫ম)

উদ্ধৃতির এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। প্রথমত উপমার আশ্চর্য সুপ্রয়োগ এবং সেই মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা। দ্বিতীয়ত চলতি ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তৃতীয়ত সহজ রসজ্ঞানের সুপটুতা। জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ভাষার উপযোগিতা অসাধারণ। বিশেষ ক'রে যখন একথা ভাবি যে, "আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।"[১] "তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন,

---

১ বাঙ্গালা ভাষা (ভাব্‌বার কথা)—স্বামী বিবেকানন্দ: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৫-৩৭; মূলত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠির অংশ।

তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[১] এই মহাজনপন্থা অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বিবেকানন্দ যে গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তার প্রভাবে স্থাণু, অচল কোন কিছুকেই তিনি স্বীকার করতে পারতেন না। এই প্রচণ্ড গতিময় ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ দেখি তাঁর 'পত্রাবলী'তে, 'পরিব্রাজক,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাব্‌বার কথা' বই তিনটিতে। চলতি ভাষার পক্ষে স্বামীজীর যুক্তি একান্ত সহজবুদ্ধি-প্রসূত—"স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?"[২] অন্তত স্বামীজীর পক্ষে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা নিজের কানেই শুনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এই মাধুর্যভাণ্ডার থেকে আরো দু'চারটি কণিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমাদের সত্যস্বরূপ যে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেকথা বুঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানসূর্য কাজ করে না···ঘরের ভিতরে আনলে আতস-কাঁচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাঁচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে কাঁচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৪র্থ ভাগ)

মনকে বশ করবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ—"অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই

১, ২ বাঙ্গালা ভাষা: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৫-৩৭।

যাবে। মন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে লাল ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।”

(কথামৃত—৪র্থ)

মায়া আর দয়ার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্ব-প্রেমের মূল কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন—“শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশেব লোককে ভালবাসা, সব ধর্মেব লোকদেব ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়।”

(কথামৃত—৫ম)

সকল পথেব সাধনাব শেষে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন “অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ”-ভাবে থাকবেন। সেই অবস্থার অনুভূতি-বর্ণনা ঃ “তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগ্‌লুম! পূজো উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আস্‌তুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এলো। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে তুলতে পারি নি। একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট্—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হ’ল না!”

(কথামৃত—৩য়)

প্রসঙ্গত বলা চলে, কথামৃত-সঙ্কলয়িতা ‘শ্রীম’ যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে রেখে গেছেন তার যথার্থ সম্মান এখনও সাহিত্যরসিকদের কাছ থেকে আসে নি। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ”। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহে ‘শ্রীম’ যে শিল্পনিপুণতার পবিচয দিয়েছেন, তার একমাত্র তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে বস্‌ওয়েল-কৃত ডাঃ জনসনের বাণীসংগ্রহ। কিন্তু জগতের ইতিহাসে অধ্যাত্ম অনুভূতির এমন অপরূপ দিনলিপি ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নি। বাংলা জীবনীসাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ এই “শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।” শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দিব্যানুভূতি-রূপায়ণে বাংলা ভাষা

ও সাহিত্য "কথামৃতে"র মধ্য দিয়ে চিরন্তনতার অধিকার লাভ করেছে।

জীবন এবং সাহিত্য—যত কাছাকাছি থাকে, ততই পূর্ণতা পায়। তাই চলতি ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ: "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।"[১] অর্থাৎ জীবনের যোগেই সাহিত্য! সংস্কৃতপন্থী সাধুভাষা যদি জীবনের যোগ হারিয়ে ফেলে তাহলে চলতি ভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই স্বামীজীও প্রয়োজনবোধে অসঙ্কোচে সাধ্ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর "বর্তমান ভারত" বইটি সাধুভাষায় লেখা হলেও আশ্চর্যরকম প্রাণবন্ত। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র সূচনায় তিনি ক্রিয়াপদের বাহুল্য বর্জন করে গদ্যের যে রূপ দিয়েছেন তা সংস্কৃতেরই নামান্তর। তবু তাঁর ভাষা সবচেয়ে জোর পেয়েছে চলতি ভাষায় স্বাধীন ক্ষেত্রে। কারণ, এই স্বাধীনতাই তাঁর ধাতুপ্রকৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরো দু'একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য: ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা

১ বাঙ্গালা ভাষা (ভাব্বার কথা): বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৫।

তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।[১]

বাংলার নানা উপভাষার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এ-প্রসঙ্গেও তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাষা বড় হয়ে উঠেছে তাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন—"অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা।"[২] বছর কয়েক আগে "পূর্ববঙ্গের সমকালীন সেরা গল্প" নামে যে গল্প-সঙ্কলনটি পূর্ববঙ্গের তরুণ সাহিত্যিকেরা প্রকাশ করেছেন তাতেও দেখেছি মূলত কলকাতার ভাষাই বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃত ভাষাও একদিন মানুষের সহজ বুদ্ধির কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কালে যত সহজাত প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছে, ততই ভাষাও হয়েছে পল্লবধর্মী। "বাপ্‌রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ ক'রে—রাজা আসীৎ !!!···ওসব মড়ার লক্ষণ"।[৩] জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তির সঞ্চার হলে আপনাআপনিই এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয় মন্থরগতি ভাষার রূপ বদলে যাবে। তখন- "দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আস্‌বে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"[৪]

"পরিব্রাজক" বইটি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রাকালে

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

২, ৩ বাংলা ভাষা (ভাব্‌বার কথা) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯০০। এর সঙ্গে তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তীকালের মন্তব্য—"শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।"—কথার কথা (১৩০৯)। " যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি, বঙ্গভাষার সেই ডায়ালেক্‌টই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে।" বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু-ভাষা (১৩১৯)। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য খাস কলকাতার ভাষাকেও একটু মার্জিত করার প্রয়োজন বোধ করতেন। দ্রঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯৮, ২০৪-৫।

৪ বাঙ্গালা ভাষা : ভাব্‌বার কথা : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : : ৩৬।

জলপথে ভ্রমণের কাহিনী। এ বইটির প্রধান গুণ এই যে, এর চলমান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সমুদ্রভ্রমণ হয়ে যায়। সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এমন একটা চাক্ষুষ করানোর ক্ষমতা আছে, যা ভ্রমণ-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ। এই বইটি পড়তে পড়তে যে মানসভ্রমণ আমরা ক'রে থাকি, তাতে একই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের বৈচিত্র্য আর ইতিহাসের গতিধারা আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে।

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর হর হর" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের "হর হর" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ?[১] গঙ্গা ও হিমালয়ের সঙ্গে সুচিরবন্ধনে বিজড়িত ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি এই প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অন্তরালে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। এ অপূর্ব সাহিত্য-রস-সৃষ্টির পিছনে রয়েছে সন্ন্যাসী হৃদয়ের শান্ত উদার অচঞ্চল দৃষ্টি।

বাংলাদেশের নিজস্ব রূপটির বর্ণনায় বিবেকানন্দ-মানসের শিল্প-চেতনা অতুলনীয় সার্থকতায় বিকশিত:

"এই অনন্ত শস্পশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবারে) আর কিছু আছে কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি আর রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে

১ পরিব্রাজক: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ৬১

বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ, তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌ছে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম, লিচু, জাম, কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে-পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে ঢুল্‌চে আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী, ইরানী, তুর্কিস্তানী গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখে ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"

উপরের উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তি জুড়ে যে আবেগের অগ্নিস্পর্শ রয়েছে, সে স্পর্শের প্রজ্বলনে আমরা নিমেষে দীপ্ত হয়ে উঠি। আর ঐ "একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা"—বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ বাংলা সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন কি?

[১]স্বামীজীর চলতি ভাষা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। তাঁর চলতি ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদ বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই শব্দ নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। হৃষীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় "কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুল" অথবা ডায়মণ্ডহারবারের দিকের গঙ্গাতীরবর্ণনায় "অনন্তশষ্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী" জাতীয় শব্দ তিনি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। অথচ,

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৩-৬৪

ভাষার ভারসাম্য হারান নি। বরং এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে ঘিরে চল্‌তি ভাষা কলমন্দ্রে মুখরিত।

টেকচাঁদ এবং হুতোমের রচনায় আমরা কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালী বাবু-সমাজের ছবি পাই। কিন্তু স্বামীজীর চলতি ভাষা সমগ্র বিশ্বপরিক্রমার বিষয়বস্তুকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। চলতি ভাষার সার্থকতা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরো সুপ্রমাণিত। টেকচাঁদ ও হুতোমের সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার কিছুটা সাধর্ম্য আছে হাস্যরস প্রবণতায়। কিন্তু রুচির নির্মলতায় বিবেকানন্দের হাস্যরস আমাদের শ্রদ্ধা অনেক বেশী আকর্ষণ করে।

মার্কিনী বর্ণ-বিদ্বেষের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত বেদনাকে কীভাবে তিনি সরস ব্যঙ্গে পরিণত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মার্কিন-ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোক্‌বামাত্রই বল্‌লে, 'ও চেহারা এখানে চল্‌বে না।' মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়ামাত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হ'ল না ; তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পরলেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু'একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, আবার দোকান গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও ;" বললে "নেই ;" "ঐ যে রয়েছে।" "ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।" "কেন হে বাপু ?" "তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো।"[১]

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৬

'পরিব্রাজক' বইটির হাঙ্গর-শিকারের বর্ণনায় চল্‌তি ভাষার সাহায্যে সমগ্র ঘটনাটির গতিবেগ ও কৌতুক আশ্চর্ষ নিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'ভাব্‌বার কথা' থেকে স্বামীজীর হাস্যরস নিপুণতার আর একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। 'বলি রামচরণ! তুমি লেখা-পড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নয়, তার ওপর নেশা ভাঙ্‌ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি?' রামচরণ—"সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"[১]

আবাব, ইতিহাসের ধারা-অনুসরণকারী বিবেকানন্দ-মানস আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই চলতি ভাষাতেই বৈপ্লবিক গতি সঞ্চার করেছেন। প্রাচীনকালেব বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতের কথায় তাঁর মনে পড়েছে এ সমৃদ্ধির মূলে ছিল "বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত"[২] ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী। "...তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা দর্শন লিখেচেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেচেন—তোমাদেব ডাকের চোটে গগন ফাট্‌ছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?"[৩] ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বঞ্চনা-পরায়ণ তথাকথিত উচ্চবর্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্মম নির্দেশ: "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধবে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথবেব ঝুপড়ির মধ্য হতে! বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।"[৪] বিপ্লবী চেতনার এই অগ্নিবাণী বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

এমনিভাবে জীবনের লঘু সৌন্দর্যের সীমা থেকে মনীষার উত্তুঙ্গ শিখর অবধি স্বামীজী এই চলতি ভাষার সাহায্যে অনায়াসে অতিক্রম

১ ভাব্‌বার কথা: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৩

২, ৩, ৪ পরিব্রাজক তদেব: পৃঃ ১০৬, পৃঃ ৮২

করেছেন। 'পরিব্রাজকে'র পাশাপাশি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে পড়তে সেই কথাই মনে হয়। দুটি নিম্নমুখী সভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বামীজী কত অনায়াসে সুসম্পূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির অতিস্তুতি এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের ভারতীয়তার গোঁড়ামি—এই দুই প্রান্তিক চিন্তাধারার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নিখিলমানবের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময়ের সত্য পন্থাটি নির্দেশ করেছেন। আজ অবধি আমাদের শিক্ষিতসমাজ সে আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, তাই আমাদের ভারতীয়তার আদর্শ আজও অসম্পূর্ণ।

"প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য। আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মে'র। আমরা চাই কি—"মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম"। "ধর্ম" কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি ? যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম দিনরাত খোঁচাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি ? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল।...এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুন্‌ছো, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই ; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খাম্‌কা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হ'ল, না এদিক না ওদিক।"[১]

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২-১৫৩

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যটি অনুপম প্রাঞ্জলতায় বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীজী এই দুই সভ্যতার বহিরঙ্গ বিষয়-গুলিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শারীরিক গঠনভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, সমাজে নারীর মর্যাদা, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকেন্দ্র ফ্রান্স—এ সব কিছুর তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর ভাষাভঙ্গীর শাণিত অথচ সরল সৌন্দর্য আন্তরিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনার সময়ও স্বামীজী একথা মনে রেখেছেন—'তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা আর এদের চোখে আমাদের দেখা এ দুই ভুল।"[১] সেই ব্যবহারিক পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজীর দৃষ্টিতে দুটি সভ্যতাই সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে। এই প্রসারিত দৃষ্টির ফলেই এ দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে স্বামীজী নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে Evolution theory বা পরিণামবাদ (আধুনিক পরিভাষায় বিবর্তনবাদ) ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ দুই দেশেই আছে। একটি বহির্মুখী অন্যটি অন্তর্মুখী। বিষয়টি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন যে,

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৯৬

সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম'; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া' 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান।"[১]

"এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে,—এদের রকম দিয়ে, জড়-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন ক'রে বহু হ'ল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত ক'রে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই এক কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটা খোঁজার নাম বিজ্ঞান (Science)।"[২]

"মাসিক পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ শিকদারের বক্তব্য ছিল, "যে ভাষা স্ত্রীলোক বুঝবে না, তা আবার বাংলা কি ?" শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'তে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কি না।"[৩] অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিতদের সঙ্গে উচ্চস্তরের জ্ঞানবিকাশের সংযোগ ঘটানো যে একান্ত প্রয়োজন একথা রাধানাথ শিক্‌দার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের ইংরেজী-বাহিনী উচ্চশিক্ষা আজ অবধি মাতৃভাষাকে বাহন করতে কুণ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষার চেয়ে গণশিক্ষার বিস্তারই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়।

'স্বামীজীর চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে ছিল জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মভাব।' এই গণদৃষ্টিই চলতি ভাষার মূল কথা।

১, ২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০

৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ : পৃঃ ১৩৬ : নিউ এজ সংস্করণ।

অবশ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পালি', 'প্রাকৃত' প্রভৃতি মূলত কথ্যভাষা কালে কালে পুরোপুরি লেখ্যভাষায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা শ্রীবিষ্ণু দে-র অধিকাংশ গদ্য রচনা যতটা সংস্কৃতশব্দসমৃদ্ধ, তার তুলনা বিদ্যাসাগরী বাংলাতেই মেলে। অথচ এঁরাও চলতি ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

কিন্তু চলতি ভাষার প্রধান প্রয়োজন—মুখের ভাষার সঙ্গে যোগরক্ষা। সেদিক থেকে উনিশ শতকের প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীই অনুধাবন-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "যুরোপপ্রবাসীর পত্র" এবং "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" বই দুটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে এই দুটি গ্রন্থের চল্‌তি ভাষা প্রথম যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। তাছাড়া এদের বর্তমান সংস্করণের ভাষায় পরবর্তীকালের সংশোধন রয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক পরিণতি লক্ষ্য করলে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যের গদ্যরীতি নিজস্ব পৌরুষ ও বীর্যেব দৃপ্ত ব্যঞ্জনায় অনন্য উদাহরণ-রূপে দেখা দেয়। আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাসই তাঁর জীবন ও সাহিত্য রচনার পটভূমি। তাই বিবেকানন্দের রচনায় বাংলা গদ্যরীতি কোমলকান্ত রূপেব পরিবর্তে ঋজু ওজস্বিতায় দীপ্ত। "পত্রাবলী" থেকে এই রীতির উদাহরণ ঃ

"প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো, 'নেই নেই' বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাকি নাকি? কিসেব নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই-নেই শুন্‌লে আমার মাথায় যেন বজ্র মাবে।......ছুঁচোগিরি কর্‌বি তো চিরকাল পড়ে থাক্‌তে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।...Avalanche-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় ক'রে। হর হর মহাদেব! উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্।"[১]

[১] বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড): পৃঃ ৪৮৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর পত্র

এমনি আরো অনেক সঞ্জীবনী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর চলতি গদ্যের মোটামুটি পরিচয় দান এখানেই শেষ করা যাক। একথা মনে রাখতে হবে যে, লিখতে গেলেই কিছুটা কারুকর্মের প্রয়োজন। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষার বনিয়াদ চলতি ভাষা,—তবু লেখার জগতে এসে সে ভাষাকে কিছুটা পরিবর্তন মেনে নিতে হয়েছে। বিষয়ানুযায়ী সে পরিবর্তনে স্বামীজীর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনুরাগ ছিল সকলজনের উপযোগী চলতি ভাষার প্রতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্য তাই তাঁর কাছে চিরঋণী।

আলাপচারী বিবেকানন্দ

এ জীবনে তিনি কত কথা বলেছেন, তার অতি সামান্যই লিখিত ইতিহাসে বিধৃত। তবু সেই স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যেই নবযুগের ভারতবর্ষ তার মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছে, পৃথিবী পেয়েছে পরিবর্তনশীল মানব-সভ্যতার নিয়ত উত্থানপতনের অন্তরালে অমৃতপন্থার ধ্রুবনির্দেশ। স্বল্পকালের পরিসরে সীমাবদ্ধ তাঁর জীবন। কিন্তু আর সব মানুষের মতো তাৎক্ষণিক নয় তাঁর কথা। প্রতিদিনের সংলাপ, বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপচারী, শিষ্য ও স্নেহভাজনদের উদ্দেশে উদ্বোধনী বাণী, স্বদেশ ও বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলী সর্বত্র তাঁর অসামান্য বাক্‌প্রতিভার নিদর্শন।

বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব তাঁর সংলাপকে নানা আবর্তনে কখনো গম্ভীর, কখনো উদাত্ত, কখনো বেদনার্দ্র, কখনো উজ্জ্বল চঞ্চল গতিবেগে ভরে দিয়েছে। তাঁর দিব্যকণ্ঠ উচ্চারিত বাণীভঙ্গিমার বৈদ্যুৎশিহরণ নিমেষে সহস্র নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, একান্ত কথোপকথনের সান্নিধ্য-মুহূর্তে শ্রোতার হৃদয়মনে জাগ্রত করেছে সর্বসংশয়মুক্ত আত্মার অভয়-বাণী। মানবজাতির উদ্দেশে আত্মোপলব্ধির এই বাণীব্রত উদযাপন করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে—"I am a voice without form". তাঁর সমগ্র সত্তাই এক দেহহীন বাণী।

জীবন ও বাণীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ মনে রেখেও বলা চলে জীবনই বাণী নয়। সীমাবদ্ধ জীবন পিছনে পড়ে থাকে। বাণীই জীবন হয়ে নব নব সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করে। এক একটি মহৎ বাণীর ধ্যান, এক একটি দিব্যমন্ত্র কত যুগ যুগ ধরে মানবতার আলোক-দিশারী হয়ে আছে। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের জীবনকাহিনী আমরা কতটুকু জানি? তবু তাঁদের ধ্যান ও সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতেই ভারতীয় সভ্যতা আজও আপন শাশ্বতমূল্য খুঁজে পায়। তাই ভাবের জগৎ

যে বস্তুজগতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত, সে কথা ভুলে গেলে মানব-ইতিহাসের মূল সত্যটিই উপেক্ষিত হয়।

অপরপক্ষে একথাও বলা চলে যে, মানবচেতনায় বাণীর প্রত্যক্ষ রূপ জীবনে। স্বামীজীর অনুসরণে বলা যায়, যীশুর উপদেশাবলী বাইবেলে যে পরিমাণে আছে, যদি সে তুলনায় তাঁর ব্যক্তিরূপের পরিচয় আর একটু বিশদভাবে আমরা পেতাম, তাহলে যীশুর স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে কত প্রত্যক্ষ, কত আপন হয়ে উঠতো। তুলনামূলকভাবে বুদ্ধজীবন মনে করুন। অধ্যাত্মবিদ্যার নিগূঢ় রহস্যের জন্য নয়, ব্যক্তিজীবনের শতসহস্র সমুজ্জ্বল ঘটনার জন্যই বুদ্ধ আজ প্রাচ্য প্রতীচ্য, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সর্বজনের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আত্মীয়।

কথা ও কাজ, বাণী ও জীবন—এ দুয়েব সম্মিলিত রূপ এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানবকে বিবেকানন্দ অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার ও তাঁর বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বে আদর্শ-রূপায়ণের অনন্যতা ও সেই আদর্শেব বাণীরূপদানে সুদুর্লভ সৌন্দর্য নবেন্দ্রনাথেব প্রথম জীবনের সন্ধিক্ষণে যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল, পরবর্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দে সে প্রভাবের পূর্ণ পরিণতি।

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ হবার পর স্বভাবতই স্বামীজী সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন। যদিও নরেন্দ্রনাথ বা তাঁর অন্যান্য গুরু-ভাইরা, যাঁরা পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের উপস্থিত 'কথামৃতে' অনেক কম, তবু 'কথামৃত' এই যুগমহামানবেব দৈনন্দিন কথালাপের যে জীবন্ত চলচ্ছবি চিরকালের মতো বাণীবদ্ধ করে রেখেছে, অধ্যাত্ম-ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে কথায়, গানে, উপদেশে, পরিহাসে, উচ্ছল কীর্তনে, গভীর সমাধিতে, সর্বোপরি জীবন্মুক্তের অপরূপ লীলাভঙ্গিমায় বাস্তব প্রত্যক্ষরূপে বিশ্ববাসী এই কথামৃতের মাধ্যমেই নিত্যকালের মতো আপন করে পেয়েছে।

জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী। তবু প্রসাধিত কারুকর্মের বিলাস-সজ্জায় অনেক সময়ই বাস্তবজীবন থেকে সাহিত্য সুদূরলোকের

অধিবাসী হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমনি একজন মাটির বুকের মানুষের প্রয়োজন, যাঁর মুখের ভাষা সমগ্র জাতি ও জনতার মুখের ভাষা, অথচ যাঁর ভাষায় জাতির সমগ্র অন্তরেতিহাস আপনি প্রকাশিত। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ, কবীর, নানক, চৈতন্য—এমনি জনমনের কাছাকাছি মানুষ, যারা জনতার ভাষাকেই অবলম্বন করে দুরূহগভীর দর্শনতত্ত্বের রহস্য প্রতিদিনের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন।

কিন্তু এঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশভঙ্গিমায় পার্থক্য আছে। প্রতিদিনের ব্যবহারের আটপৌরে গদ্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যঞ্জনামণ্ডিত করেছেন, গভীরতম উপলব্ধির যে চিত্রময় প্রত্যক্ষতা এনে দিয়েছেন, আর তাঁর সমস্ত সংলাপে যে পরমরসিকমনের বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে—সেইখানে তিনি আধুনিক মনের সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষ।

স্বামীজীর কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সরল মাধুর্যটুকু দীপ্ত তেজের অগ্নিমন্ত্রে রূপান্তরিত। সাত্ত্বিক শুভ্রতা সংগ্রামী রজোগুণের স্পর্শে আগ্নেয় উত্তাপ লাভ করেছে তাঁর বাণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা-মৃতের ভাবপরিমণ্ডলটি পল্লীবাঙলার ; তেমনি স্নিগ্ধ, প্রসন্ন, গভীরতাব শ্রীমাখানো ; আর বিবেকানন্দ-বাক্‌ধারার পিছনে রয়েছে কলকাতার নাগরিক পটভূমি, যে কলকাতার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যিক সূচনা হয়েছিল টেকচাঁদ ঠাকুর বা হুতোম প্যাঁচাব ভাষায়। এ ভাষা নাগরিক, কিন্তু শব্দনির্মাণে বা ক্রিয়াবিন্যাসে কোনোরকম শুচিবাইকে প্রশ্রয় দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারীতে গ্রাম্যশব্দপ্রয়োগের বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের কোনো কোনো নেতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। স্বামীজীর লিখিত চলতি বাংলা পড়েই বেশ অনুমান করা যায় যে, তাঁর মুখের ভাষাও শব্দব্যবহারে অনেক পরিমাণেই নিরঙ্কুশ ছিল। "পত্রাবলী", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র রচনাভঙ্গী তো বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গীরই লিখিতরূপ।

যেমন ধরুন, 'পরিব্রাজকে'র সূচনায়—"স্বামীজী! ওঁ নমো

নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া।" অথবা ঐ বইয়েই আর একটু এগিয়ে "আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন?—পা নিরীক্ষণ ক'রে চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌচাকলা, তায় চক্কর-ফক্কর বড় দেখা গেল না।"[১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে—"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"[২]

"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু শ হাত দিয়ে দেখছে, আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে লেখেন নি—তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা, খালি চীৎকার হচ্ছে; বস! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখো না। আপনা আপনি বুদ্ধিশুদ্ধি আসবে।"[৩]

অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই মুখের ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি উদাহরণ মেলে "পত্রাবলীর" ভাষায়—"...দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ঘোরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।"

সাধু ও চলতির মিশ্রণে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি থেকে তাঁর

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১১৯
২ তদেব পৃঃ ১৫১
৩ তদেব পৃঃ ১৬৯

বাক্‌ভঙ্গিমা কী অনিবার্যরূপে প্রকাশিত তার উদাহরণ দিই শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রথম সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দজীর উদ্দেশে লিখিত স্বামীজীর একটি চিঠি থেকে—"তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তোরাত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম—even unto death, দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নাই টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।···ভ্যালো মোর ভাই-রে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers, not the brain."[১]

শুধু যে সাধু আর চল্‌তি তা নয়, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত সব কিছুতে মিলেমিশে আলাপচারী স্বামীজীর ও লেখক স্বামীজীর অদ্বয় সত্তা এখানে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। এই একান্ত ঘরোয়া সহজ ভঙ্গীটিতে প্রেরণা ও পৌরুষ, সহৃদয়তা ও অধ্যাত্ম অনুভব—এ সব কিছুরই মিলিত স্বাদ।

তবু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে স্মরণীয়, যত চেষ্টাই করা যাক, মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় তফাত থাকবেই। সে ক্ষেত্রে স্বামীজীর মুখের ভাষার জন্য আমরা বাংলায় 'কথামৃত', 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'স্বামীজীর কথা'; ইংরেজীতে 'Inspired Talks', 'The Master as I Saw Him' এবং 'Reminiscences of Swami Vivekananda'—এই কয়টি গ্রন্থের শরণ নিতে পারি। তাছাড়া অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ', এবং শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের 'Swami

১ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩৫৩-৫৪

Vivekananda in America: New Discoveries'—এ জাতীয় গ্রন্থেও তাঁর সংলাপের কিছু কিছু অংশ মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের যে একনিষ্ঠ সংকলন মাস্টার-মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামীজীর ক্ষেত্রে ঠিক সে ধরনের তথ্যনিষ্ঠ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বাণীসংগ্রহ সম্ভবপর হয় নি। স্বামীজীর সমসাময়িকদের কেউ এ বিষয়ে সজাগ হলে ইতিহাস ও মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'ত। 'কথামৃতে' নরেন্দ্রনাথের যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ, তাতে তাঁর প্রস্তুতিপর্বই বড়ো হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী ওয়াল্ডো-সংকলিত 'Inspired Talks'[১]-এ স্বামীজীর বাণী থেকে শাশ্বতকালের প্রেরণাসম্পদ আহরিত। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর ঘরোয়ারূপের চেয়ে বাণীরূপের প্রাধান্য। তবু বাণীসংগ্রহ ও অধ্যাত্মগ্রন্থ হিসাবে 'Inspired Talks' একটি উজ্জ্বলতম গ্রন্থ। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' স্বামীজীর ঘরোয়া রূপটি ফুটেছে। কিন্তু শিষ্য স্বামীজীর মুখের ভাষাকে সাধুভাষার মিশ্রণে অনেক জায়গায় কৃত্রিম করে ফেলেছেন। এদিক থেকে 'কথামৃত'-কার মহেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অতুলনীয়। তবু স্বামীজীর পরিণত মানসের চিত্ররূপে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বিবেকানন্দ-সাহিত্যে চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকারী। ভগিনী নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' গুরু বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টি ও জীবনোপলব্ধিময় বাণীসম্পদে পরিপূর্ণ। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের গভীরতম কবিত্বময় নাটকীয় ঘাতসংঘাতে সমুজ্জ্বল দিকটিরই এ গ্রন্থে প্রাধান্য। তাই এ গ্রন্থের কথোপকথনসংগ্রহ ভাবসৌন্দর্যে ও প্রকাশ-গৌরবে বিপুল ব্যঞ্জনাময়। 'Inspired Talks' বা 'দিব্যবাণী' এ বিশেষণটি স্বামীজীর প্রায় সব কথোপকথন সম্বন্ধেই খাটে। তবে

---

১ বাণী ও রচনা: ৪র্থ খণ্ড: পৃঃ ১৮৭-৩২৮ দ্রঃ। এই অসামান্য অনুবাদ গ্রন্থের 'নিবেদন'-অংশে 'ইতি অনুবাদকস্য'-রূপে যিনি আত্মগোপন করেছেন, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। এ অনুবাদ যে তাঁরই, সে কথা তিনি 'বাণী ও রচনা'র প্রধান সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দজীকে কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলেছিলেন।

বিশেষভাবে শ্রীমতী ওয়াল্ডোর স্মৃতিসঞ্চয়নে বিধৃত দিব্যবাণী সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে।

আলাপচারী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে তাঁর কথোপকথনের কিছু উদাহরণ পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরি—

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ॥ ৩য় খণ্ড॥ ১৮৮৫, ৯ই মে।

নরেন্দ্র। proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

গিরিশ। বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ); এই জিনিষটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত।[১] External world (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে, philosopher (দার্শনিক) কেউ proof করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (অপ্রতিরোধনীয় বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়তো বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি. ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

[দেবতারা অমর এই কথা উঠিল]

নরেন্দ্র। তার প্রমাণ কই?

গিরিশ। তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র। অমর, past ages-এ ছিল proof (প্রমাণ) চাই। মণি[২] পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু। (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্যে) অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ,—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (যোগীন গিরিশাদি ভক্তের প্রতি সহস্যে) নরেন্দ্রর কথা ইনি আর লন না। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) —আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল

১, ২ 'একজন ভক্ত' এখানে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ—এমন অনুমান করা চলে। মণি অবশ্যই তিনি নিজে।

ছাড়া আর কিছু খায় না।' নরেন্দ্র বললে 'চাতক এ জলও খায়।' ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, 'ঐ! ঐ!' আমি বললাম, 'কি?' ও বললে, 'ঐ চাতক! ঐ চাতক।' দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা লই না।" (সকলের হাস্য)

*

কথামৃত ॥ ৩য় ভাগ ॥ পরিশিষ্ট—বরাহনগর মঠ।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি তো কিছুই মানতুম না।—জানেন।

তিনি যা যা বলতেন প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, তবে আসিস কেন?

আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।

মাষ্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুসী হলেন।

*

কথামৃত (৪র্থ) ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল।

নরেন্দ্র—বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমীদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে! ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে)—সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বর লাভের পথে একটা stage; এই সব stage পার হলে, আরও এগিয়ে পড়বে, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র—যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি—হ্যাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র—সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি—যে যে অবস্থায় দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে (reality) সত্য। যতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ

বাগানটি তোমার পক্ষে reality ; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থা—তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে ! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন reality (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র—আমি Truth চাই। সে দিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে)—কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমাব যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবো না।'

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম !'

"আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্যলোকের কথা বুঝব না।'

*

তরুণ বিদ্রোহীর যুক্তি-তর্ক, সংশয়-জিজ্ঞাসার উদাহরণ-স্বরূপ সংলাপ-কণিকাগুলি পাঠকচিত্তে যে ধারণা উপস্থিত করে, তারই কাছাকাছি আর একটি সংলাপবিবরণ বিবেকানন্দ-মানসের সুতীব্র অন্তর্দাহের পরিচয়রূপে উদ্ধৃত করি। শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক তাঁর 'New Discoveries' গ্রন্থে চিকাগো বক্তৃতার পূর্ববর্তী আগস্টমাসের শেষ দিকে এক ঘরোয়া আলোচনার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বিখ্যাত অধ্যাপক রাইটের পত্নীর স্মৃতিসংগ্রহ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি জাতীয়তাবাদী যুবক-সন্ন্যাসীর এই অগ্ন্যুদ্গীরণ পরবর্তীযুগের বিপ্লববাদের পূর্বাভাস—"And God will have vengeance, you may not see it in religion, you may not see it in politics, but you must see it in history, as it just has been ; it will come to pass. If you grind down the people, you will suffer. We in India are suffering the vengeance of God. Look upon these things. They ground down those poor people for their own

wealth, they heard not the voice of distress, they ate from gold and silver when the people cried for bread, and the Mahommedans came upon them slaughtering and killing; slaughtering and killing they overran them. India has been conquered again and again for years, and last and worst of all came the Enghishman. You look about India, what has the Hindoo left? Wonderful temples everywhere. What has the Mahommedan left? Beutiful palaces. What has the Englishman left? . Nothing but mounds of broken brandy bottles! And God has had no mercy upon my people because they had no mercy. By their cruelty they degraded the populace, and when they needed them, the common people, the common people had no strength to give for their aid. If man cannot believe in the vengeance of God, he certainly cannot deny the vengeance of History. And it will come upon the English; they have their heels on our necks; they have sucked the last drop of our blood for their own pleasures, they have carried away with them millions of our money, while our people have starved by villages and provinces. And now the Chinaman is the vengeance that will fall upon them; if the Chinese rose today and swept the English into the sea, as they well deserve, it would be no more than justice".

"অন্যায়ের প্রতিশোধ ভগবান অবশ্যই নেবেন। আপনারা হয়তো ধর্ম বা রাজনীতির মধ্যে তা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারংবার এমনি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। আপনারা যদি জনগণের উপর পীড়ন ও অত্যাচার করেন, তার জন্য আপনাদের দুঃখভোগ করতেই হবে। ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখুন, কেমন ক'রে ঈশ্বর আমাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যারা ছিল ধনী মানী, তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গতজনের কান্না তাদের কানে পৌঁছায় নি। সাধারণ মানুষ যখন অন্নের জন্য হাহাকার করে মরেছে, তখন ধনীরা তাদের সোনা-রূপোর থালায় অন্নগ্রহণ করেছে।

তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানেরা, তাদের কেটে কুচিকুচি করলে। তলোয়ারের জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হ'ল। তারপর বহুবার ভারত বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ।

ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা ?—ভাঙা মদের বোতল। আমাদের দেশবাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে। তারপর যখন জনসাধারণকে প্রয়োজন হ'ল, তখন জনসাধারণের সাধ্য ছিল না দেশকে সাহায্য করার! ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন—এ কথা যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তাহলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তারা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে প্রদেশে প্রদেশে মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে। নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এ-দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে। আজ যদি চীনারা জেগে উঠে ইংরেজদের সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়—যা তাদের উচিত প্রাপ্য—তা হলে সুবিচারই হবে।"[১]

---

১ Swami Vivekananda in America : New Discoveries : 1st Edn : পৃঃ ২৩-২৪।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনায় অনেক সময় ভবিষ্যতের যথাযথ পূর্বাভাস আশ্চর্যভাবে দেখা দিয়েছে। উদ্ধৃত অংশটির ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণের অপেক্ষায়। কিন্তু অত্যাচারিত শোষিত পরাধীন জাতির চিন্তানায়কের কণ্ঠে এই ক্ষমাহীন আত্মবিশ্লেষণ ও অভিশাপবর্ষণ বিবেকানন্দচরিত্রকে এখানে আগ্নেয়গিরির প্রলয়ঙ্কররূপে উদ্ভাসিত করেছে।

কিন্তু এই একান্ত জাতীয়তাবাদী সত্তাই বিশ্বপরিক্রমার ফলে ধীরে ধীরে সর্বজাতির,—এমন কি অত্যাচারী ইংরেজের মধ্যেও মানবমহিমার প্রকাশ লক্ষ্য করেছিল। উনিশ শতকের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিবেকানন্দের পরিণতমানসে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরপর্বে মানবমৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতার পথে আপন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

তাই সংগ্রামী বিবেকানন্দের পূর্ণতর পরিচয় তাঁর ধ্যানীসত্তায়। আমেরিকার 'Thousand Island Park' (সহস্র দ্বীপোদ্যান)-এ বিশ্রামরত স্বামীজীর কাছে যে ক'জন তত্ত্বজিজ্ঞাসু এসে সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীমতী ফাঙ্কি তাঁদের অন্যতম। শ্রীমতী ফাঙ্কি স্বামীজীর ঈশ্বরতন্ময় স্বরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন—In his talks he may go ever so far afield, but always he comes back to the one fundamental thing—"Find God! Nothing else matters."[১]—"কথাপ্রসঙ্গে তিনি যত দূরেই চলে যান না কেন, শেষ অবধি সেই মূল প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন—ভগবান লাভ করো, আর কিছুই কিছু নয়।"

স্বামীজীর পূত সান্নিধ্যের শেষ দিনটির স্মৃতিতে শ্রীমতী ফাঙ্কি স্বামীজীর যে অপূর্ব চিত্রটি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, সে চিত্রটি স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার সুন্দরতম প্রতীক। শ্রীমতী ফাঙ্কি ও তাঁর সঙ্গিনী—দু'জনকে নিয়ে স্বামীজী সেদিন তাঁর শেষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। 'আধমাইল আন্দাজ দূরে এক পাহাড়ে আমরা

১ Reminiscences of Swami Vivekananda : p. 261

উঠলুম। সমস্তটাই অরণ্য আর নির্জন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি অবনতশাখা বৃক্ষতল নির্বাচন করলেন—আমরা তিনজনে সে গাছটির নেমে-আসা শাখার তলায় বসলুম। প্রত্যাশিত আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে তিনি হঠাৎ বললেন, 'এখন আমরা ধ্যান করব। অশ্বত্থের তলে বুদ্ধের মত বসে থাকব।' মুহূর্তে তিনি যেন ব্রোঞ্জে গড়া মূর্তিটির মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন। একটু পরেই বজ্র বিদ্যুৎ নিয়ে বিরাট ঝড় দেখা দিল। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি। এসব তিনি টেরই পেলেন না। আমার ছাতাটি মেলে কোনো রকমে তাঁকে ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আপন ধ্যানে সম্পূর্ণ সমাহিত স্বামীজী বাইরের সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রইলেন।[১] দেশপ্রেমিক, গণনায়ক, মানবিকতাবাদী বিবেকানন্দের অন্তর্লোকে যে ব্রহ্মবিদসত্তা চিরজাগ্রত ছিল, এমনি কোনো দিব্যমুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটতো, তখন :

'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি।'

'অবাঙ্মনসোগাচরম্' এই ধ্যানলোকের আভাস স্বামীজীর রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত তাঁর 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' গানটিতে। আর তাঁর সংলাপসংকলনগ্রন্থের মধ্যে 'Inspired Talks' গ্রন্থে।

স্বামীজীর রচনা ও কথোপকথনে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলসে উঠেছে দিব্যবাণীর প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ঠিক এ ধরনের চমক নেই,—গোমুখী-উৎসারিত গঙ্গার মতো স্বচ্ছ শীতল সে অমৃতপ্রবাহ। স্বামীজীর বাণীতে শুধু যে তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তিই সঞ্চারিত, তা নয়, তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধিও অভীঃমন্ত্রের মূল প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজীর আত্মতত্ত্বের আলোচনায় আমরাও সহস্র-দ্বীপোদ্যানের সেই অনুরাগীদের মতো উদ্বুদ্ধ হই, যখন পড়ি—

---

১ Reminiscences of Swami Vivekananda : pp. 264-265

"No law can make you free. Nothing can give you freedom, if you have it not already. The Atman is self-illumined.

···Beyond what was, or is, or is to be, is Brahman. As an effect, freedom would have no value, it would be a compound, and as such would contain the seeds of bondage. It is the one real factor not to be attained, but the real nature of the soul.···The greatest sin is to think yourself weak. No one is greater : realise you are Brahman."

কোনো নিয়মকানুনই তোমায় মুক্ত করতে পারে না, তুমি মুক্তই রয়েছো। তুমি যদি আগে থেকেই মুক্ত হয়ে না থাকো, তবে আর কেউ তোমায় মুক্ত করতে পারে না। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ।···যা কিছু ছিল, আছে, বা হবে, ব্রহ্ম সে সব কিছুর পারে। মুক্তি যদি কোনো কর্মের ফল হতো, তবে তার কোনো মূল্যই থাকতো না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হতো, সুতরাং তার ভিতরে বন্ধনের বীজ থেকে য়েত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব। মুক্তি লাভ করতে হয় না, মুক্তিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ।···নিজেকে দুর্বল ভাবাই সবচেয়ে বড়ো পাপ। তোমার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই, উপলব্ধি কর, তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ। (Inspired Talks : ১৬ই জুলাই, ১৮৮৫ তারিখের দিনলিপি।)

"Christs and Buddhas are simply occassions upon which to objectify our own inner powers. We really answer our own prayers.

It is blasphemy to think that if Jesus has never been born, humanity would not have been saved. It is horrible to forget thus the divinity in human nature, a divinity that must come out. Never forget

the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever be. Christ and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am. Bow down to nothing but your own higher self. Until you know that you are that very God of gods, there will never be any freedom for you."

'খ্রীস্ট ও বুদ্ধের মতো মহামানবেরা কেবল আমাদের বহিরবলম্বন মাত্র; তাঁদের উপর আমরা আমাদেরই অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তাহলে মানবজাতির কখনো উদ্ধার হতো না, এমন কথা ভাবা ঈশ্বরনিন্দারই সমান। মানবস্বভাবের অন্তর্নিহিত যে ঈশ্বরসত্তা তাকে ঐ ভাবে ভুলে যাওয়া অসঙ্গত। ঐ ঈশ্বরসত্তার প্রকাশ কোনো না কোনো ভাবে হবেই হবে। মানব-স্বভাবের মহত্ত্ব কখনো ভুলো না। অতীতে বা ভবিষ্যতে ঈশ্বরসত্তার যে প্রকাশ হয়েছে বা হবে, তার মধ্যে আমরাই সর্বোত্তম প্রকাশ। 'সোঽহম্'—'আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র', খ্রীস্ট ও বুদ্ধগণ সে মহাসমুদ্রের তরঙ্গমাত্র। আপন মহত্তর সত্তার কাছে ছাড়া, আর কারো কাছেই মাথা নোয়াবে না। যতক্ষণ না তুমি উপলব্ধি করতে পারছ যে, তুমিই সেই দেবাদিদেব, ততক্ষণ তোমার মুক্তি নেই।'

[Inspired Talks : ৩০শে জুলাই, ১৮৯৫ এর দিনলিপি]

কোন্ দিব্য মুহূর্তে এই মন্ত্রবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু এখনও যখন বিবেকানন্দ-রচনাবলী পাঠ করতে যাই, সেই মুহূর্তটি পরমতম সত্যের সঙ্গে আমাদের এই ক্ষণসত্যময় জগতের চিরন্তন ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজীর দিব্যবাণীময় সত্তার শ্রেষ্ঠ কথাসংগ্রহ এই 'Inspired Talks' নানা দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু পার্থক্য এই যে, মানুষ বিবেকানন্দের চেয়ে তাঁর ভাবরূপই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'জ্ঞানী'র চেয়ে 'বিজ্ঞানী'কে বড়ো বলেছেন। বিবেকানন্দকে তিনি যখন সমাধির আনন্দের ডুবে থাকার চেয়ে উঁচু অবস্থার কথা বলেন, তখন ঐ বিজ্ঞানী-সত্তার কথাই অন্যভাবে দেখা দেয়। অদ্বৈতসত্তার এই স্তরে যে মুক্তমানস বিপ্লবীর পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব তার দৃষ্টিভংগী কি হবে সে সম্বন্ধে স্বামীজীর আর একটি বাণী—

'Learn to feel yourself in other bodies, to know that we are all one. Throw all other nonsense to the winds. Spit out your actions, good or bad, and never think of them again. What is done is done. Throw off superstion. Have no weakness even in the face of death. Do not repent, do not brood over past deeds and do not remember your good deeds ; be azad (free). The weak, the fearful, the ignorant will never reach the Atman. You cannot undo, the effect must come, face it, but be careful of all deeds to the Lord, give all, both good and bad. Do not keep the good and offer only the bad. God helps those who do not help themselves.'

'অনুভব করতে শেখো যে, আর সব দেহে তুমিই বর্তমান, জানতে চেষ্টা কর যে, আমরা সবাই এক। আর সব আজে বাজে জিনিস শূন্যে উড়িয়ে দাও। ভালো মন্দ যাই করেছ, সে সব থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ, সেগুলি নিয়ে আর একদম ভেবো না। কুসংস্কার দূর করে দাও। সামনে মৃত্যু এলেও কোনোরকম দুর্বলতা মনে ঠাঁই দিয়ো না।

অনুতাপ করো না। আগে যে সব কাজ করেছ, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এমন কি, যে সব ভালো কাজ করেছ, তাও মনে রেখো না। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো

আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কোনো কর্মের ফল তুমি নষ্ট করতে করতে পারো না—ফল আসবেই আসবে। সুতরাং সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হও। কিন্তু সাবধান আবার যেন সে কাজ ক'রো না। সব কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও—ভালো মন্দ সব। নিজে ভালোটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ো না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য করতে যায় না, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।'[১]

[Inspired Talks : ৩রা আগস্ট, ১৮৯৫ এর দিনলিপি]

এই বাসনামুক্ত বৈরাগ্যময় শুকদেবোপম সত্তাই বিবেকানন্দের সহজাত প্রকৃতি। তাই স্বামীজীর রচনাবলী অনুধাবনের সময় একথাটি মনে থাকা প্রয়োজন যে পাঠক যাঁর বাণী ও রচনার অনুশীলন করছেন, তিনি মূলতঃ এক সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী, যিনি বিশ্বকল্যাণে আত্মনিবেদনের ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয়—স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বের আদর্শ। তবু 'মতামত দর্শন বিজ্ঞানে'র চেয়ে প্রেমই তাঁর উপলব্ধিতে জীবনের সারসত্য।

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এইমাত্র ধন।

(সখার প্রতি)

বুদ্ধ তাই তাঁর দৃষ্টিতে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। কতবার কতভাবে তিনি বুদ্ধের প্রতি তাঁর চিরন্তন আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একদিন বুদ্ধপ্রসঙ্গে বুদ্ধের সংসারত্যাগকাহিনী বর্ণনার সময় তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয় : Have you never thought

---

১ উক্তিটি প্রচলিত বাক্যের বিপরীত। সাধারণতঃ আমরা বলি 'ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে।' কিন্তু এখানে চরম বৈরাগ্যবান সাধকের কথা বলা হয়েছে। তুলনীয়—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।—গীতা

of the heart of the heroes? How they were great, great, and soft as butter.' তুমি কি কখনো মহাবীরদের হৃদয়ের কথা ভেবে দেখেছ? তাদের হৃদয় কত বড়, কত বড়, অথচ কত মাখনের মতো কোমল?[১]

বুদ্ধহৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী অজান্তে আপন হৃদয়সত্য উচ্চারণ করেছেন। তবু, স্বামীজীরই ভাষায় 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' জগতের ইতিহাসে যাঁরা শ্রেষ্ঠ-বীর, তাঁরা সবচেয়ে বেশী দুঃখী। এই নিখিলযন্ত্রণাকে হৃদয়ে ধারণ করেই সেই রক্তাক্ত অনুভূতি আরো সত্য হয়ে ওঠে; প্রেমে ও যন্ত্রণায়, যন্ত্রণায় ও ঈশ্বরে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। কালী ঈশ্বরচেতনার সেই বেদনাঘন মূর্তি।

"She is the organ. She is the pain. And she is the giver of pain. Kali! Kali! Kali!" 'তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রণা, তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী, কালী! কালী! কালী!'[২]

এই যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই বিবেকানন্দ ধ্যাননেত্রে তাঁর আনন্দময় জীবন-দেবতার মুখশ্রী দেখতে পেয়েছেন। তাঁর 'The Cup' কবিতায় বেদনার পানপাত্রটি বিনা প্রশ্নে পান করবার আদেশ এসেছে জীবনদেবতার কাছ থেকে, তারপর নিমীলিত দৃষ্টির নির্জন পটভূমিতে মুক্তির অন্বেষণের পরিসমাপ্তি।

তাই ভারতীয় সাধনার শেষ ও শুরু—'আনন্দাৎ আনন্দান্তরম্।' নিখিলবেদনাকে অকাতরে বরণ করতে পেরেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের আনন্দময় রূপটি তাঁর কথোপকথনের নানাস্থানে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করেছে। উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এমনি নিরাসক্ত হৃদয়ের অপেক্ষা রাখে।

১ The Master As I Saw Him : 'His attitude to Buddha' : Complete works of Sister Nivedita : Vol I : p. 271

২ Ibid : Kshir Bhowani . Complete works of Sister Nivedita : Vol I : p. 94.

একদা আমেরিকায় কোনো মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, "Swamiji, are you a Buddhist ?" (স্বামীজী আপনি কি বৌদ্ধ ?) মহিলার উচ্চারণে Buddhist (বৌদ্ধ) কথাটি দাঁড়িয়েছিল 'Budist', যার মানে দাঁড়ায় কুঁড়ি-বিশারদ। স্বামীজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, "No, Madam, I am a florist." (না, আমি একজন পুষ্পবিশারদ।)

ব্যঙ্গচ্ছলে হলেও উত্তরটি ঠিক। স্বামীজীর কাজ তো কুঁড়িকে ফুটিয়ে তোলা।

বিখ্যাত দার্শনিক ইঙ্গারসোলের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ স্মরণীয়। ইঙ্গারসোল বলেছিলেন যে, জগৎটাকে তিনি কমলালেবুর মতো উপভোগ করতে চান। উত্তরে স্বামীজীর কথা, 'আমিও তাই চাই, তবে খোসাটুকু বাদ দিয়ে।' মায়ার খোসাটুকু বাদ দিয়ে ব্রহ্মফল আস্বাদের উপমা স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেও দিয়েছেন। ওই নির্মোহ দৃষ্টিই হাস্যরসের গোড়ার কথা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদে গো-রক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে স্বামীজীর সেই বিখ্যাত কথোপকথনটি এ জাতীয় ব্যঙ্গের চরম উদাহরণ।

স্বামীজী। …আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করিয়াছে কি ?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে গেছে, সামর্থ্যসত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেন নি ?

প্রচারক। না, লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে।

স্বামীজী। যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনাহারে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুঠো ভাত না দিয়ে পশুপাখির জন্য রাশি রাশি খাবার বিলায়, তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কর্মফলে মানুষ মরছে—এ ধরণের কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে —গোমাতারা আপন কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক (অপ্রতিভ)—হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন, তা সত্য বটে, তবে শাস্ত্রে বলে—গোরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী (সহাস্যে)—হ্যাঁ, গোরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ?[১]

স্বামীজীর মানবিকতাবোধের অপূর্ব-দৃষ্টান্তও এই কথোপকথনে প্রকাশিত।

বেলুড় মঠ। ১৯০২

মঠের আঙিনায় স্বামীজী সেদিন সাঁওতাল মজুরদের নারায়ণ-জ্ঞানে খাওয়ালেন। তারপর শিষ্যকে বললেন, 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালোবাসা, এমন আর দেখি নি।'

তারপর মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি ? নয়তো গেরুয়া পরে আর কি হল ? 'পরহিতায়'—সর্বস্ব অর্পণ এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।…দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ-বাজানো, ঘণ্টানাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯

যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।...আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

সেদিনের কথাবার্তার শেষে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আজ যা বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখবি। ভুলিস নি যেন।'[১]

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ভোলেন নি বলেই স্বামি-শিষ্য-সংবাদের দুটি খণ্ডে আমরা আলাপচারী বিবেকানন্দের একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করেছি। স্বামীজীর মুখের ভাষায় যথাযথ লিপিবদ্ধ করা হয় নি বলে এ গ্রন্থের যে অপূর্ণতা, তা বক্তব্যের মহিমায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে অন্ধতমিস্রাবিধ্বংসী চৈতন্যময় বিবেকানন্দের প্রবল দুর্বার ব্যক্তিত্ব।

চেতনের লক্ষণ কি, এ প্রশ্নের উত্তরে শিষ্যকে স্বামীজী বলেছিলেন, 'যা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ না একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার বিদ্রোহ করবে। যেখানে struggle (সংগ্রাম), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ) সেখানেই জীবনের চিহ্ন।'[২]

আহারে, চলন-বলনে, ভাবে ভাষায় যে তেজস্বিতা তিনি জাতীয় হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, তার জ্বলন্ত, জীবন্ত মূর্তি তিনি নিজে। এ যুগে তাঁর নিজস্ব মৌলিক বাণী কি, সে কথাও তিনি বলেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতাকে—'Yes!. the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel.'[৩] 'হ্যাঁ, বয়স যত বাড়ছে, ততই একথা উপলব্ধি করছি যে, পৌরুষের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। এই আমার নূতন বাণী।'

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ: বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ২৩৫

২ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ১২

৩ Complete works of Sister Nivedita: Vol I: p. 122.

ঋগ্বেদের ঋষি বলেছিলেন, বাক্‌ই সরস্বতী। নরঋষি বিবেকানন্দের বাক্‌ই মহাশক্তি। জাতির অন্তরে এই মহাশক্তি সঞ্চারই তাঁর জীবনবাণী। অমিত তেজ ও অনন্ত প্রেমে পরিপূর্ণ তাঁর বাক্‌মহিমা। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' শিষ্যের মাধ্যমে সমগ্র জাতির প্রতিই তাঁর 'অভীঃ'মন্ত্র উচ্চারণ—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে একথা ধ্রুবসত্য। বীর হ—সর্বদা বল্‌ 'অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ইপাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যতকিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্যেব সূর্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপাতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

যেদিন ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণ—ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন ; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ অভীঃ'।"[১]

বিবেকানন্দের আর এক শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'অস্ফুট স্মৃতি' থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার একটি কণিকায় বিধৃত নিখিল-মানবের প্রতি প্রেম-বিগলিত সত্তার অন্যতম উদাহরণ—

সেদিন আলোচনার বিষয়ঃ অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষে পার্থক্য কি? এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তাই স্বামীজীর জীবনবেদরূপে গৃহীত হ'তে পারে—"বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান, কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয়

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৬

আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয় যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তি নেই।"১

আত্মমুক্তি থেকে এই বিশ্বমুক্তির জগতে উত্তরণের মূলে অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা। বিবেকানন্দের জীবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'জীব শিববাদে'র পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। বহুমুখী বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিবেকানন্দ-বাণীর মূলসুরটি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির, সেই উপলব্ধির আলোকেই জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রের অনুধাবন। স্বভাবতই উপনিষদের মন্ত্রবাণী স্বামীজীর কথোপকথনে ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। এ জাতীয় মন্ত্রোচ্চারণের এক অপূর্ব বাণীচিত্র আছে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'তে—"বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর, লয়, তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা :

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। মুণ্ডক, ২।২।৫—সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য সব বাক্য পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন :

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ কঠ ২।২।১৫

সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না। চন্দ্র-তারকাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি : পৃঃ ৩৩৯

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপ. ২।৫ ; ৩।৮

—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"[১]

আবার এই উপনিষদমন্ত্রে অভিষিক্ত বিবেকানন্দেরই আর একটি কথাও স্বামী শুদ্ধানন্দজীর বাণী-সংগ্রহে বিধৃত : 'এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারবে।'[২]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুধ্যান-প্রসঙ্গে তাঁর ওই বাঙ্ময়স্বরূপের আলোচনা আমাদের কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপনীত করে। মহৎ সান্নিধ্যে আপন মহিমাকে নিমেষের জন্যও যদি স্মরণ করায়—সেই তো পরম লাভ।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৪১-৪২ উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর অনুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দকৃত।

২ স্বামী শুদ্ধানন্দ-সংকলিত 'স্বামীজীর কথা' : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬০

সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা গদ্যের সাধুরূপ আজ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অন্তর্হিত। স্বামীজীর ভাষায় 'এক কলকেতার ভাষা'ই মাজিতরূপে নিখিল বাঙালীর লেখনীর ভাষা। (ব্যক্তিগতভাবে এই প্রবন্ধের লেখকও চলতি বাংলার অনুগামী।) তবু এক এক সময় প্রশ্ন জাগে, সাধুভাষা কি সত্যি চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে আমাদেব মননেব জগৎ থেকে? (সাম্প্রতিককালের বিশ্রুত দু'চারজন লেখকের কথা মনে হচ্ছে; যেমন ধরুন,) মোহিতলাল (মজুমদার,) প্রমথনাথ বিশী, নীরদচন্দ্র চৌধুবী,—এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক অন্যতম এই তিনজন নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাধু-গদ্যের মহারথী। বিদ্যাসাগর থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবধি বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুধাবন করলে একথা স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে যে, সাধুগদ্যের নিজস্ব প্রাণশক্তি ও প্রকাশের ঐশ্বর্য আজও চলতি ভাষায় অপেক্ষিত।

সাধুগদ্য যে কৃত্রিম, একথা সাহিত্যেব ক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়। যেমন নয়, অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে গিয়ে অভিনয়শিল্পেব স্বাভাবিক অতিরেক অস্বীকার কবার মনোবৃত্তি। আসলে তো কৃত্রিম বলেই তা অভিনয়! সংস্কৃতের মতো বিশাল সাহিত্যকীর্তি ওই আপাতকৃত্রিম ভাষাপদ্ধতিকে স্বীকাব করেই আমাদের জীবনে ও মননে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অথচ কালিদাস বা ভবভূতির ভাষা যে কৃত্রিম একথা বলার সাহস আমাদের হয় না। সংস্কার তো ভাষামাত্রেই অবশ্যকরণীয় —তাই না আমাদের ভাষা-মাতামহীর নাম 'সংস্কৃত'। রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয়, দেবেন্দ্রনাথ বা ভূদেব. বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র—এঁরা কেউ কৃত্রিম ভাষায় লিখেছেন মনে কবাটা ভাষার নিজস্ব অলংকরণ ও সংগতিসাধন-চেষ্টাকেই অস্বীকার করা।

সাধুভাষা নিশ্চয়ই গড়ে-তোলা ভাষা। কিন্তু চলতিভাষাও কি মার্জনার অপেক্ষা রাখে না? বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রতিভাস্পর্শে

সাধুভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই বিদ্যাসাগরের শিল্পচেতনা থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল পর্যন্ত এ ভাষার যে সৃজন ও মননশক্তি আমাদের মাতৃভাষার গদ্যসাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ যৌবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজকের চলতিভাষার সমস্ত নৈপুণ্য স্বীকার করেও আমরা বাংলা গদ্যকে তার চেয়ে শক্তিশালী ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করতে পেরেছি, একথা মনে করা কঠিন।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—তিনজনেই সর্বজনবোধ্য ভাষায় লিখবার পক্ষপাতী। বাংলারচনার দুর্বলতার বিরুদ্ধে এঁদের তিনজনেরই নানামুখী যুক্তির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। তবু বিষয়বিশেষ অনুসারে এঁদের ভাষাও সবসময় জনসাধারণের মুখ চেয়ে থামে নি, বরং আপন আদর্শের উন্নতশিখরে পাঠকসমাজকে আহ্বান করেছে। কোনো দেশের কোনো যুগের সাহিত্যই পাঠককে অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না, সাহিত্যের সার্থকতা পাঠক তৈরী করায়। একথা আর সব সৃজনধর্মী শিল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ জীবনের উপাদানই শিল্পের উপকরণ, কিন্তু যা আছে তা নিয়ে যা অনন্য তাকে গড়ে তোলাতেই শিল্প বা সাহিত্যের মহিমা।

'পরিচয়'-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্র'-প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের চলতিরূপের সমর্থন মোহিতলালকে বিস্মিত করেছিল। সাধু গদ্যের সমর্থনে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য—'ভাষার এক সাহিত্যিক ভঙ্গিকে কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রেই কৃত্রিম। কবি যে ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবেই, চিরদিনই করিয়া থাকে।' (আধুনিক সাহিত্যের ভাষা)[১]

সাধুগদ্যের সমর্থনে ঐ একই প্রবন্ধে মোহিতলালের আর একটি কথাও প্রণিধানযোগ্য—'এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্মহিসাবে বাঙ্গালী এক জাতি, কিন্তু ভাব-বিস্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা

১ আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল : ৬ষ্ঠ সংস্করণ : পৃঃ ১৪৫

সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রকৃত বাংলা নয়—বারো-আনা সংস্কৃত।"[১]

মোহিতলালের এই ভাষাপ্রীতির শ্রদ্ধাযোগ্য রক্ষণশীলতাসত্ত্বেও পরবর্তী বাংলা গদ্যে মনন ও রসসৃষ্টি—দুয়ের ক্ষেত্রেই চলতি ভাষাই মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর চলতিভাষা-সমর্থন মোহিতলাল কখনো স্বীকার করেন নি, কিন্তু বিবেকানন্দের চলতি গদ্যপ্রসঙ্গে তিনি কি বলতেন জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক! এ পর্যন্ত তেমন কোনো উদাহরণ পাই নি। তবে একথা নিশ্চিত যে, বিবেকানন্দের অন্তরেও মনন বা দর্শনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতানুগামী সাধু-গদ্যরীতিই জয়ী হয়েছে। এদিক থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে স্বামীজীর আকৈশোর সাহচর্য নিশ্চয়ই প্রধান প্রভাব হিসাবে গণ্য হতে পারে। উত্তরজীবনে স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষাপ্রীতি, সংস্কৃত স্তব ও পত্র রচনা, সংস্কৃতচর্চা ও সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহ প্রভৃতির কথা মনে থাকলে তাঁর বাংলা গদ্যে সংস্কৃতপ্রভাবের কারণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবার ওপরে বেদান্তবিদ বিবেকানন্দের ভাষার প্রাণশক্তি তো সংস্কৃতবাহন বেদান্তদর্শন থেকেই সঞ্চারিত!

India's Message to the World (জগতের প্রতি ভারতের বাণী) নামে স্বামীজীর যে অসমাপ্ত রচনাটি স্বামীজীর ভারতচেতনার বীজমন্ত্রগুলি ধারণ করে আছে তাতে ভাষা-সমস্যাসমাধানে স্বামীজীর নির্দেশ—"এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষাসমস্যার) একমাত্র সমাধান।"[২] সংস্কৃতকে ভারতের ভাষামাধ্যম করবার এই নীতি সাধারণভাবে আজও স্বীকৃত হয় নি বটে, তবু হিন্দী যতোই রাষ্ট্রভাষা হবার অধিকার চাইছে, ততই সংস্কৃতপন্থী হতে চলেছে—এও লক্ষণীয়। অন্ধ ভাষাবিদ্বেষের গণ্ডী মুছে গেলে সংস্কৃতের সার্বভৌম মহিমা আপনি প্রমাণিত হবে।

---

১ মোহিতলালের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য': পৃঃ ২৪৫-২৪৬

২ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: পৃঃ ৩৭০

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি বাংলা গদ্যের মননভূয়িষ্ঠ রচনাবলী যে সংস্কৃত থেকে বেদান্তচিন্তা ও ভাষাসৌষ্ঠব দুয়েরই উত্তরাধিকার পেয়েছে, সেকথা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাভাবিকভাবেই সাধুভাষা এই বৈদগ্ধ্যের সবচেয়ে বেশী ফলভাগী। (বিবেকানন্দ-মানসের গঠনে এই ভাষা ও শাস্ত্রের বিপুল প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর দুটি প্রিয় মননপ্রসঙ্গ থেকে উদাহরণ দেওয়া চলে।

প্রথমে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের ভাষাগত আদর্শ লক্ষ্য করা যাক।

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ

যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-স্বভাবয়োরিতরেতর ভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং, তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতর-ভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্। তথাপি অন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেনাত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্ম্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।[১]

অনুবাদঃ 'এখানে যুষ্মৎ পদের অর্থ—অনাত্মা জড় পদার্থমাত্র, যাহাকে 'ইদং' (এই) বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়, আর অস্মৎ পদের অর্থ চিৎস্বভাব আত্মা (ব্রহ্ম)। তন্মধ্যে অস্মৎপদার্থ চিৎস্বভাব আত্মা হয় বিষয়ী—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় আছে বলিয়াই তিনি বিষয়ী; আর যুষ্মৎপদার্থ—জড়বস্তু হয় তাহার বিষয়, অর্থাৎ চিৎপ্রকাশ্য। উক্ত যুষ্মৎপ্রতীতিগম্য বিষয় ও অস্মৎপ্রতীতিগম্য বিষয়ী (চৈতন্য), উভয়ই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব,—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহংপ্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা ইহারাও

১ বেদান্তদর্শন: দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত সং : পৃঃ ৩।৪

তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার, তাহাও আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা তাহা অনাত্মা নহে, এবং যাহা অনাত্মা তাহাও আত্মা নহে, সুতরাং অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরভাব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মার তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়গত ধমসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদি গুণেরও পবস্পব তাদাত্ম্যভ্রম থাকা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যদিও এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানের বিষয় আত্মাতে (আমাতে) ইদংজ্ঞান জ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদিব) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যভ্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহাদিতে অহংজ্ঞানাস্পদ আত্মাব (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য হওয়াই উচিত, অর্থাৎ 'অহং মম—আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, অথবা হইতেই পারে না, এই সিদ্ধান্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। তথাপি অনাদিসিদ্ধ অবিবেক-প্রভাবে অত্যন্ত-বিলক্ষণ স্বভাব ও অত্যন্ত বিবিক্ত অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য বোধগম্য হওযায় আপনাতে অন্যের ও অন্য ধর্মের এবং অন্যেতে (দেহাদিতে) আত্মার ও "ইহা আমার" ইত্যাদি উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহাব মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্যমিথ্যা উভয়জড়িত, সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, এবং কবে যে, উহার অবসান হইবে, তাহাও বলা যায় না।'

মূলানুগ এই বঙ্গানুবাদেব পাশাপাশি আচার্য শংকরের ভাষা কত সংহত আকারে কী বিপুল সত্যকে ধারণ করে আছে। স্বামীজীর সাধু গদ্য যে অনেক পরিমাণে এ জাতীয় ভাষাভঙ্গিমার দ্বারাই প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী স্বামীজীর আর একটি প্রিয়গ্রন্থ। জয়পুরের ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতের কাছে তাঁর পাণিনি-অধ্যয়নের প্রচেষ্টা ও

সাফল্যের কাহিনী 'বিবেকানন্দ-জীবনী' পাঠকদের সুবিদিত।'[১] ব্রাহ্মণের সংস্কৃত, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য প্রভৃতির সঙ্গে স্বামীজী পাণিনির মহাভাষ্যেরও নাম করেছেন তাঁর বিখ্যাত বাঙ্গালাভাষা রচনায়।[২]

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের অনূদিত পাণিনির মহাভাষ্য প্রকাশিত হতে থাকে। মূল ও অনুবাদের[৩] একটু উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

"...'চত্বারি বাকপরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণো যে মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।' চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ নিপাতাশ্চ তানি বিদুর্ব্রাহ্মণো যে মনীষিণঃ। মনসঈষিতো মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টান্তে ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং । এতদ্বাচোযন্মনুষ্যেস্থু বর্ততে। চতুর্থ মিত্যর্থঃ। চত্বারি।"

'...চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত; যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী. তাঁহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন। ইহাদিগের তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থভাগ ব্যবহার করে।' চারিপ্রকার, বাক্যপরিমিত পদ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদসমষ্টিই বাক্য। যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকল জানেন। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারাই মনীষী। তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে তাহা ইঙ্গিত হয় না, গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না, কার্যকরী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থভাগ ব্যবহার করে;—"মনুষ্যলোকে যাহা

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দঃ স্বামী গম্ভীরানন্দঃ (১ম সং) প্রথম খণ্ডঃ পৃঃ ৩১৮-৩১৯

২ বাণী ও রচনাঃ ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬

৩ উদ্বোধনঃ ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যাঃ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ঃ পৃঃ ২৮৫-৮৬

আছে; ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে।" তুরীয় অর্থ চতুর্থ। "চত্বারি"। "চারি"। এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।'

ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের মহত্তম মনীষী পাণিনির মনন-ঋদ্ধ-ভাষা-নৈপুণ্যও স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীতে আলোকসম্পাত করতে পারে। স্বামীজী জানতেন, 'যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।'[১] তাই তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ও অর্বাচীন যুগের সংস্কৃত ভাষার তুলনা করতে গিয়ে লিখছেন 'ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরেমতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতের দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।……যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে,—'রাজা আসীৎ' !!! আহা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল।'[২]

'রাজা আসীৎ' অবশ্য বাণভট্টকে মনে পড়ায়। বাণভট্টের অনুরাগীরা এ মন্তব্যে ব্যথিত হলেও সাধারণভাবে উত্তরকালীন সংস্কৃত-সাহিত্যের অতি-পল্লবিত রূপের ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার্য। বাস্তবিক মননের ক্ষেত্রে অসাধারণ সিদ্ধিসত্ত্বেও সৃজনের ক্ষেত্রে অর্বাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য অতিমাত্রায় ঐতিহ্যলালিত, মন্থরগতি। ভাবের বিপ্লবের সঙ্গে ভাষার বিপ্লবও সাধিত হয়—সেকথা সংস্কৃত-সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে বিস্মৃতপ্রায়। সুতরাং প্রাচীন মনীষীদের সঙ্গেই বরং স্বামীজীর গুণগ্রাহী হৃদয়ের আত্মীয়তা। সেইসঙ্গে একথাও স্মরণীয়, সংস্কৃতই সর্বভারতীয় সুধীমণ্ডলীর ভাষা। ভারতের

১, ২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: 'বাঙ্গালাভাষা': পৃঃ ৩৬

ইতিহাসে সব গণধর্মী ভক্তি-আন্দোলনই একসময় না একসময় সংস্কৃতের মাধ্যমে আপন স্থায়িত্বলাভ করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণাপুষ্ট নব অদ্বৈত-আন্দোলনেরও সে পরিণতি স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদের মতো 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র সংস্কৃত অনুবাদও সাধিত হয়েছে। বিবেকানন্দের মৌলিক বাংলা রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' (একত্রে 'অনুবাদ-বিবেকানন্দম্') অনুবাদ করে ভারতের সর্বপ্রান্তের মনীষীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন ডঃ সীতানাথ গোস্বামী।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষ্যের অনুগামী বিবেকানন্দ কখনো কখনো সংস্কৃত গদ্যও লিখেছেন তাঁর কোনো কোনো চিঠিপত্রে। পূর্বাচার্যদের অনুসরণে স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যার এক উদাহরণ এখানে দেওয়া চলে।

গীতার 'যাবানর্থ উদপানে' (২।৪৬) শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে স্বামীজী যে নতুন ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন সেইটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়—'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকায়ামপি ভূমৌ যাবানুদপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাম্ (অল্পজলমলং ভবেদিত্যর্থঃ) 'আস্তাং তাবদ্ জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্পেঽপি জলে সিধ্যতি' এবং বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু অর্থঃ প্রয়োজনম্।"[১]

'সমস্ত দেশ বন্যাপ্লাবিত হ'লে তৃষ্ণাতুরের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার পক্ষে যথেষ্ট)—সে যেমন বলে, বিরাট জলরাশি থাকুক, সামান্য একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট'—জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্বব্যাপী বন্যার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণমাত্র, তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান।'[২]

অনুসন্ধান করলে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী থেকে শাস্ত্রব্যাখ্যায় মৌলিকতার এমন আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বেদান্তের বিশদ ব্যাখ্যা-

---

১, ২ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩৫৬-৫৮

সম্বলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সেটির সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তবু স্বামীজীর রচনাবলীতে অনুসন্ধান করলে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া খুব কঠিন নয়।

কিছুকাল আগে বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দকৃত 'ধর্মমীমাংসা ও রামকৃষ্ণদর্শন' নামে যে মূল্যবান উপকরণটি চোখে পড়েছিল, বর্তমান লেখকের 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'গ্রন্থের 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা: শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায়ে (পৃঃ ২৪১) তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যানুসরণে এ রচনাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল সত্যটি যেমন বোঝা যায়, তেমনি পরবর্তী বিবেকানন্দ-চিন্তাধারার বাণীবীজরূপে এই রচনার মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির ভাষারূপটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এই রচনাটির আলোচনার আগে নরেন্দ্রনাথ দত্ত-রূপে রচিত স্বামীজীর প্রথম জীবনের আর একটি মূল্যবান গ্রন্থভূমিকা স্মরণীয়।

'সংগীতকল্পতরু' নামে যে সংকলনগ্রন্থটি স্বামীজী তাঁর বন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে একত্রে সংকলন করেন, তার ভূমিকাস্বরূপ 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনাটি যে স্বামীজীরই, এ বিষয়ে এখন অনেকেই একমত। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' (প্রথম সংস্করণ-১৯৬৩)—রচনাকালে বেলুড়মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের দুটি বই দেখেছিলাম। এ বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সে বই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।[১] অনতিকাল পরে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু'-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে স্বামীজীর সঙ্গীতসাধনা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত হয়। সম্প্রতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর 'বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত' গ্রন্থটি এ বিষয়ে আরো অগ্রসর।

১ এ সংস্করণের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

মূলতঃ 'জ্ঞানের বাহন' হিসাবে এ ভূমিকার ভাষা বিচার্য হলেও স্বামীজীর প্রাক-সন্ন্যাস যুগের কল্পনামণ্ডিত ভাষাশৈলীরও বেশ কিছু উদাহরণ এখানে রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষা ও সংগীতপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মন্তব্য ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান—

"আধুনিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষালব্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিকভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিত্ব নীরস অথবা কষ্টকল্পিত ভাবের আলয়, প্রাথমিক মনুষ্যের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি। অনন্ত সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধি প্রতিঘাতী প্রভা, নিবিড় অরণ্যের মহান স্তব্ধ ভাব, গিরি-নির্ঝরের গম্ভীর হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর ধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপু, নদীসকলের অর্ধস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি, বনবিহঙ্গের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শকার. সঙ্গীত প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত। আমরা শোভা দেখি, গান শুনিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হই; অরণ্য-আশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘররবে নাচিয়া উঠিত, প্রকাণ্ড হিমালয়ের চিরশুভ্র শিখর হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং প্রাতঃকুন্দের বিকাশ পর্যন্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত; তাহা কি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়? আমরা সৌন্দর্য দেখি, তাঁহারা সৌন্দর্য পান করিতেন,—আমরা মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি, ঋষির প্রাণ বিষ্ণুপদ-নিঃসৃতা নির্মলসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীততরঙ্গে মিশাইয়া যাইত।··· যাঁহাদের প্রাণে কবিত্ব, যাঁহাদের জীবনে অলঙ্কার, যাঁহাদের কার্য ন্যায়, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণই এই সঙ্গীতের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিলে হয়ত ভুল হইবে, তাঁহারা আবিষ্কর্তা। এ দেবদুর্লভ ধন মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না, এ মন্দাকিনীধারা।

অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য, যাঁহার প্রতি ছন্দে গ্রহ নক্ষত্ররাজি ভ্রমণ করিতেছে, সেই দেবাদিদেব আদি কবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া কোন

কোন পুণ্যবানের মস্তকে বর্ষণ করেন। ভারতের এই ভাস্কর মহাত্মশালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল রঙ্গভূমির ত সেই সঙ্গীত একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ সর্বাবয়বসম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে আজি পাশ্চাত্য ভূমির বিজ্ঞানচর্চায়, দর্শনচর্চায়, ন্যায়চর্চায়, জ্যোতিষচর্চায়, গণিতচর্চায় ও ভৈষজ্যচর্চায়, প্রাচীনভারতকে দূরপরাহত করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সঙ্গীত তুমি শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্তনের, ঘোর দুর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া শত বিঘ্ন বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছে।"[১]

বিবেকানন্দের কবিহৃদয়ের ও ভারতপ্রেমিক-সত্তার উন্মেষ নরেন্দ্রনাথের এই রচনাটিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির প্রভাবসত্ত্বেও বক্তব্যস্থাপনে আবেগ, আত্মবিশ্বাস ও দৃপ্ত গৌরববোধের যে সমন্বয় পরবর্তী বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা সবই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকায় সার্থকভাবে উদাহৃত। বিশেষতঃ পরবর্তী সাধুগদ্যশৈলীতে বিবেকানন্দের ভাষারীতির যে ক্রমবিকাশ তার ধারাটি অনুসরণে এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরে স্বামীজীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা মধ্যযুগের সাধক টমাস-আ-কেম্পিসের Imitation of Christ-এর স্বকৃত গদ্যানুবাদের 'সূচনা'। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় ১ম বর্ষের ১ম থেকে ৫ম সংখ্যায় স্বামীজীর অনুবাদের সূচনা এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে টমাস-আ-কেম্পিসের নামে প্রকাশিত হলেও এ গ্রন্থের রচনাকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে টমাস হ্যামারলীন বা হ্যামারকেন (১৩৮০-১৪৭২) এই ভক্তিবৈরাগ্যময় গ্রন্থের লেখক।[২] এ অনুবাদের ভূমিকায় স্বামীজীর

১ সঙ্গীত কল্পতরু: 'সঙ্গীত ও বাদ্য'

২ বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা: ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র: 'বিবেকানন্দের একখানি প্রিয়গ্রন্থ অধ্যায়' দ্রঃ

দেশকাল ও ধর্মমত নিরপেক্ষ যথার্থ সাধকদের প্রতি অনুরাগ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি আধুনিক খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের বহিরঙ্গ চাকচিক্যের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় আদর্শের দুস্তর পার্থক্যসম্বন্ধে কটাক্ষও স্মরণীয়।

বরাহনগর মঠে থাকার সময় স্বামীজী মাঝে মাঝে পরিব্রাজকরূপে নানা তীর্থে পরিক্রমা করেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মঠবাস চলতো। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে একবার বরাহনগরে ফিরে এসে প্রায় একবছর (অল্পকিছুদিন শিমূলতলায় থাকা বাদ দিলে) তিনি মঠবাস করেন। এই সময়েই তিনি 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় তাঁব অনুবাদটি শুরু করেছিলেন, এমন অনুমান করা চলে। স্বামীজীর রচনার ভাষা তখন মূলতঃ সাধু গদ্য। সেদিক থেকে 'ঈশা অনুসরণের' 'সূচনা'র ভাষা লক্ষণীয়—

" 'খ্রীষ্টের অনুসরণ' নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান কাথলিক' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহা-পুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা ও সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সততযুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন?"[১]

" 'সব সেয়ান কী এক মত'—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা-অনুসরণ : পৃঃ ১৬

পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে।"[১]

'ভক্তসিংহ' ঈশানুসরণ-রচয়িতার অন্তরের সাধর্ম্য-অনুভবকারী বিবেকানন্দের অন্তর-পরিচয় উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে এ রচনার শান্ত, ওজস্বী, দৃঢ়নিষ্ঠ যুক্তি ও অন্তর্নিহিত আবেগধর্ম লক্ষণীয়। এর কিছুকাল পরে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হিমালয়ভ্রমণের কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতসাধকদের চিরতপস্যার স্থান হিমালয়-যাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এই পরিক্রমা-কালে নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ার পথে অগ্রসর হওয়ার সময় একদিন রাত্রিবাসের জন্য এক ঝরণার ধারে পানচাকির কাছে অখণ্ডানন্দ ও বিবেকানন্দ আশ্রয় নিলেন। স্নান সেরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের তলায় স্বামীজী ধ্যানে মগ্ন হলেন। এক ঘণ্টা পর স্বামীজী ধ্যান থেকে উঠলেন। সেই ধ্যান তাঁর অনুভূতিজগতের বিরাট দরজা খুলে দিয়েছে। সঙ্গীকে ডেকে বললেন, "গ্যাখ্ গঙ্গাধর! এই বৃক্ষতলে একটা মহাশুভমুহূর্ত কেটে গেল ; আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।" "স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট রক্ষিত এক-খানি নোটবুকে স্বামীজী সেদিনের অনুভূতির কথা লিখিয়া রাখেন। তিনি বাঙ্গালাতেই লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত উহার ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এই, (উহার মূল হারাইয়া গিয়াছে): " 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। শিবা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহা কল্পনা নয়। এই একের দ্বারা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা-অনুসরণ : পৃঃ ১৭

অপরের আলিঙ্গন যেন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের সদৃশ—তাহারা উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু মানসিক বিশ্লেষণ সাহায্যেই উহাদিগকে পৃথক করা চলে। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। অতএব 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

"বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।"[১]

স্বামী অন্নদানন্দকৃত স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনীতেও এই রচনাটির উল্লেখ আছে। মূল রচনাটি হারিয়ে গেছে এই ধারণাই এতকাল প্রচলিত ছিল।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী-পরিকর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত"-গ্রন্থের পরিশিষ্টে সান্ন্যালমশাই এই রচনাটি

---

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : প্রথম খণ্ড : স্বামী গম্ভীরানন্দ : পৃঃ ২৮৩ (১ম সংস্করণ)। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' গ্রন্থ থেকে এই অংশটির ইংরেজীরূপ—"In the beginning was the word etc.

"The microcosm and the macrocosm are built on the same plan. Just as the individual soul is encased in the living body, so is the Universal Soul in the living Prakriti (Nature) —the objective universe. Shivā (Kali) is embracing Shiva : this is not a fancy. This covering of the one (Soul) by the other (Nature) is analogous to the relation between an idea and the word expressing it : they are one and the same, and it is only by a mental abstraction that one can distinguish them. Thought is impossible without words. Therefore in the beginning was the word, etc.

The dual aspect of the universal soul is eternal. So what we percieve or feel is this combination of the Eternally Formed and the Eternally Formless. (p. 197 ; 1955 Edn.)

সংযুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রকেই চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। 'লীলামৃত' থেকে এই রচনাটির ভূমিকা-স্বরূপে সান্যালমশাই যা লিখেছেন এবং রচনার যে প্রথমাংশ ইংরেজী-অনুবাদের মাধ্যমে স্বামীজীর ইংরেজী ও বাংলা জীবনীতে উল্লেখিত, তার মূল বাংলা নিচে উদ্ধৃত করছি—

ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) খাতায় তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই এবং তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্য-ভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

...আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসঙ্গে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্মমীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।][১]

In the beginning was the word and the word was with God, and the word was God.[২] ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত (অনুশীলন): শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল: ২য় সং: পৃ: ২৫৭; বন্ধনীচিহ্ন বর্তমান লেখক প্রদত্ত।

২ বাইবেলের সেণ্ট জন লিখিত সুসমাচারের গোড়ায় এই বাক্যটি রয়েছে।

বৃহৎ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত; শবোপরি শিবা —কল্পনা নহে; যেমন—মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনাদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব In the beginning was the word and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।"[১]

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল-প্রদত্ত মূল রচনাটির অবশ্য এইখানে শুরু। এরপরই স্বামীজীর ধর্মমীমাংসা এবং রামকৃষ্ণদর্শনের মূলসূত্রাবলীর উপস্থাপনা।[২] প্রাবন্তিক অংশটুকুর মূল ভাষা আমরা পেলাম। পরবর্তী দার্শনিকসূত্রাবলী থেকেও স্বামীজীর তদানীন্তন ভাষাভঙ্গীর দু'একটি উদাহরণ দিই—

"দ্ব্যণুক এসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে। [ধর্মমীমাংসার ১, ২ সূত্র]।

জীবন কি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দোষ হয়।

[রামকৃষ্ণ-দর্শনের ১৬, ১৭ সূত্র]

বলা বাহুল্য ভারতীয় শব্দব্রহ্মবাদের সঙ্গে এই বাক্যটির বিশেষ মিলই স্বামীজীকে আকৃষ্ট করেছে।

১, ২ লীলামৃত: পৃ: ২৫৯ এবং 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য': 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা: শ্রীরামকৃষ্ণ'—অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বামীজীর দার্শনিক আলোচনার ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষাকে অনুসরণ করেছে। এদিক থেকে রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয়ের মননচর্চার ভাষার সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার গোত্রগত মিল রয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি তাঁর এ জাতীয় রচনার ভাষাতেও এক অন্তঃশীল গতিবেগ সঞ্চার করেছে।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এই গদ্যরচনাটির পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসে (প্রায় সাত বছর) আর কোনো মৌলিক গদ্য রচনা থাকলেও আমাদের এখনও চোখে পড়ে নি। আমেরিকা থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্ঠিতম উৎসবে 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'ভাব্‌বার কথা' প্রবন্ধগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'হিন্দুধর্ম কি?' নামে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির মধ্যেই পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিণত সাধুগদ্যের পূর্বাভাস দেখি। সংস্কৃত শাস্ত্রাদির প্রভাবে সূত্র-জাতীয় বাক্যরচনা-পদ্ধতির উদাহরণ (রামকৃষ্ণ-দর্শনে এর আগে যা আমরা পেয়েছি)—
"শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত বেদ বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

'সত্য' দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।"[১]

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩

বিভিন্ন বক্তব্যের সমাবেশে দীর্ঘজটিল বাক্যপদ্ধতি—

"কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচার-নিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুধাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[১]

দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘতম বাক্যটির অসমাপিকা ক্রিয়াবহুল রূপায়ণে স্বামীজী কোথাও ছন্দোভঙ্গ করেন নি বা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় নি, এও যেমন লক্ষণীয়, তেমনি জটিল ও দুরূহ দার্শনিক বক্তব্য-রূপায়ণে স্বামীজীর এই ভাষার উপযোগিতাও চিন্তনীয়। সাধারণবিচারে এ ভাষার অমিতবিস্তার দোষাবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় সংযোজন এতে কিছুই নেই, বরং একটি সমগ্র যুগের পতন ও উত্থান-কাহিনী যেন এই দীর্ঘবাক্যটির দ্বারা কালসীমায় বিধৃত।

বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪-৫

হয়তো এই শব্দারণ্য অতিক্রম করেই অনুভূতির উদ্বেল তরঙ্গে বিবেকানন্দ-হৃদয় আন্দোলিত হতে থাকে। আর সেই মুহূর্তে একের পর এক ঢেউয়ের মতন তাঁর তরঙ্গায়িত বাক্যরাশি পাঠকের হৃদয়তটে আঘাত করে ফেরে—

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে—ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।"...

"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি।"[১]

১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় বিধৃত স্বামীজীর আলাপচারীটি এ প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"এই সেদিন "হিন্দুধর্ম কি?" ব'লে একটা বাঙলায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়।"[২]

আধুনিককালে কেউ কেউ যখন সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজীকে রচনাশিল্প সম্বন্ধে অনবহিত মনে করেন, তখন স্বামীজীর জবানবন্দীতে একথাগুলি বিশেষভাবেই স্মরণীয়—"দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব।"[৩] এই নূতন ছাঁচের মূলসূত্র

---

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৫-৬

২ তদেব: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ২৩

৩ তদেব: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ৯৪

বিশেষণের দ্বারা ক্রিয়াপদের বিলোপ। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত গদ্যের আদর্শই এখানে বাংলার প্রচলিত গদ্যরীতিতে নবজীবন সঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত।

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী এই আদর্শে 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। ১৮৯৯-এ যখন 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়, তখন তার প্রস্তাবনায় স্বামীজী এই গদ্যরীতির ব্যবহারে অপূর্ব নৈপুণ্য সঞ্চার করলেন। স্বামীজী যে সচেতন গদ্যশিল্পী, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই 'প্রস্তাবনা'টির ভাষায়—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[১]

ভারত-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত বিবেকানন্দ-সাহিত্যের শুভসূচনাও উদ্বোধনের এই 'প্রস্তাবনা'য়, নামান্তরে যা 'বর্তমান সমস্যা।' এই 'উদ্বোধনে'র লেখকরূপেই স্বামীজীর মৌলিক বাংলা-রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ আবির্ভাব। সে আবির্ভাবে চলতি গদ্যের ধারা যেমন সজীব ও প্রাণবন্ত, সাধুগদ্যের ধারাও তেমনি স্থিতধী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী গদ্যরীতির অনন্য উদাহরণ।

'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। তবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশকালের দিক থেকে 'বর্তমান ভারত'ই প্রথম অধিকার দাবি করতে পারে।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৩

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথমবর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকেই 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত, সেক্ষেত্রে 'পরিব্রাজক' নামান্তরে 'বিলাতযাত্রীর পত্র'রূপে 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত। কালের হিসাবে সাধুগদ্যের লেখক বিবেকানন্দই ধীরে ধীরে তাঁর 'পত্রাবলী' এবং 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাব্‌বার কথা'র রসরচনাগুচ্ছ প্রভৃতির মাধ্যমে চল্‌তি গদ্যের লেখক হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাধুগদ্যের সংহত বিন্যাস 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনায় পর্যন্ত স্বাক্ষর রেখেছে। 'পত্রাবলী' বাদ দিলে সাধুগদ্যের রচনা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের স্বল্পসীমায় বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে রয়েছে।

'পরিব্রাজকে' স্বামীজী তাঁর বিশ্বভ্রমণের সঙ্গী করেছেন বাঙালী পাঠককে; 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' মূলতঃ এই বিশ্ববীক্ষার আলোকেই— ভারত ও য়ুরোপের জীবন, আদর্শ ও সাধনার তুলনামূলক মূল্যায়ন। ('বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দ সন্ধান করেছেন ভারত-ইতিহাসের চিন্তন-প্রণালী বা ইতিহাসের দর্শন। সুতরাং তথ্য নয়, তত্ত্বগত ইতিহাস-অভিজ্ঞানরূপে 'বর্তমান ভারতে' যে ভারতাত্মার সংক্ষেপিত ইতিহাস বর্ণিত, তার ভাষা মৌখিক রীতির চলতি গদ্য না হয়ে মনন-ঋদ্ধ সুসংহত সাধুভাষা হওয়াই স্বাভাবিক।)

'বর্তমান ভারতে'র গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীর মন্তব্য—"বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেকস্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধ হয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমত প্রয়োগ করিয়াছেন।"[১] বাস্তবিক পাশাপাশি এই তিনটি গ্রন্থে স্বামীজীর ভাষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার অনায়াস কৌশল দেখলে দক্ষ ভাষাশিল্পী হিসাবে স্বামীজীর প্রতিভা-বৈচিত্র্য আমাদের মধুসূদনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথা মনে পড়ায়।

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১২০

মধুসূদনের সঙ্গে আরো একক্ষেত্রে স্বামীজীর মিল—সাহিত্যে আত্মনিয়োগের স্বল্পকালীনতায়।

মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই সমকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ। বিবেকানন্দের মতো ক্রান্তদর্শী পুরুষই অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে অখণ্ডকালচেতনায় ইতিহাসকে বিধৃত করতে পারেন। বৈদিক যুগের ভারতীয় জীবনধারা থেকে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর কর্তব্য-নির্ণয় অবধি বিশাল বিষয়বস্তুকে একটিমাত্র নিবন্ধের পরিসরে আবদ্ধ করতে গিয়ে যে বৈদান্তিক-সুলভ সংযম স্বামীজী অবলম্বন করেছেন, তার দ্বারা বাংলা গদ্যের অর্থগূঢ় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে 'বর্তমান ভারত' বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কিন্তু এই গদ্যরীতিই প্রজ্ঞাদীপ্ত অনুভূতির আলোকে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়কে নূতন তাৎপর্যে পাঠকমানসে উদ্ভাসিত করেছে। সবার উপরে স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসীর অন্তরে ভারতের মাটি, মানুষ, জাতি, ইতিহাস, আদর্শ ও সাধনা এক বিপুল আবেগে আলোড়িত হয়ে নবভারতের স্বদেশমন্ত্ররচনা করেছে। একে একে এ জাতীয় গদ্য-রচনার উদাহরণ—

'বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান-ভোজন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে?"[১]—বৈদিক যুগের পুরোহিত-কেন্দ্রিক ভারত-সভ্যতা।

ইংরেজ-শাসনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ—"যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাবলের ন্যায়—তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ২২২

ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।"[১] এ বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত বিশালদৃষ্টি ও সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সমন্বয় কী অনায়াসে সাধিত।

পাশ্চাত্যের ময়ূরপুচ্ছধারী সমকালীন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজীর ধিক্কারবাণী ও পন্থানির্দেশ—"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে —দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ-জাতি, উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!"[২] পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমায় সমগ্র ভারতের সঙ্গে তাঁর যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল, সে আত্মীয়তাবোধ আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে আজও দেখা দেয় নি বলেই তাঁর এই গণচেতনাময় ঈষৎ ব্যঙ্গে চকিত কণ্ঠের বেদনা ও ভর্ৎসনা-মিশ্রিত আহ্বান আজো 'বর্তমান ভারতে'র পাঠককে স্তব্ধ ও আত্মানুসন্ধানী করে।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বিবেকানন্দের সাধুগদ্য আপন পৌরুষস্বাতন্ত্র্যের ঋজুতায়, বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাসদৃষ্টির উন্মীলনে এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনমন্ত্রের দুন্দুভি-ধ্বনিতে আজও বাংলাসাহিত্যের পাঠককে যে পরিমাণ প্রেরণা, পথনির্দেশ ও সর্বোপরি মননশীল গদ্যরচনার সংকেত দিতে পারে, সে কথা মনে রেখে বাংলা সাধুগদ্যের কাছে আমাদের জাতীয় ঋণস্বীকারে শ্রদ্ধাবনত হওয়া একান্ত সঙ্গত ও প্রার্থনীয়।

১, ২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৩০-২৩১; ২৪৮-২৪৯

স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী"[১]

মানবমনের দুটি আয়না—চোখ আর চিঠি। আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সব চেয়ে বেশি ধরা দেয় চোখের আলোয়, লেখকের অন্তরের কথা তেমনি সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। 'Style is the man' কথাটি পত্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে বোধ করি সবচেয়ে প্রযোজ্য। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিটির মুখচ্ছবি আমরা চিঠিতেই প্রকাশিত দেখি। বলা চলে—'Letter is the man'. বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বিশালতাই আমাদের সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে, সন্দেহ নেই। তাঁর চিঠি যতটা ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক তার চেয়ে ভাবসত্তার বাণীবহ। বিশেষভাবে প্রথম যুগের রবীন্দ্র-পত্রমালা পববর্তীকালে যেভাবে তথ্যে, তত্ত্বে, বক্তব্য-উপস্থাপনায় প্রায় প্রবন্ধপর্যায়ী হয়ে উঠেছে, তাতে করে অনায়াসেই পত্র ক্রমে গ্রন্থাকারে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের অমূল্য উপকরণ হলেও মনে রাখতে হবে, পত্রের প্রত্যক্ষস্পর্শ ও সীমায়িত ভঙ্গিমা তাঁর শেষযুগের অধিকাংশ পত্রেই অনুপস্থিত।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং একেবারে মুখের ভাষার মতোই দ্রুতচলনে তার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাই, তাঁর গদ্যেও গতিবেগ সঞ্চার করেছে। চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্ন ভাষা ইস্পাতের শানিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে। চিন্তার দিক থেকে বেদান্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জীবনের দিক থেকে কোলকাতার কথ্যভাষার সঙ্গ—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে। জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তাঁর দৃষ্টি, তবু মূলতঃ তিনি সন্ন্যাসী—এ কথাটি তাঁর চিঠিতে পরিস্ফুট; অথচ এ সন্ন্যাসের একটি মূল আদর্শ 'জগদ্ধিতায়'

---

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম খণ্ড

—আধুনিককালে যার নাম "বিশ্বপ্রেম"। স্বদেশ, স্বজাতি, সেইসঙ্গে সর্বমানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধ্বনি তাঁর চিঠিপত্রের মানস-পরিমণ্ডলে অনাহত সুরে বেজে চলেছে—একটু কান পাতলেই শোনা যায়। এ প্রবন্ধে অবশ্য আমি কেবল বাংলায় লেখা চিঠিগুলির আলোচনা করব—বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই। ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ। যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী যেভাবে অনুকৃত হয়েছে তা বিস্ময়কর।

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর পত্রাবলী তাঁর জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক গূঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে; এই পত্রাবলী তাঁর জীবনীরচনার অপরিহার্য উপাদান।

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস আর একদিকে সুগভীর মানব-প্রীতি —এই দুই সম্পদে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষা সমুজ্জ্বল। চলতি ভাষায় সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে "পরিব্রাজক" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই দুটিতে স্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ করেছেন, পত্রাবলীতে সেই কৃতিত্বের সূচনা ও পরিণতি। তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রাঙানো এই চিঠিগুলি আমাদের সুখদুঃখময় অন্তর-চেতনার সঙ্গে অনায়াসে যোগস্থাপন করে। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন, আজ তাঁদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই পত্রালাপগুলির মূল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবলীতে তাঁর বৈপ্লবী-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিবেকানন্দকে পাওয়া যায় তাঁর "পত্রাবলীর"র পৃষ্ঠাতেই।

১৮৮৯ এর ৪ঠা জুলাই তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা একটি চিঠিতে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়—"আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট।...কখন কখন কলিকাতার

নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে। তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।...কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।—'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.

আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরাপহত হয়—For 'we have taken up the cross, Thou hast laid upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.'—Imitation of Christ.'[১]

*

"তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।"[২]

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার প্রতি কী অমেয় ভালবাসার বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সন্ন্যাসীকে মোচন করতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর। ঐ চিঠিরই আরেক অংশে বুদ্ধপ্রসঙ্গে আছে—"যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।...বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৮৮

২ তদেব : পৃঃ ৩১৩-৩১৫

তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই।”[১]

ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁর অনুভূতি—“…রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবের জন্য এ জগতে আর নাই।…তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই।”[২] ব্যক্তিগত অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে,—“Love is the gate to all the secrets of the universe”—দেবর্ষি নারদের ভক্তিসূত্রে আছে—তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ; মহাকবি দান্তে অনুভব করেছিলেন—‘Love that moves suns and stars’। জীবনশতদলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মতো মহামানবদের জীবনে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই এঁরাই মানবজাতির আদর্শ—তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবজ্যোতি।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি ঐ অতুলনীয় সহানুভূতিকেই বুঝ্‌তেন বলে ‘জীবে দয়া’র স্থলে ‘জীবে প্রেম’ তাঁর জীবনে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন—

“মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কাম করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।”[৩]

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩১৩-৩১৫
২ তদেব : পৃঃ ৩২০-৩২১
৩ তদেব : পৃঃ ৪১২

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি কেবল চিন্তনীয় তত্ত্ব নয়। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা উনিশ ও বিশ উভয় শতকের বাঙালীর পক্ষেই অনন্য আদর্শ। সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা তাঁর পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত—"Life is ever expanding, contraction is death (চিরসম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু।) যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি কর্‌ছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)।"[১]

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে। বিশেষ করে বাঙালী শিক্ষিতমন্যের কাছে অন্যের নেতৃত্ব অসহনীয়। "ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সম্মিলিতভাবে কাজ করবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।"[২] এই ঈর্ষার অনলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দগ্ধ হতে হয়েছে—আজ অবধি এই স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমরা নেতৃহীন হয়ে আছি।

কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচনা তো ভাঙনমুখী নয়, গড়নমুখী। তাই নবযুগের কর্মপন্থা নির্দেশ করে লিখেছেন—"পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব' আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।"[৩]

সত্যিকার অধ্যাত্মধর্মচেতনা ভারতবর্ষের কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু ধর্মের নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায়

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৪ (গ্রীষ্মকাল)-এর চিঠি; বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৫৭

২ তদেব: তারিখ ১৮৯৪: বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ২৭

৩ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা ১৮৯৪এর চিঠি: বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩০

অধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়াটা এদেশের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। দেখে শুনে স্বামীজীর মন্তব্য—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন কেবল আছে ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না! দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।"[১]

এই ছুঁৎমার্গী সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়, উপনিষদ-প্রতিপাদিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল রূপ এ কথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি বেদান্তচর্চার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সেবামূলক কর্মশক্তিকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ স্মরণীয়—

"আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।...ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম।"[২]

আর এই পরোপকারের জন্য যে বিপুল প্রাণশক্তি চাই, তার জন্য প্রয়োজন অনন্ত আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই জ্বলন্ত বিগ্রহ। "যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।...যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে "নির্গচ্ছন্তি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।"[৩] এই পাশমুক্ত কেশরীর নির্ভয় বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নির্বীর্যতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৪ সালের চিঠি : বাণী রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৫১-৫২

২, ৩ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৫ সালের চিঠি : বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১২১-১২২

চেয়েছিলেন—তাঁর ইংরেজী, বাংলা সব জাতীয় রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"...আসল কথা ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?...একঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে...তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার!"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলে দুটি দেবতার—বস্তুত একই দেবতার দুটি রূপ আমরা দেখ্‌তে পাই। একজন "উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর", আর একজন "মাতৃরূপা কালী"। শ্মশানচারী এই দুই দেবতার মধ্যে তাঁর বৈরাগ্যপূত শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সম্মিলিত প্রকাশ দেখি 'নটরাজ'-প্রতীকের মাধ্যমে। তাঁর 'নৃত্যের তালে তালে' 'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' 'Kali the Mother' প্রভৃতি কবিতায় আমরা শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতেও জগন্মাতার নামোচ্চারণ করে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি—"আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার যেন মনে না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে! মাভৈঃ! জয় কালী! জয় কালী!"[২]

মহাশক্তির উপাসক বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন জাতির মনে আবার শক্তিসঞ্চার করবার জন্য প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষাদর্শ—"কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের মনে রাখিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম, কেন এ পার্থক্য হইল?

---

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখের চিঠি: বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০-৮১

শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউয়র্কে দেখিতাম Irish colonist (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই, কেন এমন হল ? আমার বেদান্ত বলছেন যে ঐ Irishmanকে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল "প্যাট্ তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—"প্যাট তুইও মানুষ, আর আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ !" প্যাট ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত ; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইত্যাদি।"[১]

আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বেদান্তের শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করার কী আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবন্তভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্যের এই রজোগুণাত্মক শক্তিকেই তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রজোগুণের অর্থ তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, 'পরহিতায়' সর্বস্ব সমর্পণের আনন্দ। সমগ্র স্বদেশী যুগ জুড়ে বাঙালী যুবকদের আত্ম-দানের আদর্শে এই রজোগুণের আহ্বানকেই আমরা সফল হতে দেখেছি।

১ 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লেখা ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩২৬-৩২৭

তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বস্বত্যাগ করে নিষ্কাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপর দেশগত প্রেম, বিশ্বানুভূতি তারও পরের কথা।

"একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

"অতএব একজনের জন্যে আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়, সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখন কাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখন আলোকের মানে হয়?

"সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।"[১]

ব্যক্তিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হবার মূল্য মানুষকে দিতে হয় কঠোর বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। দুঃখের ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার "অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।" "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছিল? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় ব্রহ্মদর্শন হয়।"[২]

স্বামীজীর বিখ্যাত "বাঙলা ভাষা" প্রবন্ধটিতে চলতি গদ্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত

১, ২ শ্রীমতীমৃণালিনী বসুকে লেখা ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ১৭০

ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।"[১]—ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে। পত্রাবলীর রচনাভঙ্গীই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরিচায়ক ;—সে মানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্যে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল,—মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে শাশ্বতসত্যের চিরন্তন দিশারী।

প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর পত্রমালায় এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব পাঠককে আচ্ছন্ন করে থাকলেও আনন্দে বেদনায় পরিহাসে অশ্রুজলে একান্ত অন্তরঙ্গরূপেও তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়ান। মাঝে মাঝে তাঁকে অশান্ত, অধীর মনে হওয়া স্বাভাবিক। হয়তো বিপুল কর্মভার ও সে অনুপাতে সীমাবদ্ধ জীবনকালের সচেতনতাই তাঁকে এতো অস্থির করে তুলেছে। সেইসঙ্গে পবপদানত স্বদেশবাসীর বেদনা, এমন কি জগতের যত নির্যাতিত মানুষের হাহাকার সবই তাঁর অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু সব বিদ্রোহ অবশেষে জগৎরহস্যের অন্তরালে ইচ্ছাময়ীর অপার ইচ্ছাসমুদ্রের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কর্মে ও ধ্যানে, সংগ্রামে ও সাধনায়, আপাত রূঢ়তায় ও পরমকল্যাণকামনায়, স্বদেশ-স্বজাতি-প্রীতিতে ও বিশ্বমানবিকতায়—যে অসঙ্গতির সম্ভাবনা সে সবই বিবেকানন্দের তীব্র ব্যক্তিত্বে বিগলিত হয়ে দিব্যবাণীর রূপলাভ করেছে। বিবেকানন্দ-বাণীর মণিভাণ্ডার তাঁর পত্রাবলী। কিন্তু এই বাণীর অন্তরে রয়েছে তাঁর মতো নরেন্দ্র-ব্যক্তিত্বশালী যুগনায়ক।

গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি—"জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়। তারা যাকে পছন্দ করে তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনবে, তা যত অসারই হোক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না।...যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম

১ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে উদ্বোধন সম্পাদককে লেখা পত্রাংশ।

হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। কথাগুলি রুক্ষ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাসা মানুষ আপনা হতেই বুঝতে পারে।"[১]

শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে লেখা অনেক চিঠিতেই স্বামীজী যে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার অন্তর্নিহিত সর্বজয়ী ভালবাসার স্বরটি তাঁরা অনায়াসেই ধরতে পারতেন বলেই এই সব পত্র তাঁদের আদর্শগত প্রেরণার অমূল্য পাথেয় হয়ে উঠেছিল। এ জাতীয় পত্রের দু'একটি উদাহরণ—"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের —মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'সব কি আধ ঘণ্টা ব'সব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গাবদ দেশময়।"[২]

স্বামীজীর আমেরিকাবাসকালে এদেশী গোঁড়া পণ্ডিতের দল যখন তাঁর সমুদ্রযাত্রা, আচারবিচারের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি নিয়ে সমালোচনা শুরু করেন, সেই সময়কার একটি চিঠিতে তার নির্মম প্রতিক্রিয়া—"রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। 'লোক না পোক'। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর দিক মাড়াবে না। Orthodox (গোঁড়া) পৌরাণিক হিন্দু আমি

---

১ পত্রের এই অংশটি অনুবাদ। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৪৪

২ মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে ১৮৯৪ সালের পত্র : তদেব : পৃঃ ৪৮

কোন কালে ; বা আচারী হিন্দু কোন কালে ? I do not pose as one (আমি তেমন কোনো ভান করি না) বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে পরিপোষণ করছে—অহ হ !!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না ? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি ? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর জন্মে ওদেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা ! বাঙলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ ? ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে।"[১] অথচ এই 'বাঙালী'র বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর কত উচ্চধারণা।[২] আসলে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মজ্জাগত তমোগুণের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর রজোগুণাদর্শের সংগ্রাম। সঙ্ঘ-স্থাপনে নিয়মানুবর্তিতা ও আজ্ঞাবহতার গুরুত্বসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে স্বামীজী লিখছেন—

"প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন ! দু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ !!! বাপু হে তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে ক'রো যে, থাকলে দিনে প্রকাশ হ'ত। তিনি নিজেই বলতেন, নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে—ঐ নরকের মূল 'অহঙ্কার'। 'আমিও যে, ও-ও সে—বটে রে মধো ?' 'আমাকে তিনি ভালবাসতেন'—হায় মধুরাম, তা হলে কি তোমার এত দুর্গতি হয় ?…এখনও উপায় আছে সাবধান।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যেও কোনো অহংভাব পাছে এসে পড়ে, নেতৃত্বের বাসনা পাছে

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৫ সালের পত্র : বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৮-১৬৯

২ দ্রঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ সালে 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর' বক্তৃতা : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২১৫

৩ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬-এর চিঠি। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৪৪।

তাঁদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, এ বিষয়ে স্বামীজী তাঁর পত্রাবলীতে বার বার করে সাবধান করে দিয়েছেন।

স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণব্রতে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণের সঙ্কল্পে কী দুরন্ত প্রাণশক্তির আধারে পরিণত, তার উদাহরণ —"সমাজকে জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক প্রেরণাপূর্ণ) করতে হবে। বসে বসে গপ্পিবাজি আর ঘণ্টার নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম।...তোমাদের কাজ distribution and propagaion of thought crurents. (চিন্তাপ্রবাহ প্রচার ও সঞ্চার করা) তাই যদি পারো, তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার ক'রে খাওগে..."

"Life is ever expanding, contraction it death. (জীবন চির প্রসারণশীল, সংকোচনই মৃত্যু।) যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহা সন্ধি পূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পারো—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালোয় ভালোয়।"

"...এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তার ভিতর আমার spirit আসবে, বিশ্বাস কর।"[১]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অধিকাংশ এমনি প্রেরণামণ্ডিত হ'লেও 'পত্রাবলী'র মতো এত প্রত্যক্ষ প্রাণশক্তির উদাহরণ তাঁর রচনায়ও অন্যত্র দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরণায় তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ কেমন করে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, পত্রাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাসে তারই স্বাক্ষর।

"যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও,—দুনিয়া তোমার

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৪ গ্রীষ্মকালের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৬৬-৪৬৭

পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। 'Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out.' (নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সব শক্তিই তোমার অন্তরে। সচেতন হয়ে সেই শক্তিকে প্রকাশ কর।) বল্ আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়'। খবরদার No 'নেই নেই'; বল্—হ্যাঁ হ্যাঁ, 'সোঽহং সোঽহং'।"[১]

এই চিঠিরই কিছুটা আগে স্বামীজী আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত বীরের আদর্শরূপে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—জগৎপাশমুক্ত নির্ভয় কেশরীকে স্থাপন করেছেন। 'পত্রাবলী' আমাদের মানস-অনুধ্যানে বিবেকানন্দের সেই দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। এ ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে বেদান্তশাস্ত্রমন্থনের ফলে লব্ধ মন্ত্র 'অভীঃ'। তত্ত্বতঃ এই 'অভীঃ' ও 'সোঽহম্' একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ। সেই সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষই নিখিলমানবকে এই অমৃতসত্যের বাণী শোনাবার ভারপ্রাপ্ত। আজকের ভারতের দৈন্য-দুর্দশা স্বীকার করে নিয়েই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের প্রাণমন্ত্র সঞ্চার করতে হবে। এ দেশের মহত্তম ভাবসত্যের জয়গান করেও স্বামীজী জানতেন, "কৃতকর্মতা (Practicality) আদৌ নাই।"

"উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি, মহা নিঃস্বার্থ কর্ম ভারতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৫৮৯

আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না।...আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেহ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে।"[১]

কিন্তু ভারতে গণজাগরণের আন্দোলন গড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। কারণ—"যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না; এইজন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই।"[২]

'দরিদ্র নারায়ণে'র সেবার পরবর্তী অধ্যায় তাই 'মূর্খদেবে'র উপাসনা। শিক্ষা অর্থে তত্ত্বমূলক বা ভাবমূলক শিক্ষা শুধু নয়, ব্যবহারিক, অর্থকরী ও জীবনসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষার কথাই স্বামীজীর মনে জেগেছে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে সে কথা তিনি লিখেছিলেন—"দাদা এই সব দেখে —বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর ব'সে—

১ 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লিখিত: ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের পত্র। বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩২২-৩২৪

২ তদেব: তারিখ ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৬: পৃঃ ৩২৫

এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দুপা দিয়ে দলেছে।"[১]

একদিকে এই বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে আত্মপ্রত্যয় ও মৌলিকতার উদ্বোধন সে সম্বন্ধে স্বামীজীর সচেতনতা—"বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয় তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইতেছে, যাহার শাসনে নতুন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, তাহা কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন চিন্তা—চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।"[২]

এখানেও সেই রজোগুণের সংগ্রামে সদসৎ মিশ্রিত কর্মপন্থার প্রশ্ন। কাজ করতে গেলেই কিছু ভুলভ্রান্তি বা পাপ এসে পড়ে। নিষ্কর্মার জড়ত্বে আর সাধকের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে আকাশপাতাল পার্থক্য। ভারতের তথাকথিত সাধু, ফকির, গুরুর দল বহুযুগ ধরে সাধারণ-মানুষের অন্নে ভাগ বসিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রতিদানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অংশ নিতে চান নি। আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের ক্ষমতা খুব কম সাধকেরই থাকে। কিন্তু রোগে-শোকে-দারিদ্র্যে-অত্যাচারে জর্জরিত মানুষকে নরনারায়ণ জ্ঞানে সেবার অধিকার সকলেরই

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ৪১২

২ মৃণালিনী বসুকে লেখা ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখের পত্র: বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃ: ১৬৯

আছে। সেজন্য যে বিরাট অনুভূতিশীল হৃদয় প্রয়োজন, বিবেকানন্দ সেই হৃদয়ের প্রকাশ।

গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবা করতে গিয়ে একটি অনাথ-আশ্রম গড়ে তুলছেন, তখন সবচেয়ে মনোমত আদর্শের রূপায়ণে আনন্দিত-হৃদয় বিবেকানন্দ লিখছেন—"বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্যমাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। 'জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস' হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতানো—দেরী হবে; কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্যবল যদি থাকে তো নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?"[১]

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এই অতি আদরের বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুভ্রাতার হৃদয়ের মিলটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হয়তো তাই স্বামীজীর বেশ কয়েকটি শ্রেষ্ঠপত্র এই গুরুভ্রাতার উদ্দেশে লেখা। স্বামীজীর পত্র সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দজীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—"বোধ হয় ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই সময়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা মহাদেশে বেদান্তের বিজয়নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতের অতুল বৈভবে জগতকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন! সভ্য জগতের সকলেই তাঁহার মুখে ভারতের অতুল মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।...স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্বগৌরবকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি যেন পাশ্চাত্যজাতিসমূহকে মুগ্ধ করিয়া স্বয়ং বিমুগ্ধ হইতেন, তাহার বর্তমান দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার তেমনি ব্যাকুল

১ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখের পত্র: বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃ: ১০১

হইতেন এবং না জানি বিরলে বসিয়া কত অশ্রুই বিসর্জন করিতেন !··· যে মহান দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে রত হইয়াছিলেন, আমিও যথাশক্তি পর্যালোচনা করিয়া চতুর্দিকে সেই একই দুঃখেরই জীবন্ত বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সেই দিন হইতেই আমার কর্তব্যজ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিল এবং আমার হৃদয়ে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল পূজ্যপাদ স্বামীজীকে আমি তাহা অতি বিশদভাবে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিলাম। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না, তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে অতি সরলভাবে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া জানাইলাম। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের দ্বারা এই বিপন্ন জনসমাজের কিছুমাত্র সেবা হইতে পারে কিনা এবং সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে এরূপ কার্য সঙ্গত হইবে কি না, জানিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক একবার ইহাও মনে হইত, বুঝিবা তিনি আমাকে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া কেবল অধ্যাত্মচিন্তায়ই রত থাকিতে উপদেশ করিবেন ! কিন্তু কি আশ্চর্য যে, তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে অমিয় আশ্বাস ও অভয়-বাণীতে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল অমোঘ বাক্যে তিনি আমাকে দুঃস্থ ও জনসমাজের সেবায় জীবন গঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন আমার প্রত্যেক কথাটি পৃথিবীর অপরদিক হইতে বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়া দিল। দুর্বল সুপ্ত হৃদয় যেন বহুকালের পর মহাবল ধারণ করিয়া জাগরিত হইল। তাঁহার পত্রের যে কয়েকটি কথার মহাশক্তিতে আমার জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ধাবিত হইল, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত না হইলে আমার সংকল্পমাত্রই সার হইত এবং তাহা কখন কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ। স্বদেশের দুঃখে পূজ্যপাদ স্বামীজীর হৃদয় যে কতদূর কাতর ছিল এবং তাহার দুঃখ মোচনের

জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, তাঁহার মহান জীবনের প্রত্যেক কার্যেই আমরা তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।...তাঁহার পত্রের যে কয়েক পঙক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেই যে মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা আর কাহারও বাক্যে সম্ভবে না। "বহুজন-হিতায়" ও "বহুজনসুখায়" জীবন পণ করিয়া কার্য করিতে তিনি যে কেবল আমাকেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি সকলকেই সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে এবং আত্ম-ত্যাগই যে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ও চরম লক্ষ্য তাহাই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।...

আমাদের মধ্যে কেহ একটু সৎকার্য করিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সেজন্য তিনি যে কিরূপ আশাপ্রদ, মধুর বাক্যে উৎসাহিত করিতেন এবং প্রাণে প্রাণে তিনি যে কি মহাশক্তির সঞ্চার করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্র পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।"[১]

উদাহরণস্বরূপ যে পত্রগুলির কথা অখণ্ডানন্দজী উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলির কোনো কোনোটি আগেই আলোচিত। তবু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের যে পত্রটির কথা অখণ্ডানন্দজী উল্লেখ করেছেন, তার অংশবিশেষ এ আলোচনায় একান্ত প্রাসঙ্গিক— "...রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য হয় না।...

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর "হে প্রভু রামকৃষ্ণ" বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পারো।...

…ধর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। গুণনিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে।"[১]

সন্দেহ কি, এমন একটি পত্রের প্রেরণাই অখণ্ডানন্দজীর সমগ্র জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে। তাঁরই সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বামীজী নিজে এসব পত্রের গুরুত্ব ততটা দিতে চাইতেন না। সেকথা মনে রেখে অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন—'বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার সমুদয় পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সম্বলিত পত্রগুলি আমি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি দেখিয়া একদিন তিনি আমাকে কতই বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পত্র রাখায় যে কোনও লাভ নাই তাহাই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিরভিমানিতার কথা আর কি লিখিব, আমরা যে তাঁহার পত্রের গৌরব করিতাম, তাহাও তিনি দেখিতে পারিতেন না।"[২]

সমগ্র 'পত্রাবলী' অনুধাবন করলে গুরুভাইদের কাছে লেখা পত্রগুলিতে সঙ্ঘনেতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের আদি প্রচারক বিবেকানন্দের মানবপ্রেমিক সত্তাটি সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশিত দেখি। নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ বোধ করি নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করায়। নিজের পত্রের গৌরব না করা বিবেকানন্দের অনাসক্ত অন্তরের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ; আবার এই পত্রসাহিত্যের শেষপ্রান্তে এসে দেখি সঙ্ঘের নেতৃপদ থেকেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, এমন কি যে প্রচণ্ড কর্মমুখরতায় তাঁর জীবনের শেষ দশকটি অতিবাহিত সে কর্মস্রোত থেকেও মুক্ত হয়ে অধ্যাত্মজীবনের আদি

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০

২ স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (ভূমিকা) স্বামী অখণ্ডানন্দ : উদ্বোধন, ১৩১৩

উৎসে মহাপ্রয়াণের ব্যাকুলতা ধ্বনিত। একদিকে বাস্তব-সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নিশ্চিত আশ্বাস—'সমাধির ঘরে চাবি দেওয়া থাকল, সময় হলে খুলে দেওয়া হবে।' ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণী শ্রবণের পর থেকেই বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের এ রূপান্তরের কথা তাঁর জীবনী-পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু 'পত্রাবলী'তে তাঁর শেষযুগের লেখনী এমন এক বেদনাধূসর পটভূমিতে অস্তগোধূলির অভিযাত্রী-হৃদয়ের রঙ ফুটিয়ে তুলেছে, যার তুলনা তাঁর রচনায় আর কোথাও নেই। বিবেকানন্দের কবিসত্তার প্রকাশরূপে এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রের অংশবিশেষ—"যতই যাই হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক। তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়!' যাই প্রভু যাই!···আমি যে জন্মেছিলুম, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরোনো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।··· তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির শান্ত! আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে আমার কর্মের ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা আসত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই, মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।”[১]

এ চিঠির মাস তিনেক পরে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী (স্বামীজীর ‘হরি-ভাই’)-কে প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখছেন—“···লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনকষ্ট। কাজেই

১ বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃ: ১৩১-১৩৩; ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা পত্র। স্বামীজীর মূল ভাব বজায় রেখে এই বিস্ময়কর অনুবাদটি যে অপূর্ব বাংলারূপ নিয়েছে, সেজন্য অনুবাদক আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

…সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি।…আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, বস্। গুরু মহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি।…আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম।”[১]

জীবনের শেষ পর্বে বিবেকানন্দের সংগ্রামীচেতনা পরমাশান্তির নির্বৃতিতে সমাহিত হতে চলেছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দরুন একটু ব্যথা একটু আহত অভিমান হয় তো কোথাও ফুটে ওঠে, কিন্তু শেষ অবধি সেই প্রার্থনা 'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।'

শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রটির মাত্র কিছুদিন আগে স্বামীজী তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ পত্র লিখেছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহের বিদেশিনী ভগিনী শ্রীমতী মেরী হেলকে। বিবেকানন্দের অন্তরতম সত্তার পরিচয়-উদ্‌ঘাটনে মেরী হেলকে লেখা পত্রগুলি বিশেষ সহায়ক। তবে আলোচ্য পত্রটি (সানফ্রান্সিস্কো থেকে ২৮শে মার্চ, ১৯০০ তারিখে লেখা) আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় বিবেকানন্দের আত্মদর্শনের পরিচায়ক আর একটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ রচনারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

"আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই তা গর্জন শুরু করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অচঞ্চল থাকবো। সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই উর্ধ্বে।…গত দুবছর ধরে মৃত্যু-উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। এখন আমি সেই—শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। 'যিনি আত্মতুষ্ট, যিনি আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ১৫০-১৫১

স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই।…'চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব'—এই হ'ল বেদান্তবাদ। এতকাল আমি এ তত্ত্বটি প্রচার করছি। তবে আঃ, কী আনন্দ!… এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যাঁ, তাই—'আমি মুক্ত'। আমি একা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

সচ্চিদানন্দে মগ্ন তোমার চিরকালের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি কখন মন্দকে উপভোগ করেছ…ভাল-মন্দ দুইই আমার কাছে উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট্; দুই-ই আমার খেলা, আমারই কৌতুক। "যতদিন দুই আছে ততদিন ভয় তোমাকে ছাড়বে না।…সাহসী হও, সব কিছুরই সম্মুখীন হও, ভাল আসুক, মন্দ আসুক, দুটিকেই বরণ করে নাও, দুইই আমার খেলা। আমার লভ্য ভাল বস্তু কিছুই নেই, ধরে থাকবার মতো কোন আদর্শ নেই, পূর্ণ করাব মতো কোন উচ্চাভিলাষও নেই; আমি হীরের খনি, ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেলা করছি।… আমার সামনে দুনিয়াটা উল্টেপাল্টে গেলেই বা আমার কি আসে যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শান্তি; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই দিতে পারে। আমি তার বাইরে, আমি শান্তি।[১]

বি—

(মূল ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ)

সুখে দুঃখে অচঞ্চল এই ব্রহ্মতন্ময়তার আদর্শই জীবন্মুক্তের সাধনা এবং সাধ্য। মাত্র চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবেকানন্দের জীবনবৃত্তের সেই কেন্দ্রসত্যটি তাঁর নিজের কাছে উজ্জ্বলতমরূপে উদ্ভাসিত। পত্রসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ব্যক্তিসত্তার জীবনদর্শন। একের সঙ্গে আর একজনের অন্তরঙ্গ আলাপচারীতে

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ২২৪-২২৫

ব্যক্তিমানসের যে বিভিন্ন মুহূর্তগুলি মুকুরিত হতে থাকে, তার সামগ্রিক সার্থকতা একটি অখণ্ড জীবনদর্শনের পটভূমিকায়। বিবেকানন্দ-পত্রাবলীর প্রথম থেকে শেষ অবধি মানবপ্রেমিক, সংগ্রামী সৈনিক, বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারে নিপুণ ঐতিহাসিক, একাধারে চলতিভাষার জীবন্তরূপ ও সাধুভাষার মননঋদ্ধচেতনা-সম্পন্ন যে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাই, তিনি মূলতঃ অদ্বৈতসাধক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-নির্বাচিত বাণীবহ বিবেকানন্দের মানস-উত্তরণের বহু বিচিত্র স্তর-পরম্পরার সামগ্রিক প্রকাশে তাই 'পত্রাবলী'ই প্রধান চাবিকাঠি।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্বসমুজ্জ্বল পত্রসাহিত্যে মধুসূদন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা পাশাপাশি মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। মধুসূদনের পত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, সেই সঙ্গে তাঁর বিদ্রোহী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বেরও শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। বিবেকানন্দের বাংলা পত্রাবলীই আমরা প্রধানতঃ আলোচনা করলেও কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর ইংরেজী পত্রাবলীর ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব আরো ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের পত্রসাহিত্য তাঁর কবিসত্তার পরিচয়কেই প্রাধান্য দিলেও মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিপুল মানসবিস্তারের তা শিল্পসমৃদ্ধ সাক্ষী।

তবু বাংলা ও ভারতের নবজাগরণে বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদানের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলা সাহিত্যে তা নিঃসংশয়ে অনন্য উদাহরণ।

বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিস্ময়ে অর্জুন বলেছিলেন—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

"আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অন্তহীন রূপ, অনন্তবীর্য তুমি, অনন্ত তোমার বাহু, চন্দ্রসূর্য তোমার দুই নেত্র, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তপ্ত করে তুলেছ। হে বিষ্ণু, নভস্পর্শী অনেকবর্ণ তেজোময় তোমার ব্যায়ত মুখমণ্ডল আর দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে আমার ধৈর্য ও শান্তি। মরণের আহ্বানে যেমন করে পতঙ্গেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে।" (গীতা ১১।১৯, ২৪, ২৯)

জগৎ-কারণের এই মহাকালমূর্তির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অর্জুনের মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন তুলেছিল—"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো"—উগ্রমূর্তি কে আপনি আমায় বলুন। উত্তর এল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—আমি লোকক্ষয়কারী কাল! তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবু বিপক্ষদলে যে বীরেরা আছেন তাঁরা কেউ বেঁচে থাকবেন না।" "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"—অতএব, তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর।

বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র—এ দু'য়ের পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন পূর্ণাঙ্গ। মনে হয়, চিরায়ত-সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও বৈরাগ্য, কুসুম ও বজ্র সেখানে পাশাপাশি দেখা দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য—"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা

এলোকেশী।" কিন্তু রুদ্রের তো বামমুখও আছে। 'মঙ্গল ও অমঙ্গল—এ দু'য়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। তাই দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, দুঃখের মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে দুঃখমূর্তি ভগবানকে চিনে নিতে হবে।[১] তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, সংগ্রামের উপরে মানবাত্মার জয়-ঘোষণাই স্বামীজীর কবিতার ব্যঞ্জনা। "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ"—"জাগো বীর"—এই তাঁর কবিতার মূল সুর, এর ছন্দ "প্রাণ" এবং দেবতা "মহাকালী।"

বাংলার ঐতিহ্যে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মতো ব্যাপ্ত সমগ্রানুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ উনিশ শতকের আগে বৃন্দাবনলীলার বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণজীবনকে আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকে তন্ত্র-সাধনার দিব্যালোকে বাঙালী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ-বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥

দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামূর্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে বাঙালী-হৃদয় যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্যদিকে শাক্ত সাধনার যুগ্ম ধারায় বাঙালী-হৃদয় অভিসিঞ্চিত।

১···God manifests through evil as well as through good··· the true attitude of mind and will, that are not baffled by the personal self, was in fact that determination, in the stern words of the Swami Vivekananda, to seek death, not life, to hurl oneself upon the sword's point, to become one with the Terrible for evermore. (The Master as I saw Him : Complete works of Sister Nivedita. Vol 1. p 117)

অধ্যাত্ম-সাধনার অন্তরালে যাঁরা মানবকল্পনার ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তাঁরাও বাঙালীর এই কালিকাপূজার ধ্যানস্তোত্রে একটি নূতন সত্যের ইঙ্গিত পাবেন। মাধুর্যমণ্ডনের দিকে বাঙালী মনের সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখদহনের তপস্যায় জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টাও তার জাতীয় ঐতিহ্য। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের মূলকারণটিও এইখানে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও আমরা জীবনানুভূতির সকল বিকাশে পরম সত্যের প্রকাশকেই অনুভব করতে চেয়েছি। আমাদের কালিকামূর্তি একদিকে খড়্গ-মুণ্ডধরা বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা।

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্য নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কবি দেখতে পেয়েছেন—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি!' এই মাতৃসাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সূচিত করে গিয়েছেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যেমন 'চৈতন্য'-ভাবনার পরিমণ্ডল রচনা করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির গানে তেমনি 'রামকৃষ্ণ'-ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে এই সংগীতের ব্যাকুলতা সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তারপর একে একে সকল মতের পরিক্রমা শেষ করে অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে দ্বৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব! উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের একটি মাত্র দিক—নিরাকার-সাধনার দিক—শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে সাকার থেকে নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে—'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'-র পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী। ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যকে যাঁরা বুদ্ধির নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁরাও অনন্তলীলাময়ের মাতৃ-সত্তাকে প্রণাম জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসবার পর থেকে।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতিপ্রিয় সংগীতগুলি স্মরণীয়ঃ যেমন—'আমায় দে মা পাগল করে', 'চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী'। সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্ব সুন্দর উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন—"আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হ'ল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হ'ল!"

(আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই জানেন গভীর অনুভূতি বাক্যমনের অগোচর—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।' আমরা তার আভাস পাবার চেষ্টা করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই সাহিত্যানুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি সাহিত্যিক উপাদান—শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য উপাদান। কেবল যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া যায় তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও এর কম বেশি অনুরণন কান পাতলেই শোনা যায়। অধ্যাত্মচেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য। তাঁর পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক নজরুল ইস্‌লাম, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কল্পনালব্ধ সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পার্থক্য থাকবেই।

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কতখানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে। তা ছাড়া আরো বহুজনের স্মৃতিতে তাঁর বাণী

চিরমুদ্রিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে পাই—"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, 'মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন'।" এই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, সমাধি থেকে অভ্যুত্থানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসীমরাজ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চাইতেন সসীমরাজ্যের কানে।

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবদুপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু পদে পদে সংশয়, সঙ্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে। অবশেষে একদিন যখন তিনি মহাজীবনের মোহানায় এসে ভুমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে মনে করিয়া দিলেন—"কোথায় কালে বটগাছের মত শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ছোট আদর্শ তোর!" কিন্তু তবু অনুভূতির স্পর্শ চাই—তা না হলে কল্যাণকর্মের পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।"

"একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশ কাল-নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।...বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ-রূপে কামশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব,

অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব' এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।"[১]

ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি সর্বজীবে দর্শন করলেন। উচ্চারিত হ'ল নবযুগের নূতন মন্ত্র—"দরিদ্রনারায়ণ"।

অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহা থেকে মন্দ্রিত হ'ল 'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি'র সুর:

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্মনসোগোচরম্' বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা নেমে এল বিশ্বজনের সেবামন্ত্র নিয়ে—

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(সখার প্রতি)

বেদান্তের এই কর্মপরিণত রূপদানই মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সমাধিলোক থেকে নেমে এসে যাঁরা মানবকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন তাঁরা সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্মসত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যই নিষ্কাম সেবব্রত গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পার্থিব সত্যের সঙ্গে অপার্থিব সত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। সুতরাং নবযুগের বেদান্ত-সাধনা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার গুহা

ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি।

স্বামীজীর কবিতা আলোচনার আগে তাঁর মননধারার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট ছিলাম। এবারে তাঁর সমকালীন বাংলাকাব্যধারার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। মধুসূদনের আবির্ভাব যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কত বড় যুগান্তর সেকথা সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'মেঘনাদবধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের সেরা মনীষিবৃন্দ। রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু একদিকে এই অভিনন্দনের সমারোহ থাকলেও গতানুগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিত-সমাজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। "ছুছুন্দরী-বধ" —রচনা করে জগবন্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির আত্মব্যঙ্গ। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, কিশোর রবীন্দ্রনাথও 'মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে মত বদলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, মেঘনাদবধকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত মনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ।" (জীবনস্মৃতি)

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের অভিনবত্ব ধরা পড়েছিল এইভাবে—"মেঘনাদবধকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।...তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।...এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা

অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।...যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র-তীরের শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্য-লক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

এখন মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত স্মরণ করা যাক। মধুসূদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"..."তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে. ওজস্বিনী ভাষায়, যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?"[১]

'মেঘনাদবধকাব্যে'র কোন্ অংশটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য—"যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমান হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : উত্তরকাণ্ড : শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ২১১

পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন।"

মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-যোগ্য—

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী ?

বাঙালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সেদিন

প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস—বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। বস্তুত যা কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে পেতেন। 'পত্রাবলী'তে তাই তিনি লিখেছেন "—যদি জন্মেছ ত' একটা দাগ রেখে যাও।" "Avalanche-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে···।" তাই মেঘনাদবধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার পরিচয় আছে তাঁর কবিতার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ বয়সে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীর-রসের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার দাবি করত। বঙ্কিম-চন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়ী (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম) এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী' 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে—বাংলা-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজাতির নব-উৎসাহ-সঞ্জাত বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব! বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে তাঁর দৃপ্ত-পৌরুষে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাবোধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় দৈন্যদুর্দশার উপলব্ধি তাঁর অনু-ভূতিকে স্পন্দিত করেছে। আবার আত্মস্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার জয়ঘোষণা তাঁকে দেশকালের ঊর্ধ্বে সর্ব-মানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে। জীবনরহস্যের আলো-

ছায়াসম্পাতে বিবেকানন্দের মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মহনীয়।

তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বলতে জীবনের লাভ ক্ষতির সূক্ষ্ম অংশ-ভাগের কথা বলছি না। সেই বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল যুগের সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার বশে স্বামীজী বলেছিলেন—"যতদিন এ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি চাই না।" সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হৃদয়-আকাশকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে ভবিষ্যৎ ভারতকে এই দুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররূপে গঠন করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম। এই বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে; সমগ্র মানবজাতি তাঁর কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক।

ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এ তিনটিই ভালো কবিতার ক্ষেত্রে "অপৃথগ্-যত্ন-সম্পাদ্য" অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে হয় না। কবিমানস থেকে সৃষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এরা এক সঙ্গেই আকার লাভ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব মানসভঙ্গী কাজ করে বৈ কি! তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যও অনেকখানি প্রেরণা যোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে তাঁর গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল সংযমের পরিচয় রয়েছে। বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি "সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা দুটি লিখেছেন। এ দুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত শব্দের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। ঐ শব্দসম্ভারের দ্বারা বক্তব্যের গভীর গাম্ভীর্যই ধ্বনিত হয়েছে।

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
(সখার প্রতি)

উপরের এই দুটি উদাহরণেই তাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জনা ও সংস্কৃত ভাষাসুলভ সংযমেই তাঁর বক্তব্য আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই,—তা' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। চরণের শেষে নির্দিষ্ট যতি থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য চলমানতা রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণান্তিক যতি অক্ষুণ্ণ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ সেকালে খুব বেশি ছিল না। ভাষার ক্ষেত্রেও স্বামীজী মধুসূদনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। যে পৌরুষদৃপ্ত জীবনাদর্শ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল মধুসূদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম প্রকাশ—সে প্রকাশের ফলে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের কল্লোলধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় আরও সুগম্ভীর মহিমায় সঞ্চারিত হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী যে বেশী মনোযোগী হন নি—তার কারণও ওই অমিত্রাক্ষর।

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই গৈরিশ ছন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে প্রযুক্ত। এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের স্পর্শ পাই—ছন্দ ও ভাষা তারই অনুযায়ী। 'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-র মন্ত্রধ্বনি চিরায়ত সাহিত্যেরই উপযুক্ত। 'সৃষ্টি' এবং 'প্রলয়' মূলতঃ গান—কিন্তু এ দুটি গানের কাব্যসৌন্দর্যের তুলনা একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্বামীজীর ইংরেজি কবিতা "Peace" (শান্তি) ঐ গান দুটিরই সমগোত্র।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষ্যে রচিত "চৌঠা জুলাইয়ের প্রতি" (To the Fourth of July) কবিতায় তার প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশসাধন তাঁর আন্তরিক আগ্রহের বস্তু ছিল। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন—"স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি।"[১]

To the Awakened India (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি), The Song of the Free (জীবন্মুক্তের গীতি) প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তিপথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবনমথিত বেদনাবিষের "পেয়ালা" (The Cup)। এ কবিতার ঘননিবদ্ধ আঙ্গিক কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয়। "My Play Is Done" (খেলা মোর হলো শেষ) কবিতায় সৃষ্টির উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত কবিতা—তাঁর "Kali the Mother" (জননী কালিকা—"মৃত্যুরূপা মাতা")—নবযুগের ঋষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে। এর আগে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা —"মহাকালী"।

"হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।"
(সখার প্রতি)

Kali the Mother কবিতায় বিবেকানন্দের জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতনা রূপ পেয়েছে এ কয়টি চরণে—

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: আলসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩ সালের চিঠি: পৃ: ৩৮৪

Who dares misery love,
and hug the form of death.
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

(মৃত্যুরূপা মাতা—অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই সুখদুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলাবিভঙ্গে শাশ্বত-রূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিতা।[১] তাই বিবেকানন্দের কাব্যসৃষ্টি, বাংলা কবিতার জগতে এক অভিনব সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ তুলে ধরেছে,—এ আদর্শ সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

*

যদি কেউ বলেন, বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের কবিতা সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাহলে একটু আশ্চর্য হলেও একেবারে অসত্য কিছু বলা হবে না। এ বিষয়ে প্রথম অবহিত হয়েছিলাম 'সাহিত্যপত্রে' পুনর্মুদ্রিত শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' প্রবন্ধটি পাঠ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ৭ম বর্ষ, ১৩১৪ সাল, জ্যৈষ্ঠসংখ্যায়[২] এই অসাধারণ প্রবন্ধটি বাংলাসাহিত্যে কবিতাচর্চার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-গ্রন্থে কবি বিষ্ণু দে এই প্রবন্ধ পাঠের প্রতিক্রিয়াতে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখ' প্রবন্ধটির আবির্ভাব বলে ইঙ্গিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের

ভাবজগতে দুঃখচেতনার সাধর্ম্য ও বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনায় এ প্রবন্ধ নিশ্চয়ই অন্যতম দিক-নির্দেশক।[১]

'বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি'-আলোচনাকালে এই প্রবন্ধটি অবশ্যস্মরণীয়। একটু দীর্ঘ হলেও প্রবন্ধকারের ভাষাতেই এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রবন্ধের সূচনাতেই লেখকের মন্তব্য—'যথার্থ কাব্যরসসম্ভোগ···কেবলমাত্র উদার নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।'

কবিতার আঙ্গিক নয়, ভাবসত্যই এ প্রবন্ধে লেখকের মূল বক্তব্য। "কবিতার প্রাণস্বরূপ যে অন্তরতম ভাব—যাহা সর্বদেশের সর্বকালের যথার্থ কবিদিগের রচনায় মানবভাষার দারিদ্র্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার শুভ্রজ্যোতিতে আপনি বিভাসিত হইয়া উঠে, যাহা বিশ্বের পুরাতন সত্যগুলিকে প্রত্যহ নবীন নবীন মূর্তিতে মানব নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়—সেই অন্তরতম ভাব"—সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক তুলনামূলকভাবে যে দু'জনের কবিতার কথা বলেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে অবহিত যে, "কবিতার দেহের বিশ্লেষণ হইতে পারে। তাহার প্রাণরূপী অন্তরতম ভাবের বিশ্লেষণ হইতে পারে না। সমধর্মী বা বিপরীতধর্মী অপর মহাভাবের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে মাত্র।" স্বভাবতঃই রবীন্দ্রমানসের ঠিক বিপরীত না হলেও, অন্য ধরনের একটি মানসের কথা তাঁর মনে পড়েছে।

১৩১০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেনের লেখা থেকে কবিতার একটি মানদণ্ড শ্রী চট্টোপাধ্যায় আহরণ করেছেন—"যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের

১ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : বিষ্ণু দে : 'বীরবল থেকে পরশুরাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : প্রথম ভারবি সংস্করণ : পৃঃ ৫৯

যত সদৃশ, এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ।”

“‘জীবনের-প্রসার’ শব্দে চৈতন্যের বহুব্যাপিত্ব এবং সেই হেতু কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সূচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি যত অধিক দিক হইতে উপলব্ধি করিয়া মানবনয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক হইতে, সৌন্দর্যসম্ভোগজনিত সুখের অনুভূতি দ্বারা বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি মোহিনীও বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন, ভীষণাকে বড় একটা দেখেন নাই।”

“বসুন্ধরা” কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণে বর্জিত—

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে, অপরূপ সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।”

এই অংশটি বর্জনের কারণ কি, “সাধারণ মানবের হৃদয়ে জীবত্ব-হেতু যে স্বাভাবিক শোণিতপিপাসা বর্তমান দেখা যায়, কবিহৃদয়ে তাহারই অলক্ষ্য প্রতিবিম্ব দেখিয়া” সম্পাদকের কুণ্ঠা? শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—“যতদিন পৃথিবীর এই নিদারুণ positive pain” বা সদ্বস্তু বেদনার সম্মুখীন হইবার বীর্যের উপলব্ধি না হয়, ততদিন মানবহৃদয়ে এই হিংসাতীব্র আনন্দের পিপাসার অস্তিত্ব

ভালই মনে করি। হিংসার সহিত এই ভীষণ যন্ত্রণার বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইজন্য এই হিংসাই অনেকস্থলে সত্যবেদনার সহিত পরিচয় করাইয়া মানুষকে বীর্যবান করে। মাত্র শোণিত দর্শনভয়ে যে মানব হিংসার আনন্দ দান করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে,
কাপুরুষ! দয়ার আধার? ধন্য ব্যবহার!
মর্মকথা বলি কাকে।"

কেহ কেহ বলিবেন, "কেন, রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার তুলিকায় বেদনার ছবি অঙ্কিত করেন নাই?" উত্তরে আমি বলিব, "হাঁ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই সদ্বস্তু বেদনা নহে, সুখাতিশয্যের বেদনামাত্র।"

"প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই 'সদ্বস্তু বেদনা' আমি কাহাকে বলিতেছি।···এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আক্রান্ত মৃগের নয়নে যে মর্মান্তিক নীরব বেদনা ফুটিয়া উঠে,—ঘোর দুর্ভিক্ষে অনশন-পীড়িত কঙ্কালাবশিষ্ট আসন্নমরণ শিশু কোটরপ্রবিষ্ট বুভুক্ষিত কাতরনয়নে তাহার ইহলোকের ভগবান শীর্ণকায়া উদাসনয়না হতভাগিনী জননীর মর্মান্তিক নৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া আছে—হতভাগ্য শিশু অপর কোন ভগবান্ অপর কোন নির্ভরের দেবতা দেখিতে শিখে নাই,—তখন পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়ের চক্ষে যে জমাট-বাঁধা নিঃসহায় রিক্ত বেদনার ছায়া দেখা দেয়—যেখানে বেদনাই বেদনার সহচর ··ইহা সেই বেদনা।

জীবনক্ষয়কারী তপস্যার পরে ভগবান বুদ্ধদেবের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত যন্ত্রণা বুঝি জমাটবদ্ধ হইয়া রিক্তমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাই এই দুঃখের ঋষির মুখ হইতে প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—'কষ্ট আছে, কষ্ট আছে'। দারুণ শোকের ভিতর শেলির হৃদয়ে·· অনন্ত বেদনার ছায়াপাত···

"It is a woe 'too deep for tears' ; when all
Is reft atonce, when some surpassing spirit
Whose light adorned the world around it, leaves
Those who remain behind, not sobs and groans
The passionate tumult of a clinging hope ;
But pale despair, and cold tranquility,
Nature's vast frame, the web of human things,
Birth and the grave, they are not as they were."

এই যন্ত্রণা "too deep for tears'-ই বটে। কেন কাঁদিবে? কাহার কাছে কাঁদিবে? নির্ভরের দেবতা, অভিমানের দেবতা কেহ থাকিলে তবে ত তাহার কাছে কাঁদিবে।

বিশ্বের পুঞ্জীভূত রিক্ত যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর,—অনন্ত হাহাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত শবরচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা করালিনীর নিরাভরণা-নিরাবরণা নগ্নমূর্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার বিরাটহৃদয়নিঃসৃত যে বীর্যের গান আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। সন্ন্যাসী প্রথমে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতি সুন্দর ও ভীষণ দুইরূপেরই অতি বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন—

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীতসুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায় কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার, খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে, স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥…
ভাঙ্গ বীণা, প্রেম সুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর! মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্র বেদনার অনুভূতির সহিত যে ভাস্বরবীর্যের শুভ্রদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আজ কয়জন ভারতবাসীর আছে?…

ক্ষুদ্র মানবের এই দশা দেখিয়া বীর সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে আহ্বান করিতেছেন—"কে মুক্তিকাম নির্ভীক বীর আছে—মোহময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। দেখ, শ্মশান বিলাসিনী যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার অর্চনা লইবার জন্য তোমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুমি কি এই দেবীর অর্চনা করিতে ভীত হইবে? যুদ্ধই ইঁহার অর্চনা। তোমার সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমস্ত চিত্তদৈন্য, সর্বক্ষুদ্র কামনা, ঐ শোণিত রঞ্জিত চরণে জলাঞ্জলি দিয়া নিষ্কলঙ্ক ললাটে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া জীবনান্তকর, মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া দেবীর সম্মুখে উদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান হও। নতশিরে স্তবের দ্বারা করালিনীর তুষ্টিসাধনে চেষ্টা করিও না। আহবেই এই দেবীর পরম পরিতোষ।…

এই যুদ্ধের ফল কি, তাহাও সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। হায়…সদা পরাজয়ই এই যুদ্ধের ফল। বিশ্বের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার সম্মুখে

মহাবীরেরও শক্তি ব্যর্থ হয়। অনন্ত যুদ্ধেও এই অনন্ত বেদনার পরিমাণ অটুট থাকে। ইহাই pessimist বা দুঃখবাদীদিগের শেষ কথা। কিন্তু সাধারণে pessimist কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেন, সেই অর্থে এই মহাবীর্য সন্ন্যাসীকে pessimist নামে অভিহিত করিলে কথাটির অপব্যবহার করা হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—'সে কি, যদি সদা পরাজয়ই যুদ্ধের ফল হয়, তবে যুদ্ধ কিরূপে চলিতে পারে? সদা পরাজিতের আবার যুদ্ধ কিরূপ?' তখন অপর একটি প্রশ্নের দ্বারা এই শ্রেণীর দুঃখবাদীরা ইহার উত্তর দেন। তাহা এই, 'যদি মরিবেই, তবে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাই যেমন জীবিতের পক্ষে স্বাভাবিক, সেইরূপ জীবনব্যাপী মহাসমরই মহাকালীর ভৈরব আহ্বানে প্রবুদ্ধচৈতন্য বীরের পক্ষে স্বাভাবিক। ফল কি হইবে, দেখিবার অবসর বা ইচ্ছা নাই।'···

বহুদিন ধরিয়া আমরা বহু কবির ললিত বেণুরবে মুখরিত, মলয় মারুত নিষেবিত আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সুখশয্যায় শয়ান করিয়া সুখের মিথ্যাস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই নিদ্রা কালনিদ্রায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। আজ বুঝি আমাদের মোহতন্দ্রা ছুটিতেছে তাই এই মহাবীর্য সন্ন্যাসীর তূর্যনিনাদ সাগরগর্জনবৎ আমাদের কর্ণে আসিয়া পশিতেছে।"

বিবেকানন্দের এই জীবনদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালীমূর্তির যে ব্যাখ্যা 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির উক্তিতে পাওয়া যায় সেকথা লেখকের মনে জেগেছে। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির এত দিনের সযত্ন লালিত দেবী-সংস্কার যখন নষ্ট হয়ে গেল, অমনি কালীপ্রতিমা তাঁর কাছে 'জড় পাষাণের স্তূপে' পরিণত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"ইহাতে আমাদিগকে বিবেকানন্দ স্বামীর সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্নদিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥'

যতদিন রঘুপতির আশার স্বপ্ন অটুট ছিল, ততদিন সাধারণ মানবের

ন্যায় রঘুপতিও মুণ্ডমালিনীকে ভক্তবৎসলা এবং কেবলমাত্র শত্রুরূপি-দানবদলনী বলিয়াই পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাই তাঁহার উগ্র স্নেহের একমাত্র পাত্র জয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিক্ত কঠোর জীবনে যাহা কিছু আশার, সুখের বা শোভার আস্পদ ছিল, সমস্তই মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইল—তখনি এই ব্রাহ্মণ আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জানিস্ কি করেছিস ? কার রক্ত করেছিল পান ?"...

"রঘুপতি বলিতেছেন, 'সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।' ইহা ত সরলভক্তি নহে,—'সরল' কোথায় ? এবং ভক্তিই বা কোথায় ? সরল নহে, স্বার্থবক্র—ভক্তি নহে, ভয়। তাই দেবীও ভক্তির দেবী নহেন।...

সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন, এই দেবী "দানবের ক্রূর পরিহাস" মাত্র নহেন। ইনি সত্যরূপিণী—তাই বলিয়াছেন, "সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী"...

ইনি যদি উপহাসমাত্র হইবেন, তাহা হইলে ইহার ভীম অসির আঘাতে যে সুখবনমালীর সুখের মুরলী মুহূর্তে মুহূর্তে ধূলিচুম্বন করে, তিনি কি ?...

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে।

বিবেকানন্দের উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের আপনাতে আপনি পূর্ণ বিরাট হৃদয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে।"

প্রবন্ধপ্রান্তে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে 'শেষ উপলব্ধি'র কথা বলেছেন, তা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সত্য হলেও, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা এরপর বহু বিচিত্রপন্থায় আবর্তিত হয়ে উপনিষদের অদ্বৈতচেতনার সাগর-সঙ্গমে উপনীত। সেদিক থেকে এ আলোচনার স্বাভাবিক অপূর্ণতা স্বীকার করেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের

পার্থক্যটি এ প্রবন্ধে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষিত। কবিরূপে এঁদের কোনো তুলনা লেখক করেন নি। মূল ভাবসত্যই তাঁর বিচার্য এবং এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পক্ষপাত যে বিবেকানন্দ-জীবনবেদের অভিমুখী তাও সুস্পষ্ট।

বিবেকানন্দের স্বল্পসংখ্যক বাংলা কবিতার মধ্যে উদ্বোধন (১৩০৬-৭), দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিই শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার মূল বিষয় করেছেন। তবে স্বামীজীর Kali The Mother, Who Knows How The Mother Plays, সখার প্রতি; বা The Cup জাতীয় কবিতার কথা উল্লেখিত থাকলে তাঁর কবিসত্তার পরিচয়টি আরো বিকশিত হত। হয়তো, এ সব কবিতা ('সখার প্রতি' ছাড়া) তখনো ব্যাপক প্রচারলাভ করে নি বলেই এই অনুল্লেখ। প্রবন্ধের প্রান্তে এসে লেখকের মন্তব্য—"কেহ মনে না করেন, আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দ স্বামীর কবি হিসাবে কোন তুলনা করিয়াছি। "কবি" শব্দটির সাধারণ যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে স্বামী বিবেকানন্দকে কবি বলা যায় কি না সন্দেহ করি। প্রবন্ধের ভিতর একস্থানে ভগবান বুদ্ধের নামোল্লেখ করিয়াছি। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করিয়াছি বলিলে ইহাও বলিতে হয়, বুদ্ধদেবের সহিতও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়াছি—কারণ, যে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করিয়াছি—ঠিক সেই প্রসঙ্গেই বলিতে বলিতে বিবেকানন্দ স্বামীর কথা আসিয়া পড়িয়াছে।"

এ বিষয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সতর্কতা সত্ত্বেও মনে হয় বিবেকানন্দের ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতাবলীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় কি না সে প্রশ্ন তুলেও সংখ্যা ও গুণবিচারে বিবেকানন্দ-রচনাবলীতে তাঁর কবিতা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। বিশেষতঃ বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতাই অপরিহার্য। তাই প্রধানতঃ ইংরেজীতেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখিত হলেও সেগুলির অনুবাদ

এবং তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা অবলম্বনে বিবেকানন্দসাহিত্যের সৃজনধর্মী কবিসত্তার পরিচয়লাভের প্রচেষ্টা বর্তমানে গ্রন্থে প্রত্যাশিত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান আলোচনাটির সারাংশ বিবেকানন্দমানসের পটভূমি-উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক বিবেচনায় এ অধ্যায়ে সংযোজিত। সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর কবিতা ও কবিসত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা যে কোনো সাহিত্য-পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।[১]

মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ

আঠারো শো একষট্টিতে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হলো। আঠারো শো তেষট্টিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য বা কৈশোরে তিনি হয়তো এই দত্তকুলোদ্ভব মহামতিকে দেখে থাকবেন। নরেন্দ্রনাথ নিজেও আর এক দত্তবংশের মহারথী। দুজনের সম্বন্ধেই সেই একান্ত পুরাতন প্রবচনটি আশ্চর্যভাবে সার্থক—'দত্ত কারো ভৃত্য নয়।' স্বভাবের ক্ষেত্রে সম্রাট, জীবনের ক্ষেত্রে অপরাজেয় সৈনিক, দুজনের একজন বিজাতীয় রীতিনীতিতে দীক্ষিত মাইকেল হলেও আসলে শ্রীমধুসূদন, আর একজন ভারতীয় ধ্যান ধারণা ও জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ সন্ন্যাসী হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্তরিক গুণগ্রাহী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলিত সার্থকতার দুই বিচিত্র উদাহরণ মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ।

মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যধারায় যে জীবনবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছিল, অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মানবতাবোধের জোয়ার এসে সেই জীবনীশক্তির অমিত সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিল। মধুসূদনের মহাকাব্যে উনিশ শতকের বাঙালীমানস সেই নবজীবনের শঙ্খধ্বনি শুনতে পেয়েছিল বলেই মেঘনাদবধকাব্য আমাদের কাব্যজগতে চিরস্থায়ী আসনের অধিকারী। প্রাচীন মহাকাব্য যেমন সমগ্র জাতির অন্তর থেকে উদ্ভূত, মধুসূদনের এই আধুনিক মহাকাব্যটি তেমনি নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার পরিণত ফল এবং সে জাতীয়তার সঙ্গে চিরন্তন মানবতার কোনো বিরোধ নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মেঘনাদবধকাব্যই বাংলাসাহিত্যে একমাত্র মহাকাব্য।

মেঘনাদবধকাব্যকে অবলম্বন করে যে সমালোচনাসাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে একটি নেতিবাচক মনোভাব, লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হতে হয়। এ যুগের সমালোচকগোষ্ঠী মধুসূদনের এই

কাব্যটিকে করুণরসের উদাহরণরূপে প্রতিপন্ন করতেই সমধিক উৎসাহী। আশঙ্কা সেখানে নয়। এই করুণরসের কারণস্বরূপ কেউ কেউ যখন সমকালীন পরাধীনতা, বাঙালী মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অথবা মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা প্রভৃতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির যুক্তি উপস্থিত করেন, তখন সবিনয়ে বলতে হয় এসব ঘটনার সঙ্গে মেঘনাদ বা রাবণের ভাগ্যকে যুক্ত না করাই ভালো। রাবণ ও মেঘনাদের ভাগ্য 'বাল্মীকি রামায়ণে'ই নির্ধারিত হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে মধুসূদনের নূতন কিছু করণীয় ছিল না। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে মেঘনাদবধকাব্যকে কেবলমাত্র করুণরসের কাব্য বলা কতদূর সঙ্গত ?

একথা সত্য যে পুত্রশোকাতুর রাবণের নিঃশব্দ অশ্রুপাতে এ কাব্যের সূচনা, চিতাশয্যায় শায়িত মেঘনাদের উদ্দেশে রাবণের বিলাপে এ কাব্যের অবসান। কিন্তু এই শোক কি ভগ্ন ভাগ্যের কাছে পরাজিত আত্মার আত্মসমর্পণ ? বরং নিয়তির অভিঘাতে, দেবতা ও মানবের মিলিত চক্রান্তে, সংসার-সমাজ-প্রিয়জনের মর্ম-যন্ত্রণায়—সর্বত্র রাবণের অটল অচল সমুন্নত বীরত্বই কি বড়ো হয়ে ওঠে নি ? মধুসূদনের কবিমানস রাবণের দম্ভকে বড়ো করে দেখে নি, রাবণের আত্মবিশ্বাসকেই বড়ো করে দেখেছিল। তাই সে প্রাণের গভীরে দুরন্ত শোকের জ্বালা অনুভব করেও অবিচলিত কর্তব্যপরায়ণতায় জীবনযুদ্ধে অগ্রসর। কেবল শত্রুহননের দুর্জয়-সঙ্কল্পে নয়, মৃতপুত্রের শোকযাত্রায় পর্যন্ত রাবণের ধীরগম্ভীর সংযত ব্যক্তিত্ব স্মরণীয়। বিশদবস্ত্র বিশদ উত্তরী-শোভিত রাবণের কল্পনায় মধুসূদন উপমা আহরণ করেছেন—ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে। কৃতকর্মের বিষপানে মধুসূদনের রাবণ তো সত্যই নীলকণ্ঠ ধূর্জটি।

মেঘনাদবধকাব্য পাঠকালে স্বভাবতই এ প্রশ্ন বারংবার মনে উঁকি দেয়, বীরত্বের সংজ্ঞা কি ? যুদ্ধবরণ বীরত্বের বহিরঙ্গ লক্ষণ, দুঃখবহন তার অন্তরঙ্গ মহিমা। অন্তর বাহিরের এই সংগ্রামস্বীকৃতি-তেই বীরত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে

শ্যামা' কবিতাটিতে বীরত্বের এই আদর্শ অগ্নিঅক্ষরে ভাস্বর হয়ে উঠেছে—

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা ;
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

স্বামীজীর চিন্তাধারায় যে আত্মবিশ্বাসী অভীমন্ত্রের উপাসক সংগ্রামশীল মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখতে পাই, মধুসূদনের রাবণে সেই আদর্শের উপাদান অনেকপরিমাণে নিহিত। যে কারণে বিবেকানন্দ ছিঁচকে চোরের চেয়ে ডাকাতকে মনুষ্যত্বের দিক থেকে বড়ো ভাবতেন, সেই কারণেই রামায়ণকাহিনীর রাবণের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল।

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Reminiscences of Vivekananda গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিসঞ্চয়ন থেকে এ সিদ্ধান্তের আশ্চর্য সাক্ষ্য পেয়েছি। বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার আমেরিকাভ্রমণের সময় অন্যতম সঙ্গী ছিলেন নিবেদিতা। এই সময়কার দিনলিপিতে (২৭শে অক্টোবর ১৮৯৯) তিনি লিখছেন, "He (বিবেকানন্দ) talked about the Ramayana. I'll tell you a curious thing. When Sadananda talks about the Ramayana I become convinced that Hanuman is really the hero, when Swami talks of it Ravana is the central figure."[১]

বিবেকানন্দ-শিষ্য সদানন্দ যখন নিবেদিতাকে রামায়ণকাহিনী শোনাতেন, নিবেদিতার মনে হত হনুমানই রামায়ণকাহিনীর আসল

---

১ Reminiscences of Vivekananda (অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত) পৃঃ ২৮৩

'স্বামীজী রামায়ণ প্রসঙ্গ করছিলেন। একটা আশ্চর্য কথা আমি তোমায় বলি। সদানন্দ যখন রামায়ণ-প্রসঙ্গ করেন, তখন আমি নিশ্চিত বুঝি যে হনুমানই রামায়ণের আসল নায়ক, আর স্বামীজী যখন বলেন তখন রাবণই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়।'

নায়ক, কিন্তু বিবেকানন্দ যখন রামায়ণপ্রসঙ্গ করতেন তখন মনে হত রাবণই এ কাব্যের কেন্দ্রচরিত্র। গুরু শিষ্যের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য এ আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত। দাস্যভক্তির আদর্শ হনুমানের প্রতি বিবেকানন্দেরও অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু রামায়ণ-কাহিনীর বর্ণনার সময় আপনা থেকেই রাবণের শৌর্যমণ্ডিত বিদ্রোহীসত্তা এই বিপ্লবী চিন্তানায়ককে আকর্ষণ করত বেশী।

তিনি বলতেন, দুর্বলতাই পাপ, যা কিছু আমাদের উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করে তাই পুণ্য। সমগ্র জাতির উদ্দেশে তাই তিনি উপনিষদের এই বাণী বারংবার ঘোষণা করেছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" রুগ্নদেহের আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বলিষ্ঠ দেহের আত্মপ্রত্যয় (এমন কি সে আত্মপ্রত্যয় যদি ভগবৎ-বিরোধী হয়, তবু) তাঁর কাছে বেশী মর্যাদা পেয়েছে; গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবলখেলার প্রয়োজনীয়তা যে দুর্বল জাতির পক্ষে অনেক বেশী, এমন কথাও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন। স্বামীজীর স্মৃতিকথায় নিবেদিতা লিখেছেন—"...his misson was to bring manliness to his people."[১] জাতীয় জীবনে ওই পৌরুষের আদর্শই বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

বলা বাহুল্য, মধুসূদন বা বিবেকানন্দ কেউই রাবণের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অনবহিত নন। বাল্মীকি-রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে রাবণকে দেখে হনুমানের যে বিস্ময়, সে বিস্ময়ই যুগে যুগে দেখা দিয়েছে—

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিত॥

যদি অধর্ম বলবান না হত, তবে রাবণ ইন্দ্রসমেত সমগ্র সুরলোকের রক্ষক হতেন। সন্দেহ কি। সর্ব লক্ষণযুক্ত বলেই তো

১ 'স্বজাতির অন্তরে মনুষ্যত্বের সঞ্চারই তাঁর ব্রত ছিল।' Reminiscences: পৃঃ ১৭৭

রাবণের পতনকে ট্রাজেডির মর্যাদা দিই, এবং ট্রাজেডির নায়ক বলেই রাবণের মহিমাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব ব্যর্থতার উর্ধ্বে রাবণের ওই দৃপ্ত পৌরুষ মানবসত্তার মহত্তর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। মানবতার প্রতি এই বিশ্বাস, এই প্রীতিই যথার্থ মানবপ্রেম। উনিশ শতকের এ দুই ভিন্নধর্মী মানবপ্রেমিকের এইখানে সুরসঙ্গতি।

মেঘনাদবধ কাব্যে কোন অংশটি শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন করে বিবেকানন্দ নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং মেঘনাদবধ-কাব্যের সেই অংশটি দৃপ্ত কণ্ঠে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১]

রাবণের পক্ষে মন্দোদরীর নীরব নিষেধের চেয়ে বড় বাধা আর কিছু কল্পনা করা যায় না। এই অন্তহীন শোক রাবণচিত্তে যেভাবে সঙ্কল্পের জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিণত হয়েছে এবং তারপর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের যে শরবৎ লক্ষ্য-তন্ময়তা দেখা দিয়েছে, সে কল্পনায় এ কাব্যের তীব্রতম গতিবেগ পরিস্ফুট। উনিশ শতকের সমালোচক-বৃন্দ এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের প্রশংসা করেছেন সবচেয়ে বেশী। সে প্রশংসার মূল্য আজকের দিনেও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।[২]

মেঘনাদবধকাব্যের করুণ রস বীররসের স্পর্শে দীপ্ত গভীর; এ কাব্যে বজ্র কুসুমের বিপরীত মিলন অনায়াসে সাধিত। নবম সর্গে রাবণের বিলাপে যে সুসংহত ঋজু প্রকাশ দেখি, সে ঋজুতার কারণ এই যে, ওই বিলাপ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হতাশার ক্রন্দন নয়; ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপার দুঃখরাশিবরণের নির্ভীকতাও

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ২১১

২ উদাহরণস্বরূপ রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' থেকে —the seventh book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps. the sublimest in the entire range of Bengali Literature. পৃঃ ১৮৩

ওই বিলাপের অন্তরালে ধ্বনিত। বিমুখভাগ্যের উদ্দেশ্যে রাবণের প্রশ্ন আছে, নতিস্বীকার নেই।

নীতিশাস্ত্রের পাপপুণ্যের হিসাব শেষ করেও মহাকালের প্রাঙ্গণে মানুষের আরো কোন পরিচয় থাকে। সৃষ্টি—রাবণ এবং স্রষ্টা—মধুসূদন—দুজনেই তার সাক্ষী।

২

মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গটি যেন নির্জন দ্বীপের মতো চার পাশের রণকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বপ্নস্বর্গ। এ সর্গে প্রবেশের আগে সশ্রদ্ধ বন্দনায় আমরা অবনতশির। দূর থেকে ভেসে-আসা পুষ্পধূপদীপেব মৃদু সুগন্ধে যেন দেবতার পূজার আয়োজন; জীবন-চেতনার অন্য এক উপলব্ধির জগৎ।

এ কাব্যের রাবণ যদি প্রতীচ্যসভ্যতার দুর্দম প্রাণশক্তির উদাহরণ হয়ে থাকে, সীতা তবে প্রাচ্য তথা ভারতীয় সভ্যতার অন্তরতম স্বরূপ। যে মধুসূদন অনায়াসে লিখেছেন, "I despise Ram and his rable; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow"[১]—সেই মধুসূদনই সীতাচরিত্র বর্ণনায় অন্তরের সমস্ত ভক্তি সরমার প্রণামের মধ্য দিয়ে উজাড় করে দিয়েছেন।

সীতার ললাটে সরমার এঁকে দেওয়া সিন্দূরবিন্দুটি—

…'শোভিত ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারা-রত্ন যথা।'

এই একটি উপমায় সীতার সমগ্র জীবনের বিষাদ-নীহারাচ্ছন্ন জ্যোতিষ্ক মূর্তিটি উদ্ভাসিত। গোধূলি আকাশের বিদায়ব্যথাতুর রক্তিম আকাশ যেন সীতার সারাজীবনের বেদনার পটভূমি।

---

১ রামচন্দ্র আর তাঁর দলবলকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণ আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করে। রাবণ এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব।

সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে সীতার চরণতলে প্রণামরত সরমা—

স্ববর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিক !

বাঙালী কবির মনে সান্ধ্যপূজার শান্ত আত্মনিবেদনের স্মৃতি ঐ দীপশিখাটিতে বিধৃত।

আজীবন দুঃখতপস্যায় মধুসূদনের সীতা নিখিলবিশ্বের সহমর্মিতা লাভ করে 'ভবতলে মূর্তিমতী দয়া' হয়ে উঠেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদেও এ সীতার মনে হয়—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরূপী
আমি।"

রক্ষকুলশোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা দুঃখী পরদুঃখে।

রাবণের বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট ব্যক্তিত্বের কল্পনায় মধুসূদন মুগ্ধ, চকিত, উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সীতার নিরলঙ্কার তপস্যাপূত সৌন্দর্যের উদ্দেশে মধুসূদনের প্রণাম-নিবেদনে ধ্যানের স্তব্ধতা, ভক্তির আত্ম-সমর্পণ। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'রামায়ণ' কবিতাটিতে মধুসূদন আর একবার তাঁর প্রণামমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন—

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !

মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থসর্গে এই দুঃখের দেবতাকে মধুসূদন আর একটি অপূর্ব উপমায় পূজা করেছেন—

রহিলা দেবী সে বিজন বনে
একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।

পবিত্র সৌন্দর্যের এই সকরুণ নিঃসঙ্গ প্রকাশেই সীতাচরিত্রের অনন্যতা।

এ মহাকাব্যের নর, বানর, রাক্ষস—সকলেই মানুষ, একমাত্র সীতাই দেবী। কিন্তু মানবহৃদয়ের বেদনার শতদলে এ দেবতার পাদপীঠ। এই অনন্তকরুণাবিগ্রহ যে মহাকবির ধ্যানে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে চিরন্তন ভারতবর্ষ অতন্দ্র প্রতীক্ষায় জেগেছিল। দেবতার আবির্ভাবকে সেই নির্নিমেষ প্রতীক্ষমান অন্তর নিষ্ফল হ'তে দেয় নি—পরিপূর্ণ পূজার অর্ঘ্য দিয়ে মহাকাব্যের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ শতকের সূচনায় পাশ্চাত্যজাতির কাছে ভারতের নারী-জাতির আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দের মানসপটে সর্বাগ্রে স্মরণীয়া হয়ে উঠেছেন সীতা।

"সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে সীতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শস্বরূপ।" "পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা সর্বংসহা সীতার মত হওয়াই ভারতীয় নারীর সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" "প্রতীচ্য বলে, কাজ কর, কর্মের দ্বারা তোমরা শক্তি প্রতিপন্ন কর! ভারতবর্ষ বলে, 'সব দুঃখবেদনা সহ্য কর—এই সহনশীলতার মধ্য দিয়ে তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত বেশী বিষয়ের অধিকারী হতে পারে পাশ্চাত্য সে সমস্যা পূরণ করেছে; আর মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে ভারতবর্ষ এই সমস্যা পূরণ করেছে। এ দুটি আদর্শই এক এক ভাবের চরমসীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি, যেন মূর্তিমতী ভারতবর্ষ।···সীতা নামটি ভারতে যা কিছু শুভ, যা কিছু শুদ্ধ, যা কিছু পুণ্য তারই পরিচায়ক।

"কে জানে এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী ওই আপাত প্রতীয়মান শক্তি ও তেজ অথবা প্রাচ্যদেশীয় তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ধৃতি ?"[১]

১ ৩১শে জানুআরি, ১৯০০ সনে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনা শহরের শেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত "রামায়ণ" বক্তৃতা।

"সীতাচরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তবু যে জাতি ঐ চরিত্র সৃষ্টি করেছে, নারীজাতির প্রতি সে জাতির যতটা শ্রদ্ধা, জগতে তার তুলনা নেই।"[১]

নবযুগের ভারতবর্ষকে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"[২] এই পুণ্যনামমালার আদ্য নামটি সীতা।

৩

মেঘনাদবধকাব্যে যে বিদ্রোহী প্রাণের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে, তার অমিত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় আমরা কিছুক্ষণের মতো চিরন্তন ভারতবর্ষকে ভুলে থাকি। সাময়িকভাবে আমরা যে ভাবধারায়ই প্রভাবিত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তরালে ভারতবর্ষের ধ্যান ও স্বপ্ন নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনার দুটি রূপ মধুসূদনের মহাকাব্যে রাবণ ও সীতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রাবণচরিত্রের উত্তুঙ্গ বিস্ময় সীতার বিনম্র-শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি—একথাটি মধুসূদনের কাব্যপাঠ-কালে স্মরণীয়।

শক্তির অপরিমেয় প্রতাপসত্ত্বেও যা ত্যাগের দ্বারা পবিত্র, ক্ষমার দ্বারা মহনীয়, কল্যাণের দ্বারা আলোকিত—তাকেই মানবপ্রাণ যুগে যুগে বন্দনা করে এসেছে। 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'—এ কেবল সাহিত্যতত্ত্বের কথা নয়, মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফল। মধুসূদনের কাব্যে রাবণের পাশে রামচন্দ্রকে নিষ্প্রভ মনে হ'তে পারে, কিন্তু সীতার মধ্য দিয়ে রামায়ণের মূল রসটি অব্যাহত থেকেছে। রামচন্দ্রকেও কি মধুসূদন আদর্শচ্যুত করেছেন?

১ প্রবুদ্ধভারত, ১৮৯৮ ডিসেম্বর-সংখ্যায় স্বামীজীর "ভারতীয় নারী" সম্বন্ধে আলোচনা।

২ বর্তমান ভারত: শেষ অনুচ্ছেদ।

বিশেষতঃ নবম সর্গে রামচন্দ্রের বীরোচিত উদারতায় অভিভূত রাবণমন্ত্রী সারণ রামচন্দ্রের যে স্তুতি করে গেলেন, তা নিশ্চয় চাঁদ-সদাগরের মনসাবন্দনা নয়। তবু দেবপ্রতিম রামচন্দ্র মধুসূদনের লক্ষ্য নন, মানবমূর্তি রাবণই মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাই সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও মানুষ রাবণই মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত সঞ্জীবিত করে।

মহাদম্ভের পরাভবের মধ্যেও প্রচণ্ড জীবনীশক্তির উপাদান নিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই শক্তিকেই নবযুগের মনুষ্যত্ব-সাধনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন; তাই রাবণচরিত্রে তাঁর মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য-পরিক্রমান্তে ভারতবর্ষের সঙ্গে ওদেশের তুলনায় তাঁর মনে হয়েছিল—...'এ দেশের মত এত বেশী তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে?...তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না—সর্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।"[১]

দেয়ালে চুরি করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, এজন্য দেয়াল বা গরুকে মানুষের চেয়ে বড় স্থান দেওয়া হয় না। অন্যায় করার স্বাধীনতা সত্ত্বেও ন্যায়ের পথে অবিচলিত থাকার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। মানুষেই ভুল করে এবং মানুষই সব ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে পরমসত্যে

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১৮৪

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা স্বামীজী তাঁর বাণী ও রচনায় বারংবার উচ্চারণ করেছেন। রজোগুণের মধ্য দিয়ে সত্ত্বগুণে উপনীত হবার সাধনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর জীবনব্রত ছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যে আমরা এই রজোগুণদীপ্ত পৌরুষের দুর্বার গতিবেগ প্রথম অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে গতিবেগের সামনে কোনো ধ্রুব লক্ষ্য নেই, প্রশান্ত পরিণামে সে গতি পূর্ণতা লাভ করে না। এই গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব এসে রূপায়িত হ'ল বিবেকানন্দের জীবনে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, যোগে জীবনের এক পরিপূর্ণ ছন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল আর এক মহাজীবন—যে জীবন প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কোচিত উপাদানে গড়া। পাশ্চাত্যসভ্যতার আত্মবিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির সামনে দাঁড়িয়ে এই যুগনায়ক ভারতবর্ষের ধ্যানের সত্যকে তুলে ধরলেন—লক্ষ্যের দ্বারা গতির সার্থকতা সাধিত হ'ল; ভারতীয় সভ্যতার মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট জড়তাকে জাগিয়ে তুললেন প্রতীচ্যের কর্মপ্রেরণায়—গতির স্পর্শে আদর্শ প্রাণময় হয়ে উঠল।

মাইকেল মধুসূদন থেকে স্বামী বিবেকানন্দে এসে বাংলার নবজাগরণের একটি অধ্যায় সুসম্পূর্ণ।

বিবেকানন্দের কবিতা

পৃথিবীর সব মহৎপ্রাণ ক্ষণজন্মাদের সঙ্গেই কবিতার নিবিড় আত্মীয়তা। একটি মহৎ হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে নিখিলমানব আপন পূর্ণতা উপলব্ধি করে। সেই পূর্ণতা কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, শিল্পে নূতন স্পন্দন, নূতন ধ্বনি জাগিয়ে তোলে। এক মহাজীবনের ছন্দে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের ভাবনালোক আবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালের ইতিহাস সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এমন এক একটি আবর্তনকে স্মরণ করে ধন্য হয়।

প্রাচ্যভূখণ্ডে বুদ্ধ ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে খ্রীষ্ট—এঁদের জীবন ও সাধনা-অবলম্বনে যে ভাবলোক গড়ে উঠেছে, এশিয়া-ইয়োরোপের সংস্কৃতি আজও তার প্রসাদধন্য। মানবহৃদয়ের এই বিপুল ভাব-স্পন্দনের স্পর্শে কবিচিত্তের উন্মীলন ঘটে সবচেয়ে আগে। কারণ, অনুভূতির অতলে যাঁরা বাণীসন্ধানী, তাঁদের হৃদয়-পথে এই মহামানবদের সহজ আনাগোনা। এঁদের অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি আমাদের আলো দেয়, এদের বিপুল করুণা আমাদের উদ্বেলিত করে। এঁদের বাণীতে নিহিত থাকে সেই প্রেরণা, যার আশীর্বাদে কবিতার জন্ম।

এঁদের কেউ কেউ সত্যি কবিতা লিখেছেন।—আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ—এঁরা তিনজনেই আক্ষরিক অর্থে কবি না হ'লেও এঁদের বাণী কবিতার সৌন্দর্যবিভায় সমুজ্জ্বল; সব মহৎসৃষ্টির মূল প্রেরণা এঁদের বাণীতে বীজাকারে নিহিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আকাশের মত উদার ও সমুদ্রের মত গভীর হওয়াই আদর্শ।" সে আদর্শ মহৎ জীবন ও মহৎ কাব্য—দুয়েরই। প্রাচীন ভারত বেদ ও উপনিষদে এ দুয়ের সার্থক সমন্বয় অনুভব করেছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত অথবা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

ঋষির "অমৃতস্য পুত্রাঃ"-দের প্রতি আহ্বান—ভারতবর্ষের ব্রহ্মৈক্যানুভূতির প্রাচীনতম নিদর্শন। উপনিষদের এই আত্মোপলব্ধির মন্ত্রমালায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অসংখ্য উদাহরণ মেলে। আর এই উপনিষদকে অবলম্বন ক'রেই ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—এই ত্রিধারার দার্শনিক ও সাধকবৃন্দ উপনিষদের আলোকে পথের সন্ধান করেছেন। বহুযুগের এই অনুসন্ধানে পথ ও মতের যত বিতর্কই থাক, সবার উপরে ব্রহ্মোপলব্ধির পরমসত্য ভারতবর্ষকে চিরকাল ধারণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সেই সত্যের সাম্প্রতিক প্রকাশ।

শঙ্করের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধের হৃদয়—এ দুয়ের সমন্বয় ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের সঙ্গে এসে মিলেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে উচ্চারিত যুগচিত্তের বাণী, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' সমাধি-তন্ময়তার জন্য ব্যাকুল বিবেকানন্দচিত্তে এই বাণী জগৎ ও ব্রহ্মের অমৃতসেতু রচনা করে পরবর্তীযুগে অমর শ্লোকে রূপান্তরিত—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

(সখার প্রতি)

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'—এক পরম সত্যের বিচিত্র বিকাশের উপলব্ধি বিবেকানন্দের কবিতার অন্যতম মূল প্রেরণা। এই উপলব্ধির সূচনা হয়েছিল কিশোর নরেন্দ্রনাথের কল্পনালোকে. উপলক্ষ্য ছিল—প্রকৃতি। চৌদ্দবছর বয়সে একবার মা-ভাই-বোনদের নিয়ে রায়পুরে বাবার কাছে যাচ্ছিলেন নরেন্দ্রনাথ—পথের বেশীর ভাগ অরণ্যময়, যাতায়াতের উপায় গোরুর গাড়ি। পরবর্তীকালে বন্ধুদের কাছে এই ভ্রমণের স্মৃতিকথা বলতেন স্বামীজী—"বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ঐ সময়ে যা দেখেছি ও অনুভব করেছি, চিরকালের জন্য তা স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গেছে। বিশেষতঃ একদিনের কথা। বিন্ধ্যাচলের তলা দিয়ে সেদিন চলেছি। পথের দুপাশে পাহাড়ের চূড়াগুলি আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে, নানা জাতের গাছ লতা

ফল ফুলে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব শোভা হয়ে রয়েছে ; মধুর কাকলিতে চারিদিক পরিপূর্ণ করে নানা রঙের পাখিরা এক কুঞ্জ থেকে আর এক কুঞ্জে উড়ে বেড়াচ্ছে, কখনো বা মাটিতে নেমে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই সব দেখতে দেখতে মনে এক অপূর্ব শান্তি অনুভব করেছিলাম। ধীরমন্থর গতিতে চলতে চলতে আমাদের গোরুর গাড়িগুলি এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে দুটি পাহাড়ের চূড়ো যেন ভালোবাসায় এগিয়ে এসে বনের পথটিকে একসঙ্গে ছুঁয়ে আছে। সেই চূড়াদুটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি এক পাশের পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে তলা অবধি এক বিরাট ফাটলের ফাঁক পূর্ণ করে যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ এক প্রকাণ্ড মৌচাক। অবাকবিস্ময়ে সেই মৌমাছিরাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবতে ভাবতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমনভাবে তলিয়ে গেল যে, সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। কতক্ষণ অমনভাবে পড়েছিলুম মনে নেই। একলা একটি গাড়িতে ছিলুম, তাই আমার এ অবস্থা আর কেউ টের পায় নি।”[১]

প্রকৃতি-সৌন্দর্যের ধ্যানে বিবেকানন্দের এই তন্ময়তার প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর একান্ত প্রিয় অনন্য প্রকৃতিপ্রেমিক কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কথা। এই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রসঙ্গেই কলেজের ক্লাসে তিনি হেস্টিসাহেবের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তন্ময়তার কথা শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদলাভের আগে রায়পুরের পথে ওই ভাব-তন্ময়তাই তাঁর জীবনে প্রথম অনন্তানুভব।

কলেজ-জীবনে নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে সত্যানুসন্ধান যত তীব্রতর হয়েছে, ততই নানা দার্শনিকের ভাবনালোকে তিনি পথ খুঁজে ফিরেছেন। সমসাময়িক যুগের বহুপঠিত পাশ্চাত্যদার্শনিকদের মধ্যে হাবার্ট স্পেন্সার, হেগেল, হিউম, কাণ্ট, শোপেনহাওয়ারের রচনাবলী তিনি যে কত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর অসংখ্য বক্তৃতামালায়। উনিশ শতকের

১ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ [দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]—অবলম্বনে।

মননধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয় জন স্টুয়ার্ট মিল ও কোম্‌ত্‌—এঁদের রচনাবলী অন্যান্য চিন্তানায়কদের মতো নরেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। একদিকে এই পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সংশয়িত জীবনজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে ভক্তিবাদী ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা—এ দুয়ের সমন্বয়ে নরেন্দ্রনাথ সমকালীন তরুণমানসের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর সাক্ষ্য রয়েছে সতীর্থ বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতি-কথায়। উত্তরকালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "প্রবুদ্ধ ভারত" (১৯০৭) পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার কিছু কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Undeniably a gifted youth, sociable, free and unconventional in manners, a sweet singer, the soul of social circles, a brilliant conversationalist, somewhat bitter and caustic, piercing with the shafts of a keen wit the shows and mummeries of the world, sitting in the scorner's chair but hiding the tenderest of hearts under the garb of cynicism: altogether an inspired Bohemian but possessing what Bohemians lack, an iron will; somewhat peremptory and absolute, speaking with accents of authority and withal possessing a strange power of the eye which could hold his listeners in thrall."[১]

১ নিঃসন্দেহে এক প্রতিভাদীপ্ত যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনে প্রাণস্বরূপ মধুকণ্ঠ গায়ক, বাকনৈপুণ্যে সমুজ্জ্বল, যদিচ অম্ল ও তিক্ত সেই সব বাক্য যা দুনিয়ার সব ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীব্রতম শরবিদ্ধ করে, অবজ্ঞাকারীর আসনে উপবিষ্ট মনে হলেও আসলে তা হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিকে সংশয় ও অবিশ্বাসে আবৃত করে রাখার ছলমাত্র; সব মিলিয়ে এক প্রেরণাধন্য 'বোহেমিয়ান' (উদ্‌ভ্রান্ত যথেচ্ছাবিচরণকারী), কিন্তু বোহেমিয়ানদের

আঠারো বছর বয়সের উদ্দাম নরেন্দ্রনাথের আচার-আচরণে যে বাধাবন্ধহীন পৌরুষের প্রকাশ ছিল, তার ফলে তাঁকে সাধারণ দিক থেকে "বোহেমিয়ান" মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়! বিশেষত যখন তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীও প্রথম পরিচয়ে তাঁকে বন্ধুবিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গী বলে মনে করেছিলেন। অনেক দিন পরে বিবেকানন্দের এই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে এক পাশ্চাত্য রমণী বলেছিলেন—"Vivekananda is nothing if not a breaker of bondage"[১]

কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনীতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-রূপায়ণের সাহিত্যিক সার্থকতা অবিস্মরণীয়। তাঁর সাক্ষ্যেই আমরা জানতে পেরেছি, অবিরত বুদ্ধিচর্চার ফলে সুলভ ভক্তির আবেগ কমে এলেও সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর আবেগ জাগিয়ে তুলতো—"···music···starred him as nothing else could, and gave him a weird unearthly sense of unseen realities which brought tears to his eyes."[২]

পরমসত্যের অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে শেলীর কবিতার দিকে আকৃষ্ট করেন। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty কবিতার নৈর্ব্যক্তিক প্রেম ও his vision of a glorified millenial humanity 'মহিমোজ্জ্বল মানবতার দিব্যদর্শন' তাঁকে শুষ্ক দার্শনিক-বিচারের থেকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। এমন কি, ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী, শেলীর কবিতালোকে প্রবেশের পর

যা নেই, সেই লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, কিছুটা স্বেচ্ছাতন্ত্রী ও স্থিরনিশ্চয়, নিশ্চিত কর্তৃত্বের সুর তাঁর উচ্চারণে আর অদ্ভুতশক্তি-ভরা দুই চোখ যা শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখে।

১ বিবেকানন্দ বন্ধনমোচনকারী ছাড়া আর কিছুই নন।: Notes of Some Wonderings: নিবেদিতা।

২ সঙ্গীত, যার মতো আর কিছুই তাঁকে আলোড়িত করত না, যা তাঁকে অপার্থিব চেতনায় দৃষ্টির অতীত সত্যের অনুভূতিতে অশ্রু-আর্দ্র করে তুলতো।

তাঁর কাছে "জগৎ আর প্রেমহীন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র রইল না—এক অধ্যাত্ম-ঐক্যের সূত্রে বিধৃত হলো।"

বিবেকানন্দের ভাবলোকে শেলীর এই সুগভীর প্রভাববিস্তারের সামান্য কিছুদিন আগে বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের "সারদামঙ্গল" দেখা দিয়েছে। কিন্তু "সারদামঙ্গল" বিবেকানন্দের ছাত্রাবস্থায় ততটা পরিচিত ছিল না। তবু শেলী, বিহারীলাল ও বিবেকানন্দ —তিনজনেই রোমান্টিক থেকে মিষ্টিক চেতনায় উত্তরণের কবি—সে হিসেবে এঁদের সগোত্র বলা চলে।

কবিচেতনার রোমান্টিক কল্পনাধর্মকে বিবেকানন্দ জীবনে মাত্র একটিবার প্রত্যক্ষ বন্দনা করেছেন, সেই দুর্লভ উদাহরণটি সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করি—

THOU BLESSED DREAM

If things go ill or well,
If joy redounding shows her face,
Or seas of sorrow swell,
'Tis but where each has part,
Each one to weep or laugh as may ;
Each one his robe to don ;
Its scenes, aternative shine and rain.

Thou dream, O blessed dream !
Spread near and far thy veil of haze,
Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems.

No magic but in thee !
Thy touch makes deserts bloom to life,

Harsh thunder blessed song,
Fell death the sweet release.

(১৭ই আগস্ট, ১৯০০)[১]

দেহাবসানের মাত্র দু'বছর আগে প্যারিস থেকে ব্রহ্মচারিণী ক্রিস্টিনকে লেখা একটি চিঠির অংশে এই কবিতাটিতে একবার মাত্র এই বৈদান্তিক কবি জীবনে স্বপ্নের সার্থকতা স্বীকার করে বিনম্র সৌন্দর্যের স্তবগানে মুখর হয়েছেন। কিন্তু ওই স্বীকৃতি যে আকস্মিক উদ্ঘাটন নয় সে কথা তাঁর 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ-কাহিনীতে গঙ্গাতীরের সবুজবর্ণনায় অথবা হৃষীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় অথবা জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রশোভা দেখে, 'সামনে কবিতার সার সৌন্দর্য থাকতে কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?' বলায় প্রমাণিত। রূপ-তন্ময়তার চরমতম পরিচয় 'পরিব্রাজকে'র এক পঙ্‌ক্তিতে—"বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে!" এসব উদাহরণসত্ত্বেও জীবনের কোমলকান্ত লাবণ্যবিলাস তাঁর রচনার স্বধর্ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র—একথা অবশ্য স্বীকার্য।

তাই "Thou Blessed Dream" কবিতাটিতে রোমান্টিক স্বপ্নচারণের যে গভীর মূল্য বিবেকানন্দ দিয়েছেন, তার প্রাণময় প্রকাশভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের কবিসত্তার একটি অপরিচিত অথচ সহজাত সত্য এ কবিতার সুধন্যসুন্দর স্বপ্ন-বন্দনায় উচ্চারিত। এই স্বপ্নই কবিদের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা-প্রজ্ঞা'--মধুসূদনের 'মধুকরী কল্পনা', কোলরিজের 'imagination' (কল্পনা), স্বপ্ন-বিলাসের সঙ্গে Blessed Dream-এর সম্বন্ধে নেই, জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরূপান্তরে এই স্বপ্নের সার্থকতা। কবিতাটির শেষ তিনটি চরণে এই রূপান্তরের অপূর্ব কাব্যময় অভিব্যক্তি—

১ উদ্বোধন-প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" (৭ম খণ্ড) গ্রন্থে লেখকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

তোমারি পরশে—প্রাণপুষ্পে হিল্লোলিত জাগে মরুভূমি,
মধুর সঙ্গীতে ভরে ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আস্বাদ।

বিবেকানন্দের কল্পনাজগতে ভীষণের এই মধুময় পরিণতির সাক্ষ্য আর কোনো কবিতায় নেই। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে বাস্তবের নিষ্ঠুর সংঘাতে স্বদেশ ও বিদেশে তিনি জীবনের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, তার ফলেই হয়তো বেদনা ও মৃত্যুর প্রতি তাঁর যতটা আত্মীয়তাবোধ ছিল, জীবনের সুখস্বপ্নের প্রতি সে তুলনায় মমতাবোধ অনুপস্থিত।

কিন্তু বাইরের ঘটনা দিয়ে কবির অন্তরজীবনকে বিচার করতে গেলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। বিবেকানন্দের একটি পত্রে তাঁর যে আত্মবিশ্লেষণ পাই, এক্ষেত্রে সে কথাই বেশী মূল্যবান—

'জগতে দু'জাতের লোক আছে। এক ধরনের হলো—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতিস্বীকারে রাজী, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সৎ সহৃদয় মধুরস্বভাব ইত্যাদি। তাদের জন্যই এই দুনিয়া, তারাই সুখী হতে জন্মেছে। আবার অন্য ধরনের লোকও আছে, যাদের স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানকরকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং এই মুহূর্তে উচ্চগ্রামে উঠছে, পরমুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম দলের লোকেরা মাঝামাঝি এক সুখের জগতে বাস করে। শেষোক্ত দলের মানুষ অপার আনন্দে ও গভীর বেদনার স্তরে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের দ্বারাই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের দল তৈরী হয়। 'প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'—এই আধুনিক মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত।

এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড়ো হতে চায়, তবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে ফেলে লড়াই করতে হবে। তাদের কোনো দয়া থাকবে না—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই

এক চিন্তা ছাড়া আর কোনো অনাবশ্যক আসক্তি নয়। সেই এক আদর্শের জন্য জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র আদর্শ 'বেদান্ত', আর আমি 'লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার।'[১]

জীবনের মহত্তম আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন বলেই সবচেয়ে গভীর দুঃখের ভার তাঁকে বহন করতে হয়েছিল—"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" পরমসত্যকে কেবল আপন অনুভূতির সীমায় আবদ্ধ করে রাখা চলবে না—ঘরে ঘরে এই অমৃতমন্ত্র ঘোষণা করতে হবে—তাই তো নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস। এই সীমাবদ্ধ দেহমনের জগতে সেই অসীমের উপলব্ধি সম্ভব করে তুলতে হবে—তাই তাঁর পক্ষে কোনো আসক্তি, কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। অথচ ওই অনাসক্তি বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত চিরন্তন প্রেমপ্রবাহের উপলব্ধিতেই সত্য হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবনেও এই দুঃখচেতনাই প্রেমের আলোকে পরিণত! এমনি এক মহৎপ্রেমের আহ্বানেই বিবেকানন্দ মানব-জীবনের দুঃখ বেদনা মৃত্যু অন্ধকার—এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে চিরন্তন সংগ্রামের পথে চলেছেন—নবযুগের নচিকেতা ধর্মরাজের শেষ উত্তর না শুনে তো ফিরে আসতে পারেন না।

তাই বুদ্ধিগত দার্শনিকচর্চায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেন নি। চাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান। বর্তমান ভারতের এই সংশয়িত জিজ্ঞাসার উত্তরে চিরন্তন ভারতবর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে জানালো, "তিনি আছেন। আমি তাঁকে দেখেছি।"

উপনিষদের আত্মোপলব্ধির অপূর্ব আলোক বিবেকানন্দ আপন অন্তরে অনুভব করলেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

---

১ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা চিঠি। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৮২

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

ব্রহ্মসঙ্গীতানুরাগী নরেন্দ্রনাথের দুটি অমর-গীতি রচনায় এই পরম-উপলব্ধির বাণীরূপ বিধৃত। 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়' নামে এই গান দুটি বিবেকানন্দের কবিতা-সঙ্কলনে উল্লিখিত।[১]

প্রথমটিতে অনাদি অনন্ত নামবর্ণহীন দেশকালহীন ব্রহ্ম বা আত্মায় কাবণরূপে বাসনার উদ্ভব—"বহু স্যাং প্রজায়েয়।" এই বাসনা থেকে অহংজ্ঞানের উদ্ভব। স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নেতিবিচারের ঊর্ধ্বে। অহং-জ্ঞানের অবস্থা থেকেই সূক্ষ্ম ও জড়জগতের, 'সুখ দুঃখ জরা জনম মরণে'র সৃষ্টি।

সে অপাব ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি, কে করে গণন॥

এই একই ব্রহ্ম থেকে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জগৎ-সৃষ্টি চলেছে, তাই এ সৃষ্টিও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—"সেই সূর্য, তারি কিরণ; যেই সূর্য সেই কিরণ।"

দ্বিতীয় গানটিতে বিপরীতক্রমে এই সৃষ্টি থেকে আত্মা আপনাকে সংহরণ করে স্ব-স্বরূপে মগ্ন হতে চলেছে—সেই অর্থেই প্রলয়। স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় উপনিষদশ্লোক 'ন তত্র সূর্যো ভাতি'র ছায়ানুসরণে এ গানের প্রথম চরণের সূত্রপাত—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ॥

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৬৬-৬৭

সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

ধ্যানতন্ময় চিত্তে বিশ্বজগতের অনুভূতি ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে বিলীন হবার পর কেবলমাত্র অহং চেতনার ধারা বইতে থাকে। এই অহং চৈতন্যের পরপারেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অবস্থা। মানবভাষা কেবল 'এ নয়,' 'এ নয়', 'নেতি' 'নেতি' বলে তার আভাসমাত্র দিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—কেমন ঘি? না—যেমন ঘি।

বিবেকানন্দের গানে—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। অপরোক্ষানুভূতির কাব্যরূপায়ণে এ গান দুটি উপনিষদের সৌন্দর্য-মহিমার অধিকারী।

এই সমাধিস্তর থেকে লোককল্যাণের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের উত্তরণ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের চোখে বিবেকানন্দ-হৃদয়ের অতুলন মানবপ্রেমই সবচেয়ে বেশী সমাদরের বস্তু। সাহিত্যের জগতে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও মানবপ্রেম -দুইই সমান আগ্রহের বিষয়।

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য-দুইই লক্ষণীয়। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আত্মসত্যের যোগে যে একাত্ম-অনুভূতি, সেক্ষেত্রে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারার উত্তর-সাধক; ব্যষ্টিগত মুক্তিসাধনাকে সমষ্টির মুক্তিসাধনায় পরিণত করার সঙ্কল্পে তিনি বুদ্ধের মহাকরুণার অধিকারী—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রেম ও অনুরাগ দরিদ্র, মুর্খ, পাপী, লাঞ্ছিতের প্রতি। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় তাঁর ব্যথিত দৃষ্টি অপমানিত মানুষকেই সবচেয়ে আগে বরণ করেছে। তাই তো তাঁর আকাঙ্ক্ষা[১]—"May I be born again and again and suffer thousands of

---

১ আমি যেন বারে বারে ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ ও বেদনা ভোগ করি, যাতে করে আমি আমার সেই একমাত্র ঈশ্বর, যাঁকে আমি বিশ্বাস করি, যিনি সমস্ত আত্মার সমষ্টিস্বরূপ, তাঁরই পূজা করতে পারি। সবার উপরে

miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in—the sumtotal of all souls; and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species is the special object of my worship."

সব জাতির সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যারা দুঃখী, দরিদ্র, এমনকি দুরাত্মা—তাঁরাই বিবেকানন্দের ভগবৎ-উপাসনার বিশেষ লক্ষ্যস্থল। সর্বজীবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তায় যাঁর বিশ্বাস, 'পাপী' বলে কাউকে চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বরং বিবেকানন্দের মতে—"Ye divinities on earth—sinner? It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature."[১] [চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ তারিখে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' নামে লিখিত ভাষণ।]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের এই স্খলন পতন ত্রুটি তার আত্ম-স্বরূপের আবরণমাত্র। এক হিসাবে এই অধঃপতনের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিবিকাশের সহায়তাই হয়; পঙ্ক আছে বলেই পঙ্কজের মূল্য আমরা বুঝি। 'Angels Unawares'[২] কবিতাটিতে স্বামীজী তিনটি চরিত্রের রূপরেখায় মানবজীবনে এই দুঃখ ও কলঙ্কের গভীরতর সার্থকতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মানুষ জীবনের বেদনার দিকটিকে বেশী করে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতার সঙ্গে

খলরূপী ভগবান, দুঃখীরূপী ভগবান, আমার ভগবান যিনি সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর দরিদ্রমানবসাধারণ—এঁরাই বিশেষভাবে আমার পূজনীয়।

১ হে অমৃতের পুত্রগণ! পাপী?—মানুষকে পাপী বলাই তো পাপ। মানবস্বভাবের বিরুদ্ধে—এ তো চিরন্তন মিথ্যা নিন্দা!

২ Poems: অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত কাব্যসঙ্কলন। বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ডে কবিতাটির লেখককৃত অনুবাদ 'অজানা দেবতা' দ্রষ্টব্য।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একদা এই বেদনাবোধকে মহত্ত্বের একটি আবশ্যিক লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গত সব সুখেরই সহজ অবসানের বাস্তবসত্য তাঁদের মনে করিয়ে দেয়—"The whole life is only a swan song."[১] এই বেদনার মূল্যে জীবনের সত্যকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দুঃখবাদী মনোভাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, দুঃখবাদ জীবনের নেতিবাচক দিকটির কাছে পরাজয় স্বীকারেরই অভিব্যক্তি। বিবেকানন্দের কাছে এই 'দুঃখ'-চেতনা সাময়িক বা সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে বিচার্য নয়, জীবনের সুখদুঃখ-কলরোলের অন্তরালে যে চিরন্তন অতৃপ্তি বিশ্বমানবের হৃদয়ধর্ম বিবেকানন্দের বেদনাবোধ সেই অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি।

মৃত্যু, অন্ধকার, কালী—বিবেকানন্দের কবিতায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ তিনটি প্রতীক। রোগশোকদুঃখমৃত্যুর জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই বিবেকানন্দের মাতৃবন্দনা। তাই মহানিশার অন্ধকারে করালিনী কালীমূর্তিতে এই সংগ্রামী জীবনচেতনা আপন সার্থক রূপকল্পটি খুঁজে পেয়েছে। তন্ত্রের কালিকামূর্তি বিবেকানন্দের ধ্যানস্পর্শে প্রকৃতি ও মানব-চেতনার অন্তরে-বাহিরে পরিব্যাপ্ত যে অমোঘ জীবনসত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে, বাংলা সাহিত্যে তার অভিনবত্ব ও পরিপূর্ণতা এক আশ্চর্য সার্থকতার উদাহরণ!

বিবেকানন্দের কালী-কল্পনায় বাংলার শাক্তসাহিত্যের রুদ্রমধুরা বিশ্বজননীর রুদ্রাণীরূপটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। মূলতঃ অদ্বৈত-সাধক হ'লেও রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ধারাবাহী বিবেকানন্দ জানতেন, "তারা আমার নিরাকারা।" এই দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈতে প্রয়াণের মধ্য দিয়ে 'সত্যে'র ক্রমবিকশিত পরমসত্তাটি আবিষ্কার করাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার বিশিষ্ট দান। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতিলব্ধ কালিকা-

১ The Master As I Saw Him: Comp. Works of S. Nivedita Vol I. P 124 'সমস্ত জীবন শুধু মরণেরই অস্তিমসংগীত'।

মূর্তি বিবেকানন্দের অদ্বৈতচিন্তার পটভূমিতে তাই স্বাভাবিক প্রেরণাতেই প্রকাশিত।

'সখার প্রতি"[১] কবিতায় সমগ্র জীবনসত্যের প্রতীকরূপে—

হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।

মায়ের মৃত্যুরূপ ও মাতৃরূপের মধ্যে এই বীরসন্তানের দৃষ্টিতে ওই মৃত্যুরূপই মানবচৈতন্যের সমস্ত দুঃখবেদনার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পটভূমিতে মহাকালী-মূর্তিতে আবির্ভূত—

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায়
কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীদর্শনের দিন কয় আগে মাতৃধ্যানে তন্ময় বিবেকানন্দের লেখনী থেকে "Kali the Mother" কবিতার আবির্ভাব। কবিতার জগতে এই শ্রেণীর সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে হয় বলেই 'আবির্ভাব' কথাটি ব্যবহার করছি। কোনো কোনো কবিতা কবিরা লেখেন, কোনো কোনো কবিতা কবিদের অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, কবিরা সেক্ষেত্রে উপলক্ষ্যমাত্র। এই অর্থেই উপনিষদের কবিরা মন্ত্রদ্রষ্টা।

এই কবিতাটির রচনাকালীন অন্যতম সাক্ষী নিবেদিতার কথায়—His brain was teeming with thoughts, he said one day and his fingers would not rest till they were written down. It was that same evening

১ বীরবাণী।

that we came back to our houseboat from some exepedition and found waiting for us, where he had called and left them, his manuscript lines on "Kali the Mother." Writing in a fever of inspiration, he had fallen on the floor, when he had finished—as we learnt afterwards—exhausted with his own intensity."[১] [The Master As I Saw Him : Complete works of Sister Nivedita : Vol I. P 94]

ক্ষীরভবানীদর্শনের পর যখন এই চিরবিদ্রোহী সন্তান উপলব্ধি করলেন, মায়ের ইচ্ছাই তাঁকে—তাঁর ভারতবর্ষকে, বিশ্বজগৎকে পরিচালিত করছে, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র—সেই সময়ে একদিন আলাপচারী বিবেকানন্দ Kali the Mother থেকে চরণ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—এর সবটাই সত্য সত্য এসেছিল, এর প্রতিটি শব্দ—

Who dares misery love,
And hug the form of death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.—তার কাছে

মা সত্যি সত্যিই আসেন। আমি তা প্রমাণ করেছি। মৃত্যুকে আমি আলিঙ্গন করেছি।"[২] Kali the Mother এর অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

১ একদিন তিনি বললেন, যে ভাবকল্পনায় তাঁর মনোজগৎ পূর্ণ হয়ে আছে, যতক্ষণ না সেগুলি লিখে ফেলতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর আঙুলগুলি স্বস্তি পাচ্ছে না। সেইদিনই বিকেলবেলা আমরা ছোটখাট এক অভিযান সেরে ফিরে এসে দেখলাম 'কালী দি মাদার' (জননী কালিকা) কবিতার পাণ্ডুলিপিতে সেই চিন্তারাশি তিনি লিপিবদ্ধ রেখে চলে গেছেন। পরে জেনেছিলাম—এক দিব্যপ্রেরণায় এ রচনা শেষ হওয়ার পরে তীব্র আবেগে অবসন্ন স্বামীজী লেখা শেষ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

২ The Master As I Saw Him : Complete works of Sister Nivedita : Vol I : p 99

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ু বেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।[১]

অনুবাদের নিজস্ব কাব্য-সার্থকতার এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

Kali the Mother-এর পাশাপাশি সার্থকতার বিচারে সমতুল্য The Cup (পানপাত্র) কবিতাটি। কবির ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের এমন বেদনাঘন রূপায়ণ কবিতার জগতে খুব বেশী চোখে পড়ে না।

The Cup-এর চিত্রকল্পটি যীশুখ্রীষ্টের জীবনকাহিনী থেকে গৃহীত—যীশুর সেই cup of blood—যে পানপাত্রের স্মরণে টমাস-আ-কেম্পিস ঈশানুসরণ (The Imitation of Christ)-গ্রন্থে লিখেছেন—"Many follow Jesus unto the breaking of bread, but few unto the drinking of the cup of His Passion."—সেই বিরল সাধকদের অন্যতম বিবেকানন্দ—যাঁর হাতে তাঁর জীবনদেবতা তুলে ধরেছেন যুগযুগান্তরের বেদনামথিত বিষপাত্র—

১ কাব্যসঞ্চয়ন: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

This is your cup—the cup assigned to you
From the beginning.

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে
সৃষ্টির উন্মেষ হতে এ পাত্র রচনা।

এ জীবনে সুখ, তৃপ্তি, আনন্দের ছায়াশীতল রাজপথ আছে, তবু কবির জীবনদেবতা জানেন সে পথ তাঁর ভক্তের জন্য নয়—

দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ,
প্রতিপদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত,
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার।
তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধরে ;—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—আর কারো তরে নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায়
আছে তারো স্থান। লও এই পানপাত্র,
বুঝিতে বলিনি আমি কি অর্থ ইহার,
শুধু ধ্যাননেত্রে দেখ স্বরূপ আমার।[১]

বীরভক্তের জন্যই এই দুর্গম পথযাত্রার সাধনা। এ জীবনে দুঃখমৃত্যু ক্ষয়ক্ষতিরও যে নিজস্ব মূল্য রয়েছে, বেদনাবিষের পেয়ালাও যে তাঁরই হাতের দান! এ দান গ্রহণের যোগ্যতা তো সকলের নেই—

But it is not meant for any other hand—

যার সে যোগ্যতা আছে, তারও কোনো প্রশ্নের অধিকার নেই, দুঃখবরণের মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর, সব জিজ্ঞাসার সমাধান···

I do not bid you understand.
I bid you close your eyes to see My face.

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : লেখককৃত অনুবাদ।

জীবনে দুঃখের এই পরমমূল্যকে বিবেকানন্দ চিরদিন স্বীকৃতি জানিয়েছেন, কারণ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় ও মানবজীবনের ইতিহাসচর্চায় তিনি অনুভব করেছিলেন—"বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন?" [পত্রাবলী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০]

"Let eyes grow dim and heart grow faint,
And friendship fail and love betray,
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way.

স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেম প্রতারণা হোক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ রোক।
রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমিই দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।[১]

---

১ শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা পত্রকাব্যমালার প্রথম চিঠি। "বীরবাণী"-গ্রন্থে The Song of the Free নামে এ চিঠির অংশবিশেষ এবং কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদ "জীবন্মুক্তের গীতি" দ্রষ্টব্য। সমগ্র পত্রকাব্যমালার শংকরীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ: বাণী ও রচনা: দশম খণ্ড: পৃঃ ২২৭-২৩৫

জীবনের ললিত ও কঠোর ভাবসত্যের পাশাপাশি ছবি স্বামীজী এঁকেছেন 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতে। মানবপ্রাণের স্বাভাবিক সুখলালসার উদ্দেশে কঠোর কশাঘাত হেনে বলেছেন—

সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥

ভারতীয় সাহিত্যে ললিত সৌন্দর্যের চিরশ্যামল প্রতীক বৃন্দাবনের কৃষ্ণকাহিনী স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন ইন্দ্রিয়াধীন সাধারণ মানুষের জন্য গোপীপ্রেমের আদর্শ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। জীবনসংগ্রামে উদ্যত নবীন ভারতের জন্য প্রয়োজন উমা-মহেশ্বরের তপস্যাকঠোর বৈরাগ্যমণ্ডিত জীবন-সাধনা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের চেয়ে কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথি, গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণই তাঁর কাছে বরণীয়, "সুখবনমালী"র চেয়ে "মৃত্যুরূপা কালী"ই আরাধ্যা।

সাহিত্যিক বা ভাবুক ভক্তের মুখে দুঃখবন্দনা খুব নতুন কিছু নয়। দুঃখবিলাস বা ভবিষ্যৎ সুখের আকাঙ্ক্ষায় দেবতার বন্দনা—এ দুইই মানবমনের 'ভাবের ঘরে চুরি'। সামান্য রক্তপাত দেখেই যার মূর্ছা হয়, নিজেকে সে পরম দয়ালু ভেবে প্রতারণা করে। এই আত্মপ্রতারণা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে বিবেকানন্দের সুতীব্র শ্লেষ উচ্চারিত—

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্মকথা বলি কাকে?

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এই কাপুরুষতাই পাপ; আত্মবিশ্বাসের অভাবই অন্তরাত্মার সুপ্তির কারণ। সব ভীরুতা ও দুর্বলতার অবসানে আমাদের প্রসুপ্ত আত্মরূপী সিংহ জেগে উঠুক, জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক সৈন্যদলের মৃত্যুউপেক্ষাকারী দৃঢ়তা আমাদের দেহে মনে সঞ্চারিত হোক, বীর সন্ন্যাসীর এই ছিল প্রার্থনা—

জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

আজকের ভারতবর্ষের কাছে এই মহাবাণীর তাৎপর্য যত বেশী এতখানি বোধ হয় কোনদিনই ছিল না। তবু এ শুধু অতীত বা বর্তমানের নয়, চিরকালের মানবাত্মার সংগ্রাম-মন্ত্র।

সংগ্রামী সন্ন্যাসী ঘোষণা করেছিলেন: 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার';—জীবনভোর জড়তা ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন সংগ্রামে সে পূজার মন্ত্র বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। দেশের জন্য যাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রচনাবলী পড়ে তাঁরা স্বদেশপ্রেমের অর্থ বুঝেছেন। পরম সত্যের জন্য যাঁরা চরম ত্যাগের পথে গিয়েছেন, তাঁরা তাঁর জীবন ও বাণীতে ব্রহ্মাস্বাদের সন্ধান পেয়েছেন। স্বয়ং তিনি সংসারপাশ-মুক্ত দৃপ্ত বেদান্তকেশরী—জাতির জীবনে ওই পৌরুষের আদর্শ সঞ্চারই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

জগৎ ও জীবনের দুটি আপাত বিভিন্ন দিক তাঁর কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল—

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল
গুঞ্জরিছে আশে আশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী
বিতরিছে ধরাবাসে ॥

*

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিঃস্বন, মহারণ,
ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার,
হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু ॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

পুরাণ ও তন্ত্র থেকে ভারতীয় সাহিত্যের দুটি প্রতীক, জীবনের

এই কোমল-কঠোর দ্বৈতসত্তার রূপায়ণ—স্বামীজীর ভাষায়, 'সুখবনমালী ও 'মৃত্যুরূপা কালী'। জীবনের এই দ্বৈতরূপের মধ্যে বিবেকানন্দের সংগ্রামী-সত্তা ভীষণকে বরণ করেছে, ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে মহাপ্রলয়ের মধ্যে জীবনের সার সত্যকে উপলব্ধি করেছে। রোগ শোক জরা মৃত্যুর প্রতিকারচিন্তা নয়, ঐ অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও ধ্বংসের অন্তরালে ভগবৎশক্তির গভীরতম প্রকাশ উপলব্ধি করা—এই ছিল তাঁর সাধনা।

আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা সাহিত্যিক কল্পনায় দুঃখবাদ একটি সুপ্রচলিত চিন্তাধারা। এই দুঃখ-কামনার আসল স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ একটি সুখময় পরিণতির আকাঙ্ক্ষা থেকে আপাত দুঃখবরণের মোহ মানুষকে পেয়ে বসে। বস্তুত কোনো স্থায়ী মঙ্গলবোধের আদর্শ মনে না থাকলে মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হতে উৎসাহ পায় না। সেই মঙ্গলবোধের আদর্শ বিভিন্ন দেশে ও কালে মানুষকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করে নিয়ে গেছে। কিন্তু এই মঙ্গলবোধ শেস অবধি সাফল্য ও সচ্ছলতার ঊর্ধ্বে কোন নিশ্চিততর প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না বলেই নিজের হাতে-গড়া প্রাসাদ নিজের হাতে ভাঙার ইতিহাসে সভ্যতার রাজপথ পরিকীর্ণ।

স্বামীজীর দুঃখচেতনা এ জাতীয় সুখাকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত নয়। দুঃখকে দুঃখের মূল্যেই উপলব্ধি করার পৌরুষ তাঁর জীবনাদর্শ।—

"Worship the terrible! Worship Death! All else is vain. All struggle is vain. Yet this is not coward's love of death, not the love of the weak, or the suicide. It is the welcome of the strong man, who has sounded everything to his depths, and knwos that there is no alternative......"[১]

১ The Master as I Saw Him: Comp. works of Sister Nivedita: Vol I: p 128

ভয়ঙ্করের আরাধনা কর। মৃত্যুর বন্দনা কর। আর সবই বৃথা, সব প্রচেষ্টাই বৃথা। কিন্তু এ ভীরুর মৃত্যুকামনা নয়; দুর্বলের মৃত্যুপ্রেম নয়, আত্মহত্যাও নয়। যে বীর জীবনের প্রতিটি জিনিসকে তলিয়ে দেখেছে এবং বুঝেছে যে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, এ সেই বীরের আহ্বান……"

"How few have dared to worship Death, or Kali ! Let us worship Death ! Let us embrace the Terri le, because it is terrible , not asking that it be toned down. Let us take misery, for misery's own sake."[১]

'কালী বা মৃত্যুকে ক'জন পূজা করতে সাহস করেছে। এসো আমরা ভয়ঙ্কর বলেই ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি, যেন সে ভয়ঙ্করকে নম্র হতে না বলি। এসো দুঃখের জন্যই আমরা দুঃখকে গ্রহণ করি।'

"…আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না: ওটি যে ছাড়বে না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি ?…এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে…তবে মানুষ।…কাপুরুষ দয়ার আধার!"[২]

সাহিত্যে, শাস্ত্রে, জীবনে এই সংগ্রামের আদর্শ যাঁদের মধ্যে পেয়েছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে সদা সচেতন। গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, প্যারাডাইস লস্টের শয়তান, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দসিংহ, নেপোলিয়ন, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ—সংগ্রামী-চেতনার এই বিভিন্ন আদর্শগুলি স্বামীজীর কথোপকথনে বারংবার উল্লিখিত। উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের

১ Complece Works of Sister Nivedita : Vol I . p 123

২ ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা পত্রাংশ। বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৮০

সংগ্রাম তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতিতর্পণে সর্বাগ্রে স্থান পেত।[১] তাঁর নিজের জীবনও তো প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রামরত এক অনন্য সেনাপতির যুদ্ধকাহিনী।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে বিদেশী ভাবধারায় আমাদের ভারতীয় জীবনাদর্শ প্রায় সমাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতার প্রত্যয় নিয়ে বিবেকানন্দের প্রতীচ্য-অভিযান ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। সে গৌরব-কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে আসমুদ্রহিমাচল-পরিভ্রমণকারী পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ইতিহাস; অনাহারে অপমানে লাঞ্ছনায় অবিচলিত থেকে আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রাম্যমাণ বিবেকানন্দের ইতিহাস। প্রিয়শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিকাগো মহাসভার অধিবেশনের তিনসপ্তাহমাত্র আগে তিনি লিখছেন—"আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি। কিন্তু মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের হাতে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ সমর্পণ করছি।···প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হয়ে মরতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করবে। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়হীন মস্তিষ্কসার ব্যক্তিদের এবং তাদের নির্বীর্য্য সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পিছনে চেয়ো না। কে পড়ে গেল দেখতে যেয়ো না। এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো। এমনি করেই আমরা অগ্রগামী হব,—একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান অধিকার করবে।" (২০শে আগস্ট, ১৮৯৩)

---

১ ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি শিষ্যসংবাদ' দ্রষ্টব্য।

চিকাগো মহাসভায় আমেরিকাবাসী এই জীবন-যোদ্ধার ললাটে বিজয়তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু এই সাময়িক সাফল্যকেই স্বামীজী জীবনের চরম জয় মনে করেন নি। আমেরিকা, ইংলণ্ড, য়ুরোপ ঘুরে এসে তাঁর সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে স্বদেশবাসীর সঙ্গে। এই আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন আত্মবিশ্বাসহীন দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য অনুক্ষণ চিন্তা ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট জীবন তিনি আহুতি দিয়েছেন। অন্তরে অন্তরে এই সদাজাগ্রত সংগ্রামচেতনা বহন করতেন বলেই বোধ হয় "নাচুক তাহাতে শ্যামা"-র নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটিতে স্বামীজী যুদ্ধের একটি বাস্তব আদর্শদীপ্ত ছবি এত প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছেন—

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্ ঝর্‌র্ দামামা নকাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ, বব-বব বম্, বব-বব বম্ বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থরথর, লক্ষ অশ্ববর—পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম, গোলাবরিষণ, গুলি শন শন, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্য-পরিচয়, পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায়, মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

পদাতিকযুদ্ধের এই বর্ণনাটিতে যুদ্ধের বাস্তব বর্ণনাকে ছাপিয়ে উঠেছে যোদ্ধাদের অন্তর্নিহিত বীরধর্মের প্রেরণা। পতাকাধারী বীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বীর তার ধ্বজা নিয়ে সহযোদ্ধাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে—এই চিত্রটি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে রূপায়ণযোগ্য।

এই জীবনযুদ্ধের দুটি দিক—বীর্যপরিচয় পতাকাধারীর অগ্রগতি

যতটা সত্য, ঠিক ততখানি সত্য সহস্র সহযোদ্ধার স্তূপাকার মৃতদেহ। এমনি করে সহস্র মরণের মধ্য দিয়ে জীবনের জয়পতাকা এগিয়ে চলে। অথবা, শুধু জয় নয়; পরাজয়, অপমান লাঞ্ছনা—রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু,—এ সবই জীবনযুদ্ধের অঙ্গ। এই নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন যে হ'তে পেরেছে, সেই তো মায়ের যথার্থ সন্তান, যথার্থ সৈনিক।

কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ আমরা ধারণা করতে পারি না। আমাদের মধ্যে দুঃখবিলাস যে পরিমাণে রয়েছে, দুঃখস্বীকৃতি সে পরিমাণে নেই। তাই ভক্তমহলে এমন উদাহরণ প্রচুর মেলে যারা ভগবানকে সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে থেকেই দেখতে অভ্যস্ত। অসুন্দর ও অমঙ্গলের অস্তিত্বকে তাঁরা পরিণামে সুখকর বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকেন; বলাই বাহুল্য, জীবনের চরম বিপর্যয়ের সামনে এ ধরনের মনগড়া স্তোকবাক্য মুহূর্তে মিথ্যায় পরিণত হয়। স্বামীজীর ভাষায়—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়,
কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে এই মৃত্যুরূপা মাতার পূর্ণ প্রকাশ Kali the Mother কবিতাটিতে।

বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের কাব্যমূর্তিরূপে Kali the Mother কবিতাটির প্রতিটি চরণ গভীর অভিনিবেশ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভবিষ্যতের কোনো দ্রষ্টাপুরুষের ধ্যানদৃষ্টিতে এ

কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হয়তো ধরা দেবে। তবু আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণা নিয়ে এ কবিতার কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রথমে একটি নিবিড় অন্ধকারের বর্ণনা—যে অন্ধকারে The clouds are covering clouds—"মেঘ এসে আবরিছে মেঘ।" ঋগ্বেদের সৃষ্টিসূক্তে যে অন্ধকার-বর্ণনাটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয়—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—তার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত কালিকা ধ্যান "মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং"—সেই মহামেঘান্ধকার মিশে গিয়ে এ যেন প্রাক-সৃষ্টির অনুরূপ প্রলয়পূর্ব অন্ধকার।

বিপুল ক্রন্দন, বিরাট ধ্বংসের আলোড়নে—

"স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ুবেগ।"

এই প্রলয় ঝড়ের উন্মুক্ত তাণ্ডবের মাঝখানে কবিচৈতন্য মহা-শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে আহ্বান করেছেন "Come, Mother Come."[১] এমন মহাপ্রলয়ের প্রেক্ষাপটে ভূলোক-দ্যুলোকব্যাপী যে চরম-সংগ্রাম চলেছে তারই মধ্যে তো রণরঙ্গিণী মায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ—যে মা দুঃখ-দৈন্য-বেদনা-সংগ্রামের সম্মিলিত রূপমূর্তি। একদিকে ওই নিবিড় অন্ধকার, আর একদিকে এই উন্মত্ত ঝড়—বিবেকানন্দের ভাবলোকে দুঃখ, ধ্বংস ও সংগ্রামের মিলিত স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। এই বিপুল ভাবপ্রেরণার আপন স্বধর্ম থেকেই মৃত্যুরূপা মহাকালীর এই অতুলনীয় চিত্রকল্পটি জেগে উঠেছে।

তন্ত্রোক্ত কালিকা-ধ্যানে এই মহাকালী-কল্পনা বীজরূপে নিহিত। কিন্তু স্বামীজীর দিব্যকল্পনা এই ছোট্ট কবিতাটির স্বল্পসীমায় জলে স্থলে আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত মহাপ্রলয় ও রোগ শোক ধ্বংস মহামারীর বিপুল তাণ্ডবের সমন্বয়ে যে জীবনসত্যের উপলব্ধি রূপায়িত করেছে, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা অচিন্তিতপূর্ব।

সবচেয়ে লক্ষণীয়, কবিতাটির শেষ দুই চরণে এসে এই ধ্বংস-রূপিণীর মহাপূজার যে তিনটি উপকরণের কথা স্বামীজী বলেছেন—

১ 'আয় মা আয়'।

দুঃখ দৈন্যকে ভালোবাসার সাহস, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা, ধ্বংস-নৃত্যে যোগদানের উন্মাদনা—এ যার আছে তারই হৃদয়ে মায়ের আবির্ভাব—To him the Mother comes. বিবেকানন্দের এই মা অভয়াবরদারূপিণী ন'ন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুরূপা, তাঁর হাতে 'বিষকুম্ভ'-ভরা রোগ-মহামারী। সাধারণ মানবদৃষ্টিতে তিনি চরম অমঙ্গল-রূপিণী। এই অমঙ্গলের আরাধনাই বীরের সাধনা। দুঃখের জন্যই দুঃখবরণের সাহস—এই ছিল স্বামীজীর বীরত্বের আদর্শ।

জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখস্বপ্নের সমাধিভূমিতে ভারতবর্ষের কবিকল্পনা শিব ও শক্তির বিহারস্থান নির্দেশ করেছে। মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃত উপলব্ধির সাধনায় রুদ্র ও রুদ্রাণীর যে ধ্যান যুগে যুগে সাধকচিত্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বিবেকানন্দের জীবনে ও কাব্যে সেই ধ্যানই সংগ্রামের তরবারিতে পরিণত। ওই সংগ্রামে পরাজয়ের হতাশা প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। আসল সংগ্রাম তো এই হতাশার সঙ্গে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে জীবনের পরাজয় ও ব্যর্থতার অসীম মূল্য—"Never mind failures ; they are quite natural, they are the beauty of life—these failures. What would be life without them? It would not be worth having if it was not for struggles. Where would be the poetry of life?" ব্যর্থতার জন্য দমে যেয়ো না ; এই ব্যর্থতা একান্ত স্বাভাবিক—এরাই তো জীবনের সৌন্দর্য। এদের ছাড়া জীবন কি হয়ে দাঁড়াবে ? সংগ্রাম না থাকলে জীবন-ধারণের কোনো সার্থকতাই থাকত না। কোথায় থাকত জীবনের কাব্য ?"

জীবনের কাব্য-সৌন্দর্যকে যিনি ব্যর্থতা ও সংগ্রামের মাঝখানেই উপলব্ধি করেছেন সেই নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় বলেছিলেন—'খাপখোলা তলোয়ার।'

অথচ ওই সংগ্রামচেতনা তাঁর Kali the Mother কবিতায়

যখন সবচেয়ে ঘনীভূত আকারে দেখা দিয়েছে, তখন তাঁর হৃদয়ে বিশ্বজগতের জন্য অপার করুণা, অনন্ত প্রেম উৎসারিত। নিবেদিতার স্মৃতিকথায় এই সময়কার বিবেকানন্দমানসের প্রতিফলন—"একমাত্র প্রেম ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। লোকে যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় আচরণও করে তবু তাকে আমরা ভালবেসে যাব. শেষ পর্যন্ত এ প্রেমকে তারা স্বীকার না করে পারবে না।"[১]

দুঃখ, সংগ্রাম ও প্রেমের এই যোগসূত্রটি স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মর্মস্থল থেকে আবিষ্কার করতে পারলেই তাঁর কবিসত্তার সবচেয়ে বড়ো রহস্যটি ধরা পড়ে, যে রহস্যের প্রেরণায় তিনি বলেছিলেন—"Through the terrors of evil, say—my God, my love! Through the pangs of death, say—my God, my love! Through all the evils under the sun, say—my God, my love! Thou art here, I see Thee. Thou art with me, I feel thee."[২] যে বিপুল বিশ্বচেতনার উদ্বোধনে সব দুঃখ সব যন্ত্রণা এমন পরমপ্রেমে পরিণতি লাভ করে—কবিতার জগতে তার চেয়ে বড়ো সত্যের প্রেরণা আর কি থাকতে পারে? উদ্ধৃত গদ্যাংশটুকু কী গভীর প্রেরণার আবেগে মণ্ডিত! বক্তৃতা ও রচনায় এমন আবেগস্পন্দিত উদাহরণ বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অজস্র। অন্তরের অন্তরে এক মননশীল কবিব্যক্তিত্বের সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের রচনাবলীতে একাধারে সাহিত্য-সৌরভ ও প্রজ্ঞাবাণীর এমন সার্থক সম্মেলন।

১ The Complete Works of Sister Nivedita : Vol. 1 : The Master as I Saw Him. Kshir Bhowani : p 99

২ "অমঙ্গলের ভয়াবহতার মধ্যে বলো, 'প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর।' মরণ-যন্ত্রণার মধ্যে বলো, 'প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর'। জগতের যত অকল্যাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলো, 'প্রিয় আমার আমার ঈশ্বর! তুমি এইখানে রয়েছ, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাথে রয়েছ, আমি তোমায় অনুভব করছি।'

'সখার প্রতি' বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা, সংগ্রাম, বেদনা ও অভিজ্ঞতার অন্তরতম পরিচয় এ কবিতার প্রতিটি চরণে নিবিড় সংহতি নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানব-জীবনের সব ছদ্মবেশ, সব শোভনতার আড়ালে যে অপার দৈন্য, অতল অশ্রু নিহিত, বিবেকানন্দের মতো এমন নির্মম বাস্তবদৃষ্টিতে তার আবরণ-উন্মোচন তো আর কারু সাধ্য ছিল না। আবার এই দৈন্য ও হীনতার অন্তরালে প্রেমের যে অনির্বাণ আলো মানবহৃদয়ে চিরজাগ্রত—সেই মহাসত্যকে উপলব্ধি করাও মানব-মহিমার আর এক বিস্ময়কর উদ্ঘাটন।

বিবেকানন্দের কথা অনুসারে—খেলার আনন্দ খেলোয়াড়ের চেয়ে দর্শকেরই বেশী। সংসার-চক্রের আবর্তনে থেকে যারা এই সংসারকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছে, তাদের পক্ষে মানব-চরিত্রের এমন নির্মম বিশ্লেষণ বা এমন নিঃস্বার্থ প্রেম—কোনোটাই পুরোপুরি সম্ভব নয়। একান্ত কাছের জিনিসকে কে সম্পূর্ণ জেনেছে!

বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মহাব্রত নিয়ে বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমা করেছিলেন, পৃথিবী-পর্যটনে সেই পরিক্রমার পূর্ণতা। সমসাময়িক পৃথিবীর নানা স্তরের মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিতে এ মানব-সংসারকে বিশ্লেষণ করেছেন—সেই বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে জগৎ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

> আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
> প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান ?
> দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
> স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?

এ জগৎ-রঙ্গশালায় মানুষের এই চির-অভিনয় প্রতিদিনের কাহিনী—সে যা নয় নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। অথচ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্নতার মধ্যে শান্তির বুলি আওড়ানো আমাদের সমান তালেই চলেছে। আদর্শবাদী মানুষের কাছে মানবমনের এই

আত্মপ্রতারণা একান্ত অসহ বলে মনে হয়। এ পৃথিবীতে কেউ কি আদর্শের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পেয়েছে? রোমান্টিক হৃদয়ধর্ম তাই চির-অতৃপ্ত।

১৮৯৬-এর ১৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটিতে শ্রীমতী হেলকে স্বামীজী লিখেছেন—"I will tell you a great lesson I have learnt in this life. It is this: 'The highe1 your ideal is, the more miserable you are.' For such a thing as an ideal cannot be attained in this world—or in this life, even. He who wants perfection in the world is a mad man—for it cannot be. How can you find the infinite in the finite?"[১]

তবু আর সব রোমান্টিকের মতোই বিবেকানন্দও একদা এই জগতেই পূর্ণতার সন্ধান করেছেন—

যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

... ...

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়।
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর, পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।

১ জীবনের কাছে আমি যে এক মহৎ শিক্ষা পেয়েছি সে কথা তোমায় বলছি। তা এই: 'তোমার আদর্শ যত উঁচু, তোমার দুঃখ তত বেশী।' কারণ এ দুনিয়ায় বা এ জীবনে যা আদর্শ তাকে কখনো সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। এ জগতে যে পরিপূর্ণ সার্থকতা চায়, সে উন্মাদ, কারণ সে পূর্ণতা কখনোই পাবার নয়। অসীমকে তুমি কেমন করে সীমার মধ্যে পাবে?' বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃ ২৮২

অসহায়—ছিন্নবাস ধবে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম' এই মাত্র ধন।

'প্রেম'—বিবেকানন্দের সব তপস্যার পরম উত্তররূপে দেখা দিয়েছে। তাই বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংঘাতে বিবেকানন্দ হৃদয়ের চির-পক্ষপাতী। বিচারবিতর্কে নয়, আত্মোৎসর্গের মধ্যেই মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিহিত। 'রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম' থেকে সর্বস্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমিক অবধি সকল সত্তার মধ্যে বিবেকানন্দ এই প্রেমের বিকাশ উপলব্ধি করেছেন—

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসারজলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন[১] শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম।
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।

হৃদয়ধর্মের এই অনন্তবিস্তারে বিবেকানন্দের কবিসত্তার সর্বোত্তম পরিচয়—কঠোরতম সন্ন্যাসীর গভীরতম মানবপ্রেমে এ মহাজীবনের অনন্ত মহিমা। এই প্রেমই তাঁর সন্ন্যাসেরও মূল প্রেরণা। ভালোবাসার বণিকবৃত্তি নয়, ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা—বিন্দুমাত্র প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাহীন নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্জন—তাই বিবেকানন্দের প্রেমের আদর্শ—

১ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতায় 'পক্ষহীন' পাঠ-স্থলে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত ঐ সংখ্যা উদ্বোধনে এবং উদ্বোধন-কার্যালয়ে রক্ষিত 'অজিৎকুমার রায়' এই নামাঙ্কিত প্রথম বর্ষের খণ্ডে উক্ত সংখ্যায় 'লক্ষ্যহীন' পাঠ রয়েছে! 'পক্ষহীন' পাঠই পরে বেশী প্রচলিত।

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

দেবার প্রেরণা এলে দেখতে পাই, অনন্ত সম্পদ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। ফিরে চাইতে গেলেই সে অনন্ত স্বার্থসীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করি মাত্র।

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত জগৎসত্য—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সাহিত্যজগতে রোমান্টিক অন্বেষণের চরম পরিণতি হিসাবে মিস্টিক প্রত্যয়ে উত্তরণের উদাহরণ হিসাবে শেলীর কবিতাকে বলা হয় Love Mysticism-এর উদাহরণ। অর্থাৎ প্রেমের অন্তরে শেলী জীবন ও জগতের সব অসঙ্গতির ঊর্ধ্বে এক নিশ্চিত প্রত্যয় খুঁজে পেয়েছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সে হিসাবে প্রকৃতি-চেতনার ও কীটসকে সৌন্দর্য-চেতনার মিস্টিক কবি বলা চলে। কিন্তু সত্যের পরম প্রকাশে এই অনুভূতিগত পার্থক্যও স্বীকার্য নয়। সে হিসাবে কঠোপনিষদের কবি যখন বলেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

অথবা গীতার কবি যখন ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ হৃদয়ের উপমায় ছবি আঁকেন—

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

তখনই আমরা সৃষ্টিরহস্যের মর্মমূলে উপনীত। বিবেকানন্দের

সর্বত্যাগী প্রেম 'সখার প্রতি' কবিতার শেষ চরণে সেই গভীরতম সত্যের স্পর্শে মানবহৃদয়ের চিরন্তন আলো হয়ে উঠেছে। ভাব-সৌন্দর্যের কথা ছাড়াও প্রকাশের বলিষ্ঠরীতি এবং ভাষার অপূর্ব ওজোগুণে 'সখার প্রতি' অসামান্য সৃষ্টি। সেই সঙ্গে দুটি সার্থক চিত্রকল্পও স্মরণীয়—

'তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার'—
'যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ :
এই সেই সংসারজলধি দুঃখসুখ করে আবর্তন।'

সুখ ও দুঃখের সমস্যাকে বিবেকানন্দ জীবনের চরম সমস্যা বলে মনে করেন নি। পরম সত্য এই সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের সাংসারিক অভিজ্ঞতার বহু উর্ধ্বে। সুখ ও দুঃখ দুয়েরই নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু যাঁরা মনে করেন, পৃথিবীতে 'এমন এক সময় আসবে যখন জগতের সব দুঃখ চলে গিয়ে কেবল এর সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকবে তখন পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।'—তাঁদের ভ্রান্তবিশ্বাসকে তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপবিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন—"তোমরা যাকে উন্নতি বল, সে ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধি মাত্র। যদি আমি কোন কিছু স্পষ্ট বুঝে থাকি, তা এই যে, বাসনা কেবল দুঃখই সৃষ্টি করে—এ ত কেবল যাচকের অবস্থা।...যদি বাসনাপূরণের শক্তি যোগখড়ি (Arithmetical) নিয়মানুসারে বেড়ে যায়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির (Geometrical) নিয়মানুসারে বাড়তে থাকবে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি কোথাও একটি তরঙ্গ ওঠে, তবে আর কোথাও গর্তের সৃষ্টি হবেই...যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব।"[১]

[জ্ঞানযোগ—অপরোক্ষানুভূতি]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইন্দ্রিয়সুখত্যাগী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সন্ন্যাসব্রতধারীদের বহুমুখী দানের কথা স্মরণ করিয়ে

১ বাণী ও রচনা : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৯৮-৯৯

দিয়ে স্বামীজী বলতেন—'ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো—ঘোর তমোগুণে ইতর সাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভিতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড।···তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)—উচ্চ আদর্শগুলি তাদের জীবনে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ideas (ভাবধারা) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে।' (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)[১]

বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশের ইতিহাসে সন্ন্যাসীর দানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি আমাদের দিতেই হবে। আবার বর্তমান ভারতের নবজাগরণের দ্রষ্টা ঋষি যখন সন্ন্যাসের নবীন আদর্শ ঘোষণা করে বলেন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই idea (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম।"[২] (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)—তখন আমাদেরও উপলব্ধি করতে হবে সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগের আদর্শ কেবল অতীতের কথা নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষেও সমান সত্য।

ভারতীয় চিন্তাধারায় সন্ন্যাস-আদর্শের সেই অমর মহিমাগাথা স্বামীজীর "The Song of The Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় সুগম্ভীর ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত। চিকাগো ধর্মমহাসভার সময় থেকে অনবরত বক্তৃতা ও আলোচনায় শ্রান্ত বিবেকানন্দ

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৫২

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৫৪

কিছুদিনের জন্য সেণ্ট লরেন্স নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোদ্যানে বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। এখানে তিনি অল্প কয়জন শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গে সাতটি সপ্তাহ (১৮৯৬এর ১৭ই জুন থেকে ৭ই আগস্ট) কাটিয়েছিলেন—এই ক'দিনের বাণী সঙ্কলনই স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Inspired Talks (বাংলায় "দেববাণী")। এই সময়ে একদিন বিকেল বেলায় ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে স্বামীজী আলোচনার আসর থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা পরিসমাপ্ত।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবন্মুক্তির আদর্শের কাব্যরূপায়ণ হিসাবে এ কবিতা ভর্তৃহরির "বৈরাগ্যশতক" বা শঙ্করাচার্যের "বিবেক-চূড়ামণি"-র সঙ্গে একাসনে স্থান পেতে পারে। সর্ববন্ধনমুক্ত এই বৈরাগ্যেরই অন্য নাম স্বাধীনতা। সমগ্র কবিতাটি জুড়ে মানুষের এই স্বাধীন সত্তার জয়গান—

Wake up the note! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach;
In mountain caves, and glades of forest deep···

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যেথা নাহি পশে···

Have thou no home. What home can hold thee,
friend?

কোনো গৃহ তুমি ক'রো না নির্মাণ
কোন গৃহ তোমা ধরে হে মহান?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।

সত্য সব, কিন্তু নামরূপ পারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো 'তত্ত্বমসি', করো না ভাবনা,
হে বীর সন্ন্যাসি, করহ ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।[১]

Know thou art That, Sannyasin bold! S-y—
"Om Tat Sat, Om!

আচার্য শঙ্করের নির্বাণষটকের প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষে 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্'—এই মন্ত্রধ্বনি বারংবার ফিরে এসে পাঠকচিত্তে যে ধ্যানোপলব্ধির সৃষ্টি করে, 'সন্ন্যাসীর গীতি'র প্রতিটি শ্লোকের শেষে 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ' উচ্চারণে তেমনি পরম সত্যের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত। যতিরাজ শঙ্করের কাব্যসিদ্ধিও অসাধারণ। অনুগামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধিমূলক রচনায় তাঁর গভীর প্রভাব স্বাভাবিক-ভাবেই সঞ্চারিত। স্বামীজী নির্বাণষটকের একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। আগ্রহশীল পাঠকের জন্য এই অতুলনীয় কবিতার প্রথম ও শেষ দুটি শ্লোক উদ্ধৃতি করছি—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

... ...

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়ানাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবো ঽহম্॥[২]

১ স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত অনুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি'-অবলম্বনে।

২ স্বামীজী-রচিত দুটি শিবসঙ্গীতে যে ভাবতন্ময় নৃত্যরত ভোলানাথের চিত্র আঁকা হয়েছে, তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতের পৌরাণিক চেতনায় নটরাজ শিব সন্ন্যাসীদের আদিগুরু। শিবময় বিবেকানন্দের 'তাথেইয়া

আত্মস্বরূপের এই স্বাধীনতার পটভূমিকায় স্বামীজী দেশ ও জাতির জাগরণকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের হোমহুতাশনে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন—বিশ শতকের প্রথম যুগের সেই স্বদেশী বিপ্লবীর দল বিবেকানন্দকে তাঁদের চিন্তানায়ক গুরুর আসন দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী বুঝেছিলেন, 'জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ওপরে ছাইচাপা পড়েছে মাত্র'। সেইসঙ্গে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কালে যেমন গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছিল, তেমনি "আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" প্রতীচ্য সভ্যতার রজোগুণাত্মক প্রাণশক্তি ও ভারতীয় জীবনধারার সাত্বিক আদর্শের সমন্বয়ে যে নবীন ভারত গড়ে উঠবে তার উদ্দেশে স্বামীজীর আহ্বান—

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring the life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet. The world in need awaits,
O Truth !
No death for thee.[১]

তাথেইয়া নাচে ভোলা', এবং 'হরহর হর ভূতনাথ পশুপতি', গান দুটিতে শিবের সেই আনন্দময় রূপটি সার্থকভাবে রূপায়িত। কালীচেতনার মতোই শিব-চেতনার ক্ষেত্রেও শাক্তদের মত শৈবেরা শেষ অবধি অদ্বৈতবাদী। তাই শিবোহং আসলে 'সোঽহম্' মন্ত্রেরই আর এক প্রকাশ। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতের যাত্রাপথে বিবেকানন্দের কবিতাও সব স্তরকেই ছুঁয়ে গেছে। প্রসঙ্গত স্বামীজীর 'শিবস্তোত্রম্' ও অম্বাস্তোত্রম্' নামে দুটি সংস্কৃত স্তবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ ১৮৯৮-এর আগস্টে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য লেখা।

জাগো আরো একবার।
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

অনুবাদক: স্বামী প্রজ্ঞানন্দ[১]

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারত-পরিক্রমার সময় রাজার কুটির থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির অবধি সর্বত্র পরিভ্রমণের ফলে ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দনের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য পরিক্রমার পর সেই পরিচয়ে তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। এর ফলে বিবেকানন্দ-মানসে যে ধ্যানের ভারত গড়ে উঠেছিল, তার অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ রয়েছে স্বামীজীর India's Message to the World (জগতের কাছে ভারতের বাণী) নামক অসমাপ্ত গ্রন্থের ভূমিকায়—"দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তাকে রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি করে, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সহায়তা করে—এই দেশ সেই সব কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। এইখানে এই মানবতাসমুদ্রে

১ পূর্বজীবনে প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীদেবব্রত বসু।

সুখদুঃখ, সবলতা ও দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোত-সংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসকল—জীবন-তৃষ্ণা, এ-জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয়;—এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে কখনও হইবে না; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র!

এই একটি দেশ, ধর্ম যেখানে বাস্তব সত্য;—এইখানেই নরনারী সাহসের সঙ্গে অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নর-নারী জীবনের সুখসামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানবহৃদয় পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে তুচ্ছ ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম সত্তা হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সবকিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।"[১]

স্বামীজীর এই ধ্যানের ভারতবর্ষ সহস্র পতন-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চিরকাল অগ্রসর হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তার গতিবেগ স্তিমিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু—"হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনো অধঃপতন হয় নাই! সত্যই এক মহিমময় ভবিষ্যৎ, প্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে পৃথিবীর সমক্ষে আমরা সগৌরবে প্রচার করিয়াছি—ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" বিভিন্ন মানবজাতির অস্তিত্বের সংগ্রামে ভারতবর্ষের নিজস্ব সমাধান তার অপার্থিবতা, তার সর্বস্বত্যাগের আদর্শ। এই ত্যাগের আদর্শই পৃথিবীর কাছে প্রবুদ্ধ ভারতের বাণী—

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৩-৭৪ : অনুবাদ লেখককৃত।

And tell the world :
Awake, arise, and dream no more !

... ...

Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease.
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.[১]

(To The Awakened India)

একদিকে অনন্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি, অন্যদিকে সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে সেবা ও প্রেমের করুণাধারায় বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গ—বিবেকানন্দ-জীবন এই দুইধারার সঙ্গমতীর্থ। ব্রহ্ম ও জগৎ—মানবমনের বিকাশের স্তরভেদে দুইই সত্য। একেবারে একধাপে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—জাতীয় উপলব্ধির জগতে পৌঁছানো দুর্লভ অধিকারীদের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জগৎসত্য থেকেই ক্রমে নিখিলবিশ্বের প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে সত্যের পরম ঐক্যে পৌঁছানোর সাধনাই শ্রেয়। তাই মানুষের প্রেম ও সেবাধর্মও একহিসাবে স্বপ্ন—স্বামীজীর ভাষায় truer dreams (মহত্তর স্বপ্ন) ; যে মানুষ 'সোঽহম্' উপলব্ধি করে নি, তার পক্ষে ওই মহত্তর স্বপ্নই শ্রেয়-সাধনা।

তাই আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী-প্রচারের মতো জাতীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও বিবেকানন্দের স্বধর্ম। ফরাসীবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলন, ভারতবর্ষের সিপাহীবিদ্রোহ—এ সবই স্বামীজীর গর্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল। পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামরত সেখানেই এই পরমস্বাধীন সংগ্রামী সন্ন্যাসীর অভিনন্দন—"The history of the world is the history

১ In Search of God and other Poems : Vivekananda : p. 23

of few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself then in God"[১]

স্বামীজীর জীবনে বিশেষভাবে বিধিনির্দিষ্ট কর্ম-ক্ষেত্র ছিল আমেরিকা। আমেরিকার মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান ও অধিকার-বোধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস স্বামীজী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় ভ্রমণ-সঙ্গী আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৯৮-এর ৪ঠা জুলাই (কবিতাটি বোধ হয় আগের দিন লেখা) স্বামীজী তাঁর নৌকায় একটি ছোট্ট উৎসবের আয়োজন করেন। সঙ্গীদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রবণে "To The Fourth of July" (চৌঠা জুলাইয়ের উদ্দেশ্যে) কবিতাটি যে অপার আনন্দ সঞ্চার করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

পরাধীনতার তমিস্রা ভেদ করে চৌঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতাসূর্য দেখা দিল—এই সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় যুগ যুগ ধরে অপেক্ষারত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সমস্বরে অভিনন্দন জানালো—

All hail to thee, thou Lord of Light!
O Sun! To-day thou sheddest Liberty!

স্বাধীনতার এই পরম সম্পদ লাভের জন্য মানুষের কত না আত্মদানের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ। সেই সব চিরস্মরণীয় মহামানব—যাঁদের সাধনা, সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের

১ 'জগতের ইতিহাস হলো মুষ্টিমেয় আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলে। যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি বা জাতি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়, অমনি তার বিনাশ ঘটে। আগে নিজেকে বিশ্বাস করো। তারপর ভগবানে বিশ্বাস।' কর্মযোগ: বাণী ও রচনা: ১ম খণ্ড: পৃ: ১৭২

তপস্যার পরিপূর্ণ ফলস্বরূপ স্বাধীনতার আলোকে আজ মানবজাতি অভিষিক্ত। এ স্বাধীনতা কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, স্বামীজীর প্রার্থনা—৪ঠা জুলাইয়ের এই স্বাধীনতাসূর্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারীর পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন করে উন্নতশির নবজীবনের অধিকার এনে দেবে—

Move on, O Lord, in thy resistless path !
Till thy high noon o'erspseads the world,
Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed.[১]

অরুণোদয় থেকে সূর্যপরিক্রমার গতিময় চিত্রকল্পে স্বাধীনতার ভাবসত্যটি এ কবিতায় যে সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের সাহিত্যজগতে তা স্মরণীয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

*

মানুষ মাত্রেরই একাধিক সত্তা। বিবেকানন্দের মতো মহা-মানবের মধ্যে মানবসত্তার বহু-বৈচিত্র্যের একত্র রূপায়ণ। কখনও তিনি দৃপ্ত সংগ্রামশীল কর্মযোগী, কখনও ধ্যানসমাহিত দ্রষ্টা ঋষি, কখনও ভক্তিতন্ময় ভাবুক কবি। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদা তিনি বলেছিলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী; কিন্তু বাইরে থেকে (বিবেকানন্দকে) জ্ঞানী বলে মনে হলেও তাঁর অন্তরটি ভক্তিময়।" [স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে: নিবেদিতা]

জ্ঞান ও ভক্তির দুটি ধারা মিলিত গঙ্গা-যমুনার মতো যে বিবেকানন্দ-সাহিত্যসৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে ভক্তির পরিচয় অন্তর্লীন। সংস্কৃত ও বাংলা স্তবরচনাগুলি বাদ দিলে ভক্তিরসের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মাত্র দুটি কবিতায় পরিস্ফুট। কিন্তু "Thou Blessed Dream"

---

১ In Search of God : Vivekananda : p. 24

কবিতার স্বপ্নচারণের মতো সে কবিতাগুলির মধ্যেও স্বামীজীর কবিসত্তার গভীরতম পরিচয় নিহিত।

বিবেকানন্দের হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা শ্রীরামকৃষ্ণ। "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলু' করিয়াছি।" "তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার নানা অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্য মাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি —কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।"

এ দুই মহামানবের হৃদয়বন্ধন এক পরমাশ্চর্য ইতিহাস। এই ভালোবাসা মানবকল্যাণের জন্য নিঃশেষে আত্মদানের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে মানবজীবনে কত নব নব ভাবের কুসুম ফুটিয়ে তুলেছে—সেই নেপথ্য কাহিনীমালা অনাগত দিনের কবি-শিল্পীদের উপকরণ হয়ে রইল।

বিবেকানন্দের কবিতায় রামকৃষ্ণ-তন্ময়তার উদাহরণ মেলে "O'r Hill and dale and mountain range"—শীর্ষক ইংরেজী ও "গাই গীত শুনাতে তোমায়" শীর্ষক বাংলা কবিতা দুটিতে। প্রথম কবিতাটি শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের অমর গ্রন্থ "Swami Vivekananda In America: New Discoveries"[১]-এ পাওয়া গেছে; চিকাগো-ধর্মমহাসভার মাত্র এক সপ্তাহ আগে অধ্যাপক রাইটকে লেখা (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) পত্রাংশ। দ্বিতীয় কবিতাটি ১৮৯৪ সালে কোনো গুরুভ্রাতাকে লেখা পত্রের মধ্যে প্রথম অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, কবিতার শেষাংশ পরবর্তীকালের সংযোজন।

১ In Search of God: pp. 3-5

প্রথম কবিতাটি থেকে দ্বিতীয় কবিতাটিতে ভাবের উত্তরণ ও প্রসার সুস্পষ্ট। সে হিসাবেও এ দুটি কবিতা পাশাপাশি আলোচ্য।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সতীর্থ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের পার্থক্য-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,—"সমস্ত বন্ধন ও অন্তহীন সংগ্রাম থেকে মুক্ত করবার মতো এমন কোনো মহাশক্তির সন্ধানে বিবেকানন্দের বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি শুধু তাঁকে বিশুদ্ধ হেতুবাদের সর্বোচ্চ মহিমার কথাই বলতে পারলাম, বিশ্বের অন্তর্নিহিত যে হেতুবাদের সঙ্গে একাত্মতার ফলে অন্তরে আসবে অমেয় প্রশান্তি। তখন আমার অন্তর্লোকে প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের জয়জয়কার চলেছে।···কিন্তু এ সময় তাঁর সমস্যা আমার ছিল না, আমার অসুবিধাগুলিও তাঁর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তিনি স্বীকার করতেন যে, যদিও নির্বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা তাঁর বুদ্ধি অধিকৃত, তবু তাঁর হৃদয় চায় ব্যক্তিসত্তার অহং, আর অনুযোগ করতেন যে রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ যা বাস্তবরূপে কখনো সর্বময় হয়ে ওঠে না, কেবল ভাবরাজ্যেই যার অধিষ্ঠান, তা কখনো তাঁকে প্রলোভনের মুহূর্তে রক্ষা করতে পারে না। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমার দর্শন কি তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠবে, আত্মার উদ্ধারের জন্য শরীরী প্রত্যক্ষতা লাভ করবে; সংক্ষেপে তিনি চাইলেন রক্তমাংসে সাকার মহিমাদীপ্ত সত্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি; সবার উপরে তিনি ব্যাকুল আহ্বান জানালেন এমন এক শক্তির করস্পর্শের জন্য যে তাঁকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে, যা তাঁর অতীত অথচ যার দ্বারা তাঁর সব ব্যর্থতা, সব শূন্যতা মহান গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে—তিনি চাইলেন, একজন গুরু বা শিক্ষাদাতা যিনি রক্তমাংসের শরীরেই পূর্ণতার প্রতীক হয়ে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অশান্তির নিরাকরণ করবেন।"

তরুণ নরেন্দ্রনাথের এই ব্যাকুল-অন্বেষণের উত্তররূপে দেখা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের সব অন্বেষণ, সব শূন্যতা পূরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আপন চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী রেখে মরদেহ ত্যাগ করলেন। ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘনায়ক

আলমবাজারে-বরাহনগরে গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাসজীবনের সাধনায় মগ্ন হলেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিত্যদিনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন, আজ আবার তাঁকেই মর্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য নবীন সন্ন্যাসীদের কঠোর তপস্যা চলল। একে একে তাঁরা ভারতবর্ষের নানা তীর্থে সাধনা ও পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। সেই পরিব্রাজক দলেরই অন্যতম নরেন্দ্রনাথ—কখনো গুরুভাই বা শিষ্যসঙ্গে, কখনো একাকী—জীবনের সেই পরমমুহূর্তটিকে আবার ফিরে পাওয়ার সাধনায় আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণরত। সেই অন্বেষণের বেদনা-ব্যাকুল দিনগুলিতে—

O'r Hill and dale and mountain range
In temple church and mosque
In Vedas Bible Al koran
I had searched for thee in vain
Like a child in the wildest forest lost
I have cried and cried alone
Where art thou gone my God my love
the echo answered gone

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,—
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ কেটে যায়।
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,

কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধুলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে ;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।
কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন,
তখন—একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমাকে আমারি নাম ধরে।
মৃদু মধু আশ্বাসের মতো এক স্বর—
'পুত্র, আমার!'

... ...

জ্বলে উঠলো আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ!
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে,—আমারি হৃদয়ে?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরব!'[১]

তারপর বিশ্বচরাচরের সর্বত্র প্রিয়তমের মধুময় আনন্দজ্যোতি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে, প্রভাতসূর্যের

১ 'সন্ধান ও প্রাপ্তি': স্বামী বিবেকানন্দ; অনুবাদ: শঙ্করীপ্রসাদ বসু; উদ্বোধন, শ্রাবণ-সংখ্যা, ১৩৬৮ এবং বাণী ও রচনা; ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ৩০১

অরুণরাগে, পবিত্র বন্ধুত্বে, অপার মাতৃস্নেহে—এমন কি জীবনের দুঃসহতম দুর্দিনে মৃদুস্বরে ধ্বনিত হতে লাগল, "আমি আছি, একান্ত কাছেই রয়েছি।" দিব্যসম্বন্ধে আবদ্ধ এ দুই পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কোনদিন বিচ্ছিন্ন হয় নি।

তবু, একবার যেন বিচ্ছেদের আভাস দেখা দিয়েছিল। সে বড়ো গোপন বেদনার ইতিহাস। বাইরের ঘটনাবলী আমাদের সুবিদিত। পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯০ সালে নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে পওহারীবাবার যোগীজীবনের আদর্শে কিছুকালের জন্য একেবারে অভিভূত। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চিঠিতে লিখছেন—"বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি ও যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়েছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।" সাধু-সন্ত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর শরণাগতি এক কথা নয়। তারপর ৩রা মার্চের চিঠি—"পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি 'উল্টা সমঝলি রাম'!—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে, স্থির করিয়াছি; এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব।"—এর পরেই শেষে আবার পুনশ্চ—"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—আপনাতে আপনি থেকো মন……

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণ জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।"

একমাসের মধ্যে এই মত পরিবর্তনের পিছনে শুধু বুদ্ধিগত

তুলনা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শনও বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। পওহারীবাবার কাছে দীক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প স্বামীজীর ভাবচিত্রটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের "বিবেকানন্দ-চরিতে" সার্থক বাণীরূপ লাভ করেছে—'গভীর নিশীথে স্বামীজী পওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা? এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালোবাসা, সস্নেহ ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার ব্যথিতচিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল! সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী অশ্রুসজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্রদ্বয়ে স্নেহ-সকরুণ ব্যথিত ভর্ৎসনা, বিবেকানন্দের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তর-মূর্তির মত ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনেও সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি তেমনি-ভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্তবিংশতিদিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন তিনি মর্মবেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা কর প্রভো!"

পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে অব্যক্ত বেদনায় স্বামীজীর মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠত। জীবনের এই গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দজীবনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—একটু বিস্ময়ের হলেও এ কাহিনী তাঁর মানসজীবনের অন্তরতম সত্য।

এমনি সব ঘটনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদ ও সংশয়ের পরমমূল্য আমরা উপলব্ধি করি।

জীবনে যে বেদনা অকথিত ছিল, কবিতায় একদিন সে কথা আভাসে ফুটে উঠেছে, তারপর সে বেদনাকে অতিক্রম করে পরম-সত্যের অনাহত বাণী ধ্বনিত।

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।

পরম নির্ভরতার এই অভয়সঙ্গীত গাইতে গাইতে মনে পড়ে, জীবনে এমনও হয়েছে—

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?

বিবেকানন্দজীবনে অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সমস্ত সংগ্রামের সখা ও সারথি, তাঁর অন্তরতম ধ্যানের নিভৃত ইষ্টদেবতা—

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি,
বীণাপাণি কণ্ঠে মোর

"O'r Hill and dale" কবিতাটিতে ব্যক্তি রামকৃষ্ণ বিশ্বচেতনায় ব্যাপ্ত। "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতায় সে বিশ্বচেতনা অনাহত ধ্বনিতে পরিণত। বিশ্বসৃষ্টির আদি ও অবসানে পরিব্যাপ্ত কবিতার চির-উৎস এই মহাবাণী—

"আমি আদি কবি
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।"

"রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ"—সব রূপের মধ্য দিয়ে তাঁরই বিকাশ—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার।"[১]

*

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোর সামাধির ঘরে চাবি দেওয়া রইল।" বিশ্বকল্যাণের মহাব্রতে ঝঞ্ঝাবেগে ধাবমান (স্বামীজীকে আমেরিকাবাসীরা নাম দিয়েছিল The Cyclonic Monk) এই বিশাল হৃদয় তবু কি কোনদিন একেবারে সেই নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানের মুহূর্তটি ভুলতে পেরেছিল? ফিরে ফিরে সেদিনের অমৃত অনুভবের কথা তাঁর বাণী ও রচনায় আভাসে ইঙ্গিতে দেখা দিয়েছে। 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' অথবা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'—সেই আপাত নিষিদ্ধ নির্বিকল্প সমাধির ইঙ্গিতময় কাব্যরূপ।

আমেরিকার বিপুল কর্মপ্রবাহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো তাঁর মনে হতো—

---

১ এ প্রসঙ্গে লেখকের 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

On little life's high, narrow bridge I stand
and see below
The struggling, crying, laughing throng
For what ? no one can know.[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় সেই শিশুটির মতো সংসারের খেলাঘর ছেড়ে বিশ্বজননীর কাছে ফিরে যাবার ব্যাকুলতায় জীবনের সবচেয়ে কর্মমুখর দিনগুলির মধ্যেই তিনি প্রার্থনা করেছেন···

Let never more delusive dreams veil off
Thy face from me
My play is done, O Mother ; break my chains
and make me free !

'কর্মযোগে' স্বামীজী বলেছেন—"আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রতম কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভবকারী।···বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও নিঃশব্দ গুহাবাসীর মতো তাঁর মন শান্ত থাকে, অথচ, সে মন প্রবল কর্মপরায়ণ।" সব কর্মমুখরতার অন্তরালে এই কি সেই নিঃশব্দ ধ্যানের আহ্বান ?

বিবেকানন্দের মতে জগতের অতুলনীয় গ্রন্থ—'গীতা'। সেই গীতার অমর অধ্যাত্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে উদ্যত সংগ্রামের মুখোমুখি।

জীবনের ক্ষেত্রেও তাই— অনন্ত সংগ্রামের মধ্যেই অপার শান্তির উপলব্ধি। নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী বেশ গ্রহণ উপলক্ষ্যে রচিত Peace কবিতাটিতে সংগ্রামের অন্তর্লীন 'শান্তি'র উপলব্ধি অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীগুণে মহৎ কাব্যের মহিমা লাভ করেছে—

Behold, it comes in might,
The power that is not power,

১ My Play is done—১৮৯৫-এর বসন্তকালে নিউইয়র্কে লেখা : দ্রঃ In Search of God : pp. 9-12

The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.
It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.[১]

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ,
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস,
আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।
দুঃখ নয়, আনন্দও নয়
মাঝে তার তারে বোধ হয়,
রাত্রি নয়, উষাও সে নয়—
উভয়ের মাঝে জুড়ে রয়।
সঙ্গীতের মাঝে মধু সম—
সুপবিত্র ছন্দ মাঝে যতি,
নীরবতা কথার অন্তরে,
মাঝে দুই রিপু তাড়নার
হৃদয়ের শান্ত ভাব সে যে!
অদেখা সে সৌন্দর্য সম্ভার,
সে যে প্রেম একাকী অদ্বয়,
অগাহিত জাগে মহাগান—
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান।

১ In Search of God : p. 31

মৃত্যু তুই জীবনের মাঝে,
স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝাদ্বয় মাঝে,
মহাশূন্য—যা হতে সৃজন
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়া।

এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে,
এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের
—একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।[১]

ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অতীত এ কবিতার ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায়—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

---

১ অনুবাদ: স্বামী নিরাময়ানন্দ (পূর্বনাম: ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য) বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৪৩০

অনুবাদক বিবেকানন্দ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদকের বিশিষ্ট ভূমিকা সব কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির জীবনেই আবশ্যিক। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি যতো বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং মাতৃভাষায় সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-আহরণই যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা,—একথা যত স্বীকৃত হচ্ছে, ততই বিভিন্ন দেশের ভাষায় বিশ্ব-সাহিত্যের ও বিশ্বমননের অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় রূপে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে এখনো যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি নি। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কিন্তু বিদেশী ও দেশী গদ্যলেখকদের হাতে দেশ-দেশান্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগ্রহ থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের জয়যাত্রার আরম্ভ। এই প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে সেকালের অনেকের মতো স্বামী বিবেকানন্দও বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এ সংবাদ আমরা আভাসে-ইঙ্গিতে কিছুটা জানতে পারলেও এ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায় নি বলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বামীজীর অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সরের Education বইখানির যে বাংলা রূপান্তর পেয়েছি। তাতে করে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এই অনালোচিত অধ্যায়টি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করি।

অনুবাদক দুই জাতের। আক্ষরিক অনুবাদক, যাঁরা যথাসম্ভব মূলের স্বাদ, গন্ধ ও গভীরতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও বহিরঙ্গ যাথার্থ্যের উপরেই জোর দেন বেশী। আর একদিকে আছেন ভাবানুবাদক, যাঁরা আক্ষরিক যাথার্থ্যের চেয়ে আদর্শ বা ভাবের সত্যটুকু পাঠকের মনে সঞ্চার করতে আগ্রহী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদকের মধ্যে পড়েন, যাঁরা বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের দৌত্যকার্যে নিয়োজিত। সে দৌত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সরকারী তকমা-আঁটা নয়, মানবপ্রীতি বা সাহিত্যপ্রীতির আন্তরিকতারই ফল।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ—এঁরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দূত। কিন্তু এঁদের রচনায় ইংরেজীতে ভারতীয় ধ্যানধারণার অনুবাদ যতটা হয়েছে, সে পরিমাণে বাংলায় বিদেশী রচনার অনুবাদ দেখা যায় না। তবু ভারতাত্মার অন্তরের বাণীকে বিশ্বসভায় ধ্বনিত করার যে দায়িত্ব এঁরা পালন করেছেন, শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের তাই সবচেয়ে বেশী গৌরব।

পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ভাব ও ভাষার যথাসম্ভব সরল রূপায়ণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় রাজা রামমোহন। বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদের মাধ্যমে রামমোহন বিশ্ববাসীর কাছে ভারতপ্রজ্ঞার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলীতে ভারতীয় সাধনার সঙ্গে খৃষ্ট বা প্রতীচ্য-ভাবনার সম্মেলন লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের আমেরিকা-য়ুরোপ-পরিক্রমার মূল প্রেরণা যে উপনিষদের অভীমন্ত্রপ্রচার, সেকথা নিজেই তিনি নানাভাবে বলেছেন। প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের বাণী ঘোষণা এবং প্রাচ্যের অন্তরে প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট্যসঞ্চার—এ দুইই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা বা রচনায় এ জাতীয় ভাষান্তরের উদাহরণ মেলে যথেষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার উত্তরাধিকারীরূপে জগতের বিভিন্ন সাধনপন্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশী আলোচিত উপনিষদ বা বেদান্ত। সারাজীবন এই বেদান্তের অভয়বাণীকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারের ব্রত নিয়ে ঘূর্ণ্যমান ঝড়ের মতো তিনি মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন। কখনো এই উপনিষদের বাণী তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্মমহিমায় রূপান্তরিত হয়েছে, আরও গভীরতর অর্থও লাভ

করেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বামীজীর বহুব্যবহৃত 'অভীঃ'[১] শব্দটি লক্ষণীয়। উপনিষদ থেকে আহরিত এই 'অভীঃ' মন্ত্রটি ঠিক এই আকারে কোনো উপনিষদে আছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু আত্মোপলব্ধির অটলসংকল্পে স্থিরনিশ্চয় নচিকেতার মতো সত্যান্বেষণ ও সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আদর্শে এই 'অভীঃ' শব্দটির ব্যঞ্জনা সমগ্র উপনিষদকেই জাতীয় জাগরণের আধারশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কঠোপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'[২] চরণটি স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে 'Arise! Awake! And stop not till the goal is reached.'[৩] 'ওঠো জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামিও না।' —এই রূপলাভ করেছে। কিন্তু এর মূল অর্থ দাঁড়ায়, 'ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানো।' এক্ষেত্রে মনে হয়, আক্ষরিক অনুবাদের আদর্শকে অতিক্রম করে স্বামীজীর জীবনদর্শনই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এ যুগের ঋষিকবির বাণীমন্ত্রে অতীতের ঋষিকবির বাণী পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং Arise! Awake! ছাড়া বাকি অংশটুকু অনুবাদ নয়, নূতন সৃষ্টি। 'প্রবুদ্ধ-ভারত'-পত্রিকার মূলমন্ত্ররূপে স্বামীজী এই ইংরেজীতে লেখা বাক্যটিই নির্দেশ করেছিলেন।

এ জাতীয় উদাহরণ স্বামীজীর বাণী ও রচনায় যে খুব বেশী মেলে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর

১ 'অভীঃ' শব্দটি না থাকলেও 'অভয়' শব্দটি কঠোপনিষদে লক্ষণীয়—এছাড়া বৃহদারণ্যকেও 'অভয়' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য। 'অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।' কঠ।১।৩।২

২ কঠোপনিষদ, ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী, ১৪শ শ্লোক। 'উপনিষৎ গ্রন্থাবলী (১ম) স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ২য় সং : পৃঃ ৯২ ·

৩ প্রসঙ্গত স্মরণীয় স্বামীজীর বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।" বাণী ও রচনা : ৯।১৬৪ এক্ষেত্রেও স্বামীজী মূল শ্লোকের প্রথমটুকু নিয়েছেন।

প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে স্বামীজী যথাসম্ভব সর্বজনের উপযোগী করে তুলেছেন। এ যে শুধু তাঁর জনপ্রিয়তা-লাভের চেষ্টা তা নয়। স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা অনুধাবন করলে বোঝা যায়, অধ্যাত্মদর্শনের এক সামগ্রিক পরিপূর্ণতাই তাঁর লক্ষ্য ও তাঁর রচনাবলীতে তা সাধিত। প্রয়োজন শুধু যোগ্য উত্তরাধিকারীদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

*

বাংলা সাহিত্যকে দেশ ও বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়োজনে এই কিছুকাল আগেও স্কুল ও কলেজের বিদ্যার্থীদের ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। মূলতঃ সংস্কৃত এবং ইংরেজী, সেইসঙ্গে কিছু পরিমাণে ফারসী ও ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। মূল রচনা জার্মান বা চীনা সাহিত্যের অনুবাদও কিছু কিছু দেখা যায়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থেকেও মাঝে মাঝে অনুবাদ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির অন্যতম টমাস-আ-কেম্পিসের নামে প্রচলিত 'Of the Imitation of Christ' এর বাংলা অনুবাদের সূচনা করেছিলেন স্বামীজী 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়ে। যীশুখৃষ্টের জীবন ও সাধনার প্রতি বিবেকানন্দের অন্তরতম অনুরাগ এবং সেইসঙ্গে এদেশে সমাগত বিদেশী পাদ্রী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের নামে রাজনীতির বেসাতির প্রতি স্বামীজীর সুতীব্র ভর্ৎসনা—এ দুয়ের সঙ্গে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ সুপরিচিত। কিন্তু খ্রীষ্টিয় সাহিত্যের এই অমর গ্রন্থটি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণা-উৎস। তাঁর সন্ন্যাসজীবনের প্রথম দিকে বরাহনগর থেকে প্রমদাদাসমিত্রকে লিখছেন—"মহাশয়কে একখানি—কোন খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত—'Imitation of Christ' নামক পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও

এ প্রকার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"[১]

তার আগের চিঠিতে নিজের জীবনে পরমসত্যের জন্য সর্বদুঃখ-বরণের আদর্শকে পরিচায়িত করেছেন 'ঈশা অনুসরণে'র ভাষায়—"For 'we have taken up the cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen."[২]—কারণ, যে ক্রুশকাষ্ঠ তুমি আমাদের অর্পণ করেছ, তা আমরা গ্রহণ করেছি; শক্তি দাও, যাতে এ ক্রুশকাষ্ঠ আমরা আমরণ বহন করতে পারি।'

'স্বামীজীর কথা' গ্রন্থে অনুগামী স্বামী শুদ্ধানন্দজী লিখেছেন—"স্বামীজী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি (Imitation of Christ) বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক-জ্ঞানে সদা সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন।"[৩]

বাংলা ১২৯৬ সালের 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর এই অমর অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঈশা অনুসরণে'র রচয়িতার একটি বিশেষণ স্বামীজীর অনুবাদের সূচনায় লক্ষণীয়—'ভক্তসিংহ।' মধ্যযুগের খ্রীষ্ট সাহিত্যের এই অমরগ্রন্থ কতকাল পরে আর এক ভক্তসিংহের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ যে হয় নি, তাতে অধ্যাত্ম-অনুরাগী পাঠকদের বেদনা অপরিমেয়।

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ৭ই আগস্ট, ১৮৮৯-এর পত্র, পৃ: ২৯০

২ তদেব: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯-এর পত্র, পৃ: ২৮৮

৩ তদেব: ৯ম খণ্ড: স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি: পৃ: ৩৩৬

অনুবাদকের নিষ্ঠা ও সততার উদাহরণ এই অসমাপ্ত অনুবাদটির ভূমিকায় স্বামীজী লিখেছেন—"অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য 'বাইবেল' সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।"[১] কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে পাদটীকায় বাইবেলের চেয়ে বেশী উল্লেখিত গীতা, উপনিষদ, মহাভারত, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি। ফলে তুলনামূলক অধ্যাত্মচিন্তার একটি সুন্দর পটভূমি আমাদের উপরি পাওনা।

'ঈশা-অনুসরণে'র লেখকের "দীনতা, আর্ত্তি ও দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা" স্বামীজীর অন্তরে গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই মহাবাণীর কথা জাগিয়ে তুলেছিল। গীতার অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি শুনেছেন—'দশবারা গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার।' অর্থাৎ 'ত্যাগী'।'[২] ত্যাগী শব্দটির সমার্থক তাগী-রূপও যে হতে পারে একথা শ্রীরামকৃষ্ণ সঠিক না জেনে বললেও 'গীতা'র অর্থ ই তাঁর কাছে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগ। আর ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত নরেন্দ্রনাথের কাছে 'ঈশা অনুসরণে'র ত্যাগ ও শরণাগতির আদর্শ যে বিশেষভাবে অনুসরণীয় হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! শ্রেষ্ঠ অনুবাদ সমগ্র জীবনের রূপান্তর-সাধনা।

এবারে স্বামীজীর অনুবাদ-ভঙ্গিমার উদাহরণ মূলের পাশাপাশি উদ্ধৃত করি—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা অনুসরণ : পৃঃ ১৭

২ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ১৮৮৪, ২রা অক্টোবর তারিখের দিনলিপি। কথামৃতের ৩য় ভাগে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনাও স্মরণীয়। ৩য় ভাগের একবিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'তাগী' নামটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে আছে,—"ঠাকুর পেনেটীতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলেছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ ধাতু ঘঙ্ 'তাগ' হয়, তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে তাগী হয়। তাগী ও ত্যাগী এক মানে"।

THE FIRST BOOK

Chapter I

Of the Imitation of Christ, and Contempt of all the vanities of the World.

'He that followeth Me, walketh not in darkness',[১] saith the Lord. These are the words of Christ, by which we admonished how we ought to imitate His life and manners, if we will be truly enlightened, and be delivered from all blindness of heart.

Let therefore our chiefest endeavour be, to meditate upon the life of Jesus Christ.

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

'খ্রীষ্টের অনুসরণ' এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা।

১। প্রভু বলিতেছেন, 'যে কেহ আমার অনুগমন করে, সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না।[২] যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি তাহা হইলে খ্রীষ্টের এই কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব ঈশার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।[৩]

উদ্ধৃত অংশের পাদটীকায় ভগবদ্গীতার শরণাগতির আদর্শ

---

১ John viii [12]

২ He that followeth me etc—যোহন, ৮।১২

৩ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম ; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে তাহারই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত হয়ে বক্তব্যের গভীরতা সম্পাদন করেছে। সে যুগের তরুণমানসে বাইবেলের সমাদর যত ছিল, গীতার ততটা নয়। বোধকরি সেই কারণে ঈশার অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে গীতা অনুসরণের কথাও স্বামীজীর মনে জেগেছে। মূলকথা অবশ্য সকল দেশের মানুষের অন্তরে ভগবৎ-শরণের মূল সুরটি যে এক, সেই সত্য প্রতিপাদন।

প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় সূত্রে যথার্থ ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণ-প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে 'ঈশা অনুসরণে'র গ্রন্থকারের বক্তব্য—

Surely high words do not make a man holy and just ; but a virtuous life maketh him dear to God.....

If thou didst know Bible by heart, and the sayings of all the philosphers, what would all that profit thee without the love of God and without grace ?

Vanity of vanities and all is vanity, except to love God, and to serve Him only.

স্বামীজীর অনুবাদ—"নিশ্চয় উচ্চ বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট—করিতে পারে না ; কিন্তু ধার্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে।[১]......

"যদি সমগ্র বাইবেল এবং দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও ?[২]

---

১ বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ বিবেকচূড়ামণি, ৬০
নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যার কেবলমাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

২ কোরিন্থিয়ান্, ১৩।২

"অসার হইতেও অসার, সকলই অসার, সার একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।"[১]

যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে একমাত্র ভক্ত ও ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই, 'ঈশা অনুসরণে'র সাধক সেই স্তরে পৌঁছেই অতিরিক্ত গ্রন্থপাঠ ও নানান মতবাদের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বলেছেন—O God, who art the truth, make me one with thee in everlasting charity.

It is tedius to me often to read and hear many things : In Thee is all that I would have and can desire.

Let all doctors hold their peace ; let all creatures be silent in thy sight ; speak thou alone unto me.[২]

[Imitation of Christ : Chapter III]

স্বামীজীর অনুবাদ[৩]—"হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া লও।

বহু বিষয় পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি ; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা তোমাতেই নিহিত।

আচার্য সকল নির্বাক হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক ; প্রভো, কেবল তুমি [আমার সহিত কথা] বল।"[৪]

---

১ Vanity of vanities, all is vanity etc.-ইক্লিজিয়াষ্টিক, ১।২

২ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে (Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda)। গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আছে—পরিব্রাজক-জীবনে তিনি শুধুমাত্র 'গীতা' ও 'ঈশা অনুসরণ' বই দুটি নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন, সে প্রসঙ্গে আলোচনাকালে 'ঈশা অনুসরণে'র এই বাক্যটি স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেন। Complete Works of Nivedita : Vol I p. 326

৩ অনুবাদের পাদটীকা, বাণী ও রচনা : ঈশা অনুসরণ ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সংস্করণ অনুসারে।

৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩

জগতের ধর্মসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থের অনুবাদে স্বামীজীর অন্তর্নিহিত ভক্তহৃদয়ের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত, বিবেকানন্দ-মানসের অনুগামীদের পক্ষে তার মূল্য অপরিসীম। একদিকে অদ্বৈত বেদান্তের শিখরসীমা অন্যদিকে বিগলিত ভক্তিপ্রবাহ—এ দুয়ের সুর-সঙ্গতিতে বিবেকানন্দমানসের পরিপূর্ণতা।

*

'ঈশা অনুসরণে'র আগে অথবা সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' বইখানি অনুবাদ করেছিলেন। যতদূর মনে হয়, 'শিক্ষা' নামে এই অনুবাদটি তাঁর প্রথম জীবনের অনুবাদ। 'ঈশা-অনুসরণ' তাঁর সাধকজীবনের অন্যতম প্রেরণাগ্রন্থ বলে অসমাপ্ত অনুবাদটির আলোচনা আগে করেছি। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থটির অনুবাদ সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করছি।[১]

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী গিরিশ চৈতন্য (বর্তমানে স্বামী প্রভানন্দ) মহারাজের উদ্যোগে একটি শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার নানাদিক নিয়ে সে সম্মেলনে আলোচনা হলেও স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির কথা তখন কেউই আলোচনা করেন নি। কারণ বসুমতী কার্যালয় প্রকাশিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যায় লেখকের 'বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি অনালোচিত অধ্যায়' প্রবন্ধ এবং উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৭৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখকের "স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ : শিক্ষা"' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একটি এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত অনুবাদ গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। পিতৃবিয়োগের পর অনুবাদের দ্বারা উপার্জনের সঙ্কল্প করে স্বামীজী 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানি মূল ও বঙ্গানুবাদসহ মতিলাল বসুকে লিখে দিয়েছিলেন। মতিলাল বসু নিজের প্রেস থেকে সেটি প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড : পৃঃ ১৯০-১৯১ দ্রঃ।

প্রণীত বলে প্রচারিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটিই যে স্পেন্সারের অমরগ্রন্থের অনুবাদ এ কথা সে সম্মেলনে যোগদানকারী আমরা জানতাম না।

বাংলার নবজাগরণে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ছিল বঙ্গ-মনীষার অন্যতম প্রধান চিন্তনীয়। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজনারায়ণ—প্রমুখ মনীষীদের জীবন-সাধনায় বাংলার ও ভারতের শিক্ষাপ্রসারণে কতখানি সহায়তা হয়েছিল, সেকথা আজ সুবিদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে শিক্ষাজগতে মৌলিক চিন্তার দিক থেকে যে দু'জন বাঙালী সর্বাগ্রে স্মরণীয়, তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন বিবেকানন্দ।

রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার বিকাশকেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্র-ভারতী আজ বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার রূপায়ণে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ-স্থাপনের প্রচেষ্টা বাদ দিলে সর্বপ্রথম প্রয়াস ভগিনী নিবেদিতার। অবশ্য নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। সে আশ্রমে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে দুর্ভিক্ষে পরিত্যক্ত শিশুরা সন্তান-স্নেহে পালিত হ'ত। তবে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাদর্শনের বিদ্যালয়গত রূপায়ণপ্রচেষ্টার নিদর্শনরূপে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়কেই প্রথম স্বীকৃতি দিতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে আরম্ভ করে ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে নবযুগের তরুণসমাজ গঠনে ব্রতী।[১]

'শিক্ষা' বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গ্রন্থ স্বামীজী রচনা করেন নি। অদ্বৈত আশ্রম বা উদ্বোধন-কার্যালয় প্রকাশিত 'Education'

---

১ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের কথা, স্বামী বিমুক্তানন্দজীর আমরণ তপস্যার ফলে যে প্রতিষ্ঠান আজ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ। জানি না, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে স্বামী বিমুক্তানন্দজীর প্রাণপণ প্রয়াস কবে সার্থক হয়ে উঠবে।

বা 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ দুটি শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নানা লেখা ও মন্তব্য থেকে সযত্নে সংগৃহীত। কেবলমাত্র 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে বিধৃত 'জ্ঞানার্জন' নিবন্ধটি পরিণত বয়সে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দেয়। এদিক থেকে স্পেন্সারের 'Education, Intellectual, Moral and Physical' নামে যে বইখানির ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বামীজী করেছিলেন, সে বইটি স্বামীজীর প্রথম জীবনের শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা অনুযায়ী জীবনের "প্রথম অবস্থায়" মিল ও স্পেন্সারের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। "তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের এডুকেশন পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই……।"[১]

হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে The Right of Translation is reserved. [অনুবাদের স্বত্ব সংরক্ষিত।] পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০; প্রকাশক Williams And Nograte, London. বইটির ভূমিকার তারিখ ও স্থান: মে, ১৮৬১, লণ্ডন।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃবিয়োগেব পর অর্থোপার্জনের জন্য কিছু অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছিলেন, এমন উল্লেখ তাঁর জীবনীকারেরা করেছেন। আবার বন্ধু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় সহায়তার জন্যও এ অনুবাদ করা হয়ে থাকতে পারে। এ বইটি ছাড়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'খানি স্বামীজী পুরো অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা গেলেও, বইটি এপর্যন্ত আমরা পাই নি।

---

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী: মহেন্দ্রনাথ দত্ত: ২য় সং: পৃ: ১৬৩-১৬৪

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের সূচনায় লেখকের যে ভূমিকা[১] রয়েছে, অনূদিত গ্রন্থ 'শিক্ষা' (এ পর্যন্ত যে ক'টি সংস্করণ হাতের কাছে পেয়েছি) থেকে তা বর্জিত। অবশ্য ভূমিকাটি ঠিক এ দেশী পাঠকের পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। স্বামীজী যখন মূল গ্রন্থ থেকেই বক্তব্য সংক্ষেপিত করেছেন মনে হয়, তখন এই ভূমিকা বর্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বসুমতীকার্যালয় প্রকাশিত কোনো সংস্করণেই

১ পাঠকদের কৌতূহলের কথা মনে রেখে স্পেন্সারের ভূমিকাটুকু উদ্ধৃত করে দিলাম—

Preface

The four chapters of which this work consists originally appeared as four Review-articles; the first in the Westminister Review for July, 1859; The second in the North British Review for May, 1854. and the remaining two in the British Quarterly Review, for April, 1858, and for April, 1859. Severally treating different divisions of the subject, but together forming a tolerably complete whole, I originally wrote them with a view to their republication in a united form; and they would sometime since have thus been issued, but not a legal difficulty stood in the way. This difficulty being now removed. I hasten to fulfil the intention with which they are written.

That in the first shape these chapters were severely independent, is the reason to be assigned for some slight repititions which occur in them: one leading idea, more specially, re-appearing twice. As, however this idea is on each occasion presented under a new form and as it can scarcely be too much enforced, I have not thought well to omit any of the passages embodying it.

Some additions of importance will be found in the chapter on Intellectual Education; and in the one on Physical Education there are a few minor alterations. But the chief changes which have been made, are changes of expression: all of the essays having undergone of careful verbal revision.

London, May, 1861

বইটির মূল, সংস্করণ-সংখ্যা, রচনাকাল, প্রথম প্রকাশকাল এ সব পাই নি। পরোক্ষ প্রমাণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এ বইয়ের একাধিক 'সংস্করণ' হয়েছিল।

'Education' গ্রন্থের বিষয়বিভাগ স্বামীজীর অনুবাদে এইভাবে ভাষান্তরিত—

Chapter I — What Knowledge Is of Most Worth ?
প্রথম পরিচ্ছেদ — সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?
Chapter II — Intellectual Education
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — জ্ঞানশিক্ষা
Chapter III — Moral Education
তৃতীয় পরিচ্ছেদ — নৈতিক শিক্ষা
Chapter IV — Physical Education
চতুর্থ পরিচ্ছেদ — শারীরিক শিক্ষা।

স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির সর্বপ্রাচীন সংস্করণ দেখেছি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারের তারিখ অনুসারে বইটির অন্তর্ভুক্তির বছর ১৯১৭।[১] প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

শিক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদের উপরে লেখা—

শিক্ষা

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক।

পরবর্তীকালের মুদ্রণে প্রথম পরিচ্ছেদের উপরে শুধু 'শিক্ষা' কথাটি লেখা।

[১] 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীবাণী বসু সংকলিত স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৫-র আর একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৯১৭-র সংস্করণটিকে তাঁরা ২য় সংস্করণ বলেছেন। কিন্তু তেমন কোনো কথা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্করণে মুদ্রিত নেই। ১৯১৫-র সংস্করণটি আমরা এখানে দেখি নি।

মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছে যে অনেককাল থেকেই বইটি স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত' বলে প্রচারিত হয়ে আসছে। কিন্তু স্বামীজীর জীবিতকালে প্রকাশিত সংস্করণে এ জাতীয় ভ্রান্তি অসম্ভব। মনে হয়, স্বামীজীর দেহাবসানের পরে অত্যুৎসাহী প্রকাশকের আগ্রহেই এ-জাতীয় বিভ্রান্তির সূচনা।

সে যাই হোক, হার্বার্ট স্পেন্সারের এই বইখানির সংক্ষেপিত অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী ও অনুবাদ-কৃতিত্বই—বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের লক্ষণীয়। সেইসঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় স্পেন্সারের প্রভাব সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, স্পেন্সারের শিক্ষাচিন্তা তার অন্যতম উদাহরণ। শিক্ষাকে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রবণতা এই সময়ে যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি বিজ্ঞানকেই মানবচিন্তার একমাত্র কেন্দ্র করে তোলার প্রয়াসও লক্ষণীয়। স্পেন্সারের 'Education'-গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্রশ্ন —'What knowledge is of most worth ?' সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?—তার উত্তরে এই বিজ্ঞানসচেতন দার্শনিকের বক্তব্য—"Thus to the question we set out with—what knowledge is of most worth ?—the uniform reply is—Science. This is the verdict on all the counts. For direct self-preservation, on the maintenence of life and health, the all important knowledge is—Science. For that indirect self-preservation which we call gaining a livelihood, the knowledge of greatest value is—Science. For the due discharge of parental functions, the proper guidance is to be found only in—Science. For that interpretation of national life, past aud present, without which the citizen cannot rightly

regulate his conduct, the indispensable key is—Science. Alike for the most perfect production and highest enjoyment of art in all its forms, the needful preparation is still—Sciene. And for the purprose of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient study is—Science."[১]

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা—"দেখিলাম আমরা যাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকা-নির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণবিমোহন সঙ্গীত শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর বিজ্ঞান।"[২]

মূল বক্তব্য-কে একটু সংক্ষেপিত করে স্বামীজী যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে তরুণবয়সেই তাঁর ভাষানৈপুণ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। অবশ্য স্পেন্সারের কাছে অনুমতির অনুবাদ চাওয়াতেই তার প্রমাণ এবং স্পেন্সারের দার্শনিক মতামতপ্রসঙ্গেও এই তরুণ এমন কিছু বক্তব্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, যার দ্বারা স্পেন্সারের মনে এই নবীন দার্শনিক সম্বন্ধে উঁচু ধারণা জন্মেছিল—এমন বিবরণ আমরা বিবেকানন্দ-জীবনীতে পাই। তবে স্বামীজীর ভাষার বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখলে এই 'শিক্ষা'-অনুবাদ গ্রন্থটির ভাষাই বোধ হয় তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গদ্যরচনার প্রাচীনতম নমুনা। কারণ, 'সংগীত কল্পতরু' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১২৯৪) যে ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন, তা যদি ১৮৮৬ সালে লিখিত হয়ে থাকে এবং স্বামীজী যদি পিতৃ-বিয়োগের পরে আর্থিক কারণে অনুবাদগ্রন্থ রচনার হাত দিয়ে থাকেন,

১ Education : Spencer : lst Edn : p 53

২ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী সংস্করণ (মুদ্রাকর : শশিভূষণ দত্ত) : পৃ: ৪৫

তাহলে ১৮৮৬-র আগেই এ অনুবাদ প্রকাশিত। স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের দেহান্তর ঘটে—১৮৮৪-র গোড়ার-দিকে, তখন স্বামীজীর বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নি। সেদিন থেকে 'শিক্ষা'-গ্রন্থের অনুবাদ ১৮৮৪-র শেষ দিক বা ১৮৮৫-তেই হওয়ার কথা। সম্ভবত বি. এ. পাসের অনতিকাল পরেই তরুণ নরেন্দ্রনাথ এ অনুবাদে হাত দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ 'বাংলা'-বিষয়ে শতকরা ৭০%এর উপরে এবং বি. এ. পরীক্ষায় ঐ বিষয়ে শতকরা ৬০%এর উপরে নম্বর পেয়েছিলেন। সমকালীন বাংলার মানদণ্ডে বি. এ. পাস তরুণ নরেন্দ্রনাথের বাংলাভাষায় দখলের নমুনা হিসাবে 'শিক্ষা' অনুবাদগ্রন্থটির ভাষা মননসাহিত্যের বিশেষ উপযোগী। পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম কি ?'[১] (১৩০৪) উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা'স্বরূপ লেখা 'বর্তমান সমস্যা' (১৩০৫), 'জ্ঞানার্জন' (১৩০৫) থেকে আরম্ভ করে 'বর্তমান ভারত' ('উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩০৫—১৩০৭ এই দু'বছরে প্রকাশিত) পর্যন্ত স্বামীজীর বিশিষ্ট রীতির সাধুগদ্যের প্রাক্-ভঙ্গিমারূপে 'শিক্ষা' গ্রন্থের ভাষারূপ লক্ষণীয়।

'বর্তমান ভারতে'র ভারতচিন্তায় যে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারত-ইতিহাসের বিশ্লেষণ রয়েছে, তারও মূলে স্পেন্সারের প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে তাঁর মত স্মরণীয়—"That which coustitiutes History, properly so called, is in great part omitted from works on this subject. Only of late years have historians commenced giving us, in any considerable quantity, the truly vulnerable information. As in past ages the King was everything and the people nothing; so in past histories the

১ 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে গৃহীত।

doings of the King fill the entire picture, to which the national life forms but an obscure background. While only now, when the welfare of nations rather than of rulers is becoming the dominant idea, are historians beginning to occupy themselves with the phenomena of social progress. The thing it really concerns us to know, is the national history of society."[১]

বর্তমান ভারতে স্বামীজীর ভারত ইতিহাস বিশ্লেষণেও এই সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য। 'শিক্ষা'-গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ—"যথার্থ ইতিহাস অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, এ কথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত।"[২]

স্পেন্সারের বক্তব্য অনেক সংহত আকারে এ অনুবাদে যে রূপ পেয়েছে, স্বামীজীর ইতিহাস-চিন্তার অন্যতম মূলসূত্র তাতে বিধৃত। 'বর্তমান ভারতে' সমাজে বিভিন্ন বর্ণের পর্যায়ক্রমে আধিপত্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বলেছিলেন—'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃ সম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।"[৩]

১ Education : Spencer : Ist Edn : p. 34

২ 'শিক্ষা' : বসুমতী-প্রকাশিত [মুদ্রাকর শশিভূষণ দত্ত] সংস্করণ : পৃঃ ৩২

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৪২

'বর্তমান ভারত' এবং সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর প্রখর সচেতনতা। সুতরাং রাজকাহিনী নয়, গণশক্তির কাহিনীই বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনার মূলসূত্র।

'Education' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ Intellectual Education (জ্ঞান-শিক্ষা)-এর উপসংহারে ছাত্রজীবনের পরবর্তী জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগপ্রসঙ্গে স্পেন্সারের বক্তব্য—"As suggesting a final reason for making education a process of self-instruction, and by consequence a process of pleasurable instruction, we may advert to the fact that, in proportion as it is made so, is there a probability that it will not cease when school-days end. As long as the acquisition of knowledge is rendered habitually repugnant, so long will there be a prevailing tendency to discontinue it, when free from the coercion of parents and masters. And when the acquisition of knowledge has been rendered habitually gratifying, then will there be as prevailing a tendency to continue without superintendence that selfculture previously carried on under superintendence. These results are inevitable. While the laws of mental association remain true,—while men dislike the things and places that suggest painful recollections and delight in those which call to mind bygone pleasures—painful lessons will make knowledge repulsive, and pleasurable lessons will make it attractive. The

men to whom, in boyhood, information came in dreary tasks along with threats of punishment, and who were never led into habits of independent inquiry, are unlikely to be students in after years, while those to whom it came in the natural forms, at the proper time, and who remember its facts as not only interesting in themselves, but as the occasions of a long service gratifying successes, are likely to continue through life that self-instruction commenced in youth."[১]

এই অংশটির অনুবাদে স্বামীজী কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বক্তব্যকে এ দেশীয় পাঠকের উপযোগী সরল করে তুলেছেন, তা লক্ষণীয়—"জ্ঞানশিক্ষার দুইটি সাধারণ নিয়মের বিষয়ে আরও দুই একটি কথা না বলিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। সেই দুইটি নিয়মই অতি প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত অনাদৃত। প্রথমতঃ শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা আপনার চেষ্টায় হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক—যদি মনোবিজ্ঞানের মত হয়, তাহা হইলে স্বাবলম্বন এবং আনন্দসহকারে শিক্ষা হইয়াছে কি না, এই দুইটি ইহার পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, যে পর্যায়ে আমাদের মনোবৃত্তি-সকল স্ফুরিত হয়, সেই প্রকার শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট হইলে অল্পায়াসেই হইবে, অতএব কষ্টকর হইতে পারে না। স্বাভাবিক পর্যায়ে শিক্ষার আরও উপকার আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষিত বিষয় কখনও স্মৃতিচ্যুত হয় না। যাহা আপনার যত্নে এবং ধারণাশক্তির বল অনুসারে শিক্ষা করা যায় তাহা মনোমধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। আবার এই প্রকার স্বযত্নে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে অপরগুলি আয়ত্ত

১ Education : Spencer : 1st Edn. pp. 103-104

করা সহজ হইয়া উঠে। আরও ইহা দ্বারা জীবনের প্রধান সহায় সাহস, মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

"দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ফল বিবেচনা করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে, তাহা নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা বলিয়াই আনন্দদায়ক হইবে। আবার যে বিষয়ে আনন্দ সহকারে শেখা যায়, তাহা অন্য বিষয়াপেক্ষা অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় আনন্দ প্রদান করে তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক মনে থাকে। পঠিতব্য অতি কর্কশ, কাজেই তাহাতে মনঃসংযোগ হয় না, সুতরাং সহজে আয়ত্ত হয় না; শিক্ষক ছাড়িবার নহেন, ভৎসনা প্রহারাদি আরম্ভ করিলেন, জন্মের মত বালকের চরিত্রে দাগ পড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে গুরুজনভয়ে, শিক্ষকের ভয়ে, সুখ্যাতির লোভে বালক পড়িত, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই সব সাঙ্গ হইল। কিন্তু যদি আত্মচেষ্টায় এবং আনন্দ সহকারে পড়িত, তাহা হইলে চিরজীবন সেই আনন্দ লাভের আশায় বিদ্যা উপার্জন করিত।"[১]

শিক্ষার ক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব বিবেকানন্দমানসে যে-সব দিক থেকে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে Phyical Education [শারীরিক শিক্ষা] অধ্যায়টি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। যথার্থ শিক্ষা যে দেহমন আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে,—সেকথা আমাদের পুথিসর্বস্ব শিক্ষার আদর্শে অনেক সময় অবহেলিত। সেদিক থেকে স্পেন্সার বরং শারীরচর্চার জন্য মননচর্চা একটু কমাতে রাজী। তিনি মনে করেন, দুর্বল দেহে পাণ্ডিত্যের চেয়ে একটু কম বিদ্যা থাকলেও যেটুকু বিদ্যা আছে জীবনে তার সুপ্রয়োগ বেশী কাম্য।[২]

দেহগত পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ স্পেন্সার মাংস খাওয়ার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নিরামিষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও জীবনসংগ্রামে

১ 'শিক্ষা': পৃঃ ৬৭-৬৯

২ Education : Spencer : 1st Edn. p. 185

রজোগুণাত্মক কর্মের আদর্শের জন্য আমিষ আহারের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া ব্যায়াম ফুটবল বা অন্যান্য খেলাধূলার প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ তো সর্বজনবিদিত। আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পক্ষেই বেদান্তের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ধ্যানধারণায় অধিকার সম্ভব—এই ছিল তাঁর ধারণা। স্পেন্সার ফুটবল খেলার "brutalizing effect" (বর্বরতার প্রভাব) সম্বন্ধে বিচলিত হলেও ব্যায়ামবিদ্যার কলাকৌশলের (gymnastics) চেয়ে খেলাধূলার সাবলীলতাকেই ছাত্রদের উত্তরজীবনে বেশী কার্যকরী মনে করেছেন।

১৮৯৫ সালে লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষের চিত্র—"...আমি চাই এমন লোক যাদের পেশী লোহার মতো দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।"[১]

স্পেন্সার তাঁর শারীরচর্চার আলোচনায় তৃণভোজী ও মাংসভোজী প্রাণীদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন—"Count up the wild races who are wellgrown, strong and active, as the Kaffirs, North American Indians and Pantagonians and you find them large cousumers of flesh. The illfed Hindoo goes down before the Englishmen fed on more nutritive food, to whom he is as inferior in mental as in physical energy. And generally we think, the history of the world shows that well-fed races have been the energetic and dominant races."[২]

এই অংশটি অনুবাদকালে এর বক্তব্য সবটাই স্বামীজী নিশ্চয় অনুমোদন করেন নি। এমন কি অনুবাদে একটু ভাষাগত স্বাধীনতা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৮৭

২ Education : 1st Edn. p. 158

নিয়ে বক্তব্যের তারতম্যও ঘটিয়েছেন। অবশ্যই মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে যান নি, কিন্তু একেবারে আক্ষরিক অনুবাদও করেন নি।

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা—"মানুষদিগের মধ্যে বুস্‌ম্যান অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা দুর্বল এবং খর্বাকৃতি, অন্যদিকে প্যাণ্টাগোনিয়ান, কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকরখাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাশী জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।"[১]

কিন্তু জগতের ইতিহাস কেবল মাংসাশী জাতিরই জয়ের ইতিহাস নয়, আসলে আত্মবিশ্বাসী জাতিরাই সর্বজয়ী। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকেরা একথা জানেন। স্পেন্সার ইংরেজের পুষ্টিকর আহারের মহিমাকীর্তনের সময় একথা ভুলে গেছেন যে, তাঁর সমকালীন ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবীদের অতি অল্পই এই আহার জুটত এবং দুর্বল হিন্দুদের (ভারতীয়দের) শোষণের উপরেই অধিকাংশ ইংরেজের দেহগত পুষ্টি নির্ভর করতো। লক্ষণীয়, অনুবাদকালে স্বামীজী illfed কথাটির বদলে বন্যজাতিদের তুলনায় "অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকরখাদ্যসেবী" কথাটি ব্যবহার করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ না করাই এখানে ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবের আগে হিন্দুদের মধ্যে মাংসাহার সর্বস্বীকৃত ছিল।

সমকালীন ইংল্যাণ্ডের তরুণদের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যহীনতার কারণ সম্বন্ধে স্পেন্সার যা লিখেছেন, তা অবশ্য একালের তরুণদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—"On old and young, the pressure of modern life puts a still increasing strain. In all business and professions, intenser competition taxes energies and abilities of every adult and to fit the

[১] শিক্ষা : 'শারীরিক শিক্ষা' অধ্যায় : পৃঃ ৯১

young to hold their places under this intenser competition, they are subject to severer discipline than heretofore. The damage is thus doubled. Father, who find themselves run hard by their multiplying competitors, and while labouring under this disadvantage, have to maintain a more expensive style of living, are all the year round obliged to work early and late, taking little exercise and getting but short holidays. The constitiutions shaken by this continued overapplication, they bequeath to their children, predisposed to breakdown even under ordinary strains on their energies, are required to go through a curriculum much more extended than prescribed for the unfeebled children of past generations."[১]

উদ্ধৃত অংশটুকুর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ স্বামীজীর ভাষায়—"আধুনিক কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্‌যোগ এবং শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি-সংগ্রামের উপযুক্ত হইবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে—কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যহ এই প্রকার অধিক পাঠ করিয়া শরীর এবং মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।"

---

১ Education : Spencer : Ist Edn : p. 174

শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য সুসঙ্গত জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মস্তিষ্ক সঞ্চালন ছাড়া অন্যান্য দিক প্রায় অবহেলিত। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্পেন্সার বলেছেন—"প্রকৃতির হিসাবের এক তিল ব্যতিক্রম হয় না;—এ দিকে অধিক ব্যয় কর, অপর দিকের লইয়া প্রকৃতি তাহা পূর্ণ করিবে।"[১] শুধু উপযোগিতাবাদের দিক থেকেই নয়, চিরন্তন শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শের দিক থেকেই প্রকৃতির এই আপূরণ-শক্তির আদর্শ আমাদের স্মরণীয়।

স্পেন্সারের শিক্ষাদর্শ মূলতঃ রুশো এবং কোম্তের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। সমকালীন হিতবাদ এবং ক্রমবিবর্তনবাদের দু'জন চিন্তানায়ক বেন্থাম এবং ডারুইনের প্রভাবও তাঁর ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদর্শের মূলে রয়েছে ইহজীবনের পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস। এমন কি, ধর্ম বা কবিতার মতো ভাবকল্পনার বিষয়বস্তুকেও স্পেন্সার বিজ্ঞানের আলোকে দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন। ফলে বিজ্ঞানের প্রতি এমন এক পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, যা আধুনিক শিক্ষাচিন্তার জগতে সমর্থনযোগ্য নয়। অতিরিক্ত বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতের প্রতিবাদে এ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারিগরীবিদ্যার ক্ষেত্রেও মানবিক বিদ্যার প্রয়োগের কথা শিক্ষাবিদ্‌দের অন্তরে জেগেছে।[২] তথ্যানুসন্ধানীদের মূল্য স্বীকার করেও একথা ভাবা দরকার যে বেঁচে থাকার অর্থ কেবল অস্তিত্বের সমস্যা মেটানো নয়। মানবমানসের দূরাভিসারী ভাবনা ও চেতনার অভিযানে চন্দ্রলোকযাত্রা সামান্য পদক্ষেপ মাত্র, মানব-অন্তরের অনন্ত মহাকাশের তুলনায় বাইরের মহাকাশ অনেক সীমাবদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা বেদান্তের আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠায়। তাই তাঁর মতে Education is the manifestation of the perfection already in man.

---

১ শিক্ষা: পৃঃ ৯৫-৯৬

২ এ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে মানবিক বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন বিশেষ প্রশংসনীয়।

"মানব-অন্তরের চিরন্তন পূর্ণতার বিকাশ সাধনই শিক্ষা।"[১] কারণ, বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মতে, 'মানব-অন্তরের চিরন্তন ব্রহ্মত্বের প্রকাশই ধর্ম।'[২] সেইসঙ্গে প্রথম জীবনে স্পেন্সারের—'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদক বিবেকানন্দ এও বলেছেন, "আমাদের চাই কি? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা)—যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু'পয়সা ক'রে খেতে পারে।"[৩]

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার সংযোগের প্রয়োজন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন থেকে প্যারীচাঁদ, ভূদেব, বঙ্কিম প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণ সকলেই একমত। স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে বেদান্তের মুক্ত আত্মার অভয়বাণী সংযুক্ত ক'রে শিক্ষাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজীর চিন্তাধারায় স্পেন্সারের প্রভাবের ও সে প্রভাব অতিক্রমণের সামান্য কয়টি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত হ'ল। সময় ও সুযোগমত এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা যাবে। এ গ্রন্থে আমাদের লক্ষ্য অনুবাদক বিবেকানন্দের পরিচয়-লাভ।

বাংলাসাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং বিরাট সম্ভাবনা। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা যত বিস্তৃত হবে, বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়গত শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা যতো ব্যাপক হবে, ততই মননশীল অনুবাদকের প্রয়োজন আমাদের বাড়বে। সেদিক থেকে বিশ্বসাহিত্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করাও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। সুখের বিষয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমেত দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন এ সম্বন্ধে সচেতন।

১, ২ ৩রা মার্চ, ১৮৯৪ চিকাগো থেকে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য। বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪০০

৩ স্বামীজীর স্মৃতি: প্রিয়নাথ সিংহ: বাণী ও রচনা: নবম খণ্ড: পৃঃ ৪০৩

বাংলা অনুবাদসাহিত্যে পৃথিবীর শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education'-এর প্রথম অনুবাদক (এ পর্যন্ত আর কোনো অনুবাদকের কথা জানি না) হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির নব সংস্করণের ভূমিকায় চার্লস. টি. স্মিথ যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, সেটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"...Spencer's treatise belongs to that brief list of immortal books which have real significance for pupils, teachers, parents, and administrators." স্পেন্সারের নিবন্ধটি পৃথিবীর ইতিহাসে সেই অঙ্গুলিমেয় অমর গ্রন্থরাজির অন্যতম—ছাত্র, শিক্ষক, পিতামাতা ও পরিচালকবৃন্দ নির্বিশেষে সকলের কাছে যে জাতীয় গ্রন্থের সত্যিকার তাৎপর্য বিদ্যমান।[১]

বিজ্ঞানসচেতন সমাজতাত্ত্বিক মননের যে উত্তরাধিকার স্বামীজী স্পেন্সারের কাছে লাভ করেছিলেন উত্তরকালে স্বকীয় সাধনা ও মননে তাকে আধুনিক ভারত ও পৃথিবীর শিক্ষাচিন্তার পক্ষে চিন্তনীয় উপাদানে পরিণত ক'রে গেলেন। সুতরাং স্বামীজীর প্রথম জীবনের এই অনুবাদ বিবেকানন্দ-জীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান; সেইসঙ্গে অনুবাদক বিবেকানন্দের ভাষাশক্তি ও মননশীলতার বিশিষ্ট উদাহরণ।

---

১ Education : Spencer : 1949 Edn : See Preface pxiii

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিকা : 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মুখপত্র-স্বরূপ তিনটি পত্রিকার কথা আমরা জানি—'ব্রহ্মবাদিন্', 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'উদ্বোধন'। এদের মধ্যে 'উদ্বোধন' বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর দান আলোচনা প্রসঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শের প্রকাশরূপে এ পত্রিকাখানির কথা আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রথমোক্ত পত্রিকাদুটির আলোচনা প্রয়োজন 'উদ্বোধনে'র সূচনারূপে।

'ব্রহ্মবাদিন্' পাক্ষিক পত্রিকারূপে ১৮৯৫-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে। স্বামীজীর অশেষ স্নেহভাজন আলাসিঙ্গা পেরুমল এ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে যে তিনজন বিবেকানন্দ-অনুগামীর পত্র প্রকাশিত হয়, তাঁদের নাম জি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও, এম. সি. নাঞ্জুণ্ডা রাও এবং এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল। ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞান-শিক্ষক আলাসিঙ্গা স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাদ্রাজের তরুণদের অন্যতম। তাঁর এবং তাঁর মতো মাদ্রাজের আরো কিছু তরুণের আগ্রহেই চিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগদানের সঙ্কল্প স্বামীজীর মনে জাগে। আমেরিকা থেকে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে যেসব চিঠি লিখেছেন সেগুলি ভাবের মহত্ত্বে ও অনুপ্রেরণার অগ্নিতাপে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। স্বামীজীর প্রেরণাতেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশের বাহনরূপে 'ব্রহ্মবাদিন্' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন মাদ্রাজের তরুণেরা। চিকাগো ধর্মমহাসভায় অসামান্য সাফল্যের পর আমেরিকায় একের পর এক নগরীতে বিজয়-অভিযান শেষে স্বামীজী যখন ইংল্যাণ্ডে তখনই ভারতে স্বামীজীর ধ্যানকল্পনার বাহনরূপে প্রকাশিত হলো 'ব্রহ্মবাদিন্'।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির আদর্শের কথা জনসাধারণকে জানিয়ে পূর্বোক্ত বিবেকানন্দ-অনুগামীরা লিখেছিলেন—

Sir,

Under the advice and with the encouragement of Swami Vivekananda, it is proposed to start a weekly journal to be named the Brahmavadin. The main object of the journal is to propagate the principles of the Vedantic Religion of India and to work towards the improvement of the social and moral conditions of man by steadily holding aloft the sublime and universal ideals of Hinduism. The power of any ideal in filling human heart with inspiration, and the love of the good and the beautiful, is dependent on how high and pure it is: and it shall be the endeavour of the Brahmavadin to pourtray the Hindu ideal in the best and truest light in which it is found recorded in the historical sacred literature of the Hindus. Mindful of the fact that between the ideal of the Hindu Scriptures and the practical life of the Hindu peoples, there is a wide gulf of seperation, the proposed new journal will constantly have in view how best to try to bridge that gulf and make the social and religious institutions of the country accord more and more with the spirit of that lofty divine ideal.[১]

১ The Brahmavadin, Saturday, Sept. 14, 1895 Vol. I No I : Prospectus. "মহাশয়, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ ও উপদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মবাদিন্ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব

'ব্রহ্মবাদিনে'র এই আদর্শই স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও প্রেরণায় প্রকাশিত সব কয়টি পত্রিকার প্রাণের কথা। 'ব্রহ্মবাদিনে'র সম্পাদকমণ্ডলী আর্যধর্ম ও সাধনার গভীরতর মর্মানুসন্ধানের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। এমন কি এঁদের অতিরিক্ত সংস্কৃত-প্রধান রচনা সম্বন্ধে স্বামীজীও মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মোটের উপর যে সমুচ্চ মননের আদর্শ বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল প্রেরণা তার পরিচয় 'ব্রহ্মবাদিনে' বিধৃত।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে সহজ গল্পকথায় বেদ, উপনিষদ, পুরাণের অমর গল্পকাহিনীগুলি ইংরেজীতে বিশ্ববাসীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনও স্বামীজী অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তরুণ বয়সে শোনা সেই অপূর্ব গল্পমালার কথাও হয়তো তাঁর মনে জেগেছিল। এই পদ্ধতিতে তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন।

'ব্রহ্মবাদিনে'র প্রায় দু'বছর পরেই তাই প্রকাশিত হল 'প্রবুদ্ধ ভারত'। ১৮৯৬-এর জুলাই থেকে প্রকাশিত হয়ে মাঝে সামান্য কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরুজ্জীবিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' আজ অবধি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্ররূপে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত।

'প্রবুদ্ধ ভারত'—পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার নামের পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে নিচে লেখা আছে—'a name suggested by

করিতেছি। পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় বেদান্তধর্মের আদর্শ প্রচার এবং হিন্দুধর্মের উচ্চতম সর্বজনীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মানবজাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা। মানবহৃদয়কে মহৎ প্রেরণা এবং শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ করিয়া তোলা নির্ভর করে একটি আদর্শের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার উপর; ব্রহ্মবাদিনের প্রচেষ্টা হইবে হিন্দুশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম সত্যের অনুসন্ধান। শাস্ত্রগত আদর্শ এবং ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপদানের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে সে কথা মনে রাখিয়া প্রস্তাবিত এই নূতন পত্রিকা সর্বদা এই পার্থক্য দূর করিতে এবং দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধ্যাত্মিক আদর্শের উন্নত মহিমার উপযোগী করিয়া তুলিতে নিয়ত সচেষ্ট থাকিবে।"

Swami Vivekananda which, while means Awakened India, also indicates the close relationship that exists between Hinduism and Buddhism." 'স্বামী বিবেকানন্দ-প্রস্তাবিত এই নামটির অর্থ জাগ্রত ভারত (ইংরেজীতে Awakened India) হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্বন্ধের কথাও মনে করিয়ে দেবে।'

'প্রবুদ্ধ ভারত'—পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার—(The Prabuddha Bharata or Awakened India, Madras, July, 1896, Vol I, no I) Ourselves (আমাদের কথা) শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে— …the eyes of the western world were themselves turned towards India, turned, not as of old for the gold and silver she could give, but for the more lasting treasures contained in her ancient sacred literature. Christian Missionaries in their eagerness to vilify the Hindu, had opened an ancient magic chest, the very smell of whose contents caused them to faint. Oriental scholars, the Livigstones of eastern literature, had unwittingly invoked a diety, which it was not in their power to appease. As philologists are succeeded by philosophers, Colebrooks and Caldwells give birth to Schopenhaurs and Deussens. The white man and his fair lady stray into the Indian wood, and there, come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary try the cool shade, the refreshing stream, and above all the hoarier, cooler and the more refreshing philosophy that falls from his lips enchant them. The discovery is published ; pilgrims multiply. A Sannyasin from

our midst carries the altar-fire across the seas. The spirit of the Upanishads make a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores and behold ! our mother-land is awakening.[১]

পাশ্চাত্যে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শের (orientalism) প্রভাব-বিস্তারের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাবে পাশ্চাত্যবাসীর প্রাচীন ভারতীয় জগতে প্রবেশের যে ছবি কথায় আঁকা হয়েছে, তাই প্রবুদ্ধ-ভারতের মলাটেও আঁকা হয়েছিল। সে ছবি স্বামীজীর কাছে এতই বিরক্তিকর

১ "...পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর এসে পড়েছিল, তবে এবার প্রাচীনকালের মতো সোনারূপোর জন্য নয়, তার চেয়ে যে চিরস্থায়ী সম্পদ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নিবদ্ধ, তারই উদ্দেশে ভারতের প্রতি এই দৃষ্টিপাত। হিন্দুদের কুৎসাগান করতে গিয়ে খ্রীষ্টান মিশনরীর দল এমন এক যাদুর বাক্স খুলে ফেলল, যার ভিতরের জিনিষগুলির গন্ধ পেয়েই তারা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। প্রাচ্যসাহিত্যে লিভিংস্টোনের সমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এমন এক দেবতাকে জাগিয়ে তুললেন, যাঁকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা এদের ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের পরে যেমন দার্শনিকেরা দেখা দেন, তেমনি কোলব্রুক আর কল্ডওয়েলদের পরে দেখা দিলেন সোপেনহাওয়ার এবং ডয়সন প্রভৃতি। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তাঁর সুন্দরী পত্নীসহ ভারতীয় অরণ্যে প্রবেশ করে অশ্বত্থতলায় হিন্দু ঋষিকে দেখতে পেলেন। প্রাচীন বৃক্ষটির শীতল ছায়া, প্রাণদ ঝর্ণাধারা আর সবার উপরে ঋষিমুখ-নিঃসৃত সুপ্রাচীন সুস্নিগ্ধ প্রাণবন্ত অমৃতবাণী তাঁদের বিমুগ্ধ করলো। আমাদের মধ্য থেকে একজন সন্ন্যাসী সমুদ্রপারে হোমাগ্নিশিখা বহন করে নিয়ে গেলেন। উপনিষদের মর্মবাণী দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে গেল। ক্ষীণ শোভাযাত্রাটি ক্রমে বিরাট উৎসবে পরিণত হ'ল। সে উৎসবের কলকোলাহল ভারতের উপকূলে এসে পৌঁছুল। চেয়ে দেখুন আমাদের মাতৃভূমি আবার জেগে উঠছেন !"

এক্ষেত্রে একটু রূপকছলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের কৃতিত্ব এবং পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অভিযানে ভারতের নবজাগরণপর্বের সহায়তার কথা যে নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা লক্ষণীয়।

মনে হয়েছিল যে, যথাশীঘ্র 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র নতুন মলাটের জন্য উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতে ক'রে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না। ১৮৯৮-এর জুন অবধি সম্পাদক রাজন আয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে এই বছরের আগস্টমাসে হিমালয়ের আলমোড়া থেকে বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দজীর সম্পাদনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' আবার প্রকাশিত হতে থাকে। রাজন আয়ারের আকস্মিক দেহাবসানে পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়াতে বেদনার কারণ ঘটলেও এর পর থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও কল্পনায় 'প্রবুদ্ধ-ভারতে'র নবরূপান্তর ঘটে।

'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এই নবজন্ম উপলক্ষেই স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত কবিতা To The Awakened India (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি) লিখেছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' দুটি পত্রিকাতেই তাঁর অজস্র বক্তৃতা ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাদুটি যে স্বামীজীর বিশ্বকল্যাণ-যজ্ঞেরই আর এক দিক সে সম্বন্ধে বারংবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুগামীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮—এই সময়ের মধ্যে আমরা দুটি ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ দেখলাম। ১৮৯৯-এ প্রকাশিত হল স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা সাময়িক পত্র 'উদ্বোধন'।

২

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার আদর্শবাণী ছিল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার আদর্শ—'Arise! Awake! and stop not till the goal is reached.' উদ্ধৃত বাক্যটি যে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তার যোগে সৃষ্ট সেকথা 'অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে আলোচিত। 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ হলো উপনিষদের মূলবাণী—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ব্যক্তি আত্মা থেকে ভারতাত্মা, এবং ভারতবর্ষ থেকে সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর এই আহ্বানের লক্ষ্য। তবু, বিশেষভাবে বাংলার সন্তান তিনি, বাঙালী হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ-পরিশোধের উপায় হলো মাতৃভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ-প্রচারের মাধ্যমরূপে একটি পত্রিকা-প্রকাশ। অনেকদিন থেকেই এ-জাতীয় একটি পত্রিকা-প্রকাশের কথা নিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলছিল।

১৮৯৪-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর বরাহনগরের মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে স্বামীজী লিখ্ছেন—"একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরাজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত (বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী সদানন্দ) হিন্দি দিকটা লিখুক……"[১]

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় 'খবরের কাগজে'র সঙ্কল্প তখনই রূপায়িত হয় নি। এর মধ্যে ইংরেজী পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন্' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হলো। তবু একে ঠিক সঙ্ঘের পত্রিকা বলা চলে না। ১৮৯৬ এর জানুয়ারিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে লেখা স্বামীজীর আর একটি চিঠির অংশ—"…তোর কাগজের idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো…। খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজানা মুসলমান ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলাভাষা

১ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড

যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গতিয়ে দিবি।...চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে,—না হবে ওদের উদ্ধার, না আর কারুর।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভাইদের অন্যতম সারদা (বা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)[২] তাঁর পত্রিকাপ্রকাশের সঙ্কল্পের দ্বারা স্বামীজীর মনে কতখানি উৎসাহসঞ্চার করেছিলেন, তা এ পত্রটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পত্রিকাপ্রকাশের পিছনে অধ্যাত্মপ্রেরণা ছিল বলেই প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ থেকে পরবর্তীকালে উদ্বোধনের বিশিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়ত সাধনায় এ পত্রিকা আজো বাঙালী পাঠকের (বিশেষতঃ অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে) পরম শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে আছে।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো যদি শ্রেষ্ঠ নেতার লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে পত্রিকাপ্রকাশের ক্ষেত্রে মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং কলকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—এঁদের দু'জনের নির্বাচন স্বামীজীর সহজাত নেতৃত্বশক্তির নিদর্শন।

৩

'উদ্বোধন'-প্রকাশের সমকালীন স্মৃতির দু'একটি উদাহরণ। প্রথমে স্বামী সুন্দরানন্দজী-সম্পাদিত 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা'-প্রবন্ধে কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের স্মৃতিচারণ—

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২১০

২ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবীর কাছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে এঁরা প্রথম থেকেই গণ্য হয়েছিলেন।

" 'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল! ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সুদৃঢ় সংকল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রেরণা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকার' সম্পাদনার গুরুদায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

"পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের

১ উদ্বোধন: ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩০৫

ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না।" স্বামীজী বলিলেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হল বল?"[১]

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর লেখক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা[২]—"স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল···।

"পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ—এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল।···

"স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস?

"শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ; সুন্দর হয়েছে।

"স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

---

১ উদ্বোধন, স্বর্ণজয়ন্তীসংখ্যা পৃঃ ২১৬-২১৭

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামিশিষ্যসংবাদ : পৃঃ ১৭৩

"শিষ্য। কিরূপ ?

"স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই। অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদ ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।"

দেখা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা নিয়ে নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্কল্পও স্বামীজীর মনে এই কালে জেগেছে। 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামীজীর বিভিন্ন রচনা সেই পরীক্ষামূলক সচেতন প্রচেষ্টার অঙ্গস্বরূপ।

"আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (সাফল্য) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে।" পত্রিকার উদ্দেশ্য যে আর একভাবে নর-নারায়ণ-সেবা সেকথাও এক্ষেত্রে স্পষ্ট।

কথায় কথায় শরচ্চন্দ্র জানালেন, "ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কাল বললেন, তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের প্রথম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব!

"স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।"

১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রথম সংখ্যা 'উদ্বোধন' (১লা মাঘ, ১৩০৫) প্রকাশিত হওয়ার কাছাকাছি একটি দিনে স্বামীজী এই পত্রিকার আদর্শ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কথাগুলি বলার পাশাপাশি ঐদিন রাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও সাহিত্য-সৃষ্টির একটি মূলসূত্র তুলে ধরেছিলেন—

"স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive idea (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 'এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, Children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত) করা হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!"

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন: "ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাকসিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস নি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাবধারা) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে।..."

"তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে। মানুষকে কেবল বলছে—"তুই নরকে যাবি। তোর

আর উপায় নেই।" তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা-শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে।"[১]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার পটভূমিকায় ভাষা-আন্দোলন, ভারতের জাগরণ ও মানব-কল্যাণের সুমহৎ সঙ্কল্প ছিল বলেই ১৩০৫ থেকে আজ অবধি—এই সুদীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের অক্লান্ত সাধনায় এবং অনুরাগী লেখক ও পাঠকমণ্ডলীর সমবেত সহায়তায় (তেমন অর্থকরী সাফল্য না থাকলেও) এ পত্রিকা ভারত-সংস্কৃতি-প্রচারে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এসেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয়—সাধারণভাবে গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকের 'উদ্বোধনে' গিরিশচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের এ-জাতীয় রচনা যদিও বা কিছু থাকতো, পরবর্তীকালে আর তার কোনো নিদর্শনই প্রায় নেই। শুধুমাত্র সাধনার বলে একটি পত্রিকার এত দীর্ঘকাল অচ্ছেদ্যভাবে পাঠকদের সঙ্গে যোগ রাখার উদাহরণ ইদানীং কালের বাংলাসাহিত্যে আর নেই।

প্রথম বর্ষ 'উদ্বোধনে'র বাঁধানো সংখ্যা থেকে এর আখ্যাপত্রটি একালের পাঠকদের আগ্রহের কথা ভেবে তুলে দিচ্ছি—

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্র

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,

কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ

প্রভৃতি নানাবিধ-বিষয়ক।

---

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১৭৬-১৭৭

প্রথম বর্ষ

১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—২৲

কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রেয় লেনস্থ উদ্বোধন প্রেস হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির সূচনা-প্রবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত 'প্রস্তাবনা'। এই প্রস্তাবনাটির গুরুত্ব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা উপলব্ধির পক্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাণের সত্যটি ধারণায় আনার জন্যও প্রয়োজনীয়। এক হিসাবে এ রচনাটি সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রস্তাবনারূপেই গৃহীত হ'তে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের এক ভাবচিত্র উপস্থাপিত করে উদ্বোধনের প্রথম প্রবন্ধেই স্বামীজী ঘোষণা করলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী য়ুরোপ পূর্বপুরুষের "মুখোজ্জলকারী সন্তান", "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।"

"কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

কিভাবে এই নবজাগরণ সম্ভব? "রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

"অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে না। সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।"

পাশ্চাত্য প্রভাবের আতিশয্যে ভারতীয়তার বিলুপ্তি সম্বন্ধে যাঁদের ভয়, তাঁদের উদ্দেশে স্বামীজীর বক্তব্য—"আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?"

প্রবন্ধপ্রান্তে এসে পাঠকমণ্ডলীর সামনে 'উদ্বোধনে'র আদর্শ ও পন্থা তুলে ধরে স্বামীজী লিখেছেন-- " 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগ বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

"কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে ; আমরা কেবল বলি—হে তেজঃস্বরূপ। আমাদের তেজস্বী কর ; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান্ কর ; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।" 'উদ্বোধনে'র সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই অসাম্প্রদায়িক মানব-মঙ্গলের শুভসঙ্কল্প অটুট থেকেছে—এইটিই বিবেকানন্দ-অনুগামীদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬ 'উদ্বোধনে'র সূচনায় 'নববর্ষ প্রবেশ'। লেখকের নাম নেই।

"আজ উদ্বোধন নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। "দেবগুরু প্রসাদে" এই এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই, বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। অনেক সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাধিক সফলতালাভ আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

"...আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত 'গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য্য। প্রয়োজনীয় যে সকল গুণাবলি স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনাই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।

"পরহিত সাধনের আবশ্যক ? নিজ হিতকল্পে ব্যাপৃত থাকলেই ত হয়। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; পাঁচজনকে লইয়াই সমাজ; স্ব স্ব কর্তব্য করিলে কাহাকেও পরের কার্য্য করিতে হয় না। পরহিত আকাশ কুসুম বা সোনার পাথরবাটিবৎ; নিজ হিতই ত পরহিত। নিজের হিতই ত পরমহিত।

"কিন্তু, কালের বিচিত্র গতি। সেকালে ছিল বটে ঐ প্রকার; একালে অন্য রকম,—কর্ত্তব্যপালনের পরিবর্ত্তে অহিতাচরণই যেন প্রথা। স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন বিলুপ্তপ্রায়, নিজ নিজ হিতসাধন সুদূর পরাহত; সুতরাং পরহিতের আবশ্যক, নিঃস্বার্থতার উদ্ভব; এবং কাহারও কাহারও বোধ হইতে লাগিল, পরহিতই পরমপুণ্য, পরহিতই নিজহিত; দেখা গেল—এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"...

প্রবন্ধটির উপসংহার—"অতি মহৎ উদ্দেশ্যসহকারে উদ্বোধন জনসমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন; কামনা—পরহিত; না, পর—নহে, স্বজাতির, স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা সমভিব্যাহারে; সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্য্যে নানা

বিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা-উদ্যম। প্রসাদ-জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

বর্ষপ্রবেশের এই রচনাটি খুব সম্ভব সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতের। স্বামীজীর ভাবধারা তিনি কীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন তা যেমন এ রচনায় লক্ষণীয়, তেমনি বিচার্য ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য। পরবর্তী জীবনে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ-প্রচারে ইনি সত্যিই 'প্রাণ দিয়েছিলেন'।

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৭ এর সূচনা-নিবন্ধটির নাম 'নবানুরাগ'। এটিও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীরই লেখা মনে হয়। প্রথম অনুচ্ছেদ এইরকম—"আজ আমাদের শুভ দিন—উদ্বোধনের নববর্ষারম্ভ। আজ আশীর্বাদ করুন, নূতন উদ্যমের সহিত যেন ইহাকে চালাইতে পারি; উদ্বোধন যেন নববর্ষে—নবানুরাগের ভরে অধিকতর বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। আজ একটু মঙ্গল-বাসনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্যমে স্ব স্ব কার্য্যে রত হইতে থাকেন; নব প্রেমে, নব অনুরাগে যেন সকলে নির্মল আনন্দমূর্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠে; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অন্তরে, প্রতি হৃদয়ে, যেন আজ তড়িৎ-তন্তু উদ্দীপিত হইয়া উঠে—"...

চতুর্থ বর্ষেও কার্তিক সংখ্যা অবধি সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। তবে এ বছরের প্রথম সংখ্যা (১লা মাঘ, ১৩০৮ সাল) শুরু হয়েছে বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কে তুমি?' কবিতা দিয়ে। তারপরই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অংশবিশেষ মুদ্রিত।...এই চতুর্থ বর্ষেরই একাদশ সংখ্যার (১লা শ্রাবণ, ১৩০৯) সূচনায় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ সংহত বেদনায় প্রকাশিত।

"আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

"কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে-দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

"বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ়, শুক্রবার, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।"—

এর পর ৪ঠা জুলাইয়ের সারা দিনটিতে স্বামীজীর বর্ণনা—"...যেদিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন প্রাতঃকালে যজুর্বেদের একটি মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী-শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, টীকাতে সুষুম্নঃ শব্দের যে অর্থ থাক পরবর্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

"ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাঁহার মনে ষট্‌চক্রের ভাব ও সাধনাবিশেষ জাগরূক ছিল।

"পরে বেলা আটটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

"ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটি এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।'

"সেদিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে "লঘুকৌমুদী" ব্যাকরণ পড়াইলেন, পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেকদিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই। সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল

ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হাল্কা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটিকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

"তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামাপূজা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সে দিন অনেক কথাবার্তা কহেন। ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইতে যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজীর নাড়ী নাই ও নিশ্বাসবন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতে সমাধিভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।"

স্বামীজী তো শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনিই প্রথম চারবছরের 'উদ্বোধনে'র প্রধান লেখক। একদিকে তাঁর মৌলিক বাংলা রচনাবলী, অন্য দিকে তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদ এ দুয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট 'উদ্বোধন' এখন থেকে সাধারণভাবে স্বামীজীর মৌলিক বাংলারচনাপ্রকাশের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল।[১]

---

১ পঞ্চম বর্ষের 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর চিঠিপত্র থেকে উদ্ধার করে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। হয়তো এর পরেও স্বামীজীর কোনো অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া যেতে পারে।

'উদ্বোধনে'র এই চতুর্থ বর্ষেই কার্তিক মাসে সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির ভার নিয়ে চলে গেলেন। স্বামীজীর আদর্শে 'উদ্বোধন' পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রবন্ধটি প্রথম পৃষ্ঠায় ধারণ করে ৫ম বর্ষের 'উদ্বোধন'-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

ভারতে শক্তিপূজা

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত)

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"জড় চেতন সকলের মধ্যে গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তি-রূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

"হে পাঠক! উদ্বোধন ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরমকল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাততঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে,—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য অসহায় মনুষ্যশরীরেই জড়শক্তিনিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতনশক্তি আবার জাগরিত।"

উদ্ধৃত অংশের পর পূর্ণাভিষিক্ত তন্ত্রবিদ্ স্বামী সারদানন্দজী ভারতে শক্তিপূজার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী। কিন্তু সূচনায় 'উদ্বোধনে'র আদর্শের বহ্নিশিখাটি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বর্ষের

'প্রস্তাবনা' থেকে সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়ার শুভ-সঙ্কল্পে সারদানন্দজীর দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

৪

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম চারটি বৎসরে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। বলা বাহুল্য, এ পত্রিকাটি না থাকলে স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাই বিবেকানন্দ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে আমাদেব মূল অবলম্বনীয় হ'ত। তার ফলে বাঙালীর মনের মাটির সঙ্গে স্বামীজীর যোগ সহজে ঘটতো কি না সন্দেহ। বাংলা-সাহিত্যে স্বামীজীর মৌলিক দানের মাধ্যম এই পত্রিকাটি তাই আমাদের মনন ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী।

স্বামীজীর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের রচনা হিসেবে নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা চলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত-উল্লেখিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ, (এখনো এই বইটির সন্ধান পাই নি), হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থের অনুবাদ 'শিক্ষা' এবং 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকা-অংশ। এ ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে নিবদ্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন', 'ঈশা অনুসরণ' (ভূমিকা ও অনুবাদ) 'হিন্দুধর্ম কি?'—এ কয়টি 'উদ্বোধন' প্রকাশের আগেই রচিত।[১] কিন্তু বাংলা সাহিত্যে স্বামীজীর আত্মপ্রকাশ প্রধানতঃ 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনাবলী অবলম্বনে।

বাংলা ১৩০৫ সনের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পাক্ষিক পত্রিকা' উদ্বোধনের আয়তন ছিল ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲। সাধারণতঃ প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে বা অন্য কোনো সময় এক মাস 'উদ্বোধন' প্রকাশ বন্ধ থাকলেও প্রথম বর্ষে এমন কোনো বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষে এই পাক্ষিক পত্রিকার বারোমাসে চব্বিশটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল।

১ গদ্যে এই রচনাগুলি বাদে বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত স্তব, সংগীত ও কবিতা কিছু কিছু এই যুগে রচিত।

প্রথম চার বৎসরের 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর যে যে মৌলিক বাংলা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিকা নিম্নরূপ—

১. প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৫—'প্রস্তাবনা'—['ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে পরিবর্তিত নাম 'বর্তমান সমস্যা'] এটি 'উদ্বোধনে'র সূচনা-প্রবন্ধ।

২. প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ই মাঘ, ১৩০৫—'সখার প্রতি' (কবিতা)। এই সংখ্যা 'উদ্বোধনে'র দুটি মুদ্রণ হয়েছিল। একটি মুদ্রণে মূল কবিতার কয়েকটি চরণ বর্জিত এবং 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' পাঠ। অন্য মুদ্রণে পূরো কবিতা এবং 'পক্ষহীন' পাঠ। 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে মুদ্রিত স্বামীজীর মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবিতে এই দ্বিতীয় পাঠটিই আছে। তবে 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' করবার চেষ্টা দেখা যায়। সে সংশোধন স্বামীজীর নিজের বা অন্য কারুর বলা কঠিন। মোটের উপর এই পাণ্ডুলিপির পূর্ণাঙ্গ বয়ানটিই বর্তমানে 'সখার প্রতি' কবিতা।

৩. প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১লা ফাল্গুন, ১৩০৫—'জ্ঞানার্জন' (প্রবন্ধ) এই সংখ্যার সূচনা প্রবন্ধ।

৪. প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩০৫—'ম্যাক্‌স্‌মূলর কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' (সমালোচনা)। ম্যাক্সমূলারের সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী ও বাণীর উপাদান-সংগ্রহে ম্যাক্সমূলার অনেক পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের দ্বারা উপকৃত।

৫. প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৫—'বর্তমান ভারত' (ধারাবাহিক রচনা)

৬. ঐ ১০ম ও ১৪শ সংখ্যা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ও ১৫ই শ্রাবণ, ১৩০৫—'ভাব্‌বার কথা' (রসরচনাগুচ্ছ)

৭. ঐ ১৫শ সংখ্যা, ১লা ভাদ্র, ১৩০৬—'বিলাতযাত্রীর পত্র' (ধারাবাহিক রচনা)

৮. দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬—'নাচুক তাহাতে শ্যামা' (কবিতা)

৯. ঐ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৬—'স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। বাঙ্গালা ভাষা।' "কালিফোনিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জিলস্ নামক স্থান হইতে" উদ্বোধন-সম্পাদককে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে লেখা স্বামীজীর পত্র। এই সংখ্যার সূচনা প্রবন্ধ।

১০. ঐ ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭- 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (ধারাবাহিক রচনা)

১১. ঐ ২০শ সংখ্যা, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭—'পারিস্ প্রদর্শনী' (প্রেরিত পত্রের অনুবাদ) পত্রটি যে স্বামীজীর নিজেরই লেখা তেমন কোনো কথা 'উদ্বোধনে' নেই। বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে 'ভাব্‌বার কথা'-গ্রন্থে এটি মৌলিকরচনার অন্তর্ভুক্ত। এমন হতে পারে যে মূল ইংরেজী রচনা স্বামীজীর, অনুবাদও তাঁর নিজস্ব। গ্রন্থবদ্ধ হবার কালে নাম 'পারি প্রদর্শনী'। রচনাভঙ্গী স্বামীজীর।

১২. তৃতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩০৭—পৌষ, ১৩০৮—ধারাবাহিক রচনা 'পরিব্রাজক' (তৃতীয় বর্ষ থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্রে'র—পরিবর্তিত নাম) এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

১৩. চতুর্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩০৯—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (প্রবন্ধ)। ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৬৫তম জন্মোৎসবে 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। 'উদ্বোধনে' পুনঃপ্রকাশকালে এই নামে পরিচিত।

১৪. পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩১০—'গাই গীত শুনাতে তোমায়' (কবিতা)। কবিতাটির সূচনায় সম্পাদকীয় মন্তব্য —"এই কবিতাটি আমেরিকা হইতে মঠে প্রেরিত স্বামীজীর চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।" ১৮৯৪ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে আমেরিকা থেকে লেখা উক্ত চিঠিতে জনৈক গুরুভাইকে

স্বামীজী লিখেছেন—'তোমার পড়বার জন্য দু'ছত্র কবিতা পাঠালাম।' চিঠিতে এই কবিতায় 'একা আমি হই বহু, দেখিতে আপন রূপ।'—এই পর্যন্ত আছে।

'উদ্বোধনে'র প্রথম চার বৎসরে প্রকাশিত স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনাবলী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ—

ধারাবাহিক রচনার মধ্যে সর্বপ্রথম রচনা 'বর্তমান ভারত' প্রথম বর্ষের ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১শ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের ৭, ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরিসমাপ্ত। দ্বিতীয় রচনা 'বিলাতযাত্রীর পত্র' প্রথম বর্ষের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ সংখ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষের ৩, ৪, ৫ এবং তৃতীয় বর্ষের ১, ৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত। তৃতীয় বর্ষের 'উদ্বোধনে'ই 'বিলাতযাত্রীর পত্রে'র নাম হয় 'পরিব্রাজক'। 'পরিব্রাজকে'র এই অংশ অবধি 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত—"এদেরও তাই হবে—কালস্য কুটিলা গতি, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা!!" এর পরের প্রায় সাত পৃষ্ঠা এবং সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টের পাঁচপৃষ্ঠার উপকরণ (বাণী ও রচনা দ্রষ্টব্য) স্বামীজীর পাণ্ডুলিপি থেকে পরে যুক্ত হয়ে গ্রন্থাকারে 'পরিব্রাজক' প্রকাশিত। বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশিত 'পরিব্রাজকে'র তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক একথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যা, ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭—এই সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত' সমাপ্ত। এই বর্ষের ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭—এই সংখ্যা থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশিত।[১] গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে পাওয়া এই রচনার অবশিষ্ট অংশ 'পরিশিষ্ট' নামে সংযুক্ত হয়।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের সমকালে ইংরেজী ২০শে জুন, ১৮৯৯ তারিখে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখে

১ উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১০, ১২, ১৯ এবং ৩য় বর্ষ ২, ৪, ৫, ৭ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত

রাত্রে বেলুড় মঠে হঠাৎ একাকী এসে সকলকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেন। মধ্যবর্তী সময়ে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী পত্র-যোগে প্রেরিত। প্রথম কয়েক বছরের 'উদ্বোধন' দেখলে বোঝা যায় যে মূলতঃ ধর্মবিষয়ক পত্রিকা হ'লেও সমকালীন পাক্ষিক ও মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, এমন কি উপন্যাস (গিরিশচন্দ্রের "ঐতিহাসিক ধর্ম উপন্যাস" 'ঝালোয়ার দুহিতা' : ১ম বর্ষ দ্রঃ) এতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তবে এ সবই মূল ধর্মভাবের বিকাশ-সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

শাস্ত্রচর্চার প্রতি স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের ফলস্বরূপ 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষেই পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের আচার্য শঙ্কর ও মায়াবাদ, গীতার শঙ্করভাষ্যানুবাদ, বেদান্তসূত্রের রামানুজভাষ্যানুবাদ প্রভৃতি এবং পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাভূষণের পাণিনীয় মহাভাষ্যের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া চারুচন্দ্র বসুর ধর্মপদ সম্বন্ধে আলোচনা, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর নাসদীয় সূক্ত অনুবাদ (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়) প্রভৃতি তো আছেই।

বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা ছাড়া 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ অনূদিত স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলীর অনুবাদও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত। প্রথম বর্ষের 'উদ্বোধনে'ই শুদ্ধানন্দজীর অনূদিত 'রাজযোগ' প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়াও 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'বহুত্বে একত্ব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'জ্ঞানযোগ' (ধারাবাহিক), পত্রাবলী প্রভৃতি নানা অনুবাদ শুদ্ধানন্দজী করেছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দই স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা Song of The Sannyasin, যেটি প্রথম সংখ্যা 'ব্রহ্ম-বাদিনে' প্রকাশিত হয়েছিল, ২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ১লা কাতিক, ১৩০৭ এর 'উদ্বোধনে' সেটির 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামে বিখ্যাত অনুবাদ করেন। প্রধানতঃ অনুবাদকরূপে পরিচিত হ'লেও স্বামী শুদ্ধানন্দ মৌলিক প্রবন্ধকার এবং 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদক-রূপেও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অংশ বিশেষ প্রকাশিত হতে থাকে। লেখক শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্তসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের অধিকাংশই তখন জীবিত। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নেতারূপে নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের এই স্মৃতিকথাগুলি স্বামীজীর মনে কীভাব জাগিয়ে তুলতো, জানতে ইচ্ছা হয়।

স্বামী সারদানন্দের রচনাবলীই 'উদ্বোধন' পত্রিকার ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের পরে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা', 'গীতাতত্ত্ব' (৫ম বর্ষ, নবম সংখ্যা), শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (১০ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক রচনা) ও অন্যান্য রচনাবলী ভাষানৈপুণ্য ও মনন-গভীরতার বিচারে বাংলা সাহিত্যে অতি উচ্চস্থানের অধিকারী। বিশেষতঃ 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতো একাধারে বিশ্লেষণমূলক অধ্যাত্ম-দর্শনের আকরগ্রন্থ ও জীবনীসাহিত্য এক 'চৈতন্য চরিতামৃত' ছাড়া বাংলা ভাষায় আর নেই। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজচরিত' নামে অমূল্য গ্রন্থখানি 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাসাহিত্যে চলতি ও সাধুভাষার তুলনামূলক আলোচনায় এবং চলতিভাষার প্রতি পক্ষপাতে 'উদ্বোধনে'র একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রথম বর্ষের ২৩ ও ২৪ সংখ্যায় গত "১৫ই আশ্বিনের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা (সমালোচনা)" লক্ষণীয়। এই সমালোচনাটিতে চলিত শব্দ ও ভাষার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরাগের সমর্থন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গদ্যভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

এই সমালোচনাটি ছাড়া 'উদ্বোধনে'র ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায়, প্রকাশিত "বাঙ্গালাভাষা" নামে স্বামীজীর গদ্যাংশটির কথা তো সর্বজনবিদিত।

'উদ্বোধন' পত্রিকার আর একজন বিশিষ্ট লেখক স্বামী অখণ্ডানন্দ,

যাঁর 'স্বামীজীর পত্রাবলী'[১] সম্বন্ধে নিবন্ধটি বিবেকানন্দ-পত্র-সাহিত্যের ভূমিকাস্বরূপ গৃহীত হতে পারে। ষষ্ঠ বৎসরের 'উদ্বোধনে' অখণ্ডানন্দের তিব্বতভ্রমণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সে-কালের কলকাতার তথা সমগ্র বাংলার পাঠকের কাছেই এই ভ্রমণ-সাহিত্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র লেখকমণ্ডলীর মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও ভারত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দ,[২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ প্রভৃতি। 'উদ্বোধন'-সম্পাদকবৃন্দ[৩] এ পত্রিকার পাক্ষিক থেকে আরম্ভ করে মাসিক অবধি 'উদ্বোধনে'র সব স্তরেই এর আদর্শ এবং সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন। তবু মনে হয় 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার মতো সম্পূর্ণ গবেষণামূলক অথবা স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী

১ উদ্বোধন, অষ্টম বর্ষ, ১৫ই আষাঢ় ১৩১৩, পৃঃ ৩২১

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত 'পরমহংসদেবের উপদেশ'

৩ 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকবৃন্দের

'প্রবুদ্ধ ভারতে'র মতো সর্বজনবোধ্য গল্পকাহিনীর মাধ্যমে আদর্শ-প্রচারচেষ্টা—এ দুই ধরনেরই পত্রিকা বাংলায়ও প্রয়োজন। অবশ্য 'প্রবুদ্ধ ভারত' এখন প্রধানতঃ উচ্চস্তরের মননধর্মী পত্রিকারূপেই গৃহীত। সেদিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির সর্বজনবোধ্য প্রচারে হয়তো এখনো কিছু করণীয় থেকে গেছে।

দশম বর্ষ (১৩১৪ মাঘ—১৩১৫ পৌষ) থেকে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তখন আয়তন ছিল ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য আগের মতো দুই টাকা। "লীলাপ্রসঙ্গ" ছাড়া এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক রচনা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের "ভারতের সাধনা"—বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে ভারতের নবজাগরণ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

'উদ্বোধন'কে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করা স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল। সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষের অপরাপর পরিকল্পনার মতো কালে এটিও রূপায়িত হলে খুবই আনন্দের বিষয় হবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আয়ুষ্মান পত্রিকাদের অন্যতম এই পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে যেভাবে ভারত ও বিশ্বের অন্তরঙ্গ যোগসাধনায় রত সেজন্য 'উদ্বোধনের' প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিনিবেদন আমাদের পবিত্র কর্তব্য। জাতির জীবনে যে উদ্বোধন তাঁদের অভীপ্সিত ছিল, 'উদ্বোধন' তার পরিপূর্ণ রূপায়ণে আরো অগ্রসর হোক এই আমাদের প্রার্থনা।[১]

---

১ এ অধ্যায়টি মূলতঃ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের গ্রন্থাগার এবং উদ্বোধন-কার্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত।

উদ্বোধন, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (মাঘ, ১৩৫৪) পত্রিকায় 'উদ্বোধনের পঞ্চাশ বৎসর' (খুব সম্ভব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজীরই লেখা); আশ্বিন, ১৩৬৫ সংখ্যা উদ্বোধনে স্বামী জীবানন্দের 'উদ্বোধনের ষাট বৎসর'

বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : 'ভাব্‌বার কথা'

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে নামের বৈশিষ্ট্যে সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'ভাব্‌বার কথা'। এ যেন স্বামীজীর নিজের মুখের কথা। কিন্তু আসলে বইয়ের নামটি স্বামীজীরই একটি রচনার নাম থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের গ্রন্থসম্পাদক (খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দ) এর নামকরণ করেছেন। 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষে প্রকাশিত স্বামীজীর ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীগুচ্ছের নাম ছিল 'ভাব্‌বার কথা'। একই সঙ্গে গভীর মনন ও জীবনে তার রূপদানের অসঙ্গতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার এক সহজাত ক্ষমতা স্বামীজীর ছিল। কলকাতার নাগরিক জীবনের তির্যক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির তুরীয় ভাবলোক থেকে সমগ্র জগৎসংসারকে নিরপেক্ষভাবে দেখে যাওয়ার শক্তি—এ দুয়ের সমাবেশে বিবেকানন্দ-মানসের যে বুদ্ধিসমুজ্জ্বল রূপ তাঁর জীবনশেষের কয়েক বৎসরের রচনায় প্রকাশিত, তার সূচনা অবশ্য তাঁর বাল্য কৈশোরের পরিহাসবিজল্পনের বৈশিষ্ট্যে। পরবর্তীকালে 'পত্রাবলী'তে এ জাতীয় মন্তব্যের তীক্ষ্ণ সরসতা পাঠকমনকে সচেতন করে তোলে। 'ভাব্‌বার কথা'র কথিকাগুচ্ছে সেই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মিলিত সমাহার। এক হিসাবে 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের এই রচনাগুলিই চলতি বাংলায় তাঁর সাহিত্যরচনার সূত্রপাত। এর আগে 'পত্রাবলী'তে চলতি গদ্যের ব্যবহার সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি নয়। কিন্তু 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কোনো মৌলিক রচনাই সাহিত্যিক সৃষ্টিপ্রেরণার বাইরে রচিত নয়।

'ভাব্‌বার কথা'—এই নামের ব্যঞ্জনা যেমন ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীগুলিকে অতিক্রম করে নিগূঢ় জীবনসত্যের ইঙ্গিত করেছে, তেমনি সমগ্র প্রবন্ধ-সংকলনটির নামরূপেও বিবেকানন্দ-মননের গভীরতা এতে ফুটেছে। অথচ একান্ত ঘরোয়া ভাষায় এই নামকরণে স্বামীজীর বাক্‌ভঙ্গিই আক্ষরিকভাবে বিধৃত।

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থের সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ উক্ত রচনাবলীর ষষ্ঠখণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা হিসাবে 'ভাব্‌বার কথা' বইটিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। 'ভাব্‌বার কথা' বিভিন্ন সময়ে লেখা স্বামীজীর প্রবন্ধ-সংকলন। 'উদ্বোধন' প্রকাশের আগে ১২৯৬ সালে 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Imitation of Christ'-এর অনুবাদ 'ঈশা অনুসরণ'[১] এবং ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে লেখা 'হিন্দুধর্ম কি ?' (উদ্বোধন, চতুর্থ বর্ষে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রকাশিত) —রচনা দুটি বাদ দিলে এ গ্রন্থে সংকলিত আর সব প্রবন্ধই 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমসাময়িককালে লিখিত বা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনা।

আধুনিককালে কেউ কেউ মনে করেন স্বামীজীর জীবন-পরিক্রমার দ্রুত ঘটনাবর্তে তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিতান্ত সাময়িক প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু 'সংগীতকল্পতরু'র ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে স্বামীজীর শেষ জীবনের রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অবধি তাঁর গদ্যসাহিত্যের পরিধি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে স্বল্পসীমার মধ্যেই তাঁর শিল্পীমন গভীর চিন্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টিকোণ এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর গুণে সাহিত্যসৃষ্টির নিজস্ব সার্থকতায় মণ্ডিত। অবশ্য তাঁর বিদেশে ও স্বদেশে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা, বাংলা সাহিত্যে অনন্য পত্রাবলী—এসব যাঁরা অনুধাবন করেছেন, তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের কবিমানস ও রচনানৈপুণ্য সম্বন্ধে নূতন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাঁরা তাঁর অন্যান্য রচনা বা বক্তৃতা পড়েন নি, তাঁরাও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর গ্রন্থচতুষ্টয়—ভাব্‌বার কথা, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পড়লেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকের পরিচয় পাবেন। জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই বিবেকানন্দ সচেতন

১ 'ঈশা-অনুসরণে'র সম্বন্ধে 'সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' এবং 'অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায় দু'টি দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া 'ভাব্‌বার কথা'য় 'শিবের ভূত' নামে একটি অসমাপ্ত গল্পের আর কোনো আলোচনা অপ্রয়োজনীয়বোধে করা হয় নি।

সাহিত্যস্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারে তাঁর ব্যক্তিত্বপ্রসঙ্গ নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু কোন্ বিশেষ লেখকের কথা এ কথা না জেনেও উক্ত চারটি বইয়ের পাঠক এক মৌলিক চিন্তাশক্তি ও গদ্যভঙ্গিমার বৈদ্যুতিক স্পর্শে উজ্জীবিত হবেন একথা নিশ্চয়। অর্থাৎ বিবেকানন্দের রচনা বলেই শুধু নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপেই তাঁর রচনাবলী বিচার্য।

বলা বাহুল্য, এ বিচারে সকলে একমত হবেন, একথা আশা করা যায় না। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি বিবেকানন্দের রচনাবলীর মূল্য থাকে, তা অবশ্যই স্বীকার করব। কিন্তু সাহিত্যমূল্যের বিচারে তাঁর রচনাবলীর নিজস্ব সার্থকতা যদি থাকে, তাহলে সাহিত্যের আলোচনার আসরে সেইটিই সর্বাগ্রে বিচার্য। এদিক থেকে বিচার করে 'ভাব্‌বার কথা'য় বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধাবলীর আলোচনা করা যাক।

ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ

'বাংলা ভাষা' নামে স্বামীজীর যে বহুখ্যাত রচনাটি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার নির্দেশকরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন-সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের বিষয় বা ভাবের বিষয়—দুয়েরই প্রকাশক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজীর মতে—"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক—কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না?"[১]

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে বাংলা গদ্যে সংস্কৃতরীতির গুরুভার আমদানির বিপক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের সমুন্নতি

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫

যে সংস্কৃত শব্দৈশ্বর্যের দ্বারাই সম্ভব, তার প্রমাণ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বা 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধ-দুটিতে মেলে। স্বামীজী নিজেও সব সময় চলতি ভাষায় লেখেন নি। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি আদ্যন্ত সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যে রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য আপনিই দেখা দেয়—এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ" অবধি জগতের মহত্তম চিন্তানায়কদের যে উদাহরণ স্বামীজী দিয়েছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখের কথার মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তো স্পষ্টই লিখেছেন —"আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।... যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"[১]

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। "ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়, দাঁত পড়ে না।"[২] বাংলা গদ্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ উদ্ধৃতির মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সাধু ও চলতি—দুই রূপেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা দীপ্যমান। চলতি ভাষায় তিনি প্রাণময় বৈদ্যুতিকগতিসম্পন্ন; সাধু ভাষায় সংহত শাঙ্করভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন। বিবেকানন্দের গদ্যরীতির দ্বৈতরূপে তাঁর ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ।

তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত ছিল চলতি ভাষার

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫-৩৬

২ তদেব : পৃঃ ৩৪

প্রতি। তাঁর সমকালীন সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের আভাস তিনি পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—"এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, সেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"[১]

ক্রান্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক গদ্যরীতিতে। এই পত্রাংশটি 'উদ্বোধনে' ছাপা হবার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে চলতি ভাষা। কিন্তু স্বামীজীর গদ্যে যে প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চলতি গদ্য অনাধুনিক সাধু গদ্যের চেয়ে কৃত্রিম শোনায়। স্বামীজী বলেছিলেন "ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।"[২] সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে সজীব ক'রে তোলা যায় না।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা : লোকাচার-বিষয়ক

'ভাব্‌বার কথা' নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং তারই তলায় লোকাচারের যুক্তিহীন শৃঙ্খলপাশের দৈন্য—এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে কতদূর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ গল্পের মতো ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে সুচতুর হাস্যপরিহাস-নিপুণ বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি থেকে একটি উদাহরণ—

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭

২ তদেব : পৃঃ ৩৬

লক্ষ্ণৌ শহরে নবাগত দু-জন রাজপুত মহরমের জাঁকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে। "কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টো সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নী-কৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্বিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাবা অজিদ্, দেবতা তো তুহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক রোবত।'—(ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ, এমনি মেরেছো শালাদের কি আজও কাঁদছে!!)"[১]

এই গল্পটির পরে স্বামীজী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে, আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী ভগবান অবধি পৌঁছয় না।

'ভাব্‌বার কথা' গল্পসমষ্টিতে 'কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে' ভগবানের মন ভিজানোর চেষ্টারত ভক্তটি, 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী, অথবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে তোলাই স্বামীজীর লক্ষ্য। তাই তাঁর হাস্যরসে বিদ্রূপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। স্বামীজীর চিন্তাধারায় বেদান্ত

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৪

এবং মানবপ্রেমের অনায়াস মিলনের মতো তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের মিলন ঘটেছে।

সমকালীন আর্যামি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানচেষ্টাকে স্বামীজী যে তীব্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন, হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত আর কেউ সেকালে তেমনটি করেছেন বলে জানা নেই। কেন যে বিবেকানন্দের উপর সেকালের 'বঙ্গবাসী গোষ্ঠী' এত চটা ছিলেন তার নানা কারণের মধ্যে একটি বোধ হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'ভাব্‌বার কথা' কাহিনীগুচ্ছের এই নক্সাটি—

"গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলেন তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে বলে ঐ রকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই। বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ, সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে। লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে। সকল জিনিষ বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মা ভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই

এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে। চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালের আদর! 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো' ইত্যাদি।"[১]

সমস্ত নক্সাটিতে আক্রমণের তীব্রতা ও ভাষাভঙ্গির দীপ্তি—দুইই লক্ষণীয়। প্রয়োজনবোধে শব্দপ্রয়োগে সঙ্কোচ এখানে অনায়াসে অতিক্রম করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় ও বিদ্রূপের তিক্ততায় এমন এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে যে, পাঠকমাত্রেই (বিরুদ্ধবাদী হ'লে আরো বেশী) এ রচনার অন্তর্নিহিত জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবেন।[২]

বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সমুচ্চ মননের পাশাপাশি এক লঘু কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সহজাত ক্ষমতা নিহিত—যা তাঁর বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিকেই অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে। কিন্তু 'ভাব্‌বার কথা'র নক্সাগুলির মতো রচনা তাঁর অতি অল্প। ফলে এ-জাতীয় রচনায় তাঁর যে অসাধারণত্ব তা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাত-আদর্শবাদীদের অন্তর্জীবনে আত্মপ্রতারণার প্রাধান্য। অথচ সে-প্রতারণার কথা তারা নিজেরা অতি অল্পই জানেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা কথায় কথায় ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেন তাঁদের নিজস্ব জীবনচর্যায় অসঙ্গতির উদাহরণ অজস্র। আত্মপ্রতারিতের এই অপসংস্কৃতিকে স্বামীজী নির্মম অঙ্গুলিসঙ্কেতে কয়েকটি নক্সার মাধ্যমে নির্দেশিত করেছেন। পরবর্তী নক্সাটিতে আর একটি জিনিসও লক্ষণীয়। তৎসম শব্দের গুরুগম্ভীর সমাবেশে হাস্যরসের ফোয়ারা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪২

২ শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়'-গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যেন আপাতরুদ্ধ থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে পাঠকহৃদয়কে মুহূর্তে উচ্চকিত করে চলে যায়। সাধুভাষা যে ব্যঙ্গজাতীয় রচনার কত উপযোগী—এ নক্সাটি তার সার্থক উদাহরণ।

'ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন-লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণসাহসী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবল বেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষঃস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বলি বাপুহে, ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ!' ক্ষিপ্র উত্তর এল—'সুর তানের আবার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী—'হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহম্মক কিনা! পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"[১]

কিন্তু এ জাতীয় আত্মপ্রতারণা তবু অজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু 'সেয়ান পাগলে'র আত্মপ্রতারণার উদাহরণ—

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৫

নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ—'সে সোজা কথা মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'

এ জাতীয় রচনায় বিবেকানন্দের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' বা রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক', এবং বিশেষভাবে 'ব্যঙ্গকৌতুক' রচনার কথা মনে আসতে পারে।[১] ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র স্বামীজীর এ-জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মিলিত প্রভাব অনুভব করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন, স্বামীজীর শব্দপ্রয়োগের অকুণ্ঠতা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত, 'এসব ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশি।' ডঃ মিত্রের অভিমত অনেকাংশেই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের বহির্বৃত্তের অধিবাসী রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুকের চেয়ে হিন্দুসমাজের অন্তরের ভিতর থেকে এমন শাণিত বিদ্রূপের সার্থকতা অনেক বেশী। এ-জাতীয় রসসৃষ্টিতে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম থেকে আধুনিক-কালের প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি অবধি লেখকবৃন্দের রচনায় যে পৌরুষ-সমুজ্জ্বল যুক্তির ক্ষুরধার ব্যঙ্গের প্রকাশ দেখি, তার সঙ্গেই বিবেকানন্দের গোত্রগত মিল বেশী। রবীন্দ্রনাথ-সমেত ব্রাহ্ম-প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে কলকাত্তাই বুলির এমন অসঙ্কোচ প্রয়োগ অসম্ভব ছিল। অথচ এই জাতীয় শব্দ ও বাক্যব্যবহারের উপরেই নক্‌শা-জাতীয় রচনার কৃতিত্ব নির্ভরশীল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : সংঘাত ও সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্যা, জ্ঞানার্জন, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি—প্রবন্ধচতুষ্টয় সাধুভাষায় লেখা। 'বর্তমান সমস্যা'[২] উদ্বোধন-পত্রিকার প্রস্তাবনা। প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার

১ বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' অধ্যায় : পৃঃ ২৩৮-১৩৯

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৯-৩৪

যে সংঘাত উনিশ শতকের চিন্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী তার সামঞ্জস্যের উপায় চিন্তা করেছেন। তথাকথিত 'ইতিহাস' হয়তো ভারতবাসীর ছিল না; কিন্তু সে ইতিহাস তো "রাজা-রাজড়ার কথা"। ভারতবাসীর অন্তরের চিন্তা ও চেষ্টার কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালভাবে লেখা রয়েছে—"ভারতের ধর্মগ্রন্থ-রাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী"তে। তাই—"প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।"

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা—আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, যার জন্মভূমি গ্রীস। "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।"

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরু-দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একবার মিলন হয়—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে —"…আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!"

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীসের যোগ্য উত্তরাধিকারী—আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্যই অবশিষ্ট। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—"চাই—সেই উদ্যম,

সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

অবশ্য ভারতবাসীর আদর্শ—পারমার্থিক মুক্তি। কিন্তু ক-জন এ সংসারে যথার্থ মুক্তির অভিলাষী ? "সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নর-নারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে ? এ পেষণেরই বা কি ফল ? দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল ?" বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ভেদী ছিল, ভারতীয়-মানসের এই বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ—"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?" সেই সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তাঁর বাণী—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে ? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।"

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনিশ শতকের মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, স্বামীজীর চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে।

'জ্ঞানার্জন'[১] প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট হলেও ছোট্ট মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বামীজী জ্ঞানার্জনের পন্থা নির্দেশ করেছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে পারমার্থিক জ্ঞান অবধি সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক—"...কেবল

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৮-৪১

উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ··· ।" প্রাচীনপন্থীরা অনেক সময় এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, সব জ্ঞানই তাঁদের পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু "পরবর্তীদের নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান ; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।" সুতরাং জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ সাধনা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন ছিল—তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই শ্রেণীগত সুবিধাবাদের দিন গতপ্রায়। সর্বশ্রেণীর লোকই এখন বিদ্যাচর্চার অধিকারী হয়ে উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে "পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা" আজকাল অচল। জ্ঞানার্জনের দুটি পথ—এক পূর্বপুরুষ বা গুরু-পরম্পরা ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক পূর্বনির্দিষ্ট কোনো পন্থার উপর নির্ভর না করে নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। তার ফলে—"···প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজন-দিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্যস্মরণেই কালাতি-পাত করে··· ।" অন্য দিকে আধুনিক বিদ্যাও গুরুনির্দেশ ছাড়া চলতে পারে না। তা যদি হ'ত, তবে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু, কাফ্রী প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আসল কথা এই যে, সব রকম জ্ঞানের জন্যই সাধনা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্যা, জাগতিক জ্ঞানের জন্য নিয়ত চর্চা, নূতন অনুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক ব'লে মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরন্তর কঠিন সাধনার ইতিহাস। তাই স্বামীজীর মন্তব্য—"অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ ; লৌকিক ও অলৌকিক—কেবল প্রকাশের তারতম্যে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'—প্রবন্ধ-দুটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্মচেতনাকে উনিশ শতকের প্রথম যুগে বিদেশীরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতেরা লোকাচার ও সংস্কারের বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শাখাটিকেই বড় ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-সাধনার মূল সত্য বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মীয় রীতিনীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার চেষ্টাই তাঁদের মধ্যে বেশী ছিল। পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝাবার চেষ্টা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' [১] বক্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বক্তৃতাটি অনেকটা পাশ্চাত্য ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র করে নি।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের কারণ—"…আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও

---

১ বক্তৃতাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'রাজনারায়ণ বসু ও সমকালীন বাঙালী মানস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।”[১]

ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যে আস্থাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবেই ভারতবর্ষের নব-জাগরণের পবিপূর্ণতা।

উনিশ শতকের বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়—ইংলণ্ড ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। ম্যাক্সমূলার জানতেন, “অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া”। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে সেকালের (এবং অনেকাংশে একালেরও) ইউরোপীয় সমাজ মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জাদুবিদ্যাই মনে করতেন। এই মনোভাবেব প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধার্মিকদের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার ‘প্রকৃত মহাত্মা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটিই বর্ধিতাকারে ‘The Life and Sayings of Ramakrishna’ (রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের The Face of Silence এবং রোমাঁ রোলাঁর ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী’ প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাজগতে রামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণীর মধ্যে এমন একটি বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, যার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিন্তাজগতেই তিনি সমাদৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধটি নিয়ে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীরা তীব্র বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী জানতেন: সত্যমেব জয়তে। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী: “মুখে—বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি, বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে?

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ৪-৫

সকল হৃদগত ভাবই ফলানুমেয় ; কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।"[১]

বিশ্বমনা ম্যাক্সমূলর শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ভগবৎ-প্রেমিকদের অন্তরঙ্গ মিলনভূমি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধুর্যমুগ্ধ মনীষী লিখেছেন—"If we remember that these utte ances of Ramakrishana recall to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings we may indeed feel hopeful about the future of that country. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of future will be erected in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme spirit—who is not far from everyone of us, for in Him we live and move and have our own being."[২]

'যদি একথা আমরা মনে রাখি যে, রামকৃষ্ণের এই বাণীসম্ভার শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব চিন্তার কথাই আমাদের মনে জাগায় না, বরং লক্ষ কোটি মানুষের আশা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই আশান্বিত হতে পারি। ঈশ্বরসান্নিধ্যের এই নিয়তচেতনাই সে মিলনভূমি, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক মহামন্দির নির্মিত হতে চলেছে, যে মন্দিরে হিন্দু ও অহিন্দু সকলেই মিলিত হৃদয়ে আমাদের অন্তরতম পরম সত্যের ধ্যানে মগ্ন হতে পারবে। কারণ তাঁরই মধ্যে বিধৃত আমাদের জীবন, গতি ও অস্তিত্ব।"

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' : পৃঃ ১৫

২ Ramakrishna : His Life and Sayings : ১ম সংস্করণের ভূমিকা।

আলোচ্য প্রবন্ধদুটির আগে ও পরে দেওয়া স্বামীজীর দুটি বক্তৃতা থেকে তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে মন্তব্য স্মরণীয়—"সংস্কারক ও সমালোচকদের কাজের ধরণ কেমন তা আমরা দেখেছি। তাঁরা কেবল অন্যদের দোষ দেখান, সব ফেলে নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করে গড়তে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমতো এক-একটা কল্পনা নিয়ে বসে আছি। দুঃখের বিষয়, কেউ তা কাজে পরিণত করতে প্রস্তুত নয়, কারণ সকলেই আমাদের মতো উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁর কিন্তু সে ভাব ছিল না, তিনি কাউকে নিজে থেকে ডাকতে যেতেন না। তাঁর এই মূলমন্ত্র ছিল,—প্রথমে চরিত্র গড়ে তোলো, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসবে। তাঁর প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল: যখন পদ্ম ফোটে, ভ্রমর তখন নিজে নিজেই মধু খুঁজতে আসে। এমনি করে যখন হৃদয়পদ্ম ফুটে উঠবে, তখন শত শত লোক তোমার কাছে শিক্ষা নিতে আসবে। এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা।"[১]

দ্বিতীয়বার আমেরিকা-পরিক্রমার সময় ২৭শে জানুয়ারি, '৯০০ তারিখে কালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাতে সেক্সপিয়র ক্লাবে স্বামীজী My Life and Mission (আমার জীবন ও উদ্দেশ্য) নামে একটি বক্তৃতায় তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছিলেন—"এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, অদ্ভুত লোক, পাণ্ডিত্য তাঁর কিছুই ছিল না, পড়াশুনোও বিশেষ করেন নি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগে ছিল। স্বধর্ম-চর্চার মাধ্যমে তাঁর সাধনার সূত্রপাত। পরে তিনি অন্যান্য

---

১ মদীয় আচার্যদেব: বাণী ও রচনা: অষ্টম খণ্ড: পৃঃ ৩৯৭ দ্রঃ। মূল ইংরেজী বক্তৃতা My Master দ্রষ্টব্য। ইংরেজী বক্তৃতাটি নিউইয়র্কে ও লণ্ডনে প্রদত্ত দুটি পৃথক বক্তৃতার সম্পাদিত সংস্করণ। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতাটির সম্পূর্ণ পৃথক সংস্করণে (১৯০১) প্রকাশক হিসাবে Baker & Tayler Co-র নাম আছে। এখন এই দুটি বক্তৃতা আলাদাভাবে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি সেই সম্প্রদায়ের নির্দেশ অনুসারে সাধন করতেন, এক একটি সম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন। এইভাবে সব সাধনার শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—সব মতই ভালো। কোনো ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করতেন না। বলতেন, 'বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পন্থামাত্র। আর বলতেন, 'এতগুলি পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়। কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হতো, তবে হয়তো সে পথ মাত্র একজনের উপযোগী হতো। যত মত তত পথ, তত আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যে পৌঁছুবার সুযোগ। যদি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তো আর এক ভাষায় শিখতে চেষ্টা করব।'—সব ধর্মমতের প্রতি এমনি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা।

"যে সব ভাবধারা আমি প্রচার করছি, সে সবই তাঁরই চিন্তাধারার প্রতিধ্বনিমাত্র।"[১]

বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও আদর্শে অলৌকিক গল্পকথা যথাসম্ভব বর্জিত। সম্পূর্ণ অলৌকিক কাহিনী-বর্জিত একটি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী তিনি লেখাতে চেয়েছিলেন। আবার নিজে কখনও এমন জীবনী রচনায় হাত দেন নি, কারণ যদি আদর্শকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে ফেলেন! তবু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ এসবের সমন্বিত ফলস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার সংহত প্রকাশ। নবজাগ্রত ভারতাত্মার উদ্দেশে তাই বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে আহ্বান করেছেন—"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার

১ বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড : পৃঃ ১৬৩

পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"[১]

সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তর-প্রেরণারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন—'ভাব্‌বার কথা'র প্রবন্ধ দুটিতে তারই আংশিক নিদর্শন।

পারি প্রদর্শনী

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও য়ুরোপ-পরিক্রমাকালে ১৯০০ খ্রীঃ আগস্টমাসে পারিতে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস দ' লিস্তোয়ার দে রিলিজিওঁ" (Congress of the History of Religions)-এ যোগদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সভানুষ্ঠানের বিবরণ স্বামীজী মূল ইংরেজী ও তার অনুবাদসহ 'উদ্বোধনে' পাঠিয়েছিলেন বলে মনে হয়। 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষের ২০শ সংখ্যায় (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭) এটিকে "প্রেরিত পত্রের অনুবাদ" বলা হলেও এই বিবরণীর ভাষাভঙ্গী স্বামীজীর নিজস্ব। অর্থাৎ অনুবাদটি স্বামীজীর করা। সুতরাং এ লেখাটিকে 'ভাব্‌বার কথা'র অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয়েছে সন্দেহ নেই।

চিকাগো-বক্তৃতায় স্বামীজীর ভারতীয় ধর্মাদর্শ-ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য যেমন আমাদের মুগ্ধ করে তেমনি এই পারি-সম্মেলনে স্বামীজীর যুক্তিস্থাপনের মৌলিকতা ও বুদ্ধিদীপ্তিও আমাদের সচকিত করে। অবশ্য স্বামীজীর বক্তৃতাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আরো অনেক জায়গাতেই আছে। কিন্তু নিজের ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ স্বামীজী কীভাবে দিয়েছেন এবং চিন্তার মৌলিকতার দিক থেকে তাঁর বিশিষ্টতা—এই দুই কারণে এ রচনাটি বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। স্থান-সংক্ষেপের জন্য কেবল দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক। শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনপ্রতীক হিসাবে যে ধারণা তার উত্তরে স্বামীজীর বক্তব্য—"স্বামীজী বলেন যে, শিবলিঙ্গ-

১ ভাব্‌বার কথা : 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬

পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ-সংহিতার যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম্র, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ যে-প্রকার মহাদেবের অঙ্গকান্তি, পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।"[১]

ভারতীয় সভ্যতায় যাঁরা সর্ববিষয়ে গ্রীকপ্রভাব আবিষ্করণে ব্যস্ত, তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দটির প্রয়োগসম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য—"...কালিদাসাদি কবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য-নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীক নাটকের সদৃশ কিনা। যাঁহারা উভয় ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা-জগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটকের আর এক।

আর্য নাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ নাই, বরং শেক্‌স্‌পীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সাদৃশ্য আছে।"[২]

সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ-মনীষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই 'পারি-প্রদর্শনী'র বিবরণীও সত্যিই ভাববার কথা!

'ভাব্‌বার কথা'-র প্রবন্ধসমষ্টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও রচনার সমাহার হলেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার দীপ্তি, গভীরতা ও অনন্য মৌলিকতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রন্থে বিধৃত প্রবন্ধ, রসরচনা, অনুবাদসাহিত্য

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮, ৫০

প্রত্যেকটিতেই সাহিত্যিক বিবেকানন্দের যে পরিচয় মেলে সেই সাহিত্যসচেতনতা দীর্ঘকালের মনন ও প্রযত্ন-সাপেক্ষ। স্বল্পসীমাবদ্ধ জীবনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যে বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, তার অন্যতম পরিচয় প্রবন্ধকাররূপে তাঁর সিদ্ধি ও সার্থকতায়। মনে রাখতে হবে, 'বর্তমান ভারত'ও এমনি একটি দীর্ঘায়ত প্রবন্ধ। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন', প্রভৃতি নিবন্ধের মননিষ্ঠ সাধুগদ্যভঙ্গীরই দীর্ঘায়তরূপে 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-সমীক্ষা গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে 'পবিব্রাজক' এবং অনেক পরিমাণে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গড়ে উঠেছে চিঠিপত্রে বিধৃত স্বামীজীর অতুলনীয় চলতি গদ্যরীতির আদর্শে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ থেকে একদা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে বা ডায়েরী জাতীয় লেখায় ছাড়া এই পত্রসাহিত্যের চলিতভঙ্গীকে প্রশ্রয় দেন নি। বিবেকানন্দ কিন্তু 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করে ১৮৯৯ জানুয়ারী থেকে ১৯০২ জুলাইয়ের মধ্যে সাধু ও চলতি দু'ধরনেরই গদ্যভঙ্গীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা চলতি গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্র' (১৮৫৪) বা প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এ দুয়ের মাঝখানে 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) পত্রিকার বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণীয়। সাধারণত এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা দৃষ্টিপাত করেন না বলেই এ বিষয়ে সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিহাসসচেতন দার্শনিক মননে সমৃদ্ধ বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ 'ভাব্‌বার কথা'র আর একটি সম্পদ 'ভাব্‌বার কথা' নামে রসরচনাগুচ্ছ। বস্তুত উচ্চাঙ্গের হাস্যরস মহত্তম চিন্তানায়কেরই সাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কথা প্রথমেই মনে আসবে। কিন্তু বিবেকানন্দের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য তাঁর বৈদান্তিক-সুলভ নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সংসার ও সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত তীব্র ব্যঙ্গে

আলোকিত করার দীপ্ত নিপুণতায়। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই হাস্যরসনৈপুণ্য তাঁর রচনাবলীকে পাঠকমনের একান্ত অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—একদিকে স্বামীজী চিন্তানায়ক, লোকশিক্ষক, অধ্যাত্ম-সাধনার গুরুস্থানীয়, আর একদিকে তিনি সমব্যথী, অন্তরঙ্গ, এমন কি বন্ধুজনের রঙ্গরসিকতায় আমাদেরই সমভূমির আপনজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যপুচ্ছগ্রাহী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে জাতীয় শিক্ষাদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেকানন্দ তাঁর কথোপকথনে, বক্তৃতায় ও রচনাবলীতে নানাভাবে ঘোষণা করেছেন। জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ চিন্তার মৌলিকতায়। 'ভাব্‌বার কথা'র রচনাবলীতে সেই মৌলিকতাই পাঠকের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। তাছাড়া বিষয়বিন্যাসের নৈপুণ্য, প্রকাশের গাম্ভীর্য ও সংযম এবং ভাষাশিল্পের কারুবৈচিত্র্যে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে 'ভাব্‌বার কথা' বিশিষ্টস্থানের অধিকারী।

বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও 'বর্তমান ভারত'

বাংলার মনন-সাহিত্যে অমর কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা যদি কেউ পেশ করতে বলেন, তাহলে রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ', দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম ; অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (বিশেষতঃ এর দুটি খণ্ডের ভূমিকা), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি বইয়ের ধারা অনুসরণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারতে'র কথা মনে পড়বে। এ তালিকায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো গ্রন্থের উল্লেখ করলাম না। কারণ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী মিলিয়ে রবীন্দ্রমননের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। আর যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি মাত্র বইয়ের কথা বলতে হয়, তাহলে আমি বেছে নেব তাঁর শেষ জীবনের 'মানুষের ধর্ম'—রবীন্দ্রনাথের স্ব-ধর্ম যে বইয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু সেটি বিংশ শতাব্দীর রচনা।

পাঠক ও লেখক-ভেদে সব সাহিত্যিকের রচনার নির্বাচিত সংকলন হতে পারে এবং তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই ; কিন্তু এমন কিছু বই থেকে যায়, যেগুলি গোটা দেশ ও যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, শুধুমাত্র লেখক বা পাঠকের প্রিয় তালিকার অন্তর্ভুক্তই থাকে না, অথচ এমন সহজেই ঘটে যে, লেখক হয়তো নিজেও ভাবতে পারেন না তাঁর বিশেষ কোনো একটি বই পরবর্তীকালের মানুষকে বহুযুগ ধরে প্রভাবিত করবে। কারণ, লেখকের অজান্তেই তাঁর ব্যক্তিমন কখনো কখনো বিশ্বমনে পরিণত হয়ে সংহত আকারে ইতিহাসের অন্তরতম নির্যাস আহরণ করে আনে। বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' সমগ্র জাতির আত্মদর্শনের অভিজ্ঞান।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 'বর্তমান ভারতে'র প্রকাশ। অবশ্য অধ্যাত্ম-সাধনা, ইতিহাস-অন্বেষণ, সমাজচেতনা ও গণদৃষ্টির মিলিত ফলস্বরূপ বিবেকানন্দের

ভারতচেতনার এক বিশিষ্টরূপ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবন থেকেই ধীরে ধীরে বিকশিত। ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর-চেতনার পরেই স্থান পেত জননী ভারতবর্ষের চেতনা। সে ভারতবর্ষ ভূগোল ও ইতিহাসের ভারত তো বটেই, সবার উপরে বিশ্ব-মানবের মহত্তম আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক। হয়তো অন্য দেশের মতো গ্রন্থবদ্ধ ইতিহাস এদেশের নেই। কিন্তু "ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী" আর একভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিধৃত করে আছে; সেই সঙ্গে রয়েছে তথা-কথিত ইতিহাসের আড়ালে সাধারণ মানুষের চিরন্তন জীবন-প্রবাহ।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। বিবেকানন্দের প্রথম জীবনে হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাবের কথা মনে রাখলে বলা যায় ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞানের অংশরূপে দেখার ধারণা তিনি স্পেন্সারের কাছেই প্রধানত পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বিবেকানন্দ-অনূদিত স্পেন্সারের 'শিক্ষা'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে ইতিহাস-লেখা সম্বন্ধে স্পেন্সারের মতামত উল্লেখযোগ্য। ('অনুবাদক বিবেকানন্দ'-অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।) কিন্তু 'বর্তমান ভারত' যে-জাতীয় ইতিহাস-সমীক্ষা, তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য স্পেন্সারের বক্তব্য আমাদের আরো বিস্তৃতভাবে স্মরণীয়—"কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় স্বভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ।...বিদ্যালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র, বলপূর্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়-সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ এবং কামান ছিল। অমুক সেনাপতি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন

করিয়া জয়লাভ করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ধ-বিবরণ আদরের হইতে পারে; টিউলিপ-পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহার নিকট একটি টিউলিপ-অঙ্কুর তৎপরিমাণ সুবর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান; হয়ত একজন ভগ্ন চীনার বাসনের অত্যন্ত আদর করেন; কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের কেশ-নখাদির পরিবর্তে বহুমূল্য প্রদান করেন; তবে কি বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয়?

"যে প্রকার অন্য সকল দ্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার করা উচিত। যদি কেহ আসিয়া বলে, "ওহে, কাল সন্ধ্যাকালে তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক হইয়াছে"—এই সকল সংবাদ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন না? এই পরীক্ষা ইতিহাসসঙ্কলিত রাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, দেখা যাইবে যে, তাহাও ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ঘটনা হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয় না। যদি আমোদ হয়, পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকারক বলিয়া মনে করিও না।"[১]

ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় স্থাপন করে স্পেন্সার চেয়েছিলেন সাধারণ মানবসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার আদর্শ। "বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবন বৃত্তান্ত। কি প্রকারে সমাজ-বিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতিবিশেষের অভ্যুদয় হইল তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব?"[২] অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যক্তি নিয়েই যদি সমাজ, তাহলে

১ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত: শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ: পৃঃ ৩০-৩২

২ তদেব: পৃঃ ৩২

সমাজের বিশেষ বিশেষ কর্মভার যাঁদের উপরে এবং যাঁদের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন নেই কি? ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু সমাজের সমগ্রতাই কি বিচার্য হতে পারে?

এর উত্তরে যিনি যে মতই পোষণ করুন, একথা স্বীকার্য যে, তুলনামূলকভাবে সমগ্র সমাজ বা জাতীয় জীবনের ধারাটি উপলব্ধি না করলে ইতিহাসদৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারে না। তাই স্পেন্সারের সঙ্গে এ যুগের মানুষ বিশেষভাবে একমত যে,—"কেবল যে সর্বোচ্চ শাসন সমিতির [ইতিহাস] আবশ্যক তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্ত্তন ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতন্ত্রের যথার্থ সহচর।" [১]

---

১ শিক্ষা: পৃঃ ৩২—৩৩

প্রাসঙ্গিকবোধে স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের ভাষা—

...let us pass now to the function of the citizen. We have here to inquire what knowledge fits a man for the discharge of these functions. It cannot be alleged that the need for knowledge fitting him for these functions is wholly overlooked; for our school-courses contain certain studies

বলা বাহুল্য, দেশের এই ইতিহাস-লেখার মতো মানুষ এযুগেও এদেশে বিরল, সে যুগে তো আশার অতীত। কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ সংসারবন্ধনমুক্ত হওয়ার ফলে পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মানুষের আত্মীয়তার অধিকার পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ও সাধনায় ভারতের অধ্যাত্মসাধনার পুঞ্জীভূত বিগ্রহকে মনে প্রাণে প্রত্যক্ষ করার পর বিবেকানন্দের পরিব্রাজকজীবনের বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী মানসনেতৃত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমান্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, "জাতটা ঠিক

---

which, nominally at least, bear upon political and social duties. Of these only one that occupies a prominent place is History.

But as already hinted, the information commonly given under this head, is almost valuless for purposes of guidance. Scarcely any of the facts set down in our school-histories, and very few of those contained in the more elaborate works written for adults, illustrate the right principles of political action. The biographies of monarchs (and our children learn little else) throw scarcely any light upon the science of society. Familiarity with court intrigues, plots, usurpations, or the like, and with all personalities accompanying them, aids very little in elucidating the causes of national progress. We read of some squabble for power, that it led to a pitched battle; that such and such were the names of the generals and their leading subordinates, that they had each so many thousand infantry and cavalry, and so many cannon;····. And now, out of the accumulated details making up the narrative, say which it is that helps you in deciding on your conduct as a citizen····. "But these are facts—interesting facts", you say. Without doubt they are facts (such, at least, as are not wholly or partially fictions); and to many they may be interesting facts. But this by no means implies that they are valuable. Factitious or morbid opinion often gives seeming value to things that have scarcely any. A tulipomaniac will not part with a choice

বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র।"[১]
(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় দাঁড়ালো 'এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি' আছে 'ধর্মে'। 'সেইটির নাশ কেউ করতে পারে নি বলেই জাতটা এত সয়ে এখন বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলেছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ তা কেন? যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্মকর্ম সব মিথ্যা, তাহলে কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার আর, হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে

bulb for its weight in gold. To another man an ugly piece of cracked old China seems his most desirable possession. And there are those who give high prices for the relics of celebrated murderers. Will it be contended that these tastes are any measure of value in the things that gratify them? If not, then it must be admitted that the liking felt for certain classes of historical fact is no proof of their worth; and that we must test their worth, as we test the worth of other facts, by asking to what uses they are applicable. Were some one to tell you that your neighbour's cat kittened yesterday, you would say the information was valuless. Fact though it may be, you would call it an utterly useless fact—a fact that could in no way influence your actions in life—a fact that would not help you in how to live completely. Well, apply the same test to the great mass of historical facts, and you will get the same result. They are facts from which no conclusions can be drawn—unorganizable facts; and therefore facts of no service in establishing principles of conduct, which is the chief use of facts. Read them, if you like, for amusement; but do not flatter yourself they are insrructive.···

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ সংস্করণ: পৃঃ ১৬১

বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা! না, তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা?…যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগা-পাস্তলা ভুল, মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা।"[১] ভারত-পরিক্রমার পরে দ্বিতীয়বার বিশ্বপরিক্রমার সময়ে

We want all facts which help us to understand how a nation has grown and organized itself. Among these, let us ofcourse have an account of its government; with as little as may be of gossip about the men who officered it, and as much as possible about the structure, principles, methods, prejudices, corruption etc. which it exhibited; and let this account include not only the nature and actions of the central government, but also those of local governments, down to their minutest ramifications ……. Let us know, too, that what were all the other customs which regulated the popular life out of doors and indoors.…… The only history that is of practical value, is what may be called Descriptive Sociology. And the highest office which the historian can discharge, is that so narrating the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology, and for the subsequent determination of the ultimate laws to which social phenomenon conform.

[Education : Spencer : 1st Edn : pp 32-36]

কৌতূহলী পাঠক মূল গ্রন্থটি দেখে নেবেন। স্থানসংক্ষেপের জন্য আমরা সমগ্র ইংরেজী অংশটি দিতে পারিনি। স্বামীজীও অনুবাদে অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬০-১৬১

স্বামীজীর মনে এ কথাগুলি জেগেছিল। তখন 'উদ্বোধনে' 'বর্তমান ভারত' প্রকাশ হয়ে গেছে। নূতন রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব ধারাটি সম্বন্ধে স্বামীজী যেকথা লিখছেন, তার দার্শনিক রূপায়ণ 'বর্তমান ভারতে'ই পরিসমাপ্ত। তবু 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অংশে প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের যে তুলনামূলক আদর্শবিচারের প্রশ্ন জেগেছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যেন বিস্তৃতভাবে তারই উত্তরদানের চেষ্টা।

মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অধিকাংশ পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে আতিথ্য নিয়েই কেটেছে। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদ বা উচ্চবিত্ত মহলের সান্নিধ্যেও এসেছেন। কিন্তু দেশের দরিদ্র, পতিত ও অশিক্ষিতের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ নূতন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন বেশী। তথাকথিত বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে নয়, 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বেরিয়ে আসুক চাষার কুটির, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপড়ি, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা, হাট, বাজার, ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে—এই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান।[১] সে আহ্বানের মূলে তাঁর নিজস্ব দেশ-দেখা চোখ।

আবার এই গণবিপ্লবের সফলতাকে তিনি বিচার করেছেন ভারতীয় ধর্মাদর্শের মাপকাঠিতে। ধর্ম অর্থে পরম সত্য উপলব্ধির প্রচেষ্টাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে তুচ্ছ দ্বন্দ্ব কলহের ঊর্ধ্বে সে ধর্ম-বোধের গভীরতম প্রজ্ঞার অবিচল আসন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্থান পতন যাই ঘটুক না কেন, এই মূল ধর্মচেতনাই সমগ্র জাতির ধারণী-শক্তির কাজ করেছে। সুতরাং আধুনিককালে যাঁরা মনে করেন যে ধর্মবর্জিত রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবেই ভারতে কল্যাণ, বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী তাঁরা ভ্রান্ত, সন্দেহ নেই।

সে কথা বোঝাতে গিয়েই স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' লিখেছেন

১ বাণী ও রচনা : পরিব্রাজক : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮২

—"দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরান পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাইচাপা পড়েছে মাত্র; আর তোমার— রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র !"[১]

পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ-প্রভাবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, এঁরা তিনজনেই ভারতীয় জাগরণের অধ্যাত্ম-সাধনার পটভূমিটি বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় ধর্মাদর্শের এই ইতিবাচক দিকটি এখন উপেক্ষিত। যতদূর মনে হয়, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিযুক্ত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণের অনুপযুক্ত। স্বামীজী তো স্পষ্টই বলেছেন— "মর্মস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণে রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।"[২] তবে ১৮৯৭ সালে ভারত-প্রত্যাগত স্বামীজীর এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও মনে হয়, ভারতের নিশ্চিত অভ্যুদয়ই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় (১৮৯৯) লিখেছেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।[৩]

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬১

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : ভারতে বিবেকানন্দ : রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর : পৃঃ ৪৬

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ : বর্তমান সমস্যা (উদ্বোধনের প্রস্তাবনা) : পৃঃ ৩১

কিন্তু সেই ভারতের জাগতিক বিষয়ে উন্নতির পন্থা কি? এ নিয়েও তিনি ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমাকালে নানাভাবে চিন্তা করেছেন। আমেরিকা-যাত্রার আগে ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ধ্যানাসীন বিবেকানন্দের অন্তরে নরনারায়ণ-সেবার যে আদর্শ জেগেছিল, তাঁর 'পত্রাবলী'র ভাষায় তার অনবদ্য প্রকাশ—

("দাদা এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপ) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphyics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, —কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গ্লোব) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।"[১]

এই একই চিঠিতে দরিদ্র ও নিপীড়িতের সপক্ষে সংগ্রামরত বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই নিপীড়নের জন্য ধর্ম দায়ী নয়। —'In every country the evils exist not with but against religion. Religion is not to blame, but men.' 'সব দেশেই যা কিছু ত্রুটি তা ধর্মের মধ্যে নয়, বরং ধর্মের বিরোধিতার ফলে দেখা দেয়। ধর্মের কোন দোষ নেই, দোষ মানুষের।'

কিন্তু মুশকিল এই যে ধর্মের নামে অধর্মাচারগুলিই শেষ অবধি পুরোহিতের বুদ্ধি, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বা বৈশ্যের বাণিজ্যশক্তির দ্বারা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখের পত্র : পৃঃ ৪১১

সংরক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার প্রধান উপায় স্বামীজীর মতে 'শিক্ষা'র বিস্তার। এই শিক্ষার দ্বারাই মানুষের অন্তর্নিহিত সিংহশক্তির জাগরণ এবং একবার সে জাগরণ হলে তার দ্বারা পার্থিব অপার্থিব সব স্তরের অভ্যুদয়ই সম্ভব।

মানবকল্যাণের জন্য যুগে যুগে নানা দেশের ত্যাগী, সাধক, বীর, যোদ্ধা, দাতা, সেবাব্রতী—নানা ধরনের মানুষের চেষ্টা চলেছে। কতো দার্শনিক মতবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন বা সমাজবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত হ'ল! মানবমঙ্গলের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জিজ্ঞাস্য মানুষের পরিপূর্ণ কল্যাণ কিসে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি স্বচ্ছ? আমরা যে সুখ বা উন্নতির আশায় ধাবমান তার নির্দিষ্ট পরিণতি কিছু আছে কি?

বেদান্তের প্রত্যক্ষ রূপায়ণে বিশ্বাসী বিবেকানন্দও জানেন, এ জগতে সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। স্বর্গ বা নরক হয়তো কল্পনা, কিন্তু সুখদুঃখে আন্দোলিত এই জীবন-নাট্যে চির-অপস্রিয়মান বর্তমান মানুষকে কোনো স্থায়ী নির্ভরতার কথা না ভাবিয়ে পারে না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিবেকানন্দ সেই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন—সেই এক মহাশক্তিই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক সুবিচার অথবা 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-রূপে পৃথিবীর নানা দেশে অভিব্যক্ত।

* * *

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর স্বামীজী লণ্ডন থেকে আমেরিকায় বিখ্যাত হেল-পরিবারের মেরী হেলকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে সর্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্বের রহস্যোপলব্ধির প্রচেষ্টা—"বাস্তব জগত—সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘ হবে। সূর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপর থাকে, কেবল তখনই আমাদের

ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য সব কিছু আমাতেই রয়েছে—এই বোধ হয়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক ঢিলটির সঙ্গে পাটকেলটি খেতে হয়—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ দুটি পৃথক বস্তু নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।"[১]

এদিক থেকে দেখলে জাগতিক অভ্যুদয়-বিলয় আপেক্ষিক সমস্যা সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরপক্ষে মানুষের চিরকালের চেষ্টা আরও উন্নতি, আরও সুখের অভিমুখী। এ প্রচেষ্টার একটি দিক দেখি ভারতের সমাজগত বর্ণবিভাগে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজনের দ্বারা এক সঙ্গতিস্থাপনের প্রচেষ্টাই এর মূলে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের এই বর্ণাশ্রম-বিভাগ আসলে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার নিহিত সত্য। শুধু গুণগত না রেখে ভারতবর্ষ এ বিভাগকে জাতিগত করে ফেলেছিল, এই যা প্রভেদ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টাও ইহলৌকিক উন্নতিপ্রয়াসের আর এক অভিব্যক্তি।

শ্রীমতী হেলকে লেখা পত্রের দার্শনিক অংশটুকুর শেষে মানব-কল্যাণপ্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের এই বর্ণাশ্রম বিভাগের আলোকে বিশ্ব-সভ্যতাকে বিশ্লেষণের যে সূচনা দেখি, পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে তারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।

"মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণদ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশগত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারও নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১

বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এযুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ। এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্যযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রূপো—কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেউ জানেন ব'লে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবেরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, "আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ। রূপার দরে

সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল ব'লে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।" (মূল পত্রে আছে 'half a loaf is better than no bread—'আস্ত রুটির চেয়ে আধখানা রুটিও ভালো'—এ জাতীয় অনুবাদই এক্ষেত্রে প্রশস্ত।)

"অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হ'তে পারে, সেইটাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্য্যন্ত।"[১]

সুতরাং ১৮৯৬ বা তার আগে থেকেই বিবেকানন্দ-মানসে শূদ্রপ্রাধান্যের কথা জেগেছে এবং সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি মানুষের সর্বরোগহর কোনো মতবাদ মনে না করলেও সেকালে প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে আপেক্ষিকভাবে ভালো মনে করেছেন।

---

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১-৩০২

মূল ইংরেজী পত্রটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—Human society is in turn governed by the four castes—the priests, the soldiers, the traders, and the labourers. Each state has its glories as well as its defects. When the priest (Brahmin) rules, there is a tremendous exclusiveness on hereditary grounds ; the person of the priests and their descendants are hemmed in with all sorts of safeguards—none but they have any knowledge—none but they have the right to import that knowledge. Its glory is, that at this period is laid the foundation of sciences. The priests cultivate the mind, for through the mind they govern.

ব্যক্তি হিসাবে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ প্রকাশে যেমন তাঁর দ্বিধা ছিল না, (আধুনিককালে বিশ্বপ্রেমিকেরা আবার স্বদেশপ্রেমকে তেমন সুনজরে দেখেন না,—ভুলে যান যে, যার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা নেই তার পক্ষে অন্য দেশ বা সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেম এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়!) তেমনি ছিল না পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর সাময়িক প্রাধান্যের কাহিনী অনুসরণ করে আসন্ন শূদ্রযুগের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ায়। তাঁর পত্রাবলী, বক্তৃতামালা ও রচনাবলীতে এই গণচেতনার অভ্রান্ত পরিচয়ই তাঁকে আধুনিক মনের নিকট আত্মীয়ে পরিণত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, শূদ্রযুগে সংস্কৃতির মান অবনমিত হবে। অন্নবস্ত্রের সংস্থানই যে-সমাজের প্রধান লক্ষ্য, তারা যে মানবমনের সূক্ষ্মতর ভাবকল্পনাকে

The military (Kshatriya) rule is tyranical and cruel, but they are not exclusive; and during that period arts and social culture attain their height.

The commercial (Vaishya) rule comes next. It is aweful in its silent crushing and blood-sucking power. Its advantage is, as the trader himself goes everywhere, he is a good disseminator of ideas collected during the two previous states. They are still less exclusive than the military, but culture begins to decay.

Last will come the labourer (Sudra) rule. Its advantages will be the distribution of physical comforts—its disadvantages, (perhaps) the lowering of culture. There will be a great distribution of ordinary education, but extraordinary geniuses will be less and less.

If it is possible to form a state in which the knowledge of the priesthood, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial, and the ideal of equality of the last can be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state. But is it possible?

অবান্তর বলে অস্বীকার করতে চাইবে, এ কিছু আশ্চর্য নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শূদ্র বা সর্বহারাদের নেতৃত্ব যাঁরা করতে আসেন, তাঁদের সীমাবদ্ধ আদর্শের দ্বারাই সমগ্র সমাজের মানস-সংস্কৃতিকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে চান।

শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধনির্ণয়-প্রসঙ্গে স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে' লিখেছেন—"সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেম-স্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[১]

শূদ্র বা সর্বহারাদের যুগেও যদি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ না হয়, তাহলে এরও পরিবর্তন হ'তে পারে। এ বিষয়ে স্বামীজীর সমাধান ছিল মহত্তম সংস্কৃতির আলোকে শূদ্রকে জীবন ও মননের ক্ষেত্রে উন্নীত করা। পূর্ব পূর্ব যুগের সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে, তাদের মহৎ আদর্শগুলির দ্বারা নবযুগের সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

Yet the first three have had their day. Now is the time for the last—they must have it—none can resist it. I do not know all the difficulties about the gold or silver standards (nobody seems to know much as to that), but this much I see that the gold standard has been making the poor poorer, and the rich richer. Bryan was right when he said, "we refuse to be crucified on a cross of gold." The silver standard will give the poor a better chance in this unequal fight. *I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread.*

Swami Vivekananda's Complete works : Vol VI :
Centenary Edn : pp 381-82. বক্রাক্ষর লেখক প্রদত্ত।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮

প্রাচীন ভারত সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদের[১] মধ্যেই মনুষ্যমহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পেয়েছিল। সেই ব্রহ্মজ্ঞ যথার্থ ব্রাহ্মণের আদর্শই স্বামীজীর মতে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। 'জগতের কাছে ভারতের বাণী' নামে যে অসমাপ্ত গ্রন্থে স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে ভারতের বাণী ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, তার সূচনায় বিয়াল্লিশটি সূত্রে তাঁর চিন্তাধারাকে সংহত করেছেন। সেখানেও দেখি 'ব্রাহ্মণে'র এই আদর্শ ঘোষণায় স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সর্বদ্বিধামুক্ত—"ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ 'ব্রাহ্মণত্ব'।

"স্বার্থহীন সম্পদহীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের উর্ধ্বে।

"জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে।

"যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোনো দাবি করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবি করে।"[২]

শূদ্রযুগের সাংস্কৃতিক অবনতিরোধকল্পে সভ্যতার মহত্তর আদর্শে তাদের উজ্জীবিত করাই একমাত্র প্রতিষেধক। আর স্বামীজীর মতে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিই ভারতের জাতীয় চেতনার মূলসূত্র হওয়ায় ধর্মীয় আদর্শের দ্বারাই আগামীযুগের গণসংস্কৃতির সার্থকতা সম্ভব। সেদিক থেকে এই শূদ্রজাগরণের সত্যকেও স্বামীজী ধর্মচেতনার বৃহত্তর প্রকাশরূপেই দেখেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাই তো তিনি লিখেছিলেন—"পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব মূর্খদেবো ভব', দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।"[৩]

১ বুদ্ধ ও শঙ্করের আবির্ভাবের পর থেকে সন্ন্যাসীরা অনেকটা সেই স্থান গ্রহণ করেছেন।

২ জগতের প্রতি ভারতের বাণী : সূচী : ১৯-২২ সূত্র : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭০-৭১

৩ ১৮৯৪ সালে লেখা : বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০

কিন্তু দরিদ্র তাঁর কাছে শুধু 'সর্বহারা' নয়, নারায়ণেরই রূপান্তর। আর এই দরিদ্রনারায়ণের পূজা কেবল অন্নবস্ত্রের উপচারে নয়, আত্মোপলব্ধির অসীম বিস্তারে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রজ্ঞা এইভাবেই পূর্ণতা দিতে পারে।

* * *

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষাগত দ্বন্দ্বের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। ভাষাবিচ্ছেদের ফলে আজ আমাদের গৃহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। মুষ্টিমেয় ইংরেজীশিক্ষিতের ইংরেজীর দাবি যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরাও মানবেন যে, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসাবে যে কোনো একটি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন। যাঁরা বিশুদ্ধ হিন্দী (সংস্কৃতপ্রধান) ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করতে চান, তাঁরা যে কেন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করতে অনিচ্ছুক তার কারণ বোঝা যায় না। ভারতীয় প্রজ্ঞার আকরস্বরূপ 'সংস্কৃত' সম্বন্ধে যে দুরূহতার অভিযোগ, সে অভিযোগ আধুনিক হিন্দীর চাইতে বেশী কি ? বরং 'সংস্কৃত' যদি সর্বভারতীয় ভাষামাধ্যমরূপে গৃহীত হতো, তাহলে সংস্কৃতের ব্যাকরণপদ্ধতির সরলীকরণের দ্বারা সমগ্র ভারতের আত্মিক যোগাযোগ অনেক সহজসাধ্য হতো।

'জগতের কাছে ভারতের বাণী'-তে স্বামীজী লিখেছেন—"এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।"

জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বামীজী তাঁর 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় (মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা The Future of India) বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—"·· সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবৎকালে

অদ্ভুত ফল লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতি-গুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিককালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। সভ্যতার ন্যায় তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।"[১]

১ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: ১৮৭-১৮৮

শিক্ষাকে মজ্জাগত করার এই আদর্শ থেকেই স্বামীজীর সাধু-ভাষায় নূতন শৈলীর উদ্ভব। অপর পক্ষে চলতি ভাষায় তিনি বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি মহাপুরুষগণের চলতিভাষায় জ্ঞানবিস্তারের অনুগামী। মননের সমুন্নতি ও গভীরতায় ভাষার প্রকাশরীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। 'বর্তমান ভারতে'র সাধু গদ্যরীতি-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-মননের এই সূত্রটি স্মরণীয়।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, ওই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে। এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা; আর একটি খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি।"[১] এ জাতীয় বাক্যসন্নিবেশ স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থের 'বর্তমান ভারতে'র আগে লেখা প্রবন্ধগুলিতেও দ্রষ্টব্য। আসলে এই দুই জাতীয় রীতি পরস্পরের পরিপূরক। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্র ও ভাষ্য রচনায় এ দুই জাতীয় বাক্যরীতির সন্নিবেশের উদাহরণ অজস্র। 'সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সাধু-গদ্যের দীর্ঘবিস্তারী বাক্‌রীতিকে 'বাগ্মিতার প্রকাশ'রূপে দেখেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা অবশ্যই স্বীকার্য। সর্বক্ষেত্রে না হ'লেও স্বামীজীর কোনো কোনো গদ্যস্তবক যে তাঁর বক্তৃতাভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত তার সবচেয়ে সেরা প্রমাণ 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ, যেখানে 'হে ভারত'—'এই সম্বোধনে নবযুগের ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান কম্বুকণ্ঠে-

১ উনিশ বিশ : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য : পৃঃ ১৩৮-১৪১

ধ্বনিত। একদিকে 'হে ভারত' অন্যদিকে 'হে বীর'—এ দুটি সম্বোধনে স্বামীজী আধুনিক ভারতবাসীর উদ্দেশ্যেই তাঁর স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। সমগ্র অনুচ্ছেদটি বিবেকানন্দের ভারতচেতনার প্রাণ-স্পন্দনে এমনভাবে অনুরণিত যে একে অনেকটা শ্রেষ্ঠ কবিতার মতো অখণ্ডসৃষ্টির মর্যাদা দিতে হয়। এমন এক একটি গদ্যস্তবক-রচনায় বিবেকানন্দের অন্তর্নিহিত কবিসত্তাই বিপুল ভাবরাশিকে স্বতোৎসারিত বাক্যগৌরবের মহিমায় চিরকালের স্মরণীয় বাণীতে পরিণত করেছে।

তুলনামূলকভাবে স্বামীজীর অসমাপ্ত ইংরেজী রচনা 'জগতের প্রতি ভারতের বাণী'র ভারত-অনুধ্যানের অংশ-বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করছি।—And what a land! Whoso-ever stands on this sacred land, whether alien or a child of the soil feels himself sorrounded—unless his soul is degraded to the level of brute animals by the living thoughts of the earth's best and purest sons, who have been working to raise the animal to the divine through the centuries, whose beginning history fails to trace. The very air is full of the pulsations of spirituluality. This land is sacred to philosophy, to ethics and spirituality, to all that tends to give a respite to man in his incessant struggle for the preservation of the animal, to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed as the spirit immortal, the birthless, the deathless, the everblessed—the land where the cup was full, and fuller has been the cup of misery, until here, first of all, man found out that it was all vanity; here, first of all in the prime

of youth, in the lap of luxury, in the height of glory and plentitude of power, he broke through the fetters of delusion. Here, in this ocean of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasure and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joy and sorrow, of smile and tear, of life and death, in the melting rhythm of eternal peace and calmness, arose the throne of renunciation ! Here in this land, the great problems of life and death, of the thirst for life, and the vain mad struggles to preserve it only resulting in the accumulation of woes, were first grappled with and solved—solved as they never were before and never will be hereafter ; for here, and here alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real. (তুলনীয়—'তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র'- 'বর্তমান ভারত') This is the land where alone religion was practical and real and here alone men and women plunged boldly in to realise the goal, just as in other lands, they madly plunged in to realise the pleasures of life, by robbing their weaker brethren. Here, and here alone the human heart expanded till it included not only the human, but birds, beasts and plants ; from the highest gods to grains of sand, the highest and the lowest, all find a place in the heart of man, grown great, infinite. And here alone the human soul studied the universe as one

unbroken unity whose every pulse was his own pulse".[১]

'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ, 'হে ভারত। ভুলিও না' সম্বোধনে যার শুরু, বাংলাসাহিত্যে স্বদেশমন্ত্ররূপে স্বীকৃত সেটি এই উদ্ধৃতির সঙ্গে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে স্বামীজীর ভারতচেতনায় রজোগুণাত্মক সংগ্রামের আহ্বান এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত ধ্যানতন্ময়তা দু'য়েরই উদাহরণ পাওয়া যাবে। এরই সঙ্গে তুলনা করা চলে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তাঁর ভারতীয় শ্রমিকের উদ্দেশে প্রণামমন্ত্র অথবা ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণদের উদ্দেশে সাবধানী নির্দেশ।[২] বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে এ-জাতীয় এক একটি আবেগস্পন্দিত স্তবক স্বদেশ ও বিশ্বের উদ্দেশে তাঁর অমোঘ আহ্বানশক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তো বটেই, সেই সঙ্গে এদের চিরন্তন সাহিত্য-সৌন্দর্যও মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুধাবন করার মতো।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ বা স্তবকটির (গদ্যে লেখা হলেও সংস্কৃতের 'কাব্য' শব্দটি এ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহার্য) প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনো ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের Egalite Liberte Fraternite-এর অশনি-নির্ঘোষ এর প্রতিছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, তন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মন প্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।"[৩]—সে কথা

১ Comp. Works of S. Vivekananda : Vol 4 : Centenary Edn : p p 313-314 অনুবাদ : 'বিবেকানন্দের কবিতা' অধ্যায়, পৃঃ ২০৭-৮ দ্রষ্টব্য।

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯, ১০৬, ৮১-৮২

৩ উনিশ বিশ : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ১৪১

তাঁর চলতি গদ্যের কোনো কোনো রচনাংশ (যেমন 'পরিব্রাজকে'র উল্লেখিত অংশ), ইংরেজী ও বাংলা পত্রাবলীর বা দেশে বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলীর অংশবিশেষ সম্বন্ধেও বলা চলে।

উদাহরণস্বরূপ 'ভারতে বিবেকানন্দ' (Lectures from Colombo to Almora) থেকে স্বদেশীযুগের বিপ্লবীদের প্রিয় আর একটি গদ্য অনুচ্ছেদ পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, স্বামীজীর এই বইটি একদা বাঙালীপাঠকসমাজে এত বেশী প্রচলিত ছিল যে, এটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলেই অনেকে মনে করে থাকেন। আর প্রধানত স্বামী শুদ্ধানন্দজীর প্রচেষ্টায় স্বামীজীর জীবৎকালেই তাঁর ভাষাভঙ্গী এত সার্থকভাবে অনুসৃত হয়ে তাঁর অনেক রচনার অনুবাদ হয়েছে যে, সেগুলি এখন বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই উদ্ধৃত অনুবাদটির সঙ্গে মূল ইংরেজী আর দেওয়া হ'ল না। "হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ— কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম

সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।'[১]

*　　　*　　　*

স্বদেশপ্রাণ বিবেকানন্দের মানসনেত্রে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস। তাই তাঁর ভারত-পরিক্রমায় বিশ্বপরিক্রমার সূচনা এবং বিশ্বপরিক্রমায় ভারত-উপলব্ধির পূর্ণতা। 'ভারতে বিবেকানন্দ' পর্বেই 'কলিকাতা অভিনন্দনে'র উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তি-শালী পাশ্চাত্যদেশে চারবৎসর ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।"[২]

স্বামীজীর ভারতচিন্তার দুটি প্রান্ত—একদিকে ভারতের অতীত ও বর্তমানের বাস্তব ইতিহাসের উত্থান-পতন কাহিনী, অন্যদিকে ভারতের মনোময় ইতিহাসের ধ্যানলব্ধ পরিপূর্ণতার আদর্শ। ফলে, ভারত-ইতিহাসের বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের আবর্তনকেই লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। ইতিহাসকে এমন কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বাঁধা উচিত কি না, এ নিয়ে ইতিহাসের দার্শনিকদের মতভেদ যথেষ্ট! কিন্তু পৃথিবীর কোনো ইতিহাসই যেহেতু ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ নয়, সেহেতু ব্যক্তির বিশিষ্ট মতনিরপেক্ষও হতে পারে না। ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যায় স্বামীজী যে বিশেষ প্রণালীটি অবলম্বন করেছেন, সর্বাগ্রে সেইটি আমাদের বিচার্য।

---

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : 'আমার সমরনীতি' : পৃঃ ১১৬ Complete Works of S. Vivekananda : Vol III (Centenary Edn) My Plan of Campaign : P 225-26

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২০৫

সমগ্র সমাজের কর্মধারাকে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারভাগে বিভক্ত করে যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল, জন্মগত অর্থে না হ'লেও কর্মগত অর্থে সে-বিভাগ অল্প বিস্তর সব দেশেই আছে। ভারতীয় সমাজের এই পদ্ধতিই গীতায় 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ'[১] উক্তিতে রূপান্তরিত। বিশ্ব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলেও আমরা দেখতে পাই সভ্যতার এক এক স্তরে এক এক বর্ণের প্রাধান্য।

এদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর আর এক চিন্তানায়কের প্রভাবও স্বামীজীর চিন্তাধারায় এসে থাকতে পারে। কোম্‌ত্ যখন পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিককালের বিজ্ঞানের যুগ অবধি সভ্যতার রূপান্তরের কথা বলেন, তখন সভ্যতার প্রকৃতিবিচারই তাতে প্রাধান্য পায়।[২] বিবেকানন্দ সভ্যতার প্রকৃতি এবং সভ্যতার ধারক বাহকদের প্রকৃতিও একই সঙ্গে বিচার করেছেন। কোম্‌তের মতে আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ, আর বিবেকানন্দের ভাষায় 'শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের' প্রাধান্যের যুগ। এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগটুকু লক্ষণীয়— দুইই এক হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তার যুগ অর্থাৎ মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন একদিকে এবং 'প্রত্যক্ষপ্রমাণবাহন' বিজ্ঞান আর একদিকে —এ নিয়ে বর্তমান যুগের চিন্তা। কোম্‌তের মতো মেরীর আদলে কোনো মানবদেবতার পূজার কল্পনা স্বামীজীর নেই। মূর্তিপূজা বা অবতারতত্ত্ব তিনি ভক্ত হিসাবে মানলেও শেষ অবধি তিনি অদ্বৈতবাদী। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতের প্রতিটি ধাপ যে মানবমনের অবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে মহত্তর সত্যের প্রতি যাত্রা—একথা স্বামীজী জানেন। সুতরাং 'মানুষ' তাঁর কাছে ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং পার্থিব সমস্যার সমাধানই তাঁর জীবনের শেষ উদ্দেশ্য

১, ২ গীতা : জ্ঞানযোগ : ৪।১৩। কোম্‌তদর্শন-অনুসারে প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক ; দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক ; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। ['কোম্‌ত দর্শন' : রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১ এবং 'নানা প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য]

নয়! বরং বলা চলে যে 'সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মরূপান্তরে'র সংকল্পই তাঁর সাধনা। আধ্যাত্মিক উত্তরণ ছাড়া মানবজীবন যে কখনো চরিতার্থ হ'তে পারে না, তার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে তো পেয়েছেনই, সমগ্র ভারতের ইতিহাসই তাঁর কাছে সে সত্যের সাক্ষীস্বরূপ।

সাম্প্রতিককালে অধ্যাত্মসাধনা ও পুরোহিততন্ত্রের একার্থক চিন্তার ফলে আমাদের বামপন্থী চিন্তানায়কেরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের প্রগতি ও প্রেরণামূলক দিকটি স্বীকারই করতে চান না। বিবেকানন্দ-মানসের অনুধাবনে কিন্তু সর্বাগ্রে এ ভ্রান্তি পরিহার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে শ্রেষ্ঠ ত্যাগের আদর্শে বিবেকানন্দ যে অধ্যাত্মসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার সঙ্গে 'চালকলাবাঁধা বিদ্যা'র কোনো সম্পর্কই ছিল না। এ বিষয়ে ভারতের পুরোহিতবৃত্তি ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ও বিদেশের খ্রীষ্টান মিশনারী—দুই দলকে বিবেকানন্দ নির্মম সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মানবসভ্যতার ঊষাকালে প্রকৃতির অন্তরালে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের আভাস যাঁরা পেয়েছিলেন, প্রায় সব সভ্যতার সূচনায় সেই পুরোহিত বা উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বারাই সভ্যতার প্রথম উন্মেষ, একথা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং 'বর্তমান ভারতে'র সূচনায় বৈদিক যুগ থেকে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কাহিনী দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর ভারত-ইতিহাস-দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

* * *

'উদ্বোধন'-পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়ে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সালে। সে সময় স্বামী সারদানন্দ এর যে ভূমিকা লেখেন তাতে 'বর্তমান ভারতে'র লেখকরূপে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এইভাবে প্রতিভাত—"আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে, কিন্তু উহার সম্বদ্ধ সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে। বহুল পরিভ্রমণ, গর্বিত

রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার ব্যবহার এবং জাতীয় স্বভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজীর মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, 'বর্তমান ভারত' তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।...

"অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোনসূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"[১]

'বর্তমান ভারতে'র এই দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি স্মরণীয় স্বামীজীর আর একটি বিশিষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ 'Historical Evolution of India' (ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ)[২]। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন তাঁর 'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটির বিশদ আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে স্বামীজীর মূল দৃষ্টিভঙ্গির একটি বক্তব্য—'In ancient India the centres of national life were always the intellectual and spiritual and not political.... The outbrust of national life was round colleges of sages and spiritual teachers.'[৩]—একথার অনুসরণে অধ্যাপক

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১৯-২২০

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৫-৩৯৫ [অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

৩ Complete Works of S. Vivekananda : Vol VI : p 161

সেন মন্তব্য করেছেন—"···রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী।···যুগে যুগে এ জাতীয় সংহতির ও ঐক্যবদ্ধতার প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে ততটা ছিল না, যতটা ছিল নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায় এবং নবদ্বীপে। ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনীতে স্বামীজী জাতির এই প্রাণকেন্দ্রগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এদেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানীর কাছে এ মূলতথ্যটি আশ্চর্যভাবে তুলে ধরেছেন।"[১]

'বর্তমান ভারতে'র বক্তব্য উপলব্ধিতে স্বামীজীর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' বিশেষ সহায়ক। এ প্রবন্ধে স্বামীজী ইতিহাসের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিশেষ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যখন বিশ্ব-ইতিহাসের মূলমন্ত্রসন্ধানী তখনই 'বর্তমান ভারতে'র মতো ইতিহাস-দর্শনের সৃষ্টি।

মানবমনের অনন্ত জিজ্ঞাসার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষে। কিন্তু কেবলমাত্র জাদুবিদ্যা, ভয়-বিস্ময় ইত্যাদি থেকেই যদি এ জিজ্ঞাসার সূচনা হতো, তাহলে পরবর্তীকালে সংসার-বাসনার ঊর্ধ্বে মানবকল্পনার রূপরস গন্ধ স্পর্শ চেতনার অতীত অদ্বৈত-বাদের ঘোষণা ভারতবর্ষে সম্ভব হত না। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চেতনাই উচ্চতর অধ্যাত্মচিন্তার জগতে এসে দেবতা ও ঈশ্বরকে নিম্নতর স্থানে নির্দিষ্ট করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় যাগযজ্ঞ থেকেই যেমন জ্যামিতির উদ্ভব, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় মননশীলতার ছন্দোময় প্রকাশই সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন 'সংস্কৃত বা দেবভাষা'।

"এদেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া

১ বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা ঃ শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন ঃ 'ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব' অধ্যায় ঃ পৃঃ ৮-৯

জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিম যুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধিনিয়ম প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল। এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল।"[১]

সভ্যতার এই বিশেষমুহূর্ত থেকে জড়বাদী দার্শনিকদেরও উদ্ভব হতে থাকে। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতে অধ্যাত্ম দর্শন ও জড়বাদী দর্শন—দুয়েরই পাশাপাশি অবস্থান। পুরোহিত, শাসক ও জড়বাদীদের চিন্তাসংগ্রামের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁর প্রতিভায় অধ্যাত্মদর্শন এক পরিপূর্ণতা লাভ করল, তিনি ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ—'গীতা' তাঁর সেই সমন্বয়-কারী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জাতি-নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সে উদারতা আনতে পারেন নি। ফলে বুদ্ধ থেকে কবীর, নানক, রামানন্দ, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির আন্দোলন এই সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে আবর্তিত।

"প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিককালের মতো প্রাচীনকালেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধিচর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল, বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে

---

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৭

গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।"[১]

আধিপত্যলাভের জন্য কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের কাহিনীর কাব্যরূপ 'মহাভারত'। বৌদ্ধপ্রভাবে মগধপ্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রাধান্য ঘটে, পরবর্তী যুগে হিন্দু রাজাদের পুনরভ্যুত্থানে সে প্রাধান্য হ্রাস পায়। বৌদ্ধধর্মই ভারতে প্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সম্রাট্‌দের সৃষ্টি করে। কিন্তু অতিরিক্ত উদারতার বশে সব জাতির লোককে আশ্রয় দিতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতি ও শুচিতা ব্যাহত হয়। সীথিয়ানদের ভারত-আক্রমণ ও পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে বৌদ্ধ প্রভাব অনেকাংশে বিনষ্ট হওয়ার পর ইতিহাসের দীর্ঘ যবনিকা-শেষে দেখা গেল বৌদ্ধ প্রভাব মুছে গেলেও একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর একদিকে সন্ন্যাস—এ দুইশ্রেণীর নবপুরোহিতশক্তি সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

"সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজকর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজাপদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ।"[২]

আচার্য শঙ্করের জ্ঞানযোগের চেয়ে রামানুজের উদার ভক্তিযোগই জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরিয়ে আনতে বেশী সহায়তা করে। কিন্তু শঙ্কর এই নবজাগ্রত হিন্দু সভ্যতাকে এক দার্শনিক পটভূমি দিলেন। "...প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুতজাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নব-ভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৯

২ তদেব পৃঃ ৩৯২

প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"[১]

ভারতের উত্তরাখণ্ডে বারংবার বিদেশীদের অভিঘাত দেখা দিলেও দাক্ষিণাত্য সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আরওঙ্গজেবের জীবনের শেষদিকে এই দক্ষিণ-বিজয়-প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াতে শিবাজী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের আবির্ভাব। মুসলমানযুগে যাঁরা সমন্বয়-পথিক তাঁরা ইসলামের তরবারিকে কিছুটা শান্ত করেছেন এবং ইসলামের অনুপ্রবেশও অনেকটা ঠেকিয়েছেন (যা একমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে), তবু রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক—এঁরা কেউই সমগ্র সমাজকে তাঁদের সাম্যের বাণীতে প্রভাবিত করতে পারেন নি। সমগ্র মধ্যযুগে এক প্রধান সমস্যা ছিল আর্য-সংস্কৃতির আত্মরক্ষা। পুর্বোক্ত মহাপুরুষদের প্রচেষ্টা সেদিক দিয়ে সার্থক। আবার এই আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়াতে মারাঠা ও বিশেষভাবে শিখেরা যে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তার দ্বারাও ভারতীয় রাজনীতি প্রভাবিত। কিন্তু এই দুই শক্তির দ্বারা ভারতের নবজাগরণ সম্ভব হয় নি।

কারণ হিসাবে স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকেরই পর্যবেক্ষণফল –"ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তি-ভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ-সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব এবং বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল দরবারেও তদানীন্তনকালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুণার রাজদরবারে কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৯১

আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণঅভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।…"[১]

এর পরে স্বামীজী ইংরেজশাসনের সমকালীন অবস্থার সামান্য উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন: আকস্মিক পরিসমাপ্তি মনে হয় ব্যস্ততাজনিত অথবা ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ তিনি তখনো সমীচীন মনে করেন নি। অবশ্য ইংরেজশাসনের যুগ সম্বন্ধে তাঁর তীব্র ও তিক্ত মতামতের বেশ কিছু নিদর্শন এখন পাওয়া গেছে। সে-আলোচনার স্থান অন্যত্র। আমরা এখন 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর বক্তব্য সম্বন্ধে মনোযোগী হব।

* * *

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা জানেন সে যুগে ইতিহাস-লেখার দিকে বাংলার গদ্যসাহিত্যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। তার কারণ, তখন অবধি আমাদের ইতিহাসের অনেকাংশই অনাবিষ্কৃত। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং' জাতীয় গদ্যপ্রচেষ্টা থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' অবধি বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাসকাহিনীর বিচ্ছিন্ন উপকরণের সমাবেশ-প্রচেষ্টা বাঙালীর নবজাগ্রত ইতিহাস-কৌতূহলের উদাহরণ।

কিন্তু ইতিহাসের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে যাঁরা প্রথম বাংলাসাহিত্যে ধ্বনিত করেছিলেন, সেই প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের

১ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: পৃ: ৩৯৪

কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমি জেনে হিন্দু কলেজের যে তরুণ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধ্যাপকটি পরাধীন ভারতবর্ষের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁর কথাও মনে পড়ে। কিন্তু সেই ডিরোজিও এবং ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যবৃন্দের অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিটির কথা ততটা গভীরভাবে বিচার করে দেখেন নি। তাই প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনের মোহ তাঁদের যতটা সমাচ্ছন্ন করেছিল, প্রাচীনের মর্যাদা ততটা আত্মস্থ করে নি।

তবু এ কথা স্বীকার্য যে, ডিরোজিওর শিষ্যেরা উত্তরজীবনে যখন চিন্তাজগতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন ধীরে ধীরে নবীনের বিদ্রোহ প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতায় অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস হয়ে এসেছে। ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী থেকে এই সামঞ্জস্য-সাধনের একটি উদাহরণ—

"বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বরপরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এ দেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও।" (এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা)

ডিরোজিও-যুগের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখেও মননের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' লিখেছেন—"যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ ঐ ভাবার্থপ্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল

এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়েছি যে, আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্নপীঠ-সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।"

ভূদেব ও মধুসূদনের সহপাঠী ও বন্ধু রাজনারায়ণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃত। তাঁর সুবিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বলেছিলেন—"...আমরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য সুজাতির সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীনকালের ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা, এমন কি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে।"

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এই জাতীয় রচনাবলীতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধমালার পূর্বসূচনা দেখতে পাই। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উপাদানে সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনার ব্যাকুলতা আমরা বঙ্কিম-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। অবশ্য বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা মূলতঃ বঙ্গকেন্দ্রিক[১]—তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-ও তো

১ ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রভৃতি প্রবন্ধ বা 'কৃষ্ণচরিত্র' মনে রেখেও বঙ্কিমের স্বদেশচেতনায় বাংলাদেশের প্রাধান্য স্বীকার্য।

বাংলার রূপকল্পেই সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।"

বঙ্কিমের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে সঞ্চরণ করে উপন্যাসের কবিকল্পনায় যে পরিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টি করেছে, আমাদের জাতীয় চেতনা তার দ্বারা অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত।[১] এদিক থেকে বঙ্কিম-বন্ধু রমেশচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধমালায় ও ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার সন্ধানী পথিক।

বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনার এই পটভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' আর একটি স্মরণীয় সংযোজন। রামমোহনের যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্শের যে সংঘাত বাঙালীর মনন-ভূমিতে দেখা দিয়েছিল, তার একটি সমন্বিত দার্শনিক রূপ আমরা 'বর্তমান ভারতে'র ছোট্ট প্রবন্ধসীমার মধ্যে বিধৃত দেখি। বস্তুত এ প্রবন্ধ-পুস্তিকাটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের দর্শন। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দজী এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—"...ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ।"

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর ভারতচিন্তা প্রধানত ভারতের অন্তরের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে অসংখ্যবার আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মানবজাতির আধ্যাত্মিক

---

১ বঙ্কিমসাহিত্য বিবেকানন্দের ভালোভাবেই পড়া ছিল এবং সেকালের তরুণদের তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন, বিশেষভাবে 'আনন্দমঠ' পড়তে বলতেন—এ সংবাদ পাওয়া যায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। বিশ্ববিবেক (২য় সংস্করণ) শ্রীযদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামিজী' (পৃঃ ২৬১) দ্রষ্টব্য।

আদর্শের প্রতীক। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা তাঁর চিন্তাজগতে একান্ত কাছাকাছি স্থান পেয়েছে। তবু ভারতবর্ষকে তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদের দিক থেকেই বিচার করেন নি। ইতিহাসের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চেতনার মূলসূত্র আধ্যাত্মিকতা তাঁর লক্ষ্য হলেও আধুনিকযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিদের সঙ্গে আদানপ্রদানেই যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'ভাব্‌বার কথা'র 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, ঘটনাপঞ্জীমূলক ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালোভাবে ভারতের ইতিহাস লেখা রয়েছে—'ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী'র মধ্যে।

ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্মের চার বিভাগের অনুসরণে স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকেও চারভাগে ভাগ করেছেন। "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতে সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে। চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরাণি, য়াহুদী, আরব এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

"বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ডপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।"[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতশক্তির সঙ্গে বহুকালব্যাপী সংঘর্ষের পর শেষ অবধি রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ আমলে প্রাধান্য বৈশ্যতন্ত্রের। ইংরেজ আমলেই

১ বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২৯

বিবেকানন্দ আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আধুনিককালে শ্রমজীবীদের কেন্দ্র করে সর্বত্র যে গণজাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে, তারই পূর্বাভাস দেখি 'পরিব্রাজকে'[১] স্বামীজীর শ্রমিক-বন্দনায়। বাংলাসাহিত্যে গণচেতনার এই অভ্রান্ত স্বাক্ষর আগামী "শূদ্রযুগে" ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা লাভ করবে। সাম্প্রতিক বৈশ্য ও শূদ্রযুগের সন্ধিক্ষণে ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে স্বীকৃতিদান।

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যে-সব পরিবর্তনমুখী আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সেগুলি একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-জীবনে নতুন প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-চেতনার শূন্যতা পূরণ করেছে। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ—এ সব আন্দোলন বা ব্যক্তিত্বের পিছনে তিনি ঐ এক উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। সমাজ-জীবনে যখনই সমষ্টিকে ভুলে ব্যষ্টির আরাধনা শুরু হয়, অথবা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের আধিপত্য ঘটে, তখনই বিপ্লবের শুরু—"সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[২]

বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন—"…এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্থালিজ্‌ম্, এনার্কিজ্‌ম্, নাইহিলিজ্‌ম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[৩]

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৬
২ তদেব : বর্তমান ভারত : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮
৩ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪১

উনিশ শতকের নবজাগৃতির সমগ্র আয়োজন যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সেই সময়ে বিবেকানন্দ যে গণ-সংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এই গণচেতনার অভাবেই উনিশ শতকের নবজাগরণ অসম্পূর্ণ। আজকের দিনেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপকতার পাশাপাশি গণশিক্ষার একান্ত তুচ্ছ আয়োজন দেশহিতৈষীমাত্রেরই গভীর বেদনার কারণ।

মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের নেতৃত্বের উত্থানপতন সম্বন্ধে এ যুগের নেতৃবৃন্দের বিশেষভাবে স্মরণীয় বিবেকানন্দের এই সাবধান-বাণীটি—

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহু-বলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়।"[১]

ইংরেজরাজত্বের বৈশ্যশক্তি একদিন এই ভুল করেছিল। পৃথিবীর যেসব দেশে শূদ্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয়, সে সব দেশেও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলেছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা বর্তমান ভারত কতখানি গ্রহণ করবে তারই উপর ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাবনা নির্ভরশীল।

ইংরেজরাজত্বের মূল স্বরূপটি বিশ্লষণ করতে গিয়ে স্বামীজী বাস্তব ইংলণ্ডের পরিচয় বিশ্লেষণে কয়েকটি উপমাত্মক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন—"ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[২] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবধি

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪২, ২৩১

ইংরেজের রাজদণ্ড যে আসলে বণিকের মানদণ্ডই ছিল—একথা সর্বজনবিদিত। ইংরেজশোষণের নির্মম ইতিহাস স্বামীজী গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তবু এই পরাধীনতার যুগেও ইংরেজশাসনের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথমত, "·· এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র" এদেশে এর আগে কখনো দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, "এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসঙ্ঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে।"[১]

এই নবজাগরণের উচ্ছ্বাসে হয়তো জাতীয় জীবনে বা ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ভুলভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, কিন্তু নির্বিবাদে পূর্বগামীদের অনুসরণ করে যাওয়াও তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। সে কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে মানবাত্মার চিরস্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—"যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না। প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। ···মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন।···দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?"[২]

সমকালীন ইংরেজশাসনের একটি দুর্বলতা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—পাছে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয় এই ভয়ে সেকালের ইংরেজরা "ইংরেজ জাতির গৌরব" সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছিল। আসলে এ মনোভাব দুর্বলতারই নামান্তর।

অপরপক্ষে সমকালীন 'শিক্ষিত' ভারতীয় মানসের দ্বন্দ্ব অনুভব করে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন—"একদিকে পাশ্চাত্যসমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা,

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৪

উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"[১] এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যারা বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীর ভাষা ও বেশভূষা অবলম্বনকেই উন্নতির চরমসীমা জেনে দরিদ্র, অজ্ঞ স্বদেশ-বাসীকে তুচ্ছ মনে করতেন বা এখনও করেন, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর অসংশয় মন্তব্য—"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?"[২]

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বিবেকানন্দ এই ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "...পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।"[৩] সুতরাং অনুকরণ নয়, স্বীকরণ; আর সেই স্বীকরণের জন্য আত্মানুসন্ধান। বর্তমান ভারতের উদ্দেশে বিবেকানন্দের এই আত্মস্থতার বাণীতেই উনিশ শতকের নবজাগরণের পরিপূর্ণতা।

বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত অনুভূতির উদাহরণ অজস্র। তবু 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম প্রজ্ঞা ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মিলিত সৌন্দর্যে যে মন্ত্রোচ্চারণের মহিমা লাভ করেছে, তার অনন্যতার কথা স্মরণ করে সে অংশটি পাঠকদের কাছে আবার নিবেদন করি—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার

১, ২, ৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬, ২৪৯, ২৪৮

ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"[১]

* * *

'বর্তমান ভারতে'র চিন্তাবীজ যে ১৮৯৬ সাল থেকেই স্বামীজীর অন্তরে অঙ্কুরিত হতে থাকে, শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা ঐ বছরের ১লা নভেম্বরের পূর্বোদ্ধৃত পত্রটি তার প্রমাণ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে সভ্যতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের সংহত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই এ পত্রের শেষাংশ রয়েছে। এই বক্তব্যকেই 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনাকালে স্বামীজী সম্প্রসারিত করেছেন।

তবে 'বর্তমান ভারতে' তাঁর বিষয়বিন্যাসে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমদিকে তিনি সংক্ষেপে বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগ থেকে মুসলমান এবং ইংরেজ শাসনের যুগ অবধি চতুর্বর্ণ-প্রথার আলোকে ভারত-ইতিহাসের চারটি যুগকে পর পর স্থাপন করেছেন। তারপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারবর্ণের শাসনকালে প্রত্যেক যুগের গুণ ও দোষ বিশ্লেষণান্তে সেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা করেছেন।

তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে তখনও শূদ্রযুগের পূর্ণ আবির্ভাব হয় নি। কিন্তু স্বামীজীর মননলোকে সমাজতাত্ত্বিকের দূর-প্রসারী দৃষ্টি আসন্ন শূদ্রযুগকে নিশ্চিত সম্ভাবনারূপে গ্রহণ করেছে। 'সমাজতন্ত্র' যে মানবসভ্যতার সমস্ত ব্যাধির উপশম, এমন কথা মনে না করলেও বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত বলেই সর্বমানবের

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

সহজাত সাম্য স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত, বিশেষ শ্রেণীর সুবিধাভোগের অবসান তাঁর অবশ্যই কাম্য।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের শেষ-জীবনের অতিমূল্যবান গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দে' বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও সেযুগের আরো কিছু তরুণের সঙ্গে ঢাকায় স্বামীজীর সাক্ষাৎকারের (১৯০১) বিবরণের অংশবিশেষ স্মরণীয়—"…ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজী যেন স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন: 'হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হলো শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখো চীনের ভবিষ্যৎ, মহান্ অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।'

"আমি বিনীতভাবে বললাম, তিনি কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, আমি …পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি।…তোমরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।"[১] উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষা অবশ্য ঠিক স্বামীজীর ভাষার মতো নয়। স্মৃতি থেকে বিধৃত এই বক্তব্যের সমধর্মী বক্তব্য আমরা আগেই পেয়েছি বলে এই স্মৃতিকথনকে ভাবের দিক থেকে প্রামাণ্য বলা চলে।

* * *

১৮৯৯-এর জানুয়ারিতে (মাঘ, ১৩০৫) 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ বৎসরই ১৫শ

---

১ 'স্বামী বিবেকানন্দ': ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'জাতীয় ভাবাদর্শ'-অধ্যায়: পৃ: ৩২৯; এ প্রসঙ্গে ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিতে রাশিয়া অথবা চীনে জন-জাগরণের ইঙ্গিত সম্বন্ধে আলোচনা স্মরণীয়। এ-গ্রন্থের 'বিবেকানন্দ: মনন ও সাহিত্য' অধ্যায়: পৃ: ১১।

সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় 'বিলাতযাত্রীর পত্র'—স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপ-যাত্রার পথে। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগের পটভূমিকায় 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' (বিলাতযাত্রীর পত্র) রচনা দুটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ঐ বৎসরই জুন মাসে স্বামীজীর বিদেশযাত্রা। সুতরাং 'বর্তমান ভারতে'র কিছু অংশ বিদেশ থেকেই 'উদ্বোধনে' প্রেরিত। 'পরিব্রাজকে' এর একটু রসমধুর উল্লেখও আছে। "যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক ক'রে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে!" তু-ভায়া অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী তুরীয়ানন্দ সেদিন Sea-sickness বা সমুদ্রযাত্রার অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

'বর্তমান ভারত' সমগ্র গ্রন্থটি একসঙ্গে লেখা হয় নি, এটা ঠিক। কিন্তু মূল বক্তব্য তাঁর কাছে স্পষ্ট থাকায় ধীরে ধীরে সেই বক্তব্যকে ভারত ও জগতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ থেকে আগামী যুগের গণশক্তির জাগরণ অবধি সমগ্র মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার তাঁর এই নিগূঢ় তাৎপর্যময় মননগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাসে তাঁর প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন দেশে ও কালে সাধারণ মানুষের অধিকার। ইতিহাসকে তিনি ক্ষমতাশালীদের উচ্চমঞ্চ থেকে না দেখে সমস্ত ক্ষমতার উৎস বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (রাজা) বা বৈশ্য (ব্যবসায়ী)—এই সব সভ্যতার শেষ লক্ষ্য সভ্যতার ধারক ও বাহক 'মানুষে'র কাহিনী। এতকালের বঞ্চিত এই সাধারণ মানুষ (ভারতবর্ষে যাদের পরিচয় 'শূদ্র') তাদের শ্রমজীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়েই সভ্যতার পরিচালনা-ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে—এই

ভবিষ্যদ্বাণী তাই বিবেকানন্দের দ্বারাই এদেশে প্রথম উচ্চারিত হতে পেরেছে।

পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মতগুলির সঙ্গে স্বামীজীর যে একালে ভালই পরিচয় ছিল, সেকথা এ প্রসঙ্গে যেমন স্মরণীয়, তেমনি মনে রাখা দরকার যে তাঁর দৃষ্টিতে অধিকার-সাম্যের মূলেও বেদান্তচিন্তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে লণ্ডনে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা Vedanta and Privilege (বেদান্ত ও অধিকার) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি– "বিশেষ সুবিধাভোগের ধারণাটি মানুষের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। দুটি শক্তি যেন অনবরত ক্রিয়াশীল—একটি শক্তি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করছে, আর একটি তা ভেঙে চলেছে। একটি সুবিধার সৃষ্টি করছে, অন্যটি তা ভেঙে দিচ্ছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভেঙে যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি দেখা দেয়। আমাদের চারদিকে এই সংগ্রাম চলেছে। অবশ্য প্রথমে আসে পশুসুলভ ক্ষমতার প্রচেষ্টা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এ দুনিয়ায় ধনের অধিকারও ঐ জাতীয়। একটি লোকের যদি অন্যের তুলনায় বেশী টাকা হয়, তাহলে সে তার চেয়ে কম টাকাওয়ালা লোকের উপর আধিপত্য করতে চাইবে। বুদ্ধিমান লোকদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা আরো সূক্ষ্ম, আরো প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের চেয়ে বেশী জানে শোনে, তাই সে বেশী অধিকার দাবী করে বসে। সবার শেষে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অধিকার দাবী হলো আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। এটিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ এটির মতো পরপীড়ক কিছু আর নেই। …বৈদান্তিক কাউকে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুবিধাভোগী হ'তে দেবে না, একেবারেই না।"[১]

"অধিকারবাদের যদি বিশেষ কোনো দেশ থাকে, তাহ'লে সে এই দেশ, যে দেশ অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ মানুষের এবং উচ্চবংশজাতদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। অবশ্য

১ বাণী ও রচনা : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬

অর্থগত সুযোগসুবিধা ভোগের কথা এদেশে ততটা নেই (আমার মনে হয়, এইটি ওর ভালো দিক), কিন্তু জন্ম ও ধর্মগত অধিকার ভোগ এদেশে সর্বত্র।"[১]

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়াতে যে ধন বা ক্ষমতার অহঙ্কার ততটা মাথা তুলতে পারতো না, সেটা ঠিকই। কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের অসারতা যত প্রমাণিত হয়েছে, ততই পাশ্চাত্যের মতো ভারতেও অর্থনৈতিক জাতিভেদ ক্রম-বর্ধমান। পুঁজিবাদী যুগের অর্থনৈতিক জাতিভেদের জায়গায় সাম্যবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক জাতিভেদ দেখা দিয়ে প্রচলিত সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তাশীল মানুষকে সন্দিহান করে তুলেছে। অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ অদ্বৈতবাদের আলোকে সর্বজীবে ব্রহ্ম-দর্শনের সত্য স্বীকার করে নিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বেদান্তনিষ্ঠ বিবেকানন্দ সব ধরনের বিশেষ অধিকারবাদেরই বিরোধী।

ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথার বিশেষ তাৎপর্যের কথাটি অবশ্য স্বামীজী নানাভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র—'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শেষ কিস্তিতে এ বিষয়ে স্বামীজীর মন্তব্য—"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ।"[২] এই বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয় দেওয়া।

প্লেটো তাঁর 'Republic'[৩]-গ্রন্থে (ক) শাসকশ্রেণী (এঁরা

১ বাণী ও রচনা : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩৩৭

২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১১

৩ Greek Political Theory : Ernest Barker : 1947 Edn pp 198-203

'perfect guardians বা পরিপূর্ণ অভিভাবক'), (খ) সৈনিকশ্রেণী (এঁদের আগে 'guardians' বা অভিভাবক বলা হলেও পরে বলা হয়েছে 'auxiliaries' বা সহায়ক শ্রেণী), (গ) উৎপাদক শ্রেণী (যাঁদের প্লেটো বলছেন 'farmers' বা কৃষকশ্রেণী)—এই তিন শ্রেণীতে তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের জনসাধারণকে বিভক্ত করেছেন। শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে 'Philosopher King' বা দার্শনিক রাষ্ট্রনায়কের কথা প্লেটো ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষে তারই প্রতিরূপ 'ব্রাহ্মণ'-শ্রেণী।[১] অবশ্য 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি আরো গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এঁরা প্রত্যক্ষ শাসনদণ্ড হাতে নেন নি। ক্ষত্রিয় নৃপতি বা সামন্তদের সহায়তাই ছিল ব্রাহ্মণদের জীবিকা। একদিকে মন্ত্রিত্ব, আর এক দিকে পৌরোহিত্য—এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সাধনায় তপস্বী জীবনযাপনই আদর্শ ব্রাহ্মণের করণীয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যেত আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের দোহাই দিয়ে পুরোহিতেরা চিরকালই সমগ্র সমাজকে হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যোদ্ধা বা ব্যবসায়ীর দল যখন রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে, সমাজ-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষে তখন রাজনৈতিক উত্থানপতনের অপেক্ষা না রেখেই পুরোহিততন্ত্র গণজীবনকে নিয়মিত করেছে। "চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরানি, য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে।"[২] কিন্তু এক ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-শ্রেণীর আধিপত্য সবচেয়ে বেশী কাল স্থায়ী। হয়তো এর রাষ্ট্রগত কারণ ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা, সেইসঙ্গে দার্শনিক কারণ ভারতীয় জনসাধারণের অধ্যাত্ম আদর্শে বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ।

---

১ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নৃপতিরা অনেকেই পরবর্তীকালে একাধারে দার্শনিক ও শাসক। পৌরাণিক যুগের রাম বা কৃষ্ণ এবং ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধ বা মহাবীর—এঁরা ক্ষত্রিয়বংশজাত এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি।

২ *বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ২২৯*

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদিক, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক যুগে সমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরোহিত বা শাসকশ্রেণী সাধারণ প্রজার মতামতের কথা[১] কখনোই চিন্তা করেন নি। বরং বৌদ্ধ শাসনের কালে কিছু কিছু স্বাধীনতন্ত্র রাজ্য এদেশে ছিল এবং বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ আন্দোলন আমাদের বর্ণাশ্রম-বিভক্ত সমাজকে পরিবর্তিত করতে পারে নি। এই যুগে সমাজের শাসনব্যবস্থার মূলে হয় 'ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি বা ঈশ্বরাবেশ', নয়তো সম্রাটের সর্বব্যাপী ক্ষমতা।

প্রাচীন শাস্ত্রের বা ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ধরে যে শাসনব্যবস্থা তার উপর প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কোনো প্রভাবই থাকতো না। পুরোহিততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের একান্ত প্রভাবাধীন প্রজাশক্তি, কেবল 'পালিত' ও 'রক্ষিত' হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভুলেই ছিল। আবার প্রাচীন যুগে রাজশক্তিও প্রধানতঃ পুরোহিতশক্তির অধীনে। ফলে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে গণশক্তিকে পদানত রাখা পুরোহিতদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদকারী ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ। রামায়ণ মহাভারতের রাজর্ষি জনক, রাজা রামচন্দ্র, শস্ত্র ও শাস্ত্রে সমান নিপুণ কৃষ্ণ—এঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় নেতৃত্বের চিহ্ন। ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতিও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। "বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাড়গণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান।"

পুরোহিত ও রাজশক্তির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমানবপ্রতিভা" বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একদিকে

---

১ 'যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে'—এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা অবশ্য স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২২-২৩

ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অখণ্ড জাতীয়চেতনার সূত্রধারণ, আর একদিকে মহত্তম অধ্যাত্মচিন্তার আলোকে ভারতবাসীর চিরন্তন ধর্মসাধনার উত্তরাধিকার 'গীতা' সৃষ্টি—এ দুয়ের দ্বারাই কৃষ্ণচরিত্র ভারত-ইতিহাসে অনন্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক এই চরিত্রের কথা ইতিহাসচেতনার পক্ষে এইজন্যই আবশ্যিক যে প্রাচীনভারতের মূল ইতিহাস আছে পুরাণগ্রন্থের অন্তর্লোকে।

বৌদ্ধযুগের অবসানের পর পুনরভ্যুত্থিত হিন্দুচেতনার যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিল পরস্পরের সহায়ক। কিন্তু পুরাকালের তপস্যা, মৌলিকতা, জীবনীশক্তি সবই তখন গতপ্রায়। তার ফলেই সহস্র বিবাদবিচ্ছিন্ন ভারতরাষ্ট্রে ইসলামের রাজশক্তির অনুপ্রবেশ।

মুসলমানরাজত্ব মূলতঃ ক্ষত্রিয় আদর্শের রাজত্ব। পুরোহিত এবং রাজা—ইসলামশাসনে একব্যক্তি। এই একচ্ছত্র প্রতাপের ফলেই বৌদ্ধ সম্রাটদের সমতুল্য সর্বব্যাপী শাসনদণ্ড নিয়ে মুসলমান বাদশাহদের দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা। মুসলমানশক্তির অভ্যুদয়ের আগে এদেশে বৌদ্ধ প্রভাব নিরস্ত হয়ে কুমারিলভট্ট থেকে শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুশক্তির নবজাগরণের প্রচেষ্টা দেখা দিলেও রাজনৈতিক সিদ্ধির দিক থেকে তা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মনীষাকে কেন্দ্র করেই হিন্দুর দার্শনিক চিন্তা এক বিশেষ রূপান্তর লাভ করে।

মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরেজ-শাসনে 'বণিকের মানদণ্ড'ই মূলতঃ শাসনকর্তা। তাই এই যুগটি স্বামীজীর মতে "বৈশ্যযুগ।" সমকালীন বৈশ্যযুগ অবধি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত ঐতিহাসিক বিভাগের প্রতিটি পর্বের গুণ ও দোষের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোম্‌ত্‌ যাকে পৌরাণিক বা আধ্যাত্মিক যুগ বলেছেন, বিবেকানন্দ যে যুগকে পুরোহিত যুগ বলেছেন, সে যুগের প্রধান লক্ষণই জগৎরহস্যের বুদ্ধি ও কল্পনাগত সমাধানপ্রচেষ্টা। ফলে পরা ও অপরা—আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দুই ধরনের জ্ঞানচর্চারই

সূত্রপাত পুরোহিতপ্রাধান্যের যুগে। স্বামীজীর ভাষায়—"পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহু কল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত···।"[১]

এদিক থেকে বিচার করলে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ তার অধ্যাত্ম অন্বেষণের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কম-বেশী সব সমাজেই ছিলেন ও থাকবেন। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের সর্ববিধ অধিকারহরণের অপপ্রয়াস দেখা দেয়, "যেখানে শক্তির আধার বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রযোগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে।"[২] সুতরাং জড়বাদী দার্শনিকেরা যখন মন্ত্রতন্ত্র জাদুবিদ্যা প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক করে দেখেন, তার মূলে পুরোহিতদেরও দায়িত্ব থাকে। শাস্ত্র বা পুরানের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন নেই। ফলে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে নানা কূট-কৌশল ও অপযুক্তির দ্বারা সমাজকে শৃঙ্খলিত করা সহজ। কিন্তু এইভাবে দেশ ও জাতিব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকার পুরোহিতদেরও আচ্ছন্ন করতে থাকে। অন্যকে ভোলাতে গিয়ে দেশাচার ও লোকাচারের শৃঙ্খলে পুরোহিতেরা নিজেদেরই আবদ্ধ করে ফেলেন।

পুরোহিতযুগের আলোচনাতে স্বামীজী একটি চিরন্তন সামাজিক সত্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৩২

২ তদেব

হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য শিক্ষা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে সে সমাজ নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”[১] বলাবাহুল্য, পুরোহিতেরা ভারতবর্ষে সে চেষ্টা অতি অল্পই করেছেন। স্বামীজীর রচনাবলীতে তাই পুরোহিতদের উদ্দেশে নির্মমতম ভর্ৎসনা বারংবার উচ্চারিত। সমকালীন ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সুবিধাবাদের দোহাই দেওয়ার বিপক্ষে তাঁর এই সাবধানবাণীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

পুরোহিত-শক্তির পরে স্বামীজী ক্ষত্রিয়শক্তির দোষগুণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, স্বামীজী নিজেকে কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় বলে গৌরববোধ করতেন। ভারতের চিরন্তন আদর্শ ‘ব্রাহ্মণ’ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আপন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিত্বে। এক হিসাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রিয় শক্তির মিলনের প্রতীক নয় কি?

পশ্চাত্য সাহিত্যে যাকে Age of Heroes বলা হয়, স্বামীজীর “ক্ষত্রিয় যুগ” অনেকটা সে-জাতীয়। সভ্যতার উন্নয়নের যুগ এই ক্ষত্রিয় নরপতিদের আধিপত্যকাল। গ্রামীণ সভ্যতা এই যুগে নগরমুখী। রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও অন্যান্য বিদ্যার বহুমুখী বিকাশ এই যুগেই দেখা দেয়। সমাজমানসকে বাল্য কৈশোর অবস্থা থেকে যৌবনে উপনীত করে এই রাজতন্ত্র। কিন্তু এই রাজতন্ত্রেই প্রজার অধিকার সবচেয়ে সঙ্কুচিত।

ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় নৃপতিদের আদর্শ অবশ্য অন্যান্য দেশের রাজতন্ত্রের চেয়ে আলাদা। এ দেশের অনেক রাজর্ষিই একাধারে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৫

বীর ও দার্শনিক। প্লেটোর 'Philosopher King' (দার্শনিক নৃপতি) এর আদর্শ এদেশেই বোধ করি সবচেয়ে সার্থকতা পেয়েছে। যাঁরা ঠিক এ-জাতীয় ন'ন, তাঁরাও অনেকেই রাজত্বের শেষভাগে স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থ ও পরে সন্ন্যাস নিয়ে দর্শন ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। "ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা—উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত।"[১] কোম্‌ত্‌ পৌরাণিক যুগের পরবর্তী দার্শনিক যুগের কথা বলেছেন। একদিক থেকে স্বামীজীর "ক্ষত্রিয়যুগ" সেই দার্শনিক যুগ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজকুলকাহিনীতে ভারতীয় নৃপতিদের মতো বৈরাগ্যের নিদর্শন মেলে না, এ আদর্শ বিশেষভাবে ভারতীয় জীবনদর্শনের সৃষ্টি। ভারতীয় চতুরাশ্রমে জীবনের পূর্ণতাসাধনের চরম অভিব্যক্তিরূপে সন্ন্যাসের আদর্শ। বুদ্ধদেবের প্রভাবে পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাস জীবনের সর্বক্ষণের আদর্শেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু, মানবমনস্তত্ত্বসম্মত জীবনশিল্পের বিচারে ভারতীয় চতুরাশ্রমের (ব্রাহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস) আদর্শই যে সাধারণ মানুষের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাজশক্তির প্রাধান্যের সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতেরা প্রায় সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মের ইতিহাসেও রোমের পোপ ও য়ুরোপের রাজশক্তির দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গ এ দিক থেকে স্মরণীয়। বৌদ্ধ বা মুসলমান যুগে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই পুরোহিতেরা সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছে।

অপরপক্ষে রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাসাধারণও চিরকালের মতো

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ২৩৬

নির্বিবাদে প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারবে না। স্বামীজীর বক্তব্য—"'প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশক্তি কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এযুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"[১]

সুতরাং প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে শাসক ও শাসিতের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় জাগরণ এবং ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ—এ সব ঘটনাই অল্পবিস্তর সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতীক।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই সংগ্রামচেতনার কথা স্মরণ করেই কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স্ ১৮৪৮-এ প্রকাশিত Manifesto of the Communist Party (কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তাহার) পুস্তিকায় ঘোষণা করেছিলেন—'A spectre is haunting Europe—the spectre of Communisum.' (সারা য়ুরোপে আজ এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে—কম্যুনিজ্‌মের ধূমকেতু।)[২] প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীসংগ্রামের নজির দেখিয়ে আধুনিককালে সে সংগ্রাম যে বুর্জোয়া ও প্রোলিতারিয়েতের (শোষক ও সর্বহারা শ্রেণীর) সংগ্রামে পরিণত সেকথা এ-গ্রন্থে ঘোষিত। আধুনিকতম সাম্যবাদী আন্দোলনের মূলভিত্তি এই পুস্তিকায়ই স্থাপিত। (সর্বহারাদের একনায়কত্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্স্ করেছিলেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের এ মন্তব্য তুলনীয়—"...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...।"[৩])

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৭

২ Marx Engels : Selected works : Vol I : Moscow : 1958

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪১

ইংরেজী সাহিত্যে মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের এ ইস্তাহার অনূদিত হয় ১৮৫০ সালে অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মকালের এগারো বৎসর আগে। সমকালীন য়ুরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে প্রখরভাবে সচেতন বিবেকানন্দ কিন্তু কোথাও মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের নাম করেন নি। কিন্তু তাঁদের এই রচনাটি বা অন্য কোনো রচনা বা তাঁদের মতবাদের কথা—কিছু না কিছু তাঁর পক্ষে জানা থাকাই স্বাভাবিক। (কিন্তু মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের মতো শ্রেণীসংগ্রামের সরলীকরণ স্বামীজী করেন নি। বরং একথাই মনে হয় যে শূদ্রের আধিপত্যসত্ত্বেও সমাজ-গঠনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন এবং এদের ইতিমূলক দিকটির সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতার পরিকল্পনা করেছেন। মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ যে শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তা যেমন আদর্শবাদী কল্পনা, বিবেকানন্দের কল্পনাটিও সেই জাতীয় কল্পনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে স্বামীজী যে ভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সেদিক থেকে মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের জড়বাদভিত্তিক চিন্তাধারা মূলতঃ সমর্থনযোগ্য নয়।(মার্ক্সের নিজস্ব বক্তব্য আংশিকভাবে উদ্ধৃত করে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

নীতি, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতির ধারণা যে মূলতঃ অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, সেকথা বোঝাতে গিয়ে মার্ক্স্ লিখেছেন—"The phantoms formed in the human brain are also, necessarily, sublimates of their material life-process, which is empirically verifiable and bound to material premises. Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development; but men, developing their material production and their matcrial intercourse, alter, along with

their real existence, their thinking and the products of their thinking. Life is not determined by consciousness, but consciousness by life."[১])

মার্ক্‌স্‌ মানবচৈতন্যকে যে স্তর থেকে দেখেছেন, বিবেকানন্দ তার চেয়ে লক্ষগুণ গভীরে অধ্যাত্মসত্যের আলোকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বাস্তবজীবনক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেকানন্দ ও মার্ক্‌সের চিন্তাধারায় মিলটুকুও লক্ষণীয়। পৃথিবীর ইতিহাস যে শাসক ও শোষিতের চিরসংগ্রামকাহিনী সেকথা দু'জনেই স্বীকার করেন এবং শ্রমজীবী সভ্যতার আসন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে দু'জনেই নিশ্চিন্ত। তবু বলবো—তুলনামূলক বিচারে 'এহ বাহ্য।'

ভারতের ইতিহাস-বিশ্লেষণকারী বিবেকানন্দ লিখেছেন—"ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভাবতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে রাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"[২] তুলনামূলকভাবে য়ুরোপে খৃষ্টধর্মের বিস্তারও এই কারণে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের ত্যাগ, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতার চেয়ে গ্রীক মানবিকতাই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণধর্ম।

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের স্তরে স্তরে পূর্বগামীদের চিন্তা ও আচরণের দৈন্য পরবর্তীদের দ্বারা সংশোধিত। শাস্ত্রশাসিত যুক্তিবিহীন মানসিকতার বিরুদ্ধে একদা জড়বাদী চার্বাকপন্থীরা এগিয়ে এসেছিলেন। জৈন এবং বৌদ্ধদের অহিংসা ও জাতিভেদবিরোধী মনোভাব হিন্দুধর্মের বহুল পরিবর্তন সাধন করেছে। আবার বৌদ্ধ অবক্ষয়ের যুগে এসেছে শঙ্কর ও রামানুজের মতো জ্ঞান ও ভক্তির ধারণীশক্তি। কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ—

১ The German Ideology

২ বাণী ও রচনা : পৃঃ ২৩৭

এঁরা সকলেই মূল ভারতীয় চিন্তাধারার বিস্তার ও সংরক্ষণে সহায়ক। কিন্তু ধর্মান্দোলনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও জীবন-জিজ্ঞাসার রূপায়ণে ভারতের বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লব ভারতবর্ষের এতকালের পন্থা ছিল না। আধুনিক যুগের কর্মপন্থায় এই ধর্মচেতনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বলা যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় ভারতের সেই সনাতন ও অদ্যতন সমস্যার মিলিত উত্তর। মানবজীবনের বিকাশের স্তরে অর্থনীতির নিজস্ব প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়, "টাকায় মানুষ করে না। মানুষেই টাকা করে।" আর সে মনুষ্যত্বের অর্থ আত্মোপলব্ধির শক্তিসম্পন্ন মানুষ। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মানদণ্ডে পরমসত্যের মূল্যায়নপ্রচেষ্টা শেষ অবধি সীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য। মার্ক্স্ যে 'বাস্তব' মানুষকে তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, সে মানুষ অধ্যাত্মসংকেতরূপে বিবেকানন্দের কাছে 'নরনারায়ণ'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞরূপে তাঁর কাছে ঈশ্বরই প্রতীয়মান। বলা বাহুল্য, ভারতীয় চেতনার পক্ষে এ আদর্শই ঐতিহ্যসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

মার্ক্স্ যে শ্রেণীহীন সমাজ বা আদর্শ সাম্যবাদী সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অন্ততঃ সাম্যবাদী দেশগুলিতে পূর্ণ সত্য নয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেদেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধানের প্রাচীর সযত্নে রক্ষা করেন। পুরানো বুর্জোয়ার জায়গা নেন বিশেষদলের ছোট বড় দলপতিরা।

অপরপক্ষে বিবেকানন্দ মনে করতেন বিভিন্ন শ্রেণী চিরকালই রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সদ্‌গুণগুলির সমন্বয়ে এক নূতন আদর্শসমাজ করে তুলতে হবে। সুতরাং জগতের ইতিহাসে যতই বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাম কাহিনী থাকুক না কেন, বিবেকানন্দর লক্ষ্য সমন্বয়।

* * *

বৈশ্য যুগের বিশদ আলোচনায় আসবার আগে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি।"[১] "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।"[২]

বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ও রাজশক্তিকে অর্থবলে নিয়ন্ত্রিত করতে বণিকেরা সদাসচেষ্ট—এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবীদের শোষণ করে চির-পদদলিত রাখা তাদের স্বার্থ। তবু বণিক-সভ্যতার গুণের দিক হলো বিশ্বমৈত্রীর প্রসার। "'বণিক কোন দেশে না যায়?' নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়।"[৩] এইভাবেই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, বিদ্যা ও সম্পদ বিশ্বময় বিস্তারিত হয়। ইংরেজ আমলের বৈশ্যযুগেই ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ।

সাধুভাষায় নিগূঢ় ব্যঙ্গসৃষ্টিতে স্বামীজীর দক্ষতার একটু নমুনা এই বৈশ্য মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যের মূলে বিদ্যা ও অস্ত্র। তার পরের যুগে এলো বৈশ্যের দল, তাদের বক্তব্য—'...অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা-সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ—তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান

১, ২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৩৮

৩ তদেব: পৃঃ ২৪০

করিবে কে? আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"[১]

ভবিষ্যতে এই শূদ্রেরাই যে পৃথিবী পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হয়েই পরবর্তী আলোচনায় শূদ্রজাগরণ-প্রসঙ্গে উপনীত। শূদ্রযুগের বিশ্লেষণে স্বামীজী কয়েকটি মৌলিক চিন্তাসূত্র তুলে ধরেছেন—

(ক) ইংরেজ-অধীনে ভারতবর্ষে আত্মনির্ভরতাহীন ভারতবাসী মাত্রই শূদ্র।

(খ) য়ুরোপে শূদ্রজাতির জাগরণের অন্তরায় বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন শূদ্র বা শ্রমিক কৃষক সহজেই অভিজাত সমাজে উন্নীত হয়ে নিজের সমাজ ত্যাগ করে।

ভারতেও একদা বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম বা ধীবরজননীর পুত্র ব্যাস এঁরা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়ে নিজের সমাজ ত্যাগ করেছিলেন।

(গ) আধুনিক ভারতবর্ষে জন্মগত জাতিভেদের ফলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা নিজের সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে শূদ্র-জাগরণে সহায়তা হয়।

(ঘ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মতো বৈশ্যেরাও সমাজের সম্পদ পুঞ্জীভূত করে শূদ্র বা শ্রমিকদের অধিকার হরণে উদ্যত। "এই স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"[২]

(ঙ) স্বার্থরক্ষার জন্যই অন্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আবার আপন স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি বিদ্বেষও পৃথিবীর ইতিহাসে নানাদেশের উন্নতির কারণ। গ্রীস, রোম, আরব, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি সবদেশেরই আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান, কার্থেজ,

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৯

২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৩

কাফের, মূর, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ তাদের উন্নতি ও সংহতির মূলে।

এক্ষেত্রে জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণীবিদ্বেষ—এ দুয়েরই বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী স্বীকার করেছেন। তাই শূদ্রপ্রসঙ্গে শ্রমিক ও ধনপতিদের লড়াই এবং শূদ্র ভারতের সঙ্গে বৈশ্য ইংরেজের লড়াই এই দুই লড়াইয়েরই ব্যঞ্জনা স্বামীজীর বক্তব্যে পরিস্ফুট।

ইংরেজের সঙ্গে এই সংঘাতমূলক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বঙ্কিমও তাঁর বিখ্যাত "জাতিবৈর" নিবন্ধে লিখেছিলেন—"....আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে।...বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"[১]

(চ) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির পদানত হওয়ার চেয়ে প্রজাতন্ত্র-নিয়মিত রাজশক্তির পরাধীনতা আরো দুর্বহ। তুলনীয় রোমান সম্রাটদের অধীন জাতিদের অবস্থা ও ভারতের অবস্থা।[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজশাসন আত্মগৌরবঘোষণায় ব্যস্ত, সেইসঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরে হীনমন্যতা সঞ্চারে সচেষ্ট। বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন এই বৃথা গৌরব-ঘোষণায় ইংরেজ শাসনের বিশেষ কোনো সহায়তা হবে না। বরং ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে অগ্রসর হলেই ইংল্যাণ্ডেরও কল্যাণ।

বলা বাহুল্য, অর্থগূঢ় সংস্কৃতপ্রধান এই গদ্যরীতির আবরণ ভেদ করে জাতিবৈর ও শ্রেণীবৈরের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা সেকালের শাসক সম্প্রদায়ের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না। 'বর্তমান ভারতে'

১ বঙ্কিমরচনাবলী (২য়): সাহিত্যসংসদ সংস্করণ: পৃঃ ৮৮৪-৮৫

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৪৫

স্বামীজী যে কেবল ভারত-ইতিহাসের মননমূলক চর্চাই করেছেন তা নয়, প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আসন্ন বৈশ্য-শূদ্র-সংঘাতের কথাও ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু মার্ক্স্‌বাদী চিন্তাধারায় যে চিরন্তন বিপ্লবের (Permanent Revolution) কথা রয়েছে, সে-জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত স্বামীজীর রচনায় পাই না। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে তাঁর বৈদান্তিক মননজাত বিশেষ অধিকারবর্জনের আদর্শের তুলনা চলে—এই মাত্র।[১]

'বর্তমান ভারতে'র শেষ পর্যায়ে এসে সমকালীন ভারতবাসীর মানসিক দ্বন্দ্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পুনর্বিচারে জাতিকে আহ্বান করেছেন। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে 'স্বদেশমন্ত্রে'র মর্যাদা লাভ করেছিল। 'হে ভারত! ভুলিও না'—শীর্ষক এই গদ্য অনুভূতির আগ্নেয় উত্তাপে এমন এক মহামন্ত্রধ্বনি-সৌন্দর্য লাভ করেছে যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব আজ অতক্রান্ত। যথার্থ স্বাধীনতার যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর আজও অপেক্ষিত, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক থেকে স্বামীজীর ওই স্বদেশমন্ত্র অনুধ্যানের সার্থকতা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য'-সম্ভাবনার কথা স্বামীজী নিশ্চিত জানতেন। ইতিহাসদ্রষ্টার সেই ক্রান্তদর্শী মন্তব্য এদেশে ও বিদেশে নানাভাবে সত্য হতে চলেছে। কিন্তু স্বামীজী বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রেই এদেশে নিষ্ফল হইবে।' সেকথা একালের রাজনৈতিক

১ এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের 'বিবেকানন্দের সমাজদর্শন' গ্রন্থ এবং 'বিবেকানন্দ শিলাস্মারক গ্রন্থে' প্রকাশিত লেখিকার 'ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ'—শীর্ষক মূল্যবান আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দলগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয় কি? এ প্রশ্নও আজকের দিনে স্বাভাবিক যে, যে শ্রমজীবীদের যুগ আমরা আজ স্থাপন করতে চাই, তা কেবলমাত্র রাশিয়া, চীন বা অন্য কোনো দেশের বিপ্লবের অনুকরণে হবে, না ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণধর্মই স্বাভাবিক বিকাশে এই শ্রম-কেন্দ্রিক সভ্যতাকে সফল করে তুলবে? স্বামীজী তো বলেছেন—'এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম'।

কিন্তু গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী পাশ্চাত্যের কোনো দেশই ধর্মকে এতটা প্রাধান্য দেয় নি, বরং সমাজতন্ত্রী দেশের চিন্তাধারায় ধর্ম অনেকটা আফিমের নেশার মতো পরিত্যাজ্য। 'ধর্ম' শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের মনে স্বভাবতই সংশয় দেখা দেয়। "মানব অন্তরের নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশসাধনই ধর্ম"—স্বামীজীর এই সংজ্ঞা জড়বাদী সভ্যতার কাছে স্বীকৃত নয়।

স্বামীজী তাঁর জীবনব্যাপী ভারত-সাধনায় উপনিষদ থেকে ধর্মের প্রধান প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন 'অভীঃ'-মন্ত্র। তাই মানব-জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তিনি ধর্মের প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন—"Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave, but……must come out to work at the Bar and the Bench, in the Pulpit, and in the cottage of the poorman, with the fishermen that are catching fish, and with the students that are studying."[১]

বেদান্তের তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না, তাকে বাস্তবজীবনে কার্যকরী রূপ নিয়ে দেখা দিতে হবে বিচারালয়ে, উপাসনাগারে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, মৎস্যজীবীর জাল ফেলায়, ছাত্রের অধ্যয়নে।" স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ উপাস্য 'above all God the poor in all races'—সব 'জাতির দরিদ্রতমদের মধ্যে রয়েছেন যে নারায়ণ। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসী— "…This Vedanta can

১ Lectures from Colombo to Almora : 5th Ed. : p 160

be carried into over everyday life, the city life, the country life, the national life and the home life of every nation."[১] "আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গ্রামীণ, নাগরিক, জাতীয় জীবনে, এমন কি প্রত্যেক জাতির ঘরে ঘরে এই বেদান্তের আদর্শ রূপায়িত করা যায়।"[২]

স্বামীজীর চিন্তাধারা অনুসরণে বলা যায় প্রেম, শান্তি ও সৌভ্রাত্র্য যদি রাজনীতির লক্ষ্য হয়ে থাকে, ধর্মেরও কি সেই একই লক্ষ্য নয়? আসলে 'রাজনীতির নামে আমরা কি 'ধর্মনীতি'র কথাই বলি না? স্বামীজীর ধর্মচেতনা মানুষের নিবিড় আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধনে। এই ধর্মবোধ শুধু ভারতের নয়, জগতের কল্যাণে অবশ্য প্রযোজ্য। যে ধর্ম শাস্ত্র বা মহাপুরুষের নামাবলী ধারণ করে অর্থ, সম্পদ বা শোষণে মগ্ন তা কোনোকালেই ধর্ম নয়। ধর্মের বিকৃতিই আফিম হতে পারে, কিন্তু যে ধর্মের আহ্বানে বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের মতো সর্বত্যাগী অথচ বিশ্বপ্রেমিক মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে, সে ধর্ম মানবচৈতন্যের সমস্ত শুভপ্রয়াসের প্রেরণাদাতা। ধর্ম যদি আফিম হয়ে থাকে, তবে অবস্থাভেদে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—এ সবই আফিম হয়ে উঠতে পারে। যা কিছু আমাদের সত্যদৃষ্টির নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে তাই আফিম। ভাষান্তরে স্বামীজী আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন অন্ধ পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের আফিম সম্বন্ধে।

'বর্তমান ভারতে'র শেষ স্তবকটিতে স্বামীজী ঘুরে ফিরে 'ভুলিও না' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি কি অনুমান করেছিলেন যে, একদিন ভারতবর্ষ ঠিক ওই কথাগুলিই ভুলতে বসবে? আশ্চর্য নয়! আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও আবার যে দ্বিগুণ বেগে পাশ্চাত্যের অশন, বসন, সাহিত্য, শিল্প, 'হাঁচি ও কাশি' অনুকরণ

১ Practical Vedanta : 3rd ed : pp 12-13

২ এ প্রসঙ্গে 'বিশ্ববিবেক' দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মূল্যবান প্রবন্ধ 'বিবেকানন্দের বেদান্ত' দ্রষ্টব্য

করে সভ্যতার ধ্বজাধারী হতে চাইবো--এ হয়তো তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল !

প্রথম চৌধুরী তাঁর 'নানা চর্চা' বইটিতে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন—"বর্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ছোপ লাগবার কোন সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা একথা ইউরোপের কানে ঢুকবে না। বর্তমান ইউরোপের মেটেরিয়ালিজম্ই নবীন এশিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ মেটেরিয়ালিজ্‌ম্ দার্শনিক মেটেরিয়ালিজ্‌ম্ নয়, ব্যবহারিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্।" বাস্তবিক পাশ্চাত্যসভ্যতার ব্যবহারিক দিকটি আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। ফলে আমরা জড়বাদী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার কথা সহজেই ভুলে যাই। অবশ্য ভারতীয় বৈরাগ্যধর্মের আদর্শ যে য়ুরোপকে একেবারেই স্পর্শ করে নি একথা বলা যায় না। কিন্তু সে তুলনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রাধান্য ভারতে অনেক বেশী।

'ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ'—স্বামীজীর এই সাবধানবাণী-প্রসঙ্গে এ যুগের নারীপ্রগতির কথা সহজেই মনে জাগবে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় নারীর যে সমানধর্মা হবার আকাঙ্ক্ষা তা ভারতীয় নারীজীবনে একহিসাবে বেশী পরিমাণেই সফল হয়েছে। তবু জায়া ও জননীরূপে যে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর নামোচ্চারণে স্বামীজী প্রকাশ করেছেন—সব দেশের নারীসমাজেই তা আকাঙ্ক্ষিত। এদিক থেকে সাধারণভাবে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা কতদূর অগ্রসর তা সন্দেহের বিষয়। বরং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীজীবনের নিষ্ঠা ও শুচিতার মহিমা বেশী বলেই আমাদের ধারণা। দাম্পত্যজীবনের যে একনিষ্ঠ অতন্দ্র সাধনা তার দ্বারাই ভবিষ্যৎ সন্তানের মাধ্যমে যে মঙ্গলময় সমাজসৃষ্টি সম্ভব—একথা ভারতবর্ষের যুগযুগবন্দিতা ওই নারীত্রয়ের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত। তবু প্রশ্ন এই—আমরা কি সে আদর্শে অবিচল থাকতে পেরেছি ?

'উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'—ভারতের আদর্শ গৃহী ও

আদর্শ সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি সর্বত্যাগী। যাঁরা সর্বমানবের অন্ন-বস্ত্রের অধিকারগত সাম্যের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেন তাঁদের ত্যাগ যেমন মহিমান্বিত, তেমনি আবার যাঁরা মানবচিন্তার সর্বোচ্চসত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেন তাঁদের ত্যাগও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী। স্বামীজীই তো ভারতের একটি কুকুর পর্যন্ত যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন মুক্তির সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও বিসর্জন দিয়েছিলেন। দুরারোগ্য কর্কটরোগে মৃত্যুশয্যায় শয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ মানবের অধ্যাত্ম-কল্যাণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অমৃতবাণী বিতরণ করে তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে গেছেন।

বিবাহ, ধনসম্পদ, ইন্দ্রিয়সুখ—আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান ভারতবর্ষে এ সবই প্রধানতঃ আত্মসর্বস্বতার প্রয়োজনে। এককালের ভারতবর্ষ সমাজকেন্দ্রিক ছিল, সে সমাজের ভঙ্গুরদশায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিমান ও যন্ত্রণা—দুইই সমাজের চারিদিকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত সামাজিক নিপীড়ন আর উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তার যথেচ্ছাচার—এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো পন্থা নিশ্চয় আজ আমাদের প্রয়োজন। স্বামীজীর ভাষায় "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের শিক্ষক।" ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই চাই পরিমিত ইন্দ্রিয়চর্চা। আবার ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের জন্য চাই ইন্দ্রিয়মগ্নতার অবসান।

ভারতের লক্ষ্য ছিল পরমসত্যের অভিমুখী। তাই জীবনযাপনকে আমরা উপায় বলে জেনেছি। এখনো উদ্দেশ্য বলে মনে করি নি। বিবাহের প্রয়োজন তাই কল্যাণের আবির্ভাব কামনায়। কুমার-সম্ভবের পটভূমিকায় গৌরীর তপস্যা। ভারতের আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রেমিক উমানাথ শঙ্কর তাই সর্বস্বত্যাগী। সংসার বা সন্ন্যাস—কিছুই এ ভারতে বৈরাগ্যের বাইরে নয়। অর্থ, পদ, দেহসুখ—এদের যে দাস হয়েছে সত্য তার কাছে স্বতঃই আবৃত। সে আবরণ যতই হিরণ্ময় হোক, তাকে অপাবৃত না করে আমাদের মুক্তি নেই।

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"—স্বামীজীর এই নির্দেশবাণী-ই কি শত শত বিপ্লবীর অন্তরে সেযুগে প্রেরণার আগুন

জ্বালিয়ে তোলে নি? কিন্তু এ আহ্বান শুধু স্বদেশজননীর উদ্দেশে আত্মদানের আহ্বানই নয়, পরমসত্যের জন্য আমরা যে সবাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হয়ে চলেছি—এ শুধু সেই কথাটি আমাদের অন্তরে ধ্বনিত করে দেওয়া। মহাবলি ছাড়া মহাপূজা সম্পন্ন হয় না। তাই জীবনের চরম উত্তর লাভের জন্য আমরা বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়েই আত্মোৎসর্গের জন্য নির্বাচিত। অর্থাৎ বলিপ্রদত্ত। "জীবনের যতো মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ীমূর্ত্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করি নি?"[১]

'নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর'—তারা যে আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাই—একথা যে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন তিনি কোনো সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক প্রবক্তা বা উচ্চমঞ্চের দেশনেতা নন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলেই সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পেরেছেন এবং আসমুদ্র হিমাচল পদব্রজে পরিক্রমান্তে রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্যন্ত ভারতের সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছেন। শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁরাও সাম্যবাদী সমাজে নেতা বা পরিচালকগোষ্ঠীর ভূমিকায় এসে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ মানুষের সর্বপ্রকার privilege বা বিশেষ অধিকারভোগের বিরোধী। আর একথাও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হওয়ার দিন সমাগত।

দরিদ্রনারায়ণের পূজারী বিবেকানন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ কী ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি নিয়ে ছবির মতো প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেকথা ভারত-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে প্রমাণিত হতে চলেছে। আজ আর এ বিষয়ে কোনো সংশয়েরই কারণ নেই যে, আসন্ন নেতৃত্বের জন্য, নূতন ভারত

---

১ Kali the Vision of Shiva : Kali, the Mother . Sister Nivedita [অনুবাদ : লেখককৃত]

সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শ্রমিক ও কৃষকের অভ্যুত্থান। কিন্তু শ্রমের সার্থকতা কোনখানে? জীবনের লক্ষ্য কোন পথে? অন্নবস্ত্র শিক্ষার সাম্য শেষ অবধি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করবে কোন আত্মিক অধিকারে? একদিকে স্বামীজী আমাদের মনে রাখতে বলেছেন—'তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র'—জীবের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যের প্রতিফলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, আর একদিকে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত নব ভারতের মন্ত্রবাণী—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে!' 'গুরুজীর জয় হোক!'

শিখ খালসা সৈনিকের ঐ উৎসাহবাণী ও রণসঙ্কেত তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শেরই বিজয়বার্তা। ভারতের নবযুগে সাধারণ মানুষের নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগ, কর্মকুশলতা, নেতৃত্বের সঙ্গে প্রয়োজন ঐ আধ্যাত্মিক চরিত্রশক্তিতে অটলপ্রতিষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ভগবান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।' সে ভগবান বা ব্রহ্মতত্ত্বকে বিবেকানন্দ ছাত্রের অধ্যয়নে, শ্রমিকের কর্মপ্রেরণায়, গৃহীর সংসারসাধনায়, যোগীর গুহানিহিত ধ্যান-তন্ময়তায় সর্বত্র সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাত্মলক্ষ্যহীন সাম্যবাদী প্রেরণার অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত রূপ দেশে বিদেশে আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। বিবেকানন্দর ভারতবর্ষ তার দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ সব শ্রেণীর মানুষকে মহত্তম সত্যের আলোকে অভিষিক্ত করে এই বাণীই ঘোষণা করবে—'ওয়াহ্ গুরু কী ফতে'।

ভ্রমণকথা ঃ পরিব্রাজক

'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের মাস দুয়েক পরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা-য়ুরোপ-পরিক্রমারত। মনপ্রাণ পড়ে আছে ভারতের কর্মপদ্ধতির উপর—নানাজনকে নানা ভার দিয়ে এসেছেন—তার মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদা) মহারাজের উপর 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায়িত্ব। পত্রযোগে বাংলা ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকা-সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ আসে। এইকালের তেমনি এক নির্দেশ—"সারদা বলে, কাগজ চলে না।···আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise (বিজ্ঞাপন) ক'রে ছাপাক দিকি গড গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচাযিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!"[১]

নিজের রচনাশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকলে এ জাতীয় নির্দেশ কেউ দিতে পারেন না। 'বর্তমান ভারতে'র দুরূহ ভাষা ও চিন্তনের খুব কাছাকাছি সৌন্দর্যতন্ময় কবিহৃদয়ের স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা নিয়ে দেখা দিল স্বামীজীর 'বিলাতযাত্রীর পত্র'—পরে যা 'পরিব্রাজক' নামে রূপান্তরিত। মূলতঃ পত্রাকারে রচিত হলেও বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে পরিক্রমারত বিবেকানন্দমানস কীভাবে সমকালীন জগৎ ও জীবনের মর্মপরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে,

১ 'উদ্বোধনে'র আর্থিক সমস্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী এই পত্রে আরো লিখছেন—"যাহোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। টাকাকড়ি বিদ্যাবুদ্ধি, সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আনব। আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?···একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার ······ক্ষমতা কারুর নাই—সব থামকা মহাপুরুষ।···আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা একরকম চলছে।" বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৬১: ১০ই আগস্ট, ১৮৯৯ তারিখে লেখা চিঠি।

তার অভিনব দৃষ্টান্ত এই 'পরিব্রাজক' সমকালীন পাঠকসমাজে কতখানি বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথমবারের বিদেশযাত্রায় যে নবীন উৎসাহে পাশ্চাত্যসভ্যতার বিপুল কর্মবেগ স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল, দ্বিতীয়বারের যাত্রায় সে মুগ্ধতা কেটে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের প্রশান্ত মনন প্রাধান্য পেয়েছে। পাশ্চাত্যের সহস্র গুণের প্রশংসাসত্ত্বেও ভারতীয় আদর্শের মানদণ্ডে এখন বিশ্বসভ্যতার সার্থকতাবিচার।

পরিব্রাজকের পূর্বনাম 'বিলাতযাত্রীর পত্র'। নামটি সাধারণ হলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপযোগী ছিল। 'পরিব্রাজক' নামকরণের সঙ্গে যে ভারতভ্রমণরত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দণ্ডধারী মূর্তি আমাদের কল্পনালোকে দেখা দেয়, তার সঙ্গে জাহাজযোগে ভ্রমণকারী বিলিতি পোষাকপরা বিবেকানন্দের বাহ্যতঃ কোনো মিল নেই। কিন্তু গ্রন্থারম্ভেই সন্ন্যাসীর ভক্তি ও বৈরাগ্যমণ্ডিত হৃদয়টি প্রকাশিত—"স্বামীজী! ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত কোরে নিও ভায়া।" এর একটু পরেই লিখেছেন—"রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্ণিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কি না আবল তাবল বকচি। ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে। এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।"

বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজাত নিরাসক্তি এখানে সূক্ষ্ম হাস্যরসের আভাসে পরিস্ফুট। এই নিরাসক্ত দৃষ্টি 'পরিব্রাজকে'র সর্বত্র জীবনের পরিহাসদীপ্ত মণি-মাণিক্য অনুসন্ধান করে ফিরেছে। তবু প্রাণের গভীরে রয়েছে ভারতসংস্কৃতির যুগযুগান্তবাহী অধ্যাত্মচেতনার ঐতিহ্য —'সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গাবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ':—তাই পরিব্রাজক ভারতের সাধনার বাণী বহন করে চলেছেন; আর দেশবাসীর উদ্দেশে জগতের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ সরলতম ভাষায় বিতরণ করেছেন। হুগলী নদীতে চড়া পড়ার ইতিহাস, জাহাজ-শিল্পের ক্রমবিবর্তন, সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম, এডেনের

ইতিবৃত্ত, আরব ও মিশরীসভ্যতার কাহিনী, নৃতাত্ত্বিক আলোচনা, প্রাচীন দক্ষিণ ভারত (পণ্ট) ও মিশরের সম্ভাব্য যোগাযোগ, বাবিল সভ্যতা, ইহুদীধর্ম ও বাইবেল, যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণ বর্ণনায় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে এই জ্ঞানভিক্ষুর সজীব আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়, আধুনিক কালের পণ্ডিতমণ্ডলী সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য আলোচনায় এই সহজ ভঙ্গীটি গ্রহণ করলে বাংলা সাহিত্য কতো সমৃদ্ধ হতে পারে।

বিবেকানন্দমনীষাপ্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো তাঁর স্নাতকপর্ব (বি. এ.) অবধি। কিন্তু সমস্ত জীবনই তিনি নানা বিষয়কজ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল। বক্তৃতা ও সেবাধর্মের সহস্র ব্যস্ততা সত্ত্বেও যখনই অবসর পেয়েছেন স্বামীজী তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারটি নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' অতি সহজকথায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের বিবরণ থাকায় এমন কথা মনে করার কারণ নেই যে বিষয়গুলিও জলবৎ। বরং যে কোনো একটি আলোচনার আনুপূর্বিক উপস্থাপনাটুকু অনুধাবন করলে দেখা যাবে বহুদিনের সঞ্চিত পঠন ও মননের সমাবেশেই এমন বিস্তৃত অথচ গভীর আলোচনাভঙ্গী সম্ভবপর।

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি—"আবার এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতদিন আগে থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেলখেকোজাত—শঙ্করাচার্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নিচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় ও-মধ্বসম্প্রদায়ের শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রাম সনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই—যখন উত্তর ভারতবাসী

'আল্লা হু আকবর, দীন দীন' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রীপুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়ণের এই জন্মভূমি। মাদ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের সুমের নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস'-তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার—অতি প্রাচীনকালে—করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার বিচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীর-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এতবড় বৈষ্ণবধর্ম—এও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হ'তে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী' এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত—সমস্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের অনুরাগ এদেশে যত প্রবল; তেমন আর কোথাও নাই।"[১]

পরিব্রাজকজীবনে স্বামীজী দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ-অঞ্চলের যুবকদের কাছেই আনুগত্য ও সমর্থন সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতার বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা যেমন ঐতিহাসিক দৃষ্টির ফল তেমনি দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমাকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও সঞ্চয়। উত্তরকালে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮৪-৮৫

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি আর্য ও তামিল (Aryans and Tamilians)[১] নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের ভারতে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাত সম্বন্ধে কাল্পনিক মতবাদের নিরসনই তাঁর লক্ষ্য। দ্রাবিড় সভ্যতার সর্বপ্রাচীন সূত্র তামিল সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর অখণ্ড ভারতচেতনার সার্থক নিদর্শন। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারত ও বিশ্বসভ্যতায় তামিলদের দান এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের অন্তরেতিহাসে তামিল সভ্যতার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা কতো সংহত আকারে কী বিপুল তথ্যরাশি ধারণ করে আছে, সেইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আজীবন জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী এই তাপসের পঠনরীতি সম্বন্ধে একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তখন মীরাটে। নানা যোগাযোগে তাঁর তপস্বী গুরুভাইদের মধ্যে আরো ছ'জন সেখানে এসে মিলেছেন। "স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন স্থানীয় পুস্তকাগার হইতে স্যার জন্ লাবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড লইয়া আসিতেন, এবং পরদিবসই ফেরৎ দিয়া বলিতেন যে, ঐ গ্রন্থ স্বামীজীর পড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারিক ইহা বিশ্বাস করিতেন না, এবং ভাবিতেন ইহা লোক-দেখানো পড়ার ভানমাত্র। ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীজী স্বয়ং একদিন পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগারিককে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সব কয়খানি বই-ই আয়ত্ত করেছি। আপনার সন্দেহ হলে আপনি যে কোন বই থেকে যে কোন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন।" তখন কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া এবং সমুচিত উত্তর পাইয়া গ্রন্থাগারিক বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্যের সীমা রহিল না—ইহাও কি সম্ভব? পরে অখণ্ডানন্দজী এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, এ আপনি কি করে করলেন?" তাহাতে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কখনও কোনো বই প্রতিটি শব্দ

---

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৭ ; বর্তমান লেখককৃত অনুবাদ।

ধরে পড়ি না। আমি গোটা এক একটা বাক্য ধরে পড়ি, এমন কি, একটা প্যারা ধরেও পড়ে যাই যেমন নাকি ছবির কলের সামনে একসঙ্গে একখানি বহু বর্ণের চিত্র ভেসে ওঠে।"[১] স্বামীজীর জীবনে এনসাইক্লোপিডিয়া পাঠের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনার নজির মেলে।

এই বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলে বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক এক চিত্রধারা স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সব গ্রন্থেই লক্ষণীয়। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তাঁর বিখ্যাত সিদ্ধান্ত 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—এই বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারের মূল কেন্দ্র। ভারতের আদর্শগত সমুচ্চমহিমার পাশাপাশি বর্তমান পতনের গভীরতার আলোচনা থেকে স্বামীজী কিন্তু নৈরাশ্য পোষণ করেন নি কখনো—বরং ভারতমহিমার অভ্যুদয় সম্বন্ধে তাঁর আস্থা প্রবলতর হয়েছে। একি শুধু পরাধীন জাতির মানস-প্রতিক্রিয়া অথবা অধ্যাত্মদিব্যদৃষ্টির অমোঘ সত্যলাভ—ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার উত্তর দেবে। আপাততঃ রাশিয়া ও চীনে গণজাগরণ সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা মনে রাখতে পারি।

* * *

ভ্রমণকাহিনীর কাছে পাঠকের দাবি লেখকের চোখে দেখা ও অদেখা জগতের সৌন্দর্য দর্শন। বিবেকানন্দের সৌন্দর্যদৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে "পরিব্রাজক" বিশেষভাবে স্মরণীয়। "মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফল খাওয়ার"[২] কথা বললেও বহুরূপে পরমসত্যের প্রকাশ যিনি দেখেছেন তাঁর দৃষ্টিতে এই বাংলার সজল শ্যামলিমা, নদী ও সমুদ্রের তরঙ্গিত শোভা, দেশ দেশান্তরের রূপ ও রীতি—এ সব কিছুই আপন স্পর্শ রেখে গেছে।

"হৃষীকেশের গঙ্গা"র "নির্মল নীলাভ"[৩] কান্তি বা "অনন্তশষ্প-শ্যামলা সহস্র স্রোতস্বিনীমাল্যধারিণী"[৪] বাংলার জলময়রূপ বা সবুজের হাজারো রকমারি ভেদের কথা "বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : ১ম খণ্ড : স্বামী গম্ভীরানন্দ : পৃঃ ২৯৬-৯৭

২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬০, ৬১-৬৪

স্বামী বিবেকানন্দ" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর সৌন্দর্য-চেতনার আরো একটি উদাহরণ আমরা মনে করতে পারি। যেমন ধরুন, স্বামীজীর জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ল তখন যেন জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী তাঁর পার্শ্ববর্তী কাউকেই বলছেন—"কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে!"[১]

সমুদ্রযাত্রায় রঙের পরিবর্তনের খেলা দেখে যাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, স্বামীজীর এ বর্ণনা তাঁদের কাছে যেমন পরিচিত ছবির অন্তরালে অপরিচিতের উন্মোচন বলে মনে হবে, তেমনি যাঁরা সমুদ্রে কখনো যান নি, তাঁরাও সমুদ্রের বিশাল আলোড়নের শব্দ ও বর্ণচ্ছটায় স্তম্ভিত হ'বেন।

রঙের নেশায় বিবেকানন্দের সৌন্দর্যচেতনা যে কী গভীরে ডুব দিয়েছে তার সেরা উদাহরণ গঙ্গাতীরে বঙ্গভূমির শ্যামলিমা বর্ণন-চ্ছলে স্বামীজী যখন লিখছেন—"বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি,—যে রঙের নেশার পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"[২] শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিটি এ নেশার স্পর্শ পেলে ধন্য মনে করবে।

শিল্পরসিক স্বামীজী যখন ফরাসি ও জার্মান শিল্পচেতনার তুলনা-

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৫

২ তদেব : পৃঃ ৬৪

মূলক ছবি আঁকছেন, তখনও তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয় মনটির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—"কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ।...ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর-দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা কঠিন।"[১]

ফরাসী শিল্পিমানস যেভাবে বাঙালী বিবেকানন্দকে আকর্ষণ করেছে, তাতে এ দুই জাতের মানস-সাধর্ম্যের কথা সহজেই মনে জাগবে। কিন্তু বিবেকানন্দের সৌন্দর্যচেতনার আধার তাঁর দৃপ্ত পৌরুষসমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাই জাতীয় জীবনে অতি নমনীয় সুকুমার-ভাবের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণে তিনি সিদ্ধহস্ত, অথচ দেশজ শিল্পের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। "বাঙ্গালা ভাষা" নামে তাঁর বিখ্যাত পত্রাংশটিতে ভাষাপ্রসঙ্গ থেকে শিল্পপ্রসঙ্গেও এই প্রাণচেতনার পরিচয়—"বাপরে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে,—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১২৬

ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম !! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম !···এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।”[১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র শেষাংশে য়ুরোপীয় চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেকালের অতিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্মা প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এদিক থেকে স্মরণীয়—“বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীদের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।”[২]

ছবি-আঁকায় স্বামীজীর হাত ছিল, এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ। স্বামীজীর চিত্রবিদ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা না পেলেও কথার ছবি আঁকায় স্বামীজীর দক্ষতার উদাহরণ তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র। তাছাড়া বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-পরিকল্পনায় অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শীলমোহরটিতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের প্রতীকস্বরূপ সর্পবেষ্টিত চিত্রটির কথা তো

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭

৩ তদেব : পৃঃ ২১৪-১৫

সুবিদিত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কল্পনায় ছাড়া এ জাতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা চিত্রাঙ্কনের কথা জাগতে পারে না। 'পরিব্রাজকে'র পরিশিষ্ট-অংশে গ্রীক শিল্পকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নোট রয়েছে—পরে বিস্তৃতাকারে লেখা হবে ভেবেছিলেন, তা কার্যকরী হয় নি। কিন্তু দেশ-বিদেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের নিদর্শনরূপে এই নোট উল্লেখযোগ্য।

* * *

'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' (প্রথম দিকে 'বিলাত যাত্রীর পত্র' নামে) 'উদ্বোধন' পত্রিকায় খুব কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে 'বর্তমান ভারত' শেষ হলেও 'পরিব্রাজক' তৃতীয় বর্ষের গোড়ায় অবধি প্রকাশিত হয়েছে। 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর ভাষায় 'ভটচাযিগিরি'—দুরূহ মননশীলতা যথেষ্ট রয়েছে, সে তুলনায় 'পরিব্রাজক' মুক্তমানসের বিশ্বভ্রমণকথা। আত্মোপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে আসীন বিবেকানন্দের মধ্যে কোলকাতার রঙ্গরসময় তরুণটি সবসময় নিহিত রয়েছে; অথবা উচ্চতম মননেরই আর এক দিক বোধ হয় সহজ প্রাণের আনন্দলীলা। 'ভাব্‌বার কথা'র রসরচনাগুচ্ছের মতো টিপ্পনীজাতীয় গল্প বা মন্তব্য পরিব্রাজকেরও নানা জায়গায় ছড়ানো। ভ্রমণকাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিবেগে এরা একান্ত স্বাভাবিক প্রকাশ এবং বিবেকানন্দের শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কৌতুকময় লেখনীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

পরিব্রাজকের সূচনা থেকেই আনন্দময় বিবেকানন্দের প্রাণোচ্ছল প্রকাশ—'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উদ্দেশে সম্বোধন—"স্বামীজী ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া।" ভারতীয় সন্ন্যাসী-জীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃষীকেশ-অঞ্চলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের পারস্পরিক সম্বোধনের রীতিটি মনে পড়বে। 'নমো'-র মো অংশটি সেখানে খুব টেনে উচ্চারিত। কখনও একাকী, কখনও গুরুভাইদের সঙ্গে পরিব্রাজক স্বামীজীর জীবনকাহিনীও এই সঙ্গে পাঠকমনে জাগবে—অন্ততঃ সম্পাদক ত্রিগুণাতীত নিশ্চয় মনে করেছিলেন।

"আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতাপত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা আরও 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। তুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, মোটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! 'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হ'ল না 'ক সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণি রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন।"[১] সমুদ্র-ভ্রমণের সূচনায় অনেকেরই সমুদ্রপীড়া (Sea-sickness) দেখা দেয়। ঘটনাচক্রে এই সমুদ্রপীড়াকে স্বামীজী কীভাবে কৌতুকের উপাদানে পরিণত করেছেন, 'পরিব্রাজকে'র হাস্য-রসসৃষ্টির তা অন্যতম সার্থক উদাহরণ—"জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া তুহাত দিয়ে মাথাটি ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।...যে তুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন' সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে!"[২]

কলকাতার গঙ্গা যে মাঝে মাঝে জলাভাবে শুকিয়ে যেত, সে-ইতিহাস-প্রসঙ্গে স্বামীজীর সকৌতুক মন্তব্য—"আর এক রিপোর্টে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৫৯

২ তদেব : পৃঃ ৬৬ ; তু-ভায়া—স্বামী তুরীয়ানন্দ।

পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।"[১]

গঙ্গার চড়ায় চোরাবালিতে আটকে নানা জাহাজের দুর্দশার কথা বলে ভালয় ভালয় গঙ্গা পার হয়ে আসার জন্য স্বামীজী মা-গঙ্গা'ক প্রণাম জানালেন। "তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার—কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই—খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্ছেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হ'ল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাক ঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটীতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হ'য়ো না। ভায়া যে গম্ভীর প্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।"[২]

সিংহলে বৌদ্ধমন্দিরে 'সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়' সে বিষয় নিয়ে আঁকা ছবিগুলির বীভৎসতাপ্রসঙ্গে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৭

২ তদেব : পৃঃ ৬৮-৬৯

—"এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায়?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা কর্তার কি দয়া!'"[১] হাস্যরসে এই জাতীয় চুটকি গল্পে স্বামীজীর যেমন কৃতিত্ব, তেমনি আবার দীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গপ্রিয়তা কী-জাতীয় কৌতুকরস সৃষ্টি করতে পারে তার উদাহরণ 'পরিব্রাজকে'র 'হাঙ্গর-শিকার' বর্ণনায়।[২] সমগ্র বর্ণনাটিতে এমন এক চলচ্চিত্রধর্মী প্রত্যক্ষতা আছে, যা ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পদ; সেই সঙ্গে আছে বিদগ্ধ মনের পরিহাসকুশলতা। স্থানসংক্ষেপের জন্য এ বর্ণনার সামান্য অংশমাত্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি।

সেরখানেক মাংস এক 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা[৩]-গোছের বড়শিতে গেঁথে সমুদ্রজলে হাঙরের উদ্দেশ্যে ফেলে দিয়ে যাত্রীরা সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষারত—"···আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে, ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হ'তে লাগলেন—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো।"[৪]

প্রথম 'বাঘা' হাঙরটি বড়শি ছিঁড়ে পালাবার পর মাংসখণ্ডের লোভে 'থ্যাব্‌ড়া'মুখো দ্বিতীয় হাঙ্গরের আগমনদৃশ্য—'আগে যান

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৮৯

২ তদেব: পৃঃ ১০০-১০৪

৩ তদেব পৃঃ ১০১

৪ তদেব পৃঃ ১০২

ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা'…শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্‌ড়া' ; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা, ও লোভ কি ছাড়া যায় ? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিকঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত কতদূর ছুটেছে, তা 'থ্যাব্‌ড়া'ই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য —সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়। আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!"[১]

প্রথম বাঘা হাঙর তার বড়শি-বেঁধা অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় থ্যাবড়ামুখো হাঙরকে কেন জানালো না সে সম্বন্ধে কৌতুককল্পনায় অনেকটা 'অ্যালিস্ ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'[২] জাতীয় কল্পনার আভাস— "আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান ক'রে দিত। নিশ্চিত ব'লত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড় গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম !! এই দেখ না— আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—ব'লে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন-বয়সসুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ বনৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে,

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৩

২ অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড—লুই ক্যারোলের এ বইটি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হবে, ততদিন সে ভাষা ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্ড়া'কে আসল খবর কিছু না ব'লে, মুচকে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' ব'লে সরে গেল।---'আমি একাই ঠকবো?'[১]

'বাঘা' চরিত্র সম্বন্ধে শেষ অনুমানটি মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি ও বঙ্কিম কটাক্ষের সংমিশ্রণে উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মিশ্রিত স্বাদে স্বামীজীর মন্তব্য-কণা 'পরিব্রাজকে'র সর্বত্র ছড়ানো থাকায় ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বিশ্ব-ইতিহাস-প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে সরসতা লাভ করেছে। যেমন ধরুন সিংহলের অধিবাসীদের বর্ণনা—"···ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা। আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলাদেশ থেকে এসেছিল তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন হোঁসেন করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে।"[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্যামির মোহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কেউই ব্যঙ্গকটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তবে স্বভাবতঃই স্বামীজীর ব্যঙ্গ আরো তীব্র। 'ভাব্বার কথা'র গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করে 'পরিব্রাজকে'র—'আর্যামি'-প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে—"এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১০২-১০৩

১ তদেব: পৃঃ ৮৮

আর্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ-কাঁচ্চা। তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল।"[১]

পাশ্চাত্যের বিশেষভাবে ইংরেজের অনুকরণে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পছন্দমতো যুক্তিবাদ এবং ভক্তিবাদের জগাখিচুড়ি করতে চাইতেন, তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—"তবে ঐ যে একদল আছে —পরের বেলা দোষটি দেখতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়'—তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওদের আবার মন! ছটাকও নয় আবার মণ! পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ করে যেগুলো সাহেব বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা করে কেঁদেই অস্থির!!"[২]

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি নিজস্ব অনন্য ভূমিকা রয়েছে—সাধারণতঃ তাঁর দর্শনপ্রাজ্ঞ ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় সে পরিচয় আচ্ছন্ন। হাস্যরসে স্বামীজীর সহজাত নিপুণতা। তাঁর রচনায় কোনো ক্ষেত্রেই তা কষ্টকৃত বা বিকৃত রুচিসঞ্জাত নয়। অথচ প্রতিপক্ষের উদ্দেশে তাঁর ব্যঙ্গে যথেষ্ট তীব্রতা, তাঁর শ্লেষ হৃদয়বিদ্ধকারী। এও তাঁর সংগ্রামীসত্তারই আর এক দিক। নির্ভীকহৃদয় এই সন্ন্যাসী সত্য ও মঙ্গলের জন্য সব দুর্বলতা, কাপুরুষতা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৫

২ তদেব : পৃঃ ৯৬

ও হীনতার বিরুদ্ধে তাঁর খরখড়্গ ভাষার উজ্জ্বল হাস্যদ্যুতি বিকীর্ণ করেছেন—কোনো রকম ভাবের ঘরে চুরির সঙ্গে আপোস তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতে একটি বৈশিষ্ট্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেটি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অনিবার্য অমোঘ শক্তি। এই শক্তিই তাঁর বক্তব্যকে কেবল আলোচনার স্তরে না রেখে নিত্যকালের বাণী করে তুলেছে। এ-জাতীয় বাক্য বা স্তবকসৃষ্টিতে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার। যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উক্তি বা লেখন—

'যদি জন্মেছিস্ ত একটা দাগ রেখে যা।'

'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না।'

'Education in the manifestation of the perfection already in man.'

'Arise! Awake! and stop not till the goal is reached.'

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।'

'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটির কথা আগেই আলোচিত। সেখানে যে বাক্য-পরম্পরা স্বামীজীর ধ্যানের ভারতকে সমগ্র দেশ ও জাতির পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছে, বিবেকানন্দহৃদয়ের বহ্নিতাপে বিগলিত সেই বাক্যধারা এক বিপুল ছন্দোবেগে পাঠকহৃদয়কে অভিভূত করে। এর সঙ্গে তুলনীয় তিনটি স্তবক আমরা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে পাই, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতিহিসাবে যারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুয়েজখালে য়ুরোপ-প্রবেশের সময়ে যুগ যুগ ধরে ভারতের ধনসম্পদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির কথা স্বামীজীর মনে জেগেছে। "বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর ক'রত, তা অনেকে

জানে না।"[১] ভারতের ঐশ্বর্যের মূলে তো—"ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।"[২]

'বর্তমান ভারতে' আমরা দেখেছি বিবেকানন্দের ইতিহাসদৃষ্টি সাধারণ প্রজার জীবনধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগের উত্থানপতন বিশ্লেষণে রত। আসন্ন শূদ্রযুগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শ্রমজীবীদের উদ্দেশে তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন—"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।"[৩]

১, বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৫

২, ৩ তদেব : পৃঃ ১০৬

গণজীবনের প্রতি বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধা ও একান্ত আত্মীয়তা তাঁর পরিব্রাজকজীবনে ভারত-ভ্রমণের ফল তো বটেই, সেইসঙ্গে নিখিল বিশ্বের সর্বজাতির সর্ববর্ণের দরিদ্র পতিত, অজ্ঞ ও মূর্খের তিনি সমব্যথী। ভারতবর্ষে মেথরের হুঁকোয় তামাক খেতে যেমন তিনি অনায়াসে সংস্কার বিসর্জন দিয়েছেন, আমেরিকায় নিগ্রোরা যখন তাঁকে স্বজাতীয় ভেবেছে তখনও অনায়াসে নিজেকে তাদেরই একজন-রূপে পরিচিত করেছেন।

জাহাজপথে যাত্রাকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাঝিমল্লাদের নৈপুণ্য ও বীরত্বপ্রসঙ্গেই পরিব্রাজকের আর একটি অমর গদ্যস্তবক দেখা দিয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ যে এই সাধারণ অবজ্ঞাত জনসমষ্টির মধ্যেই নিহিত, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দের বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন মহাকালের মন্দ্রস্বরের মহিমায় প্রতিধ্বনিত—"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই[১] কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা! তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম তোমাদের আচার ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে

১ ডম্ফ এখানে দম্ভ অর্থে। একটু আগে সমকালীন আর্যামির আতিশয্য প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন—"একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখেছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!"—পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৭

তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয় আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন-পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্য—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।"[১]

পরিব্রাজক-জীবনে ভ্রাম্যমাণ বিবেকানন্দের রাজার প্রাসাদ থেকে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮১-৮২

আরম্ভ করে দরিদ্রতম চাষী, মজুর, মেথর—সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে সাধারণ ভারতবাসী-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি কী পরিমাণ প্রসারিত হয়েছিল, উদ্ধৃত স্তবকদ্বয়ে তাঁর সমুজ্জ্বল প্রমাণ। পরবর্তীকালে য়ুরোপের সাধারণ শ্রমজীবীর তুলনায় ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনের আদর্শগত ও নীতিগত মানদণ্ড যে উঁচু—এ বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় হয়।

তখন অবধি সাম্যবাদের ঢেউ এদেশে দেখা দেয় নি—একথা মনে রাখলে বিবেকানন্দের গণচেতনার তাৎপর্য আরো গভীর অর্থ বহন করে আনে। শ্রমজীবিসভ্যতার বন্দনায় এমন মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ণতা, এমন আপনবোধের অন্তর্দৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম দেখা দিয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে যখন সাম্যবাদী গণ-আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, তখনও সাহিত্যের বিচারে বিবেকানন্দের শ্রমিক-বন্দনার সঙ্গে তুলনীয় রচনা একান্ত দুর্লভ।

সাম্যবাদের ধারণায় শ্রেণীসংগ্রামকে অনেক সময় আমরা অনিবার্য বলে মনে করি। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি চাইছেন, উপযুক্ত সময় থাকতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের দল যেন নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হয়ে আসেন—কারণ ভবিষ্যৎ যখন এই শ্রমজীবী মানুষের, তখন সে ভবিষ্যতের জন্য যথাযথ প্রস্তুতিই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা ভবিষ্যতে যে অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, তার ফলে এই উচ্চশ্রেণীরা হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে যে, শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়েছে, তার অনেকটা কারণ বিবেকানন্দের এই সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। জন্মগত জাতিভেদ বা অর্থগত শ্রেণীভেদ—এ দুয়েরই অবসানকল্পে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর যা কর্তব্য ছিল, আমরা ভারতবাসীরা তা পালন করি নি।

অপরপক্ষে একথাও মনে রাখতে হবে যে সাধারণমানুষের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী তাদের অন্তরে সঞ্চার

করে শ্রমজীবী সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার পরিকল্পনাও বিবেকানন্দের ছিল। সহযোগিতার দ্বারাই এ আদর্শ সম্ভব—পরস্পরকে উচ্ছেদ করার মনোবৃত্তি এ আদর্শের অন্তরায়। আবার প্রয়োজনক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামও স্বামীজীর দ্বারা স্বীকৃত। 'আনন্দ-মঠের' সন্ন্যাসীদের দেশের জন্য সংগ্রামকে তিনি তরুণ বিপ্লবীদের কাছে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করতেন।[১] অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজারা যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ—"যেথায় সমাজশরীর বলবান্, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা-রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"—একথা বর্তমান ভারতে[২] তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, ফরাসী বিপ্লবের কথাই এ ক্ষেত্রে তাঁর মনে জেগেছিল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বিকাশে সাধারণ মানুষের স্থান সম্বন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"তবে একটা কথা বলে রাখি,—গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, তাঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ[৩]।"

সাধারণমানুষের সাথে এই সহমর্মিতায় সন্ন্যাসের সর্বত্যাগের আদর্শ বিবেকানন্দমননে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের ফলেই ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে স্বামীজী বিশ্বজনের আপন মানুষ হতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের

১ স্বামী বিবেকানন্দ : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃঃ ৩২৮

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৯

৩ তদেব : পরিব্রাজক : পৃঃ ১১৭-১৮

'জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবসেবা'র বীজমন্ত্র তো ছিলই। ধীরে ধীরে এই বিশ্ব-পরিব্রাজকের অন্তরে সে বীজ কখন বিশাল বটের মতো নিখিল মানবাত্মার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, বিবেকানন্দ-সাহিত্য সেই বিশাল বটের প্রাঙ্গণ-বেদিকায় ছায়ারৌদ্রের মিলিত আভাস।

* * *

'পরিব্রাজকে'র ইউরোপ-পরিক্রমায় আমাদের বিশ্ব-ইতিহাস-পরিক্রমা হ'তে থাকে। একদিকে প্রাচীন শিলালিপি থেকে আহরিত উনবিংশ শতাব্দীর মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস-চর্চা, অন্য-দিকে ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হুঙ্গারি, তুরস্ক, ঈজিপ্ট, গ্রীস—প্রভৃতি নানাদেশের টুক্‌রো টুক্‌রো চলচ্চিত্র—এ দুয়ে মিলে ভ্রমণসাহিত্যপাঠের সর্বোত্তম ফল লেখকের সঙ্গীরূপে মানসভ্রমণ যখন সারা হয় তখন একজন সেরা ভ্রমণরসিকের সঙ্গসুখলাভ পাঠকের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

"আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? —পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা, তায় চক্কর-ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হোক—যখন কিংবদন্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়।"[১]

এর আগে তো তিনি একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করেছেন, আমেরিকা ইংল্যাণ্ড-পরিক্রমাও ততোধিকবার—কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাসাহিত্যে সে চক্রচিহ্নের ছাপ পড়ে নি। 'পরিব্রাজকে' তাঁর সারা জীবনের দেশভ্রমণের অংশমাত্র বিধৃত। তবু সেইটুকুই ইতিহাস-চেতনার বিরাট প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়ে দেশ-দেশান্তর ও বর্তমান কাল থেকে সুদূর অতীতে ব্যাপৃত কালান্তরের ব্যঞ্জনায় পাঠকহৃদয়কে সজীব কৌতূহলে ভরে রাখে।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পরিব্রাজক : পৃঃ ১১৮

পরিব্রাজকের সঙ্গে ভ্রমণরত আমরা কখনো সুদূর অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে জানতে পারি—"য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে 'বাইবেল' নামক ধর্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হ'তে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়।...এই বাইবেলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতি"। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন আশিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক পারসী মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব—আত্মা বা পরলোক নাই। নবীনভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের।"[১]

কখনো পারি (বা প্যারিসে) বিবেকানন্দের বন্ধু ও অনুরাগী বিশ্ব-বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। যেমন সেযুগের সেরা অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডের সঙ্গে পরিচয়—"পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণহার্ড...বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা বালক, যা বল তাই—হুবহু, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বার্ণহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ, 'ত্রেজ্‌াঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে'[২]—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা,

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৫

২ tre's ancien tre's civilis'e

ঘাট পরিচয় করেছি।' বার্ণহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল —'সে মঁ র‍্যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন।"[১]—এমন মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর সখ্যস্থাপনা আশ্চর্য কি!

এ ছাড়া হিরাম ম্যাক্সিম, জুল বোওয়া, মাদাম কালভে, পেয়র হিয়াসান্থ—এমন কতোজনের সঙ্গে পরিব্রাজক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং বর্ণনার গুণে তাঁরাও আমাদের অন্তরঙ্গজনে পরিণত। আবার প্যারিসের মহাপ্রদর্শনীতে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ খুঁজছেন কোথায় সেই মানুষ—যে তাঁর অভাগিনী জন্মভূমির নামটি উজ্জ্বল করে তুলে ধরবেন এই বিশ্বমনীষীর সম্মেলনে! "এই মহা-কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—যে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।"[২] জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের এই প্রীতিই পরবর্তীকালে জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার আন্তরিক সহায়তার কারণ।

১ বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১২৪

২ তদেব: পৃঃ ১১৯

আবার অষ্ট্রিয়ার পথে যেতে যেতে নেপোলিয়নের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার মানী রাজবংশের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাসের চকিত দর্শন—"অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে-থা বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হ'লে সে বংশের সঙ্গে বে-থাই হয় না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর অধঃ .তন !! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো যে, বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, 'আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ ?'-এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক' অর্থাৎ আমা হ'তে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাই নি। সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হ'ল।"[১] নেপোলিয়ন বিবেকানন্দ-মানসে তরুণ বয়স থেকেই পরম শক্তিমান্ বীরের আদর্শ।—আর সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে বিবেকানন্দের সবচেয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছে ফ্রান্স।

এমনি ক'রে সারা য়ুরোপ ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী ঈজিপ্টেও এসেছিলেন, কিন্তু সে-কাহিনী আর লেখা হয়ে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ফিরে যাবার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিল মনে। বিশেষতঃ তাঁর জন্য স্বদেশত্যাগী সেভিয়ার দম্পতি—যাঁরা সুদূর হিমালয়ে 'মায়াবতী'তে রয়েছেন, তাঁদের কল্যাণচিন্তা তাঁকে ফিরে যেতে আরো উৎসুক করে তুললো। অকস্মাৎ একদিন বেলুড় মঠে ফিরেও এলেন—কিন্তু মিঃ সেভিয়ার তার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। প্রথমে স্বামীজীর বক্তৃতারাশির সাঙ্কেতিক লেখক গুডউইন, তারপর শিষ্য ও অভিভাবক-তুল্য সেভিয়ার—এ দু'জনের মৃত্যুবেদনা তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত করেছিল সন্দেহ নেই।

কিন্তু স্বামীজীর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে 'পরিব্রাজক'ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি লাভ করল। সমকালীন ভারতবর্ষে স্বদেশে ও

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৩০

বিদেশে সর্বত্র পরিভ্রমণকারী রচনাদক্ষ এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজীর মতো ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের হয় নি, আবার বিশ্বসভায় গৌরবের মুকুট লাভ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপে মহিমান্বিত অতিথির মর্যাদালাভও বিবেকানন্দজীবনে রবীন্দ্রনাথের আগেই ঘটেছে। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের ভ্রমণকাহিনীর অতি সামান্য অংশ নিয়েই 'পরিব্রাজক' পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপিত। তবু বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে বর্ণনার অভিনবত্বে, ভাষার দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বিশ্বমানবের অন্তরঙ্গ সম্মেলনে 'পরিব্রাজক' আজও পাঠকহৃদয়ে সমান সমাদরের বস্তু।

* * *

'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের ২৩ সংখ্যায় (১লা পৌষ, ১৩০৬) "গত ১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (সমালোচনা)" 'পরিব্রাজক'-গ্রন্থের প্রথমযুগের সাহিত্যমূল্যনিরূপণপ্রচেষ্টার দিক থেকে স্মরণীয়। তখন সাহিত্যপরিষদের কার্যালয় ছিল ১০৬।১ নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীতে। সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৬-এর ৪ঠা বৈশাখ সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২য় সংখ্যায় (১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬) তা প্রকাশিত হয় এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় পর পর কয়েকটি সংখ্যায় আলোচিত হয়। বিশেষভাবে গদ্যভাষা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাবই আমরা এখানে আলোচনা করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখী সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই বক্তৃতাটি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'পরিব্রাজক' তখন 'বিলাত যাত্রীর পত্র' নামে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় চলতি গদ্যের সমর্থন 'উদ্বোধন'-পত্রিকার পরিচালকদের নিশ্চয় খুবই উৎসাহিত করেছিল। ভাষাভঙ্গী দেখে আমাদের ধারণা এই সমালোচনাটি সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দেরই লেখা।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চলতি ভাষাপ্রীতির উদাহরণরূপে এই সম্পাদকীয়ের লেখক নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি তাঁর বক্তৃতা থেকে উল্লেখ করেছেন—"ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়, একদিকে সার্বভৌমিক ব্যাকরণ; আর একদিকে দেশীয় চাসাভুসা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ; আর একদিকে খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ; এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণীসঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে ভাল হয়।"

"আর এক স্থলে বলিতেছেন, 'আর তাহার মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন হীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা।' আরও একস্থলে বলিতেছেন, 'বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞলোকের কার্য্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃত পক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি।'

"আরও বলিতেছেন, 'স্থলবিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্য্যকরী হয়। কেহ যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল" তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে যদি বলে যে "অমুক কথাটির বাঁধুনি আলগা" তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।' কথাগুলি যাহা বলিয়াছেন—অতি সমীচীন।"[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার ভাষায় চলতি ভাষার ধাঁচ এত স্পষ্ট ছিল যে, সমগ্র বক্তৃতাটিকে সাধুভাষা থেকে চলতিভাষার পথে যাত্রার নিদর্শনই বলা চলে। এটি লিখিত বক্তৃতা। সুতরাং বাংলা চলতি গদ্যের ইতিহাসে এর বিশিষ্ট স্থান আছে। 'উদ্বোধনে'র সমালোচনার প্রথম কিস্তিতে এর ভাষার প্রশংসা—"বক্তৃতাটির ভাষা অতি স্বাভাবিক, সুললিত মধুর এবং নূতন-ধরণের। এরূপ ধরণ বাঙ্গালা গদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিবে। ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে, ততই

১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, পৃঃ ৭৪৮-৪৯

মিষ্ট ও প্রশংসনীয়। যে ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা যায় না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়—কপট। মনে ভাবছি এক—হয়ত মুখে কইছি এক—আর লিখ্‌বার সময় লিখ্‌ছি আর এক।…”[১]

সমকালীন প্রচলিত গদ্যের মিশ্র ধরণের রীতির মধ্যে এই সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গদ্যরীতিকে ‘উচ্চমিশ্র’ ধরণের বলা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণে চলতি ক্রিয়াপদ—হচ্চে, হ’চ্চে, হচ্ছেন, হ’চ্ছেন ইত্যাদির ব্যবহার সেকালের গোঁড়াপন্থীদের অসহ্য ঠেকলেও ‘উদ্বোধনে’র সমালোচক এই সব প্রয়োগকে সাগ্রহে সমর্থন করেছেন—“এরূপ উন্নতি বা পরিবর্তনের গতিরোধ দুঃসাধ্য। কি করা যায় বলুন?—নাচার। লেখক যদি এইরূপ ঘরোয়া চলিত ধরণে লিখিয়া ভাষার আর এক মূর্তি চিত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন। বিশেষ, প্রসিদ্ধ গভীর চিন্তাশীল লেখকের লেখনী হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হইবে, তাহা ত নিন্দনীয় হইতেই পারে না বরং সে সকল, কালেতে ক’রে সাধারণে চলিয়া যাইতেই থাকে।…এ হেন সুশাসিত ও বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্দুসমাজ যখন “যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে জীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্তর” ব্যবহার হইল, তখন সামান্য বঙ্গভাষায় ‘হইতেছে’ ‘খাইতেছে’র পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে যে ‘হচ্চে’, যাচ্চে’ চলিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? পরন্তু ভাষার গৌরব—বচনবিন্যাসে ততটা নয়, যতটা ভাব-প্রকাশে।”[২]

‘উদ্বোধনে’র সমালোচক উচ্চবিমিশ্র ধরণের ভাষার উদাহরণরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ ও বিবেকানন্দের “বিলাত যাত্রীর পত্র” এ দুয়েরই নানা বাক্য ও অনুচ্ছেদ, বিশিষ্টার্থক বাক্যের প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ ও চলতিশব্দের ব্যবহার ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি তুলনায় বেশ ধরা পড়ে যে স্বামীজীর

১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৫

২ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, পৃঃ ৭৫২

ভাষা ক্রিয়াপদেও সম্পূর্ণ চলতি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ও সাধু দু'ধরণের ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ উদ্বোধনের সমালোচনা থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ভাষার উদ্ধৃতি—"সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা, কোথাও বা ফলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী পদ্ধতি কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া কম্মিয়া শিখিয়াছি, আর তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জো শো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে পারে না এমন নহে।"—দ্বিজেন্দ্রনাথ।[১]

"...কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি—দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম, কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে টিকটিকি, ইঁদুর, ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে—কিবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেয়ালে—দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে, আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে,—কবি শ্যামাচরণ হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

(বিলাতযাত্রীর পত্র—বিবেকানন্দ)[২]

'উদ্বোধনে' তখন 'বিলাতযাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজকের, 'হাঙ্গর ধরা'র বিবরণ অবধি প্রকাশিত। এর মধ্যেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাষার তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হ'ল। লেখক বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে 'উদ্বোধনের' এই সমালোচকের কতটা উচ্চ ধারণা তার পরিচয়

১, ২ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা পৃঃ ৭৫০, ৭৫২

যেমন এতে ফুটেছে, চলতি ভাষার আন্দোলনে 'উদ্বোধন' পত্রিকার অগ্রগামিতাও তেমনি প্রমাণিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—দু'জনেই মননশীলতায় উচ্চতম দর্শনচিন্তার অধিকারী। কিন্তু রচনাভঙ্গীতে যে সরসতা, বাকনৈপুণ্য এবং চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগ এঁরা দেখিয়েছেন, তা সমকালীন সাহিত্যে ঠিক এইভাবে অন্যেরা অনুসরণ করেন নি। কিশোর রবীন্দ্রনাথের পত্র ও ডায়ারী তখন অবধি যুবক রবীন্দ্রনাথই অনুসরণ করার কথা ভাবেন নি! 'উদ্বোধন'-পত্রিকা (১৮৯৯) প্রকাশের পর সবুজপত্র (১৯১৪) অবধি চলতি ভাষাকে বাঙলার লেখক সমাজের অগ্রগামিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

'য়ুরোপ-প্রবাসী'র পত্র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছেন—"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।…আমার বিশ্বাস বাংলা ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"[১]

সতেরোবছর বয়সে লেখা এই পত্রগুলির যে সাহিত্যিক মূল্য রবীন্দ্রনাথের মনে পরিণত বয়সে (১৯৩৬-এ লেখা উদ্ধৃত অংশ) দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা অনেকেই একমত হ'বেন। তরুণ মনের যে তীক্ষ্নতা এ চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশিত সে তীক্ষ্ন ঋজু ভঙ্গী পরবর্তী রবীন্দ্রগদ্যে অনুসৃত হয় নি। তাঁর কাব্য-প্রেরণা গদ্যরীতিকে আবিষ্ট করেছে।

এর বারো বৎসর পরে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যের আর এক পদক্ষেপ। ভাষা আরো গম্ভীর, গভীর ভারবহনের উপযুক্ত, মননের পরিণতি দৃষ্টিভঙ্গীতে সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে। তবু, আশ্চর্যের বিষয়, সতেরো এবং উনত্রিশ বছরের

---

১ রবীন্দ্ররচনাবলী: দশম খণ্ড: শতবার্ষিক সংস্করণ: 'পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের প্রবেশক': পৃঃ ৩৪০

রবীন্দ্রনাথের এই চলতি গদ্যরীতি তাঁর নিজের রচনায় তো অনুসৃত নয়ই, সমকালীন আর কেউ এ রচনার দ্বারা প্রভাবিত ন'ন।

১৮৯৯-এর জুন মাসে বিবেকানন্দ যখন 'পরিব্রাজক' ('বিলাত-যাত্রীর পত্র' নামে) লিখতে শুরু করলেন, তখন কি তাঁর মনে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'য়ুরোপযাত্রীর পত্রে'র আদর্শ জেগেছিল? 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'—এ দুটির কোনোটির ভাষার সঙ্গেই বিবেকানন্দের চলতি গদ্যরীতির প্রকৃতিগত মিল না থাকলেও মূলতঃ কলকাতার চলতি ভাষা হিসাবে এদের সাধর্ম্য আশ্চর্য নয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বই ভাষার মূল চাবিকাঠি—একথা মনে থাকলে ভাষার আদর্শ-বিচারে দু'জনের বিস্তর পার্থক্যের কারণ বোঝা যায়।

উদাহরণস্বরূপ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র ভাষাভঙ্গীর নমুনা—"আমি ইংলন্ড দ্বীপটাকে এত ছোটো ও ইংলন্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করেছিলাম যে, ইংলন্ডে আসবার আগে আমি আশা করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,' মনে করেছিলেম, এই দুই-হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাড্-স্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত। কিন্তু, তাতে আমি ভারী নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে—কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়।"[১]

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'-তে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যময় গদ্যভঙ্গীর উদাহরণ—"তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র

---

১ রবীন্দ্ররচনাবলী : শতবার্ষিক সং : দশম খণ্ড : য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র : দ্বিতীয় পত্র : পৃঃ ২৪২-৪৩

ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নিচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্ ঝিক্ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন্ এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে।"[১]

এই সঙ্গে 'ছিন্নপত্র' অবধি রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যরীতি অনুধাবন করলে প্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, চিত্ররীতি, শব্দসুষমা ও অন্তর্নিহিত কাব্যধর্মে রবীন্দ্র গদ্যভঙ্গিমা প্রথম যৌবনের অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতার ফল চঞ্চল ও তির্যক্ গতিভঙ্গী থেকে উপলব্ধির গভীরতার পথে অগ্রসর। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের গদ্যরীতি একটু পরিণত বয়সেও ('পরিব্রাজক' লেখা শুরু ৩৬ বছর বয়সে) রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি মহত্তম প্রজ্ঞার বাণীরূপদানেও সমান দক্ষতা অর্জন করেছে। কবিজনোচিত তন্ময়তা বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও মূলতঃ তাঁর গদ্যের গতিধর্ম, সাবলীলতা ও পৌরুষশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' নয়, বরং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'ই বিবেকানন্দ-গদ্যরীতির পূর্বসূচনা। রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যের প্রথম রচনা হিসাবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র কথা ভাবেন নি, তার মূল কারণ হয়তো রুচির বিভিন্নতা। বিবেকানন্দের সঙ্গেও হুতোমের রুচিগত মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। কিন্তু উত্তর কলকাতার আঞ্চলিক গদ্যরীতির যে পরিমার্জিত রূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রচলিত ছিল, তার বদলে হুতোম (যদি তিনি ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও হয়ে থাকেন) এবং পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে পরুষ অথচ প্রাণশক্তিসম্পন্ন লোকরীতির আমেজই বেশী দেখা

১ রবীন্দ্ররচনাবলী : শতবার্ষিক সং : দশম খণ্ড : য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী : পৃঃ ৩৮৭

দিয়েছে। অবশ্য স্বামীজীর চলতি গদ্যে তৎসম বা মূল সংস্কৃত পদের অজস্র নিপুণ ব্যবহার তাঁর গদ্যে যে ক্লাসিক স্বাদ সঞ্চার করেছে, হুতোমের গদ্যে তা নেই। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা-জাতীয় রচনায় আজ অবধি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' অনতিক্রান্ত।

চলতিভাষাকে যাঁরা সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভোজনে প্রথম আভিজাত্যের আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু সচেতন শিল্পী-মনের দিক থেকে বিবেকানন্দই প্রথম বন্দনীয়। হুতোম নক্‌শা-সাহিত্যকে কিছু মহৎ সাহিত্য ভাবেন নি, রবীন্দ্রনাথ পত্রের ভাষায় যে চলতিরীতি, তাই বজায় রেখে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ছাপিয়েছেন, মনন-সাহিত্যে এর প্রয়োগের কথা ভাবেন নি। অপরপক্ষে বিবেকানন্দ তাঁর ভ্রমণকথা 'পরিব্রাজক' ও মননসাহিত্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এ দুই গ্রন্থে চলতি ভাষার সর্বময় প্রকাশ-ক্ষমতা প্রমাণিত করে পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের রাজপথটির শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন করে গেছেন।

বিবেকানন্দের দুই পৃথিবী : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

"Bold has been my message to the people of the West.

Bolder to those at home.—"India's Message to the world."[১]

"পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"—'জগতের কাছে ভারতের বাণী।'[২]

আমেরিকা ও য়ুরোপে দ্বিতীয়বার পরিক্রমার সময় 'পরিব্রাজক' লিখতে লিখতে স্বামীজীর অন্তরে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শ এবং য়ুরোপীয় পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক মূল্যায়নপ্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে। নেপ্‌ল্‌স থেকে স্বামীজীর জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন। 'পরিব্রাজকে' এই অবধি বিবরণের পর তাঁর মন্তব্য—"ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে,—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি ব'লবো। তবে ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল।"[৩]

সেই অসমাপ্ত বক্তব্যই দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধনে' ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৫ সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এই নামে ধারাবাহিক রচনারূপে প্রকাশিত। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এই দুই সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার মননোজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ প্রকাশরূপে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দ-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১, ২ Complete Works of Swami Vivekananda : Centenary Edn : Vol IV : p. 308 ; বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬৯

৩ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৭

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই তিনজনের মাধ্যমে ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে সংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ কালের দিক থেকে এঁদের অনুজ। তবু পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় বা প্রাচ্য অধ্যাত্মমহিমা ঘোষণা এবং পাশ্চাত্যের রজোগুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের প্রয়াসে তিনি যে ভাববিনিময়ের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তারই ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে 'চিকাগো-বক্তৃতা', অন্যদিকে 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী—স্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক বিচারের পটভূমি।

আমেরিকাযাত্রার অব্যবহিত আগে স্বামীজী আসমুদ্র-হিমাচল পরিক্রমার দ্বারা রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতমের পর্ণকুটির অবধি সর্বত্র ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপাতম্রিয়মাণ ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে সবার আগে দরকার স্বদেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা। প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার সময় যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিল, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিক্রমার সময় স্বামীজী সে-অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতীয় বা প্রাচ্যসভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐক্য বা পার্থক্য সম্বন্ধে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন।

স্বামীজী মনে প্রাণে অনুভব করতেন যে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের উদ্দেশে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি তাঁর নিজের বিশেষ বাণী রয়েছে পাশ্চাত্যের উদ্দেশে। আবার একথাও ঘোষণা করেছেন—"পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"

বিবেকানন্দজীবনের সমগ্র ধ্যান-ধারণার উৎস স্বদেশজননীর যে

বাণী সমগ্র বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণা করা প্রয়োজন, সেকথা ভেবে "India's Message to the world"—নামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনাও তিনি করেছিলেন। স্বামীজীর অকাল প্রয়াণের ফলে সে-গ্রন্থটি সম্পূর্ণ না হ'লেও গ্রন্থ-সূচনায় সূত্রাকারে "জগতের কাছে ভারতের বাণী"র যে মূলসূত্রগুলি বিধৃত, তাদের অবলম্বন করে স্বামীজীর বিস্তৃত রচনা ও ভাষণাবলীর সাহায্যে এ-বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবল বন্যায় সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্য অনুকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, স্বামীজী সে সম্বন্ধে ভারতবাসীকে বারংবার সাবধান হতে বলেছেন। 'বর্তমান ভারতে'র শেষাংশে সমকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর মানসদ্বন্দ্বের নিপুণ বর্ণনা—"একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্‌ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি?"[১]

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৪৬

যুগমানসের এই সংঘাতে সে যুগে বা এযুগে যাঁরা বিচলিত, তাঁরা স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই দুই পৃথিবীর মূল পার্থক্য-বিশ্লেষণটুকু অনুধাবন করতে পারেন—"পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি ; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, 'ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥' "[১]

দুই সভ্যতার এই মূলগত পার্থক্যটি অনুধাবন করলে আধুনিক মনের কাছে এ দুয়ের সমন্বয়সাধন অসম্ভব মনে হবে না। কিন্তু এখন অবধি অনুকরণসর্বস্ব আমাদের শিক্ষিত সমাজে যে কোনো বিদেশী মুদ্রাই স্বদেশী সম্পদের চেয়ে সহজে বরণীয়। তাই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মনন আজকের দিনেই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

প্রয়োজনমতো বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে সেগুলি ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই স্বামীজীর আদর্শ। স্বামীজীর ধারণায়, আগামী যুগের বিশ্ব-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল য়ুরোপ নয়, ভারতবর্ষ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ আলোচনা-প্রসঙ্গে (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'উদ্বোধন'—'প্রস্তাবনা') স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আসন্ন সম্মিলন-কাল সম্বন্ধে লিখেছেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ' ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী ; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন নিত্যসুখের

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬

আশায় ইহলোকের অনিত্যসুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।···ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"[১]

স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে ও চলতি ভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে সমুন্নত বা পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তিই যে ঐহিকসুখে আসক্ত—এমন কথা স্বামীজীর অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসপ্রবণতার মূল লক্ষণগুলিই তাঁর আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই স্বীকার্য।

সময়ের দিক থেকে 'বর্তমান ভারত'-রচনার সমাপ্তি আর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত খুব কাছাকাছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ধারাবাহিক প্রকাশকাল। ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির দু'সংখ্যা আগে (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে 'বর্তমান ভারতে'র অনুরূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃতের সংহত ভঙ্গিমা পরিবর্তিত হয়ে চলতি ভাষার জোয়ার দেখা দিয়েছে। 'পরিব্রাজকে' স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিশ্ব পরিক্রমায় সহযাত্রী। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' সে ভ্রমণের অন্তরতম ফল উপলব্ধির প্রয়াস।

বাংলায় লেখা স্বামীজীর মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত। 'পরিব্রাজক'ও 'বর্তমান

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান সমস্যা : ভাব্‌বার কথা : পৃঃ ৩১-৩৩

'ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের বৎসর ১৩১২ ; 'ভাব্‌বার কথা গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৩১৪ সালে। গ্রন্থাকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশের সময় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে পাওয়া অংশ পরিশিষ্টরূপে যোগকরা হয়। বইটির সমাপ্তির ধরণে মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও কিছু বক্তব্য সংযোগের পরিকল্পনা স্বামীজীর ছিল।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দজীরই লেখা। পরিচায়িকারূপে তিনি লিখেছেন—"এই প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর, দেশী জিনিষের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ঠিক ইহার বিপরীত-মতাবলম্বী ; হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন ; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের হিন্দুমেলার দ্বারা তরুণ বিবেকানন্দ যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ 'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণে অনেকগুলি দেশপ্রেমের গানের তলায় শুধু 'হিন্দুমেলা' কথাটি লেখা অর্থাৎ হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে এরা রচিত বা সে মেলায় গীত। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী হিন্দুমেলার আগেও সমকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৪৭

সত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। স্বামীজীর দেহাবসানের পর ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বদেশী আন্দোলনের ধারাবহন করে চলেছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজী সেই স্বদেশী ভাবধারার মূলপ্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (এটিও খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দেরই লেখা) আছে—"স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির মূলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আশা করি স্বামীজীর এই নিরপেক্ষ সমালোচনাগ্রন্থ-দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।"

স্বামীজীর বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের মূল বিষয় 'ভারতচিন্তা'। কিন্তু এই ভারতচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকেই বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিক্রমারত। সেদিক থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ থেকে আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক পরমলক্ষ্য অবধি উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ অবধি অনতিক্রান্ত গ্রন্থ।

ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংলা গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শসৃষ্টির নিদর্শনরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ নামে অভিহিত। তবে সাধারণতঃ প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' তার চেয়ে কিছু বেশী। বিশ্বসভ্যতার দুটি প্রধান ধারার অনুধাবনে এ গ্রন্থে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি বিস্ময়কর এর প্রকাশভঙ্গীর স্বাদুতা। এশিয়া ও য়ুরোপের ইতিহাসকে

মৃদু হাস্যরসের ভিয়েনে চাপিয়ে যে অনায়াস শিল্পকুশলতায় বিবেকানন্দ এ গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর জ্ঞানের বিস্তার, দৃষ্টির মৌলিকতা ও জ্বলন্ত দেশানুরাগ পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। অত সহজ করে বলেছেন বলেই তাঁর বিশ্লেষণ এত গভীর। এমন কি প্রকাশের এই সারল্য অনেকসময় তথ্যমেদপুষ্ট গবেষকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশ-সারল্যই বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসচর্চায় প্রযুক্ত হয়ে বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে একই সঙ্গে গভীর ও উদার করে তুলেছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র মনন-প্রাধান্য অনেক পরিমাণে স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার আনন্দময় সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্তিত্ব-সুরভিত রচনায় (ইংরেজী literary বা personal essay-র সগোত্র) পরিণত।[১]

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন তখনকার তরুণমানসে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তার অজস্র নিদর্শন। হিন্দুকলেজের যে তরুণ ছাত্রদল সেকালে নব্যবঙ্গ (young Bengal) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটিতে মন্তব্য করেছেন—"নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন ;—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচিতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্যপক্ষ-পাতিতার ঝোঁকে বঙ্গ-সমাজ বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।"[২]

---

১ বাংলা সাহিত্যের একদিক : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : প্রবন্ধ ও রচনার পার্থক্য আলোচনা স্মরণীয়।

২ রাতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : সপ্তম পরিচ্ছেদ : পৃঃ ১৪২ (নিউ এজ সংস্করণ)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯৬-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকা-প্রত্যাগত বিবেকানন্দকে কলকাতাবাসীরা যে অভিনন্দন দিয়েছিলেন তার উত্তরে যেন ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশই স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত—"প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করার অন্য কোনো উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধহয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু সবই ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়।"[১]

তা হবার নয় ব'লেই, স্বামীজীর মতে, এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তায় ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার মহত্তম প্রকাশ। তরুণ সন্ন্যাসী সে যুগের তরুণতরদের আহ্বান করেছিলেন—"আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশবৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে।"[২]

১ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: পৃঃ ২১০-১১

২ তদেব পৃঃ ২১৭

স্বামীজীর এ আহ্বানে সে যুগে যে পরিমাণ সাড়া জেগেছিল, স্বাধীনতা-উত্তর পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রবাহে আজ তা কিছু পরিমাণে স্তিমিত। রাজনীতির সর্বগ্রাসী উন্মাদনা জাতীয় প্রাণসত্যকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করে আছে বলেই বিবেকানন্দ-বাণী ও সাহিত্যের নূতন চর্চা ও মূল্যায়ন এই বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে আমাদের একান্ত করণীয়।

সেকালের নব্যবঙ্গের তরুণদলের অনেকেই কিন্তু অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের প্রতিই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মিশনরীদের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও মধুসূদনের অনুসরণ সেকালে খুব কম বাঙালীই করেছেন। আবার মধুসূদনের সতীর্থ মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তো সেই ইংরেজীয়ানার যুগে বিশেষ ব্যতিক্রম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথাও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ব্রাহ্মসমাজের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মূলতঃ ভারতীয় স্বাদেশিকতার আদর্শে অটল দেবেন্দ্রনাথ এবং চিরাগত ঐতিহ্যের কল্যাণপ্রদ ভূমিকায় নিশ্চিত বিশ্বাসী ভূদেব—এঁদের দু'জনকেই আমরা নব্যবঙ্গের ইতিহাসে ব্যতিক্রম মনে করতে পারি। সেই সঙ্গে রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে-যুগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও স্মরণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে আমরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিচারবিহীন অনুসরণের বদলে যে স্বাধীন বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাই, তার মূলেও অন্যতম প্রেরণা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্বিজয়-অভিযানের পাশাপাশি কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে নবযুগের ভারতবর্ষ অতীতের অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত'-প্রসাদের সৌভাগ্যলাভ করেছে। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের অনন্যতা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন—"সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা

ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণ-শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।"[১]

তরুণ নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর সমুদ্রোপম গভীরতা ও আকাশকল্প বিস্তারের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, দুরূহতম অধ্যাত্মসত্য-প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর অনায়াসনৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতায়। বস্তুত বিবেকানন্দমানসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়প্রচেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার উদার সমন্বয়েরই আর এক রূপান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই তিনি জেনেছিলেন জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আর কিছুই নয়, একই সত্যকে প্রকাশের নানান্ ভাষা মাত্র।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই সমন্বয়দৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ মেলে বিভিন্ন জাতির মূলগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায়—"অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছরূপে বিকাশ হয়েছে।"[২]

কঠোপনিষদের—অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।[৩]—'সেই একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : সরলাবালা সরকার : 'রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী' অধ্যায় : পৃঃ ১২২

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬০

৩ কঠোপনিষৎ : স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : ২।২।৯

সেই সেই আকার লাভ করে, তেমনি সকল সত্তার অন্তর্নিহিত আত্মা নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, অথচ সেই রূপের অতীতরূপেও তিনি বিরাজিত।'—এই শ্লোকটির কথা এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। স্বামীজীর জীবনে এ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী—'যত মত তত পথ।' উপনিষদের ব্রহ্মোপলব্ধির পরিপূর্ণ আদর্শরূপে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক ও প্রাচীন ভারতের চিরন্তন যোগসূত্ররূপে বিবেকানন্দের মননদৃষ্টিকে বিশ্বতোমুখী মৈত্রী ও করুণায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত এক ও অদ্বয় সত্যকে স্বামীজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণায় প্রকাশিত দেখেছেন।

বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন—"Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth"[১] "চারুকলা, বিজ্ঞান ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করবার বিভিন্ন পন্থামাত্র।"—এ উপলব্ধির মূলে রয়েছে অদ্বৈতপ্রত্যয়। বলা বাহুল্য সে প্রত্যয়ের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী—"ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই—তাঁর মধ্যে সাকার নিরাকার দুইই মিলেছে।" (নিবেদিতার অনুবাদে—God is both with form and without form. And He is that which includes both form and formlessness.)[২]

উল্লেখিত ভূমিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণীটি উদ্ধৃত করে নিবেদিতার বক্তব্য—"এইখানেই আমাদের আচার্যদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, কারণ এই উপলব্ধিতেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রে পরিণত তা নয়, সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতেরও সংযোগস্থল। বহু এবং এক যদি সত্যিই এক সত্তা হয়, তা হলে

১, ২ Complete works of S. Vivekananda: Vol I: Introduction: p xiv; xiii, Centenary edition. বাংলা অনুবাদ লেখককৃত।

শুধু কেবল সবধরণের উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সব কাজ, সব সংগ্রাম, সমস্ত সৃষ্টিই পরমসত্যলাভের বিভিন্ন পন্থা। এর পর থেকে লৌকিকে ও আধ্যাত্মিকে আর কোনো প্রভেদ থাকতে পারে না। পরিশ্রমই প্রার্থনা, জয়ই ত্যাগ, সমগ্র জীবনই ধর্ম। প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ ত্যাগ ও বর্জনের মতোই কঠোর দায়িত্বে পূর্ণ।" "It is this which adds its crowning significance to our Master's life, for here he becomes the meeting point, not only of East and West, but also of past and future, If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but all modes of work, all sort of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction henceforth between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and avoid."

অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীজীকে একটু ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মননই আমাদের পন্থা নির্দেশ করতে পারে। যে অদ্বৈত উপলব্ধির দৃষ্টিতে পার্থিব সমস্ত প্রচেষ্টাই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ সে দৃষ্টি যাঁদের নেই, তাঁরা স্বামীজী বা নিবেদিতার ব্রহ্মদৃষ্টিকে বাদ দিয়েই বস্তুমুখী জীবনচর্যাকে একমাত্র সত্য মনে করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু বলেছেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।"[২] তিনি উপমা দিতেন আঙ্গুলে তেল মেখে কাঁঠাল-ভাঙার, নইলে জড়িয়ে যায়। কিছুকাল নির্জনে সাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরসত্তার উপলব্ধি না হ'লে সংসার-চেতনা তেমনি মানবমানসকে আচ্ছন্ন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভিন্নসত্তার আদর্শ তাই সত্যলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সে সত্য কখনোই ব্যবহারিক সমুন্নতির বাসনা নয়, সব বাসনার অতীত পরম লক্ষ্যে সেই সত্যের প্রকাশ।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সাহিত্যকৃতি আলোচনার আগে এই অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের ভূমিকাটুকু স্মরণীয়।

* * *

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' ('বর্তমান সমস্যা') প্রবন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃ স্ফুরণ হইবে।"[১]

সমস্যা এই কীভাবে সেই নবজাগরণ ঘটবে? স্বভাবতঃই সেকালের একদল পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রাচীন শাস্ত্র ও সমাজের আধিপত্যের যুগ ফিরিয়ে আনাই বর্তমান ভারতের উন্নতির উপায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটেছিল জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে। আধ্যাত্মিকতা জীবনের পূর্ণতার ফল, রিক্ততার সৃষ্টি নয়। শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলেই ভারতের অভ্যুদয় ঘটে নি, জাতীয় ইতিহাসের নানা স্তরে সমকালীন প্রয়োজন-অনুসারে এজাতীয় আচার-বিচারের প্রাদুর্ভাব। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার জন্য যে সত্ত্বগুণের প্রশান্তি প্রয়োজন, তা এদেশের কটি মানুষের আছে? সমগ্র দেশ জুড়ে নিরুদ্যম প্রাণহীন জড়ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে সন্ন্যাসী লিখলেন—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩১

পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।…সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর।…রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?…ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"[১]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার এই সূচনাপ্রবন্ধে স্বামীজী চেয়েছিলেন—"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা[২]"…সেই সহায়তার সার্থকতার ভিত্তিতেই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার পরিপূর্ণতা।

* * *

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনার দু'মাস আগে 'উদ্বোধনে' 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের সূচনায় বর্তমান ভারতের ভাষাভঙ্গিমার রেশ থেকে গেছে। "সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন-বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ, পার্শ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়-প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা, মধ্যে মধ্যে সমধর্মী শরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনরাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।"[৩] সামান্য অদল বদল হলেও আজ অবধি ভারতবর্ষের এই সঠিক চিত্র।

আজও অধিকাংশ শক্তিশালী বিদেশী জাতির চোখে আত্মকলহ-

১, ২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩২-৩৪

৩ তদেব: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১৪৯

পরায়ণ আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ করুণার মনোভাবই প্রধানতঃ দেখা যায়। অন্যদিকে বিদেশী সভ্যতার আপাতপ্রবলতায় একদল লোক যেমন এদেশে তাদের অন্ধ অনুকরণে মত্ত, তেমনি আর একদল লোক যা কিছু বিদেশী তাকে ঘৃণার সঙ্গে বর্জনীয় মনে করেন। স্বামীজীর মতে—'দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না।"[১]

একাধিক বিদেশী শক্তির পদানত হয়েও ভারতবর্ষ কেমন করে তার সভ্যতার ধারা বজায় রেখেছে, তার উত্তরে স্বামীজী দেখিয়েছেন—"প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে।"[২] সেই ভাবটি অনেকসময় আমাদের স্বদেশবাসীরাও ধরতে পারেন না, বিদেশীদের তো কথাই নেই। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও তীব্র শ্লেষে স্বামীজী বলছেন—"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে 'হাঁসেন হোঁসেন' করছ।"[৩]

বহুদিনের পরাধীন জাতির আত্মবিশ্বাসের অভাবই তাকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে। বিশেষতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে আমাদের অনুকরণপ্রিয়তা বোধ হয় সবচেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সেকালের ও একালের অনুকরণবিশারদদের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে আজও সমান উপভোগ্য এবং ভারতীয় আদর্শের চিরন্তনতায় স্বামীজীর অবিচল আস্থার পরিচায়ক—"ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার

১, ২, ৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : পৃঃ ১৪৯, ১৫০, ১৫১

সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপানে পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী ক'রে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়িহাত রাবণ নড়াতে পারেন নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম !! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?"[১]

* * *

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা—শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বামীজীর ভাষার "ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক।"[২] যা মানুষকে বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত করে। আর 'মোক্ষ' মানে—"মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না।"[৩] ইহকাল বা পরকালের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিলাভই মোক্ষ। "এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।"[৪]—ধর্মীয় দর্শনের দিক থেকে স্বামীজীর এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। আর এই মুক্তিতত্ত্বের উপরে নির্ভর করেই ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য সভ্যতার মূল যে ভারতীয় সভ্যতা (যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে গ্রীক সভ্যতা) তার নিজস্ব প্রকৃতিটি অনুধাবন না করলে অন্য সভ্যতার সঙ্গে পার্থক্যের কারণও ঠিক ধরা যায় না।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫১

২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২

শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচারী শব্দ দুটি একার্থক। আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজয়িত্ব একই কথা। "আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো? এদের উদ্দেশ্য ভোগ ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নাই···"[১]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য বোধ এবং ভারতীয় অদ্বৈতবাদের অদ্বয় উপলব্ধি—বিভিন্ন দিক থেকে একই সত্যে উত্তরণের চেষ্টা। কিন্তু অদ্বৈতবাদ যেমন সচেতনভাবে নিখিল-বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও তেমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সচেতনতায় পৌঁছায় নি। তবু পরিণামবাদের বিচারে এ দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত মিলটুকু স্বামীজীর দৃষ্টিতে সার্থক-ভাবে ধরা দিয়েছে।[২]

য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধে স্বামীজী বস্ত্র-বয়নের উপমায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হ'ল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্চে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা-খিচুড়ি জাত। এর টানা হচ্ছে যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।"[৩]

"অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।"[৪]

"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো।

১, ২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৬, ১৯৯, ২০৯, ২১০-১১

আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায় তলওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ; শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ; ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।”[১]

মোক্ষকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় সভ্যতার পার্থিব জীবনধর্মকে বর্ণাশ্রমাচারের দ্বারা সংহত করার প্রয়াস সম্বন্ধে অনেকেই একমত হবেন। কিন্তু জন্মগত সুবিধাবাদ বর্ণাশ্রমকে যে নির্মম অত্যাচারে পরিণত করেছে, তার সঙ্গে তুলনায় ইউরোপীয় তলওয়ারের সংঘাত অনেক সহনযোগ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের জন্যই ভারতে ধনীদরিদ্রের বা কায়িকভাবে দুর্বল-শক্তিমানের প্রভেদ ততটা মাথা তুলতে পারে নি। ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস, য়ুরোপীয় সভ্যতায় প্রভাবিত ও আমূল রূপান্তরিত করার আগ্রহ।

বিবেকানন্দসাহিত্যে বহুবিঘোষিত ভারতের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে এযুগে কারু কারু মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। লোকায়তদর্শনের অনুরাগী কেউ কেউ ভারতবর্ষকেও জড়বাদী চিন্তার দেশরূপে প্রতিপন্ন করতে পারলে আশ্বস্ত হ'ন—সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় মনীষা একদিকে যেমন ঈশ্বরকেও যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা অস্বীকার করার সাহস রেখেছে অন্যদিকে তেমনি পুরাকাল থেকে বেদান্তের অদ্বৈত-প্রত্যয় পরমসত্যকে বাক্যমনের অগোচররূপে নামরূপের পরপারে নির্দেশ করে এসেছে।

তবু সাধারণভাবে ভারতীয়দের আচার-আচরণে যে দুর্বল লোলুপতা ও হীনমন্যতা দেখা যায় তার কারণ কি? অপরপক্ষে য়ুরোপীয়দের বস্তুপ্রধান মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের আচার-আচরণে যে সরল নীতিবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা দেখা যায়, তারই বা উৎস কোথায়?

[১] বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১১

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ‘পথের সঞ্চয়’-গ্রন্থের ‘যাত্রার পূর্বপত্র’ রচনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাহান্ন বছর বয়সে য়ুরোপ-যাত্রাকালে কবির অন্তরে পাশ্চাত্যসভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে বক্তব্য দেখা দিয়েছিল, প্রাসঙ্গিকবোধে তার আংশিক উদ্ধৃতি—“য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে থাকে তখন আর তাহার সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে; বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।”[১]

এরপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে টাইটানিক জাহাজডুবির সময়ে
১ য়ুরোপীয় যাত্রীদের আত্মত্যাগের আশ্চর্য উদাহরণ স্থাপন করে প্রশ্ন করেছেন—‘আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই? এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে?”[২]

জ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নব আবিষ্কারে, মানবকল্যাণের জন্য নিত্য নব আত্মদানে য়ুরোপ প্রতি মুহূর্তে তার অজস্র প্রাণশক্তির উদাহরণ দিয়ে চলেছে। এমন কি সুদূর বিদেশে যদি কোনো সত্যের সন্ধান সে পায়, তা হলে একজন য়ুরোপীয় যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা সে সত্যকে অনুধাবন করে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন-অনুগামী হ্যামারগ্রেণ এবং বিবেকানন্দ-অনুগামী নিবেদিতার[৩] মধ্যে তার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখেছেন।

১,২ রবীন্দ্ররচনাবলী : দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৃঃ ৮৬৩, ৮৬৫

৩ “ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ

"...এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না ; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে ; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে—কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ।

"সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার দ্বারা কেহ লাভ করিতে পারে ? ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিকতা নহে ? এবং জিজ্ঞাসা করি এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই ?"[১]

আপাতদৃষ্টিতে য়ুরোপের এই প্রাণশক্তিকে আধ্যাত্মিকতারই একটি দিক বলে মেনে নিলেও বিবেকানন্দ যে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র পার্থক্যের কথা বলেছেন, সেদিক থেকে য়ুরোপের সাধনাকে আমরা ধর্মের পরিচায়করূপে অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার স্বাধিকারের সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। য়ুরোপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের আদর্শ যেমন দেখানো যেতে পারে, ভারতে তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সর্বত্যাগের আদর্শ জাতীয় জীবনের প্রধান সুর। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার স্তরগত তারতম্যের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। য়ুরোপের কর্মমুখর সভ্যতার অসাধারণ মনোবলের কথা স্বীকার করেও বলা যায় তা ভারতীয় পরাবিদ্যাসম্মত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ নয়। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতায়

অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।" রবীন্দ্ররচনাবলী : দশম খণ্ড : পৃঃ ৮৬৬

১ তদেব পৃঃ ৮৬৬-৮৬৭

ব্যবহারিক জীবনের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরমপ্রজ্ঞাই এ সভ্যতাকে আজ অবধি ধারণ করে আছে। হ্যামরগ্রেণ বা নিবেদিতা তাঁদের য়ুরোপীয় ধৈর্য ও একমুখীনতাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁরা যে পরিমাণে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণেই তাঁদের সিদ্ধি। য়ুরোপীয় বলে নয়, ভারতীয়করণের দ্বারাই তাঁদের অধ্যাত্মচেতনার সার্থকতা।

য়ুরোপ-পরিক্রমাকালে স্বামীজী সে দেশের ঐশ্বর্য ও মহিমায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি শুনতে পেয়েছেন সব আনন্দ-কলরোলের অন্তরালে গোপন বেদনার দীর্ঘশ্বাস। স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন—"জড়শক্তির লীলাভূমি য়ুরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে।"[১] তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতা আগ্নেয়গিরির উপরে প্রতিষ্ঠিত নগরী—যে-কোনো মুহূর্তের অগ্নি-উদগীরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। স্বামীজীর এ-বক্তব্য কেবল তদানীন্তন য়ুরোপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য একথা মনে করার কারণ নেই, পরবর্তীকালের দুই মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত য়ুরোপও আসন্ন পরমাণুযুদ্ধের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগ্রাহিতায় বিবেকানন্দের আন্তরিকতাও সমান লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর নির্দেশ—"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর' কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে দেখছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেন নি—তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা, খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা-

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৫১-৫২ দ্রঃ

আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।"[১] রহস্যচ্ছলে দু' সভ্যতার মূল পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখছেন—"দেবাসুরের গল্প তো জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে—পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সেকথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মতো, দেবতাগুলো তো অনেকাংশে হীন। এখন বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।'[২]

পাশ্চাত্যে নারীর সম্মান স্বামীজীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষে বহুযুগের পদদলিত নারীসমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যের নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও কর্মশক্তি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ বিবেকানন্দের পক্ষে মর্মগ্রাহী হয়েছিল—"ক্যাথলিক য়ুরোপের মেরীপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা, বামাচার,—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্টান্ট তো ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু-যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষস্থানে লক্ষরূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'! বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা', 'ধন্য মেরী' 'ধন্য মেরী' দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

"আর মেয়ের পূজো। এ শক্তিপূজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপূজো কুমারী সধবাপূজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক কল্পনা প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপূজো। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণমাত্র; এদের দিনরাত, বারমাস।"[৩]

১, ২, ৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬৮ ; ১৯০-৯১

ফরাসীজাতি য়ুরোপের অগ্রণীরূপে বিবেকানন্দের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার কেন্দ্র। য়ুরোপের নবজন্মবর্ণনাপ্রসঙ্গে (স্বল্পকথায় সরল ভঙ্গিমায় এই নবজন্ম (Renaissance)—বিবরণও অপূর্ব) পারি ও ফ্রাঁসের কথা বিশেষভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে 'পারিপ্রদর্শনী'র অভিজ্ঞতা এদিক থেকে সহায়ক হয়েছে। "এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ এ বিলাস, এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই ফরাসী মানুষ। ধন থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।"[১]

অনেকটা বাঙালীচরিত্রের সঙ্গে মেলে বলেই কি স্বামীজী ফরাসীদের অতো ভালোবেসেছিলেন?

*　　*　　*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার তুলনামূলক আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে আরম্ভ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার, রীতিনীতি ধর্মকর্ম—সর্ববিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে সরস বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ করে রাখে। এদিক থেকে দু'একটি উদাহরণ পাঠকের কাছে নিবেদন করি।

পরিচ্ছন্নতা-সম্বন্ধে দুই সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী—"আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে ময়লা, গায়ে না নেয়ে একটি ধপধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগাগোড়ায় তফাত—হিন্দুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি তা আগাপাস্তলা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৩

সমস্ত কাজে। হিন্দু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিন্দুর পরিষ্কার শরীর হলেই হ'ল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিন্দুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল! হিন্দু করছেন ভেতর সাফ, বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।"[১]

জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের হাস্যরসমিশ্রিত একটি উদাহরণ—'আয়ু, বল, বীর্য, এদের আর আমাদের, অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা বিশ্বাস পূরো থাকে। ওলাওঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্যই কি ভারতের লোক সর্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে?"[২]

আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর হাসিঠাট্টার বিশেষ ভঙ্গী—"পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। একপক্ষ বলছেন যে মাংসাহারে যত রোগ; অপরপক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বলছেন যে ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরে বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপরপক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৭১

২ তদেব: পৃঃ ১৬৫-১৬৬

এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড় বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। একপক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক।"[১]—অবশ্য মাংসাহারকে স্বামীজী রজোগুণাত্মক কর্মের পক্ষেই প্রশস্ত মনে করতেন, সত্ত্বগুণীদের পক্ষে নিরামিষ আহারই নির্দেশ করে গেছেন।[২]

সমগ্র 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' জুড়েই এমনি লঘু ভঙ্গীতে গুরু বিষয়ের অবতারণা। কিন্তু কোথাও এ রচনাকে বাকসর্বস্ব মনে হয় না। প্রতিটি বিষয়ের পিছনে আছে তীক্ষ্ণতম পর্যবেক্ষণ ও সুদীর্ঘ মননের ইতিহাস। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এই কারণেই স্বামীজীর গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

* * *

মননের গভীরতার সঙ্গে বাচনের সরসতার এমন মিলনে বিবেকানন্দের পরে যোগ্য উত্তরসূরী প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গীতে সওয়াল জবাবের প্রাধান্যের জন্য একটু কৃত্রিমতা এসে পড়েছে, তবু সরস গদ্যভঙ্গীর অন্তর্লীন পরিহাসবৈদগ্ধ্যে বাংলা-ভাষার তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। একথা আজকের দিনে পুনরুক্তি করতে হলো—কারণ, প্রমথ চৌধুরী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রবণতাই দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশী। বক্তব্য-নিবেদনে স্বামীজীর আপাত লঘুভঙ্গী আবার যখনই প্রয়োজন দার্শনিক জিজ্ঞাসাও ফুটিয়ে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ—Evolution Theory (স্বামীজীর পরিভাষায় 'পরিণামবাদ') সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। স্বামীজীর মতে এই মতবাদ য়ুরোপে নূতন হ'লেও ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। তবে ইউরোপীয় evolution (এভোলুশন) বহির্মুখী, ভারতীয় পরিণামবাদ অন্তর্মুখী।

"পূর্বে বলেছি যে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে,

১,২ তদেব : পৃঃ ১৭৪, ১৭৫

শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদাভাবটা ভুল; ওসব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি পাথর গাছপালা জন্তু মানুষ দেবতা এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ।...এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন বুঝেছে—এদের রকম দিয়ে—জড় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে।...”[১]

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে য়ুরোপীয় ভারততাত্ত্বিকেরা যখন আর্য-অনার্য-দ্বন্দ্বের কল্পনায় মত্ত, স্বামীজী তখন প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য মন্থন করে এ মতবাদের অসারতা প্রমাণে কৃতসঙ্কল্প। বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক যুগ অবধি কোথাও এ জাতীয় সংঘাতের বিবরণ নেই। রামায়ণের বানর বা রাক্ষস কাউকেই রামচন্দ্র পদানত করতে চান নি, বিশেষতঃ বানরদের তো নয়ই। রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাদের কারণ রাজনৈতিক প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা নয়। রাবণের রাজ্য ও সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী বই কম নয়। সেদিক থেকে বরং আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যজাতিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার স্মরণীয়। অপরপক্ষে সভ্যতার স্তরভেদ অনুসারে ভারতবর্ষ সব অশিক্ষিত ও অসভ্য জাতিকেই গ্রহণ করে ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে—কোনো আরণ্যক জাতিকেই বিনষ্ট করে নি। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে’র পরিশিষ্টে স্বামীজী য়ুরোপ ও এশিয়ায় মুসলমান ও খ্রীষ্টান-বিজয়ের ইতিহাস অবলম্বনে দেখিয়েছেন যে, খৃষ্টধর্মের অনুগামীদের চেয়ে ইসলামের অনুসারীরা অন্য জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিরক্ষায় উদারতর।[২]

* * *

‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে’র এই তুলনামূলক আলোচনার পিছনে স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে আধুনিক জীবনসংগ্রামের

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০

২ তদেব : পৃঃ ২১০-১৩

উপযুক্ত করে তোলা। যে ব্যক্তি বা জাতি ধর্মের নামে আলস্য ও জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় তার ইহকালই নষ্ট, পরকাল তো দূরের কথা।

"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি ·· বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক!···অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহাউৎসাহে অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নয়—আবার 'মোক্ষ!'

···আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।"[১]

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধই বিবেকানন্দমানসে উজ্জ্বলতম। লক্ষণীয়—দু'জনেই ক্ষত্রিয়—বিবেকানন্দ নিজেকে যে বংশোদ্ভূত মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণজীবনে পরমজ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অদ্ভুত কর্মকুশলতা, অনন্তপ্রীতি —এ সব কিছুর সংমিশ্রণ স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করেছে। ভারতীয় জীবনাদর্শের চিরসারথি ও চিরসখা এই মহানায়ক কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যস্থলে বসেই পরম-সত্যের মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিবেকানন্দজীবনের ঝটিকাবর্তের অন্তরালে তন্ময়ধ্যানের উপলব্ধিতে তাঁর স্বভাবস্থিতি লক্ষণীয়। সত্ত্বগুণের অর্থ যে নিরুদ্যম জড়তা নয়, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও নবভারতের বিবেকানন্দ-জীবন।

'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র যে পার্থক্য স্বামীজী আগে বুঝিয়েছেন সেই

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫৩

সূত্রে তাঁর মন্তব্য—'মুক্তিকামের ভাল' অন্যরূপ, ধর্মকামের 'ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান দেখিয়েছেন। অবশ্য কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল মন্দ মিশ্রকর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"[১]

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন স্বামীজী ভিক্টোরীয়যুগের শুচিবাইগ্রস্ততাকে অনায়াসে অবহেলা করেই সবল মনুষ্যত্বের সজীবতা সঞ্চার করেছেন, জাতীয় জীবনে রজোগুণসঞ্চারের আগ্রহেও তেমনি ভালো-মন্দের প্রচলিত মাপকাঠিকে অনায়াসে অবজ্ঞা করেছেন। তবু মূল্যবোধে তিনি যে অবিচল, সেকথা 'প্রাচ্য' আদর্শকে 'দেবতা' ও 'পাশ্চাত্য' আদর্শকে 'অসুরের' সঙ্গে তুলনাতেই পরিস্ফুট। নিষ্কাম আত্মোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া যথার্থ আধ্যাত্মিকতা হতেই পারে না—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেখানে তা আছে সেখানেই যথার্থ আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু আদর্শের সেই তুঙ্গশিখরে পৌঁছুবার আগে সদসৎ-মিশ্রিত কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের যাত্রা। বিচারশীল মন ক্রমে 'সৎ'-আদর্শের অনুবর্তী হয়ে পরম সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছয়।

* * *

'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই গ্রন্থেরই ভাষাশৈলী মোটামুটি এক। তবু 'পরিব্রাজকে'র ভাষায় তৎসম শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এসে স্বামীজীর চলতিভাষা আরো

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫৪-৫৫

স্বচ্ছন্দ, দেশজ শব্দ ও রীতিতে সমৃদ্ধ, পাঠক ও লেখকের অন্তরঙ্গতাও গভীরতর।

দুটি গ্রন্থেই লেখনভঙ্গী এসেছে চিঠিপত্রের অন্তরঙ্গতা থেকে। পরিব্রাজকে যেমন 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে উদ্দেশ করে 'স্বামীজী'—সম্বোধন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তা না থাকলেও উদ্দিষ্ট পাঠক 'উদ্বোধনের' কর্তৃপক্ষ এবং তাঁর গুরুভাইয়েরা—একথা বেশ বোঝা যায়। স্বামীজীর পত্রসাহিত্যের রচনারীতিই এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধ পত্রের চেয়ে দীর্ঘবিস্তারী প্রবন্ধ-রচনায় স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তা ও বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দুয়েরই বহু বিচিত্র ও অতলান্ত প্রকাশ পাঠকের প্রত্যাশাকে আরো বেশী তৃপ্ত করে। সেইসঙ্গে বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আরো বৃহত্তর দানের সম্ভাবনার প্রশ্ন মনে জাগায়। কিন্তু যা হতে পারতো তার আলোচনা সমালোচকের দায় নয়, যা হয়েছে তার সৌভাগ্যকে উপলব্ধি করাই সমালোচকের কর্তব্য। সেদিক থেকে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অমর সৃষ্টি।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র আলাপচারী ভঙ্গীকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টির দার্শনিক পার্থক্য ; দ্বিতীয়ত দুই জীবনধারার দৈনন্দিন ও সামাজিক পটভূমিকায় বিচার ; তৃতীয়ত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দুই সভ্যতার আদর্শ বিচার। কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্য সভ্যতার জন্মভূমি ভারতের মানুষ হিসাবে প্রাচ্য আদর্শের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণশক্তির সঙ্গে স্বামীজীর রজোগুণাদর্শের মিলটুকুও লক্ষণীয়। এ দুই সভ্যতার মিলনসাধনই তাঁর বিশ্বপরিক্রমার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে নিপুণভাবে সাধিত।

উত্তর কলকাতার চলতিভাষাভঙ্গীকেই স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' ব্যবহার করেছেন। এর ফলে একটু অতিরিক্ত আঞ্চলিকতা তাঁর ভাষায় সঞ্চারিত। পরিবর্তনশীল মুখের ভাষা স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই অপ্রচলিত শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আরো

কিছুকাল পরে স্বামীজীর চলতিভাষা কলকাতার লোকের কাছে পুরানোকালের ঠেকতে পারে। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে স্বামীজী যা চেয়েছিলেন—"ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দিতে পারে"—সেই আদর্শ তাঁর চলতিভাষার গ্রন্থদুটিতে সার্থকভাবে প্রমাণিত। কালস্রোতে এ ভাষার ইস্পাতধর্মে কখনো মরচে পড়বে না—এ বিশ্বাস সকলেরই। হয়তো আধুনিক যুগের চলতিভাষায় আধুনিক শব্দ, উচ্চারণ বা ইডিয়ম দেখা দেবে এইমাত্র।

বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে কিছুকাল বাংলাসাহিত্যে তাঁর সাধনা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমকালীন সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম। ১৩১৫ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রমানসে স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়-আদর্শ কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই উদ্ধৃতির দ্বারা এপ্রবন্ধের বক্তব্য সমাপন করি। এ প্রবন্ধে রামমোহন, রানাডে ও বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন-সাধক রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[১]

বাংলাসাহিত্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অসাধারণত্বে যাঁরা গুণমুগ্ধ,

১ সমাজ: পূর্ব ও পশ্চিম: রবীন্দ্র রচনাবলী: ত্রয়োদশ খণ্ড শতবার্ষিক সংস্করণ: পৃঃ ৫৫

তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ অন্যতম।[১] বিবেকানন্দের কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি এ বিষয়টি বাংলার নানা লেখককে আকৃষ্ট করেছে, নানা জনে নানাভাবে এ দুই সভ্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন[২], ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, ভাষারীতিতে ও বক্তব্যস্থাপনে যে সিদ্ধি বিবেকানন্দ আয়ত্ত করেছিলেন, তা চিরকালের শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্তু হয়ে থাকবে।

---

১ উদ্বোধন : সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা : কুমুদবন্ধু সেনের 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের পৃঃ ২৮-২৯-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২ প্রমথ চৌধুরী : 'আমরা ও তোমরা' —প্রবন্ধ
অন্নদাশংকর রায় : পথে প্রবাসে
দেবেশচন্দ্র দাশ : ইয়োরোপা

বাংলা সাহিত্যে বিবেকমন্ত্র ঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

সাহিত্যের শৈলীবিচারে লেখকের ব্যক্তিত্ব যে মুখ্যভূমিকা নিয়ে থাকে, সেকথার সংহত রূপায়ণ 'The Style is the man'—এই সুপ্রচলিত বাক্যটি। কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে এত সুপ্রযুক্ত ও অব্যর্থ মনে হয় যে একে বিশ্লেষণ করার কথাই আমরা ভাবি না। এক্ষেত্রে 'the man'—বা ব্যক্তিসত্তাটির অর্থ কি দাঁড়ায়? লেখকের ব্যক্তিত্বের সমস্ত অংশই কিছু লেখায় প্রতিভাত নয়। লেখার জগতে যে ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিনের জীবনে ও আচরণে সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাও থাকতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর মতো নিপুণ নৈয়ায়িকও অন্তরে অন্তরে রোমান্টিক কল্পচারী হওয়ার ফলে বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক সিদ্ধিতে পিছিয়ে যেতে পারেন। অক্ষয় বড়ালের মতো নারী ও প্রকৃতির রহস্যমুগ্ধ কবিও দৈনন্দিন জীবনে সাবধানী সংসারীর ভূমিকায় ভালোই মানিয়ে যান। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো মর্ত্য ও অমর্ত্যের সেতুবন্ধনে সুদূরপ্রসারী অন্যমনা দৃষ্টি এই দেনাপাওনার জগতে জমিদারীর হিসাব-নিকাশে সাফল্য লাভ করেন। মোটের উপর মানবব্যক্তিত্বের সবটা নয়, বিশেষ কোনো দিক লেখকের রচনায় Style বা শৈলী হয়ে ধরা দেয়। লেখককে অতিক্রম করে তাঁর নিহিত সত্তা রচনার ক্ষেত্রে এক অভিনব জাদু সৃষ্টি করে। অনেক সময় লেখকও বাল্মীকির মতো অবাক হয়ে ভাবেন: 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'—এ আমি কী বলেছি? সেইসঙ্গে প্রশ্ন, কেমন করেই বা বলেছি?

কিন্তু এমন লেখকও মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁদের রচনাগত ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে-বাহিরে যে বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁরা জীবনে প্রকাশ করেন, তাঁদের রচনায়ও তার অবিকল ছায়াপাত। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। 'The Style is the man' কথাটিকেই ঘুরিয়ে বলা চলে 'The Man is the Style'. বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক।

মুখের ভাষায় সাহিত্যকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন বলে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'ভাব্‌বার কথা'র ব্যঙ্গরচনাগুচ্ছ, 'পরিব্রাজকের' ভ্রমণকাহিনী এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র তুলনা-মূলক সভ্যতাবিচার করেছেন। আবার গভীর মননের গাঢ়বদ্ধ বাণীরূপ দিয়েছেন 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধে এবং 'বর্তমান ভারত'-নামে ভারত-ইতিহাসের দার্শনিক বিশ্লেষণে। একদিকে অদ্বৈত বেদান্তের গুহানিহিত ধ্যানমূর্তি আর একদিকে কর্মে পরিণত বেদান্তের লোকপাবনী গঙ্গাধারারূপে সর্বস্তরের সর্বজনের অন্তরঙ্গতা—সাধু ও চলতি গদ্যে বিবেকানন্দের দ্বৈতসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাছাড়া তাঁর অমর পত্রসাহিত্য তো রয়েছেই। একহিসাবে তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টার অধিকাংশই পত্ররচনার অন্তরঙ্গ আলাপচারী। তাছাড়া আছে তাঁর ইংরেজী ও বাংলা কবিতা—যা ভাবে ও কল্পনায় বিবেকানন্দ-মনোমন্দিরের মূল চাবিকাঠি। বিবেকানন্দপ্রতিভার ভাস্বর প্রতিফলন বিবেকানন্দ-সাহিত্য।

* * *

অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-রচনাবলীর (The Complete Works of Swami Vivekananda) ভূমিকা লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ৪ঠা জুলাই, ১৯০৭—স্বামীজীর দেহাবসানের পাঁচবছর পরে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এর চেয়ে ভালো কোনো পরিচায়িকা সম্ভব নয়। প্রথম সংস্করণ ইংরেজী রচনাবলী ছিল চারখণ্ডে বিভক্ত। পরবর্তী সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে রচনাবলীর আটটি খণ্ডে এখন তা বিধৃত। বাংলা অনুবাদে ও মৌলিক রচনায় মিলে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দশখণ্ডের পরিকল্পনা হয় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে প্রকাশিত হয়ে এই রচনাবলী যে অভাবিত জনসমাদর লাভ করে, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের একটি অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা এতকাল পূরণের অপেক্ষায় ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডটিতে রয়েছে স্বামীজীর

মৌলিক বাংলা রচনা এবং অসমাপ্ত একটি বাংলা অনুবাদ (ঈশা-অনুসরণ)। আমাদের মনে হয়, স্বামীজীর মৌলিক রচনারূপে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি এই খণ্ডটিতে সংযোজিত হওয়া এখন প্রয়োজন। প্রথমটি স্বামীজীর প্রাক্‌সন্ন্যাসযুগের রচনা 'সংগীতকল্পতরু' গ্রন্থের (প্রথমসংস্করণ, ১৮৮৭) ভূমিকা 'সঙ্গীত ও বাদ্য'। দ্বিতীয়টি তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে আলমোড়ার পথে ধ্যানোপলব্ধিজাত মনন--'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' (১৮৯০)।[১] তাছাড়া হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির শিক্ষা নামে যে সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বামীজী তাঁর পিতৃবিয়োগের পর করেছিলেন বলে মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন এবং 'বসুমতী' কার্যালয় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত বলে যে বইটি এতকাল প্রচারিত হয়ে আসছিল, সেই মূল্যবান অনুবাদগ্রন্থটিও এখন 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।[২] শেষোক্ত অনুবাদটি বাংলার রচনাবলীর সঙ্গে ষষ্ঠখণ্ডেই স্থান পেলে ভালো হয়। স্বামীজীর প্রথমজীবনে কৃত 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদের কথাও মহেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীতে আছে—আশা করি কালক্রমে সেটিও আবিষ্কৃত হয়ে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ মৌলিক রচনা ও অনুবাদ এ দুয়ের দ্বারাই সংযুক্ত। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর ইংরেজী ভাষণ বা রচনা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনেকে একথা মনেও রাখেন না যে, স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ' বা 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বই মূলে ইংরেজীতেই সৃষ্টি। এ সব রচনার অনুবাদে স্বামীজীর সাধু গদ্যরীতি বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অনুসৃত। সাধারণভাবে বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনার অনুবাদে এই রীতিই পরবর্তীকালেও গৃহীত।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যপাঠের ফল আত্মিক জাগরণ—উপনিষদের ভাষায় 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।' "যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোনকালে বলবান হইবে না, যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জারাদিব কেশরী'।"[১]—এই আত্মবিশ্বাসকে স্বামীজী বর্তমান ভারতের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে করতেন।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস— নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশকোটি দেবতার এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।"

"আমি পাশ্চাত্ত্য দেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়-গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে, 'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে —প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে পারে কি? না, পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা পর্যন্ত পারে না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈতভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি…।"[২]

১ এ গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতিটি অসম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত। মূল পাঠটি এখানে দেওয়া হল। বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৫১-৫২

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা : ভারতে বিবেকানন্দ : পৃঃ ৭৯-৮০

এই আত্মবিশ্বাসের অভয়মন্ত্র-উচ্চারণের পরেই স্বামীজীর যে বাণীটি স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে, মানবজাতির উদ্দেশে তা চিরসংগ্রামের আহ্বান—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতার এই চরণটিতে বিবেকানন্দ-জীবন-সাধনার সংহত রূপায়ণ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বামীজীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' রচনাটির চিন্তাসূত্রের অন্যতম বাণী—'জীবন কি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।'[১] ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা।'[২] বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ দুইই পরিবর্তনশীল মায়িক সত্য। তবু দুঃখ ও মৃত্যুর তোরণ-দ্বারেই মানুষ অনন্তজীবন-রহস্যের মুখোমুখি হয়। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে মহাকালী সেই দুঃখরূপিণী পরম সত্যের প্রতিমা।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শক্তিসাধনার কালী-উপাসনায় যে অন্তরঙ্গ যোগ বাংলাদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে সাধিত বিবেকানন্দ তার আধুনিক উত্তরাধিকারী। ফলে একই সঙ্গে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার অভয়বাণী ও অকল্যাণের সঙ্গে চিরসংগ্রামের প্রতিজ্ঞা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান দুটি সুর। আবার এ দুটি সুরের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রয়াস। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ প্রার্থনায় তিনি শিখিয়েছেন—"আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'[৩]

দ্বিতীয় বার আমেরিকাযাত্রার প্রথম দিনটিতে জাহাজ তখনও গঙ্গাবক্ষে। এক দিব্যপ্রেরণায় স্বামীজী বলেছিলেন—"Yes! the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale." "হ্যাঁ, বয়স যত বাড়ছে, তত

১ এ বইএর পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

২ The Master As I Saw Him

৩ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ২৪৯

আমার মনে হচ্ছে মনুষ্যত্বই সব। অন্যায় করলেও মানুষের মতো কর! শয়তান যদি হতেই চাও, খুব বড়ো দরের শয়তান হও।"[১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই কথাটি আরো বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত—"একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

"মানুষ হও রামচন্দ্র। অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা আপনি গড়-গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পারের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"[২]

অর্থাৎ বড়ো দরের অন্যায় করাটাই তিনি মনুষ্যত্ব মনে করতেন না। কিন্তু যাদের মানসিক হীনতা অন্যায় করবার সাহসও রাখে না, তাদের চেয়ে সাহসী অন্যায়কারী তাঁর কাছে বেশী সমাদৃত। আবার যথার্থ আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত নির্ভীক মানুষের কাছে কোনো অন্যায়ের চিন্তাই তো আসতে পারে না! অমৃতসত্যের সেই অভয়বাণী শোনাতেই বাংলাদেশে ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংঘাতে দুই ধরনের রক্ষণশীলতা আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনপন্থী একদল উটপাখির মতো অতীতের বালুভূমিতে মুখ গুঁজে শাস্ত্র ও গুরুবাদের দোহাই দিয়ে সব যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নিজেদের অন্ধসংস্কার অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে উৎসুক; আর একদল নবীনপন্থী চান যে-কোনো আধুনিক মতবাদের প্রশ্নহীন অনুকরণে স্বজাতি ও স্বদেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভুলে আত্ম-অবলোপ। সভ্যতার সংঘাতে এমন সংকট দেখা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজী এই সংঘাতের সুফলের উপরেই জোর

১ The Master As I Saw Him : Sister Nivedita's Complete Works : Vol I : p. 122.

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬২

দিয়েছেন। যে ভুলভ্রান্তি বা সাময়িক আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়েছে, তার উপরে তুলে ধরেছেন মানুষের ভুল করার অধিকার। মানুষই ভুল করে, কারণ মানুষই জৈবসত্তার উপরে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। "যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।... মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি?"[১]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস কি? সাহিত্যতত্ত্বে যে নবরসের কথা বলা হয়, তাতে ধর্মীয় সাহিত্যের মূলে রয়েছে শমভাব। সে সাহিত্যের পরিণাম শান্তরস। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্বের বহু বিচিত্র ভাবধারার আবর্তে গড়ে-ওঠা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল প্রেরণায় শান্তরসের অনুভূতি কিছু পরিমাণে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার সংগ্রামী রূপটিই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

বীররসের মূলে রয়েছে উৎসাহ। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রেরণামন্ত্র 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—যেটি তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শবাণীরূপে নির্বাচন করেছিলেন, সেই মন্ত্রটি অধ্যাত্ম আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য মানবচিত্তে জাগরণের আহ্বান। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংলাপে ধর্মরাজের মুখে এই আহ্বান ধ্বনিত। বীরত্বের আদর্শের দিক থেকে কায়িক ও মানসিক দু'ধরণের বীরত্বের কথাই আমরা ভাবতে পারি। ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল সত্যলাভের জন্য সর্বদুঃখবরণের নির্ভীকতা। সাধারণভাবে যাকে 'বীররস' বলা হয়, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে তা আছে সন্দেহ নেই। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র বীররস এই কারণেই স্বামীজীকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। তবু, 'বীররস'ই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস নয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের লক্ষ্য মানবজাতির আত্মিক জাগরণ। সে জাগরণের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের সাধনা—আর এই মনুষ্যত্ব-উপলব্ধিই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তরতম রসোপলব্ধি। বিবেকানন্দ-সাহিত্য-

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৪৪

পাঠ আমাদের মনুষ্যত্ব থেকে মুমুক্ষুত্বলাভের পথে প্রেরণা দেয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি, সুখ-দুঃখ, জন্মমরণ, দেবাসুরের চিরদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় এই মনুষ্যমহিমার উপলব্ধির জগতে আহ্বান করে। 'Manliness' বা মনুষ্যত্বের প্রেরণাকে পাশ্চাত্য humanism (মানবিকতা) কথাটির দ্বারা আংশিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসত্তার অপূর্ণতার স্বীকৃতি সে মানবিকতাবাদে নেই। অপূর্ণ বলেই মানুষের পূর্ণতার প্রয়াস, আর সে পরমপূর্ণতা মানুষেরই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার—এই উপলব্ধি বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী, প্রেমিক ও সন্ন্যাসী—সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের প্রেরণার আধারে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূলরস যে মনুষ্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত, সে জাতীয় রসবাদ অতীতের সাহিত্যচিন্তায় মেলে না। নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডীকে অতিক্রম করাই সব মহৎ সাহিত্যের ধর্ম।

যে 'মানব'-চিন্তা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র, সে মানুষের যেমন বিশেষ কোনো দেশকাল নেই, তেমনি আর এক অর্থে সে মানুষের আবির্ভাব এই ভারতবর্ষেই। সে মানুষ জগতের অধীশ্বর হয়েও পরমসত্যের প্রেরণায় সর্বত্যাগী, বিশ্বের মুক্তিকামনায় আপন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিসর্জনকারী। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিবেকানন্দের সেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র আহ্বান—

Awake, arise, and dream no more!
This is the land of dreams, where karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts
Of flowers sweet or noxious—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth! Be one with it! Let visions cease,

Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.[১]

ওঠো জাগো আর স্বপ্ন নয়,
স্বপ্নের এই জগতে ভালো মন্দ নানাফুলের বিনিসুতোর মালা
গেঁথে চলেছে আমাদের কর্ম। মূলহীন বৃন্তহীন সেই পুষ্পরাশি
পরমসত্যের মৃদুতম স্পর্শ পেলে আদিম শূন্যতায়
বিলীন হয়ে যায়। অভী হও, নির্ভয়ে সত্যের মুখোমুখি
দাঁড়াও। সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। সব কল্পনা থেমে যাক।
আর যদি তা না পারো, তবে অনন্ত প্রেম ও নিষ্কাম সেবার
মহত্তর স্বপ্নই দেখো।

মহত্তম সত্যের সেই আহ্বানই—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় 'জাগো বীর'[২]—বাংলাসাহিত্যের বিবেকমন্ত্র। বিবেকানন্দের স্বল্পসীমার জীবনবৃত্তে যে অনন্ত তেজের ভাণ্ডার নিহিত ছিল, জীবনে, সাহিত্যে, ভাষায়, বিপ্লবে, জীবনসংগ্রামে ও পরম আত্মত্যাগে তাই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বমানসে ও বাংলা ভাষায় আমাদের অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

১ বীরবাণী : শতবার্ষিকী সংকলন : পৃঃ ৫৪

২ জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।
—বীরবাণী

ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণদর্শন[১]

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর[২] লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে[৩] সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশলায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাধরের খাতাতে তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র[৪] ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই ; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই, এবং তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্যভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

…আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্ম-মীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন][৫]

In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত ; শবোপরি শিবা—কল্পনা নহে ; যেমন মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনাদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তাও করিতে পারে না। অতএব In the beginning there was the word, and the word was with God and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।

অথ ধর্ম মীমাংসা

১। দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

২। এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েই হইতেছে।

৩। এই নিয়মের অধীনে প্রতি পত্র, শিরা ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা ও এবম্প্রকার বহু মনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমষ্টিস্বরূপ এই মনুষ্য-জগৎ।

৫। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শুভ এবং কতক-গুলিকে অশুভ মনে করি। (পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শুভাশুভ কি? এবং যথার্থ বোধ কি না?) প্রস্তাব, মনুষ্যকে হিতাহিত, শুভাশুভ, উত্তমাধম জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সিদ্ধান্ত করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

৬। ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টি-বোধ, পরকাল-বোধ এবং কর্ম-বোধ-জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্যে পরিণত হইয়া মনুষ্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে তাহার নাম ধর্ম।

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তুগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট দ্বারা, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা, সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা দ্বারা, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই জগতের উৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ফল, ঈশ্বরানুগ্রহে খণ্ডিতব্য ফল, স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন ইত্যাদি বহু প্রকারে কর্মের ফল অনুমিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিভিন্ন অনুমানের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে।

৮। সমাজের বিভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।

৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রমমাত্র বোধ করেন। পূর্বে তরবারি দ্বারা, এক্ষণে যুক্ত্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী—এবং পণ্ডিতদিগেরও মত এই যে, মনুষ্যজাতি যে প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে—যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি তাঁহার সত্যের সীমা।

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি

নমো রামকৃষ্ণায়

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সমষ্টি একটি জীবন, সেই প্রকার সর্বমনুষ্যের সমষ্টিস্বরূপ এই বিরাট মনুষ্যের

অর্থাৎ মনুষ্য-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা সান্ত অথবা অনন্ত।

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থাস্বরূপ।

৩। যেমন বৃদ্ধ যদি বলে—আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে যেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম অবস্থাগত মনুষ্য সমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বকে ভ্রান্ত বলা উন্মত্ত প্রলাপ।

৪। কারণম্ এব কার্যমনুপ্রবিশতি—কারণই কার্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নূতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা হইলেও কারণটা তাহার মধ্যে থাকিল।

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, প্রত্যেক পূর্ব ধর্মমত পরধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। অতএব যদি মনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ্বাসে আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘৃণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহাও সত্য।

৭। ধর্মপরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে। পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।

৮। যেমন আমরা কোন পোলে (খুঁটিতে) উঠিতে গেলে, নিম্নস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্তু এই সমস্ত স্থানের সমষ্টিই পোল। সেই প্রকার এই সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম; এবং এই সকল ঈশ্বর-ভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।

৯। অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত হইবে, তাহাও সত্য।

১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কত কি তা জানি না।

১১। এই পৃথিবীলোকে যত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনন্ত জগতে যত হইবে, এবং অন্যান্য লোকে যত আছে এবং সম্ভব; ভূলোক দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত রূপ আছে এবং হওয়া সম্ভব, এবং ভাব, রূপ, গুণ যে প্রকার মনুষ্যজীবের মানসিক বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম চিদাত্মা জীবসমূহ যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, যদি আরও কত প্রকারের মনুষ্যের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে; এই সকলের সমষ্টি বিরাট পুরুষের নাম ঈশ্বর।

১২। পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরে তাহা হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি দোষ কি বর্তমান?

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচনা কর, মনে কর—একটি শক্তি কোন একটি বস্তুর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,—কেবল একটি, তাহা

হইলে গতি অসম্ভব। ইহা নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে কার্য করিলেও হইবে না; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যাহতভাবে কার্য করিলে (Contrary and Contradictory হইবে, অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার প্রতিরূপ প্রতিঘাত শক্তির দ্বারা ব্যাহত হয়, ইহাও সত্য। (3rd law of Newton)

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান ; এবং ইহাই বিশ্বের জীবন।

১৬। জীবন কি ? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

১৭। যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়।

১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শান্তি, ক্রোধ, প্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের যুগ্ম বর্তমান নহে ?

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ কেবল পর্যালোচনা করিয়াছে, অপরগুলি করে নাই।

২০। পূর্বপক্ষ—এক শ্রেণীর কার্য যে প্রকার দয়া, ধর্ম ইত্যাদি যথার্থ সৎ ; অপর শ্রেণী—অর্থাৎ পাপ ইত্যাদিই মায়িকসত্তা অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র।

২১। উত্তর—তাহা হইলে আমাদিগেরও উল্টাইয়া বলিবার অধিকার আছে ; যথা পাপই সত্তা, পুণ্যাদি মায়িক।

২২। সত্তা উভয়েই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব কারণও এক প্রকারের।

পরিশিষ্ট—২

'সঙ্গীতকল্পতরু'

['বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের সূচনায় 'সঙ্গীতকল্পতরু' প্রসঙ্গে যে আলোচনা ছিল, এ সংস্করণে তা পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। সেইসঙ্গে নবলব্ধ কিছু তথ্যও সংযুক্ত। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান লেখকই সামান্য আকারে হ'লেও আলোচনার সূত্রপাতকারী। এ গ্রন্থের সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর আলোচনা-গ্রন্থ দুটি দেখবেন। 'সঙ্গীত-কল্পতরু'-র ভূমিকা-রচয়িতা কে, এ প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড) থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য—"বিভিন্ন কারণে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই ইহার লেখক। এই বিষয়ক যুক্তিগুলি আমরা পর পর উপস্থিত করিতেছি। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বলা হইয়াছে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন একখানি বাংলা গানের পুস্তকের জন্য। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথ বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের বাজনা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা বড়তলার বৈষ্ণবচরণ বসাক

প্রকাশ করেন ও উহার একখানি পুস্তক বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু লিখিয়াছেন, প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনাদ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র পুস্তক প্রকাশককে তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।' (পৃঃ ৮০) ইংরেজী জীবনী এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দের সম্মিলিত রচনা The Life of Swami Vivekananda এবং শ্রীপ্রমথনাথ বসুর উদ্ধৃতিটি তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" নামে জীবনীগ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

'সঙ্গীতকল্পতরু'র সূচনাপৃষ্ঠা—

সংগীত-কল্পতরু*

অর্থাৎ

নানাবিধ বাদ্যাদি শিক্ষা, স্বরলিপি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে
বিস্তর শিক্ষাপ্রদ বিষয় সহ জাতীয়, ধর্ম্ম-
বিষয়ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক,
সামাজিক, প্রণয়, বিবিধ
এবং নানাবিষয়ক
গীত সংগ্রহ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ,
ও
শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

———

১১৮নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
আর্য পুস্তকালয় হইতে
শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১২৯৪ সালে। এই সংস্করণে 'বিশেষ কথা'-শীর্ষক একটি ছোট্ট সূচনা লিখেছেন শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক —"সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে যদিও ভূরি ভূরি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নানারূপ বাদ্যশিক্ষা, সঙ্গীতশিক্ষা, সুর, আলাপ ও বিবিধ সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সহ একাধারে নানা দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের গাথা একত্রে

সমাবেশিত এরূপ সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনকারী পুস্তক অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। 'সঙ্গীতকল্পতরু' আজ সেই অভাব-পূরণের জন্য জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সঙ্কলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।..."

পাঠকসমাজে এই সঙ্গীতসঙ্কলনটি কি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের মাঘ মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১২৯৫-এর জ্যৈষ্ঠে তৃতীয় সংস্করণ।

সঙ্কলনটির বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে সমকালীন শিক্ষিত সমাজের রুচি ও প্রবণতার সুন্দর নিদর্শন মেলে। প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত। হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে"—কবিতাটি দিয়ে সূত্রপাত। এই বিভাগের অনেকগুলি গানের তলার শুধু 'হিন্দুমেলা' লেখা। মনে হয়, এগুলি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর প্রেরণায় অনুষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা'য় গাওয়া হ'ত। সেকালের জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ তপন', 'তব পদে লই শরণ'; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ', মনমোহন বসুর 'দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন' প্রভৃতি অনেক গান এ সঙ্কলনে সংগৃহীত।

এই সঙ্কলনকালে ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি-লোকে সর্বাগ্রে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী জীবনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বদেশপ্রেম তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান সুর।

জাতীয় সঙ্গীতের পর ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত দাশরথি, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গানের উপস্থিতি স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ দু'জনেই এই সাধক কবিদের গানের অনুরাগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যে গান দুটি শুনিয়েছিলেন—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের 'যাবে কিহে দিন আমার' এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর 'মন চল নিজ নিকেতনে' গান দুটি এ সঙ্কলনে গৃহীত। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'কালী কালী বলোরে আজ' গান দুটির নির্বাচন লক্ষণীয়।

জাতীয় এবং ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের পরে শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত, বৈষ্ণবদিগের গান, বিবিধ ধর্মসঙ্গীত, খ্রীষ্টানী সঙ্গীত, মুসলমানি গান, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, বিবিধ সঙ্গীত, নানাবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে সঙ্গীতরচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় সঙ্কলন এই 'সঙ্গীত-কল্পতরু'।

বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণ বইটি আদ্যন্ত হাতের লেখায় পরিমার্জিত। খুব সম্ভব এ হস্তাক্ষর স্বামীজীর নিজের। কিন্তু কোন সংস্করণের জন্য এ পরিমার্জনা? পরবর্তীকালে তো বইটির নাম হয়েছে 'বিশ্বসঙ্গীত'; এবং নরেন্দ্রনাথের নাম মুছে ফেলে গ্রন্থকার হিসাবে রয়েছে শুধু বৈষ্ণবচরণের নাম। সে যাই হোক, এই তৃতীয় সংস্করণের সংশোধনী হস্তাক্ষরটি যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয়ে স্বামীজীর হাতের লেখা বলে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়, তবে ঐ হস্তাক্ষরে সংশোধিত ভূমিকাটি পরম মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় সংস্করণের সূচনায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'সঙ্গীতকল্পতরু' এই শিরোনামের উপর হাতে লেখা আছে—

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।

* * *

সঙ্গীতে যে সুখ পাই, সে সুখ কোথাও নাই,
এ সুখে বাঞ্চত যেই, বিফল জীবন তার।
"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ জ্ঞেয়ঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ"

তার আগে গীতের সূচীতে (পৃঃ ৵০) শেক্সপীয়রের 'মর্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে "The man that hath no······no such man be trusted". অংশ টুকু হস্তাক্ষরে উদ্ধৃত। এ হাতের লেখাও স্বামীজীর ইংরেজী হস্তাক্ষরের মতো।

প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে যে সাধক ও কবিগণের জীবনীসংগ্রহ রয়েছে, তৃতীয় সংস্করণে সেটি 'সংগীত ও বাদ্য' ভূমিকার পরেই সন্নিবিষ্ট। তৃতীয় সংস্করণে ভূমিকা পরিবর্ধিত এবং পূর্ব সংস্করণের গানও কিছু বদলেছে, কিছু নূতন সংযোজিত। এই নব সংযোজনের মধ্যে আছে স্বামীজীর নিজের তিনটি গান—'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' (ইংরাজী সুর—একতালা); 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি' (রাগিণী বাগেশ্রী তাল আড়াঠেকা), 'একরূপ-অরূপ-নামবরণ' (রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল)। রচয়িতার নাম 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত'। (পৃঃ ৫৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য।)

অন্যান্য গানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' (রাগিণী—তিলককামোদ—তাল ঝাঁপতাল), রবীন্দ্রনাথের 'গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে', 'বল গোলাপ মোরে বল' 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে', 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' প্রভৃতি আজকের দিনের পাঠকের কাছে আগ্রহজনক।

সর্বশেষে বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতরচনা সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত উদ্ধৃত করে তাঁর এ যুগের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি উদাহরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, রাজা রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-রচনার সূচনা।

---

১ 'সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে (পৃঃ ৯৭-৯৮) ভারতীয় সঙ্গীতপ্রসঙ্গে 'সঙ্গীত কল্পতরু' থেকে উদ্ধৃত ভাবসৌন্দর্যমণ্ডিত অংশটি 'সঙ্গীত কল্পতরু'র প্রথম সংস্করণের সূচনায় 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনার ৮-৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-রচনা সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অভিমত—"আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। যদি কেহ ঐ সকল পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চা থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দীভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না; অনেক গায়ক সেই রাগ, সেই তাল, কেবল ভাষা বাঙ্গালা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইহারা সঙ্গীতের মূল সূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাঙ্গালা গাহিলে লোকে আদর করিবেনা, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্‌ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে. তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয় তাহা হইলে হিন্দি গানও বাঙ্গালাভাষায় না গাহিলে চলিবে না।

এই সর্বলোকসুখপ্রদ সর্বসন্তাপহারী মোক্ষপ্রদ সঙ্গীতশাস্ত্র কি এতই সহজ যে, চিরকাল অভিজ্ঞ (?·) কুসংস্কারান্ধ "ওস্তাদজি"দিগের হস্তে পড়িয়া থাকিবে। আমরা দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং শব্দ শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত ইহার প্রাণে প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিলাম না।…"[১]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের রচয়িতাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। 'সঙ্গীত কল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণে বিধৃত নরেন্দ্রনাথ দত্তের গান তিনটির মধ্যে 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি', এবং 'একরূপ-অরূপ-নাম বরণ' গান দুটি ছাড়া তঁার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংগীত 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' বাংলা ধ্রুপদী সঙ্গীতের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে



বিবেকবাণীর উৎস ও গতি

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জীবনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখেছেন, সব কিছুই তাঁর কাছে মহৎ, পবিত্র ও সুন্দর। মানুষ তাঁর কাছে শুধু মানুষ নয়, দেবতা। সে ভুল করতে পারে, অন্যায় করতে পারে, তবু দেবতা। তার ভুল, তার অন্যায় সাময়িক; সুযোগ-সুবিধা, উৎসাহ এবং শিক্ষা পেলে, তার সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হলে সে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ তাকে বড় করবে না, সে নিজের শক্তিতে বড় হবে। বড়র সম্ভাবনা তার মধ্যে বীজাকারে আছে, সেই বীজ মহীরুহে পরিণত হবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে। স্বামীজীর কাছে জীবন সার্থক ও সুন্দর এই কারণে যে, তার মধ্যে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে; তার সাহস, ধৈর্য, অনমনীয় দৃঢ়তার স্বাক্ষর রয়েছে। তার ভুলভ্রান্তি, পরাজয়, ভীরুতা, এগুলিও আছে, কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে এসব কিছুই নয়। শেষ যুদ্ধে সে জয়ী হবেই। তাই স্বামীজী মানুষকে ভালবাসতেন, মানবজীবনের প্রতিটি দিকই তাঁর কাছে মূল্যবান।

জীবন মানে পূজা, নিজেকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা। এই জীবনের কোন ঘটনাই তাঁর কাছে ক্ষুদ্র বা নগণ্য নয়। তাই দেখি, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আপাতদৃষ্টিতে যা ধর্ম বহির্ভূত, তা নিয়েও চিন্তা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারেঃ যিনি সংসারকে অনিত্য বলে ত্যাগ করেছেন, তাঁর চিন্তাজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান, ইংরেজ ও ভারতীয় এই সব প্রসঙ্গ আনাগোনা করে কেন? নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কিনা, তা দেখবার কি প্রয়োজন তাঁর? কেন তিনি শূদ্র শক্তির জাগরণ কামনা করেছেন? সব দেশই তো তাঁর দেশ। তাহলে ভারতের প্রতি বিশেষ দরদ কেন তাঁর? এক কথায়—শুধু বেদান্ত প্রচার নিয়ে তিনি থাকেননি কেন? "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এই বেদান্তের বাণী। যা মিথ্যা, সেই জগৎ নিয়ে সময় নষ্ট করার কারণ কি? কেন তিনি একথা বলেছেন যে, যতক্ষণ একটি মাত্র কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তাঁর মুক্তি নেই? এসবের কারণ, জীবনকে তিনি অস্বীকার করেননি। প্রকৃত বেদান্তবাদীর মতো তার ব্যবহারিক সত্যতা মেনেছেন; বুঝেছেন, এই জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, মৃত্যুকে জয় করতে হবে, অমৃতত্ব লাভ করতে হবে। তাই দেখি, তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদীর মতো দারিদ্র্য দূর করতে চান, বিজ্ঞান ও

কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ভিতর দিয়ে জীবনের মান উন্নত করতে চান, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়তে চান, প্রাচ্যের চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাস্তববুদ্ধির সমন্বয় ঘটাতে চান।

জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, এমন কোন দিক নেই, যে বিষয়ে এবং যেদিকে স্বামীজী চিন্তা করেননি এবং নতুন আলোকসম্পাত করেননি। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে আমরা এক মত না হতে পারি, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁর প্রত্যেক চিন্তা গভীর ও মৌলিক, এবং তার মধ্যে তাঁর সর্বজনবিদিত মানবপ্রেমের স্পর্শও সুস্পষ্ট।

কিন্তু কোথা থেকে পেলেন স্বামীজী তাঁর এতগুলি অভিনব চিন্তা? কি করে পেলেন তাঁর এই অভূতপূর্ব মানবপ্রেম? কি তার উৎস? কার যাদুস্পর্শে তাঁর চিন্তা ও বাণীর এই তেজ, এই বেগ, এই গভীরতা? স্বামীজী পড়েছিলেন অনেক, আর একবার যা পড়তেন, তা কখনও ভুলতেন না। সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যেসব চিন্তা, তার সঙ্গে স্বামীজী সুপরিচিত ছিলেন। মিল, বেন্থাম, স্পেনসার, ডারউইন—এই সব দিকপালের যাবতীয় গ্রন্থ স্বামীজীর অধীত। ইতিহাস ও দর্শন ছিল তাঁর পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয়। আবার প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারও তাঁর আয়ত্ত ছিল। সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ উত্তমরূপে অধিগত করেছিলেন। কিন্তু শুধু তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর পাঠের উদ্দেশ্য ছিল না, তথ্যের পিছনে যে ভাবের ইঙ্গিত আছে, তার অনুধাবন করাই ছিল তাঁর জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য। কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনার পিছনে অতীত ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে। তার মর্ম গ্রহণ করাই হচ্ছে শিক্ষার মূল কথা, এ বিষয়ে স্বামীজী ছিলেন সবিশেষ সচেতন। তাঁর "ভাববার কথা" বা "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পড়লেই বুঝতে পারা যায় কী তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি! শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বার বার তিনি বলেছেনঃ তথ্যসংগ্রহ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মননশীলতা। এ বিষয়ে তিনি নিজেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমুদ্র যতই তিনি মন্থন ক'রে থাকুন, স্বামীজীর এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি, এই দৃষ্টিশক্তি ধার করা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর যে বিদ্যা, তা পুঁথিগত বিদ্যা নয়। পুঁথিগত বিদ্যা কৃত্রিম, নিষ্প্রাণ, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন। স্বামীজীর বিদ্যা সহজ, সাবলীল ও গতিময়। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। দুর্বার পর্বতভেদী নির্ঝরের মতো। এ তাঁর অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ—জ্ঞানবহ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মানুভূতির লক্ষণ। তিনি ব্রহ্মময় জগৎ দেখেছেন, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখেছেন। সকল জীব তাঁর কাছে ব্রহ্ম। সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর দৃষ্টি উদার, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল; জ্ঞান শুদ্ধ, সত্য, মুক্ত, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। উপনিষদে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"[১] উত্তরে গুরু বলেছিলেনঃ আত্মা। স্বামীজী সেই আত্মাকে জেনেছিলেন। গুরুকৃপায় এবং নিজের সাধনবলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে তিনি শক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন। যোগদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজীর বিচারশক্তি তাই অভ্রান্ত, প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ভুল। মানুষের মধ্যে তিনি দেখতেন ঈশ্বরকে, তাই তাঁর সব প্রচেষ্টা মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতেই শুধু তিনি শক্তিমান ছিলেন না, ঠাকুরের অখণ্ড ভাবরাশিই তাঁর চেতনার মূলে উৎসস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর ঋণের সম্বন্ধে বলেছেনঃ "সমস্তই সেই একমাত্র উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, সবই এসেছে সেই পূতাত্মা থেকে, সেই অসীম অনুপ্রেরণা হতে, যিনি আমার ভালবাসার ভূমি ভারতবর্ষে নিগূঢ় সমস্যার সমাধান করেছেন এবং সে মীমাংসা দ্বিধাশূন্যচিত্তে নির্বিচারে, ভগবৎসুলভ মুক্ত হস্তে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।"*

তিনি অনেক বিষয়ে চিন্তা করেছেন, অনেক সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়েছেন, মানুষের মনের অনেক অন্ধকার দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সব কিছুর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করে, সর্বশেষে তাকে পর্বতশীর্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া, যেখানে সে নিজেকে জানবে, জানবে সে জগৎ থেকে ভিন্ন নয়, সে সকলের মধ্যে বিরাজ করছে বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে। জানবে সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সে স্বয়ং পরমাত্মা, ঈশ্বর। স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মূল সুর—জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, জীব শিবই। তাই জীবপ্রেম শিবপ্রেম।[২] তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ আমি সেই ভগবানকে পূজা করি যাকে অজ্ঞেরা মানুষ বলে। দুষ্ট যারা, সমাজের হেয় যারা, তারাও তাঁর কাছে নারায়ণ। মূর্খ, মুচি, মেথর, তাঁর রক্ত, তাঁর ভাই। তিনি সমস্ত পুঁজিবাদী ও সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের তিনি শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বলেছেন; স্বাগত জানিয়েছেন ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল থেকে, হাট-বাজার থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে বেরিয়ে-আসা নতুন ভারতকে।[৩] এই ভারত বেদান্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে, নতুন যে সমাজ ভারতে রূপ নেবে তা মুসলিম সমাজের মতো শ্রেণীবিহীন হবে, কিন্তু তার জীবনদর্শন বেদান্তই থাকবে- এ এক নতুন সমন্বয়ধর্মী পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নতুন এক সভ্যতা

রূপ নেবে ভারতে, যা ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে সে নিজের মধ্যে যে ঐশ্বরিক সত্তা আছে, তাকে সম্ভোগ করতে পারে এবং নিজের চরিত্রে তাকে প্রকাশ করতে পারে—এই বাণীই হচ্ছে স্বামীজীর সব বাণীর প্রাণকেন্দ্র। এই জীবনদর্শনই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ামক হয়ে থাকবে—এই ছিল তাঁর আশা।

প্রথম থেকেই স্বামীজী একজন 'চিহ্নিত' ব্যক্তি। তাঁর গুরুর লীলাসহচর। লোকশিক্ষার জন্য তাঁর জন্ম। নর-ঋষি। অখণ্ডের ঘর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে মর্ত্যে আগমন। যুগ-প্রয়োজনে বার বার অবতারের সঙ্গী। স্বতঃ-ই মন ঈশ্বরমুখী। ধ্যানসিদ্ধ, তাই খেলাচ্ছলেও ধ্যান করতে ভাল লাগে এবং জমাট ধ্যান হয়। সমাধি সর্বদাই করায়ত্ত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে চাবিকাঠি।[৪] যে উদ্দেশ্যে দেহধারণ, তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে বন্দী, মুক্তি নেই। নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। বড় আধার। পুরুষের সত্তা। পদ্ম মধ্যে সহস্রদল। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে, আবার জিতেন্দ্রিয়। খাপ খোলা তরোয়াল, অপরের কথা কচ্ কচ্ করে কেটে দেন। যুক্তিতে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। নেতৃত্বে তাঁর জন্মগত অধিকার।

স্বামীজী যেযুগের মানুষ, সেই যুগটা একটা ভাঙাগড়ার যুগ। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে ভারতের মানসজগতে তখন দারুণ এক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত ভারতবাসী পুরাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত। সর্বত্র তখন প্রচণ্ড বিতর্ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে কেন্দ্র করে এবং স্বভাবতই পাশ্চাত্যের প্রাধান্য স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীও এই যুগ-প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁরও মনে নানা দ্বন্দ্ব, নানা প্রশ্ন। মনে দ্বন্দ্ব ছিল বলেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আবার এই দ্বন্দ্বের জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজের বাইরে চলে এসেছিলেন। এই দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিল তাঁর বাড়ীর পরিবেশ। তাঁর মা-ই তাঁকে প্রথম প্রাচ্য জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্রতকথা--তাঁর মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল। মুখে মুখে তিনি তাঁর আদরের 'বিলে'কে শিখিয়েছিলেন ত্যাগের মহিমার কথা, সত্য কি করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, প্রেম ও অহিংসার মহত্ত্বই যে শ্রেয়, তার কথা। পিতামহ ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর স্মৃতিচারণ শুনে শুনেও

স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ ত্যাগ নিশ্চয়ই আরও উদ্দীপিত হয়েছিল। আবার, তাঁর ব্যবহারজীবী বাবার মজলিসের আলোচনাও তাঁকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য করত। মায়ের সাহচর্য তাঁকে বিশ্বাসের যে দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিত, বাবার বন্ধু-বান্ধব ও মক্কেলদের সাহচর্য তাঁকে সেই দৃঢ় ভূমি থেকে পরমুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত করে দিত। তাঁর বাবার মজলিস এক অদ্ভুত শিক্ষাস্থল ছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সব মতের ও পথের লোকের অবাধ যাতায়াত ছিল সেখানে। সবাই স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলতে পারতেন সেখানে। তবে যিনি যাই বলুন, যুক্তির সঙ্গে বলতে হবে। ঈশ্বর আছেন যেমন বলা চলবে, ঈশ্বর নেই তেমনই বলা চলবে। সুতরাং প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হত, যুক্তির লড়াই লেগেই থাকত। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজী যখন বালক, তখন থেকেই এই লড়াইয়ের একজন উৎসাহী শরিক। তর্কের বিষয়বস্তু যাই হোক, তাঁর বাবা নরেন্দ্রনাথের কি মত জানতে চাইতেন, আর আত্মসচেতন বালক নরেন্দ্রনাথও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর যা বক্তব্য তা জানিয়ে দিতেন। প্রতিপক্ষ বিদ্যায় ও বয়সে যতই বড় হোন, তাঁদের মত অযৌক্তিক মনে হলে তাকে আক্রমণ করতেও স্বামীজীর এতটুকু দ্বিধা হত না। সে প্রতিপক্ষ তাঁর বাবা হলেও না। এ ডেঁপোমির জন্য পাড়ায় স্বামীজীর যে যথেষ্ট দুর্নাম ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি বকাটে বা ডেঁপো যাই হোন, কথায় ও যুক্তিতে তাঁর বুদ্ধি পরিণত বয়সের মানুষের মতো। তাঁর বাবা বিশ্বনাথবাবু নিজে স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী, অপরের স্বাধীন চিন্তাতেও হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতেন না। তাঁর ছেলের স্পষ্টবাদিতায় তাঁর বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হলেও তিনি বাধা দিতেন না, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, স্বামীজী বয়সে কম হলেও সব সময়েই যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন।

স্বামীজী তাঁর বাবা-মার কাছ থেকে অনেক মানবিক গুণ পেয়েছিলেন যা পরে পূর্ণভাবে বিকশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্তের প্রভাবে। বিশ্বনাথবাবু অকাতরে দান করে যেতেন (মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথের মতে, এ তাঁর একটা ব্যামোর মতো ছিল) এবং এ বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। নেশাখোর যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করলে হয়তো তার সর্বস্ব সে নেশার জন্যই খরচ করবে, তা জেনেও তিনি তাকে সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না। এ বিষয়ে একবার স্বামীজী আপত্তি করলে বিশ্বনাথবাবু বলেছিলেনঃ "জীবনটা যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তার লাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।"

পরবর্তী জীবনে এসব লোককে দয়ার চোখে দেখেননি স্বামীজী, শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। শ্রদ্ধা এই কারণে যে, তাদের মধ্যেও দেবত্ব আছে। দয়া করলে ছোট করা হয়। কেউ তাঁর কাছে ছোট নয়, ঘৃণ্য নয়—তা সে যত অন্যায়ই করুক।

স্বামীজীর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন আমাদের মুগ্ধ করে। যাচাই না করে শুধু অমুক বলেছেন বলে কোন জিনিস মেনে নেওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। ডানপিটে স্বভাব তাঁর চিরকালের। গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে বলে সেই গাছে তিনি উঠবেন না, এমন পাত্র তিনি ছিলেন না। সেই গাছে উঠতেই হবে তাঁকে, শুধু দেখবার জন্য সত্যি সত্যিই ব্রহ্মদৈত্য আছে কিনা। অপর জাতের হুঁকোয় তামাক খেলে জাত যায় বলে শুনেছিলেন বালক নরেন্দ্রনাথ। সত্যিই কি যায়? কিভাবে যায়, কোন্ দিক দিয়ে যায়? তা পরীক্ষা না করে মেনে নেওয়া সেই আশ্চর্য বালকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরীক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন হুঁকোয় টান দিয়ে দেখেছেন। বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলেন, কিন্তু এমনই বাবা যে, আপত্তি করলেন না। এই ডানপিটে স্বভাব বোধ হয় সব চেয়ে খুশী করেছিল তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকে। এক জায়গায় দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেনঃ "নরেন আমাকেও গ্রাহ্য করে না।" এ বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন গর্ববোধ করছেন। কেন করছেন? কারণ বুঝেছেন, সত্যের অনুসন্ধান যে করছে, তার কোন অবস্থাতেই আপস করা চলে না। সে নিষ্ঠুর হয়, নির্মম হয়, রূঢ় ব্যবহার করে, মোলায়েম কথা বলতে সে জানে না। স্বামীজীকে শেষ দিন পর্যন্ত লোকে ভুল বুঝেছে তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। কিন্তু কোমলহৃদয় স্বামীজী কখনও কাউকে জেনে-শুনে বা ইচ্ছা করে আঘাত করেননি। সত্য কথা বলতে গিয়ে তাঁকে লোক-দেখানো সৌজন্য ত্যাগ করতে হয়েছে হয়তো, কিন্তু তা করেছেন আঘাত করার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তাঁর এক অপূর্ব বাণীঃ "সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।"[৬] এই বাণীই স্বামীজীর প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু এই বাণী তিনি প্রথম শোনেন তাঁর মায়ের মুখে যখন তিনি সত্য ভাষণের জন্য শিক্ষকের হাতে নিগৃহীত হয়ে স্কুল থেকে বাড়ীতে ফেরেন। তাঁর মা বলেনঃ সত্যের জন্য অপমান অপমান নয়, গৌরব।[৭] মার এই শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হল যখন তিনি গুরুকে বলতে শুনলেন এবং তাঁর আচরণে দেখলেন, "সত্যই কলির তপস্যা।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, পারেননি কেবল সত্যকে ত্যাগ করতে। স্বামীজী মার কাছে যা শিখেছিলেন, তার অখণ্ড, বাস্তব রূপ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

মার কাছে স্বামীজী যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন, তাতে বিশ্বাস ছিল, যুক্তি তত ছিল না। যুক্তির তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করার প্রথম শিক্ষা পেলেন যখন তিনি বাবার মজলিসে যাতায়াত শুরু করলেন। কলেজে ও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে যুক্তি দিয়ে বিচার করার ঝোঁক তাঁর অভ্যাসে পরিণত হল। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কাছে যখন গেলেন তখন এ অভ্যাস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁকে প্রিয়তর করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে তর্ক করতে উৎসাহ দিতেন, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক। তাঁর অনেক কথা স্বামীজী মানতেন না, তাতে তিনি খুশীই ছিলেন। হয়তো জানতেন ক্রমে সবই মানবেন স্বামীজী। এক সময়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেন। দেখা গেল, স্বামীজী কিন্তু তবু তাঁর কাছে আসেন। আসেন আর যান, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু একটি কথাও তাঁর সঙ্গে বলেন না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলি না, তবু তুই আসিস কেন?" স্বামীজী বলেছিলেনঃ "ভালবাসি তাই আসি, আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি?" অনেক সময় আমরা দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর হয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা আর কারও সঙ্গে স্বামীজীর তর্ক বাধিয়ে দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, যুক্তি দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নেবার যে গুণ স্বামীজীর তা আরও ফুটে উঠুক।

বস্তুত আদর্শ শিক্ষক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী স্বয়ং এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাস্টারমশাইকে বলছেন তর্ক না করতে, আর স্বামীজীকে বলছেন তর্ক করতে। অর্থাৎ যার যা ভাব। স্বামীজী যুক্তিবাদী, তাই যুক্তি দিয়ে কত এগুনো যায়, তা দেখতে উৎসাহ দিচ্ছেন; বোধহয় স্বামীজী লোকগুরু হবেন এই জন্যই। লোকশিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকে বহুপ্রকার মতের সম্মুখীন হতে হবে, তাঁর যুক্তিতর্ক পাকা হোক, এই চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নিজেকে মারতে একটা নরুন যথেষ্ট; অপরকে মারতে হলে ঢাল-তরোয়াল দরকারঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সার্থক উক্তির সমর্থনে এই ব্যবস্থা।

স্বামীজীকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[৮] তাঁর নিজের প্রয়োজনে। কি সেই প্রয়োজন? শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, সে ক্ষুদ্র নয়, মহৎ। স্বয়ং ঈশ্বর। সে নিজেকে জানে না, তাই এত দুঃখ পায়। অসহায় মনে করে, তাই কেবল কাঁদে। নিজের যে দিকটা দেখেছে,

তা নিশ্চয়ই মলিন, কিন্তু সেই দিকটাই তার আসল দিক নয়। ইচ্ছা করলেই সে সমস্ত ধূলোকাদা ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারে, তার যে আসল রূপ, যে রূপ সুন্দর, মহৎ ও পবিত্র, যে রূপে সঙ্কীর্ণতা নেই, দ্বেষ-হিংসা নেই, প্রেম আছে, সত্য আছে, সেই রূপ অর্থাৎ তার স্বরূপ, প্রকাশ করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে আশা, আশ্বাস ও সাহস দিতে এসেছিলেন। মানুষ ভয়ার্ত, তার নিজের কাছে সে পরাস্ত; কিন্তু এইটাই সব নয়। তার পতন আছে, কিন্তু উত্থানও আছে। পতনের পরেই হয়তো বিরাট উত্থান অপেক্ষমাণ। শুধু সে জানে না। ধর্মের সার্থকতা এই যে, সে মানুষকে তার ঊর্ধ্বতম যে নিয়তি, সেই নিয়তির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে তাকে এগিয়ে যেতে বলে। শুধু তাকে লক্ষ্যের কথা বলে না, সেই লক্ষ্যে কি করে পৌঁছাতে হবে সেকথাও বলে দেয়। যেযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, ধর্ম নিয়ে তখন অনেক তর্ক-বিতর্ক। একদল ধর্মকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিলেন, কারণ তাঁদের মতে ধর্ম যুক্তিবিরোধী। অন্যেরা নিজেদের ধর্মমতই সত্যিকারের ধর্ম, একমাত্র ধর্ম, বলে জানতেন। পরস্পরে কী দ্বন্দ্ব, কী ঈর্ষা! আবার আর এক দল ধর্ম মানে আচার-বিচার, লৌকিকতা, যা ধর্মের বাইরের দিক, তা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। ধর্মের যা মর্মকথা, প্রাণকেন্দ্র—ত্যাগ-বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম—তা জানার বা অনুশীলনের কোন উৎসাহ ছিল না তাঁদের। ধর্ম আচরণের বিষয়, শুধু তর্ক ও বিচারের বিষয় নয়, শুধু কথা ও মত নয়, বুদ্ধির খেলা নয়। ধর্ম নিয়ে যখন এত সংঘর্ষ ও কোলাহল, সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি তাত্ত্বিক বিচার জানতেন না বা বুঝতেন না, বুঝতেন যো-সো করে লক্ষ্যে পৌঁছানো, ঈশ্বর লাভ করা। আম খাওয়া বুঝতেন, আম বাগানে কত গাছ, কত আম ফলেছে, কত তার দাম এ হিসাবে তাঁর দক্ষতা বা রুচি ছিল না। ধর্মমত তাঁর কাছে গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ঈশ্বর সব ধর্মের কেন্দ্রস্থল। ছোটবড় সব মত ও পথ দিয়ে ঈশ্বরকে তিনি জেনেছিলেন ও পেয়েছিলেন—নানাভঙ্গিতে, নানাভাবে। ঈশ্বর কারও একচেটে নয়, সকলের। চাঁদামামা সকলের মামা। কেউ তাঁর 'ইতি' করতে পারে না। নুনের পুতুল সমুদ্রে কত জল মাপতে পারে না। তিনি কে এবং কি একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তবু মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করে। প্রত্যেকে তার রঙীন চশমা দিয়ে তাঁকে দেখে। এই দেখা সার্থক যদি তার পিছনে ব্যাকুলতা থাকে। যে ব্যাকুল, তাঁকে সত্যি সত্যিই চায়, একদিন সে তাঁকে পাবেই পাবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মত ও পথকে তুচ্ছ মনে করেননি। সব মত ও পথকে শ্রদ্ধা করেছেন। বলেছেনঃ "যত মত, তত পথ।" লক্ষ্য এক কিন্তু পথ বহু! বহু পথের প্রয়োজন এই কারণে যে, সব মানুষ এক রকমের নয়। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" যার পেটে যা সয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মানুষ তার মহিমায়

প্রতিষ্ঠিত হোক। যেভাবে তা সম্ভব, সেই ভাবেই হোক। সে যেন অল্পে সন্তুষ্ট না হয়। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"[৯] এগিয়ে যাও, আরও, আরও—এই ছিল তাঁর বাণী। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম তিনি প্রচার করেননি। কোন দল তিনি গড়েননি। যা নিত্য-সত্য, সর্বজনীন, শুধু তাই প্রচার করেছেন। খালি পেটে ধর্ম হয় না—বলতেন। কিন্তু ভরা পেটই সব, দৈহিক সুখই একমাত্র সুখ—এ মানতেন না। মানুষই ভগবান, বলতেন। জীব শিব। তাই জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে পূজা।

অপূর্ব মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ. অপূর্ব তাঁর বাণী! "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[১০]—কথা নতুন নয়, কিন্তু তার প্রয়োগকৌশল নতুন। সমাজজীবনে কি এর প্রয়োগ করা যায়? মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি এই ভিত্তিতে সম্ভব? সবার মধ্যে এক ঈশ্বর, সবাই আমরা এক—এই বাণী কি বাস্তবে রূপায়িত করা যায়? এক মানবগোষ্ঠী, এক পরিবার, এক মানুষ. এক পৃথিবী—এ ঐক্য কি শুধু স্বপ্ন বিলাস? ঐক্য স্বপ্নবিলাস হোক আর যাই হোক, বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতেই হবে। বৈচিত্র্য প্রকৃতির নিয়ম। মত ও পথ, ভাষা, বিশ্বাস. আচার ও আচরণ, আহার, বেশভূষা, বিবাহ. দেহের রং, সমাজব্যবস্থা—এর বৈচিত্র্য থাকবেই। কিন্তু এই অনৈক্যের পশ্চাতে যে মহান ঐক্য বিদ্যমান, তার স্বীকৃতিও চাই। সুখ সমৃদ্ধি অবিভাজ্য। শান্তি অবিভাজ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও নয়, এমন কি সহাবস্থানও নয়। শুধু সহানুভূতি, সমবেদনা। একের জন্য অপরের। একের দুঃখে অপরের দুঃখ, একের সুখে অপরের সুখ। বঞ্চনা নয়, প্রেম, প্রীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শের প্রতীক। শুধু ধর্মের রাজ্যে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও। তিনি এমন একজনকে চেয়েছিলেন যিনি তাঁর হয়ে এই বাণী মানুষকে শোনাবেন। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ। রূপে, গুণে, চরিত্রে অদ্বিতীয় পুরুষ। বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব শক্তি উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁকে। নিজের ভাবে নিজের হাতে তাঁকে গড়েছিলেন। কাদার তালের মতো।[১১] বলেছিলেনঃ "নরেন লোকশিক্ষে দেবে।" নরেন্দ্র বলেছিলেনঃ "আমি ওসব পারব না।" তবু ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তোর হাড় করবে।"[১২] স্বামীজীর পরবর্তী জীবন সাক্ষ্য দেয় কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে খাটিয়ে নিয়েছিলেন। স্বামীজী যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের।

শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ যন্ত্র। একথা বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। বলছেনঃ "তিনি (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ) অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন।"[১৩] এ গুরুভক্তির উচ্ছ্বাস নয়, সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। স্বামীজী বলতেনঃ নিরক্ষরের (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের) পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একদিনে তা করেননি। অনেকদিন তাঁকে দেখেছেন, অনেকভাবে দেখেছেন, দেখতে যেয়ে অনেক সময় নিষ্ঠুরও হয়েছেন। স্বামীজীর ভাব বরাবরই এই ছিল, যেটা ভুল বলে জানব, সঙ্গে সঙ্গে তা ত্যাগ করব। তার আওতায় সব পড়ে—গুরু, ধর্ম, সন্ন্যাস। তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় গাজীপুরের পওহারী বাবার কাছে তাঁর যাতায়াত করার ঘটনা থেকে। পওহারী বাবা যদি বড় হন, তবে তিনিই তাঁর গুরু হবেন—এই চেয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু পওহারী বাবা তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী দেখে ভুল বুঝলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বুঝেছিলেন, তাঁর গুরু অতুলনীয়, তাঁর কোন কথা বা সিদ্ধান্ত ভুল হয় না। নিবেদিতাকে লেখা এক পত্রে দেখি এই স্বীকারোক্তি।

স্বামীজীর কথা আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তাঁর সব কথার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। "যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।"[১৪] কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু সত্য। সত্য এই অর্থে যে, তাঁর মানবপ্রেম শ্রীরামকৃষ্ণের দান। তিনি চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে, শুকদেবাদির মতো, শরীররক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকু মন শরীরের দিকে দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেনঃ "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিস নি।"[১৫] বস্তুত শুধু মানবপ্রেম নয়, যত উচ্চ চিন্তা, যত উচ্চ ভাব, সবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, তিনি ভাষা। শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্র, তিনি ভাষ্য। বস্তুত এক সত্তা, যেমন অগ্নি, আর তার দাহিকা শক্তি। যেমন দেহ,

আর আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—এঁদের দুজনকে আলাদা করে ভাবা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্বামীজীকে একবার বলেছিলেনঃ "তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।"[১৬] স্বামীজী বলতেনঃ "আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর।"[১৭] কিন্তু কার কণ্ঠস্বর? শ্রীরামকৃষ্ণের। যে ভারত নিত্য ও শাশ্বত, তার প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। এ ভারত ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত। সত্যানুসন্ধান তার তপস্যা। দরিদ্র, নিষ্পিষ্ট, তবু সতেজ, বলীয়ান, তরুণ। অতি প্রাচীন, অথচ অতি নতুন। আত্মা অমর, দেহ মরণশীল—এই সত্যের সার্থক উদাহরণ। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার রূপকার, জ্যোতির্ময়, অমর ভারতের আত্মা এই শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিবেকবাণীর উৎস ও গতিপথ নির্ণয়ে আমরা যদি অগ্রসর হই নিবিষ্টচিত্তে, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অভিন্ন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব সুস্পষ্টভাবেই। প্রকৃতপক্ষে, এঁদের দুজনকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে কল্পনা করাই সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বামীজীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সেই অনন্ত সত্য। তিনি বলেছেনঃ "আমি যা, আমি তাই; আর আমি যা তা সর্বদা তাঁরই কল্যাণে হয়েছে; আমাতে, আমার কথাতে যা কিছু মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তাঁরই শ্রীবদন, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই আত্মা থেকে পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের বর্তমান যুগের অধ্যাত্মজীবনের, উহার উদ্দীপনার ও কর্মোদ্যমের উৎসস্থল—যুগাবতার! আমি যদি জগৎকে গুরুদেবের জীবনের এক ঝলকও দেখাতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক।"*

বিবেক-জীবনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি, তা আগামীকালের জন্যই রাখা আছে। সেদিনই প্রমাণিত হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অগ্নি, আর বিবেকানন্দ তাঁরই দাহিকাশক্তি।

স্বামীজী যেসব ভাব প্রচার করেছেন, তা কতটা শ্রীরামকৃষ্ণের এবং কতটা তাঁর নিজস্ব এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ ভাবতেন, এ তাঁর বিদেশ থেকে ধার করে আনা জিনিস। একবার স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ এই সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন। তিনি বললেনঃ "তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?" স্বামীজী বললেনঃ "তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস? আমি

এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।"[১৮] স্বামীজী বলতেনঃ "ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে কখনও আসেননি।"[১৯] আর তাঁর এবং তাঁর গুরুভাইদের জন্ম হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ত্রিজগতে ছড়িয়ে দিতে। পাশ্চাত্য দেশে থাকার সময় স্বামীজীকে অনেক সময় সপ্তাহে ১২।১৪টা করে বক্তৃতা করতে হত। কি বিষয়ে বলবেন, এই ছিল তাঁর সমস্যা। রোজ তো আর নতুন বিষয় খুঁজে বের করা যায় না। কি বিষয়ে পরের বক্তৃতাটা দেবেন এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় তন্দ্রাগত হতেন। ঠিক এই সময়ে তিনি দেখতেন কে যেন এসে বলে যাচ্ছেন এর পরের বক্তৃতায় তাঁকে কি কি বলতে হবে। তিনিও ঠিক তাই বলতেন। এতেই লোকে তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হত। এমন সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত যা তিনি কখনও ভাবেননি। তাঁর কথাই তাঁকে অবাক করে দিত।[২০] শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে দিয়ে বলাতেন এসব কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ অনেক কথা বলেছেন যা আশ্চর্যজনকভাবে নতুন, বিজ্ঞানসম্মত। আবার অনেক কথা বলেছেন যা অতি পুরাতন। বস্তুত যা সত্য তাই বলেছেন। সত্য চিরনতুন, চিরপুরাতন। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। আহার, পোশাক, জীবনযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মাচরণ, সাহিত্য, শিল্প—অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, আদরণীয়, তেমনই জীবনের উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কি এই উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য—মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তার বিকাশ। বিকাশ মানে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, মনের উৎকর্ষও। মনের সম্পদই প্রকৃত সম্পদ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট নমস্য, কারণ তাঁদের মনের সম্পদ সর্বাধিক। এই সম্পদকেই স্বামীজী দেবত্ব বলেছিলেন। এ সম্পদের বৃহত্তম রূপকেই ঈশ্বর বলা হয়। তাই চরম বিকাশ ও ঈশ্বরলাভ একার্থক। ধর্ম এই বিকাশে সাহায্য করে, তাই ধর্ম সার্থক। ধর্ম মানে মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সংগ্রাম। যে সংগ্রামে দেহমনের উৎকর্ষ হয়, যার দ্বারা সুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হয়, মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে, নিজের মহত্ত্বকে জানে বা চেনে, তাই ধর্ম। বিজ্ঞানও এই অর্থে ধর্ম। দেহের জন্য বিজ্ঞান এবং মনের জন্য ধর্ম। ধর্ম ও বিজ্ঞান একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ। অঙ্গাঙ্গি। ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অসম্ভব। তাই উভয়ের সমন্বয় স্বামীজী চেয়েছিলেন। মানবমুক্তির পথ এই সমন্বয়ে।

স্বামীজী জন্মেছিলেন বিরাট প্রতিভা নিয়ে, কিন্তু সেই প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে। তাঁর সেই প্রতিভা স্বামীজী উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। বলেছিলেনঃ

"গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।"

কিন্তু কে এই শ্রীরামকৃষ্ণ? কোন ব্যক্তি? কোন মত, সম্প্রদায়? শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ, মানবকল্যাণের আদর্শ। যে আদর্শ মানুষকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর, সুন্দরতম করে, মহৎ থেকে মহত্তর, মহত্তম করে। মানুষের "কাঁচা আমি"কে ভেঙে "পাকা আমি"কে আরও পাকা করে। যে আদর্শ মানুষকে শেখায় "নাহং, তুঁহু"; আমি নই, তুমি। তুমি অর্থাৎ ঈশ্বর, যিনি জীব, জগৎ সব হয়েছেন। যে আদর্শ বলতে শেখায়ঃ মুচি মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই, যতক্ষণ একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই। যে আদর্শ মানুষকে একাত্মতা শেখায়, শেখায় অন্যের দুঃখ আমার দুঃখ, অন্যের সুখ আমার সুখ। শেখায় "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" শেখায়ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উৎস, স্বামী বিবেকানন্দ গতি, পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ গোমুখী, স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গাসাগর। এ দুয়ের মাঝখানে অসংখ্য ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনার তরঙ্গ, আলোড়ন। দেব ও মানব প্রকৃতির অভিনব বিলাস। স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতু-সংযোগ। ঈশ্বর মানবরূপে এসেছেন, হেসেছেন, কেঁদেছেন, কতভাবে লীলা করেছেন। বিবেক-চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাপ্তির সোপান, জীবকে শিব করার প্রক্রিয়া। এ চিন্তা মানুষকে 'মানহুঁস' করে। মানুষের মধ্যে চৈতন্য জাগিয়ে তুলতেই তো এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তার জন্যই তো তাঁর বিবেকানন্দ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। তারই জন্য তো সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে তাঁকে টেনে এনেছিলেন।

বিবেকানন্দ-বিচার

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদটির ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর লিখেছেনঃ "ব্রহ্মণঃ ইতি কর্মণি ষষ্ঠী।" 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হচ্ছে, "ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা। 'ব্রহ্মের'—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদে কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে বুঝতে হবে, অর্থাৎ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার অর্থঃ ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা। আচার্যের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে 'বিবেকানন্দ-বিচার'—এই সমাসবদ্ধ পদটিতেও আমরা "কর্মণি ষষ্ঠী"—কর্মে ষষ্ঠী গ্রহণ করছি। কারণ, যদি কর্তায় ষষ্ঠী গ্রহণ করি, তাহলে পদটির অর্থ দাঁড়ায় বিবেকানন্দ-কৃত বিচার, অর্থাৎ বিবেকানন্দের চিন্তাধারা। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিবেকানন্দের নানান বিচার রয়েছে। সেগুলির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও একটি অতি দীর্ঘ প্রবন্ধেও করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় পর্যায়ে চৌদ্দটি বিষয়ে স্বামীজীর বিচার সমূহ প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আলোচিত। সুতরাং 'বিবেকানন্দ-বিচার' বলতে আমরা "বিবেকানন্দকে বিচার" এই অর্থ গ্রহণ করছি। স্বামীজীকে তাঁর বাণী এবং কর্ম সম্পর্কে অনেকেই বিচার বা সমালোচনা করেছেন, তাঁর জীবৎকালেই এবং পরেও—স্বদেশে এবং বিদেশে; এখনও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি তা করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এতে কিছু দোষ নেই, যদি সত্য নির্ণয়ের জন্যই সে বিচার হয়—যদি কোন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে কলুষিত দৃষ্টি নিয়ে সে বিচার করা না হয়। মহামনীষীদের সম্পর্কে যুগে যুগে এই ধরনের বিচার করা হয়েছে; সুতরাং মহান চিন্তানায়ক বিবেকানন্দকেও যে চিন্তাশীল মানুষ নিজ নিজ সীমিত বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই প্রমাণ করে যে, স্বামীজী লোকোত্তর মহামানব। ভবভূতি বলেছেনঃ "লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি।"—লোকোত্তর পুরুষদের মনের কথা বোঝবার সামর্থ্য কার আছে? স্বামীজীর ক্ষেত্রে একথার সত্যতা যে কত গভীর ও ব্যাপক তা বিবেকানন্দ-বিচার পরিক্রমায় অনায়াসেই বোঝা যায়।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ-বিচার প্রসঙ্গে যেকথা প্রথমেই বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর কর্মযোগ। এই বিচারের সূত্রপাত রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম-

কালেই এবং এখনও তা অল্পাবিস্তর অব্যাহত আছে। ১লা মে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ই মে দ্বিতীয় অধিবেশনে ঐ সমিতির কার্যপ্রণালী আলোচিত ও গৃহীত হয়। কার্যপ্রণালীতে ছিলঃ "মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"[১] স্বামীজী স্বয়ং ঐ সমিতির সাধারণ সভাপতি হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁর সহকারী হন। সভাশেষে সভ্যগণ চলে গেলে স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে বলেনঃ "তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?"[২] স্বামীজী উত্তর দেনঃ "তুই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বন্ধ ক'রে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবী-ময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। .....

"স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ-সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই।

"স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ......তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব বল?"[৩]

স্বামীজীর উপরি-উক্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ঈশ্বরকোটি স্বামী যোগানন্দের মনের সংশয় মিটে যায়। কিন্তু তিনিই যে একা এই ধরনের সংশয় পোষণ করেছিলেন তা নয়। কথামৃতকার শ্রীম-র মনেও এই সংশয় জেগেছিল। একদিন তিনি স্বামীজীকে বলেনঃ "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন

বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ সব বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল *কি?"*[৪] *স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দেনঃ "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির চেষ্টা কি?" শ্রীম নীরব।*

তখনকার মতো নীরব হলেও শ্রীম-র মনে এই সংশয় পরবর্তীকালেও ছিল। তিনি এবং আরও কেউ কেউ বলতেনঃ "ওরা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা) ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলে অন্যপথে চলেছে।"[৫] স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটির রচনার অন্যতম কারণ উল্লিখিত মন্তব্য। শ্রীম লিখিত বা 'কথিত' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাবৎ কথা নেই, তিনি যে তাঁর ত্যাগী ভক্তদের পরিচালনার ভার নরেন্দ্রনাথের উপর দিয়ে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন—এসব কথা স্বামী সারদানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গে লিখে গেছেন।[৬] শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ত্যাগীভক্তদের ধর্মজীবন গঠনে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন এবং তাদের একান্তে যোগধ্যানাদি ধর্মের উচ্চাঙ্গ সকলের উপদেশ এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য উৎসাহিত করতেন আর সাধারণ ভক্তদের "কলিতে নারদীয়া-ভক্তি", "উচ্চরোলে নাম সংকীর্তনেই জীবোদ্ধার" ইত্যাদি কথা বলতেন তা লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে।[৭]

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা থেকেই যে নরেন্দ্রনাথ শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাও স্পষ্টাক্ষরে লীলাপ্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে।[৮]

স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করেন ১৯০৯ সালে। তখন মাস্টারমশায়ের (শ্রীম) মনোভাব যা ছিল, তা আমরা দেখেছি। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবী সদলবলে কাশী যান। মাস্টারমশায় ঐ দলে ছিলেন। কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পরিদর্শন করে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।" মায়ের এই কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েকজন ভক্ত ও ব্রহ্মচারীকে মাস্টারমশায়কে বলতে বলেন, কারণ তিনি জানতেন, মাস্টারমশায়ের ধারণা—সাধন ভজনসহায়ে ভগবান লাভ না করে সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের অনুকূল নয়। মাস্টারমশায়কে

মায়ের ঐ কথা পরিবেশিত হলে, তিনি সহাস্যে মন্তব্য করেনঃ "আর অস্বীকার করবার জো নেই।"[৯]

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর বিচারের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কথামৃতে' সন্ন্যাসী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, এমন স্থানে থাকবে যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না, টাকা স্পর্শ করবে না, দোর বাক্সে চাবি দেবে না—ইত্যাদি উক্তিনিচয়ের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সন্ন্যাসীর কর্মযোগের সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন হবার পরে বিজ্ঞানানন্দজী একদিন বেলুড় মঠে সমবেত সন্ন্যাসীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "আমার এক একবার এ-ও মনে হয় যে, এসব কাজকর্মের প্রবর্তন করে স্বামিজী মহা অনর্থের সূচনা করেছেন। এতে জগতের লোকের খুব উপকার হচ্ছে সন্দেহ নেই; কিন্তু যারা ঐ সব কাজ করছে তাদের জীবন করে দিয়েছেন খুবই বিপদসঙ্কুল। তবে এও খুব সত্যি যে, বসে বসে পশ্চিমে সাধুদের মতন কুড়েমি করে আর পাঁচ রকম গল্প গুজব করে সময় নষ্ট করার চাইতে এসব সেবাদি কর্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক সাধন ভজন করতে পারে, সর্বক্ষণ ভগবদ্‌চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে পারে, তাদের পক্ষে এসব কাজকর্মের কোনই প্রয়োজন নেই। স্বামিজীর সঙ্গে একদিন এ বিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছিল......।"[১০]

১৮৯৭ সালের ১৫ই জুন স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে একটি অগ্নি-গর্ভ পত্রে লেখেনঃ "কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ নাহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হ'তে হবে......ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পেঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্‌। ......এই তো পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'।"[১১] এই প্রেরণাপূর্ণ পত্রটি বারংবার পাঠ করে অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর প্রবর্তিত সন্ন্যাসীর কর্মযোগে নিজেকে আদেহান্ত সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প হন। মুর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি যেসব হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য চিঠি লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম অনুরাগী, কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্র তাঁদের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' পাঠক মাত্রেই

জানেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমদাবাবুকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত বহু পত্র লিখেছিলেন। প্রমদাবাবুর গৃহেও শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সন্তানগণ অতিথি হিসাবে বিশেষ আদর আপ্যায়ন পেতেন। কিন্তু অখণ্ডানন্দজীর চিঠি পেয়ে প্রমদাবাবু লেখেনঃ সাধুসন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকাজের চেয়ে প্রব্রজ্যা, তপস্যা ও স্বাধ্যায়ই প্রশস্ত।[১২] সে চিঠির উত্তরে অখণ্ডানন্দজী যা লিখেছিলেন, তা আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে এমন কি স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মনেও একবার স্বামীজীর কর্মধারা সম্বন্ধে সংশয় জেগেছিল।[১৩]

বিংশ শতকের শুরুতে স্বামীজীর দুই শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যখন শ্রীগুরুর প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হরিদ্বার হৃষীকেশ অঞ্চলে পীড়িত সাধুসন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী ও অনুন্নত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন সেখানকার সাধুসমাজ তাঁদের "ভাঙ্গী সাধু" এই শ্লেষাত্মক আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা রোগীদের মলমূত্র পর্যন্ত নিজেরাই পরিষ্কার করে দিতেন। আচার্য শঙ্করের মতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শমদমাদিসহায়ে বেদান্তের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম থাকতে পারে না; কর্মযোগ গৃহস্থদেরই অবলম্বনীয়—সন্ন্যাসীদের নয়। সুতরাং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকবেন কেন? এই ছিল তাদের প্রশ্ন। বাস্তবপক্ষে এটি বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শেরই বিচার বা সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা সন্ন্যাসীর কর্মযোগ সম্পর্কে যেসব সংশয়-সন্দেহ-শ্লেষের উল্লেখ করেছি, তার বেশী যাবার প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের দেখতে হবে সমস্যাটির সমাধান কোথায়। প্রথমেই বলা যায় স্বামীজী একেবারে নতুন কিছু করেননি। যেযুগে সেবাব্রত সন্ন্যাসী উপগুপ্তের মুখে—কবির ভাষায় বলি—উচ্চারিত হয়েছিল, "আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা।", সেযুগ

থেকে শত শত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে বলেই আজ লোকের মনে হয় সন্ন্যাসীর কর্মযোগ একটা সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। কিন্তু বস্তুত যে তা নয় —এটি নিঃসন্দেহে বলা চলে। ৪ঠা জুলাই ১৮৯৭, স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে লিখেছিলেনঃ "বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।"[১৪] ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দেওয়ায় স্বামী অখণ্ডানন্দ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অসহায় রোগীদের প্রাণপণে সেবা করছিলেন। তাঁর ছিল ব্রাহ্মণ শরীর। তাঁর সহায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও কারও কারও ব্রাহ্মণ শরীর হয়তো ছিল। মনে হয় এই জন্যই স্বামীজী 'ব্রাহ্মণসন্তানেরা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। আসলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবাকার্যের প্রায় দু-হাজার বছর পরে সন্ন্যাসীর কর্মযোগের পুনরভ্যুদয় ঘটল। সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বৌদ্ধদের দ্বারাই। সঙ্ঘ কখনও কর্মহীন হয়ে জীবিত থাকতে পারে না। তাই শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাঁরা এক একটি বৌদ্ধ মঠে থাকতেন, তাঁরা ধ্যানাদির অতিরিক্ত কর্মযজ্ঞেও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ঘটলে, বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হলে বৈদিক যাগযজ্ঞ যা ভগবান বুদ্ধ নিষেধ করে গিয়েছিলেন, আবার তার আবির্ভাব শুরু হল। ভারতের আকাশ-বাতাস যখন কর্ম-কাণ্ডীদের যজ্ঞীয় ধূমে আচ্ছন্ন হবার উপক্রম, তখন আবির্ভাব হল আচার্য শঙ্করের। তিনি বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। যুগের প্রয়োজনেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যে বারংবার লিখে গেলেন সন্ন্যাসীর কোন কর্ম নেই—সন্ন্যাসের অর্থই সর্বকর্মসন্ন্যাস।

তারপর প্রায় বারোশ বছর কেটে গেছে। তখন যুগ পালটেছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আবার সন্ন্যাসীদের কর্মযোগ অবলম্বন করতে হয়েছে। শিষ্যা মৃণালিনী বসুকে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়।"[১৫] যদিও স্বামীজী যে বিষয় সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেছেন, তা এখানে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়, তবু বলা যেতে পারে, ঐ মন্তব্যের ভিতর একটা সনাতন সত্য নিহিত রয়েছে। চিঠিটির ইংরেজি অনুবাদেও 'institution'—শব্দটি লক্ষণীয় ঃ "Rishi, Muni or

God—none has power to force an institution on society." ১৬ ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ সংঘ এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের শিবজ্ঞানে জীবসেবাব্রত স্বামীজী জোর করে সমাজে চালিয়ে দেননি। সমাজের প্রয়োজনেই সঙ্ঘের আবির্ভাব এবং সমাজের প্রয়োজনেই সন্ন্যাসীর কর্মযোগ। এ বিষয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রমদাদাস মিত্রকে ১০।১।১৮৯৯ তারিখে যে পত্র লিখেছিলেন—যার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিবেকানন্দ-বিচারের এই প্রথম ও মুখ্য পর্যায়ের উপসংহার করা যেতে পারেঃ "'আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না'—ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্যদ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে (তাহার পূর্বে) লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে।

"দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের এই অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্টনিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদানে নির্মিত বা বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

"আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিস্ নি? একথা যে শোনে তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।"১৭

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ-বিচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে চতুর্বিধ যোগের সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। স্বামীজী তাঁর একাধিক বক্তৃতায়, কথা প্রসঙ্গে এবং বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমন্বয়ের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। ইংলণ্ডে প্রদত্ত "বিশ্বজনীন

ধর্মের আদর্শ" শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ "ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণ-মাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ...।"[১৮]

বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই।[১৯]—"চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য ক'রে সাধন করা চাই।"[২০]

স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে আছেঃ "জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য। ইহার একটিতেও যিনি ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী নহে।"[২১]

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শের প্রতীক, "...বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত" উদীয়মান সূর্যশোভিত চিত্রটি স্বামীজী নিজেই অঙ্কিত করেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ঃ "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।"[২২]

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর ২৪শে জুলাই, ১৯০০ তারিখের পত্রেও আছে ঃ "সূর্য=জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল=কর্ম ; পদ্ম=প্রেম; সর্প=যোগ ; হংস=আত্মা ; উক্তিটি*=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে

উহা প্রেরণ করুন। এটি হৃৎ-সরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।"[২৩]

চতুর্বিধ যোগের এই সমন্বয়াদর্শ সম্পর্কে বিবেকানন্দকে বিচার করা হয় এই বলে যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের বাণীবহ হয়েও তাঁর আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেই একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করেছেন। সমালোচকদের অভিমত এই যে, 'কথামৃত', যা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর রত্নভান্ডার তাতে এই ধরনের সাধনার কথা কোথাও নেই, বরং এর বিপরীত কথাই আছে ঃ "অনন্ত মত অনন্ত পথ।... একটা জোর করে ধরতে হয়। ... এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হ'লে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।"[২৪] "একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ ক'রবে।"[২৫]

বিবেকানন্দ-বিচারে প্রবৃত্ত সমালোচকরা আরও বলেন যে, স্বামীজী স্বয়ং যে আদর্শের প্রতীক, তা-ই তিনি সকলের আদর্শ বলে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ঐ আদর্শ রূপায়িত দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে প্রথমে ভক্তি ও পরে জ্ঞানসাধনা দেখা যায়—কর্মযোগ বা রাজযোগের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই বিচারের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, স্বামীজী চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্যের কথা বললেও, বেশ জানতেন যে, সকলের পক্ষে ঐরূপ সমন্বিত সাধনা সম্ভব নয়। তাই বহু স্থলেই তিনি একটি সাধনপথের অথবা দুইটি বা তিনটি যোগের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যায় স্বামীজী লিখেছেনঃ "আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।"[২৬]

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিম্নোক্ত কথাগুলিও অনুধাবনীয় ঃ "মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি জ্ঞান যোগ ও কর্মসম্বন্ধে উপদেশ করিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া

দিবেন—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞাসু জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি।"[২৭]

"...অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথই প্রয়োজন।"[২৮] "বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি ক'রো না। কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর।"[২৯]

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও।"[৩০]

"আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা... সমষ্টিগতভাবে ঐ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনের সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হ'ল, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হ'তে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই।"[৩১]

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শের যে প্রতীক স্বামীজী স্বহস্তে অঙ্কিত করেছিলেন, তার পরিপূর্ণ সার্থকতা, মনে হয় শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিতেই নিহিত। একটি বিরাট সঙ্ঘে বিভিন্ন রকমের অধিকারী থাকাই প্রত্যাশিত এবং সকলেই ব্যক্তিগতভাবে চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করতে না পারলেও, সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা পারবে, এই ছিল স্বামীজীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সম্প্রদায়বিশেষে কোথাও কেবলমাত্র জ্ঞানের উপরই প্রচণ্ড জোর, কোথাও বা শুদ্ধা ভক্তির উপর, কোথাও কর্মের উপর, কোথাও বা যোগের উপর। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তা চাননি, তাই এটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়।

ভক্তিযোগের একজন পথিক, যিনি 'দাসোঽহং'-ভাবে সাধনা করেছেন, তাঁর পক্ষে যুগপৎ জ্ঞানপথের 'সোঽহং'-ভাবের সাধনা সম্ভব না-ও হতে পারে, তবে তিনি যা করতে পারেন তা হল বৌদ্ধিক অদ্বৈত-বেদান্তবিচার এবং অদ্বৈত জ্ঞানকে কর্মে পরিণতিদান। তার ফলে জ্ঞানী যোগী ও কর্মীর প্রতি সম্প্রদায় বিশেষের যে বিদ্বেষবুদ্ধি বা উন্নাসিক ভাব দেখা যায়, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সকল পথের সাধকের প্রতিই সশ্রদ্ধভাব পোষণ করতে পারেন।

আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, স্বামীজী সে-জীবনে চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য দেখেছিলেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আর স্বামীজীর মতো লোকোত্তর পুরুষের দৃষ্টি এক হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশ সম্পর্কেও পূর্বেই বলা হয়েছে, কথামৃতেই তাঁর তাবৎ উপদেশ বিধৃত নেই—অধিকাংশ উপদেশই সাধারণ ভক্তদের জন্য।

॥ ৪ ॥

বিবেকানন্দ-বিচারের তৃতীয় পর্যায়ে কর্মযোগের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ২৫ সংখ্যক সূত্রের স্বামীজীকৃত ব্যাখ্যার যে অংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় স্বামীজী কর্ম আদি প্রত্যেকটি যোগকেই স্বতন্ত্র সাধনপথ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যত্রও স্বামীজী বলেছেনঃ "জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।"[৩২] স্বামী তুরীয়ানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "হরি ভাই, এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।"[৩৩] স্বামী সদানন্দকেও স্বামীজী বলেছিলেনঃ "জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।"[৩৪]

স্বামীজীর এইসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা বিবেকানন্দ-বিচার করেন তাঁরা ভাষ্যকার শঙ্কর, টীকাকার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্যদের মত উল্লেখ করে বলেন যে, কর্মযোগ কখনও সরাসরি মুক্তি দিতে পারে না। গীতায় যেখানে (৩।২০) পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কর্মেরই দ্বারা জনকাদি সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেখানেও আচার্যেরা ক্রমশ চিত্তশুদ্ধির ফলেই জ্ঞানের প্রাপ্তির কথা বলেছেন। বিষয়টি খুব জটিল। কারণ স্বামীজীও বলেছেনঃ

"কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হ'তে পারে।" [৩৫]

"...ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়।" ৩৬

"...সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না।"৩৭

"Jiva-seva can give Mukti not directly but indirectly, through the purification of the mind. But if you wish to do a thing properly, you must, for the time being, think that that is all-sufficient." ৩৮

এই শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিতেই, মনে হয়, সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান নিহিত।

॥ ৫ ॥

চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়—চাতুর্বর্ণ্য ও অসবর্ণ বিবাহ। স্বামীজী গুণগত বর্ণবিভাগ মানতেন—জন্মগত নয়। পাশ্চাত্যে তাঁর শিষ্যদের তিনি প্রণবসংযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন শুনে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ মন্তব্য করেন, প্রণবে তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। সুতরাং স্বামীজী কি করে ম্লেচ্ছদের ঐ ভাবে দীক্ষিত করলেন। তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় ক'রে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।"৩৯

মহাভারতে আছে প্রাচীনকালে প্রথমে এক ব্রাহ্মণজাতিই ছিল। পরে কর্মের বিভাগ হতে থাকে এবং ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের সৃষ্টি হয়। তখনও কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুযায়ীই ঐ চারিটি বিভাগ ছিল। ৪০

পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনে চাতুর্বর্ণ্য বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীজী একাধিক বক্তৃতায় মহাভারতের এই বর্ণ বিভাগের উল্লেখ করেছেনঃ

"জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহা-

ভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইঁহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।" [৪১]

আমরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা শুনতে পাই। স্বামীজীও শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে গিয়েছেন। সেই আদর্শ সমাজের রূপ স্বামীজীর অনবদ্য-ভাষায় এইভাবে অভিব্যক্ত হয়েছেঃ "এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়াশক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ-শোক আর মনুষ্যশরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে—তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।" [৪২]

অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষেও স্বামীজী তাঁর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বহুবার ব্যক্ত করেছেনঃ "ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।" [৪৩]

"..(আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ' বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।" [৪৪])

গোঁড়া হিন্দুরা স্বামীজীর এই সব মতের তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা হিন্দুধর্মের বনিয়াদ—বর্ণাশ্রমব্যবস্থা গেলেই হিন্দুধর্মের সর্বনাশ। আর অসবর্ণ বিবাহের কথা বলাই তো মহাপাপ, কারণ তা ঐ বর্ণব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে।

স্বামীজীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রথা মাত্র। তা সনাতন নয় এবং সেই কারণে সনাতন ধর্মের সঙ্গে তার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। বহুবার তিনি একথা বলেছেন। তাঁর চিঠি থেকে একটা উদ্ধৃতিঃ

"...পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতিভেদ একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।" [৪৫]

আসলে যেসব গোঁড়া হিন্দু বিবেকানন্দ-বিচার করেন, তাঁদের অনেকেরই ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা নেই। পুরনো কয়েকটি আচারকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান—গুটিকতক অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থকে সারসর্বস্ব করে।

তাঁদের জানা নেই যে, বিদেশী অনেক জাতিই ভারতে বসবাস করার ফলে বর্ণাশ্রমব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। গুর্জর ও হূনজাতি ভারতে এসে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলে গৃহীত হয়েছিল এবং হূনজাতি রাজপুতদের একটি শাখা বলে গণ্য হত। মুসলমানদের আগে বিদেশ থেকে আক্রমণকারী শক, কুশাণ, হূন, গ্রীক, পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতি এদেশে বহু সংখ্যায় বাস করত, কালক্রমে তারা সব বিরাট হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মনুসংহিতায় (১০।৪৩—৪৪) চীন, পারদ প্রভৃতি বিদেশী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু মনুসংহিতায় অসবর্ণ বিবাহের কথা আছে। বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ চার বর্ণ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই তিন বর্ণ থেকে, বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্র, এই দুই বর্ণ থেকে এবং শূদ্র শুধু শূদ্র বর্ণ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন।[৪৬] অবশ্য মনুর যুগের অনেক প্রথাই বর্তমানে অচল। সেগুলির পুনরভ্যুদয় বাঞ্ছনীয় নয়—হবেও না। তবে যেটুকু ভাল আছে, তাকে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত করে

নেওয়া যেতে পারে। স্বামীজীর অভিমতও তাই ছিল। তিনি একাধিকবার বলেছেনঃ

"ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে।"[৪৭]

॥ ৬ ॥

ভূমিকাতে বলা হয়েছে, বিবেকানন্দ-বিচারের পরিধি খুব বিস্তৃত, কারণ ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিবেকানন্দের বাণী ও কর্ম সম্পর্কে অনেক সমালোচনা হয়েছে। বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "শনিবারের চিঠি"র বিবেকানন্দ-সংখ্যায় জনৈক লেখকের বিবেকানন্দ-বিচারের উত্তরে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায় পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ লেখেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী হিন্দু-ধর্মের উপর যে রচনা পাঠ করেন, ১৮৯৪ সালের ৯ই নভেম্বর "The Statesman and Friend of India" পত্রিকায় তার সমালোনা করে Rev. J. Hudson একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৪৮] একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের দ্বারাই সেই সমালোচনার উত্তর দিতে পারা যায়। ঐ জাতীয় আরও অনেক সমালোচনা সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতেতর দেশের কথা বাদই দিলাম। এদেশেই স্বামীজী সম্পর্কে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার জবাব দিতে গেলে 'বিবেকানন্দ-বিচার' নিবন্ধায়িত করা যায় না, গ্রন্থায়িতই করতে হয়। আর সে জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। আমরা শুধু ঘরোয়া মহলে যে 'বিবেকানন্দ-বিচার' শুনে থাকি, তারই আংশিক আলোচনা করেছি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ

একজন বিদেশী ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, জগতে মহাপুরুষদের চেনা সহজ, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মানসপুত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দু ধর্মপ্রচারক বলিয়াই ভক্তি ও পূজা করে। কিন্তু যদিও ইহাই স্বামীজীর প্রকৃষ্ট পরিচয়—তথাপি তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ মাত্র। ধর্মজগতের বাহিরেও দেশের ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে যে তাঁহার অমূল্য অবদান আছে তাহা আমরা সব সময়ে স্মরণ করি না। কিন্তু ইহার পরিচয় না পাইলে স্বামীজীর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে। একটি প্রাচীন উদাহরণ দ্বারা ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। কয়েকজন অন্ধ হস্তী দেখিতে গিয়াছিল। হস্তীর শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত বুলাইয়া তাহারা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল। যাহারা তাহার পায়ে হাত দিয়াছিল তাহারা মনে করিল হস্তী একটি স্তম্ভের মতো, যাহারা কানে হাত দিয়াছিল তাহারা মনে করিল হস্তীর শরীর কুলার মতো, ইত্যাদি। সেইরূপ যদি আমরা স্বামীজীকে কেবল ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে করি তবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও অবদান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আরও এমন অনেক দিক ছিল যাহার যে কোন একটির দ্বারা তিনি খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বঙ্গ সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রচলনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস যে, প্রমথ চৌধুরীই "সবুজ পত্র" নামক মাসিকপত্রে ইহার প্রথম ব্যবহার করেন। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই স্বামীজী "ভাববার কথা", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থে কথ্যভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐ সমুদয় গ্রন্থেই আছে।[১] সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু ধর্মজগতের বাহিরে ইহা অপেক্ষাও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুতর বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনা। ইহা তাঁহার

বক্তৃতা ও রচনাবলীর মধ্য দিয়া এত পরিস্ফুট হইয়াছে যে, ইহার সমর্থনে প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

লন্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "স্বামীজী, শক্তি, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার কেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে তিন বৎসর বাস করিবার পর দেশে ফিরিয়া আপনার কেমন লাগিবে?" স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেনঃ "আমি দেশ ত্যাগ করিবার পূর্বেও জন্মভূমি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতাম—কিন্তু এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র তাহার বাতাস আমার নিকট পবিত্র—ভারত আমার তীর্থস্থান।"[২]

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। নিবেদিতা লিখিয়াছেনঃ "যে সময় আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেখা হইত—ভারতের চিন্তাই ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।" অন্যত্র নিবেদিতা স্বামীজীর সর্বজাতি প্রেমের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ "যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশানিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।"[৩]

স্বামীজীর দেশপ্রেম কেবল মনের ভাবাবেগ ছিল না। তিনি দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য বাঙালী যুবকগণকে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় একদল যুবক তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেনঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠ কর, আনন্দমঠের সন্তানদের মতো দেশভক্তি লাভ কর। জন্মভূমির সেবা তোমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সর্বাগ্রে চাই রাজনীতিক স্বাধীনতা। তিনি অন্য একদল যুবককে বলিয়াছিলেনঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।"[৪]

স্বামীজী স্বদেশচেতনাকে ধর্মচর্চার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও সমকালীন রাজনীতিক নেতাদের অপেক্ষা তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি অনেক বেশী দূরপ্রসারী ছিল। ভারতের

জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের নীতিকে নিন্দা করিয়া তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ ভিক্ষার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যাইবে না— আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

আর একটি বিষয়েও স্বামীজী কংগ্রেসের নেতাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। কংগ্রেস ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কিন্তু স্বামীজীই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে ভারতের অনুন্নত শ্রেণী—মূর্খ, দরিদ্র, কৃষক, শ্রমজীবী—এক কথায় সমগ্র জনশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নহে। তিনি দিব্যচক্ষুতে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিয়া কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ এই সমুদয় চির নিপীড়িত অবহেলিত চাষা, জেলে, মুদি ও অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকেরাই ভারতের স্বাধীনতা আনিবে এবং ভবিষ্যৎ যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়া ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি তাঁহার বক্তৃতায় ও গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'পরিব্রাজক' হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি। ভারতের উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেনঃ "তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেচেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা।... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে,—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি।... অতীতের কংকালচয়!- এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"[৫]

এই সমুদয়ের মূল সূত্র হইল গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবে-শিবজ্ঞান' ও "দরিদ্র নারায়ণ" এই দুইটি মন্ত্র। ইহারই প্রভাবে এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেনঃ তাঁহার নিকট দরিদ্র চিরনিপীড়িত জনগণের উন্নতি নিজের মোক্ষ লাভের অপেক্ষাও মহত্তর উদ্দেশ্য ও আদর্শ। ইহা যে কেবল মুখের বাক্য নহে, তাঁহার অন্তরের কথা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। মুক্তিকামীদের মঠের অঙ্গ হিসাবে "দরিদ্র নারায়ণে"র সেবার জন্য মিশন প্রতিষ্ঠা জগতে একটি অভিনব সৃষ্টি।

স্বামীজীর এই সমুদয় চিন্তা ও আদর্শ বিংশ শতকের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই—এই জন্য সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের অসারতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন ও বোম্বে নগরীতে প্রকাশিত "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায় এগারোটি প্রবন্ধে তাঁহার অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আবার ধর্মই যে হিন্দুদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র অরবিন্দ শেষ জীবনে পন্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ "১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বুঝিলেন বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত ছিলেন এবং যাঁহার কার্য্য সবেমাত্র সুরু হইয়াছিল সেই কর্ম্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাইবার আর কেহ নাই।... শ্রীঅরবিন্দ আর নিষ্ক্রিয় হইয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুদূর প্রবাস হইতেই তিনি যেন বঙ্গমাতার শোকবিহ্বল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন।"[৬]

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ "বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার প্রভাব আজও প্রবলভাবে কাজ করিতেছে। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিবঃ বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"[৭]

রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেনঃ "স্বামী অশোকানন্দ আমাকে লিখিয়াছেন যে, অরবিন্দ ঘোষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।"[৮]

সাধারণের ধারণা যে, মহাত্মা গান্ধীই সর্বপ্রথম জাতীয় জাগরণে ও মুক্তি সংগ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতার উপর জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই বিবেকানন্দ যে ইহা উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেনঃ "গান্ধী প্রকাশ্যভাবেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের রচনাগুলি হইতে তিনি

প্রচুর সাহায্য পাইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে আরো ভালবাসিতে ও আরো ভালো করিয়া বুঝিতে সেগুলি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে।" [৯]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপরও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখিয়াছেনঃ

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥"

"মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

ইহা উপনিষদের বাণী নহে—বিবেকানন্দের পূর্বোল্লেখিত উক্তির প্রতিধ্বনি। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' নামক কবিতায়। ইহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। কয়েকটি পঙ্ক্তির উল্লেখ করিতেছিঃ

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

* *

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে॥"

স্বামী বিবেকানন্দ যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নিম্নলিখিত কয়েক লাইনেঃ

"শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করো না নমস্কার।"

এই "মানুষের নারায়ণ" যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণ" হইতেই উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করা কঠিন। কারণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যে সার্ধ তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমরা জানি তাহাতে 'জীবে-শিব' বা "দরিদ্র নারায়ণ"—এই দুইটি অনুভূতির উল্লেখ আছে এরূপ প্রমাণ আমার জানা নাই।

মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' ও রবীন্দ্রনাথের "মানুষের নারায়ণ" এই দুইটি সংজ্ঞাই যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সূচিত করে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেনঃ "রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তবাদের দুই স্রোতধারা মিলিত হইয়া সংগতিলাভ করিয়াছিল।...বিবেকানন্দের মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁহার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।" [১০]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা সর্বজনপরিচিত সত্য—ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। সাহিত্যিক মোহিতলাল বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সংকলিত হইয়া "বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সপ্তম অধ্যায় বিবেকানন্দের উত্তর সাধকঃ অরবিন্দ, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র। এই অধ্যায়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছিঃ "মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণউদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে?

"বিবেকানন্দের 'কর্ম্ম'-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগেব এক মহাশক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে।

"বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসী অথচ দেশ-প্রেমিক ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই।" [১১]

"নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই;... তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিতত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎমুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুই জনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি।" [১২]

বিংশ শতকে ভারতের কয়েকজন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের উপর স্বামী বিবেকানন্দের কিরূপ প্রভাব ছিল তাহার কিছু আভাস দিলাম। ধর্মজগতের বাহিরেও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কত বড় ছিল ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ

॥ ১ ॥

ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ "মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল'কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।"[১] একথার তাৎপর্য—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনগ্রসর, ভিন্ন-মানসিকতায় লালিত মানবসংঘকে নিবিড়ভাবে নিজের করে পেতে হলে তাকে স্নেহ-বাৎসল্যের দ্বারাই পেতে হয়। জীবনকে দেখার একটি সাধারণ রীতি হল বস্তু-তন্মাত্রের পদ্ধতি। সেখানে মানুষ জীবধর্মের প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাকে বলা যেতে পারে রসের দৃষ্টি, প্রেমের বোধ। যখন বাস্তব পরিচয়ের খণ্ডতা, খর্বতা ও অসম্পূর্ণতা মুছে গিয়ে একটি ব্যাপক সর্বগ্রাসী ভালবাসা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অনাত্মীয়কে আত্মীয় করবার ইচ্ছা জাগে, প্রতিকূল বিরোধকেও মিত্রতার বন্ধনে বাঁধতে হৃদয় প্রস্তুত হয় এবং কদাকার কুৎসিত শিশুকেও দেবশিশু বলে বুকে রেখে ঘুম পাড়াবার জন্য মাতৃভাব জেগে ওঠে। নিবেদিতার ভারতবর্ষীয় সম্পর্কে চেতনা হল মাতৃভাবের সাধনা। এর দীক্ষা তিনি তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই মাতৃভাব অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায় না। এটি একটি স্বয়মাগত দিব্যানুভূতি। জাতি, সংস্কার, পরিবেশ—সব কিছু ভুলে গিয়ে, ভারতবর্ষের বাহ্যিক দুর্দশা ও পাতিত্য সত্ত্বেও, তাকেই সন্তানরূপে গ্রহণ করা, লালন করা, মনুষ্যত্বের পোশাকে সজ্জিত করা—এ একাধারে ভাবের বস্তু, অন্যদিকে কঠিন বাস্তব ব্যাপার। মানসিকতায় সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের একত্র সমাবেশ না হলে এই ধরনের কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। এর প্রাণরস নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে আহরণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ও সাধনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিস্মৃতকে স্মরণের পথে টেনে আনা, হারানো কুল পরিচয়কে উদ্ধার করা এবং মূঢ় দেশবাসীকে অতীত ও বর্তমান জীবনচর্যা সম্বন্ধে অবহিত করা—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আবির্ভাবের

মূল তাৎপর্য। বিশ্বের যেখানে যে উদ্দেশ্যেই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন, সেখানে ধ্যানের ভারতবর্ষই তাঁর মানসনয়নে প্রত্যক্ষবৎ অবস্থান করত।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের জন্য পথে নামেননি। প্রাচীন, মধ্য-যুগ ও আধুনিক কালের ভারতবর্ষের মূল তাৎপর্য সন্ধান, তাকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির আলোকে বুঝে নেওয়া এবং জগতের ইহ ও পরত্রের সমন্বয়সূত্রে মনুষ্যত্বকে ধারণ করা—তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এই দিকেই ধাবিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের শাস্ত্র-সংহিতা, বেদ-উপনিষদ্-তন্ত্র-পুরাণ-ষড়্দর্শন, বৌদ্ধ শীল-সদাচার, বিনয়, অভিধর্ম ও দার্শনিক তাৎপর্য, মধ্যযুগের সগুণাত্মক ভক্তিপন্থী ও নির্গুণাত্মক জ্ঞানপন্থী সন্তসাধকদের ভাবভঙ্গিমা তিনি তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাধকের দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তির জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।*

উত্তর-বৈদিক কালে ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা—রাজযোগ রাজধর্মাবলম্বীদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ, যাজক ও পুরোহিত সমাজ বৈদিক কর্মকাণ্ড নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ, অথবা

নিঃশ্রেয়স ভক্তিমার্গ—এর একটি মুষ্টিমেয় জ্ঞানবাদী সমাজে, অপরটি সংখ্যাগুরু ভক্তসমাজে প্রচারিত হয়েছিল; কিন্তু বৌদ্ধ ভাবধারার প্রবল প্লাবনে আর্যসভ্যতার মূল বনিয়াদ—বেদের প্রতি আনুগত্য এবং চাতুর্বর্ণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ভেঙে পড়ল। বৌদ্ধ সমাজে ও সঙ্ঘে কাম্য-কর্মানুষ্ঠান ও বৈদিক যাগযজ্ঞ অহরহ নিন্দিত হতে লাগল। চতুরাশ্রমও বৌদ্ধ 'ত্রিশরণে'র খোঁচায় হীনবল হয়ে পড়ল। ফলে এতদিন ধরে বেদপন্থী আর্যসমাজের বৃহৎ অট্টালিকা যে সমস্ত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল, বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রবল আক্রমণে তার অনেকগুলিই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার ফলে ভারতীয় সমাজের যে মূল আদর্শ—গার্হস্থ্যধর্ম, তার স্থলাভিষিক্ত হল 'সঙ্ঘ'। জীবনচর্যা ও প্রব্রজ্যা প্রায় সমার্থ হয়ে পড়ল, গার্হস্থ্য জীবনকে সঙ্ঘারাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল। একদিকে পায়ের তলার ভূখণ্ড সরে গেল, অপর দিকে শূন্য, অনিত্য ও অনাত্ম—এই নেতিবাচক মানসিক মূল্যবোধ সাধারণশ্রেণীকে এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্বাণ ও মোক্ষ সাত্ত্বিক লক্ষণ হারিয়ে তামসিক ভোগবাদের দিকে চলে পড়ল। বৌদ্ধ "সব্বং সুঞ্ঞং" ও "নিব্বানং সান্তং"—এই দুই তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে সুখময় ঐহিকবাদের আফিমের রসে ঝিমিয়ে এল। এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ যান-উপযানের আনন্দ-বিরমানন্দ-পরমানন্দ মিশ্রিত হয়ে গিয়ে দেহচর্যাকেন্দ্রিক গোপনচারী উপধর্ম বা 'কাল্ট' (cult) গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে সমাজের অন্ধ গুহায় শিকড় চালিয়ে দিল। উত্তর-বৈদিকযুগে ক্ষত্রিয়সমাজ এবং জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণসমাজ ঔপনিষদিক তত্ত্বকথা ও সেশ্বরবাদী দর্শনচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দেশের আবালবৃদ্ধ এই সমস্ত সুখময় 'যানের' কাছে আত্মবিক্রয় করল এবং রহস্যবাদী দেহচর্যাকেন্দ্রিক গুপ্তপন্থার দিকে সমাজের একটা বড় অংশ মোহাবিষ্ট হয়ে চলে গেল।* এইভাবে অন্তত পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অর্ধচন্দ্রাচিহ্নিত ধ্বজপতাকাধারী নবজাগ্রত ইসলামধর্ম ভারতে প্রবেশ করেছে উন্মুক্ত তরবারি হাতে করে। এই নবপ্রবুদ্ধ মৃত্তিকাতলচারী বাস্তব ধর্মবোধের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে ভারতবর্ষ পরাজিত হল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রবল আক্রমণের মুখে গ্রাম-জনপদ-নগরচত্বর-মঠ-মন্দির সব ভেসে গেল। রাজ্যশাসন ক্রমে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সারাসেন (Saracen) জাতির অধিকারে চলে গেল। ভোগকেন্দ্রিক পার্থিব ব্যাপার, রাজ্যশাসন,

সমাজবিন্যাস, সামরিক বিদ্যা এবং তার সঙ্গে স্বল্প পরিমাণে ভক্তিবাদ (‘সুফী’) ইসলামের সাহচর্যে ভারতবর্ষের জীবনেও নানা বিক্ষোভ, বিস্ময়, পরিশেষে অসাড় নিষ্ক্রিয়তা এনে দিল।

ইসলামের নব অভ্যুদয় ও অভিযান ভারতীয় আর্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জনজীবনে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু চিত্তের গভীরে আঁচড় কাটতে পারেনি। পার্থিব জীবন সম্বন্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয়যুক্ত আসক্তি এবং নৈতিক একমুখীনতা ইসলামকে কেন্দ্র করে এদেশে সঞ্চারিত হল। কিন্তু দার্শনিক মননের ক্ষেত্রে এবং অধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে ইসলামের বিশেষ কোন গভীর প্রভাব ভারতীয় মানসিকতায় অতি অল্পই দেখা যায়। কারণ জীবনচর্যা ও দার্শনিক মননের দিক থেকে ভারতবর্ষকে নতুন কিছু শেখাবার গুরুদায়িত্ব নিয়ে ইসলামের আগমন হয়নি। ভারতীয় শিথিল সমাজব্যবস্থা ও বিবদমান ‘ক্ষত্রপে'র (satrap) বিশৃঙ্খলাকে ইসলামের ‘মনোলিথিক’ প্রকৃতি অনেকটা আয়ত্ত করেছিল এবং ভারতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে কয়েকশত বৎসরের জন্য মুমূর্ষু করেও রেখেছিল। তাতে প্রচণ্ড মানসিক বলের পরিচয় আছে, কিন্তু সুদূর-বিস্তারী অধ্যাত্মচেতনার কোন লক্ষণ নেই। এই জন্য প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকার ও শাসন করলেও ইসলাম ধর্ম ভারতের প্রাণের গভীরে আবেগের তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য ভক্তিবাদী কয়েক শ্রেণীর ‘বে-সরা’-পন্থী মুসলমান সম্প্রদায় ভারতীয় সাধনার অত্যন্ত নিকটে এসেছিলেন। তবে তারও পিছনে ছিল প্রচ্ছন্ন আর্য (ঈরানীয়) সংস্কার। ‘ঈরান’ শব্দটি সেমেটিক ভাষায় শব্দ নয়, এটি খাঁটি ইন্দো-ইরানীয় শব্দের (‘আর্যাণাম্’) অপভ্রংশ। সে যাই হোক, ইসলামের প্রবল মর্ত্যপ্রীতি, জাত-পাঁতের বেষ্টনীভঙ্গ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের নিবিড় অনুভূতি ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যে বাইরের দিকে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগের সন্তসাধক সম্প্রদায় আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিপন্থা প্রচার করে সাময়িকভাবে ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলামের গতিরোধ ও ধর্মান্তরীকরণের প্রবল প্রচেষ্টাকে কিছুটা রুখতে পেরেছিলেন।* কিন্তু ভারতীয় আর্য-সভ্যতাকে আর বেদ-উপনিষদের যুগে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না। ছত্রিশখানি পুরাণে-উপপুরাণে মিলে তারস্বরে আর্তনাদ শুরু করলেও পৌরাণিক যুগ মানবমহিমার নতুন কোন বাণীমন্ত্রে ভারতীয় সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। কোটি

কোটি দেবদেবী পূজাভোগরাগাদি গ্রহণ করতে লাগলেন। ভারতীয় হিন্দু-সমাজ মোটামুটিভাবে পৌরাণিক মতে চললেও ইসলামের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না। তখন সমগ্র দেশ নৈতিক আদর্শ ও অধ্যাত্মসংস্কারের দিক থেকে প্রায় দেউলে হতে বসেছে, ধর্মান্তরীকরণের দ্বারা মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি হলেও ভারতীয় ঐতিহ্য মননের দিক থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। তিন-চারশত বৎসর আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে বিচিত্রতর জীবনচর্যা ও কর্ম-কান্ডে বিশ্বাসী শ্বেতাঙ্গ বণিক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং গঞ্জে, পত্তনে, বন্দরে পশরা বিছিয়ে বসে। এরাই যথার্থ অ-ভারতীয় ভাবের প্রতিকূল সংস্কার ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। ইসলাম ও তার সেবকেরা প্রধানত প্রাচ্যভূমিতে আবির্ভূত। প্রথম দিকে তার সঙ্গে ভারতের অমিত্র-সম্পর্ক থাকলেও ভারতীয় ভাব-ভাবনা এবং সারাসেনীয় সভ্যতা মোটামুটি এক মাটির রসে লালিত হয়েছে – উভয়ের প্রাণবিন্দু হচ্ছে প্রাচ্য সংস্কার।

কিন্তু ইউরোপ থেকে আনীত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রাচ্যের ধর্ম হলেও পশ্চিমের ঘরে গিয়ে সে কুলত্যাগ করেছে। সেই ধর্মাবলম্বীরা কোনও দিক দিয়েই নিদ্রাতুর প্রাচ্যভূমির আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে ইসলামের সঙ্গে আপাত বিরোধ ঘটলেও পরস্পরের বোঝাবুঝি হতে অধিক বিলম্ব হয়নি। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গসমাজ আগাগোড়া কর্মঠ, বাস্তব, সদা-জাগ্রত এবং ইহজীবনের প্রতি অতিশয় আসক্ত। তারা সপ্তাহব্যাপী জীবনের মধ্যে ছ-দিন ব্যয় করে তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধন সংগ্রহে এবং "সাবাথ ডে"-কে পৃথক করে রাখে ধর্মচর্যার জন্য। পাঁচবার নামাজ পাঠ বা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-পাঠ তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে ঠাঁই পায় না। তারা কর্ম ও ধর্ম, পার্থিব ও অপার্থিব, মর্ত্য ও অমর্ত্য—এই দুই পৃথক শ্রেণীতে জীবনধারণকে স্পষ্ট ভাগ করে নিয়েছে। বস্তুত খ্রীষ্টানী আদর্শের ও জীবনযাপন-প্রণালীর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ অনাত্মীয়তার সম্পর্ক, ইসলামের সঙ্গে নয়।

॥ ৩ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারত-বর্ষে নতুন ধরনের এক উৎকট শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রবল উচ্ছ্বাস আসতে শুরু করল। ইসলামের তরবারি ও তস্‌বি তাকে সন্ত্রস্ত করলেও মূল থেকে আশ্রয়চ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূঢ় আঘাতে শিক্ষিতসম্প্রদায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই বন্যাধারায় গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এদেশের ইংরেজিনবিশ মধ্যবিত্তশ্রেণী মনে করেছিল, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যেই

বর্তমান ভারতের মুক্তি রয়েছে। এই পাশ্চাত্যপ্রেমিকেরা আরও মনে করেছিল, বিদেশী সংস্কৃতির অবাধ-অনুশীলনের ফলে ভারতীয় সংস্কার মুছে ফেলা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা শুধু বাইরের দিক থেকে অনুকরণের ব্যাপার নয়, জাতির পূর্বতন কুলধর্মের সঙ্গে নাড়ির অচ্ছেদ্য বন্ধন সহজে কেটে ফেলা যায় না। সেকথার মূল তাৎপর্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কেউ কেউ অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা একথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, জাতীয় সংস্কার পিরানকামিজের মতো নয় যে, ইচ্ছে হলেই তা খুলে ফেলা যায় বা যথেচ্ছা বদলানো যায়।

ভারতবর্ষের ধর্মকর্ম, শীলসদাচার, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মীয় আচার-আচরণ কালের প্রয়োজনে নানা পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে। বস্তুত পরিবর্তন ভারত-চেতনার একটি প্রধান লক্ষণ। ব্রহ্ম আছেন, সগুণ সোপাধিক ঈশ্বর আছেন, পৌরাণিক দেব-দেবী সঙ্ঘ রয়েছেন, যতিজীবনের আদর্শ নন্দিত হয়েছে, আবার ভোগজীবনকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর-কারুণ্যলাভে ব্যাকুল ভক্ত সম্প্রদায় এবং নিছক কার্যকারণতত্ত্বে বিশ্বাসী বার্হস্পত্য সম্প্রদায়, পরম আস্তিক এবং ষোল আনা নাস্তিক—ভারতবর্ষীয় মানবযাত্রার মিছিলে সকলেই স্থান পেয়েছেন। ইউরোপের ইতিহাসে যাঁরা খ্রীষ্টানধর্ম সম্বন্ধে বা এর কৃত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই সদলে 'হেরিটিক' বা 'অ্যান্টিখ্রাইষ্ট' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন এবং জ্বলন্ত চিতায় ভস্ম হয়ে গেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য মত ও বৌদ্ধ মতের দর্শনপ্রস্থানগত প্রচণ্ড বিরোধের দিনেও এরকম তীব্র সঙ্ঘর্ষের সংবাদ দুর্লভ। বিশেষ ধরনের মানসিকতা, শিক্ষা, মননচর্যা, ধর্মীয় কৃত্য, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপার কোন একটা অচল অজড় আদর্শে সমস্ত জাতিকে শিলীভূত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখেনি, কালগতিকে পরিবর্তনের অমোঘ নীতি জীবনে, চিন্তায় ও আদর্শে স্বীকৃত হয়েছিল বলে এমন একটি সর্বজনগ্রাহ্য মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে আমরা একালে 'ভারতধর্ম' আখ্যা দিতে পারি* পাশ্চাত্য জাতিরা একে বলেন 'রেলিজিয়ন'। লাতিনে 'religare' শব্দটি যদি religion শব্দের উৎস হয় তাহলে

দেখা যাবে religion-এর মধ্যে "বাঁধাবাঁধি নিয়ম"—এই ধরনের অর্থ লুকিয়ে আছে। 'Creed' শব্দটির অন্তরালে রয়েছে আর একটি লাটিন শব্দ 'credo', অর্থাৎ বিশ্বাস। তাই creedal religion-ও শক্ত ধরাবাঁধা বিশ্বাসের অধীন। হিন্দু-ধর্ম, যা ইসলাম অভিযানের পূর্বে আর্যধর্ম নামেই সাধারণসমাজে পরিচিত ছিল, তা কিন্তু পশ্চিম দেশের religion নয়, creed-ও নয়। আর্যধর্মপ্রণালী হল এক ধরনের জীবনচর্যা, যা দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনসাপেক্ষ।

দেবদেবী-সংক্রান্ত বহু লৌকিক ধর্মবিশ্বাস হিন্দু ধর্মের কায়া গঠন করলেও এ ধর্ম মূলত বহুদেববাদী নয়, একদেববাদীও নয়। এ হচ্ছে আত্মা-বাদী। আত্মার স্বরূপসন্ধান আর্যসাধনার মূল কথা। আত্মা ও তার পরিপার্শ্ব এ দুয়ের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ ভারতীয় ধর্মানুশীলন, দার্শনিক চর্চা ও বিবিধ কৃত্যের একমাত্র ফলশ্রুতি। এক সদ্বস্তু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলে বাইরের ইন্দ্রিয়জ জগৎচেতনা সম্পর্কে কোন ভ্রান্তিরই অবকাশ থাকবে না। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ এই অন্তর ও বাইরের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। ইংরেজি ভাবে লালিত কয়েকজন ক্রুদ্ধ তরুণকে বাদ দিলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য জলতরঙ্গ এদেশের মনোমৃত্তিকায় প্রবল বেগে আছড়ে পড়লেও তাতে আত্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন গুটিকয়েক ব্যক্তি—সমগ্র জাতি ও সমাজের তুলনায় যাঁরা সমুদ্রতটের বালুকণা মাত্র। রামমোহন ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপর ধর্মসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে মনে করেছিলেন, পৌরাণিক যুগটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার এবং তাকে ইতিহাস থেকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা না করে ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেনঃ উপনিষদ্, বেদান্ত ও ষড়্দর্শনের নানা প্রস্থান সাধারণের মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং পৌরাণিক সংস্কার সমগ্র ভারতবর্ষকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক ঐতিহ্যকে ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে না দিয়ে তার

বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রস্তুত হলেন। এই সময়ে সাগরপারের শ্বেতাঙ্গ পন্ডিতদের কেউ কেউ নিছক কৌতূহল ও গবেষণাবৃত্তির বশে বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণ সম্বন্ধে নানা তথ্য সন্ধান করতে লাগলেন। দেখা গেল, উত্তর-বৌদ্ধ ভারতবর্ষ প্রধানত পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অতিনিন্দিত পুরাণের যথার্থ তাৎপর্য কি, দেশের আপামর জনসাধারণ পৌরাণিক ভাবের দ্বারা কেন পরিচালিত হয়েছে, সে বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

॥ ৪ ॥

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বাস্তব ভারতবর্ষ ও ধ্যানের ভারতবর্ষ একসূত্রে মিলিত হয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছি যে, ভাবের দৃষ্টিতে দেখলে, চোখে ভালবাসার রং ধরলে বাস্তব ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বোধ জন্মলাভ করে—এ বোধ নিষ্কাম ও অহেতুক। একেই বলতে পারি উপযোগবাদের এলাকা বহির্ভূত বিশুদ্ধ চিদানন্দময় অনুভূতি। ভালবাসার দৃষ্টিকে রসের দৃষ্টি ও আনন্দের বোধ বলা যেতে পারে। স্বামীজী এই বোধের প্রতীকপুরুষ, এবং তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের অন্তরে তিনি এই ভালবাসা জাগাতে চেয়েছিলেন, নিজেও এই ভূমি থেকে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেছিলেন।

যাঁরা স্বামীজীর ইংরেজি গ্রন্থ ও বাংলা রচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবহিত আছেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, ইতিহাসচেতনা তাঁর একটি বিশিষ্ট মনোভঙ্গি। তিনি সমাজবেত্তা, ধর্মের সংগঠক, ব্যক্তিগত চরিত্রের নিয়ামক এবং সর্বোপরি, সেবাধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। কিন্তু তাঁর যাবতীয় কর্মপ্রবাহ, লোকহিতৈষণা, অধ্যাত্মসংস্কার—সমস্ত কিছুর মূলে আছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভারতবর্ষকে উপলব্ধির চেষ্টা। কালপ্রবাহের মতো সূক্ষ্মচেতনা ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা—এই দুয়ের পরম্পরাক্রমে ইতিহাস অগ্রসর হয় এবং অখন্ড কালপ্রবাহ বাস্তব জীবন ও বোধের সংস্পর্শে এসে খন্ড খন্ড বোধে রূপায়িত হয়। ভারতবর্ষের জীবন, ইতিহাস ও সাধনার বিকাশধারা, পরিবর্তন ও পরিণাম বুঝতে গেলে তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের গতিপথটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, এবং স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী ভারতবর্ষের ধ্যান ও কর্মের মূল প্রেরণা বুঝতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের কালক্রম অবলম্বন করে। বৈদিক ও উত্তর বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক, মর্ত্যজীবী ইসলাম ও ভারতীয় ভক্তিধর্ম, একালের পাশ্চাত্যের ইহবাদী, জীবনসমুখ ভোগকামনা—

এ সবই বিবেকানন্দ কালের ক্রমগতি অবলম্বন করে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উনিশ শতক—এই তিনটি কালপর্যায় ভারতবর্ষের জীবন ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনই একান্তভাবে বৈরাগ্যবাদী ছিল না, নৈষ্কর্ম্যের সাধনা করলেও নিষ্কর্মা ছিল না। সেকালে রাজা রাজ্যপাটে বসতেন, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন, দরকার পড়লে পররাজ্য গ্রাস করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আবার অন্য দিকে গো-ব্রাহ্মণের সেবা করতেন, চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের বিশুদ্ধি রক্ষা করতেন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সমাজের উপদেশে তিনি বিনয়-শীল-সদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। একদিকে দৈনন্দিন জীবনধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা, আর একদিকে জীবনাতীত অধ্যাত্মসাধনা দুদিকেই যাতে সমানুপাতিক ভারসাম্য থাকে, প্রাক্-বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ তার প্রতি সদাসতর্ক ছিল। ফলে সমস্ত সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করাব জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনকে সমন্বয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হলে তাকে যে 'বিনয়'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, তাকেই বলা যেতে পারে জীবনচর্যার চারিটি পর্ব অর্থাৎ চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস)। চতুরাশ্রম ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত এবং চাতুর্বর্ণ্যের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) দ্বারা শ্রেণীবিন্যাস রক্ষিত হত।* কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল বৌদ্ধযুগে, যখন 'আশ্রম' ও 'বর্ণ' ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল, সঙ্ঘারাম ও প্রব্রজ্যা মানুষের গৃহধর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল, এবং তার ফল হল—বৈরাগ্যের বিকার, মনুষ্যত্বের অপহ্নব, তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার ধনুষ্টংকার। উত্তর-বৌদ্ধযুগে এক ধরনের রহস্যবাদী, সংগুপ্ত দেহচর্যা 'কাল্ট' ও উপসম্প্রদায়ের সুড়ঙ্গপথে ছড়িয়ে পড়লে কামনাকে দমন করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন কামকে ধর্মের নামে সেবা শুরু হয়ে গেল। তন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, নাথপন্থ. অঘোরপন্থ

প্রভৃতি 'যান' ও 'পন্থ' ক্রমে ক্রমে সমাজের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে দিল। পরস্পর-বিবদমান ভারতীয় জাতি সম্প্রদায় এবং দেহচর্যাকেন্দ্রিক রহস্যময় কৃত্য বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে অবাধে অনুশীলিত হতে লাগল। এতে অধ্যাত্মবাদের সীলমোহর ছিল। এ বিষাক্ত ভাবপ্রবাহ শঙ্খবিষের মতো সমস্ত জাতিকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দর্শনযুগে ভারতের মনন ও সাধনা যে নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে মোহমুক্তির প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং অদ্বৈততত্ত্ব যে জীবনচর্যার চূড়ান্ত বিকাশ বলে গৃহীত হয়েছিল, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎ সঞ্চার করে জাতির মোহাচ্ছন্ন দেহমনকে আবার স্বস্থ করতে চাইলেন। কিন্তু তখনই সমগ্র দেশ ও সমাজ এতটা অসাড় হয়ে পড়েছে যে, মুষ্টিমেয় সাধকসম্প্রদায় ও কিছু মননশীল ব্যক্তি এই তত্ত্বকে মানবচেতনার শেষ নিদান বলে গ্রহণ করলেও বৃহৎ জনসঙ্ঘ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রইল। তারপর ইসলামের অভিযানে ভারতীয় ধ্যানধর্মের অনেকটাই আত্মরক্ষার তাগিদে আত্মগোপনশীল গুহাবাস বেছে নিল। অবশ্য মধ্যযুগে আত্মসমর্পণমূলক ভক্তির প্লাবনে এই মানসিক জাড্য দূর করবার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সুদৃঢ় মনননিষ্ঠ প্রত্যয় ভাবাবেগে কিছু আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, একথাও স্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যদেব, তুলসীদাস, কবীর, নানক, রজ্জব, দাদু, মীরাবাঈ, নরসি মেহ্‌টা—এঁরা ভক্তিকে মানবজীবনের চরম পুরুষার্থ বলে প্রচার করেছিলেন। মধ্যযুগের ভ্রষ্ট অবস্থা বিবেচনা করলে এঁদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সহজেই বোঝা যাবে।* অদ্বৈতপন্থা ভিন্ন জাতির বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, একথা একালের ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য একথা তর্কসাপেক্ষ যে, তাঁর অদ্বৈতপন্থা প্রকৃত অদ্বৈতপন্থা কিনা, অথবা ইসলামি 'মোতাজেলা' ও 'মুওয়াহিদ্দিন' সম্প্রদায়ের যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদ তাঁকে প্রথম জীবনে উদ্বুদ্ধ করেছিল এমন কথাও কেউ কেউ বলতে পারেন। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে তাঁর অনুরাগী ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ উপসম্প্রদায় কখনও জ্ঞানমার্গীয় ভক্তিবাদ, কখনও আবেগমূলক ভক্তির রসে নিজেদের আর্দ্র করে, কখনও এই মতকে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োগ করে অদ্বৈতপন্থার উনিশ শতকী টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 'আইডিয়া' দানা বেঁধে ওঠে। একদিকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ আর একদিকে লোকহিতৈষণা ও সমাজসংস্কার, একদিকে নব্য পৌরাণিকতা আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজ-অবলম্বিত বেদান্ততত্ত্ব, একদিকে ভারতীয় জীবনের নিষ্কাম কর্ম, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের প্রবল কর্মোদ্যম ও জ্ঞানানুশীলন—এই উভয়-কোটির মধ্যে ভারতীয় মানস যখন দুলছিল, ঠিক তখনই ভারতীয় সমাজ ও ভাব-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মানসসন্তানদের আবির্ভাব হল। বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের মূল তত্ত্বকথা, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ বুঝে নিয়ে তাকে দেশকালের উপযোগী করে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এইটি হচ্ছে ভারত-সংস্কৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

॥ ৫ ॥

স্বামীজী ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করবার জন্য ভারত-পরিক্রমায় বহির্গত হন। বাসনা ছিল— সমস্ত ভারতবর্ষের মূল প্রাণরহস্য আবিষ্কার করবেন। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, বহু আঘাত ও বিপদসত্ত্বেও ভারতসভ্যতা যে জাতিকুল হারিয়ে ফেলেনি, বা সংস্কৃতির দিক থেকে বর্ণসঙ্কর হয়ে যায়নি, এর মূল রহস্য সন্ধান করা প্রয়োজন। ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার বহু অংশ হয় স্বাভাবিক নিয়মে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নয় খ্রীষ্টানধর্মের চাপে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে আজ সেসব ধর্মচর্যা, cult প্রভৃতি জীবন থেকে সরে গিয়ে স্মৃতির যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অনুরূপ বা অধিকতর প্রবল আঘাত এলেও প্রাচীন ভারত কি মন্ত্রবলে মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উদ্বর্তিত হয়েছে, স্বামীজী সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গ লাভ করে সে রহস্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।*

তিনি দেখলেন, ভারতভূমির মূল তাৎপর্য হচ্ছে এক ধরনের ভাবের সমন্বয়। একদিকে ব্রহ্মতত্ত্ব, আর একদিকে বহুদেববাদ; একদিকে ঈশ্বরকরুণা, আর একদিকে নিরীশ্বরবাদ; একদিকে সর্বাস্তিবাদ, আর একদিকে নাস্তিক্য-বাদ; একদিকে বৈরাগ্য, আর একদিকে ভোগ; একদিকে ব্রহ্মসংহিতা, আর এক-দিকে কামসংহিতা; একদিকে যুগযুগান্ত ধরে নানা ধর্মীয় কৃত্য ও চর্যার অবাধ অনুশীলন আর একদিকে জাতিপাঁতিহীন, পুঁথিপত্রবর্জিত ব্রাত্য সংস্কার। একদিকে আসক্তির পঙ্ককুণ্ডে কর্দম বিলাস, আর একদিকে অনাসক্তির শূন্যতা—এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। বৌদ্ধ, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্কার এই প্রবাহে মাঝে মাঝে কিছু আবর্ত সৃষ্টি করেছে, পরে আবার তা স্তিমিত হয়ে গেছে—জীবন ও ভাবপ্রবাহ যেমন চলছিল, তেমনি চলতে শুরু করেছে। প্রবাহের এই নিরবচ্ছিন্নতার কারণ, বিপরীত ও বিষমকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ভারতবর্ষের মূল ধর্ম। বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ধর্ম অনুশীলন ও জীবনচর্যা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ একথা সার বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বেসুরোকে সুরের মধ্যে আনা, বিরোধকে রোলার চালিয়ে সমভূমি করে দেওয়ার চাইতে তাকে যথাসম্ভব ঐক্যের মধ্যে রক্ষা করা—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা যেতে পারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি। নানা ছোটখাট ভেদবৈষম্যসত্ত্বেও ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একপ্রকার ভাবের ঐক্যকে অনুসরণ করেছে এবং সে ঐক্যবোধের মূল প্রেরণা হল ব্রহ্মবাদ। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন পরস্পরসম্পর্কহীন কোটি কোটি জীবকে একটি পারমার্থিক ঐক্যবোধের মধ্যে আনতে পেরেছে, যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ জগতের বিরোধ নেই। তারই ফলে বাইরের

ইতিহাসের কুশীলবেরা আকাশ বিদীর্ণ করলেও জাতির অন্তঃপুরে তার কর্কশ কলরব পৌঁছায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিবেকানন্দ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতে তিনি দেখেছিলেন—গোটা জাতটাই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি বা খ্রীষ্টান হয়ে যায়নি, তার কারণ—নিজের মূল স্বরূপে এ জাতির আস্থা কখনও পুরোপুরি টলে যায়নি। টলে গেলে প্রাচীন ঈরানের মতো এদেশে সর্বত্র ইসলামের ধর্মীয় আধিপত্য স্থাপিত হত, অথবা আরবীয় ইসলাম ও ঈরানীয় আর্যদেং. সংমিশ্রণে যেভাবে পারস্যের সূর্যোপাসক জাতি অর্ধচন্দ্রের প্রতীক-পতাকাকে শিরে ধারণ করেছিল, ভারতবর্ষেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত এবং এদেশেও একটি মিশ্রধরনের ইন্দো-সারাসেনীয় সংস্কার, ধর্মবোধ ও আচরণমূলক বৃহৎ জাতি-সম্প্রদায় গড়ে উঠত। অথবা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানধর্মের যেমন নানা আঞ্চলিক রূপ আছে, ভারতবর্ষের মূল ধর্মমত তেমনি তত্ত্বের দিক থেকে নানা ভাগে উপ-বিভাগে খন্ড-বিখন্ড হয়ে যেত। অবশ্য বৈদিক-ঔপনিষদিক, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগের ধর্মমত ও আচারানুষ্ঠানের অনেক রূপান্তর হয়েছে, দেব-দেবীসঙ্ঘও কায়া বদলিয়ে ফেলেছেন। তবু মূল কুলধর্মে হাত পড়েনি। সে মূল বৈশিষ্ট্য হল রঙ্গনটী প্রকৃতির জড় ও জীবকে কেন্দ্র করে নর্তনবিলাস এবং আকার-অবয়বহীন, কালত্রয়াব্যবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ চিদাত্মাবোধ—যাকে চলতি কথায় বলা হয় ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মবিহার—এই দুয়ের ভেদ ও বিকল্পের প্রতিভাস সম্পূর্ণরূপে নিরসন। বৌদ্ধযুগের শেষ পর্বে এ সমন্বয়-বন্ধন ছিন্ন হল, কিন্তু পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু ভাবগত বিশৃংখলা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়নি--শুধু অধিকারী-ভেদ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করলেন।* এর ফলে নিষ্কাম নিদিধ্যাসন এবং

সকাম জীবনচর্যা ও যৌবন, যোগক্ষেম ও ত্যাগ—সর্ববিধ দ্বৈতভাব অন্বয় ঐক্যের মধ্যে স্থানলাভ করল। ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, ইসলামের অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের এই মনঃপ্রকৃতি মোটামুটি একইভাবে চলছিল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও জীবনসাধনার যথার্থ প্রতিকূলতা নিয়ে উপস্থিত হল ইউরোপীয় সভ্যতা।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ এদেশে করুণার ধর্ম (religion of mercy) প্রচার করলেও ইউরোপীয় জীবনধারার প্রবল আসক্তিযোগই ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের আলোড়িত করেছিল। বৌদ্ধদের সর্ববৈনাশিক শূন্য যেমন শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্বের সহোদর নয়, তেমনি খ্রীষ্টানসঙ্ঘ প্রচারিত ধর্ম ও নীতিচর্যা ভারতধর্মের নিকটতম আত্মীয় নয়। কারণ শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেই দেখেছিলেন পাশ্চাত্য ধর্মানুষ্ঠান ও জীবনচর্যা ধর্মের জীবন ও কর্মের জীবন, ত্যাগের জীবন ও ভোগের জীবন, রবিবাসরীয় ক্রিয়াকর্ম ও অন্য ছদিনের জীবিকার্জন প্রচেষ্টা—এই দুই ব্যাপারকে পৃথক রেখে চলতে উপদেশ দিয়েছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ এই ইহকামী এবং বাস্তব-জীবনে সফল পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ক্রমে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরীকরণের জোয়ার মন্দীভূত হয়ে পড়ল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং ঈষৎ পরে বঙ্কিম-নেতৃত্বে নব্যহিন্দু সমাজ প্রাচীন ভারতকে নতুনভাবে আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। স্বামীজী এই সমস্ত ভাব ও আদর্শের প্রতিক্রিয়া প্রথম যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও তত্ত্বোপদেশে ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন। বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্য অথবা শঙ্করকৃত উপনিষদ্ ব্যাখ্যা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী না হলেও এই তত্ত্বটি ভারতীয় চেতনায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা রূপান্তর ও পরিবর্তন হলেও এই চিন্তাটি ভারতবর্ষ কোনও দিন বর্জন করেনি। কিন্তু বৌদ্ধ ও ইসলাম আদর্শের সঙ্ঘাতে এই চিন্তাচর্যা কিছু আড়ালে পড়ে গিয়েছিল এবং জাগ্রত জীবন থেকে সরে গিয়ে ক্রমেই "বনের বেদান্ত" হয়ে উঠেছিল। দ্বৈতবাদী নানা প্রস্থান, ভক্তিবাদের পুলকময় বিপুল প্লাবন এবং দেহকেন্দ্রিক ভুক্তি-মুক্তিবাদী রহস্যময় কৃত্যানুকৃত্য সত্ত্বেও মধ্যযুগের তত্ত্বাদর্শ থেকে এই মননধারা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়নি। কারণ এটাই ভারতবর্ষের নিজস্ব কুলধর্ম। কুলধর্ম পরিত্যক্ত হলে সমস্ত জাতীয় কাঠামোই ভেঙে পড়ে এবং দেশ ও সমাজ অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে ছুটে

চলে। তখন কিছু গ্রন্থ ও স্থাপত্যকর্ম ছাড়া একটা বিশাল জাতির আর কোন স্থাবর চিহ্ন থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে পড়বে প্রাচীন আইওনীয় সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্য-ঐতিহ্য প্রভৃতির কথা। ভারতবর্ষকে সে অপঘাত থেকে রক্ষা করেছে এমন একটি মননধর্ম ও জীবনচর্যা, যা জীবনের কোনও একটিকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি, বা মানুষের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে পুরাতন স্মৃতিসংহিতার অনুশাসনে অচল করে রাখেনি। মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ভেঙে পড়লে এবং বৈদেশিক শাসকশক্তির প্রবল চাপের ফলে ঐ অদ্বৈত সমন্বয়বোধ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কিছু অসাড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইউরোপীয় ভাবধারার প্রবল সঙ্ঘর্ষে সেই পুরাতন ভাববস্তু আবার নবরূপে জেগে উঠল। রামমোহন—দয়ানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবচন্দ্র—বিবেকানন্দ সেই সত্যটিকেই নানা দিক থেকে দর্শন করে জাতীয় জীবনের অনুকূলে তাকে ব্যক্তিজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই তত্ত্বই ইউরোপ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী সমাজের যুক্তিবুদ্ধিকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তাঁরাও অনুভব করেছিলেন, এই ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বটি আসলে কোন দেশকালের গণ্ডিবদ্ধ ব্যাপার নয়। সর্বদেশে ও কালে এর একটা সার্বজনীন আবেদন আছে।* স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ততত্ত্বের মূল কথাকে একালের মানবসমাজে একালের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছেন।

কালক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বের লোকপ্রচলিত অর্থ হয়ে পড়েছিল—ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সবই মায়িক ও প্রাতিভাসিক অর্থাৎ ব্যক্তিপ্রত্যয়জাত এবং ইন্দ্রিয়জ বস্তুচেতনা আসলে একটি শূন্যগর্ভ বিরাট নেতিবাদ—এই ধরনের একটি অর্ধদার্শনিক তত্ত্বকথা শুধু লোকসমাজে নয়, সুধীসমাজেও গৃহীত হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হল বাস্তব ভীরুতা ও প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রতি অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা—যাকে চিত্তের জড়ত্ব ছাড়া আর কিছু নাম দেওয়া যায় না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিষ্কল ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ এবং জগদ্ব্যাপারের প্রতি অলস ঔদাসীন্য—ভারতবর্ষের সমাজজীবনের অধোগতি এই কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছিল। নৈষ্কর্ম্য ও বিগতস্পৃহার অর্থ জীবনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়। এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ও সাধককে 'নির্মম' পলাতক সন্ন্যাসীতে

পরিণত করেছিল, মানুষের দুঃখ-দুর্গতিকে "স্বপ্নো নু, মায়া নু"† বলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিবেকানন্দ এ পথের পথিক নন। বেদান্ত তাঁকে বেশী করে মানব-পথিক করে তুলেছে, নিজ জীবন সম্পর্কে অনাসক্ত হয়েও তিনি পতিত ও আত্মবিশ্বাসহীন জাতির পাতিত্যমোচনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব যে "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্"* বলে সুদুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মোক্ষ-নির্বাণেচ্ছাই নয়। দুঃখব্যাধির ত্রিবিধ পীড়নে জীবের সকরুণ পরিণাম দেখেই এই রাজসন্ন্যাসী তত্ত্বকথার গহনতা ছেড়ে দিয়ে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য শুধু নিজস্ব তত্ত্বোপলব্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে ভারতের চতুঃসীমায় মঠ প্রতিষ্ঠিত করে বৌদ্ধধর্মের বিকার থেকে আর্যমানসিকতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হতেন না, এবং স্বামীজীও হিমাচল-গুহাবাস ছেড়ে আধুনিক জীবনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন না।

বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বই যে আধুনিক বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাণের পথ, এবং এটি কোন সাম্প্রদায়িক বা বিশেষ দেশের কুক্ষিগত তত্ত্বকথা নয়, পরন্তু যে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই (তিনি যে দেশের এবং যে সময়েরই হোন না কেন) এই তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে মানসিক প্রদাহ মেটাতে নিজেই সক্ষম, পাশ্চাত্য বিশ্বে বিবেকানন্দ সেই কথাই অসাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পশ্চিমের বাস্তববাদী ও কর্মনিষ্ঠ জাতিকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না করলে তাদের চিরচঞ্চল রাজসিক সংস্কার কখনও সুগভীর আত্ম-প্রত্যয়ে পৌঁছাতে পারবে না। তাই স্বামীজী পাশ্চাত্যে বেদান্ততত্ত্বকে প্রধানত জ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে যেসব ভক্ত তাঁর ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের তিনি জ্ঞানবাদ থেকে আত্মোপলব্ধিমূলক সূক্ষ্ম চেতনায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তত্ত্বটিকে একালের প্রাণ-সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি মূলত কর্মযোগ ও সেবাধর্মের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিদ্রাতুর প্রাচ্য জাতিকে মানবত্বের মহিমায় উন্নীত করতে হলে তাকে রাজসিক কর্ম ও সাত্ত্বিক সেবাধর্মের মধ্যে টেনে আনতে হবে। তা নইলে তার বহু-শতাব্দী-ব্যাপী মানসিক জড়তা, যাকে আমরা অধ্যাত্মসাধনা বলে ভুল করি (মোহনিদ্রাকে বাহ্যত যোগনিদ্রা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক), এই চিত্তবৃত্তির নিষ্ক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত একটা জাতির কর্মজীবনকে তামসিক জড়তার কুম্ভীপাকে নিক্ষেপ করবে। এ সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। সেই জন্য অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্শ্বচরদের শুধু ধ্যানধারণার তুরীয় লোকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করতে দেননি। ভারতের কোটি কোটি মানুষের পাতিত্য মোচনের জন্য অনুরাগী শিষ্যদের সেবাধর্মের মধ্যে বেদান্তের নতুন

তাৎপর্য খ‍ুঁজতে বলেছেন। লোকশিক্ষা, জীবসেবা, সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা, শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ প্রচার—এগ‍ুলি অতি প্রত্যক্ষ সত্য। ব্রহ্মতত্ত্বের দোহাই দিয়ে যাঁরা এসব জগদ্ব্যাপারের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকেন এবং এ সমস্ত প্রচেষ্টাকে কর্ম-বন্ধন বলে মনে করেন, তাঁরা জীবনভীর‍ু পলাতক, যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞ মাত্র। একালের ভারতবর্ষের জীবনযাত্রাকে পরিত্যাগ এবং ইতিহাসের ধারাপ্রবাহকে অস্বীকার করে নয়, পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের প্রতি উদাসীন থেকেও নয়,—সমে ও বিষমে, স‍ুরে ও বেস‍ুরে যে মানবসঙ্গীত অহরহ বেজে চলেছে, যাতে ভালমন্দ, আলো-অন্ধকার একাকার হয়ে গেছে, তাকে অতিপ্রত্যক্ষ সত্য বলে গ্রহণ করে লোকজীবনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা এই নব্য বেদান্ত-তত্ত্বের ম‍ূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষের এই স্বর‍ূপটি একালের ইতিহাস ও সমাজের পটে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই হচ্ছে স্বামীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষ। এই বিশাল দেশ-কাল-পাত্রকে তিনি নবজীবনের এক উদার উপলব্ধির মধ্যে ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই দৃষ্টি ও ধারণা বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের দৃষ্টি নয়, রাগান‍ুরাগ বিবর্জিত ত্যাগের দৃষ্টিও নয়। এ হচ্ছে নিষ্কাম ভালবাসার আবেগ। কথাটা বাহ্যত অয‍ুক্তিয‍ুক্ত বলে মনে হলেও পরমার্থত সম্প‍ূর্ণর‍ূপে প্রাসঙ্গিক। সকাম ভালবাসা হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা"। নিষ্কাম ভালবাসা হল "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা"—একালের ভাষায়—জীবসেবা। এই বিরাট জীবনপ্রবাহ ও ইতিহাসের ধারাকে বিবেকানন্দ এই মানবপ্রেমের রসেই উপলব্ধি করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গ‍ুর‍ুর কাছে এই দীক্ষা লাভ করেছিলেন। দেশ-কাল-পাত্রের খণ্ডিত ভৌগোলিকতা ভুলে গিয়ে সীমাবদ্ধের মধ্যেই অসীমতাকে, সহস্র বন্ধনের মধ্যে ম‍ুক্তিকে, স্নেহ-ভালবাসা সেবার মধ্যে দ‍ুঃখাভিভূত মান‍ুষকে জীবন্ত সত্যর‍ূপে এবং খণ্ড তুচ্ছের মধ্যে বৃহতের স্বর‍ূপ উপলব্ধি—মানসিক এই প্রবণতা বিবেকানন্দের দান। কারণ তিনি ভারতবর্ষের যথার্থ র‍ূপটি শ‍ুধ‍ু ধ্যানের মধ্যে নয়,—জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যাঁরা রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় নানা আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তাঁরই করধৃত দীপবর্তিকার সাহায্যে পথের সন্ধান করেছিলেন। যে আধ‍ুনিকতা ফ্যাশন মাত্র নয়, যে শিল্পকলার অন‍ুশীলন ও আলোচনা 'ডিলাটেন্টে'র অবসর বিনোদনের সঙ্গী নয়, যে সমাজবিজ্ঞান শ‍ুধ‍ু প‍ুঁথিগত বিদ্যা নয় এবং যে রাজনীতি শ‍ুধ‍ু শ‍ূন্যগর্ভ আন্দোলনসর্বস্ব নয়, পরন্তু যার মধ্যে ভারতের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে—স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকেই আবিষ্কারে প্রয়াস করেছিলেন, সেই ভারতের ধ্যানম‍ূর্তি তিনি প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও একালের পাতিত্য, আরণ্যক য‍ুগের মহর্ষি এবং একালের 'পারিয়া', অনন্ত ও সান্ত—সমস্ত

বিপরীতকে বৃহত্তর মানবচেতনালোকে উপস্থাপিত করে ভারতবর্ষের নিত্য-স্বরূপের যে মূর্তি তিনি ধ্যান করেছিলেন, তাকেই মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলা যেতে পারে। তাই বিবেকানন্দই যথার্থ 'ভারতপথিক'। ভারতবর্ষ অস্তি ও নাস্তির মধ্যে সংশয়চিত্তে দোদুল্যমান নয়, জীবনকে মায়া বলে পরিত্যাগ করাও তার অভীষ্ট নয়, 'হেডনিস্ট্' ও 'এপিকিউরিয়ন'-দের মতো ঐহিক সুখানুভূতিকে পরম পুরুষার্থ বলে উদ্বাহু হওয়া ভারতের স্বভাববিরোধী। পিপ্পলী শাখাস্থিত দুই সুপর্ণের মতো ভারতবর্ষ ইহ ও পরত্রের যে সমন্বয়ের সাধনা করেছে, নিষ্কাম জ্ঞানসাধনা ও সকাম ভক্তিসাধনাকে যেভাবে সমন্বিত করেছে, তা শুধু দেশকালে পরিব্যাপ্ত কোন সীমাবদ্ধ তত্ত্বকথা নয়, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপও নয়—তার মূল এ জীবনমৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নিত্যকালের ভারতবর্ষকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নবরূপে দর্শন করেছেন এবং সমগ্র জাতিকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তার মধ্যে আহ্বান করেছেন। নরের মধ্যে নরোত্তম এবং নরোত্তমকে নারায়ণে উন্নীত করাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সে সাধনা কুটিলগতিতে প্রায় হাজার বৎসর ধরে অবহেলিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে বিবেকানন্দ সেই নর-নারায়ণতত্ত্ব দুঃখহত ভারতবাসীর মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। এই হচ্ছে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রচারিত ধ্রুববাদে (positivism) বা উপযোগবাদে (utilitarianism) মানুষের কল্যাণ স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সে কল্যাণ নিতান্তই জীবধর্মী-মানুষের আহার-নিদ্রার কথা। সে মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক। সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সমাজশক্তি হস্তগত করে বহুজনের কল্যাণসাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে কল্যাণসাধনার মূল কারণটি কিছু অস্পষ্ট। নরকে নরোত্তমে পরিণত করা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নরোত্তম নারায়ণে উদ্বর্তিত না হলে মানবজীবনের মৌলিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতচেতনাকে এই দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এই জন্য কোঁৎ, মিল, জেরিমি টেলর প্রভৃতির তুলনায় স্বামীজীর সাধনরীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসনগত অধিকার দিলেই তার একান্ত কল্যাণ করা যায় না, তার অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। তার মধ্যে অন্তর্লীন বৃহৎ সত্তার উদ্বোধন, ক্ষুদ্রতম অণুকে বৃহত্তমের সমপর্যায়ে উপলব্ধি, কারণ প্রকৃতির দিক থেকে দুই-ই এক—ভারতবর্ষের এই অদ্বৈতবাদ স্বামীজী নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। মুমূর্ষু ভারতের বাঁচবার একমাত্র পথ এই অন্বয়বোধ, যা মানবকল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বামীজী বর্তমান ভারতের কানে সেই মহামন্ত্র জপ করেছিলেন।

ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকেছেন উইল ডুরান্ট ঃ "বিশলক্ষ বর্গমাইলব্যাপী এই বিশাল উপদ্বীপ; আয়তনে আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ এবং ভারতের অধিভূ গ্রেট ব্রিটেনের বিশগুণ। এখানে বাস করে বত্রিশ কোটি মানুষ—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমবেত লোকসংখ্যার চাইতেও বেশী এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২৯০০ বা তারও পূর্বেকার মহেঞ্জোদারো থেকে উদ্ভূত বিকাশ ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাবশালী অবিচ্ছিন্ন ধারাটি সাম্প্রতিক কালে প্রকটিত হয়েছে গান্ধী, রমন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বর্বর পৌত্তলিকতা থেকে শুরু করে প্রতিটি উন্নত পর্যায়ের ধর্মমত এবং সর্বোপরি সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সর্বেশ্বরবাদ দেখা যাবে এদেশে। খ্রীষ্টধর্মের আটশ বছর পূর্ব থেকে আটশ বছর পরে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত এদেশের দার্শনিকগণ ঔপনিষদিক অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিতে হাজার রকমের ভাববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এদেশের বৈজ্ঞানিক তিন হাজার বছর পূর্বে জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশ করেছেন এবং ইদানীংকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে অনির্ণেয় অতীতকাল থেকে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদেশের রাজধানীগুলিতে রাজত্ব করেছেন অশোক ও আকবরের ন্যায় প্রাজ্ঞ ও হিতকারী প্রজাপালক। এদেশে হোমারের মতো সুপ্রাচীন চারণকবি মহাকাব্য গান গেয়ে শুনিয়েছেন। এদেশেই জন্মেছেন সেসব মহাকবি যাদের বর্তমানেও জগৎ জুড়ে সমাদর। এদেশের নিপুণ শিল্পী তিব্বত থেকে শ্রীলংকা এবং ক্যাম্বোডিয়া থেকে জাভা পর্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর জন্য অসংখ্য বিশাল মন্দির গড়েছেন; মুঘল বাদশাহ ও বেগমের মনোরঞ্জনের জন্য নিখুঁত সুন্দর সৌধ নির্মাণ করেছেন—ভারতের এই ভাবমূর্তি ইদানীংকালে আত্মপ্রকাশ করছে ধৈর্যশীল গবেষণার মাধ্যমে। সেদিন পর্যন্তও পাশ্চাত্য-মানসে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপের একচেটিয়া সম্পদ। ভারতবর্ষ সেই পাশ্চাত্যের মানসলোকে নবীনপ্রতিভাসম্পন্ন একটি মহাদেশরূপে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।"[১] এই হল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত এক পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকের চিত্তপটে বিধৃত ভারতবর্ষের একটি পরিলেখ। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে সুমহান ভারতবর্ষের বিপুল বিচিত্র সংস্কৃতির অনেক কিছুই

এখনও অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত এবং জ্ঞাতাংশটুকুরও যথার্থ মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

উত্তরে চিরতুষারাবৃত নগাধিরাজ ও পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেনিল সুনীল জলধি বেষ্টিত ভারতভূখণ্ড একটি বিশিষ্ট দেশ। ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাত এবং সর্বোপরি যুগযুগান্ত ধরে নিজস্ব একটি ভাবধারার চর্চা ও চর্যা এই দেশের ঐতিহ্যকে দিয়েছে একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সত্তা, এদেশে গড়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, বিকশিত হয়েছে মানবগোষ্ঠীর এক অনন্য সুন্দর ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষের আকৃতির যেমন বৈশিষ্ট্য, ততোধিক তার প্রকৃতির। প্রকৃত ভারতবর্ষের আকৃতি সম্বন্ধে যদিও বা আমরা খোঁজখবর রাখি, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে, অন্তর্নিহিত ভাবজীবন সম্বন্ধে অধিকাংশের জ্ঞান সত্যই সীমিত। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন ঃ "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। ...রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না।...তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ...এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচারব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।"[১] এদেশের মানুষ অতীতে কি করেছিল, কিভাবে প্রবল শক্তি অর্জন করেছিল, তারা যা শ্রেয় জ্ঞান করেছিল তাকে কিভাবে আয়ত্ত করেছিল, আয়ত্ত করে কিভাবেই বা তাকে সংরক্ষণ করেছিল—এই তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করেই এই দেশবাসীর বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব। কোন জাতিই তার নিজের গতিপ্রকৃতি ও শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন না হলে তার সহজাত শক্তির স্ফুরণ সম্ভব হয় না এবং নিজস্ব গতিপথে তার অভ্যুদয় ও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনতে হবে, তার সত্যিকারের ইতিহাস জানতে হবে, ভারতাত্মার মর্মমূলের ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "...কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ

সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি।" ৩ এই "বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে" গুপ্ত পথ অনুসরণ করে জানতে হবে ভারতবাসীর মননের ইতিহাস, ভারতবাসীর বিশ্বাসের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মকথা—এক কথায় ভারতীয় ভাবধারার প্রকৃত স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা সহজেই "নীতি, শিল্প-কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশভূমি" ভারতবর্ষের বাহ্য ও আন্তর রূপ নির্ণয় করেছিল সুনিপুণভাবে। একজন গৌরবান্বিত ভারতবাসীর ন্যায় তিনি পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীকে বলেছিলেনঃ "...তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হান্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব-স্বরূপ মিশ্রগণিত—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যা-দশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (Decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। ...সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার ভিত্তি। ...সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য।... শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রং উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার'

কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে...।"[৪] এভাবে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমা ঘোষণা করে স্বামীজী শুধু যে ভারতবর্ষকে জগৎসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাই নয়, তিনি আত্ম-গ্লানিতে নিমজ্জিত দেশবাসীর অবসাদমুক্তি দিয়েছিলেন, স্বদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবাসীর অন্তরে। তিনি জাতির চিত্ত হতে জড়তা, ভীরুতা ও দুর্বলতা দূর করে দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠে উদ্গত জাগরণের মন্ত্র জাতির মেরুদণ্ডে এনেছিল স্বাজাত্যাভিমানের শিহরণ। স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী কলম্বোতে প্রথম বক্তৃতাতেই আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেনঃ "আগে আগে আমি ভাবতাম যে ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ডমাত্র নয়, একটি প্রাচীন জাতির বাসভূমিমাত্র নয় বা একটি দুর্লভ সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্রমাত্র নয়, তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, ধর্মভূমি, দেবভূমি। ভারতবর্ষ জগতের ধর্মচেতনার প্রাণ-কেন্দ্র। ভারতবর্ষ একটি মহান আদর্শের প্রতীক। ভারতবর্ষ একটি শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন। ভারতবর্ষ স্বামীজীর ভালবাসার বস্তু। ভারতের ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্রতম, ভারতের জল নির্মলতম, ভারতের বায়ু বিশুদ্ধতম। তাঁর মুখের পঞ্চাক্ষর 'ভারতবর্ষ' শ্রোতার প্রাণে শিহরণ তুলত, একটি অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করত। তিনি একদিন সানফ্রানসিস্কোতে স্বীকার করেছিলেনঃ "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন আমি বলতে আরম্ভ করি, তখন কোথায় গিয়ে থামতে হবে তা কখনো জানি না।" তাঁর এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূলে ছিল ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবল যুক্তি। স্বামীজী একটি নিবন্ধে লিখেছিলেনঃ "দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই-সব কিছুরই পুণ্যভূমি। ...আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্র-সমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল

হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত—বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে দেশমাতৃকা রানীর মত পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।"[৫] অশ্রুতপূর্ব ইতিহাসের মনন-আলোকে উদ্ভাসিত স্বামীজীর দৃষ্টি স্বচ্ছ। এই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানতে হবে। ইতিহাস সব দেশে সমান নয়। এই দৃষ্টিতে না দেখলে আমরা সত্যিকারের ভারতবর্ষকে খুঁজে পাব না। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে বিবেকানন্দের পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটিমাত্র টিকে আছে। সেটি ভারতীয় সভ্যতা। ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া সভ্যতা আজ ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার চিহ্নসকল প্রত্নাগারের শোভাবৃদ্ধি করছে মাত্র। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা অবিচ্ছিন্নধারায় স্মরণাতীতকাল থেকে প্রবাহিত। সেই ধারা কখনও প্রবল, কখনও দুর্বল, কখনও তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে জাতির মানস উদ্ভাসিত, জগৎবাসী বিমোহিত, কখনও ভস্মের ক্রমবর্ধমান আস্তরণে সেই অগ্নি প্রায় নির্বাপিত। এই ধারা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে বিধৃত। এই ধারার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একটি শাশ্বত প্রেরণা, একটি নিত্যসত্য ভাবাদর্শ। এই আদর্শের প্রেরণা এতই গভীর ও ব্যাপক যে, একে অবলম্বন করে ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে তাদের জীবনসমস্যার সমাধান করেছে, অপর সভ্যতার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও নিজের অস্তিত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসহকারে রক্ষা করেছে, উপরন্তু নবাগত ভাবনা চিন্তাকে প্রয়োজনমতো আত্মসাৎ করে নিজের মহিমময় ভাবাদর্শকে মাথায় করে রেখেছে, আবার সময় সুযোগমতো নিজের উন্নত ভাবধারায় আলোকিত করেছে অন্যান্য সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চগুলিকে এবং অকাতরে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। "ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই

গিয়াছিল, সেখানে ধ্বংস করিতে যায় নাই, গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে। বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদানকারী বর্ষাবারির মত আসিয়াছিল।”[৬] আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষের যে জাতিগত ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ভারতবর্ষকে বিশিষ্টতা দান করেছে সেটির প্রকৃতি ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং সচেতনভাবে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে। পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়কেতন উড়িয়ে স্বদেশে ফিরেই স্বামীজী দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন তাঁর কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায়ঃ

"...in the first place, we must try to keep our historically acquired character as a people". এই ইতিহাস-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করলেই জাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি শতধারায় বিকশিত হয়ে জাতির উদ্দেশ্যসাধন সহজ করে তুলবে। ভারতীয় ভাবাদর্শ অনুযায়ী স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেনঃ "...আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়।...আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মতো উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে।”[৭]

পৃথিবীর জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য ও সর্বসাধারণত্ব যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় প্রত্যেকটি প্রাচীন জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেকটি জাতির জীবনধারায় রয়েছে কিছু অনন্যস্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে জাতির সাধ্য ও সাধনার স্ফূর্তি সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট। জাতির অন্তর্জীবনের উৎসমূলে অধিষ্ঠিত গভীর ও ব্যাপক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জাতি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে ও জাতির গতিশীল বিকাশ-অভীপ্সাকে চরিতার্থ করে প্রাণদ বলদ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। জাতির এই কৃতির বা সৃজনমূলক প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটে জাতির সংস্কৃতিতে।

একটি জাতির সংস্কৃতি বলতে বোঝায় তার কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধ্যানধারণা। অনেকে মনে করেন আচার-অনুষ্ঠান শালীনতা-শিষ্টাচার এবং সে সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা, নীতি-নিয়ম সংস্কৃতির অন্তর্গত। সামগ্রিক দৃষ্টিতে জাতির অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির উৎকর্ষ সংস্কৃতির অন্তর্গত। জাতির চর্চা ও চর্যার মূলে থাকে একগুচ্ছ ভাব, জনসাধারণের আচারে ব্যবহারে কর্মনীতিতে থাকে একটি সাধারণ ঐক্য। স্বভাবতই প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির ঐতিহ্যগত ভাবাদর্শ তার অন্তর্গত সকল মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে ব্যক্তি মানুষকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেনঃ "মানুষের প্রধান সম্পদ তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্যের জন্য চাই ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্য। ...রাষ্ট্রীয় জীবনে কিন্তু সংহতিই বড়ো কথা. ব্যক্তিত্ব সেখানে অনেক সময় বৃথা বাধা মাত্র। অথচ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।" [৮] কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় ব্যক্তির গভীর অভীপ্সা ও ব্যাপক সাফল্য ব্যক্তির ক্ষুদ্রতার বন্ধন অতিক্রম করে গোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসস্রোতে আত্মসমর্পণ করে। ম্যালিনস্কি লিখেছেনঃ

"Culture, the cumulative creation of man, extends the range of individual efficiency and of power of action ; and it gives a depth of thought and breadth of vision undreamed of in any animal species. The source of all this consists in the cumulative character of individual achievements and in the power to share in common work. Culture thus transforms individuals into organized groups and gives these an almost indefinite continuity." [৯]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে দেখা যায় ভারতবর্ষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের অভীপ্সার মধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করেও ইতিহাসের কোন নিগূঢ় নিয়মে নিজস্ব ভাবধারা আশ্রয় করেই তার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

যেমন ব্যক্তির জীবনের তেমনি প্রত্যেকটি জাতির জীবনের রয়েছে একটি weltans chauung—যেটি তার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর; অন্যান্য সুর সেই প্রধান সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐকতান সৃষ্টি করে। এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই জাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করে, জাতিকে স্বকীয়তা প্রদান করে। এবং এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনপথেই জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ গড়ে ওঠে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে কি না? উত্তরে বলা যায়, সংস্কৃতি একটি সজীব ভাব, গতিশীল তার প্রকৃতি। কিন্তু প্রত্যেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির সংস্কৃতির আন্তর ভাবসম্পদটি সনাতন শাশ্বত, তার পরিবর্তন ঘটে না। মূল ভাবধারাকে আশ্রয় করে বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে জাতির সংস্কৃতির বাহ্য রূপান্তর ঘটে মাত্র। সুপ্রাচীন প্রত্যেকটি জাতির বর্তমান বা ভবিষ্যতের সংস্কৃতি তার প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্তন মাত্র নয়, তার ঘটে রূপান্তর। সেই রূপান্তরে

প্রতিবেশ ও পরিবেশের চাহিদা মেটাতে বাহ্য পরিবর্তন মাত্র ঘটে, জাতির চরিত্রের মৌলিকতার পরিবর্তন ঘটে না। "জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানসিক সম্পদ এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঘাত-প্রতিঘাতে"[১০] সংস্কৃতির রূপান্তর যুগে যুগে ঘটলেও এই সকল রূপান্তরের মধ্যে ফল্গুনদীর মতো প্রবহমান জাতির প্রাণধারা জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকে অটুট রাখে। স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে লিখেছেনঃ "এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। ...আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন ক'রে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্যে দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ ক'রে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।"[১১]

পশু থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে মানুষ। আবার মানুষের বিকাশেরও বিভিন্ন পর্যায়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তি। মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা অসীম। প্রাচীন ভারতের ঋষিও ঘোষণা করেছিলেনঃ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" ভারতের ঋষি আবিষ্কার করেছেন আঁধারের পশ্চাতে জ্যোতি, জড়ের পশ্চাতে চৈতন্য, রূপের পশ্চাতে অরূপ-সত্তা। বোধে বোধ করেছেন জীবাত্মার মধ্যে বিশ্বাত্মাকে। আত্মার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব অবগত হয়েই ভারতীয় ঋষি যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজকে বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ক্রমবিকাশবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেনঃ "In the light of our present knowledge, man's most comprehensive aim is seen not as mere survival, not as numerical increase, not as increased complexity of organization or increased control over his environment, but as greater fulfilment—the fuller realization of more possibilities by the human species collectively and more of its component members individually."[১২]

ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের "greater fulfilment"-এর জন্য ভারতবাসী অবলম্বন করেছে তাঁর আন্তরশক্তি ও অধ্যাত্মবিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা আশ্রয় করেই মানুষ মৃত্যুকে পর্যন্ত জয় করে অভয় হয়, অমৃতস্বরূপ হয়। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"[১৩]এই প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধিই ভারতবাসীর ভাবানুভূতির আশ্রয়, এই তত্ত্বোপলব্ধির ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই তত্ত্বোপলব্ধিই ভারতাত্মার মৌলশক্তি। ভারতবর্ষ তার সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধিভিত্তিক সত্যকেই আশ্রয় করে আছে। সত্য সনাতন, তার পতন-অভ্যুদয় নেই, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, সেই সত্যই জাতির জীবনরথের পথ। এই পথে যাতায়াত করেই ভারতবাসী অর্জন করেছে অনন্যস্বতন্ত্র স্বকীয়তা, সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছেছে জাতীয় উদ্দেশ্যের শীর্ষে। এই জাতীয় উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে ভারতীয় সমাজ সময়োপযোগীভাবে বিন্যস্ত করেছে ভারতবাসীর মূল্য-বোধ, বিচারবোধ, নীতি ও সংস্কারবোধ। এই পরিবর্তনের অন্তরালে ভারত-বাসী প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে সামাজিক রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা জীবন-উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী করে গড়ে তুলছে। ফরাসী ও ইংরেজের সঙ্গে তুলনা করে স্বামীজী লিখেছেনঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। ...ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। ...হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বলো, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ।"[১৪]

স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসমূল নির্ণয় করেছেন; ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতার মূল্যায়ন করে বলেছেনঃ "আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্ন-দান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার...।"[১৫]* এখানে ধর্ম

কি? মানুষ স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববান। এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য মানুষ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করে চলেছে। এই স্বরূপ উপলব্ধিই মুক্তি, এই মুক্তিই মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই মানুষের মধ্যে দেখা যায় একটি সর্বজনীন বুভুক্ষা। মানুষের স্বরূপ-বিকাশের আয়াসপ্রয়াসই ধর্মের অন্তর্গত। "Religion is the manifestation of the divinity already in man"—সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য আত্মাতেই ঈশ্বরোপ-লব্ধি। যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে আত্মানুভূতি। আত্মানুভূতিই অমৃতত্ব। স্বামীজীর নিজের জীবন ও বাণীর মর্মমূলে অপরোক্ষানুভূতি, সদাজাগ্রত অধ্যাত্মদৃষ্টি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভারতীয় শোণিতে প্রবহমান ধর্মপ্রবণতা—ভববন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ভারতীয় জীবনের লক্ষ্যবিন্দু অপরোক্ষানুভূতিভিত্তিক মোক্ষ।

আবার ধর্ম শব্দটি মীমাংসকদের মতে ব্যবহার করে স্বামীজী দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে মোক্ষেচ্ছালাভের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের। এখানে ধর্ম হচ্ছেঃ "যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল।...অতএব মুক্ত হ'তে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হ'লে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।"[১৬] ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে ধর্ম ও মোক্ষের একটি সামঞ্জস্যবিধান করেছিল। সে কারণে ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনককে দেখা গিয়েছিল। বৌদ্ধমতের প্রাধান্যের ফলে ধর্মের অনাদর ও মোক্ষের প্রাবল্য সমাজকে ক্রমে পঙ্গু করে ফেলেছিল। প্রকৃত ভারতীয় আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী অধিকাংশের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেনঃ

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।"[১৭] ভারতীয় শাস্ত্রানুযায়ী নির্দেশ দিয়েছেন বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক জাতিধর্ম বা স্বধর্মই ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের পথ—মুক্তির সোপান। জাতিধর্ম উচ্ছন্নে গিয়েছিল বলেই জাতির অধঃপতন ঘটেছিল। জাতিধর্মকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নয়, ধর্মকীর্তনের আফিম ভারতবাসীকে মোহগ্রস্ত করেনি। প্রকৃত ধর্মের অভাবই ভারতবাসীর দুঃখের কারণ। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে দুর্বল করতে পারে না। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, পরোপকারই ধর্ম, অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, স্বাধীনতাই ধর্ম, ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, ঈশ্বর ও আত্মাতে অভেদদর্শনই ধর্ম। ভারতীয় পরা ও অপরা সকল বিদ্যার উৎস এই ধর্মচেতনা। ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প-কলার প্রেরণার মূলে এই ধর্মভাবনা। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-উৎস এই ধর্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে স্বামীজী ঘুমন্তপ্রায় জাতির মর্মমূলে শিহরণ তুলে-ছিলেন, মোহগ্রস্ত দেশবাসীর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন, ভারতীয় জনমানসে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামীজীর প্রধান একটি অবদান হচ্ছেঃ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-উৎস স্বরূপের আবিষ্কার এবং তার বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা। ভারতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত ধর্ম। সেই ধর্মের ভিত্তি সর্বানুস্যূত আত্মোপলব্ধি। ভারতের ঋষি বলছেনঃ তুমি জগৎসংসার থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র নও, তুমি ভূমা, বিশ্বসংসারের যাবতীয় দৃশ্যবস্তু তোমার সত্তায় সত্তাবান। এই সর্বাত্মীয়তার বোধে মানুষের মধ্যে যে অনন্ত আত্মশক্তির প্রবোধন ঘটে, সেই প্রবোধনের অমৃতালোকে মরমানুষ মরজগতেই অমরত্ব অনন্তত্ব অনুভব করে। এই সত্যের উপলব্ধি ভারতবাসীর জীবনে একটি মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিতে এনেছে চিরসজীবতা ও অমোঘতা, দিয়েছে একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। এই সর্বাবগাহী ধর্মানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মার প্রাণসত্তা, এই অনুভূতিই যুগে যুগে ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করেছে, সময়ে সময়ে এই অনুভূতি-ভিত্তিক ভাবধারা উৎসারিত হয়ে মানবসভ্যতাকে রসসিক্ত করেছে।

ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে গ্লানি সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়েছে তার কারণ প্রকৃত ধর্মের অভাব, ধর্মের যথাযথ প্রয়োগের অভাব। সেই অভাব

দূর করার জন্য স্বামীজী উপস্থাপিত করেছেন সর্বাবগাহী বেদান্ত ধর্ম। ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সম্পদ "বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী--একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহ-অবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।"[১৮] এই সর্বভাবগ্রাসী ধর্মমতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে এগিয়ে চলে। নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত যাবতীয় সাধনার উদ্দেশ্য নিখিল বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ বিচিত্র প্রয়াস।

এই ধর্ম মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই বনের বেদান্তকে স্বামীজী ঘরে ঘরে এনে দিলেন। সুস্পষ্টভাবে দেখালেন যে, এই ধর্মানুসারী জীবন ভারতবাসীর প্রকৃত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন। এই ধর্মভাবসম্পৃক্ত জীবনের মধ্যেই ভারতবাসীর যাবতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার পূরণ সম্ভব। প্রকৃত-পক্ষে ভারতবাসীর ধ্যানে-জ্ঞানে মননে-প্রাণনে কর্মে সাধনায় অনুরণিত হচ্ছে এই ধর্মমত। স্বামীজীর প্রচলিত বেদান্তধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেনঃ "বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক--এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ। এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার নিকটে পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়।"[১৯] ভারতীয় বেদান্তের এই অসীম সর্বাবগাহিত্ব মানবপ্রগতির

সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছে এবং সেই দ্বার দিয়ে দেশবিদেশের নতুন নতুন কল্যাণকারী সকল ভাবসমূহকে সাদরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

এই সর্ববিস্তারী ধর্মকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; ...ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের-সমস্ত-জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"[২০] এই ধর্মের ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত। এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করেই ভারতবাসীর বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ নিয়মিত হচ্ছে। আশাআকাঙ্ক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতীয় জীবনসাধনার শীর্ষস্থানে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে সিদ্ধি। ভারতের মনীষা আবিষ্কার করেছে সর্বানুস্যূত আত্মোপলব্ধি। মানুষ বিশ্ব-সংসার থেকে ভিন্ন একটা ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র, এই বুদ্ধিই তো যত ভয় ও দুঃখের মূল। এই বুদ্ধি মিথ্যা বুদ্ধি, এই মিথ্যা বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। প্রকৃত-পক্ষে একটি মাত্র সত্তাই আছে, যে সত্তার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিভেদ একটা ভ্রান্তিমাত্র। সর্বানুস্যূত উপলব্ধির অমৃতালোকে ক্ষুদ্র সীমিত মরমানুষ এই মরজগতেই অমর সত্তা ও ভূমানন্দ আস্বাদন করতে পারে।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও অনুভূতিতে পরিস্ফুট হয়েছিল একটি মহান সত্য—সর্ববস্তুতে দ্বৈতরহিত ঐক্যোপলব্ধি-ভিত্তিক অদ্বৈতদর্শনের বিকাশের পথে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত তিনটি পর্যায় বা ক্রমিক স্তরমাত্র এবং এই বিকাশের চরম লক্ষ্য অদ্বৈত। স্বামীজী প্রাচীন আচার্যদের মতো হিন্দুদের সর্বোচ্চ শাস্ত্র শ্রুতিকে কোন বিশেষ মত-বাদের সমর্থনের জন্য ব্যাখ্যা করেননি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার গণ্ডি ভেঙে তিনি দেখিয়েছেন যে, অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ তিনটি সোপান বা স্তরমাত্র। এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতের পরিপোষক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সুসামঞ্জস্য দেখিয়ে স্বামীজী হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের এক মহাসমন্বয় করেছেন।

ব্যক্তিমানুষের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করছে পরমসত্য সম্বন্ধে তার পরিজ্ঞান ও উপলব্ধি। এই আপেক্ষিকতা না মানলেই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতপার্থক্য উপস্থিত হয়। অপরপক্ষে ধর্মদর্শনে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি মেনে নিয়ে স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে সম্মিলিত ও

বিদ্বেষশূন্য এক মহাজাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সর্বাবয়ব বেদান্তের আলোকে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতির মহামিলনের ইঙ্গিত করেছিলেন।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর আর একটি বৃহৎ অবদান, ভারতীয় জীবনে ধর্মবিজ্ঞানের ন্যায় নীতিবিজ্ঞানেরও একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমি আবিষ্কার। বিশালবুদ্ধি রামমোহন পর্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে ধর্মবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট নীতি-বিজ্ঞানের জন্য New Testament-এর আশ্রয় খুঁজেছিলেন। সার্বিক সংস্কারে প্রযুক্ত রামমোহনের প্রতিভা এক্ষেত্রে বিফল হয়েছিল, সন্দেহ নেই। শুধু তিনি নয় অনেক সংস্কারকই ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করে স্বামীজী বলেছেনঃ "সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাহাদের একজনও সকল ধর্মের প্রসূতিকে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি।" তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট স্বীকৃতির অন্যতম প্রকাশ, নীতিবিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আলোকে তিনি অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যেই নীতিবিজ্ঞানের মূলকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় বলেনঃ "দর্শন বা নীতির প্রমাণের এইমাত্র কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না; কোন মানুষের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া তাঁহারা দেখিতে চাহেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে—আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন—সেই সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি...।" এইভাবে অদ্বৈততত্ত্বের উপর নীতিবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার ফলে নীতিবিজ্ঞান শুধুমাত্র যে বিতর্কাতীত দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েছিল তাই নয়, ঐতিহ্যবাহী ভাবধারা-অনুসারী হওয়াতে ভারতবাসীর জীবনের বিভিন্নপাদে তা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। লাহোরে 'বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, একমাত্র অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি বলেছিলেনঃ "প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব?...অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে,...অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব

অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও।...অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না।" এভাবে ভারতগৌরব অদ্বৈতবেদান্ত সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করে স্বামীজী অদ্বৈততত্ত্বকে নীতিবিজ্ঞানের একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই ভারতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতবাসীর নৈতিক জীবন দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ✓

ধর্মের ভিত্তি অপরোক্ষানুভূতি। আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য মানবের অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার ক্রমবিকাশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ ভগবৎসত্তা, তার বিকাশই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্মের মূল তত্ত্ব অধ্যাত্মবাদের পাদপীঠে সকল ধর্ম মিলতে পারে। এখানে যাবতীয় সঙ্ঘবন্ধ ধর্ম ও ব্যক্তিগত অনুসৃত ধর্মাভীপ্সার মিলনে কোন বাধা নেই। আত্মবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ধর্মের সর্বজনীনতা বা সার্বভৌমত্বের বীজ আত্মানুভূতি। সেখানে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, অনুদারতার স্থান নেই। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই "যত মত তত পথ," সব ধর্মই সত্য। এই সত্যকে কথায় ভাবনায় সীমাবন্ধ রাখলে চলবে না। পরমতসহিষ্ণু হলেই চলবে না, নিঃসঙ্কোচে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে হবে পরধর্মসেবীদের। বিবাদ-বিসংবাদ, পরমতে অসহিষ্ণুতা ধর্মবিরোধী। বিশ্বসম্মেলনে ধর্মসেবীদের আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন নতুন যুগের আদর্শঃ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" ধর্মীয় ঐক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে তিনি দেশবাসী ও জগৎবাসীকে সচেতন করে তুলেছিলেন, সেই সঙ্গে ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে নতুন মানবসমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। এই নতুন মানবসমাজের আদর্শ হবে "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ, বিবেকানন্দ-জীবনে পুনঃপরীক্ষিত এই ধর্মসমন্বয় বিভিন্নধর্মের একত্রীকরণ নয় বা বিভিন্ন ধর্মমতের অংশ বিশেষের চয়ন নয়। এই সমন্বয় প্রত্যেক মানুষকে স্বধর্ম আন্তরিকভাবে পালন করতে প্রেরণা যোগায়, পরধর্মকে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সব জাতি সব ধর্ম এক অখন্ড ঐক্যসূত্রে স্বামী বিবেকানন্দে [illegible] তনালোকে বিধৃত হয়েছিল, সেই কারণে ধর্মজগতে তাঁর [illegible] 'দান [illegible] সমন্বয়ের' বাণী এত জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে জগৎবাসীকে আকৃষ্ট [illegible] ছিল এবং বর্তমানেও সকলকে ঐক্যসাধনের পথে অনুপ্রাণিত করছে।

ধর্মের মৌলিক সাধনপ্রণালীগুলি জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম—এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। মনস্তাত্ত্বিক স্বামীজী দেখলেন যে পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের মধ্যে বিচার, হৃদয়বত্তা, আপনার যাবতীয় শক্তি সংহত করে নিষ্ক্রিয়

অবস্থানের ক্ষমতা ও পরোপচিকীর্ষার প্রেরণায় কর্ম—সব কিছুই বিদ্যমান। পরিপূর্ণ মানব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এই চারটি ভাবাদর্শের সার্থক সম্মেলন ও সমন্বয়। ধর্মবিজ্ঞানভিত্তিক যে নতুন মানব-সমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তার জন্য আদর্শ মানুষ হবে জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম-সাধন সম্ভূত সমন্বিত ব্যক্তি। মানবকে দেবত্বে উন্নীত করার এই পরিকল্পনা যেমন মহান, তেমনি বর্তমান যুগের প্রয়োজনভিত্তিক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ মানবের এই ভাবাদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী মানবতাবাদকেই মহীয়ান করে তুলেছেন, সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর আর একটি অবদান, কারও কারও মতে শ্রেষ্ঠ অবদান, "কর্মে পরিণত বেদান্ত" বা Practical Vedanta। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ ভারতবাসীর জীবনে কালো ছায়া বিস্তার করেছিল, সেই ভেদ দূর করে স্বামীজী উপস্থাপিত করলেন কর্মে পরিণত বেদান্তের বলিষ্ঠ চিন্তাসূত্র। অদ্বৈতবাদের উচ্চ ও মহান সত্য সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী "কর্মে পরিণত বেদান্ত" বিষয়ে লন্ডনে চারটি ভাষণ দিয়ে উপসংহারে শ্রোতাদের উদার আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ "এস আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে, আর প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যবস্তু উপাস্য হইবেন।" ধর্মের নামে প্রচলিত ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার প্রশ্রয়, ভাবের ঘরে চুরি প্রভৃতিকে নির্মম কশাঘাত করে স্বামীজী 'শিবোঽহং' মন্ত্রে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আত্ম-প্রত্যয় জাগরিত করে নরের মধ্যে নারায়ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যদর্শী স্বামীজীর দৃষ্টিতে অদ্বৈততত্ত্বই জগৎবাসীর ভবিষ্যতের আশ্রয়, কর্মে পরিণত অদ্বৈততত্ত্বই মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ করতে সক্ষম। স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "...অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে...কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।"[২১] এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য নিদান দিয়েছিলেন "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয়

দেহ" সূত্র। এভাবে বেদান্তনীতির যথার্থ প্রয়োগ করে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। জীবসত্তা অনাদি অসীম। জীবের প্রতিকূল পরিবেশরূপ কারাবন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, জীবকে আবরণমুক্ত করে অমৃতের অংশীদার ও পূর্ণতার অধিকারী করে তুলতে হবে। জীব তো প্রকৃতপক্ষে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত। যেসব আবরণ বা বাধা পূর্ণস্বরূপকে সঙ্কুচিত করে দেখাচ্ছে, সেই আবরণ বা বাধা দূর করার সহজ উপায় স্বামীজী প্রদর্শিত কর্মে পরিণত বেদান্ত। এখানে বেদান্ত বলতে মনে রাখতে হবে স্বামীজীর বাণীঃ

"The word Vedanta must cover the whole ground of Indian religious life."

জাতির জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত বেদান্তকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের মহিমময় ভারতকে গঠন করবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেনঃ

"Each nation has a main current in life ; in India it is religion. Make it strong and the waters on either side must move along with it."[২২]

ভাবের জগতে স্বামীজীর আর একটি অবদান পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ বা **Humanism**-কে ভারতীয় ভাবরসে অঙ্গীকৃত করে নতুন ও গভীর তাৎপর্য দান। একসময়ে কৈবল্যমুক্তির জন্য লালায়িত ও পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত স্বামী বিবেকানন্দ আর্ত, পীড়িত, দীন, দরিদ্র মানুষকে যেমন ভালবেসেছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ বাসেননি। অজ্ঞান-বাধিত পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা। অসীম তাঁর ভালবাসার যদিও বা পরিমাপ করা যায়, অবহেলিত লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ ভালবাসার হিসাব করা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র তাঁর মানবপ্রেম।* সর্বভূতে একাত্মার অনুভূতিতে প্রদীপ্ত তাঁর মানবপ্রেম। সেই কারণে বিশাল-হৃদয় স্বামী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেনঃ

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই খাঁটি মানবপ্রেম মানবতাবাদের মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা

দান করেছে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তাশীল মোহিতলাল লিখেছেনঃ "...হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এ যুগের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান,—Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। ...ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিস্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব।"[২৩] এই তত্ত্ব অতি পুরাতন হলেও আমাদের বোধগম্যভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীমন্ত্রে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল জ্ঞান ও পৌরুষের সমন্বিত আধার স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। পুরাতন হলেও চিরনবীন এই তত্ত্ব মরজগৎ ও অমরলোকের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়েছে, লোকায়ত ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। এই সমন্বয়ে উৎসারিত হয়েছে মহান এক শক্তি, উদ্ভাসিত হয়েছে নবযুগের দিগন্ত। মানুষকে 'মানহুঁশ' হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই আহ্বানে সুর মিলিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ

"Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel." নিপীড়িত নরের মধ্যে নারায়ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নরনারায়ণের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন যুগঋষি স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অর্থ, মানবের অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার ক্রমবিকাশ। সেই বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করে নরজীবনেই পূর্ণতা আনতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, পথনির্দেশ করেছিলেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ নরঋষি।

ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে দেশমাতৃকার বরেণ্য সেবক স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ মাতৃভূমি, একটি ভৌগোলিক সত্তামাত্র নয়। তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃভূমি বিরাটের মূর্তি, যে মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে বৈদিক ঋষির ভাবানুভূতিঃ "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।" অধ্যাত্ম-অনুভূতির ভিত্তিতেই স্বামীজীর দেশপ্রীতি। এই বিশুদ্ধ দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ স্বামীজী গর্বিত সন্তানের মতো বলতেনঃ "দর্শন ধর্ম বা নীতি-বিজ্ঞানই বলুন অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এ-সব কিছুরই প্রসূতি। ...এখনও ভারত এই-সকল বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"[২৪]

হীনম্মন্যতার কালো মেঘের আড়ালে দীর্ঘকাল পরাধীন ভারতবর্ষ ধুঁকছিল, সেইসময় শৌর্যবীর্যের স্ফুরিত আধার বীর সন্ন্যাসী জাতিকে দিয়েছিলেন মোহমোচনের মন্ত্র,—ভারতবর্ষের জীয়নকাঠি ঔপনিষদিক অধ্যাত্ম-বোধ। হিন্দুধর্ম জড়তা ত্যাগ করে, নবপ্রাণতরঙ্গে প্রাণবন্ত বলশালী হয়ে ওঠে। ধর্মই ছিল ভারতবাসীর ভাবানুভূতির আশ্রয়। ধর্মকেন্দ্রিক চিত্তোত্থানে জাতীয় জীবনে উপস্থিত হয় সর্বপ্রথম ব্যাপক সর্বভারতীয় জাগরণ। ধর্ম-ভিত্তিক এই জাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য জাতির শিরায় উপশিরায় সঞ্চালিত হয়। জাতির সামাজিক জীবনে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায়, বাণিজ্যিক প্রয়াসে সর্বদিকে যে বৈদ্যুতিক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার ব্যাপকতা ও তাৎপর্য সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।[২৫] "ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ" এই মন্ত্রের উদ্গাতা ধর্মনিষ্ঠ নির্ভীক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক শক্তির বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ। বহু জাতি ও ধর্মের মিলনভূমি ভারততীর্থের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে স্বামীজী ভারতের জাতিগঠনের নিজস্ব উপায় নির্দেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখেছেনঃ "...ত্যাগ ও চরমসত্যের অপরোক্ষজ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তারূপ সুমহান সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত।"[২৬] জাতীয় ঐক্যের নীতি ঘোষণা করে স্বামীজী বলেছিলেনঃ

"A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune." উদার ও গভীর এইরূপ অধ্যাত্মচেতনার ঐক্য-ভূমিতে স্বামীজী রোপণ করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধবৃক্ষ। স্বামীজীর এই প্রয়াসের ফলে সহজেই স্বাভাবিক জাতীয়তাবোধ স্ফুরিত হয়েছিল, জাতির পুনরুত্থান সহজসাধ্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বামীজীর অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেনঃ

"Vivekananda vitalised the nationalism of India by putting it

on a spiritual level and making it a clarion call of the Hindus to realise the value of their spiritual heritage. . . ."[২৭]

আধ্যাত্মিকতা-নিষ্কাত জাতীয়তাবোধ ভারতবাসীকে কিরূপ উদ্বুদ্ধ করেছিল তার প্রমাণসস্বরূপ তিনটি উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ "ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন......বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা।" নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র লিখেছেনঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব-ধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।" জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানের প্রতি ঋণ স্বীকার করে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই লিখেছিলেনঃ

"Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We therefore owe everything to Swami Vivekananda."

ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধের স্ফুরণ ভারত-ইতিহাসে স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল। ইতিহাসবিদ্ স্বামীজী "ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে লিখেছিলেনঃ "ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে।"[২৮] রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনায় যে মহান আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবোধন ঘটেছিল তারই অন্যতম ফলশ্রুতি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। স্বামীজী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও ভারতীয় যুবকদের দিয়েছিলেন স্বাদেশিকতা ও আত্মত্যাগের অতুলনীয় অনুপ্রেরণা। এই বীর্যবান বলপ্রদ প্রেরণা দেশ-সেবীদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে মহান জাতীয়তাবোধকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।* মহাশক্তিধর স্বামীজীর ভাবসঞ্চারের সুদূরপ্রসারী ফল আলোচনা করে ঐতিহাসিক পানিক্কর লিখেছেনঃ

"What gave Indian nationalism its dynamism and ultimately enabled it to weld at least the major part of India into one state was the creation of a sense of community among the Hindus to which the credit should to a very large extent go to Swami Vivekananda. This new Sankaracharya may well be claimed to be a unifier of Hindu ideology. Travelling all over India he not only aroused a sense of Hindu feeling but taught the doctrine of a universal Vedanta as the background of the new Hindu reformation."[২৯] ভারতের জাতীয় নবোন্মেষের জনয়িত্রী যে আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতি তার প্রেরণাস্থল ছিলেন স্বামীজী। এবং তাঁর হাতিয়ার ছিল সর্বাবয়ব বেদান্ত বা জীবব্রহ্মবাদ।

ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর জীবনে একদিকে শাস্ত্রশাসিত্বং, প্রচলিত রীতিনীতি ও দীর্ঘকালের সংস্কারের প্রবল টান, অপরদিকে সংস্কারকগণের নিছক যুক্তি ও বিচারের আঘাতে অবসন্ন ভারতের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আশাআকাঙ্ক্ষা,—এদের টানাপোড়েনে ভারতীয় জীবন যখন পর্যুদস্ত, হীনপ্রভ ও অনেকাংশে বিপন্ন, সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রতিভার বলে জাতীয় জীবনের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল। ভারতবাসী স্বস্থ হয়েছিল, জাতীয় জীবনের চিরন্তন উৎস শাশ্বত অমর ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিল; ভারতবর্ষের মধ্যে স্বদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিষয়ে স্বামীজীর অবদানঃ

"...the clarification in a new and exciting way of the role of the Indian tradition as a source for a vigorous patriotism. He caught up many ideas that were abroad in nineteenth century Indian thought, and transmuted them into a powerful force that has enriched modern Indian nationalism."[৩০]

স্বামীজীর নেতৃত্বে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের চিন্তা পুনর্জাগ্রত, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ও আধুনিকতা প্রাপ্ত হয়ে "নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ" সৃষ্টি করেছিল। নবজাগরণের প্রবোধনকারী জাতীয়তাবাদ স্বামীজীর নেতৃত্বে দাঁড়িয়েছিল চারটি স্তম্ভের উপরঃ (১) ভারতের অগণিত জনগণ, এরাই ভারতবর্ষের আশাভরসা। জনগণই জাতীয় সৌধের ভিত্তি। (২) দৈহিক ও নৈতিক শক্তির উদ্বোধন, (৩) সাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির ভিত্তিতে ঐক্য এবং (৪) প্রাচীন ভারতের গৌরব ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও সর্ববোধ।[৩১] এই চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ জাতির অবিসংবাদিত নেতারূপে গৃহীত হন, কারণ তাঁর হৃৎপিণ্ডে স্পন্দিত হয়েছিল ভারতভারতীর অমর বাণী, তাঁর মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল সমগ্র জাতির পক্ষে চিন্তা, তাঁর চিন্তা ও কর্মে প্রকাশিত হয়েছিল সমগ্র জাতির ভাবানুভূতি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ ভারতবর্ষের অবনতির পূর্বোক্ত অন্যান্য কারণ ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল—অপর জাতির সঙ্গে মেলামেশা লেনদেন বন্ধ করা, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারা, নারীজাতিকে পদদলিত করা, দরিদ্রগণকে নিষ্পেষিত করা এবং দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করা। জাতির দীর্ঘকালের পাপস্খালনের জন্য "ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবা-ব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।"[৩২] এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম সার্থক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা। এই জাতীয়তাবাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে অতীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেনঃ

"Vivekananda did not die in 1902. He lived till 1946. His ideas, his *sadhana* flowed in different channels to enrich and vitalise the nation and enabled it to win the first round. With Gandhi and Bose closes the epoch which he had opened. A new chapter has begun. The future will show whether his soul has

died or it will reincarnate to spiritualise the nation and to guide it to the conquest of mankind."৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের স্বজাতির প্রতি নিবিড় অনুভূতি ও আগ্রাসী জাতীয়তাবোধ কিন্তু কোন সময়েই মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলাদর্শের পরিপন্থী হয়নি। দেশের জন্য "সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা" বিশ্বমৈত্রীর ভাবনার বিরোধী হয়নি। অদ্বৈততত্ত্ব-ভিত্তিক তাঁর স্বদেশপ্রেম তাঁর বিশ্বপ্রেমের পরিপূরক। প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর মহান আদর্শের সমন্বয় করেছিলেন। অধ্যাত্মচেতনার পাদপীঠে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় করেছিলেন। সমন্বয়ান্বেষী স্বামী বিবেকানন্দ উদারদৃষ্টিতে আহ্বান করে লিখেছিলেনঃ

"Instead of antagonizing, therefore, we must help all such interchange of ideas between different races, by sending teachers to each other, so as to educate humanity in all the various religions of the world ; but we must insist, ...not to abuse others, nor to try to make a living out of others' faults ; but to help, to sympathize with, and to enlighten all." ৩৪ বিশ্বমনা স্বামীজী বিশ্ববাসীর আত্যন্তিক কল্যাণকে নিজের জীবনব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বকল্যাণ ছিল তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য।

বর্তমানে রাজনীতি বা সমাজনীতিতে যে সাম্যবাদ প্রচলিত, তার লক্ষ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তির সমান অধিকার। বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে পূর্ণতা। মানুষমাত্রেই পূর্ণতার প্রতীক, অমৃতের অধিকারী। সমাজজীবনে আমরা যেখানেই কোন বিশেষ অধিকারের দাবিকে স্বীকার করি সেখানেই আমরা মানুষ ও মানুষের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ মেনে নিই। এই বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর কর্মে পরিণত বেদান্তের বিদ্রোহ। অদ্বৈতবাদের গভীরতম ও মহত্তম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর সাম্যবাদ। স্বামীজী ঘোষণা করলেনঃ

"None can be Vedantists, and at the same time admit of privilege to anyone, either mental, physical, or spiritual ; absolutely no privilege for anyone. The same power is in every man, the one manifesting more, the other less ; the same potentiality is in

everyone. Where is the claim to privilege?"৩৫ ধর্মানুভূতির সমত্ববোধ থেকে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী আমাদের সর্বজীবে সমদর্শী হতে শিখিয়েছেন। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত করেছেন।

সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টি কখনই কুহেলি-আচ্ছন্ন ছিল না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম মানবতার মহিমা তারস্বরে ঘোষণা করছে, আবার এই হিন্দুধর্মই নিম্ন ও দরিদ্রশ্রেণীকে এমনভাবে পদদলিত করছে যার তুলনা বিরল। দীন, দরিদ্র, দুর্বল জনসাধারণকে উপেক্ষা ও অবহেলাকে তিনি "জাতীয় পাপ" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং এই পাপস্খালনের জন্য তিনি সমস্যার মূলদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ভারতের নিজস্ব জাতীয়পথে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতির বিধান করতে হবে। সংস্কারের চাইতে স্বাভাবিক বিকাশের উপর জোর দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ। স্বামীজী সংস্কারকদের আহ্বান করে বলেছিলেনঃ "তাহাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা নষ্ট না করিয়া তুমি কি তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্বের উদ্ধারসাধন করিতে পার? তুমি কি সমতা, মুক্তি ও কর্মশক্তির দিক দিয়া সমভাবে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াও যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সহজাত প্রকৃতির দিক দিয়া হিন্দু হইতে পার? এইরূপই করিতে হইবে এবং আমরা তাহাই করিব।" "চলমান শ্মশান" বলে ঘৃণিত লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষকে স্বামীজী আমার রক্ত, আমার ভাই বলে সাদরে ও অপার সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, সেই সঙ্গে শিক্ষারূপ উপকরণ দিয়ে নরের মধ্যে নারায়ণের পূজা করেছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করে স্বামীজী সাবধান করে দিয়েছিলেন। ধর্মবর্জিত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন আধুনিক শিক্ষার কারখানায় যে লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা দেখা যায়, তাতে মানুষ তৈরী হবে না, গোষ্ঠীজীবনের ভিত সুদৃঢ় হবে না। জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ, সাম্যবুদ্ধি ও ঐক্যবুদ্ধি জাতীয় অভ্যুদয়ের সোপান। জনগণকে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে স্থাপন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

যেমন জনগণের জাগরণ, তেমনি ভারতীয় নারীজাতির উন্নয়ন স্বামীজী পরিকল্পিত ভারতজাগৃতির একটি প্রধান কার্যসূচী। নারীমাত্রেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে "মা জগদম্বার জাত।" দুটো পাখা শক্ত সক্রিয় না হলে পাখী যেমন গন্তব্যস্থলে উড়ে যেতে পারে না, সমাজপাখীর একটি ডানা পুরুষকে সবল বীর্যবান ও অপর ডানা নারীকে দুর্বল হতে দিলে সমাজপাখী প্রগতির পথে

অগ্রসর হতে পারে না। ভারতীয় জীবনযজ্ঞে নারীশক্তির জাগরণ ভিন্ন অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। চিন্তানায়ক স্বামীজীর নারীজাগৃতি সম্বন্ধে মৌলিক একটি দান, তিনি তাঁর নিজস্ব বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছিলেনঃ "নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; ...নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। ...নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবে।" নারীগণকে পূর্ণ মর্যাদায় ও স্বমহিমায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামীজীর এই পরিকল্পনা অভিনবত্বে ও অতুলনীয় সম্ভাবনায় আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল কোলাহলকে ছাপিয়ে এখনও বাস্তববাদী আদর্শরূপে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জনগণ। স্বামীজীর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞায় বিধৃত তত্ত্বঃ "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।"[৩৬] সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হয়েও প্রায়ই নিজেদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রকৃতির নিয়মের বশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে "বসুন্ধরা ভোগ" করে। স্বামীজী তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে শ্রমিকশক্তি কর্মে, শক্তিতে, ঐশ্বর্যে উন্নত হয়ে মানবজীবনের সার্বিক অধিকার আয়ত্ত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[৩৭] জেলে মুচি মেথর চাষাভুষো শ্রমজীবীদের মধ্য থেকেই "নূতন ভারতকে" আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাধর স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার জন্য তিনি শূদ্রজাগরণে শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। বর্ণবৈষম্য সমাধানের জন্য তিনি **levelling up** অর্থাৎ অনগ্রসরকে অগ্রসর করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। উন্নত বা অগ্রসরকে পিছিয়ে দেওয়া প্রগতির বিরোধী মনে করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আদর্শরাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের

উপহার দিয়েছেন। তাঁর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সংস্কৃতি, বৈশ্যযুগের বিতরণ-আকাঙ্ক্ষা ও শূদ্রযুগের সাম্যের সমন্বয় ঘটবে, সেই সঙ্গে উপরোক্ত কোন যুগেরই দোষত্রুটি তাতে থাকবে না। স্বামীজীর চিন্তালোকের রাষ্ট্র হবে মানুষের বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্মপালনের উপায় স্বরূপ।

পশ্চিমে পার্লামেন্ট, সেনেট, ভোট, ব্যালট, মেজরিটি প্রভৃতি রাজনীতির দাপট দেখে স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল যে শক্তিমান পুরুষেরা ইচ্ছামতো সমাজকে পরিচালনা করছে, জনসাধারণ "ভেড়ার দলের" মতো অনুসরণ করছে মাত্র। স্বামীজী বলেছেনঃ "রাজনীতির নামে...চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে।" পাশ্চাত্যের এই রাজনীতি অনুসরণ করে স্বামীজীর আদর্শরাষ্ট্রের রূপায়ণ সম্ভব নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তিনি নিদান দিয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতার নির্যাস, যার সাহায্যে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমাজের সকল নরনারীকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হবে। এই সমাজের চলার পথের পাথেয় হবে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল ভারতাত্মার বাণী তথা স্বামীজীর জীবনের ভাবানুভূতি। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর মহাসমাধির একমাস পরে লিখেছিলেনঃ "ভারতের জাতীয়-জীবনের পরিণতি যেন তাঁহার মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল এবং তিনি এক নূতন জীবনবোধের সূচনা করিয়া ঊনবিংশ শতকের জাগরণকে অনেকাংশে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পাইয়াছিলাম।" স্বামী বিবেকানন্দই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দিশারী।

কেশবচন্দ্রের তুলনায় আঠারোগুণ শক্তির আধার স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবিষ্কার করেছিলেন সেই প্রতিভার দ্যুতি জীবনের বিভিন্ন পাদে বিকীর্ণ হয়ে বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় মুগ্ধ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই লিখেছেনঃ

"...if Narendranath Datta had not been Swami Vivekananda, Bengal might have one more addition to the large number of her good poets of the nineteenth century. The same thing may be said of his historical knowledge, which was both profound and extensive."[৩৮] এই ধরনের অনেক স্তুতির উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

কিন্তু তার সাহায্যে স্বামীজীর বিশাল প্রতিভার বিবিধ ও বিচিত্র অভিব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না।

সংখ্যার পরিমাপে স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনা অতি-অল্প। তৎসত্ত্বেও সেই স্বল্প রচনার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে "সহস্রদল পদ্ম" বিবেকানন্দের প্রতিভা-দীপ্তি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা' ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং প্রসন্ন মনের সহাস্য রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।"[৩৯] সাহিত্যচর্চার সময় তাঁর ছিল না, তাঁর সামান্য যা কিছু রচনা তা প্রয়োজনের তাড়নায়। "ভাববার কথা", "বর্তমান ভারত", 'পরিব্রাজক', "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি রচনার মধ্যে লেখক বিবেকানন্দের মুনশীয়ানা সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর সাধু ও চলিত গদ্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ, তাঁর সাধুগদ্যের রসাস্বাদন করে প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখেছেনঃ "সাধুগদ্যে তিনি অতিমাত্রায় সংহত ও ঋজু। কিন্তু এই ঋজুতার ফলে ভাবপ্রকাশের এমন এক ঘনবদ্ধতা দেখা দিয়েছে যা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য-অনুযায়ী। অথচ সেই সুগভীর বাক্‌সংযমও অনুভূতির আবেগে মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদের মতো অমর কাব্যরচনা করেছে।"[৪০] আর বাংলা ভাষায় চলিতগদ্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান চিরস্মরণীয়। তাঁর চলিত গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য "শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মত।" যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সেই সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতি তাঁর লক্ষ্য। চলিত ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেনঃ "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?......ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"[৪১] স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যের বিষয়-বস্তুও লক্ষণীয়। "সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। চলমান জগৎ ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এই মননধর্ম সজীব ও

গতিময়।"[৪২] কবিতা ভাবলোকের ভাষা। শঙ্করের অদ্বৈতসিদ্ধি ও বুদ্ধের জগদ্ধিতায় আত্মোৎসর্গ, এ দুয়ের মিশ্রণে গঠিত বিবেকানন্দ-চরিত্র। রামকৃষ্ণ-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে এক পরম সত্যেরই সাকার ও নিরাকার উপলব্ধির বৈচিত্র্য তাঁর ভাষায় ও ভাবে ফুটে উঠেছে, আবার সহজভাবে বিশ্বপ্রেমের স্বতঃমাধুর্য স্ফুরিত হয়েছে তাঁর কাব্যপ্রয়াসের মধ্যে। তিনি জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি, তাকে স্বীকার করেছেন; বেদান্তের পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়সেতু স্থাপন করে তিনি তাঁর তথাকথিত কাব্যসাধনার মধ্যে বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে যেভাবে কবিত্বময় করে তুলেছেন, সেই প্রয়াস তাঁর অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ মাত্র। কাব্যসমালোচক স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি তিনভাষাতে লেখা কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছেনঃ "এগুলির মধ্যে আছে সত্য কবিত্বের শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, অভ্রান্ত স্বাক্ষর। নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যতগুলি শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন তার মধ্যে এই কবিত্বও নিশ্চয় একটি। এই কবিপ্রাণ যুবক কবিতা লিখে শুধু শখই মেটান নি, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা তাঁর হৃদয়মনকে হিমশিলার মত গলিয়ে বইয়ে দিয়েছে কবিতায়। দীর্ঘ চর্চার অভাবকে ছাপিয়ে, ভাষা ও ছন্দের অনভ্যস্ততার বাধা এড়িয়ে ভিতরের সেই কাব্য বাইরে মুক্তি পেয়েছে। মৌলিকতা তাই ছন্দে বা ভাষাসজ্জায় ততটা স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও তা আছে বিবেকানন্দের অনন্য মন ও প্রেরণার সবল স্পন্দনে—যা একটু মনোযোগ দিলেই এই কবিতাগুলির মধ্যে চিনে নেওয়া যায়। তিন ভাষাতেই বিবেকানন্দের কবিতা কাব্যরাজ্যে বিশেষ স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা লাভ করেছে।"[৪৩]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে সত্যযুগের প্রবর্তন হয়েছে, তার "প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়।" এই প্রবোধনের প্রাণচ্ছটা সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য সংগীত—সংস্কৃতির আঙিনার সর্বত্র প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে। জাতীয় জাগরণের ধারা অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দ "ভাববার কথা"-তে লিখেছিলেনঃ "জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্পসংগীত আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।" তিনি আবার রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে বলেছিলেনঃ "আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সিদ্ধির যোগসূত্র ধরে স্বামী বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবনে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল যুগ-

জাগরণের প্রাণের প্রাচুর্য, ভাবের মাধুর্য। আধ্যাত্মিকতা-উৎস থেকে উৎসারিত ভারতীয় শিল্পকলা ম্রিয়মাণ হয়ে হীনাবস্থার আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে শিল্পচেতনার ধারা কখনও ক্ষীণ কখনও প্রখর স্রোতে জাতীয় সংস্কৃতির শিরা-উপশিরায় সঞ্চালিত ছিল। কিন্তু সর্বদাই সেই শিল্পপ্রয়াসের আকূতি ছিল জীবন ও জগতের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধিৎসা। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রতিভা সহজেই আবিষ্কার করেছিল ভারতীয় শিল্পসাধনার বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় শিল্পবোধের ভিত্তিভূমি নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্য। ভারতবর্ষ পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রকৃতিকে উত্তরণের পথে অতিক্রম করে একটি মহৎ ভাবপ্রাপ্তিকে করেছে আদর্শ। এই মহৎ ভাবটির স্বরূপ আবিষ্কার করে যুগোপযোগী উপায়ে সেই ভাবটিকে আয়ত্ত করার পথনির্দেশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

শিল্পসাধনায় ভারতবর্ষের অতীত গৌরবময়। স্বামীজী বলেছেনঃ "ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিতকলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীর আদি গুরু।"[৪৪] স্বামীজীর গভীর শিল্পবোধ আবিষ্কার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্মের প্রসার-কালে এদেশে শিল্পসৌন্দর্যের যে বিকাশ ঘটেছিল তার তুলনা নেই।

শিল্পতত্ত্বের বিশ্লেষণে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পভাবনার রূপটি ফুটে উঠেছে তাঁর একটি উক্তিতে। তিনি বলেছেনঃ

"...true Art can be compared to a lily which springs from the ground, takes its nourishment from the ground, is in touch with the ground, and yet is quite high above it. So Art must be in touch with nature—and wherever that touch is gone, Art degenerates—yet it must be above nature."[৪৫]

ভারতীয় শিল্পের গোপন কথা আদর্শের রূপায়ণ, প্রকৃতির অনুকরণ নয়। ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের স্বর্ণযুগে দেখা যায় সব কিছু শিল্পপ্রয়াসের মধ্যে রয়েছে উপরোক্ত ভাবাদর্শের মধুর ব্যঞ্জনা।

ভারতবর্ষের প্রাণসত্তায় ঝঙ্কৃত ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের মূল সুরটিকে উদ্ধার করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ও ভবিষ্যতে তার ভূমিকা নির্দেশ করে স্বামীজী লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনর্বাসন করেছিলেন। ভারতবর্ষে শিল্প মুখ্যত ধর্মকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখানে শিল্প-সাধনাও ধর্মসাধনের অঙ্গ। অধ্যাত্মভাবপুঞ্জকে পরিব্যক্ত ও রূপগ্রাহ্য করার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়েছিল ভারতীয় শিল্প। ভারতীয় শিল্পসাধনা তার এই

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেও, সাধারণ উদ্দেশ্য যে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের সাধন তাতেও কখনই কার্পণ্য করেনি। ভারতীয় শিল্পী জানেন ভারতীয় ঋষির উপলব্ধ সত্য যে ঈশ্বরই "...মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত।"[৪৬] আনন্দাপিপাসু শিল্পীরও উদ্দেশ্য আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের এই বিশ্বকবিতার পাঠ ও রসাস্বাদন করা।

ডাঃ কালিদাস নাগ 'উদ্বোধন' সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ "বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারে না।" ভারতীয় শিল্পের রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। নিবেদিতা হ্যাভেল সাহেবকে ভারতীয় কান্তিবিদ্যা ও শিল্পদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হ্যাভেলের অনুসরণ করেছিলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ। ক্রমে নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথের অপরাপর শিষ্যেরা স্বামীজীর শিল্পভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৪৭] ভবিষ্যতের ভারতীয় শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে স্বামীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন 'art' ও 'utility'-র সামঞ্জস্য ও সমন্বয়।

ভারতাত্মার অধ্যাত্ম জীবনছন্দকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সংগীত। এদেশের সংগীতসাধক বিশ্বাস করেন ললিতকলাসকলের মধ্যে সংগীতের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নেই, "ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরঃ"। ভারতীয় সংগীতের মর্মবাণীর সংগে পরিচিত স্বামীজীর দৃষ্টিতে সংগীত "নিরাবিল আনন্দ, জাগ্রত প্রেরণা ও সাধনপথের সহায়ক।" অসাধারণ প্রতিভাধর স্বামীজী নিজে যেমন ছিলেন সংগীতকুশলী, তেমনি ছিলেন সংগীতের সমঝদার। ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, আমাদের দেশের যথার্থ সংগীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। কোমল ভাবোদ্দীপক কীর্তনকে সাময়িকভাবে বর্জন করে তিনি উচ্চ ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপ্ত ধ্রুপদ-গান অনুমোদন করেছিলেন। ভারতীয় সংগীতে cadence বা মিড় মূর্ছনার প্রশংসা যেমন করেছিলেন harmony-র অভাবহেতু বীররসের স্বল্পতার সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। ভবিষ্যতের ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ হচ্ছে, জাতির ভাবানুভূতি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে 'মিউজিক'-এর 'সায়েন্স' বিকাশ করতে হবে। তবেই সংগীতের কবিত্ব মাধুর্য স্ফুরিত হয়ে ব্যক্তি ও জাতির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হবে।

ভারতসংস্কৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দের দানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে সামান্যই। এর যথার্থ মূল্যায়ন করবেন ভবিষ্যতের চিন্তাবিদ্‌গণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ভারতীয় চেতনা তথা বিশ্বের চিন্তাসরোবরে বিবেকানন্দ-আলোড়ন উত্থিত হয়েছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। তরঙ্গাভিঘাত ভারতসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে অনুপ্রবেশ করে বিস্তার করেছে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেনঃ "এইরূপে জাতীয় চাঞ্চল্যের শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ স্রোতধারা কখনও মিলিত হইয়া, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখনও এক পথে, কখনও বিপরীত পথে, কখনও একটানা স্রোতে, কখনও ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল। ...শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক ও কেন্দ্র হইতে আহৃত ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল।" [৪৮] শুধুমাত্র যোগফল নয়, শতাব্দীর সাধনার সার্থক ফলশ্রুতি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতাত্মার শাশ্বত রূপটি নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছে, তার স্ফুরিত শক্তিতে ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের অন্ধকার-অনড় সংস্কৃতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের মহান ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বৃহত্তর পটভূমিকায় বিবেকানন্দ-আলোড়নকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেনঃ

"I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development." [৪৯]

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মসাধনের আয়াসপ্রয়াসের আকৃতি মিলিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-মানসে, তাঁর চেতনে বিধৃত হয়েছিল বিভিন্ন বিচিত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। সেই কারণে নবযুগাচার্য যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা যেমন ছিল ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, তেমনি হয়েছিল কালোপযোগী ও স্বর্ণসম্ভাবনাপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপরিধি ও তাঁর জীবন-মিশনের পর্যালোচনা করে ভগিনী নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন দুটি সুস্পষ্ট ধারাঃ

"...in the great life that I have seen, I cannot but think that a double purpose is served, —one of world-moving, and another, of nation-making."[৫০]

সর্ব শুভশক্তি ও ভাবনার প্রসূতি ভারতবর্ষকে জগৎসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, ততোধিক আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর পুনরভ্যুদয়ের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থাপিত করেছিলেন নতুন ধরনের জাতীয়তাবোধ। আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক এই জাতীয়তাবোধের লক্ষ্য সার্বিক জাগৃতি। আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির অধিনায়ক স্বামীজী তাঁর লক্ষ্য ঘোষণা করে বলেছিলেনঃ "আমি সেই ভারতকেই আবার দেখিতে চাই, যে-ভারতে প্রাচীন যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল, তাহার সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবে মিলিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর হইতেই হইবে, বাহির হইতে নয়।"[৫১] ভারতাত্মার বাণীমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ যে "নূতন ভারতের" পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই ভারত জগতের যাবতীয় মহৎ ভাবের সমন্বয়-ভূমি। ভারতাত্মা এই নবীনরূপে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রে, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, বিজ্ঞান, সংগীত, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, মহান সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন।

ভারত-জাগৃতির সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত ভারতের বিশ্বজনীন জীবন-লক্ষ্য--মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অত্যাবশ্যক গুরুদায়িত্ব স্থান পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার মধ্যে। ভারতাত্মা বিবেকানন্দ স্বাভাবিক নিয়মেই বিশ্বাত্মার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বুদ্ধিচাতুর্যে উদ্‌ভ্রান্ত, বস্তুতান্ত্রিকতার মদে প্রমত্ত, জাগতিক বৈভবে ক্লিষ্ট পীড়িত পাশ্চাত্যকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি উদার-হস্তে দিয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিকতা। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ "সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূল-মন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সংগীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী।"[৫২] নিঃসন্দেহে স্বামীজীর জাতীয়তাবোধ তাঁর জগদ্ধিতায় ভাবনার পরিপূরক। যেমন ভারতের, তেমনি বা ততোধিক বিশ্বমানবের জন্য সমর্পিত তাঁর জীবন ও সাধনা। এই

অসীম অনন্ত বিশ্বচিন্তার পটভূমিকায় সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে স্থান পাওয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনভূমি উদারতর ব্যাপকতর হয়েছিল, সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অসংখ্য বিচিত্র বিরোধী সংঘাতশীল শক্তিসমূহের সমন্বয় করে মানব-সমাজকে অগ্রসর করিয়ে দেবার অনন্যসাধারণ অধ্যাত্মদীপ্ত প্রতিভা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। এই প্রতিভা ভারতের বিশেষ সম্পদ, ভারতীয় সংস্কৃতির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন,

"... a great advocate of equilibrium between warring forces of life : reason and faith, matter and spirit, individual and society, science and religion, the past and the present, the East and the West, and last but not least, haves and have-nots." ৫৩

সকল ভাবের সংহতি ও সমন্বয় ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক রূপ। ভারত-চেতনার মূলপ্রেরণা ও ধারার সার্থক অনুসৃতির ফলশ্রুতি স্বামী বিবেকানন্দ। সেই কারণে তিনি ভারতপ্রাণ হয়েও ভারত-সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির মহান মর্যাদায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন এবং পেরেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সমন্বয়সূত্রের প্রয়োগ ও প্রচারের দ্বারা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবপ্রেমিক, তিনি নরঋষি। মানবমরমী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বকল্যাণ ও সংহতির পথপ্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি, ভারত-সংস্কৃতিতে অন্তর্নিহিত পরম আশ্বাসের ভাবটি আত্মস্থ করে জগদ্বাসীকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেনঃ

"I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God."

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনার লক্ষ্য ছিল—ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, তার বিকাশ এবং ভারত কর্তৃক বিশ্বকল্যাণের নেতৃত্ব গ্রহণ। বিশ্বমানসে তাঁর ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল। তিনিই ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যতের দিশারী, চিন্ময় ভাবাদর্শ।

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে বিবেকবাণীর তাৎপর্য*

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠকের কাছে এটি সুবিদিত যে, ১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বরে চিকাগোয় অনুষ্ঠিত সেই বিখ্যাত ধর্মমহাসভার মাধ্যমেই স্বামীজী পাশ্চাত্য-জগতের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর এই আবির্ভাব যেমন নাটকীয়, তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেযুগের মানুষের মধ্যে যে আর্তি জেগেছিল তারই উত্তরে স্বয়ং বিশ্বনিয়ন্তাই যেন এই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল এক গোত্রহীন কাল (an age without a name)। এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, আবার কোন সময়ে কোন একটি বিশেষ চিন্তাও এযুগে প্রাধান্য লাভ করেনি। বিচ্ছিন্নতা ও ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল গত শতাব্দীর পৃথিবী; বিভিন্ন চিন্তার স্রোত ও নানামুখী গতি পরিণামে বিশ্বাস ও সন্দেহ, আশা আর নিরাশার মধ্যে, মানুষের মনকে করে তুলেছিল দোদুল্যমান, অস্থির করে তুলেছিল সমগ্রভাবে মনুষ্যজাতিকে। প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিক মতবাদ যেন তখন ক্রমাগত কূল পরিবর্তন করছিল, একটি করে দার্শনিক চিন্তার সৌধ গড়ে উঠছিল, আর কিছুদিন পরেই তাতে অসামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল। এদিকে তাকিয়েই হোয়াইটহেড্ বলেছিলেনঃ "বিগত শতাব্দীগুলির তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দী সত্যিই এক অস্থিরতাময় যুগ। ......তখন প্রতিটি মানুষেরই চেতনা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ......ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিকেরা সমস্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের মতবাদই চরম সত্য; ফলে তাঁদের সকল প্রয়াসই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ছিল।"[১]

চিন্তাক্ষেত্রে এই বিপর্যয়ের মূলে কিন্তু ছিল নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ও গতানুগতিক খ্রীষ্টধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য। আধুনিক জগতে এই দুইয়েরই অবদান রয়েছে বলে এর কোনটিকেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়, অথচ এদের চিন্তাধারা আলাদা। এদের দুই পক্ষেই যেমন তীক্ষ্ণধী মনীষীরা ছিলেন, বিপক্ষেও তেমনি ছিলেন চিন্তাশীলেরা। কিন্তু যুগের প্রশ্ন ছিল, এ দুয়ের মধ্যে মিলন সম্ভব কি না। এই মিলনের চেষ্টাই, হোয়াইটহেডের মতে, একটা বিতর্কের সৃষ্টি করছিল। গত শতাব্দীর শেষদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রমশ জয়লাভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ক্রমপ্রসারিত জ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে, মানুষের জাগতিক সুখের উপকরণ সংগ্রহের পথ ধরে। এটি কিন্তু হচ্ছিল মানুষের অন্তরের নিভৃততম আর্তির বিনিময়ে, যে আর্তি জড়িয়ে আছে তার শাশ্বত চেতনাকে ঘিরে। বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯০২ সনে, বারট্রান্ড রাসেল এই কথাটিই তুলে ধরলেন তাঁর বক্তব্যেঃ "মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত ও অসহায়। তার নিজের ও সমগ্র মানবজাতির উপরে ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এক নিশ্চিত অন্ধকার। ভাল-মন্দ সম্পর্কে উদাসীন, ধ্বংসোদ্যত, সর্বগ্রাসী জড়পুঞ্জ অস্থির গতিতে এগিয়ে আসছে। নিজের প্রিয় জিনিসগুলি ক্রমশই চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে; আগামীকাল মানুষকে নিজেই যেতে হবে অন্ধকারের রাজত্বে। চরম বিপর্যয় এখনও আসেনি। ভাগ্যের হাতে ক্রীতদাস হয়ে তাকে চলতে হবে, নিজের তৈরী মন্দির হবে তার উপাস্য, দৈব-ঘটনায় হতবাক্ হয়ে কাটাতে হবে জীবন। অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে; নয়তো তার জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা এক জরাজীর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি করবে যে পৃথিবী অচেতন শক্তির ক্রিয়া হিসাবে তার নিজেরই সৃষ্টি।"[২]

যদিও সাহসী উক্তি তবুও মানবমনের অসহায় অবস্থার কথাই এতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের যুক্তি যেখানে তাকে নিয়ে গিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তার *ভবিতব্যকে সম্মানের সঙ্গে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।* কিন্তু সাহসের সঙ্গে এই শূন্যতাকে মেনে নিতে তো সবাই পারে না। তাছাড়া গত শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগৎ তখন এমন এক অবস্থার সম্মুখীন যেখানে ধর্মের পতন দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে অনৈতিকতা তখন সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলছিল। আসলে তখন এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছিল যেখানে অনৈতিকতার জন্ম ও বিস্তার একান্ত স্বাভাবিক। সব কিছুর উপরেই মানুষের অবিশ্বাস, নৈতিকতা তখন তার স্বর্গীয় আসন থেকে বিচ্যুত, জীবনের

উদ্দেশ্য সীমিত পরিসরে আবদ্ধ; শাশ্বত সত্তার উপরে সন্দেহ, চরম সত্যের সন্ধান অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। সংক্ষেপে, অনুপ্রেরণাময় শক্তি হিসাবে ধর্ম তখন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত।

এটাই কি সে অবস্থা নয়, যে অবস্থায় নিজেকে প্রকাশিত করবেন বলে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন? তিনিই তো বলেছিলেন যে, যখন মানুষ তাঁকে ভুলে যাবে কিন্তু তাদের সমস্ত আর্তি ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ হবে তখনই তিনি আসবেন। "হে অর্জুন, যখন ধর্মের পতন আর অধর্মের উত্থান দেখা যায়, আমি তখনই নিজেকে প্রকাশিত করি।"[৩] সন্দেহ নেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এমন অবস্থাই এসেছিল। এবং ভগবানও আবির্ভূত হলেন।

পাশ্চাত্য জগতে তাঁর আবির্ভাবের, সঠিক অর্থে তাঁর বার্তাবহের আগমনের, ক্ষেত্র তিনি নিজেই প্রস্তুত করলেন। ঘটনার সূত্রপাত মাদ্রাজে ১৮৯৩ সনের বসন্তকালে। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় যাওয়া-না-যাওয়া নিয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে আদেশ করলেন পাশ্চাত্যে যেতে। "আমার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছা ছিল না, মনে মনে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে কয়েক দিন ধরে বারবার বলতে লাগলেন, 'আমার কাজের জন্য এসেছিস; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ঐ সভার আয়োজন জানবি'।"[৪] যারা এই ঘটনার সাক্ষী তাদের কারও জীবিতাবস্থায় এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু অন্য একটি ঘটনায় এর সমর্থন মেলে। এতেই মনে হয়, স্বামীজী তাঁর ধর্মমহাসভায় যোগদানের পিছনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা দেখতে পেয়েছিলেন। আমেরিকায় যাবার কয়েক মাস আগে তিনি তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে আবু পাহাড়ে বলেছিলেনঃ "হরি ভাই, ঐ ধর্মমহাসভা-টভা যা হতে চলেছে তা এর জন্যই (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে)। আমার মন তাই-ই বলছে। দেখবে, শিগ্‌গিরই এটি ফলে যাবে।"[৫]

বিরাট সেই ধর্মমহাসভা, যার প্রস্তুতি ও আয়োজন ছিল বিশ্বব্যাপী সেটা কি একজন তরুণ অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসীর জন্য? স্বামীজীর গুরুভাই ও শিষ্য ছাড়া অন্যদের কাছে এটি অতিরঞ্জন বলেই সম্ভবত মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই মহাসভার অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই সকলের কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে

গেল যে, "দৈবীশক্তির অধিকারী এই বক্তা" স্বামী বিবেকানন্দই সভার প্রধান চরিত্র, মূল নায়ক। সত্যি কথা বলতে কি, অগণিত ধর্মনায়কদের উপস্থিতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগতের কাছে স্বামীজীকে পরিচিত করে দেওয়া ছাড়া এই ধর্মমহাসভা স্থায়ী কোন সুফল রেখে যেতে পারেনি।

এরপর প্রায় তিন বছর ধরে স্বামীজী আমেরিকা ও ইংলন্ডের অধিবাসীদের কাছে এমন এক বাণী প্রচার করলেন যা পাশ্চাত্য জগতের তৎকালীন দুরূহ জটিল সব সমস্যার সমাধান এনে দিল। সমকালীন কোন দার্শনিক মতকে খণ্ডন কিংবা স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন তবুও তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি বলাটা ঠিক নয়। তাঁর চিন্তাধারা কখনই পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না, বরং বহু শতাব্দীর ভাবধারায় পরিপুষ্ট ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিস্নাত হয়েই তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি লালিত হয়েছিলেন এমন এক সভ্যতার কোলে যা পাশ্চাত্য-জগৎ কোনদিনই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। যদিও সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত জনসাধারণ ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করেছিল, তবুও সাধারণভাবে বলা যায় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবধারা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি ছিল একান্ত অগভীর। অবজ্ঞা ও একটা রহস্যময় চমৎকারিত্বের দৃষ্টি—এই মিশ্র মনোভাব ছিল তাদের, এবং সাধারণভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তারা মোটামুটি অজ্ঞই ছিল বলা যায়। ভারতবর্ষের প্রতি এরকম মনোভাবের দরুনই স্বামীজীর পক্ষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সম্মানিত ও বিশদ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ছিল। নতুবা, সাধারণ শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগত। এই ধর্মমহাসভার ফলেই জনসাধারণ স্বামীজীর প্রতি তাদের দরজা উন্মুক্ত করল এবং তাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যই যে স্বামীজীর আবির্ভাব--এই সত্যকে স্বীকৃতি জানাল। তারা বুঝতে পেরেছিল, স্বামীজী এমন এক সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে এসেছেন যা বহু যুগ আগে থেকেই অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এসেছে।

স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করল, একথা ঠিক নয়। অবশ্য অনেকে করেছিল—একথাও সত্যি। তারা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে আরও গভীরতা ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল। আরও একদল নারী পুরুষ, সংখ্যায় কয়েক হাজার, তারাও স্বামীজীর ভাবধারার মহত্ত্ব ও গভীরতা বুঝতে পেরেছিল, এবং পরিণামে নিজেদের উন্নতও করেছিল। অনেকে এভাবে রূপান্তরিত হলেও স্বামীজীর প্রভাবের শক্তি শুধু তাঁর তৎকালীন সাফল্য দিয়ে বিচার করলে চলবে না। যদিও তিনি উইলিয়াম জেম্‌স্‌, এডোয়ার্ড কার্পেন্টার, ম্যাক্সমূলার, ক্যামন্‌ এইচ আর

হাওয়েইস, মনকিওর কনওয়ে, ক্যানন উইলবারফোর্স, রেভারেন্ড জন হপস, লুই জি জাঁ, লিও টলস্টয়, জোশিয়া রইস, চার্লস ভোয়সে প্রমুখ তৎকালীন পাশ্চাত্য মনীষীদের প্রভাবিত করেছিলেন নিঃসন্দেহে, যদিও তাঁর ভাবধারা ও চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য সাধারণ নারী-পুরুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, তবুও একথা বলা যায় না যে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তৎকালীন দর্শন বা ধর্মতত্ত্বকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছিল। শিক্ষিত সমাজের মূল যে চিন্তাধারা তাতে গভীর আধ্যাত্মিকতার ভাব প্রবেশ করেছিল, একথাও বলা যায় না।

তাহলে স্বামীজীর অবদান কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে তাঁর পাশ্চাত্য-ভ্রমণের একটি প্রত্যক্ষ ফল ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁর প্রভাব। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় এতদিন যে গোঁড়া-মনোভাব ছিল তা দূর হয়েছিল স্বামীজীর বক্তৃতায়। ১৮৯৩-৯৪ সনে তাঁর বক্তৃতা-সফরে আমেরিকাবাসীদের মনে ক্রমশ এই ভাব জেগে উঠল, যে সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মতো এমন একজন বিরাট ও মহৎ পুরুষ সৃষ্টি করেছে সেই সভ্যতা নিঃসন্দেহে এক মহান ও উজ্জ্বল সংস্কৃতির পরিবাহক। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতির তাৎপর্যের উপরে স্বামীজীর বক্তৃতা, ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের সমর্থনে তাঁর অগ্নিময় ভাষণ, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গভীর আলোচনা—এ সবই আমেরিকান মনোভাবের উপরে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, এটি স্বামীজীর একটি বিরাট অবদান। কিন্তু এছাড়া আরও আছে।

তাঁর পাশ্চাত্য-ভ্রমণে, বিশেষত ১৮৯৫-৯৬ সনে, তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য-জগতের চিন্তাধারা ও জীবনচর্চার গভীর সমস্যার যথার্থ সমাধান তুলে ধরেছিলেন। আর এটি করতে গিয়েই তিনি তাঁর বাণীর (কিংবা তাঁর ভাষায় "গুরু-দেবের বাণীর") বীজ বপন করে দিচ্ছিলেন মানুষের জীবনে, পাশ্চাত্য জগতের সামগ্রিক চেতনায়, এবং যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। এবং এভাবেই পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমশ একটা পরিবর্তন আসছিল। বর্তমান যুগে প্রাচ্য ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে আগ্রহ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে স্বামীজীরই প্রভাব।

তা যাই হোক না কেন, আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বামীজীর বাণীর একটি বিশেষ দিক আলোচনা করা—পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তার বা মতবাদের সংঘর্ষে জর্জরিত হচ্ছিল তার সমাধানে স্বামীজীর প্রভাব কি, তা দেখা।

॥ ২ ॥

বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সংঘর্ষ বহু যুগ ধরে চলছিল তা অনেকেরই জানা। সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করে নেওয়া যাক। ১৫৪৩ সনে কোপার্নিকাস যখন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বললেন, তখন থেকেই এই সংঘর্ষের শুরু। মানুষের চিন্তাধারায় এটি বিরাট এক পরিবর্তন নিয়ে এল। এরপরে এলেন গ্যালিলিও যিনি মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের উপরে এক বিরাট আঘাত হানলেন। খ্রীষ্টীয় চার্চের ঈশ্বরকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যবাদকে (God-oriented teleology) বাতিল করে দিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওই পরিবর্তিত বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করলেন। অ্যারিস্টটলের অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান 'উদ্দেশ্য'র পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের তখন প্রশ্ন ছিলঃ কি উদ্দেশ্যে ঘটনাগুলি ঘটছে? যে কোন ঘটনার উদ্দেশ্যকে মানুষের প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের সব কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। চার্চের পাদ্রী ও পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বাইবেল ও অ্যারিস্টটেলীয় লজিকের সাহায্যেই এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করছিলেন। চার্চ ও গ্রন্থাগারের বাইরে এসে বিশ্বরহস্যকে জানার কোনও তাগিদ তাঁরা দেখাননি।

গ্যালিলিওই প্রথম এই অচলায়তনের দরজা খুলে বাইরে এলেন, তাঁর টেলিস্কোপ এবং কেপ্‌লারের জ্যোতির্বিজ্ঞান-সূত্রাবলীর সাহায্যে বিশ্বের নানান ঘটনার ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিলেন; তিনি কিন্তু এই ঘটনাবলীর পিছনে 'কেন'-র চেয়ে 'কিভাবে' ঘটছে তার উপরেই জোর দিলেন। এডুইন্ আর্থার বার্টের ভাষায়ঃ "গ্যালিলিওর দর্শনে...... এই জগৎ হল কতগুলি বস্তুপুঞ্জ যা গাণিতিক সূত্রাবলীর সাহায্যে চলে, অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্য দিয়ে প্রবহমান বস্তুপুঞ্জই হচ্ছে জগৎ।"[৬] এর তাৎপর্য, বাস্তব জগতে সব বস্তুই গাণিতিক সূত্র মেনে চলছে, এর মধ্যে কোন 'উদ্দেশ্য' খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা। বার্টের উক্তি আবার উল্লেখ করা যায়ঃ "বাস্তব জগৎ (অর্থাৎ মৌলিক গুণাবলী-সমন্বিত জগৎ) গাণিতিক সূত্রানুসারে ভাসমান পারমাণবিক গতিসমূহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থায় পরমাণুসমূহের গতির মধ্যে কারণ-তত্ত্ব নির্দেশ করা একটা তাত্ত্বিক খেয়াল মাত্র; যা কিছু ঘটছে তা এইসব বস্তুপুঞ্জের গাণিতিক

পরিবর্তন মাত্র।"[৭] উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এই যে যান্ত্রিকতাবাদ, এ ধারণার ফলে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন যে, একটি বস্তুকে চালিত কিংবা গতিশক্তির তারতম্য করার জন্য একটি যান্ত্রিক শক্তি দরকার। পরে এটিকেই নিউটন তাঁর "গতির প্রথম সূত্রে" লিপিবদ্ধ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, যখন বস্তুর ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক ও গাণিতিক সূত্র যুক্ত হল, আদি-কারণ হিসাবে ঈশ্বরও সিংহাসনচ্যুত হলেন। গ্যালিলিও অবশ্য মনে করতেন যে, ঈশ্বরই মূল কারণ, তিনিই বস্তুতে প্রথম গতিসঞ্চার করেছিলেন এবং তারপর থেকে বস্তুগুলি নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে। বার্টের উক্তিঃ "একটি প্রয়োজনীয় কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের কাজ সেখানেই শেষ হল। তিনি এক বিশাল যান্ত্রিক স্রষ্টা বলে পরিগণিত হলেন যাঁর কাজ পরমাণুর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।"[৮] খ্রীষ্টীয় গীর্জার ধর্মধ্বজীরা গ্যালিলিওকে এর জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

কেপ্‌লার, গ্যালিলিও এবং ডেকার্টের পর আইজাক নিউটন (গ্যালিলিও যে বছর মারা যান সেই ১৬৪২ সনেই তাঁর জন্ম) আধুনিক বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করালেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি দৈব উদ্দেশ্যের বদলে যান্ত্রিক কারণকে তুলে ধরে, তাঁর প্রচেষ্টাতেই সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুর স্থান-পরিবর্তন ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিতে দৈব-নির্দেশের যুগ শেষ হয়ে এল।

পাশ্চাত্য জগতে নবজাগরণের (Renaissance) মতোই এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন চেতনার সঞ্চার করল। বিশ্ব সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা মানুষকে তৃপ্ত করতে পারল না। বিজ্ঞানের স্পর্শ মানুষকে অসীম শক্তিশালী করে তুলল। যদিও নিউটনের আবির্ভাবে পৃথিবী-কেন্দ্রিক নক্ষত্রজগতের কল্পনা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হল, যদিও মহাশূন্যের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা ছাড়া মানুষের অস্তিত্বের আর কোনও অর্থ রইল না, তবুও যুক্তির সাহায্যে মানুষ সমস্ত রহস্যের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল যে রহস্যের মধ্যে সে নিজেও একটি। মানুষ দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নতুন নামকরণ হল "যুক্তির যুগ" (The Age of Reason)। বিভিন্ন রকমের চিন্তা ও মতবাদ এর অন্তর্ভুক্ত হলেও মোটামুটি-ভাবে সবেরই উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও আশাবাদ। শুধু বিজ্ঞানই

নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় সব কিছুই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হল এবং মানুষের কাছে তা বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগল। সবাই আশা করেছিল, এভাবে যদি সব কিছুকে দেখার চেষ্টা করা হয় তবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে এবং পরিশেষে একটি আদর্শ মানব-সমাজ গড়ে উঠবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত দার্শনিক মতবাদগুলির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ঈশ্বরকে কেবল-মাত্র আদি কারণ হিসাবে স্বীকার করা এবং দৈব উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করায় মানুষের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, কেননা সব কিছুই যখন উদ্দেশ্যহীনতায় পর্যবসিত ভালমন্দ স্থির হবে তাহলে কিভাবে? এই প্রশ্ন দেখা দিল। পাশ্চাত্য জগতে এই ধারণাগুলি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসায় মানুষের জীবনে ধর্ম ক্রমশই কম কার্যকরী ও কম অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গতানুগতিক ধর্মচিন্তার পুনর্জাগরণের চেষ্টা চলল, সাহিত্যে শুরু হল 'রোমান্টিসিজমের' সুর যা পরবর্তী শতাব্দীতে চরমে উঠল। এগুলি কিন্তু কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারল না; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তর্কমূলক যৌক্তিক (rational) ধর্মতত্ত্ব, যাকে 'Deism' বলা হত, মানুষের মন জুড়ে থাকল। দৈব-অনুপ্রেরণা, আলৌকিকত্ব ও ভবিষ্যদ্বাণী অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। অলৌকিক কার্যকলাপে বিশ্বাস করাটা কুসংস্কার হয়ে দাঁড়াল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভল্টেয়ারের উক্তিঃ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা নৈতিক বলে মনে হয়, তার মিলিত রূপই ধর্ম, বিচার-মূলক ধর্ম।[৯]

কিন্তু এই বিচারমূলক ধর্মের ভিত্তিও খুব তাড়াতাড়ি ধ্বসে পড়ল। বিভিন্ন দার্শনিকেরা এতে সাহায্য করলেও সবচেয়ে বড় আঘাত হানলেন ইম্যানুয়েল কান্ট। তিনি দেখালেন যে, ঈশ্বর-অস্তিত্বের প্রধান তিনটি যুক্তিঃ সৃষ্টিমূলক (argument from Design), আদি-কারণমূলক (argument from a first cause) এবং অধিবিদ্যামূলক (ontological argument) —এর কোনটিই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে না। তিনি বললেনঃ "আমি মনে করি যে ঈশ্বরতত্ত্বে যুক্তির অবতারণা করার সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন এবং এই যুক্তিগুলি মিথ্যা যুক্তি মাত্র।"[১০] স্বীয় সিদ্ধান্ত জানানোর পর তিনি তা প্রমাণ করতে এগিয়ে গেলেন। শিক্ষিতমহলের কাছে ঈশ্বর আর একবার

সিংহাসনচ্যুত হলেন। অজ্ঞেয়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ তখন যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

কান্ট অবশ্য বলেননি যে ঈশ্বর নেই। তাঁর দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "a priori knowledge"-এর প্রতিস্থাপন যেটিকে ডেভিড হিউম বাতিল করে দিয়েছিলেন। কান্টের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় জ্ঞানের একটি ভিত্তিভূমি খুঁজে বের করা যেটিকে তিনি আগেই খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর দর্শনের এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু এতে বোঝা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত কিরকম ঘূর্ণীর মধ্য দিয়ে চলছিল। কান্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত এমন একটি ভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে ধর্ম দাঁড়াতে পারে। তাঁর দর্শনকে সংক্ষেপে বিবৃত করতে গেলে বলতে হয়, তিনি বিশ্বকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হল কাল-আকাশ-কার্যকারণের জগৎ (world of time, space and causation)—আমরা যে জগৎকে জানি ও যার মধ্যে বাস করি। এটির মূল ভিত্তি মানবমনের অন্তর্গত স্বাভাবিক বৃত্তির উপরে, যেটি কেবলমাত্র স্থান কাল ও কতগুলি প্রত্যয় (categories or concepts) যেমন সার্বিকতা, বহুরূপত্ব, কারণত্ব ইত্যাদির উপরে নির্ভরশীল। আমাদের মন হল একটি স্থানিক (spatial) ও ক্ষণস্থায়ী মাধ্যম যার সাহায্যে সত্য জগৎ (things in themselves) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। তাই যে জগৎকে আমরা জানি সেটি হল আপাত-স্থানিক জগৎ (temporal-spatial world) যা পরিচালিত হয় এমন কিছু সূত্রের সাহায্যে যার স্রষ্টা হল মন। এটি আগাগোড়াই পূর্ব-নির্দিষ্ট। এর মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, দৈব-নির্দেশে এটি পরিচালিত হয় না। এটি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক। বিপরীতপক্ষে, সত্য জগৎ যাকে ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না, হয়তো সেটি ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু আমরা কি করে সে জগৎকে উপলব্ধি করতে পারি? কান্ট মনে করেন যে, আমাদের নৈতিক চেতনা, ধর্মীয় উপলব্ধির সাহায্যে আমরা সেই জগতের আভাস পেতে পারি। এইভাবে তিনি যান্ত্রিক জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা সূত্র মেনেছিলেন। যদিও স্থান-কালিক জগতের মধ্য দিয়ে সত্য জগতের প্রবহমানতাকে বহুবর্ণে রঞ্জিত উজ্জ্বল শাশ্বত আলোকবর্তিকার সঙ্গে কোন তুলনা কান্ট করেননি, তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ ক্রমশ এদিকেই ঝুঁকছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অজ্ঞেয়বাদ রোমান্টিসিজমের আবর্তে গিয়ে পড়ল। এটা যেন একটা সাময়িক অবকাশ। যদি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো না যায় তবে বিশ্বাসের পথে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভব—এটাই ছিল সেযুগের মনোভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এভাবে হৃদয়ের ধর্মকে (religion of the heart) মানুষ আঁকড়ে ধরল। রুশো-প্রবর্তিত রোমান্টিসিজমের প্রভাবে

কবিরা ঈশ্বরকে খুঁজে পেলেন প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত অবস্থায়; উপলব্ধি করলেনঃ

"... a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean, and the living air, ..."[১১]

ভাববাদী দার্শনিকেরা কান্টকে অনুকরণ করে তাঁকেই আবার দুর্বোধ্য বলে বাতিল করে দিলেন, যদিও যুক্তির দিক দিয়ে তা করতে পারলেন না। হেগেল চরম সত্তা (Absolute) সম্বন্ধে ধারণা করলেন, এটি যেন একটি সর্বগ্রাসী কারণ-প্রজ্ঞা যা এই ক্ষুদ্র জগৎকে উন্মুক্ত করে এবং এই বিশ্বজগৎ আবার পরিণামে সেই চরম সত্তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক কালপ্রবাহে বিকশিত হচ্ছে। অবশ্য আমি যত সংক্ষেপে বললাম, হেগেলের দর্শন তার চেয়ে বহুগুণ বিস্তৃত এবং বিভিন্ন যুক্তিপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদী দর্শনসমূহের বিশ্লেষণে আমরা এগুতে চাই না, কারণ এগুলিকে বহু পূর্বেই এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তবুও সেই শতাব্দীতে ফিক্টে, হেগেল, স্পেন্সার, শেলিং কিংবা কার্লাইল বা এমার্সন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেই তত্ত্বগুলিকেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করেছিলেন। ১৮৯৬ সনে লন্ডনের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ "'অনন্তই সান্ত হইয়াছেন'—জার্মানিতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর দর্শন-শাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই-সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়—অনন্তস্বরূপ নিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একদিন অনন্ত নিজেকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করেনঃ সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে সকলই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে পারে না।"[১২]

॥ ৩ ॥

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাশ্চাত্য জগতের মূল সমস্যাটি ছিল এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি আসলে কোন যান্ত্রিক নিয়মের বশবর্তী, অথবা চরম বিশ্বপ্রজ্ঞার দ্বারা চালিত? এর দুটোর একটাও হওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না, এমন কিছুকে মানতে রাজী নয় যা ইন্দ্রিয়বেদ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এবং এটি আত্মিক শক্তির (Spiritual force) অস্তিত্ব বিষয়েও কোন প্রমাণ পেয়ে ওঠেনি। তাই ব্যক্তি-ঈশ্বরকে (Personal God) মেনে নিতে তৎকালীন মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আপস করে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতেই হয়েছিল। সনাতনী খ্রীষ্টধর্ম এ পথেই সমাধান খুঁজছিল। স্বামীজী কিন্তু এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেনঃ "কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল!"[১৩]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির (দ্বৈত চেতনা) মধ্যে যেমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান ছিল না, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এরা ছিল বিপরীত মেরুর। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিকে বজায় রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্য মানুষ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে, যার জন্য সে গর্ব অনুভব করত, সে তার ভবিষ্যৎ প্রগতির কোন সীমা খুঁজে পাচ্ছিল না। কর্মতৎপরতা ও উৎসাহের সাহায্যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে স্বীয় অধীনে এনে স্বপ্ন দেখত যেন এই পৃথিবীতেই সে তার ঈপ্সিত স্বর্গ গড়ে তুলবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুক্তি-অনুসারী, ব্যবহারিক, মানবকল্যাণকামী ও আত্মবিশ্বাসী। যুক্তির সাহায্যে সকল সমস্যারই সমাধান সম্ভব, এই ধারণা তার ছিল। এটাই ছিল তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যার সাহায্যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগতে চালিত হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তার গতানুগতিক ধর্মচিন্তা যা তাকে ছোটবেলা থেকেই শেখাত যে, সে একজন মহাপাপী এবং এজন্য তার অনুগত হওয়া উচিত ঈশ্বরের প্রতি যে ঈশ্বরের কাজকর্ম সে বুঝে উঠতে পারে না। এই তত্ত্ব কম-বেশী মেনে নিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের উপরে একান্ত নির্ভর করে তোলাই খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কর্তব্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টধর্মের উভয়কেই মেনে নেওয়ার ফলে পাশ্চাত্য জগৎ এক মানসিক রোগগ্রস্ত সংস্কৃতির কবলে পড়েছিল। এই দুইয়ের মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্য ভাববাদী দার্শনিকেরা যে চেষ্টা করতে লাগলেন তা সমস্যাকে কেবল জটিলতর করেই তুলল। কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রকৃতপক্ষে, যুক্তি ও বাস্তবের দ্বারা চালিত না হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক ও ধর্মীয় ভাববাদ সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করতে লাগল। ফলে পাশ্চাত্য জগৎ ভরে উঠল প্রেততত্ত্ববিদ্, ফেইথ-হীলার্স, জ্যোতিষী, থিওজফিস্ট প্রমুখ গুপ্তবিদ্যা পারদর্শীদের দ্বারা। সাধারণের মধ্যে কেউ কেউ তাদের আন্তরিক অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেও অধিকাংশই উত্তেজনা-সন্ধানী (sensation-seekers) হয়ে উঠল। কেউ কেউ বা এসবে অনাগ্রহী হয়ে রইল। স্বামীজী এসব গুপ্তবিদ্যাকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেনঃ "একজন নির্বোধ অথবা অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার মস্তিষ্কে যে-সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক। জগতে সর্বাপেক্ষা পরস্পরবিরোধী যত প্রকার অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুযায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়-বোধের ভাষা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১৪]

ধর্মনেতাদের মধ্যে একাংশ অযৌক্তিক ও কাল্পনিক তত্ত্বচিন্তায় গা ভাসালেন, বাকিরা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হলেন, অর্থাৎ এঁরা মনে করলেন যে মানুষের মধ্যে যে সৎ গুণগুলি রয়েছে সেগুলি বাড়িয়ে তুললেই মানবসমাজকে আদর্শস্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাঁদের সকল প্রয়াসের মধ্যে মানুষের জীবনে নৈতিকতাকে ক্রিয়াশীল করে তোলা, যান্ত্রিক অপসংস্কৃতিকে দূর করা, ন্যায়-বিচারকে উচ্চ স্থান দেওয়া ইত্যাদিই প্রধান হয়ে উঠল। আর এভাবেই "লিবারেল ক্রিশ্চিয়ানিটি"র উদ্ভব হল যার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার চেয়ে সামাজিক ও নৈতিক ক্রিয়াকলাপই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এই উদার খ্রীষ্টানরা তাঁদের ব্যবহারে ক্রমশই উপযোগবাদে (utilitarian) অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ধর্ম তাঁদের জীবনে ঐশ্বরিক চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে থাকল। অনুরূপভাবে আর এক শ্রেণীর লোক যাঁরা মূলত একই লক্ষ্য নিয়ে চলছিলেন, তাঁরা কিন্তু ঈশ্বরকে পটভূমিকার বাইরেই রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। গত শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং লন্ডন এই শ্রেণীর নাস্তিকে ভরে গিয়েছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গত শতাব্দীর চিন্তাশীল মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা, অথবা একটির সাহায্যে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করা। এরই ফলে যেসব বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে গতানুগতিক ক্যাথলিক মতবাদ থেকে খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism), উপযোগবাদ, র‍্যাডিক্যালিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে

নাস্তিক্যবাদ পর্যন্ত সবই ছিল। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সবরকম প্রয়াসই দেখা গিয়েছিল। নানান সংগঠন তাদের পত্রিকা, অধিবেশন, বক্তৃতা ও মতবাদের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীকে মুখর করে রেখেছিল।

এমন সময় নানারকম চিন্তাধারার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যেই দেখা দিল বিদ্যুতের ঝলকানি যা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যকে প্রকট করে তুলল। ১৮৫৯ সনের ২৪শে নভেম্বর চার্লস ডারউইনের "ওরিজিন অব স্পেসিজ" ইংলন্ডে প্রকাশিত হল। গ্যালিলিওর "সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বে"র মতো এই ক্রমবিকাশ-বাদও সনাতনী খ্রীষ্টধর্মের উপরে বিরাট আঘাত হানল। বাইবেলের "হায়ার ক্রিটিসিজমে"র* কথা বাদ দিলেও এই ক্রমবিকাশবাদ সপ্তদশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের চেয়েও মারাত্মক আঘাত হেনেছিল।

অন্যদিকে, বহু উদারপন্থী প্রোটেস্ট্যান্ট নেতারা ক্রমবিকাশবাদকে নিজেদের মতবাদের কাজে লাগিয়ে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বগুলিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যাতে সেগুলি মানবজীবনে কার্যকরী হয়ে ওঠে। তাঁরা ক্রমশই আশাবাদী হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেনঃ সৃষ্টির পর থেকেই ঈশ্বর এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যাতে এই জগৎ ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ খ্রীষ্টান-সমাজ হয়ে উঠতে পারে, যে সমাজে সকলেই হবে কর্মী, সুখী এবং অন্যের প্রতি প্রেমে পূর্ণ। "আধুনিক সমাজতন্ত্রীরা পরবর্তী শতাব্দীকে এমন এক যুগ বলে চিহ্নিত করছেন যেখানে সকলেই তাদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবে"—মন্তব্য করেছিলেন অজ্ঞেয়বাদী লেসলী স্টিফেন। সনটা ছিল ১৮৯৩।

বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে স্বামীজী কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু ক্রমপ্রগতির (Steady progress) ব্যাপারে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি-কল্পনার অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দিতে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। "তোমরা যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না —উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি।"[১৫] অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব ; সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ...বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা দোষাবহ এ কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অতএব এমন

সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? ...আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রণা ভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর দিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানুষ সমাজ সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখদুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে। ...কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহা-রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা নহে।"[১৬]

বিশ্বজগৎ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কি, তা জানার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের মানুষ তার সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করেছিল। বিভিন্ন রকম আপাত-সমাধানও তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মূল সমাধানটি তখনও ছিল অজানা। তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমগ্র সংস্কৃতিটিই সেই শতাব্দীর শেষদিকে হয়ে পড়েছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। এক-দিকে সে তার সকল বন্ধন ছিঁড়ে সর্ববিষয়ে যেন মুক্তির আস্বাদ পেতে লাগল, তার শক্তি ও জ্ঞান যেন চরম সীমায় পৌঁছে যাবার মতো হল। কিন্তু অন্যদিকে তার জীবনদর্শন জাগতিক সত্তার ঊর্ধ্বে তার সেই মহান অপ্রতিরোধ্য আত্মিক চেতনাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হল তার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও। তার কোন আত্মা আছে কিনা সে বিষয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। একদিকে তার জাগতিক জীবন যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ছন্দোবিহীন, অন্যদিকে রয়েছে তার আত্মিক জীবন যার মধ্যে যুক্তির ছিটেফোঁটাও সে দেখতে পারছে না। এই দুই জগৎকে যতবারই সে মেলাতে চায়, প্রশ্ন ও সন্দেহ ততবারই তার সামনে গভীরভাবে ভেসে ওঠে। এ ধরনের দ্বন্দ্বময় সাংস্কৃতিক চেতনা বেশী-দিন টিকে থাকতে পারে না।

॥ ৪ ॥

এই সংকট-লগ্নে যখন যান্ত্রিক ও বাস্তবজীবন প্রসঙ্গে একটি আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয় সর্বতোভাবে কাম্য ছিল, তখনই চিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত

হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি যে বাণী শোনালেন তা যেন হঠাৎ এক পরিবর্তনের সূচনা করল। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বেদান্তোক্ত সার্বভৌম-একত্ব বিষয়ক। পাশ্চাত্য জগৎ তখনও দাঁড়িয়ে ছিল দ্বৈতবাদের উপরে। বিষয় (object) ও বিষয়ীর (subject) পার্থক্য, চেতনার আধার হিসাবে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব, তা সে পদার্থটি জড়, মন বা আত্মা যাই হোক না কেন—এই দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী পাশ্চাত্য জগতের সামনে বেদান্তের একত্ববাদ প্রথমদিকে দুরূহ এবং অগ্রহণীয় বলেই মনে হয়েছিল। তাদের এই সমস্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে স্বামীজী নিজেকে প্রতিভাত করলেন তাদের কাছে মানবদরদী হিসাবে। পাশ্চাত্য লোকেদের জীবন ও চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে প্রেমিক পিতার মতো তাদের ভাষাতেই এমনভাবে প্রকাশ করলেন নিজেকে যা তাদের অন্তরকে স্পর্শ করল। প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোকে তাঁর শিক্ষা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করল এক দৈবী ঋষি রূপে, যিনি রক্ষা করতে এসেছেন শুধু মানুষকেই নয়, তার ধর্মকেও—যে ধর্মের তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাই তাঁর কথাগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধের মতো মনে হতে লাগল।

স্বামীজী তাদের মূল সমস্যাটিকে ধরেই নাড়া দিলেন, সব কিছুকে তুলে ধরলেন আত্মার আলোকে। তাঁর মূল শিক্ষাটি কি ছিল? প্রথমত, যান্ত্রিক বিশ্ব ও অ-যান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে তিনি কোন আপস করতে রাজী ছিলেন না। একটি অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলেই দু-ধরনের মতবাদের উৎপত্তি—একথাটিই তিনি বুঝিয়ে বললেন। এ দুটির কোনটিই চরম সত্য নয়। চরম সত্য যা তা সকল দৃষ্টিভঙ্গিকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়, সাগর যেভাবে সকল নদীকে স্থান দেয় নিজের বুকে। চরম সত্য 'এক'—সমস্ত নাম-রূপের ঊর্ধ্বে তা, একটি অনন্ত শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। "এই জগৎ সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যাবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র।"[১৭]

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজীর দৃষ্টিতে জড়ের মতো ব্যক্তি-ঈশ্বরও এই জাগতিক বিশ্বের একটি অংশ মাত্র। "ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।"[১৮] অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "আমরা যে-কোন ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই—উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া

থাকে; আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যাবহারিক মাত্র। কার্যকারণ-ভাব কেবল ব্যাবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাকে স-সীম-রূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। ...এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃত-পক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ সত্তা মাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই সদৃশমানব-বুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।"[১৯]

চেতনার একটি স্তর (one state of consciousness) থেকে দেখতে গেলে এ জগৎ জড়পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয় যা তার নিজস্ব নিয়ম ও সূত্র মেনে চলে। অন্য একটি স্তর থেকে দেখলে এই জগৎই আবার ভাবস্রোত বলে অনুভূত হয়; আরও ঊর্ধ্বস্তর থেকে দেখলে এটি শুদ্ধ চৈতন্যে রূপায়িত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যা "মোমের বাগান", মোম দিয়েই যার গাছ-ফুল-ফল তৈরী। জগৎ সম্বন্ধে এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বেদান্ত যেগুলিকে বিভিন্ন স্তর বলে বর্ণনা করেছে, স্বামীজী তাকেই প্রকাশ করে বললেনঃ "দ্বৈতবাদে এই বিশ্বকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহৎ যন্ত্ররূপে কল্পনা করা হয়; বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে ইহাকে জীবদেহের মতো একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করা হয়। ...অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ইহা অর্থহীন কথা। ...অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, এ সকলই মায়া। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদূতগণ, জন্মমৃত্যুর অধীন অন্যান্য প্রাণী, এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনন্তকোটি আত্মা এই সমস্তই স্বপ্নমাত্র'।"[২০] অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিতে দাঁড়িয়েই এই সব আপাত-বিভিন্ন জগৎ-সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে একই সত্তার বিভিন্ন স্তর বলে প্রতীয়মান হয়। স্বপ্নের মধ্যে সব কিছুকেই যৌক্তিক বলে মনে হয়, সত্য বলে বোধ হয়। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর এর সব কিছুর মধ্যেই ধরা পড়ে অসঙ্গতি। "অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড"-এর মতোই এর কার্যকারণ সূত্র। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ...যখন আমরা এই জগদ্রূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন ঐ সমুদয়ই অসম্বদ্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলি অসম্বদ্ধ জিনিস

যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে।”[২১]

স্বামীজী কিন্তু বুদ্ধদেবের মতো (এবং আধুনিক যুগের কিছু কিছু অভিজ্ঞতাবাদীর মতো) “এ জগতের সবকিছুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ” এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বৈত-অস্তিত্বও তিনি মেনে নেননি। তাঁর ভাষায়ঃ “বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন, ...একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ— নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম হয় না; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা ‘দৃশ্য’ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। এই কথার কোন সংগত উত্তর প্রাচীন-কালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টারূপে কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণাম-শীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।”[২২]

স্বামীজীর মায়া-ব্যাখ্যা বা জগতের আপাতপ্রতীয়মানতা পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে কান্টীয় দর্শন (Philosophy of Kant) বলে মনে হয়েছিল প্রথমদিকে। কান্টীয় দর্শনে এই স্থান-কালিক জগৎ মানবমনের দ্বারাই নিরূপিত হয়। এবং এই মন একটি সত্যবস্তু যাকে অতিক্রম (transcend) করা সম্ভব নয়। এই জগতের সত্যরূপ জানা অসম্ভব; বস্তুর সত্তা চিরদিনই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। বেদান্তদর্শনে কিন্তু মায়া বা আপাতপ্রতীয়মান এই জগৎ নিত্য নয়, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এর মূল কারণ। অবিদ্যার কোন কারণ নেই। মনের বহুবর্ণ-রঞ্জিত কাঁচের মধ্য দিয়ে এই সান্ত সীমিত জগৎ অসীম অনন্তে ভাসছে। এই জগৎ চিরন্তন সত্য নয়; এটিও বিলীন হয় নিত্য অনন্ত চরম সত্যকে রেখে। এই চরম সত্য বা সত্তাকে বিষয়রূপে (object) কখনও জানা যায় না।

এটি শাশ্বত চৈতন্য; আর একে উপলব্ধি করা যেতে পারে যখন মানুষ এর সঙ্গে একত্ব অনুভব করে। এটি বাইরে কোথাও নেই। এটি রয়েছে মানুষের নিজের মধ্যেই; উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই।

স্বামীজীর শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই অনন্ত চরম সত্তাকে অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, একে জানতে হবে অপরোক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মুনি-ঋষিরা এই চরম সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন, জগতের প্রত্যেকেই এরকম উপলব্ধিবান হোক; নতুবা ধর্ম কথার কথা হয়েই থাকবে। তাঁর ভাষায়ঃ "ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। ...কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক বিশেষতঃ বর্তমানকালে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ...যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। ...জগতের সাধুপুরুষদের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। ঐরূপ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ...এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ...ইহাই বেদান্তের মূলকথা—ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না..।"[২৩]

স্বামীজীর পাশ্চাত্যবাসের অধিকাংশ সময়ই নিয়োজিত হয়েছিল এই চরম সত্তার উপলব্ধির বিষয়ে শিক্ষা দিতে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মানুষের চিন্তা, এষণা ও আবেগকে পরিশুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত আত্মাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ, অনিত্য থেকে নিত্যে উত্তরণই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা। জগৎ সম্বন্ধে এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব কোপার্নিকাসীয় বিপ্লবের চেয়েও অনেক সুদূরপ্রসারী; স্বামীজী যেমন বলতেন, দৃষ্টিভঙ্গির এই আমূল পরিবর্তনই ধর্মচর্চার মূল লক্ষ্য।

তিনি যেসব পথ বা যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল বহুমুখী। তিনি

শিখিয়েছিলেন ত্যাগ, অনাসক্তি, নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে বিচার, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম, ভক্তিযোগ—সংক্ষেপে, মনকে শুদ্ধ ও উন্নত করার সমস্ত পথই ছিল তাঁর শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত। শুধু কতগুলি ভাল ভাল চিন্তা বা অস্বচ্ছ অনুভব নয়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষের মনকেই পরিবর্তিত করে ফেলতে হবে, নিজেকে এক নতুন সত্তায় উত্তীর্ণ করতে হবে। যে জগৎকে আমরা দেখি, কান্ট যাকে অপরিবর্তনীয় বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তা আমাদের অস্থির মনেরই প্রতিফলন। মন যখন বিশুদ্ধ হবে, চরম সত্তার উপলব্ধি তখনই সম্ভব। আসলে, চরম অতীন্দ্রিয় অবস্থায় মন বিলীন হয়ে যায়, এবং সাধক তখন নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেন চরম সত্তার সঙ্গে একীভূত রূপে। এটিই হল ধর্মের মূল। "যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট; কিন্তু যে বলে, 'আমি ধর্ম বিশ্বাস করি', অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।"[২৪]

এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে, বিজ্ঞানের কাছে যা অজানা। এই যে বিশ্বজগৎ, সুদূর অতীত থেকে যা আবর্তিত হয়ে চলেছে, এর মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলেরও একই মত। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "...সব কিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা। সর্বসংহারক কাল আসিয়া সবই গ্রাস করে, কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না...",[২৫] মায়ার জগতে সব কিছুর কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা, এমন কি মায়ার নিজেরও কোন কারণ নেই। এর অর্থ হল, মানবীয় যুক্তির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না; জড়ের মধ্যেও পাওয়া যাবে না সব কিছুর সমাধান, ব্যক্তি-ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী ইচ্ছার মধ্যে বা দর্শনের তর্কবিতর্কের মধ্যেও নয়—এ সমাধান পাওয়া যাবে তখনই, মানুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে শিখবে, ব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে পারবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি মুক্ত নই? অদ্বৈতবেদান্ত কি এই শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছে না? স্বামীজী বার বার এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেনঃ "আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব, তাহা নয়; আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ—এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম; ...আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে

হইবে; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটিকে সরাইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।"[২৬]

মুক্তির জন্য এই যে সংগ্রাম, এর মধ্যেই রয়েছে যথার্থ নৈতিকতা, কারণ এ তো শুধু স্বীয় মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস নয় এ সকলের মুক্তিরই প্রয়াস। সকল জীবের একত্ব ও প্রতিটি প্রাণীর অন্তর্নিহিত দেবত্বকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করার মধ্যেই এই প্রয়াস নিহিত। জগতেব নিম্নতর সত্তাকে এই প্রয়াস অস্বীকার করে। বলছেন স্বামীজীঃ "...সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।"[২৭] "যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে—আকৃতিতে, সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।"[২৮] পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্যের অবতরণের কথাই স্বামীজী বলেছেনঃ—চেতনার উত্তরণে যে স্বর্গ আবির্ভূত হয়। সনাতনী খ্রীষ্টধর্মের কল্পিত অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের ধারণাকে তিনি বার বার খন্ডন করেছেন। এই সব ধারণার দ্বারা যে নৈতিকতাকে রক্ষা করা যায় না সেকথা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন। "আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটো করিতে হয় না; বরং নীতির ভিত্তিভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হইতে হইবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল।"[২৯]

কিন্তু, হৃদয়াবেগকে ধ্বংস করে অত্যধিক জ্ঞান ও যুক্তির প্রাধান্য স্বামীজীর কাছে ভাল ঠেকেনি। তাঁর ভাষায়ঃ "এখন প্রয়োজন—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা

কখন থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে।"৩০

বিজ্ঞান ও যুক্তির অনুসারী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, অনুসন্ধান, প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রাদি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শনের সামঞ্জস্য রয়েছে, কোনও বিরোধ নেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ তার সমাধান স্বামীজী এইভাবে করেছেন যে এগুলি একই চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। তাঁর ভাষায়ঃ "মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসার কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র। অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।"৩১

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর শিক্ষাদানের পূর্ণ বা আংশিক আলোচনা সংক্ষেপে করা কঠিন। অদ্বৈতবেদান্তের যে ব্যাখ্যা তিনি জগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন, পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা নতুন আলো নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ সম্বন্ধীয়, এমন কি যুক্তি হৃদয়াবেগ সম্পর্কীয় সকল সমস্যার সমাধান তারা খুঁজে পেয়েছিল স্বামীজীর মধ্যে। অদ্বৈতবেদান্তের ভূমিতে দাঁড়িয়েই তারা সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে পেল; ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগৎ, যুক্তি ও বিশ্বাসের জগৎ, জড় ও ব্যক্তি-ঈশ্বরের জগৎ—সব কিছুই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এ সবই আপাত সত্য; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ব্যাখ্যা পেতে গেলে এসবের একটিমাত্রকে সম্পূর্ণ বলে ধরলে চলবে না। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহা দ্বারা যে

সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। ...সেই নির্গুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা...।"[৩২]

স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে এটাই দেখা যায় যে, গত তিনটি শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যজগৎ যেসব সমস্যায় আবর্তিত হচ্ছিল—ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমস্যা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সঙ্ঘাতের সমস্যা—তার সব কিছুই অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে সমাধান পেতে পারে। তিনি সত্যই বুঝেছিলেন যে, বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈত দর্শন ও ধর্মই একান্ত প্রয়োজনীয়। "...যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তি-বিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।"[৩৩] "ইওরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই ইওরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।"[৩৪]

এবং, সম্ভবত এজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই মহান আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগতে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জাতীয় জীবনের এক চরমতম অন্ধকারের দিনে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অজ্ঞতা, রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, নৈতিক শিথিলতা, হীন স্বার্থপরতা ও অভাবনীয় অযোগ্যতার বিষবাষ্পে যখন মোগল সভ্যতার প্রাচীন সৌধ ভেঙে পড়েছে—এমনই একদিনে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুষ্টিমেয় সৈন্যের হাতে পরাজিত হলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ইংরেজ শাসনের এই নতুন অধ্যায়কে স্বাগত জানালেন অনেকেই নতুন প্রত্যাশায়।

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মৃতপ্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজ ও জনজীবনে এক নতুন প্রাণস্পন্দন দেখা দিল—শুরু হল আধুনিকতার পাদপীঠে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় বিধি ও নীতিশাস্ত্রের এক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ মূল্যায়ন। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত হল ভারতবর্ষে—এর নাম নবজাগরণ বা 'Renaissance'। এই নবজাগরণ বাঙালী চিত্ত আলোড়িত করে যে নতুন ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল তারই উচ্ছ্বসিত ধারায় অবগাহন করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত নবজন্ম লাভ করল। সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে লাগল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় লাঞ্ছনার স্বরূপ এবং ভারতবাসীর মুক্তির আকুতি। ধীরে ধীরে ভারতবাসী তখন সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছে। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষা। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া কৃষক-শ্রমিকদের বিরাম-হীন বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম। ১৮৫৭-র দেশজোড়া অভ্যুত্থানের পরও চলল বিদ্রোহের মিছিল। বস্তুত ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক উদ্দীপনাময় যুগের সূত্রপাত হয়েছিল—স্বাদেশিকতার জোয়ার সর্বত্র। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা, কেশবচন্দ্রের ধর্ম নীতি সেবা ও দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা, বাংলা নাট্যমঞ্চের কার্যকলাপ, 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা, 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের নিত্য নতুন চমক জাতীয় চেতনাকে তখন নানা ভাবে সঞ্জীবিত করছে। শ্রীরামকৃষ্ণের

জীবন, বাণী ও হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে লোক ছুটছে দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে, অসাধারণ মেধা, মনীষা ও বাগ্মিতা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দেশে শুরু করেছেন 'বাস্তববাদী' রাজনৈতিক আন্দোলন। এক কথায়, তখন কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন চরম উদ্দীপনাময় স্বাদেশিকতার রঙে রঞ্জিত।

সমকালীন কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, গণ-আন্দোলন, সাহিত্যচর্চা এবং বিদেশী শাসকের স্বৈরাচারী নীতি ছাত্রাবস্থাতেই স্বামী বিবেকানন্দকে একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকে পরিণত করেছিল। শিমলার ডানপিটে নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র একজন জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না, তিনি তাঁর জীবন বাণী ও কর্মের দ্বারা ভারতবাসীর নবলব্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নানা ভাবে সঞ্জীবিত করেছেন--যার ফলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এক প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করেছে।

স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রত্যয় হল জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের এক শ্রেষ্ঠ অবদান ; আর এই মুক্তির সাধনা হল বেদান্তভিত্তিক। উপনিষদ্ বলছেঃ "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্"[১] —মন, বাক্, শ্রোত্র ও বিজ্ঞান—এ সকলের উপর আধিপত্যই হল 'স্বারাজ্য' লাভ। এই স্বারাজ্যের পর ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ হয়। হিন্দুদর্শনে এটাই হল সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর, অর্থাৎ বিশ্বচেতনার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে, কেবলমাত্র সর্বপ্রকারের বন্ধন মুক্ত হওয়াই নয়—বরং বিশ্বের সর্বচরাচরের সঙ্গে প্রকৃত একাত্মবোধ স্থাপন। এই হল স্বাধীনতা বা স্ব-অধীনতা। হিন্দুদর্শনে 'স্ব-অধীনতা'-র অর্থ হল বিশ্বসত্তার কাছে ব্যক্তিসত্তার আত্মসমর্পণ। সুতরাং স্বরাজ বা স্বাধীনতা কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিভাষা নয়—একটি আধ্যাত্মিক শব্দ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মানবসমাজের উন্নয়নের ঊর্ধ্বতন স্তরে 'স্বরাজ' কোন প্রকার বস্তুতান্ত্রিক সামগ্রী নয়—'স্বরাজ' হল আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও যৌগিক অগ্রগতি ("বন্দে মাতরম্", ৩।৭।১৯০৭)।[২] বিপিনচন্দ্র পাল বলছেনঃ এই স্বরাজ লাভ হলেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে।[৩]

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধন মোচনই চাননি, মানুষের বৈষয়িক ও সামাজিক মুক্তিও তাঁর কাম্য ছিল। স্বাধীনতা বলতে স্বামীজী কি বুঝতেন তা তাঁর বহু চিঠিপত্র ও রচনাদিতে প্রকাশ

পেয়েছে। তাঁর মতেঃ "উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।"[৪] আবার, "সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।"[৫] তবে বলে রাখা দরকার যে স্বাধীনতা অর্থে স্বামীজী কখনই স্বেচ্ছাচার বোঝেননি।[৬]

স্বামীজী বলছেন যে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা উপনিষদেই লিখিত আছে। কিন্তু, এবারে প্রশ্নঃ পরাধীন জাতির পক্ষে কি সত্যই দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব? স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই এই চরম সত্যটি জানতেন যে, পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির স্বাধীন চিন্তা বা কর্মের অধিকার নেই বা তার পক্ষে নিজের ইচ্ছামতো শরীর, বুদ্ধি বা ধন ব্যবহারেরও সুযোগ নেই—সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই তিনি ১৯০১ সালে ঢাকায় প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেনঃ "India should be freed politically first."[৭] মনে পরাধীনতার জ্বালা ছিল বলেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী—অন্য জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও তিনি হর্ষোৎফুল্ল।[৮] ১৮৯৮ সালের ৪ঠা জুলাই শ্রীনগরে পালন করলেন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। "To The Fourth of July" কবিতার মাধ্যমে অভিনন্দন জানালেন আমেরিকার ইতিহাসের চিরস্মরণীয় এই দিনটিকে এবং এরই সাথে পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা কামনা করলেন। তাই রোমাঁ

রোলাঁ সত্যই ভ্রান্ত যখন তিনি লিখলেন যে, স্বামীজীর মধ্যেঃ

"There was no thought of *Hind Swaraj*, of the political independence of India."[৯] দেশমাতৃকা ছিলেন "queen of his adoration", "India was his day-dream, India was his nightmare" —ভারতের সমাজ ছিল তাঁর শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী —এবং অতি শৈশবকাল থেকেই পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিতা ভারতমাতার সর্বাত্মক মুক্তির স্বপ্ন তিনি দেখতেন। ১৮৬৭ সালে অখন্ড ভারতবোধ, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং স্বদেশী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য দূর করে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় স্বদেশী শিল্পের পুনরুত্থান, কৃষি, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগীতের মাধ্যমে হিন্দুমেলা জাতীয় জীবনে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। বালক নরেন্দ্রনাথের সংগেও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা ও জাতীয় ব্যায়ামাগারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১০] এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীও তাঁর খুব প্রিয় ছিল।[১১]

ছাত্রসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালে আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে "ছাত্র সভা" বা "Students' Association" প্রতিষ্ঠিত হলে পদচ্যুত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথের ভারতীয় ঐক্য, শিখজাতির অভ্যুদয়, ম্যাৎসিনীর জীবন, চৈতন্য প্রভৃতি বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রসমাজ ভীড় জমাত ছাত্রসভার অধিবেশনে। দেশপ্রেমের তপ্ত আগুন জ্বলত সকলের বুকে। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার নিয়মিত শ্রোতা।[১২]

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. এবং শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংকলিত 'সংগীত-কল্পতরু' পুস্তকটি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের অন্যতম নজির।

এই সংগীতগ্রন্থটি মূলত স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা সংকলিত "কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায়"[১৩] বৈষ্ণবচরণ বসাক তা শেষ করেন। এই পুস্তকে জাতীয়, ধর্মীয়, শ্যামা, কৃষ্ণ, প্রণয়, ইত্যাদি বহু বিষয়ে সংগীত সংকলিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রথমেই রয়েছে জাতীয় সংগীত। হেমচন্দ্রের "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে"—গানটি দিয়ে এর সূত্রপাত। এছাড়া, এতে শিবনাথ শাস্ত্রীর "কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ তপন", দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি", সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারত সন্তান", মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন", রবীন্দ্রনাথের "অয়ি বিষাদিনী বীণা", "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" প্রভৃতি বহু জাতীয় সংগীত স্থান পেয়েছে। এই বিভাগের অনেকগুলি গানের তলায় শুধু 'হিন্দুমেলা' লেখা রয়েছে। মনে হয়, এগুলি হিন্দুমেলায় গীত হত। এই সব জাতীয় সংগীতের পর ধর্মসংগীত স্থান পেয়েছে। সুতরাং এ সময় স্বদেশ-চেতনাই যে নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল এই সংকলনটিই তার বড় প্রমাণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠে বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের মেধা এবং চৈতন্যের প্রেম—এই মহাত্রিবেণীর সমন্বয়ে নবভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা। পদব্রজে পরিব্রাজকবেশে ভারত পরিক্রমায় বের হয়ে সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ নিজ চোখে দেখে এলেন ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় সারা দেশ কিরকম স্থবির হয়ে পড়েছে—দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, অজ্ঞানতা, অসারতা, পরনির্ভরশীলতা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং নানা ধরনের অশিক্ষা কুশিক্ষায় মগ্ন সারা জাতি—তমোগুণে আচ্ছন্ন সারা দেশ। দেশের অভ্যন্তরে এই অবস্থা চলছে, আর বিদেশে ভারত সম্পর্কে চলছে নানা অপপ্রচার—ভারতকে বিশ্বসমাজে হেয় করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলেই যে দেশের এই অবস্থা তা তিনি জানতেন—তাঁর চিঠিপত্র এবং কথাবার্তাতেও প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ "ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।" আর এক জায়গায় তিনি বলছেনঃ "...ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রাণ্ডির বোতল—আর কিছু নয়। ...ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই

নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এ-দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে...।"[১৪] সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি জাতীয়তাবাদী যুব-সন্ন্যাসীর এই অগ্ন্যুদ্গিরণ যেন আগামী যুগের বিপ্লববাদের পূর্বাভাষ। ১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবর মিস মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে[১৫] স্বামীজী ভারতে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি, চরম অপদার্থতা এবং ঘৃণ্য ও স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক অপশোষণের এক মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। ছত্রে ছত্রে পরাধীনতার জ্বালা আর হতাশা—"মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি...ভগবান থাকেন।" ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন যে স্বামীজীর এই চিঠির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। Press Act, Arms Act, পুণা প্লেগ দমনে সরকারী অত্যাচার ও নারীর শ্লীলতাহানি, তিলকের কারাবরণ, লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতি ও কলকাতা কর্পোরেশন আইন, ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশের দুর্ভিক্ষ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারী নীতি—এ সবের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর চিঠিতে।

পরাধীনতার এই জ্বালা থেকে মুক্তির উপায় কি? ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষকে প্রকৃত সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে? বস্তুত, কংগ্রেস তখন ছিল নরমপন্থীদের (moderates) হাতে। ইংরেজি শিক্ষিত ধনিকশ্রেণী পরিচালিত ও ধনিক স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের খেটে খাওয়া বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্কই ছিল না (ইন্দুপ্রকাশ, ১৩.১১.১৮৯৩)।[১৬] তাঁরা মনে করতেন যে, সমাজের নিম্নস্তরের সর্বহারাদের দুর্দশা ও অজ্ঞানতা দূর করা অনাবশ্যক এবং সেজন্য পরিশ্রম করার এখনও সময় আসেনি।[১৭] তৎকালীন কংগ্রেস একটা তিনদিনের রাজনৈতিক 'তামাশা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইংলন্ড ছিল

তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা এবং অনুপ্রেরণার উৎস—তাঁরা কঠোরভাবে সরকারের সমালোচনাও করতে পারতেন না। এর লক্ষ্য (কিছু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা লাভ) ভ্রান্ত, গঠনতন্ত্র (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) অবৈধ এবং কর্মপদ্ধতি (আবেদন-নিবেদন— "a policy of 3 Ps") ছিল নিন্দনীয়। স্বামীজী কংগ্রেসের দুর্বল মত, পথ ও নীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় তিনি কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তকে বললেনঃ "...বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে। গোড়ায় তাদের পেটপুরে খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথ করে নেবে। যদি কংগ্রেস তাদের জন্য কিছু করে তবেই কংগ্রেস আমার সহানুভূতি পাবে। সেই সঙ্গে আমাদের ইংরেজদের গুণগুলোও আত্মসাৎ করতে হবে।"[১৮] কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে অধিক ক্ষমতার দাবি জানাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নন—এর বিরুদ্ধে স্বামীজী বলছেনঃ "আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত নয়। ...দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।"[১৯] কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন যে জনসাধারণের দুর্দশা বা অজ্ঞানতা দূর করার সময় এখনও আসেনি—ধনীদের মতো জ্ঞানার্জনের সমান সুযোগ পেলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেনঃ "তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন?"[২০] কংগ্রেস নেতাদের তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, কেবলমাত্র দিনরাত "এ দাও, ও দাও" বলে চিৎকার করলে কিছু হবে না,[২১] গোটা কতক লোককে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়ে দিলে বা কিছু রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করলে স্বাধীনতা আসবে না।[২২] "এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগমহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি 'আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও' বল্লে কি চলে?"[২৩] আগে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের দিনে

তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, সেবা করতে হবে—নিজেদের মানুষ হতে হবে—তা না হলে ইংরেজের দেওয়া জিনিস তো রাখাই মুশকিল।"[২৪] ..."আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, ...শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, ...ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?"[২৫] বেনিয়ার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে লাভ নেই—"ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে মিছামিছি হৈ চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলা-বাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent ব'লে declare করুক, হেঁকে বলুক, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম', আর সমস্ত স্বাধীন Government-কে নিজেদের declaration-পত্র পাঠিয়ে দিক; তখন একটা হৈ চৈ উঠবে। ...কেবল কি গলা-বাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে। বিধিমতে কাজ ক'রে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।

"...পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে! ...কংগ্রেস জোর-গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগ্নীদের মতন ব'সে ব'সে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?"[২৬] —তাহলে দেখছি ১৮৯৩ সালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের মতামতের সঙ্গে স্বামীজীর প্রবল সাদৃশ্য। অরবিন্দ ঘোষের মতো সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও চান যে কংগ্রেস গণমুখী হোক, রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বা ইংলন্ডের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করে আত্মশক্তির বলে ("purification by blood and fire" —অরবিন্দ) নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুক।

"জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় খুঁজতেই" ১৮৯৩ সালে স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন। বস্তুত, আমেরিকায় স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ীর সম্মানলাভ এবং বহির্বিশ্বে স্বামীজীর প্রচারকার্য জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়—জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর। মনে প্রশ্ন জাগতে পারেঃ বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে অথবা বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কি সার্থকতা? দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে—প্রথমত, ইংরেজ

শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট—দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বীর্যবত্তা—সব কিছু সম্পর্কেই একটা হীনম্মন্যতা বিদ্যমান; দ্বিতীয়ত, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত—বিদেশীর চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ, এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না—যা যে কোন মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের অনেক নজির মিলবে। বিদেশে বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীকে দিল গৌরব, ঐক্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়, সুদৃঢ় হল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল। বহু বৎসরের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা সমবেতভাবে যা করতে পারেননি, বিবেকানন্দ তা করলেন। এ সম্পর্কে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালের অমৃত বাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্যঃ

"He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders put together."[২৭]

"সাইক্লোনিক মঙ্ক" বিবেকানন্দ সত্যিই এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের বুকে। 'পুণ্যভূমি' ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হীনম্মন্য জাতির সামনে প্রচার করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুললেন। চাবুকে চাবুকে সচকিত করে ভারতবাসীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে কাপুরুষতা, পরানুবাদ, পরানুকরণ এবং দাসসুলভ দুর্বলতাই জাতির পরাধীনতার কারণ। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—"এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?" জাতিকে ডাক দিয়ে তিনি বললেনঃ "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি...।"[২৮] জনসাধারণের সেবা করে তাদেরকে 'মানুষ' করে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি আসবে। স্বামীজী 'মানুষ' চেয়েছিলেন—মানুষ,

খাঁটি অকপট মানুষ, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, যারা অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত—যদি এমন একশ আত্মবিশ্বাসী, আদর্শনিষ্ঠ যুবক মেলে তবে ভারতের মুক্তি হবেই। ভাবীকালের দেশপ্রেমিকদের সামনে তিনি রাখলেন স্বদেশপ্রেমের এক নতুন আদর্শ। পশ্চিমের আমদানি-করা দেশপ্রেম নয়, তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতো তিনদিনের জন্য দেশপ্রেমিক সাজা নয়—প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে গেলে চাই তিনটি জিনিসঃ হৃদয়, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা।[২৯] স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী, ত্যাগ ও বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট ক্ষীয়মাণ মুমূর্ষু জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অত্যুগ্র আশার সঞ্চার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করল। স্বামীজী তাঁর জীবিতাবস্থাতেই (১৮৯৭) প্রত্যক্ষ করলেন যে, "...আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। ...কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না।"[৩০]

জাতি সত্যই সেদিন জেগেছিল—স্বামীজীর প্রেরণায় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এলেন। তাঁর দেহ-ত্যাগের পরেই জাতি দেখল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদীদের অভ্যুদয় এবং নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তিলক ও গান্ধীর আবির্ভাব। ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়েন্ডেল টমাস লিখিত "Hinduism Invades America" নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলেই ঘটেছেঃ

"Anarchist movement in Bengal and the more recent drives for 'Civil Disobedience' which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale (p. 91)."[৩১]

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার প্রয়োজন বস্তুত ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই মহত্তর জিনিসটিই যুগিয়েছেন স্বামীজী। জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে সরকারও ওয়াকি-বহাল ছিলেন। বিপ্লবীদের আস্তানা খানা-তল্লাশ করতে গিয়ে পুলিশ বিবেকানন্দের পুস্তিকাদি পেত। স্বামীজীর উপরেও পুলিশী দৃষ্টি ছিল

এবং তাঁর চিঠিপত্রও খোলা হত।[৩২] সিডিসন কমিটির রিপোর্ট[৩৩] (১৯১৮), উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেম্‌স্ ক্যাম্পবেল কার (I.C.S.) সম্পাদিত Political Troubles in India 1907-1917[৩৪] এবং সরকারী বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে[৩৫] বিপ্লব-আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৮ সালে ঢাকা সেলুলার জেলে বন্দী বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীকে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "তুমি কি বৈদান্তিক? ...তুমি কি বিবেকানন্দের ভক্ত?"[৩৬] বেলুড় মঠও পুলিশী সন্দেহ থেকে রক্ষা পায়নি।[৩৭]

এবার স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, নিজে পূর্ণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এবং জনজীবনে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রেরণাস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও, কেন তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিলেন না?[৩৮] প্রথমত, স্বামীজী সন্ন্যাসী, তাঁর কাছে ঈশ্বরই সত্য—আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অজ্ঞানতা দূর করাই তাঁর কাম্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হল 'man-making' —তাঁর মতে দেশের ভালমন্দ, স্বাধীনতা-পরাধীনতা দেশবাসীর উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণ যে শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত, দেশে সেই শাসনব্যবস্থাই স্থাপিত হয়।[৩৯] উদাহরণ-স্বরূপ, তিনি চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসের কথা বলেছেন কারণ চীন "could not produce men equal to the system."[৪০]

সুতরাং আগে চাই মানুষ। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে বৃথা সময় ও শক্তি ক্ষয় করা অপেক্ষা 'মানুষ' তৈরী করে জাতি গঠন

করা অধিকতর ফলপ্রসূ নয় কি? তবে সরাসরি রাজনীতির কথা না বললেও বাক্য প্রয়োগের সতর্কভঙ্গিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—যেকথা তিনি সরাসরি বলতে পারেননি, তা ঘুরিয়ে বলেছেন। "বর্তমান ভারত"-এ স্বামীজী বলছেন যে স্বজাতি-বাৎসল্য এবং বিজাতির প্রতি বিদ্বেষ—এই দুই কারণে জাতীয় ভাব বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলে গেলেনঃ "একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক-জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির...এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।"[৪১] এতকথার পর স্বামীজী কিন্তু একবারও বললেন না যে ভারতের উন্নতির উপায় হল একান্ত স্বজাতি-বৎসল ও একান্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়া। সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে স্বামীজীর রচনাবলীতে এ ধরনের অসংখ্য নজির মিলবে। তবে স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ভারত স্বাধীন হবেই। ১৮৯৭ সালে বেলুড় মঠে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন যে, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণত দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।. . . not with bloodshed".[৪২] স্বামী গম্ভীরানন্দজীও জানিয়েছেন যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এ কথাটা বহুকাল প্রচলিত ছিল যে এক "অভূতপূর্ব উপায়ে" ভারতের স্বাধীনতা আসবে।[৪৩] ভারতের স্বাধীনতা কখনই বিনা রক্তপাতে অর্জিত হয়নি--তা ঠিকই; তবে এই চরম সত্যটিকেও স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের মুক্তিসংগ্রামের তুলনায় সে রক্তপাত বা আত্মদান ব্যাপকতার দিক থেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর ভূমিকা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি "আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক।[৪৪] স্বামীজীর কার্যাবলীর মূল্যায়ন করলে এই উক্তিটির যথার্থতা মিলবে।

প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতি জাতি থাকলেও 'ভারতীয়' নামে কোন জাতি ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজ, বিদ্যাসাগর-দয়ানন্দের আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কর্মপ্রয়াস বা কংগ্রেসী রাজনীতিও তখন সমগ্র দেশে কোন সজীবতা আনতে বা কোন জাতির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় চিকাগো ধর্মমহাসভার কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করেন। জগৎসভায় হিন্দু-ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরববোধের মাধ্যমে এক ঐক্য গড়ে ওঠে। তাঁকে অনেকে "হিন্দু জাগরণের" নেতা বলে অভিহিত করে থাকেন—কিন্তু স্বামীজীর মতে 'হিন্দু' কোন বিশেষ ধর্মীয় শব্দ নয়।[৪৫] তাঁর কার্যকলাপে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিলেও, "তাঁর আহবান কেবল হিন্দুদের জন্য ছিল না। তিনি সর্বদাই 'ভারত' শব্দ ব্যবহার করতেন, এবং ভারতীয় জনসংখ্যার যখন হিসাব দিতেন, তখন মুসলমানদের বা খ্রীস্টানদের সংখ্যাকে বাদ দিয়ে বলতেন না।"[৪৬] এছাড়া, তাঁর প্রচারিত 'নববেদান্ত' বিশেষ কোন ধর্মমত নয়—এই 'সর্বাবয়ব' বেদান্তের দ্বারা তিনি মানবধর্ম প্রচার করে বিশ্ববাসীকে কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু, ১৮৯৮ সালের ১০ই জুন মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"-র পরিকল্পনা সংবলিত পত্রটি জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দের স্বদেশদ্যোতনার আর এক চিহ্ন[৪৭] এবং এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সূত্রও নিহিত আছে।

দ্বিতীয়ত, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে না দাঁড়িয়েও স্বামীজী বললেন যে, "ভারতের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের কুটিরে।" ভারতের তথাকথিত নীচজাত শ্রমজীবীরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ—প্রকৃত জাতি গঠন করতে হলে এই বিরাট জনসমষ্টিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্ন দিয়ে 'মানুষ' করতে হবে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কেউই গণশক্তির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। পরবর্তীকালে গান্ধীজী জনসাধারণের ভিত্তির উপর জাতীয়তা-বাদের সূচনা করেছিলেন।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করে তিনি ভারতবর্ষে আবেগময় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন। তিনি মনে

করতেন যে কেবলমাত্র অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করেই জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব।[৪৮] অতীতে আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করেই ভারতের গৌরব ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, আধ্যাত্মিকতাই অতীতে ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল—সুতরাং এই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মই জাতীয় জীবনের ধারক। কোন প্রকার সংস্কারসাধন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম বলতে স্বামীজী কখনই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানাদি বোঝেননি। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন পৃথিবীর সর্বধর্মের মূলতত্ত্বকে উদারভাবে গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোপলব্ধি। তাই তাঁর ধর্ম হল "man-making religion" —জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি ধর্মকে দেখেছেন। নিঃস্বার্থ মহান ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কারসাধন বা স্বাধীনতা সংগ্রামও তাই তাঁর কাছে ধর্মের অন্তর্ভূক্ত।[৪৯] এছাড়া, স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে "Renaissance precedes revolution"—আর এই renaissance নিঃসন্দেহে "spiritual renaissance." ইতিহাসের মননশীল পাঠকমাত্রই জানেন যে ভারতে ধর্মবিপ্লবের পরেই সাধিত হয়েছে রাজনৈতিক বিপ্লব। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র বিশ্বের জন্য ভারতের একটি বিশেষ বাণী আছেঃ বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে হবে। "...আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই ; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।"[৫০] এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় চরমপন্থী রাজনীতিবিদ্‌দের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। চরমপন্থী অরবিন্দের মতে জাতীয়তাবাদ কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, "Nationalism is a religion that has come from God."[৫১]—সনাতন ধর্মই হল জাতীয়তাবাদ।[৫২] বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেনঃ "This new Nationalist movement in India is essentially a spiritual movement."[৫৩] এই সকল নেতৃমণ্ডলী বিশ্বের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতেও বিশ্বাসী ছিলেন।[৫৪]

বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হল আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ, কারণ স্বামীজীর ডাকে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একটি গোঁড়া জাতীয়তা-বাদ গড়ে তোলে এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়।[৫৫]

চতুর্থত, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতেও ভারতভূমি মাতৃরূপে প্রতিভাত। অতীতের গৌরবমণ্ডিত দেশমাতাকে তাঁরা উভয়েই অধিকতর গৌরবশালিনী দেখতে চেয়েছিলেন।[৫৬] দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে স্বামীজী বলছেন যে, অন্যান্য দেবদেবী বাদ দিয়ে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশজননীই সকলের উপাস্যা হোন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি বঙ্কিমের "সন্তান ধর্ম" পালন এবং স্ত্রী-জাতিকে মহামায়া ও দেশজননীর জীবন্ত প্রতীকরূপে সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দেন।[৫৭] "বর্তমান ভারত"-এর উপ-সংহারে তিনি স্পষ্টই বলেনঃ "তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত।" বলা বাহুল্য যে, দেশকে মাতৃরূপে জ্ঞান করে "সন্তান ধর্ম"-এর সাহায্যে দেশ-মাতৃকার বন্ধনমোচনের আদর্শ প্রচারে অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টি কিন্তু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে তিনি বাংলার কথাই বলেছেন এবং তৎকালীন বাংলারই জনসংখ্যার হিসাব দিয়েছেন। এছাড়া, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিও বাংলার বুকে উচ্চারিত হয়নি (৭ই আগস্ট, ১৯০৫)। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টি ছিল সমগ্র ভারতের দিকে এবং তিনিই মাতৃপূজার আদর্শকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন। পরবর্তীকালে চরমপন্থী রাজনীতিকগণ এই আদর্শকেই প্রচার করেছেন—অরবিন্দ ঘোষ স্বদেশকে 'মা' বলে পূজা করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও সমতলভূমির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন ভারতমাতার প্রেম ও জীবনীশক্তি। ভারতের ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্প ও ধর্মের মধ্যে তিনি দেখেছেন মায়ের পবিত্র জীবনকথা, ভাবাবেগ, অভিজ্ঞতা ও সুসংবদ্ধ আত্মার বহিঃপ্রকাশ।[৫৮]

পঞ্চমত, নির্বীর্য জাতির প্রাণে বীর্যবত্তা বা ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজের সঞ্চার করা স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে 'অভয়ম্'-ই হল বেদ-বেদান্তের মর্মবাণী—গীতার মর্মও

হল পুরুষার্থ ও শক্তির উন্মেষ। তাঁর জীবন, রচনা ও সাহিত্যের এক প্রধান উপজীব্য বিষয় হল বীররস। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাম নয়—রাবণই তাঁর কাছে প্রধান চরিত্র।[৫৯] লক্ষ্মণ চরিত্র তাঁর কাছে কাপুরুষরূপে প্রতিভাত, স্বদেশ-দ্রোহী বিভীষণ তাঁর কাছে "নেমকহারাম, traitor"।[৬০] গীতার শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, প্যারাডাইস লস্টের শয়তান, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, ইতিহাসের বিজয় সিংহ, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, নেপোলিয়ন, সীজার, চেঙ্গিস খাঁ, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীর-চরিত্রগুলি তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে রণক্ষেত্র--হীনবীর্য জাতিকে বহুবার বহুভাবে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছেন; বলেছেনঃ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন শক্তির উপাসনা--লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু এবং বজ্রদীপ্ত উপাদানে গঠিত মন। তিনি বলেছেনঃ সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল—দুঃখ মৃত্যু এর নিত্যসঙ্গীঃ

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

বেদান্তের 'অভীঃ' মন্ত্র ও মহাকালীর প্রলয়মূর্তি—একই সত্যের নামান্তর। দুঃখ-মৃত্যু ও বেদনার এই ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই বিবেকানন্দ বাংলার অকুতোভয় বিপ্লববাদী ও স্বাধীনতাসংগ্রামীদের চিরনমস্য।

বস্তুত, স্বামীজীর দেশপ্রেম, স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল--কংগ্রেসী আন্দোলন, চরমপন্থী রাজনীতি ও বিপ্লববাদের উপর স্বামীজীর প্রভাব গভীর ও সুস্পষ্ট।

১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক মাস পরেই অমরাবতী কংগ্রেসে অশ্বিনীকুমার দত্ত মডারেট নিয়ন্ত্রণাধীন কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করে প্রকৃত গঠনমূলক কাজের দাবি জানান। পরবর্তীকালে কংগ্রেস

সত্যই স্বামীজীর আদর্শেই জনজাগরণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি গঠনে নেমেছিল।[৬১] এ বিষয়ে গান্ধীজীর নাম স্মরণীয়—তাঁর উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেছেন।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে হিন্দুধর্ম, অতীত ইতিহাস, ভিক্ষানীতি বর্জন ও আত্মশক্তির বলে স্বাধিকার লাভের উপর ভিত্তি করে যে চরমপন্থী দলের (extremists) উদ্ভব হয় তার মতাদর্শ ও কর্মপন্থার উপরেও স্বামীজীর প্রভাব লক্ষণীয়।[৬২] এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

"The fundamental point of difference between the older political agitations and the new Nationalist Movement is thus (1) its intensely spiritual and religious character as compared to the absolutely secular spirit of the former and (2) its strong grip on the actualities of Indian life and thought as against the imitative character of the older and earlier social and political activities."[৬৩] বস্তুত, এই দুটি বস্তুই স্বামীজীর দান।

বাংলার বিপ্লবীদের কাছে "Swami Vivekananda appeared ... to be more a political prophet than a religious teacher."[৬৪] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোপন আই. বি. রিপোর্টে উল্লেখিত আছে যে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পূর্বে (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) ১৯০১ সালে বাংলায় বিপ্লববাদ

প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ ঘোষ সুদূর বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে স্বীয় ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠান। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ঠাকুর পরিবারের কারও কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হয়েছিল তা স্পষ্ট করে জানা না গেলেও, এটা ঠিক যে ঐ একই সময়ে কলকাতা এবং বাংলার মফঃস্বলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলি স্পষ্টত বিপ্লববাদী সমিতি না হলেও, এদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।[৬৫] বলা বাহুল্য যে, গোয়েন্দা রিপোর্টের ১৯০১ সালটি ঠিক নয়, কারণ যতীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে কলকাতায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন তত্ত্বের" অনুকরণে স্বামীজীর আদর্শ ও অগ্নিময়ী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজীর জীবনকালেই বাংলার প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্র "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯০২, ২৭শে মার্চ, দোল পূর্ণিমা)।[৬৬] এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর মতেঃ "স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।"[৬৭] তিনি বলেন যে স্বামীজী দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ দিতেন; স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর এই ভাবাদর্শের কথা জানতেন এবং এ ব্যাপারে সরাসরি উৎসাহ দিতেন।[৬৮] ভগিনী নিবেদিতা "অনুশীলন সমিতি"-তে যাওয়া-আসা করতেন এবং স্বামী সারদা-

নন্দ এখানে গীতা পড়াতেন।[৬৯] স্বামীজীর জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্মতি না থাকলে তাঁদের পক্ষে নিশ্চয় এটা সম্ভব হত না। বিপ্লবী যাদুগোপাল বলেছেন যে, স্বামীজী সানন্দে এই তরুণের দলকে কাজের বহু উপদেশ দিতেন এবং সমিতির অনেকেই আগে থেকে বেলুড় মঠে যেতেন।[৭০] সতীশ-চন্দ্রের বিবৃতি থেকে আরও জানা যায় যে, "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ পরে তিনি জানতে পারেন যে বরোদা থেকে একটি দল (অরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ) কলকাতায় এসেছে। পরে দুইদল ব্যারিস্টার পি. মিত্রের[৭১] নেতৃত্বে এক হয়ে যায়। অরবিন্দ ঘোষ তখন পশ্চিম ভারতে ঠাকুর সাহেব[৭২] পরিচালিত গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—ইতিমধ্যেই তিনি সমিতির পুণা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিপ্লবসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গেও গোপন আলোচনা করেছেন।[৭৩] এগুলো নাহয় লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারের রাজনীতি, কিন্তু বোম্বাই-এর 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী দেশে ইতিমধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যে বিবেকানন্দের সঙ্গে তিলক, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা[৭৪] প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তিনি কি অরবিন্দের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সম্পর্কে একেবারেই

অজ্ঞ ছিলেন? সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ-প্রেরিত—যে অরবিন্দ ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত আছেন,—যতীন্দ্রনাথ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলে স্বামীজী তাঁকে কি বলেন বা বরোদা দলের সঙ্গে সংযুক্তির পর "অনুশীলন সমিতি"-র প্রতি স্বামীজীর কি মনোভাব ছিল? বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেনঃ "স্বামীজীর দেহান্তের পূর্বে 'সমিতি'র প্রতিষ্ঠা-কর্তারা সাক্ষাৎভাবে স্বামীজীর সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন; উপদেশ অনেক নিয়েছিলেন।"[৭৫] সুতরাং এ থেকে এটা অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে বরোদা দলের সঙ্গে সংযুক্তির পরও "অনুশীলন সমিতি"-র প্রতি স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল—বিশেষত স্বামীজীর দেহান্তের পরেও যখন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ "অনুশীলন সমিতি" এবং "বিবেকানন্দ সোসাইটি"-তে গীতা পড়াতে আসতেন।[৭৬] প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও বিপ্লব আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। বিপ্লবী যাদুগোপালের মতেঃ "রাজনীতির আত্মদানমূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি ছেয়ে ছিলেন। ...বহুদিন পর্যন্ত স্বামীজীর প্রভাব বাংলার রাজনীতিতে ছিল।"[৭৭] ১৯০১ সালে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে হেমচন্দ্রের বিবৃতিটি স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা-স্পৃহার এক উল্লেখযোগ্য নজির। পরবর্তীকালেও এ সম্পর্কে হেমচন্দ্র বলেন যে, "স্বামীজী বলেছিলেনঃ 'পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।' সেদিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব-ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।"[৭৮]

স্বামীজীর উগ্র রাজনৈতিক চেতনার জ্বলন্ত প্রতীক নিবেদিতা। বিপ্লব আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। বস্তুত স্বামীজীর মানসকন্যার

পক্ষে স্বামীজীর উগ্র রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়—স্বামীজী যদি সূত্র হন, তবে নিবেদিতা তার ভাষ্য। স্বামীজীর জীবনকালেই নিবেদিতা রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই স্বামীজীর অজানা ছিল না। স্বামীজী জানতেন যে সম্পূর্ণ ধ্যানধারণা ও তপস্যার জীবন নিবেদিতার নয়—নিবেদিতা কর্মী। তাঁর প্রয়োজন জগন্মাতার উপাসনা—শক্তির আরাধনা। এই কারণে নিবেদিতাকে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এছাড়া স্বামীজী কখনও নিবেদিতার প্রতিবন্ধক হননি, তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিয়েই গেছেন। "তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামত চল, নিজের কর্ম বাছিয়া লও"—এ নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর কথা (২৫।৮।১৯০০)।

স্বামীজীর ভ্রাতা প্রখ্যাত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। এগুলি ভূপেন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ করেননি—অন্যের মুখ থেকে শুনেছেন। বর্তমানে ঐসকল তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের কোন পথ খোলা না থাকলেও, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী নেতৃমন্ডলী তা গ্রহণ করেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের মতেঃ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিনকে স্বামীজী নাকি বলেছিলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে তিনি বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন এবং বন্দুক-নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিম-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী দেখলেন যে দেশ প্রস্তুত নয়—তাই তিনি জাতি গঠনের কাজে হাত দিলেন।[৭৯] বিপ্লবী দল গড়ার কাজে স্বামীজী আর কি করেছিলেন, তা তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনকে বলেন, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির জন্য তিনি তা ভূপেন্দ্রনাথকে বলেননি।[৮০] দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে এক সময় স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ঠিকই—তাদের সঙ্গে গোপনে বিপ্লব সংক্রান্ত কিছু আলোচনাও অসম্ভব নয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এবং নয়-এর দশকের প্রথম ভাগে পশ্চিম ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে স্বামীজীর

ঘনিষ্ঠতা তৎকালীন ভারতীয় গোয়েন্দাবিভাগের প্রধানেরও দৃষ্টি এড়ায়নি।[৮১] এদেশের রাজন্যবর্গের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন যে, শাসক সম্প্রদায়ের মনে "প্রজারঞ্জনের বীজ" উপ্ত করার জন্যই তিনি রাজ-দ্বারে ঘুরেছিলেন।[৮২] বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে স্বামীজী বিপ্লবীরূপেই প্রতিভাত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ বলেছেনঃ "...সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন। ... প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে-কাজের ভার দিয়ে যান।"[৮৩] ভূপেন্দ্রনাথের মতে বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ডঃ দত্তের প্রবীণ সহযোগী বিপ্লবকর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করকে স্বামীজী নিজেই নাকি সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেনঃ

"The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it, I will see the revolution in my life time."[৮৪]

মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে ১৯০২ সালে অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "What India needs to-day is bomb."[৮৫] বাংলাদেশে এর পরেই অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে ১৯০৮ সালে বোমার আবির্ভাব হয়।

বিপ্লব আন্দোলন চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে। ডঃ দত্তের প্রদত্ত তথ্য সমূহের সত্যতা যাচাই-এর কোন পথ খোলা নেই। এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে এলে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদী চরিত্রের এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত হবে।

স্বামীজী যে বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, স্বামীজী জীবিত থাকলে ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি

নেতৃত্ব দিতেন। "খাপ-খোলা তলোয়ার" বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র শ্রীশ্রীমায়েরও অজানা ছিল না—তাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্নেহকাতর জননী বলছেনঃ "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত...।"[৮৬]

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী

স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক শাশ্বত ঋষিমূর্তিকে, যে মূর্তি দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেনঃ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ভারতীয় সনাতন আদর্শের চিরন্তন গতিধারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আজ থেকে এক শতাব্দী আগেও যা সত্য ছিল, আজও তাই সত্য—সত্যের কোন সময়সীমা নেই। "যুগ-নায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থের উপসংহারে স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রশ্ন করেছেনঃ "ভগবৎ-পথসঞ্চারী ইতিমূলক সক্রিয় প্রীতি ও শক্তির মূর্তবিগ্রহ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর হৃদয়দ্বারে নববার্তা লইয়া সমুপস্থিত—কে তাঁহাকে বরণ করিয়া নবযুগের রূপায়ণ ত্বরান্বিত করিবে?" এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ইতিহাস। আজ আমরা যেভাবে যে পথে এগিয়ে যেতে চাই, সেই পথকে আলোকিত করে রাখতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত বাণী, আবার আগামীকালের বক্ষেও সেই একই আলোকবর্তিকা সংশয়াচ্ছন্ন মানুষকে ঘোর অন্ধকারে পথ দেখাবে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং মানবজীবন—সকল বিষয়ে স্বামীজীর তত্ত্বজ্ঞান সমুন্নত আদর্শকে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। আবার চিন্তা, কর্ম এবং ধর্মের পথেও স্বামীজীর চেতনা পূর্ণায়ত জীবনবেদের পথপ্রদর্শক।

যে কোন কালেই এবং একালেও আছে মানুষের অতীতের অপূর্ণ আশা, পাওয়া ও হারানো; আর আছে তার আজকের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের দেশকালের সীমায় আমরা এই হিসাবে কি পাই, দেখা যাক। তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ কি দিয়েছেন বা কি দিতে পারেন।

অতীতের অনেক আশাই পূর্ণ হয়েছে। তবু একটি যেন চিরকালের অপূর্ণতা আজও মানুষের মনকে নাড়া দেয়। সে তার জীবন, সুখ ও আনন্দের চাহিদা।

সবচেয়ে বড় যে বস্তু আমরা হারিয়েছি তা হল মূল্যবোধ। মানুষ ভুলেছে তার আপন মহিমা, যথার্থ মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাবোধ। হারিয়েছে প্রাণের প্রাচুর্য, হৃদয়ের অনুভব, বিচারের বুদ্ধি, আর কাজের উদ্যম। সবল আশাবাদের স্থান নিয়েছে নৈরাশ্যবোধ।

আজ আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে প্রয়োজন। খাওয়া চাই, পরা চাই, একটা আচ্ছাদন চাই, এসব জোটাতে একটা বৃত্তি চাই, তার জন্য যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু চাই শিক্ষা বা দক্ষতাপত্র, আর চাই একটু চিত্তবিনোদন। চাই এসব যেন তেন প্রকারেণ। কারণ এগুলো প্রয়োজন! এর নাম দিয়েছি একালে 'বাস্তবতা'। কি মূল্য এখানে মূল্যবোধের?

এই সাধারণ পরিবেশ আজ। কিন্তু আজকের এই সাধারণ জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর কোন স্থান আছে কি? তিনি তো সেই সন্ন্যাসী, সেই হিন্দুধর্মের প্রবক্তা, সেই তত্ত্বজ্ঞানী! বাস্তবের কথা—বিশেষ করে আজকের কালের জীবনের কথা, তার জীবনের প্রয়োজন—তিনি জানবেন কি করে? সনাতন তত্ত্ব ছাড়াও দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের কথা তিনি যা বলেছেন সে তো অনেকদিন আগে—আজকে তার উপযোগিতা কতটুকু? এসব প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়।

স্মরণ করলে দেখা যাবে—চিরকালের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার পথ, সব কিছু পার্থিব পাওয়ার মধ্যে থেকে পরমকে পাবার উপায়, আর আজকের কালে খুঁজে না পাওয়া বিলুপ্ত মূল্যবোধগুলির পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা—এ সবই স্বামীজী দিয়েছেন। অর্থাৎ আজকের সব আকূতি মেটাবার উপায় স্বামীজীর কাছে জানা সম্ভব।

তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেনঃ "পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্র-বিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে... সকলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" [১]

স্বামীজীকে হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা বললে তাঁর খণ্ডিত পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁর প্রচারিত বার্তা ছিল আসলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটি সর্বজনীন ধর্ম বা জীবনের উপজীব্য। তাঁর কথাঃ "শাস্ত্র যদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সাহায্য করিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র যদি কেবল সন্ন্যাসীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়... শাস্ত্র যদি কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে, অনুশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে,

তবে দুর্বল মানুষের কাছে এই শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই।"[২] হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখনও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিলঃ "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"[৩] "আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব, হিন্দুভাবেও নয়, খ্রীষ্টান ভাবেও নয়, বা অন্য কোন ভাবেও নয়. .।"[৪]

তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর তত্ত্বের স্বরূপ কি? "যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী, এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হ'তে হবে।"[৫] এই তত্ত্ব আজ ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কেন? স্বামীজীর উত্তরঃ "আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি।"[৬] এই তত্ত্ব নিয়েই তিনি 'নূতন'কে আহ্বান কবে বলছেনঃ "...প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে আরম্ভ ক'রব—একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।"[৭] "...এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।"[৮]

এখানে উচ্ছ্বাসের স্থান নেই; তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে। কারণ একালের একটি প্রধান প্রবৃত্তি—যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সব কিছুকে গ্রহণ করা। প্রমাণ চাই। এই বুদ্ধিবাদ যেমন বস্তুবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি, তেমনি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-প্রস্থানে অতি সূক্ষ্ম ব্যবহারে বন্দিত। বিবেকানন্দও এই বুদ্ধিবাদে শ্রদ্ধাশীল। তিনি নিজের কথা সম্বন্ধেও বলেছেনঃ "যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি।"[৯]

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর চিন্তাধারার প্রভাব কতটা সক্রিয় এবং কতটা শাশ্বত সে বিচার দুদিক থেকে হতে পারেঃ স্বামীজীর তুলে ধরা তত্ত্বের বিচার, যাতে দেখতে হবে তাঁর তত্ত্ব কি শুধু তাঁর কালের উপযোগী, না একালেও

সমান প্রযোজ্য, অথবা সেগুলি চিরকালের; আর সেই বাণীর উৎস সন্ধান অর্থাৎ প্রবক্তার অন্তর্গঠনের উপাদান আবিষ্কার।

যিনি স্বামীজীকে গভীরভাবে বুঝেছিলেন, সেই নিবেদিতার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি অতি সংক্ষেপে বিচার করলে দেখা যায়—এ উপাদান ছিল তিনটিঃ শাস্ত্র (অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা); গুরু (যিনি দুর্লভ অপরোক্ষকে সুলভ করেন); আর দেশ (যা বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেয়)।[১০] তাই স্বামীজী বস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে বাস করেননি। পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতির ভিত্তি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাকেও হৃদয়ের স্পর্শে আত্মসাৎ করেছেন। এই ত্রিবেণীসঙ্গম থেকেই তাঁর বাণী উৎসারিত হয়েছিল। নিবেদিতা যথার্থই দেখেছেনঃ "স্বামীজীর একটি সম্পূর্ণ আধুনিক মন ছিল।"[১১] "যে অবস্থায় মানুষ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে, সেই সমাধি-অবস্থালব্ধ শাশ্বত প্রজ্ঞালোকে তাঁহারও চিত্ত উদ্ভাসিত থাকিত বটে, কিন্তু উহা সেইসকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরই নিপতিত হইত, যাহা আধুনিক জগতের মনীষী ও কর্ম্মিগণের আলোচনার বিষয়।"[১২] অন্যত্র নিবেদিতা বলেছেনঃ "...যে-নিয়তি তাঁকে তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণায় অস্থির করেছে, সেই নিয়তিই তাঁর মধ্যে গৃহীর আদর্শকে মূর্ত করেছিল; পালনে ও রক্ষণে ব্যগ্র, পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন অনুধাবনে ও অনুধাবন করানোয় উৎসুক, জীবনের সংগঠন ও ইতিহাস রচনায় অগ্রসর—আদর্শ গৃহী।"[১৩] রোমাঁ রোলাঁ "বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী" গ্রন্থে বলেছেনঃ "কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পরেই কেবল তিনি লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন। তিনি আর্ত মানবতাকে—তাহার সকল করুণ নগ্নতার মধ্যে তাঁহার দেশমাতৃকাকে—স্বহস্তে ও স্বচক্ষে স্পর্শ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।"[১৪] এ বিচারে সহজেই বোঝা যায়, এ প্রবক্তার পক্ষে কালের উপযোগী তত্ত্ব পরিবেশন সম্ভব। এবার অন্যটির কথা।

আমরা দেখেছি মানুষের সমাজজীবন দেশকালের সীমায় বাঁধা হলেও নিছক মানুষ চিরকালের। চিরকালের মানুষের বিকাশের জন্য কতকগুলো চিরকালের তত্ত্ব আছে। বিবেকানন্দ আজকের জন্য আবার তাদের সংগ্রহ করেছেন। স্বামীজীর চিন্তায় কিছু তত্ত্ব আছে যা শুধু একালেই নয়—ভবিষ্যৎ কালেও

অচল হয়ে যাবে না। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর মূল্য সেই জন্যই সবচেয়ে বেশী।

আবার যে তত্ত্ব নিছক আজকের জন্য, যে বাণী আজকের বাস্তব জীবনের উপযোগী, আজকের প্রয়োজন যা মেটাতে পারে—আজকের কালে বর্তমান না থেকে স্বামীজীর পক্ষে তাও দিতে পারা সম্ভব হয়েছিল দুটো কারণেঃ প্রথমত, ইতিহাস শুধু অতীতের অনুলিপি নয়, অনাগতের আভাসও তার মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। স্বামীজী তাঁর ইতিহাসচেতনার ফলে যে দূরদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাতে শুধু বর্তমানে দাঁড়িয়েই কর্তব্য নির্ণয় করেননি। আগামী দিনের রূপও সে চেতনায় প্রত্যক্ষ করে সেদিনের কর্তব্যও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর সময়ে যা তৎকালবর্তী বাস্তব ছিল, তার অনেক কিছুই আজকের কালেও বর্তমান। কাজেই যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়, স্বামীজীর কাছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও পাবার মতো কিছু থাকা সম্ভব।

সাধারণ মানসিকতার পরিবর্তনের একটি বিশেষ গতি দিয়ে সমাজজীবনের কাজ নির্ধারণ করা যেতে পারে। সে হিসাবে রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ একটি নির্দিষ্ট কাল—যদিও বেশ দীর্ঘ। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এরপর একটি স্বল্পস্থায়ী কালের সীমা টানতে পারি—১৮৯৩ থেকে ১৯০২ বিবেকানন্দের প্রবচন-যুগ। স্বামীজীর দেহান্তের পরই আর এক নতুন কাল, যে কালে সকল চিন্তা আর কাজে স্বামীজীর বাণীর ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়—যখন তিনি "অশরীরী বাণী"[১৫]—এরই শুরুতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লববাদের নব উদ্দীপনার যুগ, যা শেষ হল ভারতের স্বাধীনতালাভে। এই মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরে মানসিকতা কিন্তু অতি দ্রুত অধিবৃত্তের ভঙ্গিতে বদলে গেছে। এই যুগসৃষ্টির শুরুতে বিবেকানন্দ-প্রবচনের আধ্যাত্মিক ভাব নবজাত রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে ও পরে ধীরে ধীরে রাজনীতি এমনই রূপ নেয় যে তা বস্তুত জাতীয় জীবনের কেন্দ্রে নিজেকে আধ্যাত্মিক ভাবের স্থলাভিষিক্ত করে, যে সম্বন্ধে স্বামীজীর স্পষ্ট উক্তি ছিলঃ "...যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যে দিকে উহার বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

"সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ...আমি

এ-কথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই ; আমার এইটুকু বক্তব্য—আর আমার ইচ্ছা, তোমরা ইহা ভুলিও না যে ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্মই মুখ্য।"[১৬] "...রাজনীতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে...।"[১৭] মানুষের ভিতরেই যে দেবত্ব আছে তাকে প্রকাশ করাই স্বামীজীর কাছে ধর্ম।[১৮]

এক চিন্তাশীল গ্রন্থকার এই ঘটনাকেই লক্ষ্য করে লিখেছেনঃ "...আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ ; সে যুগে সমাজ, ধর্ম, ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সংকটের যুগ—সেই সংকটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল ; সে এক অকাল-সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল।"[১৯] বাঙালীর সম্বন্ধে হলেও একথা সারা ভারতের সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেনঃ "......সে একটা সেন্টিমেন্টমাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না।"[২০]

এর পরের কালই আমাদের আজকের কাল যা শুরু হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সময় থেকে। একেবারে নতুন কাল—যখন ভারতবাসীর বেশভূষা, কেশ-শ্মশ্রু-বিন্যাস, কথা কইবার ভঙ্গি থেকে শুরু করে যানবাহন, পথঘাট, শহর, পল্লী, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি, সাংসারিক সম্বন্ধ, শিক্ষার ধারা, ভাষা—লিখিত ও কথ্য—সাংবাদিকতা, শিল্প, সাহিত্য, সব কিছুর মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যে তাকে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। একালেও বিচারবুদ্ধি ও শ্রেয়োজ্ঞানের অভাবে আমরা ভেবে নিয়েছি, বোধ হয় সবই পেয়ে গেছি ; চেষ্টার আর প্রয়োজন নেই ; চিন্তা ও মননের সাহায্যে

লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে জেনে সেদিকে এগুনোর পথ বোধ হয় নতুন করে আবিষ্কার করতে আর হবে না; যে পথ-হারানোর পথ ধরেছি তাই বোধ হয় সকল আকুতিকে প্রাপ্তির প্রশান্তি দেবে।

দারিদ্র্য-পীড়িত, অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত, নিরন্ন, পদদলিত, অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত নীচের তলার মানুষের হাহাকার সে মহাপ্রাণের কণ্ঠে প্রতি-নিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, নারী ও গণজাগরণ, ঐহিক উন্নতি, চরিত্র, মনুষ্যত্বের বিকাশ, আত্মবোধের প্রসার, সর্বজনীনতা, মুক্তি, পূর্ব-পশ্চিমের তত্ত্ব-বিনিময়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলন—অনেক বিষয়েই স্বামীজীর সুচিন্তিত ও উপলব্ধ দৃষ্টির প্রকাশ রয়েছে তাঁর বাণীতেঃ "কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই এক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না ; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।"[২১] –এ মন্তব্যে একমত হওয়া সম্ভব নয়। এখন এ প্রশ্ন মুলতুবি রাখবার অবকাশ নেই। বরং সে বাণীতে, সে জীবনে জগতের কি উপকার সাধিত হয়েছে, কি হচ্ছে আর কি হতে পারে তা বোঝবার এই উপযুক্ত কাল।

নবযুগের পথ প্রদর্শক স্বামীজী তাই—কি ভারতের কি বিশ্বের—আজকের ব্যাধির নিদান হিসাবে এই মানুষকেই সবল করতে চাইলেন। বললেনঃ "এস, মানুষ হও। ...তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভাল-বাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।"[২২] "রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। ...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। পশ্চাতে চাহিও না। ...এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"[২৩] মানুষ যদি স্ব-মহিমায় স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দৈহিক মানসিক সব ব্যাধিই দূর হবে। এই হওয়াই চরিত্রগঠন। তার উপায় শিক্ষা। "...নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম...।"[২৪] তাই দেখা যায় স্বামীজী সাধারণ জীবনীশক্তিবর্ধক নিদান দিয়ে বিভিন্ন দেশে কালে

প্রকাশিত ব্যাধিলক্ষণের নিরাময়ের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই তিনি একটি ব্যক্তি-মাত্র নন, কোন কালোপযোগী বাণীমাত্র নন, তিনি একটি পদ্ধতি যা সকল কালেই মানুষের কাজে লাগবে সব দেশেই।

চিরকালের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার পথ মানুষের যথার্থ স্বরূপকে জানা। একালে তা জানার এক নতুন চেষ্টা দেখা যাচ্ছেঃ "...এক অবিভক্ত সমষ্টি-স্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মানুষ'।"[২৫] "এখন যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, সে সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ।"[২৬] "...অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। ...যদি বর্তমান কালের মনুষ্যজাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে ; কেবলমাত্র নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে কখনও হইবে না।"[২৭]

সমস্ত অভ্যুদয়ের জন্যও মানুষের এই স্বরূপ জানা প্রয়োজন। আমাদের দারিদ্র্য বেকারত্ব দূর করতে, জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে সাংসারিক ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে; অর্থনৈতিক সমস্যা, যুবজীবনের অস্থৈর্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতেও এ তত্ত্বেরই প্রয়োজন। ".. 'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে'..."[২৮] —একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। স্বামীজী বলেছেনঃ "সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে'।"[২৯] স্বামীজী বলছেন, পাশ্চাত্যদেশে মানুষকেঃ "ইংরেজ 'পাপ, পাপী' ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; বাস্তবিক যদি সকল ইংরেজ নিজেদের পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে এ-কথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে—সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে; সে নিজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে—সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা

হইলে সে সূর্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে।"[৩০] "...এ দেশের মতো এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ...আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই।"[৩১] আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বামীজীর সেই কথা শোনবার বিশেষ প্রয়োজন, যেখানে বলছেনঃ "...বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। ...আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। ...বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—যে যে-কাজ করুক না কেন, যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।"[৩২]

স্বামীজীর এই কথার সঙ্গে যে প্রশ্ন উঠবে এযুগের প্রবণতায়—তা এবং তার উত্তরও আমরা স্বামীজীর কাছেই শুনতে পারিঃ "আর এক প্রশ্ন—এই ভাব কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক।"[৩৩] "আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মতো করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হই। ...আমি যাহাকে কাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। ...আমি যদি চোর হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই 'কার্যকর' শব্দটি—কেবল আমরাই বর্তমান অবস্থায় যাহা করিতে পারি, সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি।"[৩৪] "সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত

না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল।"[৩৫]

স্বামীজী কালের তথাকথিত প্রয়োজন, প্রবণতা, চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হননি। তিনি স্পষ্ট বলেছেনঃ "মানুষের মনযোগানোর সময় আমার নাই, উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। বরং সহস্রবার মৃত্যু বরণ করিব, তবুও (মেরুদণ্ডহীন) জেলি মাছের মতো জীবনযাপন করিয়া নির্বোধ মানুষের চাহিদা মিটাইতে পারিব না—তা আমার স্বদেশেই হউক অথবা বিদেশেই হউক।"[৩৬] "যদি আমায়—জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা হ'লে তাতে জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, জগৎ শাসন করছে তারাই অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়।"[৩৭]

তিনি একালের চাহিদা জেনেও তথাকথিত বস্তুবাদীদের মতো মানুষের অসংস্কৃত মনুষ্যত্ব-বিনাশকারী সাধ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেননি। সকল মানুষকে প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কারণ একমাত্র তাতেই সকল যুগের সকল মানুষের সকল ক্ষুধা মেটাবার উপায় নিহিত। তাই তিনি দেখালেনঃ "...আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি।"[৩৮] আর মননের দীনতায়, জীবনৈষণার কার্পণ্যে, অভাবের তাড়নায়, প্রয়োজনের তাগিদে জাতি যে আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাচ্ছিল না তাকে রূপ দিয়ে বললেনঃ "...ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ...ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিবে। ...আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে...।"[৩৯] "...ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না।"[৪০] "চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। ...এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।"[৪১] "ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন—আর আমি ইচ্ছা করি তোমাদের

মধ্যে...সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক...।"[৪২] স্বামীজী আমাদের না-খুঁজে-পাওয়া এক জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সন্ধান দিলেন আজকের কালের হিসাবে যাকে আমরা একেবারে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আজকের পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদের মদিরার ঘোর ধীরে ধীরে ছুটে যাচ্ছে। সেখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একবাক্যে বলছেনঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রগতি, সভ্যতার নব নব বস্তুসম্ভার মানুষকে জীবনের, যথার্থ সুখের, আনন্দের সন্ধান দিতে পারবে না। মানুষ সভ্যতার আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। দুর্নিবার জনবিস্ফোরণের মধ্যে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ একাকিত্বে নিজেকে নির্বাসিত করে এক প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে শিহরিত। এ সভ্যতার ফল হচ্ছে—নানান বিরুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি। ভোগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরের পাশেই দারিদ্র্যের গভীর খাদ।

এইটাই আজকের যুগসমস্যা। মানুষ মনুষ্যত্বহারা, ব্যক্তিত্বহারা হয়ে যাচ্ছে, ঐক্যচ্যুত নিঃসঙ্গ হচ্ছে, বন্যার জলের মূলহারা উদ্ভিদের মতো ভেসে চলেছে, নিজের চারদিকে বড় বড় অসঙ্গতি তার -বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নিজের উন্নতির মধ্যে, বুদ্ধির আর বিবেকের মধ্যে, স্বার্থ আর প্রেমের মধ্যে। হেনরী হুইলর, মার্লো পন্টি, লিউইস মম্ফোর্ড, এরিক ফ্রন্ট, এরিক কাহলার, নরম্যান কাসিন্স. লেকমতে-দ্য-ন্যুই, নোয়াম চমসকী, ভজটেক কিন্সকী, পিতিরিম সোরোকিন, জুলিয়ান হাক্সলী, আর্নল্ড টয়েনবী এবং আরও অনেকে এই সমস্যাই আবিষ্কার করছেন আর সমাধানের যা ইঙ্গিত দিচ্ছেন তা হচ্ছে ঐ—মানুষকে পূর্ণ করে তোলা।

আজকের বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে স্বামীজী ভারতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করলেন—যার অভাবে জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গুরুর আসনে বসে তার সন্ধান তাকে দিতে হবে। মানুষকে বলতে হবেঃ তোমার স্বরূপ জান ও জেনে তাকে প্রকাশ কর। মানুষের জন্য সভ্যতা, সভ্যতার জন্য মানুষ নয়। কোন তত্ত্বের কাছে স্বামীজী মানুষকে বলি দেননি। "অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।"[৪৩] মানুষের হয়ে ওঠার জন্য তত্ত্ব। মানুষের এই হয়ে ওঠার নামই ধর্ম।[৪৪] "যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে।"[৪৫] "বাহ্য

ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।”[৪৬] “এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা। ...এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।”[৪৭]

রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই বলেছেনঃ “ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।”[৪৮]

স্বামীজী বলেছেনঃ “বর্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।”[৪৯] “জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব বর্তমান—এই ভারতীয় ভাব ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানা ভাবে ব্যক্ত হইতেছে। তোমরা কি দেখিতেছ না, পূর্বে সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন উহা স্বভাবতঃ ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মাদের চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্যন্ত...। তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে?”[৫০] এ যেমন ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি লক্ষ্য করেছেনঃ “রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। ...আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্বভাব কিভাবে বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।”[৫১]

ধর্মের প্রতিনিধি দ্য-পল (ক্যাথলিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার রবার্ট ক্যাম্বেল তাঁর ভাষণে খ্রীষ্টধর্মের বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ করে বলেনঃ "আধুনিক গোষ্ঠীর খ্রীষ্টানরা, যীশুকেই একমাত্র ঐশ্বরিক বলতে ইতস্তত করেন; তাঁরা বলেন, আমাদের যে কেউই ঐশ্বরিক হতে পারেন। অবশ্য এটা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির কাছে—যাতে সকল মানুষেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়—খুবই সমর্থন পাবে। বস্তুত বহু বিষয়েই দেখতে পাবেন আজকের উদার খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে—বিশেষ করে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর-সত্তা ও সকল মানুষই ঐশ্বরিক সত্তাময়, এই তত্ত্বদ্বয়ে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথাঃ উদার গোষ্ঠীর মতে—গোঁড়া খ্রীষ্টান-চিন্তা 'আদি পাপ' প্রভৃতি বিশ্বাসের দ্বারা দুষ্ট। উদার গোষ্ঠী এই মতবাদকে আদৌ সহ্য করতে চায় না। তারা বিশ্বাস করে, যথার্থ শিক্ষা ও প্রয়াসের দ্বারা মানুষ পূর্ণতালাভ করতে পারে। আমি জানি, স্বামী বিবেকানন্দ এই নতুন ঝোঁকগুলিকে সমর্থন করতেন। স্বামীজী আমাদের বলেছেনঃ 'প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।' আজকে এই ভাব মানবধর্মী আধুনিকরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছেন।"[৫২]

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "'জগতে পাপ নাই'—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যাহারা আমায় গালি দিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ--আমি অধর্ম প্রচার করি নাই, ধর্মই প্রচার করিয়াছি বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবে।"[৫৩]

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। যাঁরা তাঁকে গালি দিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরদের অনেকে আজ তাঁকে সাধুবাদ দিচ্ছেন। এঁদের একজন স্বামীজীকে তাঁর ঐ ভাব প্রচারের জন্য সেদিন সাধুবাদ জানালেন সেই চিকাগো শহরেই—যেখানে পঁচাত্তর বছর আগে 'পাপে'র মাথায় প্রথম বজ্রপাত হয়। এ তো গেল ধর্মক্ষেত্রের কথা, আজকের বিজ্ঞানক্ষেত্রের কথা কি?

নৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বের বিচারে মানুষের সত্তার সবটা কখনও আবিষ্কার করা যায় না। এর নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ—মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করলেই যে সব সময় তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যায় না—তা থেকে ক্রমাগতই পাওয়া যাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কিছু নব্য ধারাও এক-দেশদর্শী। এর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সামনে হাজির করে তা কতকটা একটা বস্তু-মানব। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বাইরের প্রকাশের দিকটাকেই আদর্শায়িত করে মানুষকে বেশী মূল্য দিতে চেষ্টা করে। এরূপ করায়, তাকে তার আসল সত্তা থেকে মারাত্মকভাবে ছিন্ন করে আনা হচ্ছে; যার ফলে সে নিজেকে অবচেতনে গুটিয়ে ফেলে আর এক কিম্ভূত মেঘময় রূপ নেয়। মানুষ এর অজানা ভয়ে কম্পিত হতে থাকে। আমাদের যুগে যে একটি বিশিষ্ট উদ্বেগ আছে তার মূল রয়েছে এইখানেই।

"অন্তত আর একটু সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসছে। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা-ক্ষেত্রের কিছু গবেষক ইতোমধ্যেই এর বর্তমান দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং নিজেদের নতুন দিগন্তের সামনে উন্মুক্ত করতে চাইছেন। পরস্পর পৃথকভাবে—তবু যেন কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে—মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখায় এমন কিছু নতুন বিশেষজ্ঞ উঠছেন, যাঁরা মানুষের সত্তার আধ্যাত্মিক দিকটারও মূল্য দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন নিঃসন্দেহে ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন—বিশেষ করে বিবেকানন্দের ভাষ্যের দ্বারা, যাতে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সমন্বয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।"[৫৪]

পাশ্চাত্যে যখন আজ জড়বাদের ঘোর কাটছে আমাদের দেশেও তখন তামসিকতার মোহনিদ্রা ভাঙছে। রজোগুণের রক্তিম আভা পূর্ব দিগন্তে দেখা দিতে শুরু করেছে, যদিও নিদ্রোত্থিতের পদচারণার জড়িমা আজও কাটেনি। আজকের ভোরে কে তাকে শোনাবেঃ "জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভস্মীভূত হবার সময়েও মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই করে। 'ভালো'র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। ...সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।"[৫৫] "তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু তিনিই

বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন!"[৫৬]

স্বামীজীর বাণী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিচারের জন্য উদ্ধৃত অংশগুলি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কি এই কথাই প্রমাণ করে না যে. একালে যুগ-ব্যাধির মহৌষধি এই বাণীতেই বর্তমান?

বিবেকানন্দ অনুধ্যান



স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন কতকগুলি প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত ভাব বা চিন্তাধারার সমন্বয় নয়—উহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বহুতর প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। যেমন, প্রত্যেক মানুষের দৈবসত্তা তাঁহার নিকট কথার কথা বা কবিকল্পনা ছিল না, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তিনি উহা সর্বদা দেখিতে পাইতেন। অতএব স্বামীজীর জীবনদর্শনে যেখানে মানুষের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, ঐ প্রসঙ্গের উৎস তাঁহার কোন একটি বিশিষ্ট মত নয়, একটি অসন্দিগ্ধ অনুভূতি। মানুষের যে কোনও সমস্যা তিনি পর্যবেক্ষণ. বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, উহাতে কোনক্ষণেই তিনি মানুষের হৃদয়গুহাবাসী নারায়ণকে ভুলিয়া যান নাই। বুভুক্ষু মানুষ, অপমানিত বা নির্যাতিত মানুষ, নিরক্ষর অথবা পীড়িত মানুষ, পুরুষ-মানুষ, স্ত্রী-মানুষ, ধর্মপ্রাণ মানুষ কিংবা পাপ-মলিন মানুষ, যে কোনও অবস্থা বা ক্ষেত্রের মানুষ তাঁহার দৃষ্টিতে মুখোশ-পরা নারায়ণ। স্বামীজীর জীবনদর্শনে মানবিকতা অন্যান্য বহুপ্রখ্যাত মনীষীর উপস্থাপিত মানবিকতা হইতে যে আলাদা হইবে তাহা স্বাভাবিকই।

যে কোনও জীবনদর্শনে জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিবেকানন্দের জীবনদর্শনেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাঁহার জীবনদর্শন বিশেষভাবেই জগৎ-কেন্দ্রিক। কিন্তু বিবেকানন্দ জগৎ বলতে কি বুঝিতেন? জগৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনা তাঁহার বক্তৃতাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে অপর মনীষীদের চিন্তাধাবা আলোচনা করিয়া যখন তিনি তাঁহার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন তখন তিনি স্বকীয় প্রত্যক্ষানুভূতির উপর দাঁড়াইয়া তাহা করিয়াছেন। তাই যখন তিনি সংসারকে মায়া বলিতেছেন আমরাও যেন তাঁহার সঙ্গে অন্তত সেই সময়ে সংসারের অবাস্তবতা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে যে বাক্য উচ্চারিত হয় তাহার এতই শক্তি। আবার তিনি যখন জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, আমরাও তখন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ঈশ্বরের জ্যোতিতে ভাস্বর ভাবিতে উৎসাহিত হইতেছি। এই ঘোষণাও স্বামীজীর প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে উদ্ভূত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় স্বামীজীও ঈশ্বরের নানা উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনদর্শনে সেইজন্য ঈশ্বরের একটা একটানা প্রকাশের পরিবর্তে ভগবৎতত্ত্বের বহুমুখী ব্যঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। সাকার, নিরাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত, নির্বিশেষ, সবিশেষ, কোমল, কঠোর, সুন্দর, ভয়ংকর, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ অথবা অলিঙ্গ—শ্রীভগবানের এই জাতীয় বিবিধভাবের কথা স্বামীজী

বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি কথাই জোর দিয়া বলা। এই জোরের সূত্র তাঁহার অনুভূতি। তাঁহার জীবনীপাঠক জানেন যে, কোনও কোনও সময়ে তিনি নিরীশ্বরবাদের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুরা ভয় পাইয়াছে, তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছে, কিন্তু তিনি "ঈশ্বর নাই" একথা বলিতে ভয় পান নাই। ঐ সময়ে সত্য তাঁহার নিকট নিরীশ্বরতার পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যকে যে সর্বদা ঈশ্বর বলিতে হইবে এমন গোঁড়ামি নরেন্দ্রনাথের ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন মাকে সব দিয়াও 'সত্য' দিতে পারেন নাই সেইরূপ স্বামীজীরও সত্যসন্ধতার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ তাঁহার আচরণ ও বাণীতে আমরা পাই। তাঁহার নিকট সত্য ছিল সকল প্রকার মতবাদের ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবক নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখিবার পর মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ "বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব!" নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ঠাকুরের পর্যবেক্ষণে যে তাঁহার উন্নত আধারত্বের অন্যতম উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে সত্যের খ্যাপন যেমন সবল তেমন চিত্তস্পর্শী।

যে তত্ত্বানুভূতি তাঁহার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় করিয়াছিল উহা স্বামীজী একটি সহজাত সংস্কার রূপে সঙ্গে লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ইহা বলা বোধ হয় অতিরঞ্জিত নয়। বালক নরেন্দ্র বা 'বিলে'র মধ্যে দুই প্রকার প্রবণতা ছিল। প্রথমটি হইল বাল্যপ্রতিভা—যাহা বহু কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির ভিতর দেখা যায়। ইঁহারা যখন একান্ত তরুণ তখনই কাব্য, শিল্প বা বিজ্ঞান প্রভৃতির কিছু না কিছু প্রতিভা ইঁহাদের কার্যকলাপে সচরাচর লক্ষিত হয়। "The child is the father of the man". কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর এই উক্তি খুবই খাঁটি। বালক নরেন্দ্র বা 'বিলে'র বাল্যকালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই জাতীয় 'প্রতিভা'র পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে—যেমন, তাহার বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, খেলাধুলায় বিচক্ষণতা, সাথীদের নেতৃত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি। বালকের পিতা-মাতা, আত্মীয়-বান্ধব, শিক্ষক বা প্রতিবেশিগণ অবশ্যই দুরন্ত ছেলেটির আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্কুল-কলেজ বা কর্মজীবনের একটি গৌরবময় ছবি কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সে যে কৃতী পিতার উপযুক্ত সন্তান ইহাতে পর্যবেক্ষকদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নরেন্দ্র যদি অবতারকল্প মহাপুরুষ বিবেকানন্দ নাও হইতেন তথাপি তাঁহার জীবন সাংসারিক দিক দিয়া যে অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দকে একদিন স্বামীজী তর্কচ্ছলে বলিয়াছিলেনঃ "আমি যদি প্রচার না করতুম, তোমাদের ঠাকুরকে কে চিনত?" স্বামী যোগানন্দ উত্তর দিয়াছিলেনঃ "তিনি না থাকলে তুমি বড়জোর একজন ডব্লিউ, সি, বাঁড়ুজ্জের মতো ব্যারিষ্টার হতে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নরেন্দ্রের

সাংসারিক দিক দিয়া একজন দিকপাল হইবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিতেন। বলিতেনঃ ও যেদিকে যাবে সেদিকেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে।*

বাল্যপ্রতিভা ছাড়া 'বিলে'র মধ্যে দ্বিতীয় একপ্রকার প্রবণতা লক্ষিত হইত। এই সংস্কারগুলিকে ধরিতে পারা বা উহাদের মূল্য নিরূপণ করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। এই দ্বিতীয় স্তরের সংস্কারগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর জীবনের মহত্ত্বের বীজ। যেসকল ভাব ও শক্তি তাঁহার চরিত্রে, কর্মে ও উপদেশে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাহারা বীজাকারে বালক 'বিলে'র মধ্যে যে ছিল ইহাই অনুধাবনীয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনে মানুষের দেবত্ব একটি প্রধান প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করিলে মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করিতে, ভালবাসিতে, সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন মানুষকেই ঘৃণা করিতে, অপমান করিতে, নির্যাতন করিতে কুণ্ঠা আসে। স্বামীজীর জীবনী-পাঠক জানেন সকলকে নির্বিচারে ভালবাসা বালক 'বিলে'র ছিল স্বভাবগত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির জন্য আলাদা হুঁকা কেন থাকিবে তাহা সে বুঝিতে পারিত না। বালকের দরিদ্রের প্রতি দয়া কখনও কখনও এত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত যে জননী ভুবনেশ্বরী সময়ে সময়ে কতই না বিব্রত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণ সেবা তাঁহার জন্মগত সংস্কার। বালক বিবেকানন্দের আর একটি অসাধারণ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার তাঁহার ধ্যানশীলতা। পরবর্তীকালে স্বামীজীর জীবনদর্শনের ইহা অন্যতম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খেলার সাথীদের লইয়া অন্য নানা খেলার বদলে "ধ্যান, ধ্যান" খেলা 'বিলে'র এত প্রিয় কেন তাহার মর্ম তাহার পরিজনবর্গ কি বুঝিতে পারিতেন? পারিবার কথা নয়। তাঁহারা বড় জোর বলিতেন 'বিলে'র দশটা খামখেয়ালের ইহা একটা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু জানিতেন এই বালক পৃথিবীতে আসিবার আগে অন্য এক লোকে দিব্যদেহে ধ্যানস্থ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ, ধ্যান তাহার প্রকৃতি। 'বিলে'র ধ্যানসংস্কার তাহার খামখেয়াল নয়—সারা জীবনের শক্তি।

বালক নরেন্দ্রের অস্বাভাবিক নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা স্বামীজীর জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়। নরেন্দ্রের বাল্যকালের অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে স্বামীজীর সমগ্র জীবনের আচরণে ও উপদেশে ঐ বৈশিষ্ট্যদ্বয় বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর" বিবেকানন্দ জীবনদর্শনের অন্যতম মর্মবাণী। সাহসের কথা অনেক বাগ্মীর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্বামীজীর মুখের বা লেখনীর

নির্ভীকতার উৎসাহ একটুও বাগাড়ম্বর নয়, উহা দুর্বলতা ও মোহান্ধকার-বিদারী জ্বলন্ত তেজস্ক্রিয়া। উহার আকর তাঁহার মস্তিষ্ক নয়, যে বীরেশ্বর মহাদেবের শক্তি লইয়া তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন উহা সেই দীপশিখা। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সঙ্গীসাথীদের পক্ষে উহা বুঝিতে পারা সুকঠিন ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন এই ছেলেটি বড় বেপরোয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রকে দেখিয়াই এই আগুনের যথার্থ মূল্য দিয়াছিলেন। বলিতেনঃ "নরেন্দ্র খাপখোলা তলোয়ার।"

উপর্যুক্ত আলোচনার নিষ্কর্ষ এই যে, বালক নরেন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার সংস্কার এবং সুপরিপক্ক আধ্যাত্মিক সংস্কার—এই দুই প্রকার সংস্কারই পরিস্ফুট ছিল। প্রথমোক্তটি ধরিতে পারা কঠিন ছিল না, দ্বিতীয়টির সম্পূর্ণ মূল্যনির্ণয় একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিচার অনুসরণ করিয়া পরে অবশ্য অনেকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং এখন করেন। যাহা শৈশবে ও বাল্যে নরেন্দ্রের মধ্যে কতকগুলি যোগসংস্কার রূপে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল তাহাই ধীরে ধীরে যৌবনে এবং পরে ধর্ম ও কর্মজীবনে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের মূলে তাঁহার সহজাত 'নিত্যসিদ্ধ' যোগসংস্কার। শিক্ষাদীক্ষা সাধনাদি যাহা তিনি করিয়াছিলেন তাহা এই সংস্কারগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছিল মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় নরেন্দ্রনাথ যদি 'নিত্যসিদ্ধ', 'ধ্যানসিদ্ধ', তাহা হইলে সিদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্ববোধের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। তত্ত্ববোধ আবাল্য তাঁহার শোণিতপ্রবাহ, স্নায়ুস্পন্দন, মানসিক চিন্তা, কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের সহিত মিশিয়াছিল। এই স্বাভাবিক তত্ত্ববোধই তাঁহার জীবনদর্শনের বিভিন্ন ধারায় অনুসঞ্চারিত।

স্বামীজীর জীবনদর্শন মুখ্যতঃ মানবকেন্দ্রিক। জার্মান দার্শনিক রুডলফ অয়কেন (১৯০৮ সালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত) বলিয়াছিলেনঃ "Man is the meeting point of various stages of reality." উপনিষদ্ পাঠক ইহাতে উপনিষদের ভূরি ভূরি ঘোষণার প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাইবেন। মানুষকে নানা স্তরে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রত্যেক স্তরের সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়া অবশেষে মানুষের নিগূঢ়তম সত্যের পরিচয় প্রদানই উপনিষদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে উপনিষদের দৃষ্টি দিয়াই দেখিতেন। মানুষের দেহমন আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনটাই অবহেলা করিবার নয়—কিন্তু তাহার অন্তরতম সত্য সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। মানুষ যদি এই সত্যকে ভুলিয়া তাহার বহিরঙ্গ সত্যগুলিকেই বড় করিয়া তুলিতে চায় তাহা হইলে সে শ্রেয়ের পথ হইতে বিচ্যুত।

সে নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণকে সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ করিতে তো পারিবেই না উপরন্তু সমাজকল্যাণকেও সে পদে পদে ব্যাহত করিবে—কেননা, মানুষের দৈবসত্তাকে বাদ দিলে মানুষ স্বার্থপর হইতে বাধ্য। হিংসা, ঘৃণা, লোভ, দম্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যীশুখৃীষ্ট বলিয়াছিলেনঃ

"For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" ১

"মানুষ যদি তাহার আত্মাকেই হারাইয়া বসে তাহা হইলে সারা পৃথিবী অধিকার করিয়াই বা তাহার কি লাভ? এমন কি দামী বস্তু আছে যা মানুষ তাহার আত্মার বদলে লইতে পারে?" এই উক্তির মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীকে কথিত উপদেশের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দকে মানুষের মহিমা খ্যাপনে ভারত বহির্ভূত অপর কাহারও চিন্তা বা ভাব ধার করিতে হয় নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের চরম সত্য যাহা উপনিষদে ঘোষিত হইয়াছে তাহাই মানুষের সম্বন্ধে শেষ কথা। এবং ঐ শেষ কথা কখনও পুরাণ হইবার নহে। উহা যত স্মরণ করা যায়, আলোচনা করা যায়, প্রচার করা যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। মানুষের যথার্থ একতা তাহার আত্মসত্যে। আত্মসত্যের কথা শুনিলেই যে শ্রোতা আত্মজ্ঞানী হইয়া যাইবে এমন অবাস্তব গোঁড়ামি স্বামীজীর ছিল না। কিন্তু সত্যের অপরিসীম শক্তিতে তাঁহার ছিল অবিচলিত বিশ্বাস। বুঝিতে পার আর নাই পার সত্যকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া যাও, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দীপ্ত বাণী। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যদি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যপূর্ণ আত্মা হন, তবে মানুষ যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাহার সেই স্বরূপ তো লুপ্ত হইবার নহে। এই কথাটি মনে রাখিয়া মানুষের সম্মুখীন হও। তাহার সহিত আচরণে তাহার বাহিরের রূপটি শুধু না দেখিয়া তাহার আভ্যন্তর সত্যটি যদি স্মরণে রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও সংস্পর্শ মৈত্রী ও প্রেমে অনুরঞ্জিত হয়—অনেক বিদ্বেষ, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা সংযত হয়। "যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুধু চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, 'তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, পশুগণ, সর্বপ্রকার প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ', তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দিকে ঘৃণার

বীজ নিক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি।”[২]

স্বামীজীর মনঃপ্রাণে মানুষের এই দেবত্ববোধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ হইয়া গিয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তিনি পর্যটন করিয়াছেন, রাজা-মহারাজা ও দীন-দরিদ্র-জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত আবার চাষা-মজুর-মূর্খ—সকল স্তরের মানুষের সঙ্গেই মিশিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে মানুষের প্রতি ঊর্ধ্বদৃষ্টি কখনও নামিয়া আসে নাই। ইউরোপে ও আমেরিকাতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। স্বামীজীর জীবনীপাঠক তাঁহার লোকব্যবহার সংক্রান্ত নানা স্থানে নানা পরিবেশে ছোটখাটো ঘটনাগুলি পড়িয়াও মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। মানুষকে তিনি কী দৃষ্টিতেই দেখিতেন! স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন মানুষের দেবত্ব উপলব্ধি ব্যাপকভাবে অভ্যাস করিবার সময় আসিয়াছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ সত্য তাহার জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করা যায় এবং করিতে হইবে। নতুবা মানবসভ্যতার সমূহ সঙ্কট। স্বামীজীর জীবনদর্শনে এই প্রয়োগের নাম “কর্ম-পরিণত বেদান্ত”(Practical Vedanta)। “ভারতে প্রাচীনকালে এই-সকল ভাব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরুগণের সংকীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই-সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই। * * *

“এখন এই-সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক পুস্তকগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, ঐগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে; যাহাতে ঐ-সকল ভাব সাধু পাপী আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই-সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে-বায়ু গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হইবে—‘তত্ত্বমসি’। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইবে—‘তত্ত্বমসি’।”[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে ‘অভয়’ একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চিকাগো ধর্মসম্মিলনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও সমাদর বিশেষ করিয়া তাঁহার এই নির্ভীক বীর ভাবটিকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছিল।

তাঁহাকে "Cyclonic Hindu" (প্রভঞ্জনকল্প হিন্দু) আখ্যা সাংবাদিকরা দিয়াছিলেন। ধর্মসম্মিলনে তাঁহার অনন্যসাধারণ খ্যাতির পর চিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় তাঁহার যে বড় পোস্টার-ছবি টাঙানো হইয়াছিল উহা তাঁহার বীরমূর্তিরই চিত্র। এই ছবি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় এই ব্যক্তি আর কিছু না হোন সর্বকাপুরুষতামুক্ত নির্ভীক পুরুষ বটেন। নির্ভীকতা যে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সূত্র খুঁজিতে গেলে বলিতে হয় উহা তাঁহার 'নিত্যসিদ্ধতা'রই অঙ্গ। যিনি সংসারের সর্বপ্রকার অজ্ঞান ও মোহ হইতে বিনির্মুক্ত তিনি স্বভাবতই ভয়হীন। উপনিষদ্ নানা স্থানে ভয় এবং অভয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিবেকানন্দ উপনিষদের আত্মজ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিয়া নির্ভীকতা তাঁহার সকল আচরণ ও কর্মে ওতপ্রোত হইয়া থাকিত। "ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর", "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর," "অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ", "ভগবানকে বিশ্বাস করিবার আগে নিজেকে বিশ্বাস কর", ইত্যাকার বহু উক্তিতে স্বামীজীর এই বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সাহস ও শক্তিমত্তা সর্বস্তরেই মানুষকে অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সেই জন্য তিনি কি ব্যক্তিগত, পরিবারগত, অথবা সমাজগত, শিক্ষাগত কিংবা ধর্মগত—সকল-ক্ষেত্রেই উদ্যম, সাহস এবং নির্ভীকতার অনুশীলনের কথা বলিতেন। "Expansion is life, contraction is death (পরিবিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু)।" স্বামীজীর একটি বহু-উদাহৃত উক্তি। স্বামীজীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুধ্যান এই সাহস ও শক্তিমত্তার অনুভব হইতেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে অনেক নেতা ও কর্মী স্বামীজীর নির্ভীক দাসত্বমুক্তির উদাত্ত বাণী হইতে যে বহুল প্রেরণা পাইয়াছিলেন ইহা আজ সুবিদিত। এই সকল দেশ-কর্মীদের অনেকে স্বামীজীকে দেশের মুক্তিযজ্ঞের এক প্রধান হোতা বলিয়া মনে করিতেন। স্বামীজীর নিকট স্বাধীনতা শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ ছিল। যে কোন স্তরের শৃঙ্খলমুক্তির প্রচেষ্টাকে তিনি সম্মান করিতেন। রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা—এই সকলের উৎপত্তিস্থান স্বামীজীর দৃষ্টিতে একই। উহা মানুষের অন্তর্নিহিত নিজস্ব নিত্যমুক্ত স্বভাব। অতএব যে কোনও প্রকার মুক্তিপ্রচেষ্টা আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনারই রূপান্তর। মানুষ যেখানেই মাথা তুলিয়াছে, দুর্বলতা ছাড়িয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উৎসাহে দুর্গমকে জয় করিতে ছুটিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানেই হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেন। আমেরিকায় আসিয়া ঐ দেশের সমাজ, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় স্বাধীন প্রচেষ্টার প্রভূত সুযোগ লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আইরিশ অধিবাসীদের আমেরিকায় প্রথম জাহাজ হইতে নামিবার

সময় ভীরু ও সন্ত্রস্ত ভাব এবং আমেরিকার মুক্ত পরিবেশে কয়েকমাস থাকিবার পরে তাহাদের সেই ভাবের দ্রুত পরিবর্তন, তথা মুখে, চোখে, কথায় আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও উদ্যমের অভিস্ফূর্তি—এই ঘটনা স্বামীজী গভীর মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনদর্শনের অন্যতম প্রতিজ্ঞা—সকল মানুষের অন্তরশায়ী আত্মা যিনি সর্বশক্তির আকর, চিরমুক্ত, চিরস্বচ্ছ, তাঁহার জাগরণই মানুষের সকল কল্যাণের নিদান। আইরিশ অধিবাসীদের ক্ষেত্রে স্বামীজী বলিতেন : আমেরিকার মুক্ত পরিবেশে আসিয়া তাহাদের ভিতরকার সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিলেন। স্বদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বাধা ও অত্যাচারের ফলে তাহাদের সেই ব্রহ্ম ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

✓একথা সত্য যে ইউরোপ আমেরিকায় এবং স্বদেশেও স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্ত বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তিনি শুধু অদ্বৈতবাদী ছিলেন ইহা বলিলে তাঁহার জীবনদর্শনের প্রতি অবিচার করা হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—বেদান্তের এই তিন ধারা যে পরস্পর বিরোধী নয় স্বামীজী ইহা বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা আধ্যাত্মিক জীবনের তিনটি ধাপ। দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈত—এই ক্রমে জীব-জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের উপলব্ধি উপস্থিত হয়। ইহা ন্যায়ের যুক্তি সহায়ে বোধগম্য না হইলেও প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই নানা দ্বৈতভাবের দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতপথের চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধিও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।" নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামিয়া আসিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় দেখা—ইহাই তাঁহার কথিত 'বিজ্ঞানে'র নিষ্কর্ষ। স্বামীজীর জীবনীপাঠক জানেন, কাশীপুর উদ্যানবাটিতে স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধিতে একটানা কিছুকাল ডুবিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন : "তুই তো বড় হীন বুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।" নরেন্দ্র সুফী সাধক জাফরের একটি গান ঠাকুরের নিকট গাহিতেন : "জ্যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।" ঠাকুর সমাধির পারের অবস্থা বুঝাইতে গিয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন : ঐ গানের ভাবের মধ্যেই ঐ অবস্থার ইঙ্গিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বক্তৃতায় যেমন অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি অন্যান্য একাধিক বক্তৃতায় জগৎসংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবিবার উপর জোর দিয়াছেন। প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ এই গ্রন্থচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি যোগকেই প্রকৃষ্ট মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজীর জীবনদর্শনে যোগসমন্বয়

এবং বেদান্তের ত্রিধারার সমন্বয় অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি সত্যই সার্থক বার্তাবহ। যুক্তিদ্বারা এই সমন্বয়কে স্থাপিত করা যায় না। যুক্তি করে এক পক্ষকে সমর্থন এবং অন্য পক্ষকে প্রত্যাখ্যান। তাহাতে বুদ্ধিচাতুর্য এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক সমস্যার সুসমাধান হয় না। পরন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে আনে গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা। এই বিষয়ে স্বামীজী প্রাচীন আচার্যগণকেও সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বামীজীর মতে উপনিষদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত তিন ভাবেরই উক্তি বিকীর্ণ। তিন ভাবেরই প্রামাণিকতা স্বীকার্য। অদ্বৈতের ভাষ্যকারগণ দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতের বাক্যগুলিকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের কৌশলে অদ্বৈত প্রতিপাদক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্যাখ্যাতাগণ সুস্পষ্ট অদ্বৈতপর উক্তিগুলি নিজেদের ভাবে টানিয়া আনিয়াছেন। এই উভয় প্রচেষ্টাই স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে অসমীচীন। স্নেহময়ী মাতা যেমন বিভিন্ন সন্তানের পরিপাকশক্তি অনুযায়ী একই খাদ্যকে নানাভাবে প্রস্তুত করেন সেইরূপ সর্বলোক-কল্যাণকারিণী শ্রুতি বিভিন্ন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর জন্য জীব-জগৎ-ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বামীজী শ্রুতির ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী অপেক্ষা মূল বাক্যগুলিকে স্বাধীনভাবে বুঝিবার উপর জোর দিতেন। তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রচেষ্টা নাই। আছে স্বানুভূতির নিঃসন্দিগ্ধ সবলতা। স্বামীজীর দর্শন সর্বতোভাবে তাঁহার জীবনদর্শন। নিত্যসিদ্ধ মহাযোগীর উদার তত্ত্বোপলব্ধি মানুষের সর্বস্তরের সঙ্কীর্ণতা, দুর্বলতা ও অসহিষ্ণুতা দূর করিবার জন্য তাঁহার বাণী ও রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যতই দিন যাইতেছে ততই ঐ বাণীর গভীরতা ও কার্যোপযোগিতা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের উপদেশ নানাভাবে দিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ উহাতে যোগ করিয়াছেন দর্শনসমন্বয়, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিকতা ও ইহলৌকিকতার সমন্বয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরস্পর অনুকূল, স্বামী বিবেকানন্দের এই মননধারার অপূর্ব মৌলিকতা অবশ্যই স্বীকার্য।

স্বামীজী কি শঙ্করাচার্যের ন্যায় মায়াবাদী ছিলেন? অবশ্যই ছিলেন এবং মায়াকে statement of facts (প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের উপন্যাস) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শঙ্করাচার্যের এবং অপরাপর অদ্বৈতবাদিগণের মায়ার ধারণাকে একটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা দিয়াছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী অষ্টম বা একাদশ শতাব্দী নয়। শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যকে বেদান্তব্যাখ্যায় যেসকল বিপক্ষকে নিরস্ত করিতে হইয়াছিল স্বামীজীর সময়ে ঐ সকল বিপক্ষ অন্তরালে। কিন্তু ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে নূতন নূতন শক্তিশালী বিপক্ষ

শুধু অদ্বৈতবাদকে নয় দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেও নাড়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল (এবং এখনও হইতেছে)। এই বিপক্ষগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারা হইতে প্রসূত। প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণের সময়ে যেসকল লোকপ্রত্যক্ষ ঘটনা, আচার এবং নৈয়ায়িক ও দার্শনিক যুক্তি পরিচিত ও প্রচলিত ছিল তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিচারধারাকে পরিপুষ্ট করিতেন। বর্তমান কালের বিপক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্য ঐ সকল বিচারধারা পর্যাপ্ত নয়। এখন প্রয়োজন প্রকৃতিবিজ্ঞানের নূতন নূতন ঘটনা পর্যবেক্ষণের ফলে বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ বিচারধারা। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বেদান্ত উপনিষদ্‌-প্রতিষ্ঠ কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির সহিত সুসমঞ্জস।

স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনদর্শনে ঈশ্বরের স্থান সম্বন্ধে প্রচুর আলোকসম্পাত করে। আলমোড়া হইতে ১৮৯৭ সালের ৯ই জুলাই তিনি চিকাগোর মিস মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন ঃ "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি ; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন দার্শনিক প্রতিভা, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, ভাবসমৃদ্ধি বা চিন্তার উৎকর্ষের জন্য যত না আদরণীয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষক উহার মানুষকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে যথার্থ কল্যাণের দিকে লইবার প্রত্যক্ষ উপায় নির্দেশের জন্য। তাঁহার জীবনদর্শনের প্রত্যেকটি দিক তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর স্থাপিত বলিয়া উহার আবেদন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভিমুখে। তাঁহার জীবনদর্শন সহস্র সহস্র জীবনে শক্তিসঞ্চারের জন্য। মানুষের নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত চৈতন্যসত্তা, উহার অনুধ্যানজনিত সকলপ্রকার দুর্বলতা বর্জন, সর্বব্যাপী চৈতন্যের জ্ঞানসঞ্জাত প্রেম সমুদয় মানবগোষ্ঠীর প্রতি প্রয়োগ, সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে অপরিণামী চিরপ্রশান্ত অন্তরাত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের সকল কর্ম সম্পাদন, ঈশ্বরকে লোকলোকান্তরে না খুঁজিয়া মানুষের মধ্যে উহার আবিষ্কার চেষ্টা—এইগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের মূল কথা।

স্বামীজীর ধর্মচিন্তা

ধর্ম শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত। স্বামীজী সাধারণত, যে দুটি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এখানে আমাদের তাই-ই আলোচ্য, এবং বিশেষভাবে আলোচ্য—যে অর্থে ধার্মিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বা জ্ঞান-লাভ করাকে বুঝিয়েছেন ; এ অর্থে 'ধর্ম' ও 'মোক্ষ' সমার্থক।

আজকাল আমরা ধর্ম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি তা উভয়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল—ইহলোক ও পরলোকে কোন বাঞ্ছিত বস্তুলাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি, আবার ইহ-পর-লোকাতীত ভগবান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি।

চরম সত্যের বাচক হিসাবে 'ঈশ্বর' শব্দটি স্বামীজীর প্রিয় ছিল। ঈশ্বরের সগুণ প্রকাশ ও নির্গুণ স্বরূপ উভয় অর্থেই আমরা শব্দটি ব্যবহার করব। প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সব কথাই স্বামীজীর—কোথাও আক্ষরিক, কোথাও সংক্ষিপ্ত করা।

'চতুর্বর্গে'র 'ধর্ম'—মীমাংসকদের 'ধর্ম'

স্বামীজী পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন ঃ আমাদের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ বা জ্ঞানলাভ বা ভগবানলাভ হলেও মীমাংসকদের অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম, চতুর্বর্গের ধর্ম, যা ক্রিয়ামূলক, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয় আনে, তা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন। ক্রিয়ামূলক বলেই প্রয়োজন, কারণ তা তামসিকতা বা জড়ত্বকে কাটিয়ে দিতে পারে। আর এই কর্মের সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা বা আত্মচিন্তাকে যে কোন ভাবে জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে কমিয়ে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষ লাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে। অবশ্য "কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা ; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়?" প্রাথমিক অবস্থায় কিছু না করাকে সাত্ত্বিক-ভাব বলে অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষ মহা তামসিকতায় ডুবে যায়। কিন্তু এ দু-রকমের "কিছু না করা"র মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত—"সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল-মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়।" "প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থা" থেকে "সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন

শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায়," যা ঈশ্বরলাভ করার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, যেতে হলে আমাদের রাজসিকতার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে; কর্ম সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। এজন্যই "'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।"[১] কর্মের মাধ্যমে মোক্ষলাভের যথার্থ অধিকারী হওয়ার জন্য কেবল কর্ম নয়, সেই সঙ্গে যে কোন ভাবে ভগবচ্চিন্তাকে জড়িয়ে রাখার কথা বলে গেছেন স্বামীজীঃ "ভগবানের পূজা জ্ঞানে কাজ কর", "'অহং'-টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ কর", ইত্যাদি ; ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কর্ম কর, যা 'কর্মযোগ', যা গীতার "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম", "মামনুস্মর যুধ্য চ" প্রভৃতি ভক্তিভাবাশ্রিত বাণীর অনুসরণ করে, অথবা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে", সব কিছু করেও "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ"—এই জ্ঞান অবলম্বন করে কর্ম করারই নির্দেশ, অন্য ভাষায়।

এই কর্ম যেমন পূজা-হোমাদি কর্ম, তেমনি পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকর্মও। নবযুগে স্বামীজীর বিশেষ বাণী ঃ যে কোন কর্মক্ষেত্রে মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা; "আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য স্বদেশই তোমার একমাত্র দেবতা হউক"; "কাউকে কিছু দিতে গেলে নতজানু হয়ে দেবে—ভাববে ভগবান ঐরূপে তোমাকে দেবার সুযোগ দিচ্ছেন" ; "ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের'জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।"[২] স্বামীজীর এই উক্তিগুলি কেবল লোককল্যাণ-সাধন নয়—ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে মানুষের সেবা—যা একদিকে ব্যষ্টিকে ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে দেবে, অপরদিকে সর্ববিধ অকল্যাণের মূল কর্মীর ব্যক্তিগত স্বার্থকে ক্ষীণ ও পরিশেষে বিনষ্ট করে পারিবারিক, সামাজিক, দেশগত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক সর্ববিধ সমস্যার সমাধানও এনে দেবে। তাই স্বামীজীর এই ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে কর্মকে নবযুগের মহামন্ত্রও বলা যায়। এ মন্ত্রে নিজের জন্য কিছু চাওয়ার স্থান নেই, আছে 'কর্তব্যে'র আহবান—অপরকে কিছু দেবার প্রেরণা যা ভারতের সনাতন সমাজব্যবস্থার ধারার একান্ত অনুসারী।

স্বামীজী বলেছেন ঃ "...ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রপিন্ড, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের

মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।"[৩] বলেছেন ঃ যথার্থ ধর্মে, সর্বজনীন ধর্মে এ দুটোই থাকা চাই। কারণ সাধারণ মানুষকে স্থূল অবলম্বন করেই সূক্ষ্মকে ধারণা করতে হয়, তাছাড়া উপায় নেই। স্বামীজীর এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ তাই সর্বজনীন এবং সর্বদেশের সর্ববিধ অধিকারীরই উপযোগী। এই আদর্শ, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়ঃ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের সীমারেখাটি মুছে দিয়েছে, এবং আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালি, অফিস, বিদ্যায়তন, ক্ষেতখামার, কলকারখানা—সব কিছুতে মন্দিরের, সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে। এ আদর্শ, যাকে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র সমন্বয় বা "মোক্ষাভিলাষী ধর্ম"ই বলব (আসলে চতুর্বর্গের ধর্মের লক্ষ্যও তাই), মানবজাতির যথার্থ প্রগতির একমাত্র পথও। সেজন্য স্বামীজী রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা প্রধানত বলেছেন রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যে; আর কর্মের উপর জোর দিয়েছেন তৎকালে সাময়িকভাবে মহা তামসিকতায় আচ্ছন্ন ভারতে। ধর্ম ও মোক্ষের এই সমন্বিত আদর্শকেই তিনি অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন "ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজে"র সমন্বয় বলে, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র—প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সমন্বয় বলে। বলে গেছেন, ভারতবাসীর অন্তরে এখনও আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমান; "যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"[৪] আর তার সঙ্গে আমাদের সমন্বিত করতে হবে পাশ্চাত্যের "আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ"[৫]-কে। পাশ্চাত্যের যথার্থ উন্নতির জন্য, স্বার্থসঞ্জাত পরস্পর-সংঘাত থেকে বেঁচে থাকারই জন্য স্বামীজী যা বলে গেছেন তারই প্রতিধ্বনি করেছেন আর্নল্ড টয়েনবী ঃ ভারতীয় ধারায়—সম্রাট অশোক. মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত ধারায়—জীবনযাপনই এযুগে বিজ্ঞান ও শিল্পে অতি উন্নত মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ—সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার পথ।[৬]

মোক্ষ বা ঈশ্বরলাভ অর্থে ধর্ম

ধর্ম বলতে এখন আমরা যা সাধারণত বুঝি—ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভ বা তার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম বা সাধনা—সে বিষয়ে স্বামীজী সংক্ষেপে বলেছেন ঃ

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক. একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"[৭]

আত্মা ও ব্রহ্মঃ আত্মা বলতে এখানে খুব সহজ ভাষায়, আমাদের মধ্যে যে চেতন সত্তা, যে চিন্তা করে, যে বিচার করে, সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে, দেহাদিকে 'আমি' 'আমার' মনে করে, তাকেই বোঝায়। এর অন্য নাম জীবাত্মা। একটি স্থূলদেহ ত্যাগের পর এই আত্মা বা জীবাত্মাই দেহান্তর গ্রহণ করে। ব্রহ্ম বলতে বোঝায় জগৎ ও জীবনের যা মূল সত্য তাই। সেই সত্য থেকেই জীবজগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই আছে, আবার বিনাশের পর তাতেই লীন হয়। এই ব্রহ্ম বা মূল সত্য জীবাত্মারও আত্মা। এরই চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে মন-বুদ্ধিকে চেতন বলে মনে হয়। মন-বুদ্ধি-সীমিত 'অহং'বোধ জাগে—যা আমাদের সাধারণ 'আমি'বোধ, যা দেহ-মন-বুদ্ধিকেই 'আমি' বলে মনে করে। এই ব্রহ্মই—শুদ্ধ চেতনাই—মন-বুদ্ধ্যাদি-বিযুক্ত চেতনাই—বিশ্বে একমাত্র চেতন সত্তা; আমার-আপনার ভিতর, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের ভিতর, দেবতাদের ভিতর এমন কি অবতার-ঈশ্বরাদির ভিতরও এই এক অদ্বিতীয় চেতনারই প্রকাশ। বিভিন্নতা যা প্রকাশ পায় তা মন-বুদ্ধ্যাদি প্রকাশের মাধ্যমের বিভিন্নতার জন্যই।

এই ব্রহ্ম বা চরম সত্যকেই বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, কালী-শিব-নারায়ণ প্রভৃতি, আল্লা-গড প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছে। এই ব্রহ্ম এক আনন্দময় চেতন অবিনাশী সত্তা—সচ্চিদানন্দ। এই ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ—দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের স্বরূপ নয়। আমরা ভুল করে, অজ্ঞান বা মায়ার জন্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের দেহমনাদি-যুক্ত বলে ভাবি। এই ব্রহ্ম শুধু আমাদেরই না, বিশ্বের সব কিছুরই স্বরূপ—মূল সত্তা। এই ব্রহ্মই জীবজগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন (বা হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে)।

স্বামীজী এই সত্যটিকে অতিসংক্ষেপে সূত্রাকারে বলেছেন—ভগবানলাভের

দুটি প্রধান পথ জ্ঞান ও ভক্তির[৮] দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেনঃ "হয় বল সবই আমি, আর না হয় বল সবই তুমি।" সত্তা বলতে বস্তু বলতে বিশ্বে দুটি কিছু নেই। যা কিছু বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয়, তা ভ্রমবশত—অজ্ঞান বা মায়াবশত। সূত্রাকারে বলেছেনঃ "এই যে বৃক্ষটি—এর ভেতর সত্তা হচ্ছেন ব্রহ্ম, আর বৃক্ষত্বটা মায়া।" মায়া বলতে, স্বামীজীর মতে, যা ঘটছে তারই বিবৃতিমাত্র—সত্যকে অন্যরূপে দেখার বিবৃতিমাত্র। সত্যকে অন্যরূপে দেখার অন্যতম উদাহরণ দিয়েছেন, একটা জ্বলন্ত মশালকে যখন খুব জোরে ঘোরানো হয়—আমরা তখন একটা আলোকের বৃত্ত দেখি। যদিও আলোকের বৃত্তের কোন অস্তিত্ব নেই, যদিও সত্য হচ্ছে যে একটা আলোকবিন্দু ঘুরছে, তবু আমরা সত্যকে অন্যরূপে দেখি, না দেখে পারি না। মানসিক ক্ষেত্রেও যা ঘটছে তা না মেনে নিয়ে যে আমরা পারি না—'স্নেহ' প্রভৃতি গালভরা যে নামই দিই না তার—তাও তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। এই মায়া বা অজ্ঞানের জন্যই আমরা জগৎকারণ ব্রহ্মকে তাঁর কার্য জীবজগৎ রূপে দেখি। অজ্ঞান চলে গেলে আর জীবজগৎ দেখা যায় না—একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হন—দুটো একসঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় না। কার্য ও কারণ একসঙ্গে দেখা যায় না। ঘূর্ণ্যমান আলোকবিন্দু ও আলোকবৃত্ত—একসঙ্গে একটিকেই দেখতে পারি আমরা, একই কালে উভয়কে নয়।[৯]

এক অদ্বিতীয় চেতন আনন্দময় সত্তা, ব্রহ্ম, ছাড়া বিশ্বে দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই—তাঁকেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে দেখি আমরা। এক অবস্থায়, স্বামীজী বলেছেনঃ "যখন বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখি", স্থূল জগৎরূপে দেখা যায়; "যখন সোজাসুজি মন-বুদ্ধির মাধ্যমে দেখি", তখন সূক্ষ্ম জগৎরূপে দেখা যায়, সূক্ষ্মদেহী দেবতাদির বা ঈশ্বরীয় রূপের দর্শন হয়; তাকেই আবার "যখন মন-বুদ্ধির পারে গিয়ে প্রত্যক্ষ করি," অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তারূপে—নিজেরই স্বরূপরূপে প্রত্যক্ষ করি।

"আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম"—একথা স্বামীজী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো কেবল বুদ্ধি-যুক্তি সহায়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেননি—এ তাঁর অনুমান বা যুক্তির সিদ্ধান্তমাত্র নয়; বেদাদি শাস্ত্রে বলেছে বলে, এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনেছেন বলেই উদ্ধৃতিমাত্র রূপেও বলেননি; বলেছেন নিজে প্রত্যক্ষ করে, ভারতীয় দার্শনিক ধর্মাচার্যগণের মতো আগে সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ করে

পরে কালোপযোগী যুক্তির মাধ্যমে—আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য করে তা বলেছেন। এখানে আমরা তাঁর সত্যোপলব্ধির পূর্বের কিছু ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছি, যে পটভূমি স্বামীজীর ধর্মচিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা জানি, ছাত্রাবস্থাতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি, অসংখ্য পুস্তক পড়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ঈশ্বর আছেন কি নেই, বই পড়ে যুক্তিতর্ক সহায়ে তা প্রমাণিত হয় নাঃ "যুক্তি উভয় দিকেই সমান।"[১০] ঈশ্বরের অস্তিত্বে নিঃসংশয় হওয়ার একমাত্র উপায়—"যা সর্ববিধ জ্ঞানেরই মূল ভিত্তি"—তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। ঈশ্বরকে দেখেছেন এমন একজন লোকের সন্ধানে যখন শেষে তিনি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং "ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা"—এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলতে শুনলেনঃ "হাঁ দেখেছি, তোকে যেভাবে দেখছি, তার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে দেখেছি"—তখন তিনি সর্ববিধ আধুনিক সংশয়ের মূর্ত প্রতীক। আমরা জানি, সে সময় "আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁচ পাত্রের মতো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে", পাশ্চাত্যে চিন্তাশীল মানুষ তখন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হতে শিখেছে, শাস্ত্রের বা কোন মহাপুরুষের কথা বিশ্বাস করে নেবার মতো মনের অবস্থা তাঁদের নেই—বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তাশীল মানুষ সব কিছু যাচিয়ে বাজিয়ে, পরীক্ষা করে নিতে চাইছে; ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে রাজশক্তির রথে সে চিন্তাধারা তখন ভারতেও—বিশেষ করে "ইয়ং বেঙ্গল"দের কাছেও পৌঁছে গেছে। স্বামীজী সে চিন্তার সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত। "যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী যা, তা কিছুতেই মেনে নেব না"—এই তৎকালীন এবং আধুনিক ভাবেরও মূর্ত প্রতীক তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন—সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত পথেই তাঁকে ঈশ্বরোপলব্ধির দিকে চালিত করেছিলেন। অবাক হয়ে স্বামীজী তাঁর মুখে শুধু "ঈশ্বরকে আমি দেখেছি" নয়, শুনলেন, "যদি চাস্ তোকেও দেখাতে পারি।" বার বার শুনলেন, কোন কথা মেনে নেবার প্রয়োজন নেই; এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁকে বলেছেনঃ "আমি বলছি বলেও মেনে নেবার প্রয়োজন নেই, নিজে যাচাই করে নে।" "আমি দেখেছি" বলেই বিশ্বাস করার, "আমি বলছি" বলেই কোন সত্য মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—যে পদ্ধতি ধরে আমি এ সত্যে পৌঁছেছি, তোমায় বলছি, তুমিও সে পদ্ধতি অবলম্বনে নিজে পরীক্ষা করে, 'যাচাই' করে দেখে নাও তা সত্য কিনা। কোন বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল কোন বিজ্ঞানী বললেই গৃহীত হয় না, যে পদ্ধতি ধরে তিনি সে সত্যে পৌঁছেছেন তা জানাতে হয়,

অন্যান্য বিজ্ঞানীরা (অবশ্য যাঁদের যোগ্যতা আছে) সে পদ্ধতি ধরে তার সত্যতা যাচাই করে দেখার পর তবে তা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঠিক সেই বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত কথাই স্বামীজী শুনলেন—শাস্ত্রের কথা, তাঁর কথাও মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—পদ্ধতি বলা আছে, নিজে যাচাই করে দেখে নাও এসব সত্য কিনা।

বিজ্ঞানের কথায় বিশ্বাস তখন (এখনও), স্বামীজীর ভাষায়, "এক ধরনের কুসংস্কারের মতো" শিক্ষিত ব্যক্তির মন জুড়ে বসেছে; অথচ, যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভাবের, যথার্থ যুক্তিসম্মত ভাবের অভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শুধু তখন নয়, এখনও আমরা অনেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার, যুক্তির দোহাই দিই, কিন্তু ঋষিদের কথায়, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্টের কথায় অবিশ্বাস করতে শিখি আর এক-জনের কথায় 'বিশ্বাস' করে—যার চেয়ে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক আর কিছু থাকতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই স্বামীজীকে "আমি দেখেছি" বলার পরেই বললেন, "যদি চাস্ তোকেই দেখাতে পারি।" বললেন, কারও কথাই মেনে নেবার প্রয়োজন নেই—নিজে যাচাই করে দেখে নাও এসব সত্য কিনা। স্বামীজী যথার্থ যুক্তিবাদী ছিলেন, যুক্তির দোহাই দিয়ে একটা কুসংস্কার ছেড়ে আর একটাকে আঁকড়ে ধরতেন না, তাই তৎকালে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মে মাত্র বিশ্বাসী হলেও, মা কালীকে 'পুত্তলিকা' বললেও, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যেদিন মা কালীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করলেন, সেদিনই তাঁর মনে হয়েছিল, ধর্ম বিষয়ক সত্য সম্বন্ধে, শাস্ত্রে যেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ উপলব্ধি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেন, সেসবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন মতামত দেবার অধিকারই কারও আসে না, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পদ্ধতি ধরে গিয়ে সে নিজে তার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখছে। পরে একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেনও।[১১]

অবশ্য নিজে পরীক্ষা করে দেখার প্রসঙ্গে তার জন্য যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনের প্রশ্ন ওঠে; অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিনা প্রতিবাদে ঘাড় পেতে একথা স্বীকার করে নিলেও ধর্মের ক্ষেত্রে একথা আমরা ভুলে যাই। আগেই বলেছি, স্বামীজী আধুনিক চিন্তার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বলে আধুনিক চিন্তার এই দৈন্য লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যে একটি বক্তৃতায় বলেছেনঃ "বিষয়কর্মে উন্নতি লাভের জন্য—একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তার হবার জন্য—দীর্ঘকাল কঠোর শ্রম করে বিদ্যার্জন করি আমরা। এরূপ করেছি বলেই কিন্তু পরে কেউ বসে খেতে দেয় না—পরেও কঠোর শ্রম করে বিষয়কর্ম করতে হয়। হয়তো ছেলে মরে গেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, তবুও বিষয়কর্ম ছাড়ে না—সেই অবস্থাতেই কার্যক্ষেত্রে যেতে হয়। এর বিনিময়ে পাই কি আমরা? সাধারণের

চেয়ে ভাল থাকা-খাওয়ার একটু সুযোগ! আর ঈশ্বরলাভের মতো এতবড় একটা বস্তুলাভ করতে চাই বিনা শ্রমে, বিনা যোগ্যতা-অর্জনে!”

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে; স্বামীজীর পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে এবং আমাদের দেশের একজন আধুনিক বড় বিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘটনাটি জড়িত বলেই আমরা বাহুল্য হলেও সেটি এখানে উল্লেখ করছি। আমরা তখন ছাত্র, রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রাবাসে থাকি। ছাত্রাবাসটির অধ্যক্ষ (স্বামী নির্বেদানন্দ) মাননীয় সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে ভালও বাসতেন খুব—আমরাই ছাত্রাবস্থায় ঐ আশ্রমে বহুবার তাঁদের আসতে দেখেছি। একবার এমনিভাবে সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কয়েকজন এসেছেন, দুপুরে খাওয়ার পর একসঙ্গে বসে গল্প করছেন। এত বড় বড় পণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ দেখে আমরাও স্বভাবতই তাঁদের কথা শুনতে সেখানে গেছি। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন "The Cultural Heritage of India" গ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ "Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance" লিখছেন। তার ভিতরে এক অধ্যায়ে দেখানো আছে বেদান্তের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের বিরোধী নয়—যা স্বামীজী বলে গেছেন। প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞানবিষয়ক অংশটি স্বামী নির্বেদানন্দ ডক্টর সাহাকে দেখতে দিলেন। তিনি পুরো অধ্যায়টিই পড়ে ফেলে বললেনঃ “কিন্তু স্বামীজী একটা কথা আছে। বিজ্ঞানের কোন সত্য কেউ মানতে না চাইলে তখনি তাকে আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে পারি। তোমরা (ধর্মের সত্য সম্বন্ধে) তা পার না।” স্বামী নির্বেদানন্দ বললেনঃ “তোমরাও পার না।” কথা শুনে সকলেই জিজ্ঞাসুনেত্রে নির্বেদানন্দজীর দিকে চাইলেন। সামনের মাঠে একটি চাষী লাঙল দিচ্ছিল—নামটি এখনও মনে আছে, গোলামবারী,—স্বামী নির্বেদানন্দ তাকে দেখিয়ে ডক্টর সাহাকে বললেন, “একে আজ তোমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে তোমার অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের লেটেস্ট থিওরিটা বুঝিয়ে দিতে পার?” ডক্টর সাহা বললেনঃ “না, তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন।” স্বামী নির্বেদানন্দ বললেনঃ “এ ক্ষেত্রেও তাই।”

একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বই পড়ে বুদ্ধি, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার প্রচেষ্টায় আধুনিক অবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক রূপে হলেও অন্যদিকে স্বামীজী প্রাচ্য ব্রহ্মচর্য আশ্রমের বিদ্যার্থীর মতোই ধর্মজগতের সত্যগুলিকে নিজে যাচাই করে দেখার মতো পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন—অটুট ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ, ধ্যানপরায়ণ-চিত্ত, অসীম মনোবলের অধিকারী, তীব্র বৈরাগ্যবান্—সত্যলাভের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই মা কালীকে দর্শন করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের

কথামতো চলে ধর্মজগতের চরম উপলব্ধি নির্বিকল্প সমাধিলাভ—অদ্বয় আনন্দময় অবিনাশী চেতনার সঙ্গে, ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এই অদ্বয় সত্তা ব্রহ্মকেই বহুভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—সাকার রূপে আবার সর্বভূতে সাকার মা কালী রূপে এবং চৈতন্যরূপেও—"দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, বিচার আর কি করবো", "মা দেখিয়ে দিলেন মন্দিরের মেজে চৌকাট মার্বেল কোষাকুষি সব চৈতন্যে জবরে রয়েছে,"—স্বামীজী নিজেও তেমনি সর্বভাবে সেই একই সত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সেই সত্যকে সাকার মা কালীরূপে ও কাশীপুর উদ্যানে নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় ব্রহ্মরূপে, নিজেরই স্বরূপরূপে উপলব্ধির কথা সর্বজনবিদিত; এই সত্যকেই সর্বভূতে দেখেছিলেন—যার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধির পরঃ "এর চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে, তুই না গান করিস, যো কুছ হ্যায় সো তূঁহী হ্যায়?" আমাদের বিশ্বাস, এটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন হরিদ্বার থেকে হিমালয়ে কোন নির্জন প্রদেশ খুঁজতে যাবার পথে এক বটবৃক্ষতলে বসে. যার পর তিনি লিখেছিলেনঃ "যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

ব্রহ্ম বা চরম সত্য "'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্',বোঝে—প্রাণ বোঝে যার,"[১২] যুক্তি দিয়ে তা ধরা যায় না, তবু স্বামীজী বলেছেন, যুক্তি যতদূর যেতে পারে তার ভিতর এ সত্য সম্বন্ধে যুক্তি বিরোধীও কিছু নেই। সেজন্য নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির পথেই এ বিষয়ে আধুনিক মন-বুদ্ধির সংশয়গুলির নিরসন করেছেন। এখানে সেগুলির দু-একটি মাত্র উল্লেখ করছিঃ

(১) অদ্বয় আনন্দময় অবিনাশী সত্তাই—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত। মন-বুদ্ধির উপলব্ধিগম্য জগতের সব কিছুই, আমাদের মন, বুদ্ধি এবং তাতে সীমিত বা তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আমাদের চেতনা—'অহং'বোধও তিনিই হয়েছেন। সব কিছুর ভিতরই তিনি অন্তর্নিহিত, সত্তা হিসাবে একমাত্র তিনিই আছেন, বাকি সবই তাঁর অভিব্যক্তি বা স্থূল রূপান্তর বা প্রকাশমাত্র—"আত্মা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থূলাকারে অভিব্যক্তি মাত্র।... এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থূল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, আর তাহার পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম স্পন্দন, যাহাকে ঈশ্বরেচ্ছা বলা যায়।"[১৩] জগৎরূপে তাঁর

প্রকাশের মূল কারণ তিনিই—তবে আপেক্ষিক ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্মতর প্রকাশই স্থূলতর প্রকাশের কারণ। অর্থাৎ সূক্ষ্মই স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে; আবার স্থূলের বিনাশের সময় তা সূক্ষ্মেই পরিণত হয়। সৃষ্টি বা বিনাশ বলে কিছু নেই। সবই রূপান্তর মাত্র। পূর্ব ও পরবর্তী ধাপগুলি ছেড়ে দিয়ে বলা যায় চেতনাই মনরূপে এবং মনই জগৎরূপে প্রকাশিত।[১৪]

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ। এটাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত যে কোন জড় পদার্থের (ম্যাটার) কারণ সূক্ষ্মতর পরমাণু, তারও কারণ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ইলেকট্রনাদি, তারও কারণ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ, বা অন্য রূপে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তি (energy) —আমরা যা কিছু বহু বিচিত্র রূপগুণবিশিষ্ট বস্তু দেখি সবই এই শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। সত্তা হিসাবে, 'বস্তু' হিসাবে তার ভিতর আর কিছুই নেই। জগতের 'বিনাশ'কালে সবই আবার শক্তিই হয়ে যেতে পারে—এসব আজ আমরা বুঝি। জগতের যত মূলের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই বৈচিত্র্য কমে আসে, ততই তা একত্বাভিমুখী হয়, এও আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যুক্তিসম্মত। স্বামীজী তাই বলেছেনঃ ভারতের ঋষিরা যে সত্য এতদিন হৃদয়ে পোষণ করে আসছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে তা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত। অবশ্য পরিণামবাদের দিক থেকে দেখলে—তাও বলেছেন।

কিন্তু আধুনিক যুক্তি এক জায়গায় এসে থমকে যাচ্ছে। জড় পদার্থ শক্তি প্রভৃতি অচেতন পদার্থেরও কারণ যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর পদার্থ মন, তারও কারণ চেতনা—এটা সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ দেখা যাচ্ছে মন-বুদ্ধি-চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণী জগতে রয়েছে—অচেতন পদার্থের ভিতর থেকেই বিশেষ অবস্থায় চেতনাদির প্রকাশ ঘটছে। এই বিকাশকে আধুনিক যুক্তি অচেতন বস্তুরই 'গুণ' বলে ধরে নিচ্ছে—একটা পরিবেশে যা প্রকাশ পায়, সে পরিবেশ না থাকলে যার অস্তিত্বই থাকে না; যেমন বিশেষ পরিবেশে জলরূপে প্রকাশ পেলেও তার ভিতর অধিকতর সূক্ষ্ম হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর বা তারও ভিতর ইলেকট্রনাদির অস্তিত্ব থেকেই যায়—জলরূপ প্রকাশের আগেও থাকে, জল বিনষ্ট হবার পরেও থাকে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মন, চেতনা প্রভৃতি সেরকম কোন 'বস্তু' নয়, দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেই সেগুলিরও অস্তিত্ব লোপ পায়।

স্বামীজী এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছেন, বিজ্ঞানভিত্তিক বা জড়বাদ-

ভিত্তিক যুক্তির দিক থেকে সে প্রশ্নের কোন উত্তরই নেই। অবশ্য মনকে দেহাতীত বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করেই তিনি একথা বলেছেন। স্বামীজী বলেছেন যে, কোন কিছুর ভিতর তার সূক্ষ্ম কারণরূপে কিছু অন্তর্নিহিত না থাকলে কোন পরিবেশ সৃষ্টি করেই তার ভিতর থেকে তার প্রকাশ ঘটানো যায় না। যেমন, কোন জড় পদার্থের ভিতর হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ইলেকট্রনাদি বা শক্তি অন্তর্নিহিত না থাকলে কোন পরিবেশ সৃষ্টিতেই তার ভিতর থেকে এসবের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তেমনি মন-বুদ্ধি-চেতনাদি যদি বস্তুর ভিতর পূর্ব থেকেই অন্তর্নিহিত না থাকত, তাহলে সেগুলির ভিতর থেকে এসবের বিকাশ হয় কিরূপে? "শূন্য হইতে কিছুই নির্মাণ করা যায় না।"[১৫]

অবশ্য, পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিকদের চিরাচরিত প্রথানুসারে আগে সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ করে পরে তিনি যুক্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—অবশ্য যুক্তি যতদূর যেতে পারে, তত দূরেই। সেজন্যই একটি বক্তৃতায় আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁরা মনকে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্লেষণ না করেই অনুমান সহায়ে মনস্তত্ত্বের বই লিখছেন—যার ফলে এসব বিষয়ে বিভ্রান্ত মানুষ আরও বিভ্রান্ত হচ্ছে।[১৬] মন দেখা যায়—শুধু স্বামীজীই নন, বহু সত্যদ্রষ্টা দেখেছেন, সূক্ষ্ম বস্তু দেখার যোগ্যতা অর্জন করে সবাই তা দেখতে পারে। আধুনিক যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানও বলে গেছেনঃ "মন দেখা যায়", "কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে তার মন দেখতে পাই—কাঁচের আলমারির ভিতরকার জিনিস যেমন দেখা যায় তেমনি দেখতে পাই।" এরূপ সূক্ষ্মদ্রষ্টার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমাদেরই হয়েছে।

যোগ অভ্যাসের ফলে নিজের মনকে নিজেই পর্যবেক্ষণ করার শক্তি আসে।[১৭] তেমনি, মনেরও পিছনে আছে চৈতন্য। কাজেই যতদূর যুক্তি যেতে পারে তার ভিতর আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম—এই বাণীর বিরোধী কিছুই নেই, বরং তার স্বপক্ষেই যুক্তি আছে।

(২) জগতের আর পাঁচটা জিনিস যেমন দেখি, ঈশ্বরকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ঈশ্বর নেই—এই আধুনিক যুক্তির (অবশ্য অগভীর যুক্তি এটি) উত্তর স্বামীজী কি দিয়েছেন, আগেই পরোক্ষে তা বলা হয়েছে—দেখার যোগ্যতা অর্জন করে, নিজে যাচাই করে দেখ, পরে এ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার আসবে। যুক্তির দিক থেকে বলেছেন, কোন বিশেষ পরিবেশে প্রকৃতিতে একবার যে ঘটনা ঘটে, সর্বকালেই ঠিক সেই পরিবেশে সেই ঘটনাই

ঘটবে। তা যদি না ঘটে, তা সত্যই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, "তোকেও দেখাতে পারি", এরই ইঙ্গিত। যাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি বলে ঘোষণা করছেন, তাঁরা যেভাবে চলে মনকে শুদ্ধ একাগ্র করে তা করেছেন, যে কেউ ঠিক সেভাবে চলে মনকে সেরকম করতে পারলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবেই। সেভাবে চলে নিজে দেখার আগে মন্তব্য করা—অন্য বিষয়ে যত বড় মনীষীই হই না আমরা—সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত স্থূল জগতের সত্যগুলির মধ্যে পরমাণু প্রভৃতি অনেক কিছুই সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তাই বলে সেগুলির অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত? [১৮]

(৩) আধুনিক জড়বাদীদের বিশিষ্ট মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি যুক্তি হল, ঈশ্বর থাকলে সব ধর্মই তাঁর সম্বন্ধে একই প্রকার বর্ণনা দেবে; কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করে, কাজেই "সব ধর্ম অ-সত্য, ঈশ্বরও অসত্য।"

এই যুক্তির উত্তরও স্বামীজীর কথায় পাওয়া যায়। সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) কয়েকজনকে নিয়ে তাঁদের জীবনগঠনের জন্য যেসব আলোচনা তিনি করতেন, তার ভিতর এক জায়গায় বলেছেনঃ "আমার গুরুদেব বলতেনঃ ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।" [১৯]

যতক্ষণ না আমরা মন-বুদ্ধির পারে যাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মন-বুদ্ধির ধারণা-শক্তির গণ্ডির ভিতরকার কিছু অবলম্বন করেই আমাদের মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করতে হবে। মন-বুদ্ধির পারে গেলে তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হবে। সাধারণ মানুষের অবলম্বনের জন্য সেই সত্যের একটা স্থূল রূপ চাই-ই। মূল সত্য এক হলেও তার স্থূলরূপ অসংখ্য হতে পারে—যেমন কোন বৃত্তের কেন্দ্র-বিন্দু এক হলেও কেন্দ্রবিন্দুর সর্বাধিক নিকটতম ক্ষেত্রে বৃত্ত টানলেও তার ভিতর অসংখ্য বিন্দু অবস্থান করতে পারে। স্থূল বলতে সেই সত্যকে সাকার সগুণ—আমাদের মতো একজন মানুষ, মানুষের মতোই গুণবিশিষ্ট ভাবা বোঝায়। কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি ভাবাত্মক অবলম্বনও সেই সত্যের তুলনায় যেমন স্থূল, তাঁকে নিরাকার সগুণ—গড্, আল্লা ইত্যাদি ভাবাত্মক অবলম্বনও তাই, তাঁর নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নির্গুণা

নিরাকারা মা প্রভৃতি ভাবে চিন্তারূপ মন-বুদ্ধিগ্রাহ্য অবলম্বনও তাই। যা কিছু চিন্তা করা সম্ভব, বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব—তার কোনটিই চরম সত্য বা ঈশ্বরের স্বরূপ নয়, সে সবই তাঁর স্থূল রূপ। তাঁর স্বরূপ মাত্র উপলব্ধি-গম্য—ভাষায় বা চিন্তায় কখনও তা প্রকাশ করা যায় না। নাম ও রূপ ছাড়া—মনে মনে কথা বলা বা ছবি দেখা ছাড়া, বা দুইই একসঙ্গে করা ছাড়া চিন্তার কোন পৃথক অস্তিত্বই নেই। তাই বিভিন্ন ধর্মাচার্যেরা সেই 'অবাঙ্‌মনসো-গোচরম্‌' সত্যে মানুষের উপলব্ধিকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পথের অবলম্বন রূপে মন-বুদ্ধির সীমায় সেই একই সত্যের একটা স্থূল আকার দিয়ে গেছেন—বিভিন্ন দেশ-কালের, বিভিন্ন রুচি ও শক্তিবিশিষ্ট মানুষের উপযোগী করে বিভিন্ন 'আকার' দিয়ে গেছেন। আর কালের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়ে চলে বলে প্রতিবারেই তাঁরা এই একই সত্যের "স্থূল রূপের"—মন-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপের—একটা নতুন আকার দিয়ে যান। স্বামীজী বলেছেনঃ এইসব স্থূল রূপের যে কোন একটি অবলম্বনে মন একাগ্র করে মন-বুদ্ধির পারে যেতে পারলে সেখানে সকলেই—মন-বুদ্ধির সীমার ভিতর থাকাকালীন ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা যার যা-ই হোক না কেন—একই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, "সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।"[২০] যেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বলেছেনঃ "সেখানে সব শেয়ালের এক রা।"

অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব বা নিজের স্বরূপ উপলব্ধিই ধর্ম

আমরা আসলে যা—আমাদের ব্রহ্মভাব—যা আমাদের স্বরূপ, সেটি উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা সাধারণত দেহ-মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে নিজের চেতনাকে অনুভব করি—এগুলি থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে পারি না। দেহ নেই, চিন্তা নেই, বিচার নেই—অথচ 'আমি'বোধ আছে—এটা সাধারণ অবস্থায় আমাদের ধারণার অতীত। দেহ-মন-বুদ্ধিতে জড়িয়ে থাকা ছাড়া যে চেতনা থাকতে পারে, তা আমরা ভাবতেই পারি না। 'চেতনা' বললে মানুষ, গরু, পিঁপড়ে প্রভৃতি দেহ-মন-বুদ্ধি-জড়িত চেতন কোন প্রাণীর কথাই ধারণায় আসে, বড় জোর স্থূল দেহহীন কেবল মন-বুদ্ধি (সূক্ষ্মদেহ) বিশিষ্ট দেবতা বা ভূতপ্রেতাদির কল্পনা করতে পারি। দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে পৃথক শুদ্ধ চেতনার অস্তিত্ব সাধারণ অবস্থায় আমাদের ধারণাতীত—শাস্ত্রাদি পড়ে

'শুদ্ধচেতনা' শব্দটিই শুধু মনে ভাবতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি—বড় জোর এই পর্যন্ত। অথচ সত্য হল—পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বুদ্ধিযুক্তি সহায়ে লব্ধ সিদ্ধান্তমাত্র নয়, কারও বলা বা লেখা কথার উদ্ধৃতিমাত্র নয়, অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ করা সত্য হল—আমরা সকলেই, বিশ্বের সব কিছুই আসলে তাই। এই সেদিনকার কথা—স্বামী বিবেকানন্দই এই সত্য বহুবার উপলব্ধি করেছেন, আবার নিজেকে দেহমনের সীমায় ফিরিয়ে এনেছেন। বলেছেনঃ "মানুষ 'বিবেকানন্দ' নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।"[২১] বহুবার স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে তিনি বলেছেনঃ "আমার মন সর্বক্ষণ ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকে। ঠাকুর বলেছেন তাই কাজ করছি।" এটা অবশ্য বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না; যা আমাদের বুদ্ধি ধারণা করতে পারে, তা হল তিনি বহুবার নিজের শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন আবার দেহ-মন-বুদ্ধির সীমায় ফিরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এরূপ করতে প্রায় প্রতিদিনই বহুজন দেখেছেন। যেটুকু দেখা যায় বাইরের লোক তাই দেখেছেন, বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হওয়া, বাকিটা তাঁরই মুখে শোনা।

আমাদের এই 'আমি'বোধকে ক্রমে দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের আসল রূপ—শুদ্ধ চেতনা, যা পরমানন্দময়, যা অবিনাশী—উপলব্ধি করাই ধর্ম। স্বামীজী বহুভাবে এই কথাটি বলেছেনঃ "প্রত্যক্ষই ধর্ম", "উপলব্ধিই ধর্ম". "আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধই ধর্ম", "আত্মারাম হওয়াই ধর্ম" ইত্যাদি। আমাদের স্বরূপই 'পরমাত্মা', আমরা যখন এই স্বরূপ ভুলে নিজেদের মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়াই—"আমি চিন্তা করি, বিচার করি, সুখ দুঃখ অনুভব করি" ইত্যাদি ভাবি, তখনই আমরা আত্মা বা জীবাত্মা। 'আত্মারাম' অর্থাৎ নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর, আনন্দের জন্য যাকে বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না;—"আমি আনন্দস্বরূপ" এই উপলব্ধি হলেই মানুষ আত্মারাম হয়। তার আগে কোন স্থূল ভোগ্য বস্তুই হোক, নামযশ বা অন্য কিছু হোক, বাইরের কিছু একটা না পেলে আমরা আনন্দ পাই না। এই আনন্দ লাভের জন্য বাইরের কিছু চাই আমরা—পেতে 'বাসনা' করি, এই আনন্দলাভের প্রেরণাই আমাদের সব প্রাণীর জীবনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। অথচ মজা হল, আনন্দ আমাদের ভিতরে ঠাসা আছে, আনন্দই আমাদের স্বরূপ। সেটি উপলব্ধি হলে, আমাদের 'ব্রহ্মভাব' উপলব্ধি হলে আনন্দের জন্য বাইরের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না—আমরা আত্মারাম হই। "আত্মারাম হওয়াই ধর্ম", "প্রত্যক্ষই ধর্ম", "আত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করাই ধর্ম",—স্বামীজীর

ধর্মের এই সংজ্ঞাগুলি মূলত তাই একই—আসলে যা সত্য, তাই প্রত্যক্ষ করা। এই অর্থেই তিনি ব্যবহার করেছেন, এই উপলব্ধিলাভের সহায়ক রূপেই ব্যবহার করেছেন, "নিঃস্বার্থপরতাই ধর্ম", "পরোপকারই ধর্ম" ইত্যাদি।

বার বাব বহুভাবে বলেছেনঃ "প্রত্যক্ষই ধর্ম—শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়। বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নয়।" "ধর্ম মতবাদ বিশেষ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়।" এমন কি, যাকে আমরা সাধারণত ধর্ম বলি—জপ, ধ্যান, মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, মনঃসংযম, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি—এসবের কোনটিই ধর্ম নয়। এসব ধর্মলাভের, সত্যদ্রষ্টা বা শাস্ত্র বর্ণিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করার উপায়, সহায়ক মাত্র, "ধর্মের গৌণ অংশ"। স্বামীজী বলেছেনঃ যতক্ষণ না কারও সত্য উপলব্ধ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে 'ধার্মিক' বলা যায় না, বলা যায়, "ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে" মাত্র।

আমরা সাধারণত এইসব অনুষ্ঠানগুলিকেই ধর্ম বলে ভাবি, তাই ধর্ম নিয়ে যত বিবাদের, ধর্মোন্মত্ততার উদ্ভব, যে ধর্মোন্মত্ততা "পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে।"

ধর্মের গৌণ অংশে বিভিন্নতা স্বাভাবিক নিয়মে, প্রাকৃতিক নিয়মেই থাকবে। স্বামীজী বলেছেনঃ সব মানুষের মুখ যেমন ঠিক একরকম হয় না, তেমনি মনও—চিন্তা বা ভাবও—সব মানুষের ঠিক একরকম হয় না। তাই, যা যথার্থ ধর্ম—সত্যোপলব্ধি ঈশ্বরোপলব্ধি বা জ্ঞানলাভ যে নামই তার দিই না আমরা—তা সব মতবাদেই এক হলেও সেই অদ্বিতীয় সত্যলাভের পথ কিন্তু মানুষের মনের—মানসিক প্রবণতার—বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন হবেই। শুধু হবে নয়, এতদূর পর্যন্ত বলেছেনঃ "পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, ততগুলি ধর্মমত"—ততগুলি মনের গ্রহণোপযোগী করে একই সত্যকে উপস্থাপন এবং তত অনুষ্ঠান পদ্ধতি—সাধন পদ্ধতি—থাকলে তিনি খুশী হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা অন্য ভাষায় বলেছেন তিনি "মত (পথ) ধর্ম নয়, ধর্ম ঈশ্বরোপলব্ধি।" আমরা দেহমনাতীত, আমরা আনন্দময়, আমরা অমর—ধর্মের এই সব কথাগুলি কেবল বোঝা বা বলাই, বা কোন মতানুসারে চলাই ধর্ম নয়, ধর্ম এইগুলিকে প্রত্যক্ষ করা। স্বামীজী তাই বলেছেনঃ "যতদিন না ধর্ম অনুভূত হইতেছে, ধর্মের কথা বলা বৃথা।" "তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। ...যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই।"[২২]

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার উপায়

"ইন্দ্রিয়ের, এমনকি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ...সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না ক'রে যত ভিতরের উপর নির্ভর ক'রব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম' হবো, আমরা ততই আধ্যাত্মিক হবো।" [২৩]

এই নির্ভরতা বুদ্ধি, যুক্তি দিয়ে জানা যায় না—অন্তরস্থ ব্রহ্মভাবের বা ঈশ্বরের বা আমাদের স্বরূপের অস্তিত্বে ঠিক ঠিক 'বিশ্বাসই' আসে না—নির্ভরতা তো দূরের কথা—"যুক্তিতর্কে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত হয় না।" "জ্ঞানাতীত ভূমিতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।" আমাদের বুদ্ধি সন্ধানী আলোর মতো—যার বুদ্ধি যত প্রখর, যত মার্জিত, পথ সে তত ভালভাবে, তত বেশী দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু পথে চলা নির্ভর করে মনের উপর, মনের যা ভাল লাগে, বুদ্ধি তাকে অকল্যাণের এমন কি সর্বনাশের পথ বললেও মন বুদ্ধির সেকথা অগ্রাহ্য করে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। কাজেই, মনকে ঈশ্বরাভিমুখী, তার ভোগলালসাজনিত বহির্মুখিতা থেকে টেনে এনে "বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে"—তাকে অন্তর্মুখী করাই ঈশ্বর লাভের পথ। "ত্যাগ ছাড়া হবে না। ত্যাগেই, বৈরাগ্যেই ধর্মের সূত্রপাত।" "একাগ্রতাই পথ", সংসারত্যাগ অতি অল্প কয়েকজন অধিকারীর জন্য, কিন্তু ভোগত্যাগ, ভোগেচ্ছাত্যাগ—এ সকলের পক্ষেই সম্ভব। এরই অন্য নাম সংযম। সংযম ছাড়া মন অন্তর্মুখী হয় না। ঈশ্বরে বা স্বরূপে একাগ্র হয় না। "জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা।" শুধু আত্মজ্ঞান লাভের নয়। স্বামীজী বলেছেন, সর্ববিধ জ্ঞানলাভেরই একমাত্র পথ একাগ্রতা। ভোগেচ্ছার মধ্যে যৌনভোগেচ্ছাই মানুষের মনে সর্বাধিক প্রবল, যে সে-ইচ্ছা সংযত করতে পারে, তার মনের শক্তি, 'ইচ্ছাশক্তি' প্রচণ্ড হয়, অন্যসব ভোগেচ্ছা জয় করে মনকে ঈশ্বরে বা স্বরূপে একাগ্র করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, সহজ হয়! তাছাড়া, স্বামীজী বলেছেনঃ ব্রহ্মচর্যের ফলে মস্তিষ্কে বিশেষ শক্তি জন্মায়, যা ছাড়া ধর্মের সর্বোচ্চ তত্ত্বগুলি ধারণা করা যায় না— "...ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়।" [২৪] তাই ধর্মলাভের জন্য স্বামীজী বার বার বহুভাবে সংযম ও একাগ্রতা অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন। এতদূর পর্যন্ত বলেছেনঃ "...ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক

ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায় ...এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।"[২৫] "ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক" যে করতে পারে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে সে জয় করেছে, অন্যান্য বিষয়ে প্রকৃতিকে জয় করা তার অসীম মনোবলের কাছে অতি সহজ ব্যাপার; মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করে "নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত" করে সে 'মুক্ত' হয়।

এটাই পৃথিবীর সব ধর্মের সব অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য—আমাদের মন বিষয়ভোগ করে আনন্দ পেতে চায়—সেজন্য বিষয়ের চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে চায়। সেখান থেকে মনকে সরিয়ে এনে ভিতরে একাগ্র করানোই জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, যোগাভ্যাস, তপস্যা, মসজিদে গির্জায় প্রার্থনাদি পৃথিবীর সব ধর্মের সব বাহ্যানুষ্ঠানেরই লক্ষ্য। মনের প্রবণতা সকলের একরকম নয়, মনের জোরও একরকম নয়। তাই যে যে অবস্থায় রয়েছে, সেখান থেকেই ঈশ্বরলাভরূপ তীর্থের পথে চলা শুরু করার জন্য, তার উপযোগী একাগ্রতার সাধনা করানোর জন্য, বিভিন্ন ধর্মমতের ও বহু বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ এই জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় বিভিন্ন ধর্মপথ হয়েছে। স্বামীজী বলেছেনঃ একই মাপে তৈরী জামা পৃথিবীর সব মানুষকে পরতে হবে বললে যা ফল হবে—বহুজনের জামা পরাই সম্ভব হবে না—একইভাবে সবাইকে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে বা ঈশ্বরলাভের জন্য একই বাহ্যানুষ্ঠান সবাইকে করতে হবে—একথা বলার ফলও তাই। উপমা দিয়েছেন—একই পুষ্টিকর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সবাই খায়, ভাত, রুটি, পাঁউরুটি প্রভৃতি আকারে, রুচি অনুসারে; আবার কেউ খায় আসনে বসে, কেউ টেবিল-চেয়ারে, কেউ হাত দিয়ে, কেউবা কাঁটা-চামচ বা কাঠি দিয়ে। খাওয়ার এসব বিভিন্নতায় ক্ষতি তো কিছুই নেই, যদি খাওয়ার মূল লক্ষ্য শরীরের পুষ্টিসাধন তাতে হয়। ধর্মমত, ধর্মানুষ্ঠান, যার যা ভাল লাগে মানুক, করুক—তার ফলে, মূল লক্ষ্যের দিকে, ঈশ্বরলাভের দিকে, সে এগিয়ে গেলেই হল: যেভাবেই চলুক, তার ফলে তার মন ক্রমশ পবিত্র, অন্তর্মুখী ও একাগ্র হলেই হল।

ত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের জন্য রাজপথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনিঃ "ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা।" নবযুগের মহামন্ত্র এটি। সেবার জন্য ত্যাগ তো অনিবার্য, আর ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে তা করলে ঈশ্বরে মন একাগ্রও হবে; ঠিক ভাব নিয়ে করতে পারলে তাতে জপ-ধ্যান করার সমানই ফল হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবার ভাব আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেরই সর্ববিধ সমস্যার সু-সমাধান আনতে পারে; কারণ তা সর্ববিধ সমস্যার মূল মানুষের স্বার্থপরতাকে খর্ব করে।

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগঃ ঈশ্বরলাভের বা জ্ঞানলাভের জন্য যত পথ আছে, যতভাবে মানুষ চেষ্টা বা সাধন করতে পারে, করে থাকে, তাকে মোটামুটি এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা যেন মনে রাখি সব পথেই মানুষকে সংযম ও একাগ্রচিত্ততার অধিকারী হতে হয়; জ্ঞানপথ ও যোগ বা রাজযোগের পথে এ দুটির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দিয়েই চলা শুরু করতে হয়, ভক্তি ও কর্মের পথে অভ্যাসের ফলে ক্রমে এই ভিত্তি গড়ে ওঠে।

জ্ঞান পথে প্রথম থেকেই, যা সত্য, বিচার করে মন থেকে তার বিরোধী চিন্তাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সত্যে মনকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করতে হয়। প্রথম থেকেই চিন্তা করতে হয় আমি এই দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি থেকে ভিন্ন আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তা—ব্রহ্ম। বিচারপ্রবণ যাঁরা, সেই সঙ্গে সংযমী ও একাগ্রচিত্ত, তাঁদের পক্ষে এ পথ প্রশস্ত, এ পথের অধিকারী খুব কম।

যোগ বা রাজযোগের পথ হল জোর করে মনকে বাইরে থেকে টেনে এনে সত্যে নিবিষ্ট রাখার পথ। পূর্ণ সংযমী যাঁরা, অসীম মনোবল যাঁদের, সর্বাবস্থায় মনের রাশ টেনে রাখার মতো শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য এ পথ প্রশস্ত। এ পথেরও অধিকারী বিরল।

ভক্তি পথ, ভালবাসার পথ—ভগবানকে আমাদের মতো মানুষ ভেবে[২৬] তাঁকে ভালবেসে তাঁর চিন্তা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁর সেবা, তাঁর নাম জপ কীর্তন, তাঁর রূপের ধ্যান ইত্যাদি করে তাঁতে পুরো মন একাগ্র করার চেষ্টাই ভক্তি পথ। এ পথ সর্বসাধারণের জন্য। অন্যান্য পথের চেয়ে সহজও। ভগবানে ভালবাসা বা ভক্তি যত বাড়ে, মনে ততই বিষয় ভোগেচ্ছা কমে যায়, ততই বেশী করে মন তাঁতে একাগ্র হয়।

কর্মের পথ হল নিজের জন্য প্রতিদানে কিছু না চেয়ে, কর্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করে অনাসক্তচিত্তে কর্ম করা। ঠিকমতো করতে পারলে এতেও ক্রমে মন পূর্ণ একাগ্র হয়। সত্য লাভ হয়। সাধারণত জ্ঞান বা ভক্তি অবলম্বনে—সর্বসাধারণের পক্ষে ভক্তি অবলম্বনে—কর্মের পথে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়াই সহজ।

বিশুদ্ধ জ্ঞান, যোগ, কর্ম বা ভক্তির পথ ধরে চলার লোকও আবার খুব কম। সাধারণত আমাদের সাধনায় একটি ভাব প্রবল থাকে, তার সঙ্গে একাধিক পথের সাধনাও কিছু কিছু করি আমরা। তাতে কোন ক্ষতি নেই, বরং ভালই। আসল কথা হল, মনকে পবিত্র ও একাগ্র করা—কেবল বিচার, কেবল ধ্যান, কেবল জপ-পূজা-প্রার্থনাদি বা কেবল কর্ম করে যদি তা হয়, ভালই; যদি এগুলির

একাধিক বা সবগুলি একসঙ্গে করে তা হয়, তাও ভাল। সেজন্যই স্বামীজী বলেছেনঃ "কর্ম, উপাসনা (ভক্তি), মনঃসংযম (যোগ) অথবা জ্ঞান—এইগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।" মুক্ত হওয়া মানে, দেহাত্মবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা—নিজেকে যে দেহ-মন-বুদ্ধি ও তৎসীমিত 'অহং' বলে মনে হচ্ছে, সেই মনে হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া। জ্ঞানিগণের মতে এই বন্ধন অজ্ঞান, মায়া বা ভ্রমসঞ্জাত। ভক্তগণের মতে, ঈশ্বরেচ্ছায়, তাঁর লীলায় এটি হয়। তন্ত্র এই বন্ধনকে পাশ বা বন্ধনরজ্জু বলেন। এই মায়ায় বা পাশে যতক্ষণ আমরা বাঁধা আছি, যতক্ষণ নিজেকে দেহ-মনাদি বলে বোধ হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা 'জীব' বা 'আত্মা'। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে 'আমি'বোধ থেকে মুক্ত হলেই আমরা 'শিব' বা 'ব্রহ্ম'। দেহাত্মবোধ কাটিয়ে, যেভাবেই হোক, নিজের "ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই" সব ধর্মাচরণের, সব ধর্মের লক্ষ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম

"সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্ম-দর্শন করিয়াছিলেন;...তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" [২৭]

"কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে,...যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি সুদৃঢ়; উহাদের অনুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্ম-সকল প্রায়ই লুপ্ত,...উহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ।" [২৮]

স্বামীজী বলেছেনঃ প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি ভাগ—দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। দার্শনিক অংশই সার। এখানে যেন আমরা মনে রাখি, দর্শন বলতে স্বামীজী এখানে কেবল বুদ্ধি-যুক্তি সহায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার কথা বলছেন না; বলছেনঃ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করার পর সে বিষয়ে বুদ্ধি যুক্তি যতটা ধরতে পারে ততটা পর্যন্ত তাদের অবলম্বন দেওয়ার কথা; অথবা কোন সত্যদ্রষ্টার উপলব্ধ সত্যকে যতটা সম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করার কথা। আগেই বলেছেন, সব ধর্মই এরূপ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সব ধর্মের দর্শনভাগও এই সব সত্যদ্রষ্টাগণের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই রচিত। পৌরাণিক অংশ তার বিবৃতিমাত্র—গল্পের মাধ্যমে সাধারণকে উচ্চ-তত্ত্বগুলি বোঝাবার চেষ্টা।

আনুষ্ঠানিক ভাগ ধর্মের স্থূলরূপ; প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকভাগেরই স্থূল-

রূপ। এই স্থূলরূপের প্রয়োজন, স্বামীজী বলেছেন, সব ধর্মেই আছে। "...যতদিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, ততদিন (মানুষ) সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ।"[২৯] কাজেই প্রত্যেক ধর্মেই এই স্থূলরূপ প্রয়োজন। সাধারণ লোকের একটি স্থূল অবলম্বন চাই। আগেই বলেছি, শুদ্ধচৈতন্য আমাদের স্বরূপ, তিনিই ঈশ্বর—একথা আমরা মুখে বলতে পারি সকলেই। ধারণায় আনতে পারি না। কিন্তু সেই অরূপ, অসীম, নির্গুণ সত্তার স্থূলরূপ—তিনি সাকার বা নিরাকার যাই হোন না, তিনি আমাদেরই মতো গুণসম্পন্ন, অবশ্য তা অনন্তগুণে অধিক—তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি করুণাময়, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও পূর্ণ করেন, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন—তিনি সাকার বা নিরাকার ঈশ্বর। এটি আমাদের মন-বুদ্ধির ধারণাগম্য। বিভিন্নরূপে তাই ধর্মাচার্যেরা দেশ-কালোপযোগী করে একই সত্যের বিভিন্ন স্থূলরূপ দিয়ে গেছেন। অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা। "মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক—প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহ ধর্ম চায়, তবে এই প্রাথমিক সোপানগুলি একান্ত প্রয়োজন।"[৩০] সব ধর্মেই প্রয়োজন।

আর একটি বিশেষ কথা স্বামীজী বলেছেনঃ "...ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। ...যাহাকে আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সত্তা—এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে।"[৩১] প্রসঙ্গান্তরে একথা পূর্বেও বলেছি। এইটি এযুগে বিশেষ করে আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। স্বামীজীর ধর্মচিন্তায়—বিশেষ করে বিশ্বজনীন ধর্মচিন্তায় এই সমন্বয় অতি প্রকট। এ নিয়ে প্রথমেই আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের মনে হয় দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত অনুভূতিকে চরম সত্যাভিমুখী সাধকের একই সত্যের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র বলে, বিভিন্ন সোপান মাত্র বলে এগুলির সমন্বয় সাধনের মতো, স্বামীজীর এই অবদানটি এযুগের ধর্ম বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান—এটিকেই নিবেদিতা ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ "স্বামীজী আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যকার ভেদরেখাটি মুছে দিয়ে গেছেন।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান*

আধুনিক মানুষের কাছে বিজ্ঞান আর ধর্ম ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই দুটি পথ যদি সম্মিলিত ও সমন্বিত হয়ে ওঠে তবে তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পাদন করে মানবপ্রতিভার সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত কয়েক শতাব্দী ধরে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রবক্তারা ক্রমশই এই দুইয়ের মধ্যে একটি ঐক্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন: তাঁরা বুঝতে পারছেন যে নিজ বিশ্বাসে স্থির থেকেও উভয়ের মিলন ঘটতে পারে এবং মানুষের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে বিজ্ঞানের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে পারে এবং ধর্মের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করতে পারে। এই পারস্পরিক মিলনসূত্র এবং উভয়ের পরীক্ষাপ্রণালী ও লক্ষ্য আমরা আলোচনা করে দেখব; দেখব স্বামী বিবেকানন্দের মনন আলোকে—মানবজ্ঞানের ঐক্য ও সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে। স্বামীজীর অপূর্ব আধ্যাত্মিকতা এবং বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে মিলনসূত্র রচনা করেছে তা আজ আমাদের কাছে বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেনঃ "ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম—এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।"[১]

বৈজ্ঞানিক পথ

মানবমনের যে বৈশিষ্ট্য আজকের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তাকে বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারার অনুসরণে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বৈজ্ঞানিক পথের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমত, তাত্ত্বিক

বিজ্ঞান—যা কোন গোঁড়ামি না রেখে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে দেখে। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক বিজ্ঞান—তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যাদি যেখানে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হয়। এই দুটি সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে। জ্ঞানের ফল শক্তি, আবার শক্তির ফলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির উপরে অধিকার জন্মায়, মানুষ সেগুলিকে নিজের জীবন ও চিন্তাধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই কোন-না-কোনভাবে ব্যবহারিক করে তোলা হয়, প্রাকৃতিক শক্তি-গুলিকে জয় করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে দেখা গেছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী এক যান্ত্রিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। মানবমন যেভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির গোপন রহস্যময় শক্তিগুলিকে একে একে নিজের আয়ত্তে এনে কাজে লাগাচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এরই পরিণামে আজ আমরা পারমাণবিক বিজ্ঞান আর মহাকাশজয়ের যুগে প্রবেশ করেছি।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু আমরা যদি আরও একটু গভীরে গিয়ে লক্ষ্য করি, তাহলে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের দুটি শাখার কথাই ধরা যাক—পদার্থবিজ্ঞান (জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ধরে) এবং জীববিজ্ঞান। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবরহস্য সম্বন্ধে এই দুটি আমাদের গভীর জ্ঞান এনে দিয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞান নির্দেশ্যবাদকেই* (determinism) তুলে ধরছিল, জড়বাদ ও

যান্ত্রিকতার ব্যাপকতায় সে বিশ্বাসী ছিল এবং তখনকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণায় একটা স্থির প্রত্যয় পরিলক্ষিত হত। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এসে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ধরনের নমনীয়তা দেখা যেতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বস্তুর বাহ্যিক রূপকেই বিজ্ঞানীরা বড় করে দেখছিলেন। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা এবং পরমাণু বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, বস্তুজগতের রহস্য জানার পথে একটি বিরাট বাধা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা আজ স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞান মূলত বস্তুর প্রকাশশীল গুণগুলিকে যত সহজে ধরতে পারে তার স্বরূপ সম্বন্ধে ততটা নয়। কয়েকজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আজ একথা বলতে কুণ্ঠিত নন যে, বিজ্ঞান বস্তুজগতের বাহ্যিক রূপটি নিয়েই বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। এই দৃশ্যজগতের পিছনে রয়েছে এক অদৃশ্য জগৎ। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এইভাবে ক্রমশ ধরা পড়ছে। বস্তুজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে বা ইন্দ্রিয়-সহায়ক যন্ত্রের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, বিজ্ঞান তা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়চেতনা এতই সীমাবদ্ধ যে, এগুলির মাধ্যমে আমরা যে জগৎকে, যে ইন্দ্রিয়জগৎকে জানছি তার গভীরে আর এক জগৎ থেকে যাচ্ছে, যা এগুলির উৎসমুখ। বিজ্ঞান কিন্তু বস্তুজগতের এই দৃশ্য অংশটুকু নিয়েই চর্চা করে এবং এই দৃষ্ট জগতের শক্তিগুলিকে মানবকল্যাণে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

জীববিজ্ঞানেও এই জিনিসটি দেখা যায়। গত শতাব্দী পর্যন্ত নির্দেশ্যবাদের সমর্থক ছিল এই শাখাটি। জীবনের বিভিন্ন স্তর ও গতি সম্পর্কে আলোচনা করে ক্রমবিকাশের বিখ্যাত তত্ত্বে সে উপনীত হয়েছিল—যে তত্ত্ব মানুষ ও পশুকে প্রায় একই স্তরে নামিয়ে এনে উভয়কেই 'যন্ত্র' বলে বর্ণনা করতে উদ্যত হচ্ছিল। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা স্পষ্টই বলছেন যে, ডারউইনের অনেক তত্ত্বের সঙ্গে তাঁরা আর একমত হতে পারছেন না। স্যার জুলিয়ান হাক্সলী তো ডারউইনের "The Origin of Species" আর "The Descent of Man" বই দুটির সম্বন্ধে মন্তব্যই করে বসলেন যে, এগুলির নাম হওয়া উচিত ছিল যথাক্রমে "The Evolution of Organisms" এবং "The Ascent of Man".* ডারউইনের সময়ে বিজ্ঞান এবং চার্চের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল তা-ই হয়তো ডারউইনকে ঐ নাম দুটি রাখতে উৎসাহিত করেছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের সর্বাত্মক জড়বাদ ও যান্ত্রিক নির্দেশ্যবাদ এবং জীব-

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও আত্মিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের বিশ্বাস শিথিল করে দিচ্ছিল।

সংকীর্ণ ধর্মমতের সীমাবদ্ধতা

সেই সঙ্গে যুক্ত হল বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ ও বিপ্লবী কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারা এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর তীব্র আক্রমণ। সে সময় শিল্প বিপ্লবের যুগ চলছে। এই ভাববাদীরা প্রশ্ন তুললেনঃ ভগবান যদি সত্যই সু-উচ্চ স্বর্গে থেকে থাকেন তবে এই পৃথিবীতে এত দুঃখকষ্ট কেন? কেন লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবন কাটায়? কেনই বা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি হাজার হাজার শিশুকে ক্রীতদাসের মতো কারখানায় খাটতে বাধ্য করে? কেন এই বৈষম্য? মানুষের উপর মানুষের কেন এই অত্যাচার?—এ আমরা বুঝতেও পারি না, সহ্য করতেও পারি না। মার্ক্স্ তাই ধর্মকে "soul of soulless conditions, the heart of heartless world, the opium of the people" বলে অভিহিত করলেন।

ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির প্রাক্কালেই ধর্ম, ঈশ্বর ও শাশ্বত মূল্যবোধের উপরে আস্থাহীনতাই আধুনিক সভ্যজগৎকে প্লাবিত করল। মানুষের কর্ম ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করার শক্তি ধর্ম হারিয়ে ফেলল। মানুষ ভালমন্দের বিচার ছাড়ল। মানুষের চিত্ত থেকে ধর্মভীরুতা, অপরাধবোধ ও শয়তানের ভয় বিলুপ্ত হল। বিজ্ঞানও এই অবস্থায় ইন্ধন যোগাল। শিক্ষিত মানুষের কাছে এগুলি কুসংস্কার বলেই পরিগণিত হল। আধুনিক বিজ্ঞান প্রথমে ধর্মকে মনে করল বিপজ্জনক ভ্রান্তি এবং পরিশেষে নিরীহ অলীক কল্পনারূপে চিহ্নিত করে এক পাশে সরিয়ে রাখল। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এবং বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একের পর এক অন্যান্য নানা দুরূহ সংঘাত পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মধ্যে নতুন করে আত্মিক জিজ্ঞাসা তুলে ধরল। বিশেষ করে বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতেই প্রথম এটি দেখা দিল। সমাজতত্ত্ববিদেরা মানবকল্যাণের ব্যাপারে ধরাবাঁধা রাস্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এমন কি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা পর্যন্ত উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, তাঁদের সাধনালব্ধ বিজ্ঞান এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারছে না। আইনস্টাইন বললেন যে, বিজ্ঞান প্লুটোনিয়ামকে বিভাজন করতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে অপরাধপ্রবণতা ও অকল্যাণকর দোষগুলিকে দূর করতে পারে না। অবশ্য বিজ্ঞানের এটি কাজও নয়। প্রায় সব বৈজ্ঞানিকই আজ স্বীকার করছেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে যথার্থ শান্তি এনে দিতে পারে না, বিজ্ঞান কেবল সুখের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে—বিজ্ঞান কিন্তু আশ্বাস দিতে

পারছে না যে, এই পথে বা সেই উপায়ে গেলে মানুষ সুখী হবেই, মানুষ মানসিক সচ্ছলতায় আন্তরিকভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবেই। পদার্থবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের মতো "পজিটিভ সায়েন্স" মানুষকে এই শান্তি দিতে পারে না এবং এটি তাদের কৃত্য নয়। এটি দিতে পারে অন্যতর কোন উপায়, এজন্য ফিরে যেতে হবে অন্য কোন তপশ্চর্যার জগতে। মানুষের স্বরূপ জিজ্ঞাসার কোন অন্তর্মুখী বিজ্ঞানই সন্ধান দিতে পারে মানুষের এই মহৎ মুক্তির এবং ভারতীয় দর্শনে এটাই হচ্ছে ধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা।

বৈদান্তিক মনন-আলোকে ধর্ম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যাকে বর্তমান যুগে অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে, অতীত যুগে যেমন এগুলিকে অত্যন্ত হেয় করা হয়েছিল। বিজ্ঞানকে আজ যথার্থ দৃষ্টিতে—মানবিক কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে—মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; এবং আধুনিক চিন্তাজগতে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মূল্যবান অবদান হচ্ছে এই প্রয়াসই। ধর্মে প্রাচ্য অবদান এবং বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি "My Master" বক্তৃতায় বলেছেনঃ "যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন?"[২]

আধুনিক বিজ্ঞানে আত্মিক জিজ্ঞাসা

প্রাচীন যুগে মানুষের কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল রহস্যময়। বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের কাছেও এ রহস্যময়ই রয়ে গেছে। তাই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্স্ জীন্স্কে দেখি তাঁর বইয়ের নাম দিতে "The Mysterious Universe." বিজ্ঞানের শত সহস্র চমকপ্রদ আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীরা আজও প্রকৃতিকে নিবিড় রহস্যময় বলেই মনে করেন। অপরিসীম জ্ঞান নিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁরা কেবল প্রকৃতির বাইরের

রূপটা নিয়েই ব্যস্ত থেকে গেছেন, বিশ্বরহস্যের মূল এখনও রয়ে গেছে দূরে। "The New Background of Science" বইয়ে জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেছেন ঃ

"Physical science set out to study a world of matter and radiation, and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself. Photons, electrons and protons have become about as meaningless to the physicist as x, y, z are to a child on its first day of learning algebra. The most we hope for at the moment is to discover ways of manipulating x, y, z without knowing what they are, with the result that the advance of knowledge is at present reduced to what Einstein has described as extracting one incomprehensible from another incomprehensible."[৩]

বিশ্বরহস্য বিজ্ঞানীদের যতটা না মুগ্ধ করেছে, মানবরহস্য করেছে তার চেয়েও বেশী। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনের ভাষায় ঃ

"All through the physical world runs that unknown content, which must surely be the stuff of our consciousness. Here is a hint of aspects deep within the world of physics, and yet unattainable by the methods of physics. And, moreover, we have found that where science has progressed farthest, the mind has but regained from nature that which the mind has put into nature."[৪]

চিন্তাশীল মানুষ, দ্রষ্টা মানুষ, প্রকৃত মানুষ নিজের পদচিহ্ন রেখে গেছে অজানা জগতের কূলে উপকূলে; মহাবিশ্বের অনাত্ম-প্রদেশের তীরে তীরে। বিজ্ঞান আজ চেষ্টা করছে মানুষের এই আশ্চর্য অজানা রহস্যকে জানতে। পরমাণুর অভ্যন্তর, কিংবা সুদূর মহাকাশের চেয়েও গভীরতর রহস্যময় এই মানুষ। আজ এর রহস্যকে ভেদ করতে চাইছে বিজ্ঞান। অন্য সমস্ত রহস্যই এর কাছে ম্লান হয়ে যায়--এই রহস্যই সব রহস্যের চাবিকাঠি।

"আমরাই সেই, যে প্রশ্ন করে"—মানুষ মূলত বিষয়ী (subject), তাকে কখনও বিষয়ভূত করা যায় না। সে দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা; বেদান্তের

ভাষায় 'দৃক্' বা 'সাক্ষী' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। এখানে এডিংটন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন যা পদার্থবিজ্ঞান জগতের গভীরে অবস্থিত অথচ পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য নয়। বিশ্বজগৎ ও মানবরহস্য সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের জন্য যে দার্শনিক সম্ভাব্যতা প্রয়োজন তা বস্তুবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ পরিসরে ধরা পড়ছে না।

"কোয়ান্টাম থিওরী" ও "ওয়েভ মেকানিক্স" তত্ত্বদ্বয়ে পণ্ডিত বলে খ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রিন্স লুই দ্য ব্রগলি কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মাসিক পত্রিকা 'Mirror'-এ "The Poetry of Science" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি তাতে পাস্কালের একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেনঃ

"In space, the universe engulfs me and reduces me to a pin-point; through thought I understand the universe". ব্রগলি প্রবন্ধটির শেষে লিখেছেনঃ "In that sublime pun lies the beauty, the poetry of pure science, and its high intellectual worth".

আমি কি বস্তু? জাগতিকভাবে বস্তুবিচারে দেখতে গেলে এই বিশাল মহাবিশ্বে আমি পরমাণু সদৃশ একটি সামান্য কণামাত্র। কিন্তু চিন্তার সাহায্যে আমি এই মহাবিশ্বের ধারণা করতে পারি। প্রকৃতির অসংখ্য বিচিত্র সব ঘটনাবলী একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর চিন্তায় সমন্বিত বুদ্ধিদীপ্ত সামান্য সূত্রের মাধ্যমে ধরতে পারেন। এটাই বিরাটতম রহস্য যে, একদিকে বিশাল মহাবিশ্বে মানুষ সামান্যতম একটি কণামাত্র আবার অন্যদিকে এই বিশালতাকে সে সামান্য কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। মানুষের চিন্তার শক্তি ও রহস্যভেদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাই এই সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করেছে।

মানবরহস্য

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে শুধু জাগতিক বা জড়সত্তায় গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। এটি তার 'অনাত্ম' দিক যা বিশাল মহাবিশ্বে সামান্য একটি কণা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আবার এমন কিছু বিশালতা রয়েছে যাকে ছোট করে দেখা মোটেই সম্ভব নয়। মূলত সে আত্মা। এটিই তার মূল স্বরূপগত পরিচয়। বিজ্ঞানকে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তবে মানুষের এই পরিচয়টিকেই তুলে ধরতে হবে। বাহ্যিক জগতের চেয়েও নজর দিতে হবে অন্তর্জগতের উপরে। এটি একটি বিরাট ক্ষেত্র—মানুষের বোধের, মানুষের চেতনার রাজ্য। এটিই তার 'আমি'বোধের উৎস। এখানে সে দ্রষ্টা (subject),

দৃশ্য (object) নয়। বহির্জগতের চেয়ে বৃহত্তর, বহুগুণে রহস্যময় এবং আকর্ষক এই অন্তর্জগৎ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই এই অন্তর্জগতের দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন। আলেক্সি ক্যারেলের "Man the Unknown" এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই।

যে মানুষ বিজ্ঞান-বহুমুখী কারিগরিবিদ্যা-সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টা, সে মানুষই আজ সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। তার প্রতিটি কার্যকলাপই বিস্ময়কর। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে আইনস্টাইনের অবদান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিংকন বার্নেট লিখেছেনঃ

"For man is enchained by the very condition of his being, his finiteness and involvement in nature. The further he extends his horizons, the more vividly he recognizes the fact that, as the physicist Niels Bohr puts it, 'we are both spectators and actors in the great drama of existence'. Man is thus his own greatest mystery."[৫]

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ভারতীয় চিন্তাধারায় এখানেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। বৈদান্তিক মনন-আলোকে ধর্ম বাস্তব জগতের রহস্যসন্ধানে সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে বিজ্ঞান যেখানে তার যাত্রাপথ আপাতত শেষ করেছে। এই "অজানা মানুষকে" বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করাই ধর্মের কাজ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্যলাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে; কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।"[৬]

সত্যানুসন্ধানে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই যৌক্তিকতা ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বীকৃত হয়েছে। এডিংটন যে ভাষায় বিজ্ঞান ও ধর্মের আত্মিক যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছেন তা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুগামী। এডিংটন বলেছেনঃ

"You will understand the true spirit neither of science nor of religion unless seeking is placed in the forefront." ৭

ভারতীয় ঋষিরা এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভিন্নতা দেখেননি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতাত্ত্বিকেরা এই জিনিসটি ধরতে পারেননি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা বোধ হয়। এটি দূর করার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদেরা অবশ্য চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞান বলতে ঠিক ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, বিজ্ঞানের বহু ছাত্রেরই সঠিক ধারণা নেই। ধর্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞানের অর্থ কেবলমাত্র রেডিও, টেলিভিশন কিংবা যান্ত্রিক কোন কারিগরিবিদ্যা যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এনে দিয়েছে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা এগুলিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে ভাগ করে মাত্র, যা তারা স্কুল-কলেজে পড়ে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সঠিক কি বোঝায় তা জানতে গেলে আমাদের উচিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দিকে তাকানো। তাঁদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যের সন্ধান; প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য লুকানো রয়েছে, যা সূত্রাকারে প্রতিফলিত হয় ইন্দ্রিয়চেতনার মাধ্যমে, নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতায় সেই রহস্যের, সেই সত্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান হল অভিজ্ঞতার আন্তরিক, নির্ভীক ও বিবিক্ত বিশ্লেষণ যার সাহায্যে বিক্ষিপ্ত সংবেদনগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিয়মিত সূত্রে বাঁধা যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কার্ল পিয়ারসনের ভাষায়ঃ

"The classification of facts, the recognition of their sequence and relative significance, is the function of science, and the habit of forming a judgement upon these facts, unbiased by personal feeling is characteristic of what may be termed the scientific frame of mind." ৮

এই ভাবে বিজ্ঞানকে বুঝলে এটি কেবল কতকগুলি ঘটনাসমষ্টি হয়ে দাঁড়ায় না।

পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ বিশ্লেষণ—এই দুটিকে চিন্তায় ও বাক্যে উপস্থাপিত করাই বিজ্ঞানপদ্ধতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোন বিষয়ের নিদিধ্যাসনায় যদি এই দুটি উপস্থিত থাকে তবেই তা বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হবে, তা সে বিষয়টি যাই হোক না কেন। তাহলে বিজ্ঞান বলতে কতকগুলি বিশেষ

তথ্যসমষ্টিই বোঝায় না। যদিও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা কিংবা সমাজবিদ্যা কতকগুলি বিশেষ তথ্যাবলীর সঙ্গে জড়িত। এই বিভাগগুলির পরিসর সীমিত হলেও সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের পরিসর অসীম। আরও দেখা যাচ্ছে, এই বিভিন্ন বিভাগগুলি যত দিন এগুচ্ছে—ক্রমশই নিজেদের পরিসর ছাড়িয়ে অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। বিভিন্ন বিষয়গুলি একত্র বিজ্ঞানের সামগ্রিক অনুসন্ধান-চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে। এই ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক ধর্মের যে তাৎপর্য ফুটে ওঠে এবং মানুষের অন্তর্জগতের ঘটনাপ্রবাহের যে বিজ্ঞান, যা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় তুলে ধরা হয়েছিল এবং আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিলেন—তার তাৎপর্য খুবই ব্যাপক এবং বহুদূর প্রসারিত।

সর্বজনীন ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে ভারতীয় উপলব্ধি

উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং তথ্যবিচারে পাশ্চাত্যে ধর্মকে মানবিক যুক্তি ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিরোধী ও পরিপন্থী বলে মনে করা হত। ধর্মকে 'finished' এবং 'ready-made' একটি তত্ত্ব বলে ধরা, একটি dogma বলে মনে করা, কতকগুলি ভাববাদী চিন্তা বলে ধরা, এই ছিল ধর্ম সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারা—এ যেন এমন একটা তত্ত্ব যা নির্বিধায় মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। এজন্যই পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যত বাড়ল, ততই ধর্মের সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষ বাধল। কারণ বিজ্ঞানের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে এ খাপ খাওয়াতে পারছিল না। ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মকে সব সময়েই একটি প্রগতি বলে ধরা হয়েছে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ধর্মেও পর্যবেক্ষণ, মনন, অনুসন্ধানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের উপনিষদেই হোক আর আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতেই হোক, এ সত্যের সাক্ষ্য মিলবে অনায়াসে।

পাশ্চাত্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিরন্তর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখে স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেনঃ "ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তাহা আমরা জানি; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক-একটি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"[৯]

ধর্ম যদি বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে তবে তা নিজেকেই দুর্বল করবে। এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "(ধর্মের) ভিত্তিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করিতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা চাহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে সম্মত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে 'চিন্তাহীন অনবধানতা' আখ্যা দেওয়া চলে।"[১০]

ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ দরকার। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "অন্যান্য বিজ্ঞান-গুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত ।...পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে অন্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাই নয়, বরং আরও বেশী জোরালো হইবে; কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা আছে।"[১১]

উপনিষদ্ পড়লে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মকে পর্যবেক্ষণশীল ও বিবিক্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল সত্যকে অনুসন্ধান করা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আদিম অন্ধ কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা আঁকড়ে ধরে থাকা ধর্ম নয়।

বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দিকটিই তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধর্মকে বিশ্লেষণ করায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ "জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্রহিসাবে ইহা শিখানো হয় না। এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে

পাওয়া যায়। তাঁহাদের রহস্যবাদী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্যবাদিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। ...রসায়ন-শাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়বস্তু-কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপর পক্ষে ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেন-না জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহারা অন্তর-গ্রন্থরূপ বিপরীত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেন-না তিনিও ধর্মবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।"[১২]

তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রজ্ঞাবান মনস্বী ঋষিরা দুটি জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। সমগ্র জগতের দুটি দিক এই দুটি। এর মধ্যে কেবলমাত্র একটির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে সে জ্ঞান হবে সীমিত, খণ্ড। আবার একটির দৃষ্টিতে অন্যটিকে বিচার করলেও তা ভুল হবে। কারণ এই জ্ঞান সামান্য আলোকপাত করে। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "দুইটি শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড; অন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি—আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত; আর বাহ্য অনুভূতি হইতে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার সহিত এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সাক্ষ্য দিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই।"[১৩]

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা তাই বলেছিলেন ঃ মানুষের নিজস্ব একটি জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে এই বিশ্বজগৎ। দুটিকেই বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখা দরকার। মানুষের সত্তা সম্বন্ধে জানতে হলে আরও গভীরে যাওয়া দরকার, তার মনে ও মানসলোকে, তার অস্তির অন্তরালে, তার মানসিক ভাবমণ্ডলে, তার অস্মিতায়, আত্মচৈতন্যের মধ্যে না গেলে মানুষের স্বরূপ

বোঝা যাবে না। এটি একটি বিরাট বিষয় এবং এ নিয়ে প্রভূত পর্যালোচনা অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ হওয়া দরকার। এ পথে সামান্য অগ্রগতিও বহির্জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে যথার্থ সত্যসন্ধানে মানুষের জয়যাত্রা ও তার জ্ঞানে অগ্রগতি ঘটাবে। এডিংটন যথার্থই বলেছেন ঃ

"We have discovered that *it is actually an aid in the search for knowledge to understand the nature of the knowledge which we seek*."[১৪]

সাধারণ ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষার পদ্ধতির পথ ধরে মানুষ এগোয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাইঃ ঘটনাসংগ্রহ, তার বিশ্লেষণ, এ সম্বন্ধে গভীর বিবিক্ত পর্যবেক্ষণ, যাতে করে সম্ভব হয় কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার, এবং সেসব সূত্রের সাহায্যে শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের দুর্দশার অবসান করে কল্যাণকর পথে তাকে নিয়োগ এবং পরিণামে মানবজীবনের জন্য প্রতিশ্রুত প্রাচুর্যের ও ঐশ্বর্যের সমারোহ। এই রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধর্ম-গবেষণা করে মানুষের স্বরূপ সন্ধান করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিরা। এর ফলে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন পরবর্তী মুনি-ঋষিরা তার উপরে আবার গবেষণা করে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এভাবে ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির ব্যাপকতা দেখা গেল। এবং তারই ফলে ধর্মের ক্ষেত্রেও একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অমূল্য উত্তরাধিকার তাঁরা রেখে গেলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। ভিত্তি এভাবে দৃঢ় হয়েছিল বলেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আজও তার শক্তি বজায় রাখতে পেরেছে। ভারতীয় ধর্ম যে তাই শুধু বিজ্ঞানের প্রতি আতিথেয়তার হাতই বাড়িয়ে দেয় তাই নয়, আধুনিক পাশ্চাত্যের বিস্ময়কর উন্নতিকেও স্বাগত জানায়। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় ঃ "সত্যকার বৈদান্তিক মনোভাব কোনরূপ চিন্তিতপূর্ব ধারণা লইয়া অগ্রসর হয় না। উহাতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। বিভিন্ন তথ্যের পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে এবং বিভিন্ন রূপ প্রতি-পাদ্যের মধ্যে সংগতি বিধানের প্রয়াসে বেদান্ত যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছে, অন্য কোনও ধর্মে তাহার তুলনা মিলে না। পুরোহিততন্ত্রের বাধা না থাকায়, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই দৃশ্যমান বিশ্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অন্বেষণে ইচ্ছামত অগ্রসর হইয়াছে।"[১৫]

মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ঔপনিষদিক ঋষিরা

একটি মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। মানুষ স্বরূপত দৈবী প্রকৃতির, সসীম মানুষের অন্তরালে রয়েছে সেই আত্মা, চিরমুক্ত নিত্যশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক আত্মা, দেহ-মন-অহঙ্কার হচ্ছে মানুষের আপাত রূপ, মানুষ মূলত কিন্তু অবিনশ্বর ও দৈবী প্রকৃতির। ঋষিরা আরও বুঝতে পারলেন যে সেই একই দৈবী প্রকৃতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও মূলে রয়েছে। একে তাঁরা নাম দিলেন 'ব্রহ্ম'; যাকে তাঁরা অভিহিত করলেন "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্" বলে। আমরা দেখি জিজ্ঞাসু শিষ্য তাঁর মহান গুরুকে প্রশ্ন করছেনঃ "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"[১৬]—হে গুরু, সত্য কি? কাকে জানলে বিশ্বের সব জানা যায়? এমন কি কিছু অদ্বয় 'অস্তি' আছে যার জ্ঞান লাভ করলে এই অন্তঃপ্রকৃতি আর বহিপ্রকৃতির সকল রহস্য জানা যায়? এই বহুত্বের আড়ালে কোন একত্ব রয়েছে কি? কোন কিছু 'এক'-এর অস্তিত্ব রয়েছে কি এই সব বিচিত্র বহু কিছুর মূলে? গুরু এই প্রশ্নের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন। তিনি বললেনঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ।"[১৭]—দুই ধরনের জ্ঞান রয়েছেঃ একটি পরাবিদ্যা—শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান; অন্যটি অপরাবিদ্যা—জাগতিক জ্ঞান। ব্রহ্মবিদেরা বলেন যে, এই দুই রকম জ্ঞানই মানুষ লাভ করতে পারে।

মানুষকে এই দুই রকম জ্ঞানই লাভ করতে হবে। জাগতিক জ্ঞান কি? উপনিষদের মতেঃ বেদ, স্বরবিজ্ঞান, যাগযজ্ঞপ্রকরণ, শব্দশাস্ত্র, ছন্দোবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। আসলে, সমস্ত শাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান সব কিছুই এর অন্তর্ভূত।

এখানে আমরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাই যা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, বিষয়গত এবং উদার। সত্য, একমাত্র সত্যই এর লক্ষ্য। কারও মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা নয়। কোন সুবিধাবাদী মতবাদের অক্ষম আত্মপ্রচার নয়। গুরুর মতে, এমন কি বেদ ও শাস্ত্রও নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভূত। কেউ যদি নিরপেক্ষ না হন, সাহসী না হন, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী না হন, তবে তিনি কি করে বলবেন যে, তাঁর শাস্ত্রও নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ঔপনিষদিক ঋষিরা সত্যকে গোপন করতে চাইতেন না, বিশেষ কোন মতবাদকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হতেন না, কোন সংস্কারকে আড়াল করতে চাইতেন না, তাঁরা জানতে চাইতেন সত্যকে এবং এই সত্যকে জানার জন্য তাঁরা কোনও ত্যাগ-স্বীকারেই কুণ্ঠিত হতেন না। বেদান্ত ছাড়া আর কোন্ ধর্মে এই সাহসিকতা, এই দুঃসাহসিক বিবিক্তি দেখা যায়? অন্য কোন ধর্মীয় সাধককে যদি প্রশ্ন

করা হয়ঃ নিম্নতর সত্য কি? তাঁরা বলবেনঃ আমার শাস্ত্র বাদে অন্য সমস্ত শাস্ত্রই নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন সাহসী ও নিরপেক্ষ। তাই তাঁরা নিজেদের পরম প্রিয় পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা বলতে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁদের মতে, সকল শাস্ত্র, সকল ভৌত-বিজ্ঞান, সকল শিল্প নিম্নতর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—অপরাবিদ্যা।

তাহলে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠবিদ্যা কি? গুরু বলেছেনঃ "অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"[১৮] —সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ যার দ্বারা সেই শাশ্বত অব্যয় আত্মাকে জানা যায়। এবং তার অর্থাৎ সেই পরাবিদ্যার পরিধিও বিশাল এবং পরিব্যাপ্ত।

বিজ্ঞান তথা সমস্ত বিষয়ই নিত্য-পরিবর্তমান মৃত্যু-পরিণামী অনিত্য বস্তুসমূহকে নিয়ে মাথা ঘামায়। এডিংটন তাই বলেছেন যে, বিজ্ঞান আমাদের কেবলমাত্র "knowledge of structural form and not knowledge of content" দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি বলেছেনঃ শাস্ত্র কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানায় কিন্তু ঈশ্বরকে দিতে পারে না। এডিংটনের ভাষায়ঃ এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে রয়ে গেছে অজানা সেই মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বটি কি? কিভাবেই বা আমরা একে জানতে পারি? বিজ্ঞান যদি তার সন্ধান না দিতে পারে তবে অন্য কোন উপায়ে অন্য কোন পথে আমাদের সেই অনুসন্ধান চালাতে হবে। শাস্ত্র যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যই জানায় তবে এমন কোন পথ নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা আমরা সেই মূলতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। উপনিষদে সেই পথের কথাই বলা হয়েছে। তাই সাহিত্য হিসাবেও উপনিষদাবলী বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অমর। এবং সেই আত্ম-অনুসন্ধান-কার্যের রূপ ও সীমা সম্বন্ধে ঔপনিষদিক বাণী সত্যই বিস্ময়কর। কোন সংস্কারকেই, তা সে যতই মনোরম হোক না কেন, যতই প্রিয় হোক, উপনিষদ্ আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় না। কোন মতবাদকেই সে চূড়ান্ত বলে মনে করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায় না। যাত্রাপথে কোনরকম ক্লান্তি বা আলস্যকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। সত্য, একমাত্র সত্যই তার লক্ষ্য। সত্যের জয় ঘোষণা করছে সে মুক্তকণ্ঠেঃ

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"[১৯]

—একমাত্র সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নয়; চরম অনুভূতির পথে যেতে হলে সত্যকে ধরে রাখা চাই।

চরম অনুভূতির পথে ছড়িয়ে আছে নানা পরিত্যক্ত মতবাদের আবর্জনা, মনোরম নানা অন্ধ বিশ্বাস এবং অনেক আপাতপ্রকল্প। এইগুলি নিয়ে মজে থাকলে চলবে না। এই পথে যেতে হলে চাই বিচারমূলক বৈরাগ্য, সদাসতর্ক বিশ্লেষণ আর আন্তরিক একান্ত নিরপেক্ষতা এবং সর্বোপরি—সত্যানুসন্ধানের জন্য একাগ্র, তন্ময় একটি নিষ্ঠা ও আর্তি। কোন একজন পণ্ডিত নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করলেন, অন্যজনে আবার তার মধ্যে যুক্তির ন্যূনতা দেখতে পেলেন। আবার এগিয়ে গেলেন তাঁরা, গেলেন গভীরে আরও গভীরে। এইভাবে নানা প্রতিভাদীপ্ত মনন ও মানসিকতার এবং চিন্তার শোভন সংঘাতের ও সমন্বয়ের পথ ধরে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। কোন জাতীয় সংস্কার বা পুরোহিতের অনুশাসনে এই অনুসন্ধানবৃত্তি কখনও থেমে থাকেনি। এইভাবে মানবরহস্যের গভীরে গিয়ে সেই শাশ্বত আত্মার সন্ধান মিলেছে, বহুত্বের পিছনে সেই চিরন্তন একত্বকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সমস্ত পথটাই ছিল আবিষ্কারের আনন্দময় অভিযাত্রা। আবিষ্কারের পর পিছনে ফিরে তাঁরা দেখলেন, কোন মতবাদই নিরর্থক নয়; মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবরহস্য

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে মানবরহস্যের গভীরে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করতেই হবে। বিখ্যাত প্রত্নজীববিজ্ঞানী পিয়ের তেইয়ার দ্য শারদাঁ বলেছেনঃ

"The time has come to realize that an interpretation of the universe—even a positivist one—remains unsatisfying unless it covers the interior as well as the exterior of things ; mind as well as matter. The true physics is that which will, one day, achieve the inclusion of man in his wholeness in a coherent picture of the world."[২০]

উপনিষদের ঋষিরা সুদূর অতীত যুগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের বাইরের রূপটার অন্তরালে রয়েছে অসীম শাশ্বত আত্মা। মানুষ যতক্ষণ নিজেকে সসীম বলে ভাবে ততক্ষণ এই সসীম জগতেই তার স্থিতি। সে তখন বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কণা ধুলোর মতোই, পাস্কাল যেমন

বলেছেন: "The universe engulfs me and reduces me to a pin-point." কিন্তু সে যখন নিজের অসীমত্ব উপলব্ধি করে, নিজেকে শাশ্বত আত্মা বলে বুঝতে পারে, তখনই সে এই বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারে। এই যে মানুষের অন্তর-পরিচয় এবং বিশ্বের রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মনে তা ক্রমশই আলোড়ন তুলছে। শারদ্যাঁ বলেছেন: "Up to now has science ever troubled to look at the world other than from without?" তিনি আরও বলেছেন:

"It is impossible to deny that, deep within ourselves, an 'interior' appears at the heart of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that, in one degree or another, this 'interior' should obtrude itself as existing everywhere in nature from all time. Since the stuff of the universe has an inner aspect at one point of itself, there is necessarily a *double aspect to its structure,* that is to say in every region of space and time—in the same way, for instance, as it is granular : *coextensive with their Without, there is a Within to things.*"[২১]

অনুরূপ কথা বলেছেন বিখ্যাত শারীরতত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ স্যার চার্লস শেরিংটন:

"Today Nature looms larger than ever and includes more fully than ever ourselves. It is, if you will, a machine, but it is a partly mentalized machine, and in virtue of including ourselves it is a machine with human qualities of mind. It is a running stream of energy—mental and physical—and unlike man-made machines it is actuated by emotions, fears and hopes, dislikes and love."[২২]

১৯৫৯ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে "Evolution after Darwin" শীর্ষক যে আলোচনা সভা হয়েছিল তার শেষ দিনে বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ স্যার জুলিয়ান হাক্সলী তাঁর বক্তৃতায় (The Evolutionary Vision) ক্রমবিকাশের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন:

"Man's evolution is not biological but psychosocial; it operates by the mechanism of cultural tradition, which involves

the cumulative self-reproduction and self-variation of mental activities and their products. Accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by breakthroughs to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas, and beliefs—ideological instead of physiological or biological organization..."[২৩]

গুণগত উৎকর্ষের দিকেই বিবর্তনের প্রবণতা প্রসঙ্গে গুণ (quality) সম্বন্ধে হাক্সলী আরও বলেছিলেনঃ

"It (evolutionary vision) shows us mind *enthroned* above matter, quantity subordinate to quality."[২৪]

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন ভাবের দিক থেকে উদ্দেশ্য চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির ব্যাপারে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ। দুটিই জ্ঞানলাভের পথ এবং অধ্যাত্মমার্গ। এমন কি বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাপারেও এই দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মূল চরিত্র দেখাতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, আত্মপ্রকাশ-উন্মুখ আদিকারণ (cause) নিজেকে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে প্রকাশিত করছে। এই পূর্ব সিদ্ধান্ত উভয়েই স্বীকার করেছে। বেদান্ত একেই ব্রহ্ম বলে অভিহিত করে যা সমগ্র বিশ্বের মূলে রয়েছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ যেকথা বলেছে তা সকল বিজ্ঞানী-কেই আকৃষ্ট করবে ঃ

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"[২৫]

—যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, যার মধ্যে সব কিছুর অস্তিত্ব, প্রলয়ে যার মধ্যে সব কিছু আবার বিলীন হয়, তুমি তাঁকে জান; তিনিই ব্রহ্ম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই মূলতত্ত্ব একটি বাস্তব সত্তা, অন্তরালে লুকানো একটি পটভূমি, যেকথা ফ্রেড হয়েল বলেছেন। বেদান্ত ও বিজ্ঞান উভয়েই বিশ্বসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টির ব্যাপারে ক্রমবিকাশবাদকে স্বীকার করে।

প্রাচীন বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই আত্মিক সংযোগ দেখিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ "আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলিয়া 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।"[২৬]

যদিও বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক আদর্শের কোন সামান্য অস্তিত্ব এখনও সরাসরি প্রাধান্য লাভ করেনি, তবুও বিংশ শতাব্দীর বহু বিজ্ঞানীই বিজ্ঞানের এই বস্তুসর্বস্ব অনমনীয় মনোভাবের বদলে বিজ্ঞানের জগতে আধ্যাত্মিক অ া ও চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন শারদ্যাঁ ও হাক্সলী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এমন কি, গত শতাব্দীতেও ডারউইনের সহকর্মী টমাস হাক্সলী বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়বাদকে মেলাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জড়বাদকে 'অনুপ্রবেশকারী'[২৭] বলে উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতেও অনুরূপ প্রতিবাদ করেছেন বিখ্যাত পদার্থবৈজ্ঞানিকেরা। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্মোচিত মহাবিশ্বের মৌল চিত্রে 'জড়' ক্রমশই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং 'মন'ই একমাত্র প্রধান হয়ে উঠছে।[২৮] জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর. এ. মিলিক্যান জড়বাদকে "নির্বোধের দর্শন"[২৯] বলে অভিহিত করেছেন।

আজকের বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান জড়বাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে, এবং জীববিজ্ঞান তার নিজস্ব পথ ধরে এ বিষয়ে এগিয়ে গেছে আরও কয়েক ধাপ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে মন ও চেতনার অভিমুখে, এবং এর ফলে নতুন পরিস্থিতির যে উদ্ভব হয়েছে তাকে জেম্‌স্ জীন্‌স্ বলেছেনঃ "A New Background of Science". জুলিয়ান হাক্সলী ও শারদ্যাঁ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মিক সত্তার খোঁজ পেয়েছেন ক্রমবিকাশের পথে। শারদ্যাঁর মতে জীববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদে প্রকৃতির একটি আভ্যন্তরীণ দিক উন্মোচিত হচ্ছে যা পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে উন্মোচিত এতদিনের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব প্রকৃতির বাহ্যরূপ থেকে ভিন্ন। প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ দিককে বেদান্ত বলেছে "প্রত্যক্ রূপ" আর বাহ্যরূপকে "পরাক্ রূপ"।

বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ দিকটি সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে স্বীকৃতি জানাবে তখনই সে খুঁজে পাবে আত্মিক সম্পর্কের প্রকৃত পরিচয় এবং এগিয়ে যাবে বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের দিকে। এই আন্তর ও বাহ্যরূপদ্বয়ের সমন্বয়ে যে জ্ঞান, বহুযুগ আগে ভারতবর্ষ তার বেদান্তে সম্যক্ জ্ঞান রূপে লাভ করেছিল। এই সম্যক্ জ্ঞানেরই অন্য নাম পূর্ণ প্রজ্ঞা বা পূর্ণতার দর্শন। প্রকৃত সত্যে আন্তর বা বাহ্যরূপের কোন ভেদ নেই। এই রূপদ্বয় মানুষেরই কল্পনা এবং তার নিদিধ্যাসনা, পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য।

ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন একই সত্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন প্রয়াসমাত্র এবং সব শাখাই পরিণতিতে বিশ্বের সার্বিক মহাবিজ্ঞানে পৌঁছায়, বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যরূপের সর্বাঙ্গীণ চরিত্রে পর্যবসিত হয়, তেমনি আন্তর ও বাহ্যবিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যায় পৌঁছায়, যে ব্রহ্মজ্ঞানে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। বস্তু এবং বস্তুর অতীত এই দুই নিয়ে সামগ্রিক অনাদি 'অস্তি', বেদান্তে ব্রহ্মবিদ্যা বলতে সেই সমগ্রতাকেই বোঝানো হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে (১ঃ১ঃ১) ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে, সর্ববিদ্যা—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম"[৩০]—'ক্ষেত্র' (জড়, প্রকৃতির বাহ্যরূপ) এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (জীব, প্রকৃতির অন্তররূপ) এই দুইয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।

বেদান্ত চিন্তার এই সর্ববিদ্যাকে স্বামীজী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সে সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ "মুক্ত ধর্ম বলিতে বিবেকানন্দ যাহা বুঝিতেন, তাহাকে বিজ্ঞান গ্রহণ করুক বা না করুক, যিনি নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিতেন সেই বিবেকানন্দের প্রশান্ত দম্ভকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই; কারণ, তাঁহার ধর্ম বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম এমন বিশাল যে, সত্যের সকল বিশ্বস্ত সন্ধানীকেই সে তাহার সহিত একাসনে স্থান দিতে পারে।"[৩১]

ব্রহ্ম ও জগৎ (The Absolute and Manifestation) শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ "বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল

বস্তুর সত্যস্বরূপ।...জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিয়েছি।"[৩২]

বিজ্ঞান ও বেদান্তের পরিপূরক চরিত্রের কথা ভাগবতের একটি জ্ঞানগর্ভ ঘোষণায় রয়েছেঃ

"প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥"[৩৩]

—এই জগতে যেসব মানুষ নিসর্গের সত্যানুসন্ধানে পারঙ্গম, সাধারণত তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত অশুভের উৎস থেকে মুক্ত করে বৃহতের দিকে উন্নীত করেন। বিশেষ করে মানুষের কাছে তার নিজের মৌলসত্তাই তার গুরু, কারণ সে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে জ্ঞাত অনুমান থেকেই শ্রেয় লাভ করে। জ্ঞানিগণ, যাঁরা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্যক্ আয়ত্ত করেছেন এবং নিজেদের জীবনে অধ্যাত্ম-কলাকে চর্যায় বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা এই মানব-জীবনেই আমাকে লাভ করেন—সর্বশক্তি সমন্বিত এবং পরিপূর্ণ প্রকাশিত এই আমাকে প্রাপ্ত হন।

ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বৈদান্তিক মত

সমগ্র বিবর্তনের ধারাকে বেদান্ত অবয়ব অঙ্গসংস্থান এবং বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকেও প্রগতিশীল ক্রমবিকাশ বলে মনে করে। বস্তুত ক্রমবিকাশের সমগ্র যাত্রাপথই, বেদান্তের দৃষ্টিতে শাশ্বত অসীম আত্মার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর রূপে প্রকাশ। এটি জড়ের বিকাশ এবং আত্মার প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে, আদি প্রাণী ছিল চৈতন্যবান, স্বীয় আত্মিক সত্তায় সত্তাবান। এই আত্মিক সত্তা ক্রমশ বেড়ে চলল, ক্রমবিবর্তনের পথে পূর্ণ থেকে পূর্ণতররূপে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমবিকাশের

মধ্য দিয়ে এই চেতনা ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় আরও পরিস্ফুট হল এবং পরিণামে পরিবেশ ও প্রকৃতির উপরে প্রাণীর বিজয়াভিযান অধিকতর দ্রুত প্রসারিত হল।

ক্রম-উন্মেষিত এই চেতনায় নবদিগন্ত দেখা গেল যখন ক্রমবিকাশের পথে মানুষের আবির্ভাব ঘটল। এর আগে পর্যন্ত যেসব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তারা মুখ্যত বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধেই সচেতন ছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিল অন্তর-পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুটি রূপ সম্বন্ধেই মানুষের চেতনা জাগ্রত।

বেদান্ত এবং বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানে এই অন্তর-পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতাই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মচেতনা—প্রকৃতির ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষে পরিণতি লাভ করেছে। এটি চেতনার ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করে নিয়ে এল যা একদিকে মানুষের যাত্রাপথে মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসায় অন্যদিকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করল।

বেদান্তের দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের পথে মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের জাগরণ সম্পর্কে ভাগবতে সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছেঃ

"সৃষ্টবা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগ-দ্বন্দ্ব শূকান্। তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥"[৩৪]

ভারতীয় বৈশিষ্ট্যঃ শুধু চিন্তন নয়, উপলব্ধি

ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞানলাভ করলাম তাতে বোঝা গেল মানুষের মধ্যে সত্তার যে রহস্য তা-ই হচ্ছে আত্মার রহস্য। আত্মার এই রহস্যের সমাধান না হলে বিশ্বের কোন রহস্যই উন্মোচিত হবে ন। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব, কোন কিছুই আমাদের এই বিশ্বজগতের রহস্য পুরোপুরি সমাধান করতে পারবে না; এগুলি শুধুমাত্র অনুমান-প্রমাণের গোলকধাঁধায়ই ঘুরতে থাকবে। চরম সত্যের মতো একটি বিষয়ে কেবলমাত্র অনুমান করেই ভারতীয় মন তৃপ্ত থাকতে পারেনি। ভারতীয় ঋষিরা সাহসিকতার সঙ্গে অন্তর-জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন, চেতনা ও অহংবোধের সূত্র ধরে তাঁরা প্রবেশ করলেন গভীরে. অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে তাঁরা নশ্বরের পিছনে অবিনশ্বরকে খুঁজে পেলেন, সসীমের গভীরে পেলেন অসীমকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে; তার তাৎপর্য বোঝানো হয়েছেঃ

"...যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং..."[৩৫] ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায় সেই মহাবাক্যই ধ্বনিত হয়েছেঃ তুমি সেই (তত্ত্বমসি)।[৩৬] উপনিষদে বার বার এই সত্যের কথাই বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবেই মানুষের চিন্তার মধ্যে যখন এমন শক্তি রয়েছে যার সাহায্যে সে একটি সামান্য সূত্র দিয়ে বিশাল বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে আত্মার ক্ষেত্রে, নিত্য অসীম আত্মার বিষয়েও কি তার অনন্ত শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়? বিশ্বজগতের রহস্য শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হল মানুষের স্বীয় অন্তর-রহস্যের সমাধান করে। উপনিষদের ঋষিরা উপলব্ধি করলেন, বিশ্বরহস্যের কেন্দ্র মানুষের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে এবং এই কেন্দ্রকে খুঁজে পেলেই মানুষ তার শাশ্বত সত্তাকে অনুভব করতে পারে। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্বজগৎ আত্মার আলোকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সত্যের উপলব্ধিতেই মানব-জীবনের পূর্ণতা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায়ঃ

"যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।"[৩৭]

এ ছিল এক আশ্চর্য আবিষ্কার, আনন্দের পরিপূর্ণতায় উজ্জ্বল আবিষ্কার। উপনিষদের ছত্রে ছত্রে এরই অনুরণন। চরম সত্য আত্মায় উপলব্ধি করে ঋষিরা জ্ঞানের চরমে পৌঁছালেন, উপনীত হলেন চেতনা, শান্তি ও আনন্দের পরিপূর্ণতায়। খুঁজে পেলেন সত্য, জ্ঞান আর আনন্দের চির প্রস্রবণকে, পেলেন সৎ-চিৎ-আনন্দকে। এই সত্যানুসন্ধানের তপস্যার পথে জীবনের যে পরিপূর্ণতা আসে—তারই আলোকে তাঁরা এই মহাজাগতিক এবং জৈবিক বিবর্তনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেলেন।

প্রতিটি জীবনই পরিপূর্ণতাকে খুঁজে পেতে চায়। আধুনিক জীববিজ্ঞানের মতে এটিই জীবজগতের সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য। উপনিষদে আমরা পাই মুক্তি আর পূর্ণতার বিষয়ে সুন্দর ধারণা। বদ্ধ আমরা মুক্ত হতে চাই,

অখণ্ড অনন্ত হতে চাই, পেতে চাই পূর্ণতাকে। যীশুখ্রীষ্ট একেই বলেছেন, 'Perfection' (পরিপূর্ণতা)। "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." ৩৮ তোমরা শুদ্ধ হও, পরিপূর্ণ হও, এমন কি স্বর্গে তোমাদের পিতার মতো শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও। মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করা, স্বীয় চেতনার সীমাকে বিস্তৃত করা, বোধিকে প্রাপ্ত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে প্রজ্ঞাবান হওয়া—এই-ই হচ্ছে মানবজীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুই মানুষের চেতনাকে বিস্তৃত করার পথ ও পদ্ধতি মাত্র, পূর্ণতার গভীরে এগিয়ে যাবার প্রয়াস। এই পথ ও প্রয়াস শুধু বাহ্যিক প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারেই শেষ নয়, পরন্তু অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের নিজের অন্তঃকরণের উপর আধিপত্যের প্রয়াসও। "জ্ঞানই শক্তি"—একথা শুধু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্য। এখানে মানুষের শক্তি পরিমাণগতভাবেই নয়, গুণগত দিক দিয়েও বেড়ে যায়।

সেন্ট হেলেনায় নির্বাসিত নেপোলিয়ান যথার্থই বলেছিলেনঃ "এই জগতে দুটি শক্তি রয়েছে—তরবারির শক্তি আর আত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি সব সময়েই তরবারির শক্তিকে নিশ্চেষ্ট করেছে। আলেকজান্ডার, সিজার, শার্লামেন আর আমি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিভা কিসের উপর দাঁড়িয়েছিল? তরবারির শক্তির উপর। যীশু তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেমকে ভিত্তি করে। আর তাই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে।"

মানবীয় পূর্ণতার বিজ্ঞান এবং বিবেকানন্দ

ভারত ধর্মকে একটি বিজ্ঞান হিসাবেই বিকশিত করেছিল; "ধর্মের বিজ্ঞান" কথাটিকে জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেনঃ "মানবীয় পূর্ণতার বিজ্ঞান।" এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তির উল্লেখ করলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ "...আমরা কৃত্রিম উপায়ে বস্তুর বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করিয়া তুলিতেছি। মানুষের উন্নতিই বা দ্রুততর করিতে পারিব না কেন? জাতি হিসাবে আমরা তাহা করিতে পারি। অপর দেশে প্রচারক পাঠানো হয় কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমরা দ্রুততর করিতে পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির দ্রুততর কোন সীমা কি নির্দেশ করা

যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হইতে পারে, তাহার বেশী নয়, এ-কথা বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অদ্ভুতভাবে তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে পারে। কাজেই পূর্ণতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা টানা যায় কি? ...সম্প্রতি—এই সেদিনকার কথা— এরূপ একজন মানব (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আসিয়াছিলেন, যিনি এই জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়া চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার এই কার্যটিকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হইবে। এই নিয়মগুলি আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, এগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা মানেই উন্নত হওয়া। এই উন্নতির বেগ দ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে নিজেকে বিকশিত করিয়া এই জীবনেই আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের জীবনের উচ্চতর দিক; এবং যে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও তাহার শক্তির অনুশীলন করা হয়, তাহার যথার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ।...এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া লও এবং এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাও। ইহাই তাহার মহান্ উদ্দেশ্য।"[৩৯]

বেদান্তের চিরন্তন বাণী ঃ অভীঃ ও শক্তি

আত্মিক জ্ঞান মানুষকে অসীম শক্তি আর সাহসিকতা এনে দেয়। সত্য ও প্রয়োজনের দিক থেকে এটাই বেদান্তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে সুদূর অতীতের সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে। আমি যেন দেখিতেছি--সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন; সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া গ্রীসে যাইতে অস্বীকার করিলেন ; তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর

কখনও বলো নাই। আমাকে কে বধ করিতে পারে? জড়জগতের সম্রাট, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অক্ষয়। আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিবও না! আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ! তুমি শিশু, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য।"[৪০]

আত্মিক শক্তি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। তখন এক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে এক সৈনিক ছুরি দিয়ে মারায় সেই সাধু মরণাপন্ন হন। অন্য সৈনিকেরা যখন সেই ঘাতককে বন্দী করে নিয়ে সাধুর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই সৈনিকই তাঁর ঘাতক কি-না, তখন সেই সাধু তাঁর পনেরো বছরের মৌনতা ভেঙে আপ্লুত ভালবাসার কণ্ঠস্বরে বললেনঃ "তুমিও সেই ব্রহ্মই।" সেই সাধু সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে নিজের একত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ঘাতকের মধ্যেও সেই এক আত্মাকেই দেখতে পেলেন।

মৃত্যুর মুখে সক্রেটিস যে শক্তি ও সাহসের নিদর্শন দেখিয়েছিলেন তাও ঐ একই আত্মিক শক্তির অর্জিত উৎসের থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন। ক্রিটো যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "সক্রেটিস, তোমার শবদেহ কিভাবে আমরা সৎকার করব?" সক্রেটিস উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তা তুমি যেভাবে ইচ্ছে করতে পার, কিন্তু যথার্থই আমার এই আমিকে তুমি ধরার চেষ্টা কর। আনন্দ কর ক্রিটো, জেন, তুমি কেবল আমার দেহটিকেই সমাধিস্থ করছ এবং তোমার যেভাবে ভাল মনে হয়, সেভাবেই তুমি তা করতে পার।"[৪১]

মানুষকে যদি যথার্থ জীবন লাভ করতে হয়, জীবনের যথার্থ পূর্ণতা সে যদি পেতে চায়, তাহলে তাকে নিজের মধ্যে সেই অবিনশ্বর আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, জয় করতে হবে তার নিম্নতর সত্তাকে, তার সসীম পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবত্বকে। এইটি লাভ করার একটি বিশেষ উপায় আছে, এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মগুলি সেই উপায়টিকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে। কিন্তু একমাত্র ভারতেই এই উপায়টিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যৌক্তিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা হয়েছে। একটি উদার সার্বিক ফলশ্রুতিতে এই ধ্যানধারণা পূর্ণবিকশিত এবং পরিণামী হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও বেদান্ত পরিপূরক

এইভাবে ব্যাখ্যাত ধর্ম, আমাদের বেদান্ত ধর্ম সমগ্র মানবজাতির কাছে এক বিশেষ বাণী বহন করে আনে। বিজ্ঞান তার কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে চমৎকার বাড়ী বানাতে পারে। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সব রকম আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে বাড়ীটিকে সাজাতে পারে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে সুখী সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত বস্তুবৈভবই দিতে পারে; এমন কি রাষ্ট্রীয় ধর্মসভার মাধ্যমে হয়তো তাকে স্বর্গের আশ্বাসও দেয়া যেতে পারে, এবং মানুষ নিজেও তার বাড়ীকে "শান্তি কুঞ্জ" (Happy Villa) ইত্যাদি নামে ভূষিত করতে পারে। কিন্তু এর কোনটিই মানুষকে সুখী ও শান্তিময় জীবনের চূড়ান্ত আশ্বাস দিতে পারে না। কারণ এটি অনেক পরিমাণে শক্তি ও পরিপুষ্টির অপর এক গোমুখী-উৎসের উপরে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরে নির্ভরশীল। তার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা-সঞ্জাত এক বিশেষ জ্ঞান ও শুদ্ধ সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত দিব্য জ্ঞান ও মহাশক্তি। মানুষ যদি ভৌতবিজ্ঞানের সাহায্যে সুস্থ সজীব বহির্জীবন-পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং তার সঙ্গে ধর্মের সাহায্যে যদি মানুষ অন্তঃপ্রকৃতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে তাহলেই সে জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পেতে পারে; অন্য ভাবে নয়। এই-ই হচ্ছে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা আমাদের এই পূর্ণতার পরিবেশ দিতে পারছে না। যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ আজ অর্থ-ক্ষমতা-বিলাসিতার মধ্যে থেকে ক্রমশই অন্তরের দিক থেকে হয়ে উঠছে শূন্য, রিক্ত। আজ সর্বক্ষণই সে রয়েছে উত্তেজনা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে, সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার মাঝখানে। তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রমত্ত পানাসক্তি, আত্মহত্যা ইত্যাদি আরও বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এই দুঃখ-যন্ত্রণার পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কেন? কারণ মানুষ অন্তরের তৃপ্তিকে হারিয়েছে, ক্ষমতা ও একঘেয়ে জীবনের দংশনে ইন্দ্রিয় সীমায় আবদ্ধ হয়ে মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, অস্থির। আধুনিক মানুষের এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা, এই বিপন্ন অসহায়তা সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিরা বহুযুগ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রয়েছেঃ

> "যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
> তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥" [৪২]

একশ বছর আগে শোপেনহাওয়ার বলেছিলেনঃ

"All men who are secure from want and care, now that at last they have thrown off all other burdens, become a burden to themselves." ৪৩

মানুষ আজ নিজেই নিজের কাছে এক বিরাট সমস্যা, এক বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, সম্পদের ঐশ্বর্যের প্রভূত প্রাচুর্য, সমাজনীতি-রাজনীতির যথার্থ সম্প্রয়োগের আরও নানা অবদান, কোন কিছু দিয়েই মানুষ এই বিপন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। এ সম্ভব কেবলমাত্র ধর্মবিজ্ঞানের সাহায্যে, ধর্মকে উপলব্ধি ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই—ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া।" ৪৪

ভারত এই বিশেষ অর্থেই ধর্মকে উপলব্ধি করেছে এবং এই কথাটিই স্বামীজী সমগ্র বিশ্বে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে গেছেন। ধর্মের পরিণাম ও উদ্দেশ্য এই উপলব্ধি, প্রাচীন ঋষিদের ভাষায়ঃ ঈশ্বরকে অনুভব করা, আত্মিক চেতনার দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলা। এটাই ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ইটের পর ইট সাজিয়ে যেমন বাড়ী তৈরী হয়, আত্মিক চেতনার স্তরেও তেমনি মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। যখন আমরা ধর্মসাধনা শুরু করি, তখন অসীম শক্তি জেগে ওঠে, চেতনার সীমা বিস্তৃত হয়, সহানুভূতির ঐশ্বর্যে হৃদয় আরও বড় হয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা ক্রমশই পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে চলেছি। এই অন্তর-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শক্তি আসে, যা মানুষকে আরও উন্নত করে। এবং তখনই আমরা বিজ্ঞান-প্রগতির উৎস-জাত তেজ ও শক্তিকে বৃহত্তর কর্মসমন্বয়ে জীবনের অংগীভূত করে নিতে পারি। তখনই মানুষ জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণে এনে শক্তি ও জ্ঞানে পরিণত করে, আনন্দ ও কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। সমাজ থেকে ধর্মকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তবে তো বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকে। মানবসংস্কৃতির সংগে সমস্ত সম্পর্ক-শূন্য এই বর্বরতাই বহু প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আধুনিক সভ্যতাও যদি এই পথেই যায় তবে তা নিজের মধ্যেই লালিত বর্বর শক্তির দ্বারা নিজেই ধ্বংস হবে। আমাদের রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত "আত্মিক প্রেম" ৪৫ এবং যা আমাদের সকলকে বেঁধে রাখবে একটি

উদার সৌভ্রাত্র বন্ধনে—যেকথা বলে গেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। মানবহৃদয়ে এই পরার্থবাদের প্রসারণা সম্পর্কে বলেছেন পিতিরিম সরোকিনও।[৪৬] এই আত্মিক প্রেম আসে ধর্মের মধ্য দিয়ে একথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং পৃথিবীর অন্যান্য আচার্য ও মহৎ জ্যেষ্ঠরাও। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।"[৪৭] তিনি আরও বলেছেনঃ "তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা।"[৪৮]

তাহলে এখন প্রশ্ন উঠবে—ধর্ম কি সত্যি আমাদের কিছু দিতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ এর উত্তরে বলে গেছেনঃ "পারে।...ইহা মানুষকে অনন্ত মহাজীবন আনিয়া দেয়। ইহা মানুষকে মানুষ করিয়াছে, এবং এই পশুমানবকে দেবত্বে উন্নীত করিবে। ইহাই হইল ধর্মের ফল। মানব-সমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ একটি অরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।...ইন্দ্রিয়সুখকে মানবজীবনের লক্ষ্য মনে করা অসম্ভব...জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।... আমরা দেখিতে পাই, পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা হইতে অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখি যে, মানুষ তাহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক স্বরূপ হইতে অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই অনুভূতির সহিত আনন্দলাভও হইবে।"[৪৯]

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখলাম, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরাট কোন ব্যবধান নেই। দুটি শাখাই মানুষকে আত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করতে চায়, নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে চায় যেখানে এই জীবনেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে মানুষ। একক বিচ্ছিন্নভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অসহায়। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের কেবলমাত্র একটিকে নিলেই হবে না। এই ব্যর্থ চেষ্টা আগেও হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবী কেবলমাত্র ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইত, এবং

আধুনিক পৃথিবী শুধু বিজ্ঞানকেই ভিত্তি করতে চায়। ফলে দুইয়ের মধ্যেই দেখা গেছে ব্যর্থতা। এই দুইয়ের সম্মিলনেই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ। জগৎ আজ এই সমন্বিত মহান মানবসভ্যতার জন্যই প্রতীক্ষমাণ। মানুষের চিন্তার জগতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটাই হচ্ছে স্বামীজীর বিশিষ্ট অবদান। বেদান্তের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে একথাই তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেনঃ

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"[৫০]

শুধু ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় নয়, হৃদয় ও বুদ্ধির, ধ্রুব ও কল্পনার সমন্বয়ও করতে হবে—স্বামীজীর বেদান্ত এই জিনিসটিই তুলে ধরেছে। এ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানবিকী বিদ্যা এবং বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। স্বামীজীর এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে তা কত ব্যর্থ এবং এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান আসলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেনঃ স্বামীজী হলেন মানুষের সব রকম শক্তির মূর্ত রূপ। মানুষের সকল মৌলিকতা, সকল অবদান, সকল শক্তিকে স্বামীজী নতুন ভঙ্গিতে চালিত করতে চেয়েছেন, কারণ মানুষের সমস্ত আশাআকাঙ্ক্ষা, শক্তি-সাহস, সাধনা ও কর্মপ্রয়াসের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন একটি সুগভীর সাম্যের অবস্থিতি, একটি সমন্বয়ী মানবপ্রজ্ঞার প্রসারিত রূপ। আগামী যুগের মানবধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ "বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও

করুণার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে।"[৫১]

স্বামীজীর ইতিহাসচেতনা

আক্ষরিক অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো ঐতিহাসিক নন। ভারত-তত্ত্ববিদ্ (ইন্ডোলজিস্ট) বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, সে পর্যায়েও স্বামীজীর আসন নিরূপণ করতে গিয়ে আমাদের দ্বিধা হতে পারে। প্রথমত ও প্রধানত তিনি অধ্যাত্মসাধনার পথে বলিষ্ঠ পথিক। সর্বোপরি তাঁর ছিল অপূর্ব ভারতপ্রেম, তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। আধ্যাত্মিক চিত্রপটে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি ভারতবর্ষকে। সমকালীন বাস্তব ভারতের সকল গ্লানি ও কুশ্রীতাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর যে ভূমিতে অনন্য উত্তরণ ঘটেছিল, সে ভূমিতেই তিনি অবলোকন করেছিলেন শাশ্বত ভারতকে। আমাদের এই বিশাল দেশের পথে ঘাটে, পাহাড়ে জঙ্গলে, সাগরে মরুভূমিতে, আকাশে বাতাসে এবং নদনদীর নিত্য প্রবহমান ধারায় মহাকালের পদচিহ্নে রচিত ইতিহাসের খোলাপাতায় তিনি তাঁর পাঠ গ্রহণ করেছেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অসামান্য মননশীলতা তাঁর অধ্যাত্ম চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে ইতিহাস-সাগরের গভীরে রত্নসন্ধানে।

এখানেই তিনি অভিনব ভারতপথিক। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনার জন্ম। অসামান্য দরদী প্রাণ নিয়ে তিনি পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন, শোষিত-দরিদ্র-পীড়িত দেশবাসীর মর্মন্তুদ বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এই প্রাণময় অভিজ্ঞতা স্বামীজীকে একাধারে করে তুলেছে মরমী দেশপ্রেমিক এবং অভিনব ভারত-তত্ত্ববিদ্। ভারতের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও শত দুর্ভাগ্য তাই তাঁর কাছে মনে হয়েছিল সাময়িক। এবং তার নিরসনকল্পে তিনি এদেশের ইতিহাসের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেছেন তাঁর রচনাসম্ভারে। ভারতের মহামানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ হয়ে ধ্যাননেত্র উন্মীলন করে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন মাতৃভূমির অঙ্কে থরে থরে সাজানো রত্নরাজি, ইতিহাসচেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি বর্তমান ভারতের অবশ্য গ্রহণীয় বলে তাদের চিহ্নিত করেছেন।

অতীত থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে ইতিহাস পাঠ করি। বর্তমান জীবনে অতীত কতটা গ্রহণীয়? তার সঙ্গে উন্নত পশ্চিমের কতটা গ্রহণ করে সমন্বিত করতে পারি? প্রগতির পথে চলার উপাদান সমূহ কোথায় সংগ্রহ করব? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় ইতিহাস। বস্তুত, ইতিহাস পাঠের সার্থকতাই

এখানে। স্বামীজীর রচনাবলী অধ্যয়ন করলে, বিশেষ করে ইংরেজিতে লেখা তাঁর মাত্র সাড়ে দশ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ—"Historical Evolution of India" (ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন) অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করলে ভারত ইতিহাসের তথ্যসন্ধানী গবেষকেরাও কিছু নির্দেশিকা লাভ করবেন, সাধারণ পাঠকেরা অবাক হবেন এই ভেবে যে এত অল্প পরিসরে তিনি এত কথা বললেন কেমন করে। স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে এই নিবন্ধটি মুদ্রিত রয়েছে।

উক্ত নিবন্ধটিই বর্তমান রচনার অবতরণিকা। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার প্রয়াস এ রচনার কৃত্য নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের ধারাটিই শুধু স্বল্প পরিসরে বর্তমান লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন নামক নিবন্ধে নয়, স্বামীজীর দেশে বিদেশে প্রদত্ত অজস্র (মুদ্রিত) ভাষণের মধ্যে, তাঁর ক্লান্তিহীন লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে তাঁর সামগ্রিক ইতিহাসচেতনা বিধৃত হয়ে আছে। এসবের সংকলন ও বিশ্লেষণ সুযোগ্য সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আমরা প্রতীক্ষারত।

॥ ২ ॥

এদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ঘন তমিস্রার বুকে নিঃশঙ্ক পথ কেটে চলার প্রাথমিক কৃতিত্বের অধিকারী ইউরোপীয় মনীষিগণ। কিন্তু তাঁরা ইতিহাসের রাজনৈতিক দিকটার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করেই আমরা ইতিহাস শিখি, পরীক্ষায় কৃতকার্য হই এবং ইতিহাসবিদ্ বলে গর্ব অনুভব করি। একথা সত্য যে ভারতের গৌরবময় ঐতিহাসিক অতীত আমাদের জ্ঞাতসারে নিয়ে এসেছেন তাঁরাই। উপকথার ভারে বহুকাল নিমজ্জিত প্রাচীন ইতিকথা তাঁদেরই অধ্যবসায় ও বিশ্লেষণের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অবধি নেই। মোটের উপর এ ধারাতেই চলেছে আজ আমাদের বিরামহীন গবেষণা, তথ্যাদির বিশ্লেষণ, আরও প্রমাণাদির অন্বেষণ এবং বিচারসিদ্ধ মতামতের প্রকাশন। এভাবে আমাদের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য এসব বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ব্যাপকতায় ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের খুঁটিনাটিও দ্রুত প্রাধান্য লাভ করছে। আমাদের ইতিহাস আজ আর রাজা উজীর সেনাপতি—এক কথায় রাজ দরবারের সামগ্রিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় "নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী" হয়তো নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের এই সামগ্রিকতার দিকে প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঐ দুই মহামনীষী "নিশীথকালের দুঃস্বপ্নের" পরিবেশেই। এবং রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধটির পূর্বে স্বামীজী রচনা করেছিলেন, "Historical Evolution of India" নিবন্ধটি। ইতিহাসের তথ্যবিচারে বা ঘটনা বিশ্লেষণে তাঁরা কিন্তু রিসার্চের (ঐতিহাসিক গবেষণার) বাঁধানো রাস্তায় চলেননি। অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় তাঁরা ভাষা দিয়েছেন ইতিহাসচেতনাকে—কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে করেছেন তত্ত্বের সম্প্রসারণ।

ভারত-ইতিহাসের নানা বিপরীত তরঙ্গে আবর্তিত ঘটনাবলীকে একটি অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সূত্র বেঁধে রেখেছে। সেই সূত্রটির সন্ধান না পেলে আমাদের ঐতিহাসিক মননরাজ্যে নৈরাজ্য এসে অধিষ্ঠান করবে। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের অনৈক্য, শক্তিহীনতা, শত সহস্র কলুষ ও ব্যভিচার তখন বিরাট হয়ে দেখা দেবে, ভারত হবে তখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ছোট বড় কতকগুলি দেশের সমষ্টিমাত্র, একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞামাত্র। এদেশের অতীতকাল ও মধ্যযুগ মরুভূমির মতো ধূ ধূ করবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্ধন, শেরশাহ, আকবর প্রমুখ পাঁচ সাতজন শক্তিধর পুরুষ মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো বিরাজ করবেন। যা কিছু আলো, যা কিছু ভাল তাই এসেছে সাগর পেরিয়ে ইংরেজশাসিত ভারতে, সংহতি ঐক্য ও জাতীয়তাবাদ বিদেশী শাসকদের দান—মনে হবে, আধুনিক ভারত-ইতিহাসের এটাই মূলধন।

কিন্তু এ তো সত্য নয়, যেমন সত্য নয় অন্ধ গোঁড়ামির মতবাদ যে বাইরে থেকে ভারতের কিছুই নেবার নেই। সত্য রয়েছে এই দু-এর মাঝখানে। সে সত্যকে জানতে হলে ভারত যে ধারাবাহিকতার সূত্রকে অবলম্বন করে, তার সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন সভ্যতাকে আজও অব্যাহত রেখেছে, সেই সূত্রটির স্বরূপ সন্ধান করতে হবে। জানতে হবে, ভারতের ভাবগত, আদর্শগত এবং ধর্মগত ঐক্য যুগে যুগে কেমন করে আবর্তিত হয়েছে—রাজনৈতিক অনৈক্যের শত জটিলতাকেও উপেক্ষা করে।

ভারত-ইতিহাসের এই মূলতত্ত্বটি, এই সূক্ষ্ম সূত্রটি স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় প্রতিভাত হয়েছে। তার বিশ্লেষণ সৌকর্যমানসে তিনটি ছক বা ফর্মুলার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে—ধর্ম, মন্ত্র বা দর্শন এবং সমন্বয় (Religion, Philosophy, and Synthesis)। এ তিনটি অবশ্য একই সূত্রে গ্রথিত—যদিও বাস্তবে তারা প্রয়োজন মতো বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজী প্রাচীন ভারতকে একটি 'নেশন' বা জাতি বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ "প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণ-

কেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। ...মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।" ১

স্বামীজীর উপরোক্ত মন্তব্য ইতিহাসের ছোট বড় কয়েকটি ঘটনার বা অধ্যায়ের পটভূমিতে যাচাই করা যেতে পারে।

মৌর্যযুগের গৌরব তখন লুপ্ত। বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী ও অহিংসা অশোকের পরবর্তী মৌর্যসম্রাটদের কাপুরুষতার ও ক্লীবতার আবরণে পর্যবসিত। আফগানিস্তান থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে প্রায় কন্যাকুমারী পর্যন্ত একদা বিস্তৃত অপূর্ব ও অনন্য মৌর্যসাম্রাজ্য কালক্রমে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। উত্তরের সিংহদ্বার ভেঙে একে একে প্রবেশ করে ছোট বড় রাজ্য গড়ে ভারতে বসতি স্থাপন করল বহ্লিক জাতীয় গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশাণ প্রভৃতি নানা জাতি। ভিতরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে সুঙ্গ, কান্ব, চেত, অন্ধ্র বা সাতবাহন এবং তারপর নাগ, বাকাটক প্রভৃতি বংশের মধ্যে। রাজনীতির ক্ষেত্রে চরম অনৈক্য, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং গভীর অনিশ্চয়তা এ যুগটিকে (আনুমানিক ২৩২ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ গুপ্ত বংশের উত্থান পর্যন্ত) অন্ধকারময় করে রেখেছে। জটিল রাজনীতির আবর্তে পড়ে ভারতের ঐক্য যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। তার ধারাবাহিক ইতিহাসে যেন ঘটেছে এক দীর্ঘকালস্থায়ী বিরতি।

কিন্তু ঐ সাড়ে পাঁচশ বছরের ইতিহাসে এই কি একমাত্র কথা? ইতিহাসের সাধারণ পাঠকেরাও জানেন যে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে এই ৫৫০ বৎসর কত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত তখন জাগ্রত ও জীবন্ত। নব্য হিন্দুর বা পৌরাণিক সভ্যতার যে পূর্ণবিকাশ গুপ্তযুগকে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে, তার প্রস্তুতিকাল তো পূর্ববর্তী এই যুগে। এযুগের তথাকথিত সুদীর্ঘ রাত্রির তমিস্রাগর্ভেই গুপ্তযুগের সর্বময় সমৃদ্ধি ও গৌরবের পটভূমিকা রয়েছে। ঐ রাত্রির তপস্যায় উদিত হয়েছিল গুপ্তযুগের প্রদীপ্ত ভাস্কর।

আরও আছে। ঐ যুগের ভারত তার প্রাণধর্মের বলিষ্ঠতার দ্বারা বলদর্পী বিজয়ী বিদেশীদের আপন করে নিয়ে বৃহৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত করে নিল। অস্ত্রবলে বিজিত ভারত জয় করল বিজয়ীকে তার সমন্বয়ভিত্তিক সভ্যতার দ্বারা, অসাম্প্রদায়িক মানবধর্মের দ্বারা, বলিষ্ঠ দর্শনের দ্বারা। শক্তিমান গ্রীকরাজ মিনান্ডার বিনয়াবনত 'মিলিন্দ' হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সার কথা জেনে নিলেন। 'মিলিন্দপহ'

গ্রন্থটি তার প্রমাণ বহন করছে। বিদিশাস্থিত গরুড় স্তম্ভটি আজও সাক্ষী রয়েছে "পরম ভাগবত হেলিওডোরসের" কাহিনীর। কণিষ্ক প্রমুখ কুশাণ-রাজদের এবং রুদ্রদমন প্রমুখ শক ক্ষত্রপদের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একলক্ষ শ্লোক সংবলিত যে 'মহাভারত' গ্রন্থটি আমাদের প্রাচীন ভারতের ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সামগ্রিক সুসমঞ্জস বিকাশের পরাকাষ্ঠা ঘটিয়েছে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তা রচনা করতে লেগেছিল প্রায় আটশত বৎসর—আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। "একটা সমগ্র জাতির স্বলিখিত ইতিহাস" স্বরূপ এই মহাগ্রন্থটির রচনাকালের বৃহদংশ জুড়ে আছে ঐ তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ। ধর্মরাজ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা ও প্রধান স্থপতি শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ সময় জন্মেছিলেন, তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক। ভাবের দিক দিয়ে, কর্মক্ষেত্রেও স্বর্ণময় গুপ্তসভ্যতার মূল রয়েছে ঐ সাড়ে পাঁচশ বছরের ইতিহাসে—এটুকুই শুধু স্মর্তব্য। এবং এভাবেই রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত সত্তা বজায় থেকেছে।

অবশ্য ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের সকল উপাদান এ জাতিতে পাওয়া যাবে না। জাতীয় সংহতির ও ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে নয়। তা ছিল নৈমিষারণ্য, কাশী, মিথিলা, তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে। এই প্রাণকেন্দ্রগুলির অপরিসীম গুরুত্ব স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনাকে বিধৃত করে রেখেছে।

ভারতীয় জাতির আর একটি বৈশিষ্ট্যকে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত "Lectures from Colombo to Almora" গ্রন্থে। একটি বিরাট প্রহেলিকা এই ভূখণ্ডের "বিনম্র হিন্দু জাতি"। ইতিহাসের অরুণোদয়ে যেমন সে ছিল, আজও সে মূলত তাই আছে। এই বিনম্র হিন্দু ("mild Hindu") তার সহনশীলতা ও তিতিক্ষার জন্য ঐতিহাসিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে কৃপার পাত্র। এ কারণেই নাকি তার জাতীয় জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনেও বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় এসেছে, বাইরে থেকে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। স্বার্থমগ্ন, ক্ষমতালোভীদের উচ্চাশা ও জিঘাংসার বলি হয়েছে "বিনম্র হিন্দু"।

প্রশ্ন তুলেছেন স্বামীজী—হিন্দুর এই বিনম্রতা তবে কি কাপুরুষতার নামান্তর? তবে আবহমানকাল সে টিকে রইল কোন্ জাদুবলে? প্রাণী জগতের অব্যর্থ নিয়মে শক্তের কাছে দুর্বল হার মেনে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু শত শত বৎসর ধরে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত সয়েও, আধুনিক

জড়বিজ্ঞানের দৌলতে পশ্চিমের খ্রীষ্টানের সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও ভারত আজও সেই "মাইল্ড হিন্দুকে" কোলে নিয়ে ভারতই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কালক্রমে মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে "মাইল্ড হিন্দু" সম-মর্যাদার আসনে বসিয়ে ভারতীয় করে নিয়েছে। রকম ভেদে একদা প্রাচীন কালে যেমন সে করেছিল।

তুলনামূলক আলোচনায় স্বামীজী এ রহস্যের তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বহু বলদৃপ্ত জাতির আশ্চর্য কর্মচাঞ্চল্যের কাছে মানবসভ্যতা ঋণী। এক একটা শক্তিমান জাতি নিজেকে প্রসারিত করবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় যুগে যুগে যুদ্ধোন্মাদনায় মেতেছে। শক্তির কাছে পরাজিত দুর্বলতা সর্বস্বান্ত রিক্ততায় অবনত চিত্তে হাত পেতে দান গ্রহণ করেছে। এভাবে আদানপ্রদানের এবং বহু প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তি সংখ্যাতীত কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত আছে। বর্তমান যুগে যখন জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রসার ঘটে চলেছে, কূট-নীতি ও যুদ্ধবিদ্য। যার দৌলতে হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী, বিরাট এই পৃথিবীর দূরত্ব যখন দূরীভূত, বিভিন্ন দেশ যখন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে—তখন এই আদানপ্রদানের গতি হয়েছে আরও দ্রুত, প্রকৃতি হয়েছে আরও সূক্ষ্ম ও নির্মম।

যুদ্ধের দামামা ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির মাধ্যমেই আধুনিক সভ্যতার এই বিস্তারলাভ। স্বামীজীর ভাষায় এই আদানপ্রদান রক্তের নিরন্তর ধারায় রঞ্জিত, অগণিত শোষণ-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে অভিশপ্ত, লক্ষ শিশুর ক্রন্দনে সিক্ত, বহু নারীর মর্মন্তুদ অকাল বৈধব্যে মসীলিপ্ত। কিন্তু দাতার মদগর্বী ভূমিকায় একদা যারা জীবন্ত অভিনয় করেছিল, তারা আজ কোথায়? প্রাচীনকালের মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম—আজ তাদের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পঠিত হবার অধিকারটুকু মাত্র বজায় রেখেছে। মানব-সভ্যতার প্রথম দিনের সূর্য যে নীলনদের তীরে উদিত হয়েছিল, সেই নীলনদ আজও বয়ে চলেছে মিশর দেশের বুক কেটে। কিন্তু সেই নদীতীরের অধিবাসীরা আজ আরবীয় ইসলামের বলিষ্ঠ উত্তর সাধক, অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আসিরিয়া, ব্যাবিলন আজ শুধু তাদের গোত্র নয়, নাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক গ্রীস ইউরোপের বর্তমান মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র দেশ মাত্র, এথেন্স আজও তার রাজধানী। কিন্তু কোথায় সেই হেলেনীয় জাতিগুলির অপূর্ব শিক্ষানিকেতনটি— School of Hellas? থুকিডিডিস, এ্যাস্কাইলাস, সফোক্লিশ, ইউরিপিডিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল—এই মহামনীষিবৃন্দ সমগ্র মানবসভ্যতার গর্ব। বর্তমান এথেন্সে বসে তাঁদের খ্রীষ্টান সন্তানসন্ততি প্রত্যক্ষ সে উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছে। মহাপ্রাজ্ঞ সক্রেটিশ যদি আজ তাঁর যুগ-যুগান্তের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে ফেলে সমাধি থেকে

উঠে এসে এথেন্সের পথে পথে সেই পুরাতন সুরে কথা বলতে থাকেন, তবে তা শোনবার মতো একটি লোকও খুঁজে পাবেন না। হারিয়ে গেছে তাঁর স্বদেশ, হারিয়ে গেছে তারাও, যারা হেমলক প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেছিল।

আর রোমঃ একদা খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ জুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠে স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘকাল, রোমই ছিল তার রাজধানী, তার প্রাণস্বরূপ। যে মহাশক্তিধর সীজার বিশ্বজোড়া ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে একছত্র নায়কের ভূমিকা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁর সকল পরাক্রমের প্রতীক বা উৎস ঐ ক্যাপিটোল পাহাড় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক করছে, ঊর্ণনাভ আজ সেখানে নিরন্তর জাল বুনে চলেছে। আজকের রোমানগণ আর "Romans among men" নয়, আজ তারা রোমানই নয়, তারা ইটালীয়। অতীতের রোমের কোন পরিচয়ই আর পাওয়া যাবে না বর্তমান ইটালীর রাজধানী রোমকে দেখে। জলের উপর বুদ্বুদের মতো প্রাচীন রোমান মিলিয়ে গেছে, চিহ্নটুকু পর্যন্ত তার নেই উত্তরকালের বুকে।[২]

স্বামীজী তাই বলেছেন, ঐ সব দেশ আর তাদের ধারাবাহিকতা বহন করছে না। তাদের বর্তমান ইতিহাস আলাদা খাতে প্রবাহিত এবং তাদের গৌরবের দাবিও আলাদা প্রকৃতির। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অনাহত, অব্যাহত। এবং তার কারণ ঐ "মাইল্ড হিন্দু"। মানবধর্মশাস্ত্র রচয়িতা মহর্ষি মনু ভারতের প্রাচীন কালের মূর্ত প্রতীক হয়ে যদি বর্তমান ভারতে এসে উপস্থিত হন, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে কালের অমোঘ বিধানে তাঁর বংশধরেরা চেহারায় পোশাকে ও আচার বিচারে বাইরের দিক দিয়ে অনেক বদলেছে কিন্তু অন্তরে ও মৌল সত্তায় ভারতীয়ই রয়ে গেছে, কথা কইছে তাঁরই সুরে যদিও ভাষা আলাদা, উদ্বুদ্ধ হচ্ছে চিরন্তন ভাবধারায়, ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজজীবনে মোটের উপর একই আদর্শ সামনে ধরে রেখেছে।[৩]

সমগ্র মানবসভ্যতায় প্রাচীন ভারতও দান করেছে কম নয়। কিন্তু তার দেবার পদ্ধতি আলাদা। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ অস্ত্র উঁচিয়ে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'সভ্য' করার অজুহাতে কিংবা কিছু দেবার বিনিময়ে অন্য কোন দেশের আধিপত্য দাবি করেনি। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কিংবা ইসলামের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের তুলনা করা যেতে পারে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম আজ সমগ্র বিশ্বে একটি প্রধান ধর্ম। এই ধর্ম প্রচার

করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শ্রেষ্ঠ মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রদর্শিত পথে 'ধর্মবিজয়ের' আদর্শে। ভারতের কোন বৌদ্ধ রাজা এক হাতে অস্ত্র এবং আর হাতে ত্রিপিটক নিয়ে বিরাট সমরাভিযানের মাধ্যমে অন্য কোন দেশ অধিকার করেছেন—ইতিহাস এমন কোন কাহিনীর ইঙ্গিতমাত্র দান করে না। কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অচেনা দেশে মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন, এবং তাঁদের রক্ষা করতে বা সে অজুহাতে এদেশের কোন নরপতি সৈন্য পাঠিয়ে সেদেশ করতলগত করেছেন—এমন কথাও কোন ইতিহাসে লেখা নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কথা। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, বলিদ্বীপ, সেলিবিস, মালয়, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশসমূহ ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অতীতের হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশবাদ ছিল শান্তির পথে ঐশ্বর্যের প্রসার, সম্প্রীতির মাধ্যমে সভ্যতার আদানপ্রদান। 'বিনম্র' হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশের এটাই ধারা ছিল।

॥ ৩ ॥

আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের ধারাও আলাদা নয়। যুগে যুগে ভারত নিষ্ঠুর বহিরাক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে, বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়েছে, তার জীবন-ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর ভারত মেনে নিয়েছে নূতনকে, প্রসারিত করেছে সমন্বয়ের সুদৃঢ় হাতখানি, বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতাকে প্রশান্ত কল্যাণে পরিণত করেছে। ইসলাম এসেছে মধ্যযুগে মুফ্‌তি-মৌলবীদের ধর্মোন্মাদনায় এদেশকে ইসলামীদেশে পরিণত করতে, অপরাজেয় রণদক্ষতায় এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন মুসলিম সেনাপতিবৃন্দ। হিন্দু বিজিত, ইসলাম বিজয়ী। বিজিত বিজয়ীর অত্যাচারে জর্জরিত। "বিনম্র হিন্দু" অকল্যাণের বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে কত দীর্ঘকাল কর্মযোগের সাধনা করেছে, কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মানল না, কোন বিচ্ছেদকেই বড় করে দেখল না, কোন বঞ্চনাতেই হতাশ হল না। তারপর প্রকৃতির অনিবার্য বিধানে হিন্দু মুসলিম—এই দুটি সমাজ আলাদা থেকেও পরস্পরকে মেনে নিল, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখল। ভারতীয় জীবন-ধারায় সাময়িক বিচ্ছিন্নতাকে জুড়ে দিতে সমন্বয়, প্রেম ও একেশ্বরবাদ মূর্ত হল কত সাধু ও সন্তের জীবনচর্চায়। রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য নামদেব, সুরদাস, মৈনুদ্দিন চিস্তি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ সাধু-সন্তগণ মধ্যযুগের ইতিহাসে নূতন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচনা করলেন। ভারতের জাতীয় জীবন সাধুর ও ঋষির আশ্রমে আবার নিজেকে আবিষ্কার

করল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আবার ফিরে এল। স্বামীজী ভারত-ইতিহাসে 'নেশন' (nation) সংজ্ঞার এই বিকাশকেই অংগুলিনির্দেশ করেছেন। এই 'নেশনের' প্রতিষ্ঠা ও গৌরব রাষ্ট্রনীতিতে ভাষা পেল মুঘল সম্রাট মহামতি আকবরের অসামান্য দূরদর্শিতায়। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম হল একবৃন্তে দুটি ফুল।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস পালাক্রমে ভাঙাগড়ার ইতিহাস। কিভাবে গড়েছে তার কথা শুধু নয়, কেন ভাঙল তাও জানতে হবে। নইলে ইতিহাস-পাঠ অসম্পূর্ণ থাকবে। ভাঙাগড়ার গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আমরা সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকেও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে সযত্নে অধ্যয়ন করি, বাইরে প্রকটিত ঘটনাবলীর উপর যথারীতি গুরুত্ব দান করি। কিন্তু স্বামীজী প্রবেশ করেছেন ঘটনাবলীর গভীরে এবং তত্ত্বগতভাবে উপরোক্ত তিনটি ফর্মুলার পটভূমিতে তাদের বিচার করেছেন।

ভারতীয় ধর্ম ও ইতিহাস—এ দু-এর অংগাঙ্গি সম্পর্কের উপর স্বামীজী অত্যধিক জোর দিয়েছেন। ধর্মকে বলেছেন ইতিহাসের নিয়তিস্বরূপ; ইতিহাসের নিয়ন্তা অন্তর্নিহিত পরিকল্পনা ও প্রেরণাস্বরূপ। এই ধর্ম কিন্তু বিশেষ উপায়ে বিশেষ এক দেবতার পূজায় পর্যবসিত নয়। এই ধর্ম বেদান্তভিত্তিক মানুষের ধর্ম। আর্যঋষিদের প্রজ্ঞা, সাধনা ও দার্শনিক বিন্যাসে এই মানুষের ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। কোন বিশেষ অবতার বা পয়গম্বরের শিক্ষায় বা প্রচারে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই একে বলা হয় সনাতন ধর্ম। অবশ্য যুগে যুগে অবতারকল্প মহামানববৃন্দ ধর্মকে রক্ষা করতে কিংবা সংস্কারসাধন করতে আবির্ভূত হয়েছেন এই পুণ্যভূমিতে। স্বামীজী এই ধর্মকেই বলেছেন ঃ

"... one great Force is manifesting itself ... as the desire for Mukti or spiritual independence with the Hindu." [৪]

ধর্ম হচ্ছে সেই মহান শক্তি যা হিন্দুর জীবনে মুক্তি বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে বিকশিত হয়। এই ধর্মের ভিত্তি ঔদার্য ও অসাম্প্রদায়িকতা। ১৮৯৩ সালে বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেনঃ "যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" [৫] কলম্বো বক্তৃতায় স্বামীজী অনেক কথা বলেছেন ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ঃ

"ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে... অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'... এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল।... নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক।... সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র।... এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।"[৬]

প্রচলিত কথায় যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, বহু দেবদেবীর পূজাবিশিষ্ট যে ধর্ম আমরা পালন করি, আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে তা স্খলিত হলেই পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়। তখন আচারবিচার ও সংস্কার প্রবল হয়ে পড়ে, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা সমাজকে গ্রাস করে। ধর্মের নামে তখন আমরা অধর্ম পালন করে কূপমণ্ডূক হয়ে পড়ি। তখনই আসে আমাদের অবনতি ও পতন। ধর্ম ধর্ম করে নয়, ধর্মের নামে অধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েই ভারত তার দুর্গতিকে যুগে যুগে টেনে এনেছে। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এই তত্ত্বটি বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

ইতিহাসসম্মতভাবে 'হিন্দু' শব্দটির তাৎপর্যও সম্যক উপলব্ধি করা দরকার। হিন্দু জাতিবাচক শব্দ, ধর্মবাচক নয়। স্বামীজীর কথায়ঃ "বেদে সিন্ধু-নদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা (পারস্যবাসিগণ) তাকে 'হিন্দু', গ্রীকরা 'ইণ্ডুস' ক'রে তুললে; তাই থেকে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়ালো—কালা (খারাপ), যেমন এখন 'নেটিভ'।"[৭] জাফনা বক্তৃতায় তিনি কথাটি আরও খুলে বলেছেনঃ "যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন কিন্তু তাহার আর সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ—'যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত।' প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু'রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ...বর্তমানকালে সিন্ধু-নদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মতো এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে।"[৮]

উক্ত পরম সত্যটিকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে স্বামীজী এই হিন্দুর ধর্মকেই বলেছেন ভারত-ইতিহাসের বিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার; তার পতন-অভ্যুদয়ের নিয়ন্তা। স্বামীজীর "বাণী ও রচনা" থেকে আরও বহু উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয় বা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যায়। ঔদার্য ও বলিষ্ঠতা এই দুটি স্তম্ভের উপর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বাঁধনে যে মহাসেতু নির্মিত, সে সেতুপথ বেয়েই চলে ভারতের ধর্মজীবন ও জাতীয় সমৃদ্ধির অঙ্গাঙ্গি জয়যাত্রা। কলম্বো বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেনঃ "অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে... এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য।"[৯] কুম্ভকোণম্ বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট করে বললেনঃ "জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত, অথবা রাজনীতি—এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না ; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক—ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। ...ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে...তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।"[১০]

সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসদর্শনের অখণ্ডতা ও মৌল অভিন্নতাকে স্বীকার করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে ঐতিহ্যগত বিভিন্নতায় এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক দেশের ইতিহাসের ধারা অপর দেশ থেকে আলাদা খাতে প্রবাহিত হয়ে একই বিশ্ব-ইতিহাস-সাগরে মিশেছে। প্রত্যেক জাতি বা দেশের একটা 'নিজস্বতা' (genius) আছে, সেই নিজস্বতা তার ইতিহাসকে প্রতি স্তরে অনুরঞ্জিত, নিয়ন্ত্রিত করে। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনা এই 'নিজস্বতার' পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব বিশ্লেষণের ভাষা পেয়েছে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে তিনি বলেছেনঃ "প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। ...তিনটি

বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জানো—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর ক'রে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারু উপর চেপে ব'সে হুকুম চালাতে পাবে না। এইটিই ফরাসী-চরিত্রের মূলমন্ত্র।...ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট ক'রে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দুকথা ব'লব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর ক'রে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।"[১১]

ফ্রান্সের ও ইংলন্ডের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা অল্প কথায় চলতি ভাষায় লেখা উপরোক্ত মন্তব্যকে ইতিহাসসম্মত বলতে দ্বিধা করবেন না। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, এবং ঐ জাতির পরবর্তী ইতিহাসের ভাঙাগড়ার পশ্চাৎপটে ছিল ঐ মন্ত্র। ঐ তিনটির মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ 'স্বাধীনতা' ফরাসী ইতিহাসের মূল নিয়ন্ত্রক।

ইংলন্ডের ক্ষেত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে স্বামীজীর ভাষ্য কত সমীচীন। স্বামীজী সে ঘটনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধ বা রাজায়-প্রজায় যুদ্ধের নানা কার্যকারণ আমরা জানি। কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল জনগণের প্রতিনিধি সভার (পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের) এই দাবি যে তার সম্মতি ছাড়া রাজা প্রথম চার্লস প্রজাদের উপর কোন কর ধার্য করতে পারবেন না। এগারো বৎসর কাল (১৬২৯-'৪০) রাজা পার্লামেন্ট না ডেকেই তাঁর বিশেষ রাজকীয় অধিকার (প্রেরোগেটিভস) বলে স্বৈর শাসন চালালেন, বেপরোয়া কর ধার্য করলেন ঐ অধিকারেই। "জাহাজ কর" দিতে অস্বীকার করলেন হ্যামডেন, বিচারে অধিকাংশ বিচারকের মতানুসারে তাঁর শাস্তি হল। প্রজার অসন্তোষ তীব্রতর হল। এত করেও কিন্তু রাজকোষে রাজস্ব আদায় দ্রুত বর্ধমান খরচের পরিধির বহু পশ্চাতে রয়ে গেল। তারপর স্কটল্যান্ডের সঙ্গে রাজার যুদ্ধের ফলে বিপর্যয় ঘটল এবং স্কচ সৈন্যবাহিনীর টাকার চাহিদা চুক্তি অনুসারে মেটাতে গিয়ে বর্ধিত

রাজস্বের প্রয়োজনে প্রথম চার্লস পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন। চার্লস স্কটল্যান্ডেরও রাজা ছিলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ (লঙ্) পার্লামেন্ট বসল। তারই দু-বছর পরে (১৬৪২) অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে প্রজার অন্যান্য অধিকার দাবিযুক্ত হয়ে ডেকে আনল গৃহযুদ্ধ। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করালেন তৎকালীন ইংলন্ডের বিজয়ী সামরিক শাসক অলিভার ক্রমওয়েল।

ইংলন্ডের আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল এই সিদ্ধান্ত গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করেছেন। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এই সিদ্ধান্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তারও অনেক আগে।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে স্বামীজী ভারতের 'নিজস্বতা'র বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেনঃ "হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। ...ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ ক'রে আছি। লাথি মারো, 'কালো' বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ।"[১২]

ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্রের এই ভাষ্য বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক বা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার বিপরীত। সেই ব্যাখ্যায় তাই স্বামীজী revivalist বা traditionalist. মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলব যে, তাঁর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একদেশদর্শিতার বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এও একরকম গোঁড়ামি যা সামগ্রিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একই বাঁধা ছকে ফেলে আর যাই হোক, বিপুল বিচিত্র এই পৃথিবীর বিভিন্ন মনুষ্যসমাজের কার্যকারণ বিচার করা যায় না। তাছাড়া স্বামীজী তো কোন ধর্মমতকে ইতিহাসের নিয়ন্তা বলেননি, তিনি মানুষের যে ধর্ম, যার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল বেদান্ত-উপনিষদে, তাকেই বলেছেন ভারত-ইতিহাসের নিয়ন্তা। স্বামীজীর "বাণী ও রচনা" পাঠ করলে, সর্বোপরি তাঁর কর্মধারা ও জীবনচর্যার পরিচয় পেলে সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ সবারই মনে হবে যে পশ্চাতে তাকিয়ে থেকে নয়, সম্মুখে প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপে ভারতের প্রগতিসাধনের রাজপথই ছিল তাঁর পথনির্দেশ। অতীতের ইতিহাস অনুধ্যানেই আমরা দাঁড়াবার শক্ত মাটি খুঁজে পাব। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনায় স্বামীজী বাণী দিলেনঃ "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। ...চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিত স্থগিত করিয়া অনন্ত

সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে...সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?... অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে... ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে... যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।"[১৩]

ধর্মাধর্ম কেমন করে ভারত-ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করেছে ধারাবাহিক তার বর্ণনার খানিকটা দু-এক কথায় আলোচনা করা হচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে বহু গলদ প্রবেশ করেছিল। অসাম্য অস্পৃশ্যতা ও সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তার প্রাধান্য বজায় রাখতে আধ্যাত্মিকতার বদলে ক্রিয়াকাণ্ড-বাবিধি ও সাড়ম্বর যাগযজ্ঞকেই বড় করে তুললেন, বৈদিক সূক্তের করলেন অপব্যাখ্যা। অথচ এই যুগই দর্শনের যুগ, ঋষিপ্রতিম মনীষীরা বুঝি দূরে অরণ্যের গভীরে গিয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন। উপনিষদের তাই আর এক নাম আরণ্যক। এলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম বা সিদ্ধার্থ। বেদকে অস্বীকার করে নয়, তার কর্মকাণ্ডের জটিল প্রাণহীন আচার ব্যবহারকে অস্বীকার করে আরণ্যক উপনিষদের অমৃতকথা জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতেই এই রাজকুমার জীর্ণকন্থা পরে পরিব্রাজক বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধীরে ধীরে মোড় ঘুরল। ইতিহাস হল প্রধানত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস, স্থায়ী হল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এর শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটল সর্ব যুগের সর্ব দেশের শ্রেষ্ঠ মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২৭১—২৩২)। দ্বাদশ শিলালিপিতে অশোক ধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য সংজ্ঞা দান করলেনঃ "স্বধর্মে তীব্র অনুরাগ বশে যদি কেউ পরধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গুণগান কল্পে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে।"[১৪] এই অশোকই

ভারতের একটি আঞ্চলিক ধর্মমত বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ধর্ম বিজয়ের মাধ্যমে। আবার এই অশোকই তৎকালীন ভারতের সকল ধর্ম-মতকে, এমন কি অধুনালুপ্ত গুহাবাসীর ধর্মাবলম্বী মুষ্টিমেয় আজীবিকদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

কালক্রমে বৌদ্ধসমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্নীতি ও অহিংসার নামে কাপুরুষতা প্রবেশ করল, রাজধর্মের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল হিন্দু ধর্ম, নূতন করে পৌরাণিক সংস্কৃতির আলোতে উদ্ভাসিত হল। এ ধারারই পূর্ণ বিকাশ ঘটল গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে। বেদভিত্তিক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে সবলে ধ্বংস করে নয়, তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে আপন করে নিয়ে, তাকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে মুছে গেল। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে দেখতে পাব যে ভারতীয় হিন্দু সত্তায় বৌদ্ধধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এসেছিলেন জিজ্ঞাসু বৌদ্ধ পরিব্রাজক প্রখ্যাত চৈনিক মনীষী হুয়েন সাঙ্ এই ভারততীর্থে। তখন কনৌজকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে ছিলেন স্বনামখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্ধন, যিনি একাধারে আদিত্য-উপাসক এবং শৈবধর্মাবলম্বী। আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ না হলেও হর্ষ ছিলেন ভগবান তথাগতের ধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন বিশ্বের সর্ব-শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রধানত তা বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা দশ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী ও শত শত অধ্যাপক নিয়ে গুণগত বিচারে শীর্ষস্থানে উঠেছিল। হুয়েন সাঙ্ কয়েক বৎসর এখানে শিক্ষা লাভ করেন। হুয়েন সাঙ্ তাঁর বৃহদায়তন ভ্রমণবৃত্তান্তে বৌদ্ধ ভারতের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একীভূত বা সমঞ্জসীভূত হয়ে যাচ্ছে। শুধু পূর্ব ভারতে বাংলার পালরাজগণের আমলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে রইল। এযুগেই তন্ত্রকে ভিত্তি করে বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবন দানা বাঁধল। এই তন্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যে বৈশিষ্ট্য তার মূল ভিত্তি এখানেই।

ধর্মাশ্রয়ী ভারত-ইতিহাসের এই তো ধারা। যখন এই ধর্মকে ভারতবাসী কুসংস্কার কদাচার ও সঙ্কীর্ণতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করল, তখনই এল

ভারতের পতন। অবিশ্বাস্য আত্মপ্রসাদ হিন্দুকে কূপমণ্ডূকে পরিণত করল, অন্ধ রক্ষণশীলতা তার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সিংহদ্বার রুদ্ধ করে দিল, রাজনীতি ও সমরনীতিতে পড়ল সামাজিক দুর্নীতির গভীর ছাপ, রাষ্ট্রে এল চরম অনৈক্য, বৈষম্য ও আদর্শচ্যুতি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অপরাজেয় তুর্কী সমরনায়ক সুলতান মামুদের বার বার ভারত অভিযান কালে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আরব মনীষী আলবেরুনী। তিনি এসেছিলেন অতীতকালের মেগাস্থেনিস, ফা হিয়েন, হুয়েন সাঙের মতো জিজ্ঞাসু মন নিয়ে, এসেছিলেন আদি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির জনয়িত্রী ভারতকে দেখতে, জানতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। বিখ্যত গ্রন্থ "তরখ-ই-হিন্দ" পাঠে জানা যায় যে আলবেরুনী বেদ-উপনিষদের ভারতকে—তাঁর স্বপ্নের ভারতকে ঐ সময় আর বাস্তবে খুঁজে না পেয়ে বেদনাবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেনঃ "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশ নেই, তাদের মতো কোন জাতি নেই, নেই তাদের রাজার মতো আর কোন রাজা। ধর্ম ও বিজ্ঞানে তাদের অধিকার তো একচেটিয়া। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নয়, তাকে কৃপণের ধনের মতো সযত্নে অপরের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেই হিন্দুর আপ্রাণ প্রয়াস ও আনন্দ। বিদেশীরা তো ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ। নিজের সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলেছে হিন্দু। হিন্দুর ঔদ্ধত্য এবং অন্ধতা আজ এত চরমে উঠেছে যে তার জ্ঞানভাণ্ডারকে যে বিদেশের কোন রত্ন একদা সমৃদ্ধ করেছিল কিংবা কদাপি করতে পারে একথা সে ভাবতেই পারে না। অথচ তার পূর্বপুরুষ কখনও এমন ছিল না। সর্বদাই আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা ভারতের সভ্যতাকে মার্জিত, উন্নত ও জীবন্ত রেখেছেন, ভারতের বাইরে যে পৃথিবী তাকে সমৃদ্ধ করেছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন।" [১৫]

স্বামীজীর সংজ্ঞানুসারে উপরোক্ত অবস্থাই চরম ধর্মহীনতার নামান্তর। যে জাতিটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতির অবনতির দিন অতি নিকট। ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, মুসলিমদের ভারতবিজয় এবং হিন্দু ভারতের পতনের মূল কারণ এই ধর্ম-হীনতা বা অধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যুগে যুগে ভারত-ইতিহাস পালা করে ধর্ম ও অধর্মকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, এমনি করেই ঘটেছে তার উত্থান ও পতন।

তুর্কী ও মোঙ্গলদের অমানুষিক শৌর্যবীর্যের ও কর্মদক্ষতার উত্তরা-ধিকারী হয়েও মহামতি মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন একজন অভিনব

ভারতপথিক। মৌর্য অশোকের, গুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের, পুষ্যভূতি হর্ষের এবং মধ্যযুগের সাধুসন্তদের ঔদার্য ও সমন্বয়ভিত্তিক ধর্মকে রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি, মুঘলশাসনকে স্থায়ী করেছিলেন শতাধিক বর্ষকাল। সেই সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হল যখন ঔরঙ্গজেব তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করে আকবরের নীতিকে পাল্টে ফেললেন এবং ভারতকে একমাত্র ইসলামের দেশে পরিণত করতে গেলেন। স্বামীজীর সংজ্ঞানুসারে স্বধর্মনিষ্ঠ কিন্তু পরধর্ম অসহিষ্ণু ঔরঙ্গজেব ইতিহাস-নিয়ন্তার ধর্মপথ থেকে স্খলিত হলেন। মুঘলের পতন ঘটল তাঁর মৃত্যুর (১৭০৭) সঙ্গে সঙ্গে। "মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না—মোগলরা ঐ যায়গাটায় (হিন্দুর ধর্মে) ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাসেকো—এদের সকলের মা যে হিঁদু।"[১৬]

"আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল।"[১৭]

মুঘলের উত্থান-পতনের ইতিহাস ধর্মাধর্মের ভিত্তিতে স্বামীজী দু-কথায় বলে দিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত অধর্মের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে গেল। সেই সুযোগে বিদেশী ইংরেজ বণিক তার মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করল, ভারত রইল প্রায় দুশ বৎসর পরাধীন।

॥ ৪ ॥

ভারতের ইতিহাস রচনায় দ্বিতীয় ফর্মুলাটি অর্থাৎ মন্ত্র বা দর্শনের (of philosophy) ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচ্য। প্রারম্ভেই মনে রাখা দরকার যে, এতক্ষণ যে ধর্মাশ্রয়ী ইতিহাস আলোচিত হল, সেই ধর্মেরই একটি কার্যকর অনুষঙ্গ বা corollary এই মন্ত্র বা দর্শন। বস্তুত মন্ত্র বা দর্শন ধর্মেরই দ্যোতনা, এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতে জাতিগঠনের প্রেরণা। পশ্চিমের ইতিহাসবিদ্‌গণ ইতিহাসের দার্শনিক দিকটাকে ফুটিয়ে তুলতে বলেন— "Renaissance precedes Revolution" —সংস্কৃতির পুনর্জন্ম বিপ্লবের পূর্বগামী। অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক বিপ্লবই সার্থক বা তাৎপর্যময় হয় না, যদি না সেদেশে দার্শনিক এবং সাহিত্যিকগণ তাঁদের উদ্দীপনাময় এবং বিশ্লেষণাত্মক রচনাবলী দ্বারা তার পূর্বে ভাবরাজ্যে প্লাবন আনতে পারেন, অত্যাচারিত শোষিত মূক জনগণের মুখে ভাষা দিতে পারেন। ১৭৮৯ সালের ফরাসী

বিপ্লবের পটভূমি রচয়িতা রুশো, ভলটেয়ার, মন্টেস্ক্যু ও ডিডেরট এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পশ্চাতে কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদী দর্শন, এঙ্গেলসের ভাষ্য এবং মহানায়ক লেনিন কর্তৃক তার কার্যকর রূপদানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখলেই কথাটির সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে।

কিন্তু পশ্চিমের ভাববিপ্লবের মন্ত্র প্রধানত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কাঠামোতে রচিত, ধর্মের স্থান সেখানে গৌণ। ভারতের কথা আলাদা। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় ধর্মই রয়েছে রাজসিংহাসনে, আর সব ভাবধারা তার পাত্রমিত্র মাত্র। ভারত-ইতিহাসে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষিকল্প মহামানবগণ, তপস্যা ও ত্যাগের গৈরিক রঙে যাঁরা অনুরঞ্জিত।

ইতিহাস থেকে দু-একটি উদাহরণ নিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গৌতম বুদ্ধ প্রাচীন ভারতে সবচেয়ে বড় ইতিহাস স্রষ্টা। তাঁর দেওয়া মন্ত্রের কার্যকর রূপ প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রগঠন ও সংস্কৃতির বিকাশ ক্ষেত্রে চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মহাভারতের আদি রচয়িতা বেদব্যাস এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ (ব্যাস পদবী ভূষিত), রামায়ণের আদি কবি বাল্মীকি এবং পুরাণকারগণ (তাঁরাও ব্যাস) যে মন্ত্রগুলি গল্পাকারে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাই তো প্রাচীন ভারতের শুধু সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নয়, রাজনৈতিক ইতিহাসেও বিপুল ভাবসমৃদ্ধি এনেছে। এঁদেরই প্রভাবে ও আদর্শে গুপ্তযুগ হয়েছিল সর্বোচ্চ গৌরবে অধিষ্ঠিত স্বর্ণযুগ, এঁদেরই আদর্শে এসেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ পরম শক্তিমান বিচক্ষণ ধর্মনিষ্ঠ নরপতিবৃন্দ।

তুর্কীবিজয়ের প্রাক্-কালে হিন্দু ভারতে এমন কোন সন্ত বা ঋষির আবির্ভাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেনি, এমন কোন "আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান" ঘটেনি যা বিশ্ববিজয়ী, বলদৃপ্ত, যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম মুসলিমদের সার্থক-ভাবে বাধা দেবার প্রেরণা জোগাতে পারত। আলবেরুনীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত মন্তব্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুসংস্কার কদাচার বিশিষ্ট পৌত্তলিক ধর্মের খোসাটা আঁকড়ে ধরে তৎকালীন ভারতবাসী ক্ষীণস্বরে বলছিল যে, সে 'ধার্মিক' আর মুসলমান 'ম্লেচ্ছ'। "ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের-পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্র-নীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে...।"[১৮] স্বামীজী মন্ত্র বা দর্শনকেই বলেছেন "আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান"। এই অভ্যুত্থান তখন ঘটেনি, তাই শাহী বংশের আনন্দ পাল কিংবা চৌহান পৃথ্বীরাজের মতো শৌর্যবান রাজন্যবর্গ তুর্কী অভিযানকে জীবন দিয়েও রোধ করতে পারেননি।

কিন্তু তুর্কী পাঠান রাজত্বকালেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে এক অভিনব আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, নানক প্রমুখ সন্তগণ এই অভ্যুত্থানের নায়ক এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের স্রষ্টা। তাঁদের দেওয়া মন্ত্র অভিনব সুরে ষোড়শ শতাব্দীতে কথা কয়ে উঠল শেরশাহ্ ও আকবরের পরম বিচক্ষণ ও উদার বলিষ্ঠ কর্মধারার মধ্যে। --একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু তা ছিল পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর "রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য-বোধ" মধ্যযুগে কেন সন্তদের মন্ত্রের প্রেরণায় জাগ্রত হল না, তার কারণ স্বামীজী বর্ণনা করেছেন উক্ত "ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন" প্রবন্ধে : "রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে ; কাজেই নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ...কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।"[১৯] মধ্যযুগে উত্তর ভারতে হিন্দু কেন রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের সাধক হতে পারেনি, তার কারণ স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনার গভীরে এমনি করেই রেখাপাত করেছে।

উত্তর ভারতে যা সম্ভব হল না দক্ষিণ ভারত তাকেই সার্থক করল। এর কারণ শঙ্কর, রামানুজ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে আরও অনেক মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির অভ্যুদয়। "...দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরেই এ-দেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।"[২০] সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব তারিখ ইতিহাস হারিয়ে ফেলেছে, রামানুজ একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য। এই প্রসঙ্গে শৈব নায়ানার এবং বৈষ্ণব আলওয়ারদের কথা স্মরণীয়। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সাধকবৃন্দ। তাঁদের গাথা-নিচয় তামিল সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। ভারতের গৌরবগাথা এবং ভগবৎ আরাধনার স্তোত্র এঁদের উপজীব্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চারণবৃন্দ এই সংগীত দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারত মুখরিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন জনগণকে, শক্তিদান করেছেন রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের। তখন দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের আধিপত্য। শৈব শঙ্কর ও বৈষ্ণব রামানুজ

যথাক্রমে এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁদের অভ্যুদয় আকস্মিক ঘটনা নয়। আকস্মিক নয় চোল ও পরে পান্ড্যদের অপূর্ব সাম্রাজ্যস্থাপনের কাহিনী। শিল্পে ও স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও সুরে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, পরাক্রমে ও সমৃদ্ধিতে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সাগরজোড়া চোল সাম্রাজ্য অনন্য ইতিহাস রচনা করল। পান্ড্যগণ তারই জের টেনেছিলেন পরবর্তীকালে। তখন উত্তর ভারতের হিন্দু বন্ধ জলাশয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তুর্কী অভিযানে বিপর্যস্ত হচ্ছে। "দক্ষিণ ভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করতে পারে নাই। ...দক্ষিণভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।"[২১]

স্বামীজীর উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত স্থায়ী বিজয়-নগর সাম্রাজ্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারব। কৃষ্ণানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত মুসলমান বাহমনি সাম্রাজ্যের সহিত পুরুষানুক্রমে বিজয়নগরের সংখ্যাতীত সঙ্ঘর্ষ চলেছে। বাহমনি চায় ইসলামের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। উত্তর ভারতে তুর্কী পাঠান যা করেছে তাই করবে বাহমনি দক্ষিণ ভারতে। বাহমনির সুলতানদের অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও বীরত্বে ও রণকৌশলে তাঁরা কারও নীচে ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়নগরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেও তাঁরা পারেননি বিজয়নগরকে নতি স্বীকার করাতে। সর্বজয়ী ইসলামের গ্রাস থেকে দক্ষিণ ভারতকে মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বুঝি বিজয়নগরের জন্ম হয়েছিল। কত ত্যাগস্বীকার, কত অবমাননা, কত নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড চলেছে। ঘরবাড়ী শ্মশান হয়েছে, রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে। আবার উঠেছে বিজয়নগর, আবার বাহমনির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত বাহমনি রাজ্য ভেঙে গিয়ে পাঁচটি বিবদমান স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের উত্থান ঘটাল। আর বিজয়নগরে এলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯—'৩০)। বিজয়নগর গৌরবের শীর্ষস্থানে পেঁৗছাল।

কেমন করে কোন্ মন্ত্রগুপ্তিতে বিজয়নগর এত শক্তির ও তিতিক্ষার অধিকারী হল—সেই দেশের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সিউয়েল সাহেব তার ততটা ব্যাখ্যা করেননি তাঁর বিখ্যাত "A Forgotten Empire" গ্রন্থে। স্বামীজী তার সূত্রদান করেছেন। বিজয়নগরকে তিনি বিদ্যানগর বলে উল্লেখ করেছেন। বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা মাধব বিদ্যারণ্যের নামেই বুঝি বিদ্যানগর নাম। যেখানে নিকলো কন্টি, আব্দুল রেজ্জাক, নুনিজ ও পায়েস

প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণ বিভিন্ন সময়ে পরিভ্রমণ করেছেন, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদের কেউ কেউ লিখেছেন যে সমগ্র বিশ্বে বিজয়নগর আর দ্বিতীয়টি নেই, যা কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি, চক্ষু কখনও দর্শন করেনি—ওটি ঠিক সেরকম একটি কল্পনার রাজ্য ঃ সেই বিদ্যানগর বা বিজয়নগর নামের মধ্যেই তার তাৎপর্য স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় প্রতিবিম্বিত করেছে।

"এই দাক্ষিণদেশেই—যখন উত্তর ভারতবাসী 'আল্লা হু আক্‌বর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর-দেবতা স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, (তখন) রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহু-বলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য...।"[২২]

উক্ত উদ্ধৃতিতে সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধব বিদ্যারণ্যের নাম নেই, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা বুক্কের মন্ত্রদাতা ও পথপ্রদর্শক তিনিই ছিলেন। দীক্ষিত বুক্ক ও ভ্রাতা হরিহর ঐ দুই ঋষির শিষ্য হয়ে সনাতন ধর্মে ফিরে এসে ধর্মরাজ্য স্থাপনের মন্ত্রে উদ্বোধিত হলেন। মাধব বিদ্যারণ্য এবং ভ্রাতা সায়নাচার্য যিনি মধ্যযুগে লুপ্তপ্রায় মহাগ্রন্থ বেদকে উদ্ধার করেছিলেন, উত্তরকালকে দিয়ে গিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ ভাষ্য—এই মহামনীষী সন্ন্যাসীদ্বয় ছিলেন বিজয়-নগর প্রতিষ্ঠার দার্শনিক। মাধব বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের নেতৃত্বে যে "আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান" ঘটেছিল, তাতেই নিহিত রয়েছে বিজয়নগরের শক্তি ও তিতিক্ষার উৎস। এই আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান সহনশীলতা ও সমন্বয়কে দোসর করে যতদিন কার্যকর ছিল ততদিনই ছিল বিজয়নগরের সামগ্রিক সমৃদ্ধি। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিবের রাজত্বকালে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধান অমাত্য বলদর্পী উচ্চাভিলাষী রামরাজার হাতে। তখন বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের মন্ত্র রাজকার্যকে আর নিয়ন্ত্রিত করত না, কূটনীতি আর যুদ্ধনৈপুণ্য এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রধান হয়ে পড়ল। একদা মুসলিম রাজ্য আহমদনগরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে বিজয়নগরের হিন্দুবাহিনী তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল, মসজিদ ধ্বংস করল, কোরাণ অপবিত্র করল। ইসলামের এই অবমাননায় দক্ষিণ ভারতের তিনটি সদ্যাবিবদমান মুসলিম রাজ্য (আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর—পূর্বে এই তিনটিকেই জড়িয়েছিল বাহমনি সাম্রাজ্য) একত্রিত হয়ে পাল্টা প্রতিশোধ নিলে, তেলিকোটার প্রান্তরে (১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) বিজয়নগরের সমাধি রচনা করল, বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

ঋষির মন্ত্রের প্রভাব এবং তার অভাবে নিছক রাজনীতি ও কূটনীতি

এভাবেই ভারত-ইতিহাসে রাজ্য গড়েছে ও ভেঙেছে। এ তত্ত্ব মারাঠাজাতির ইতিহাসে আরও বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। স্বামীজী "ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনে" উক্ত জাতির প্রতিষ্ঠার মূল কথা যথারীতি দু-চারটি পঙ্‌ক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ "সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণবিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধৃবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।"[২৩]

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই মুঘল পতনের প্রধান কারণ স্বামীজী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে একমত হবেন। গোঁড়া একদেশদর্শী ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির শেষ পর্যন্ত চরম ব্যর্থতা, শিবাজী প্রতিষ্ঠিত উদ্দীপিত মারাঠা জাতির বৎসরের পর বৎসর ধরে নেতৃবিহীন জনযুদ্ধ, ভগ্নমনোরথ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে আহমদনগরে প্রাণত্যাগ (১৭০৭), এবং তারপর দ্রুতগতিতে ভারতজোড়া মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও সমগ্র দেশের শোচনীয় দুর্গতি—এসব তৎকালের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুঘল ইতিহাসের সর্বাগ্রগণ্য ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়—তাঁর (ঔরঙ্গজেবের) অসামান্য কৃতিত্বের (পিতা শাজাহানের রাজত্বকালে প্রধানত সুবেদার রূপে) লীলাভূমি দাক্ষিণাত্য, তাঁর সমাধিভূমিও ঐ দাক্ষিণাত্য। মারাঠাকে ঔরঙ্গজেব ঘৃণাভরে বলতেন "পার্বত্য মূষিক"। এই "পার্বত্য মূষিকের" দলই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।[২৪]

শিবাজী এক অনন্য দুর্ধর্ষ মারাঠাজাতি গড়েছিলেন, কৃষক মাওলি সম্প্রদায়কে যুদ্ধবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শী করে তুলেছিলেন, অপূর্ব ঔদার্যের ভিত্তিতে এক আশ্চর্য শাসনপদ্ধতি রচনা করেছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন আদর্শ 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠাকল্পে, ক্ষুদ্র এক জায়গীরদারের পুত্র হয়েও তিনি "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" ঔরঙ্গজেবকে পর্যুদস্ত করে তাঁর কাছ থেকে স্বাধীন মারাঠা 'ছত্রপতির' স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। মাত্র ছ-বৎসরকাল ধরে (১৬৭৪—১৬৮০) এক নবোত্থিত জাতির নায়ক হয়ে তিনি যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যে ভাবধারা তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সমগ্র মারাঠা জাতির অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন, তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠা জাতি এমন করে ঔরঙ্গজেবের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ঠেকাতে

পেরেছিল, চরম দুর্গতি ও অনিশ্চয়তাকে করেছিল অঙ্গের ভূষণ, প্রতি গৃহকে পরিণত করেছিল দুর্গে। একমাত্র সংকল্প ছিল মৃত্যু কিংবা স্বাধীনতা। এরকম জনযুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে।

কি সে মন্ত্র যা শিবাজীর মৃত্যুর পরেও শতাধিক বর্ষকাল এত বড় ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল? বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বৃহদংশের মালিক ছিল পেশোয়াশাহীর অধিনায়কত্বে শক্তিমান মারাঠারা। প্রায় ভারতজোড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি পর্যন্ত এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন যে, ভারতবর্ষের বিভাজন হবে শেষ পর্যন্ত দুটি শক্তির মধ্যে—ইংরেজ ও মারাঠা। অবশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ওয়েলেসলির ভুল ভেঙেছিল। মারাঠা শক্তি তখন চরম অনৈক্যে প্রপীড়িত, আদর্শচ্যুত ও তথাকথিত কূটনৈতিক গ্লানিময় রাজনীতির কলুষে আপ্লুত। গোঁড়ামি, অবিশ্বাস ও পরস্পর হানাহানিতে মারাঠা তখন শিবাজী-দত্ত মন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছে। তার চৈতন্যশক্তি তখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ১৮১৮ সালের মধ্যে আদর্শচ্যুত আত্মবিলুপ্ত মারাঠাজাতি আকারে বৃহৎ তার ভূখণ্ডকে ইংরেজের কাছে যেন বিলিয়ে দিল। তিনটি ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (যথাক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের আমলে) মারাঠা চরিত্রের শোচনীয় পরিণতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এই মন্ত্রই তুকারাম, রামদাসের সাধনালব্ধ সম্পদ। রামদাস তা শিবাজীকে দান করেন। রামদাস ছিলেন শিবাজীর প্রত্যক্ষ গুরু ও দার্শনিক, তিনিই শিবাজীর হাতে তুলে দেন জাতীয় পতাকা—গৈরিক পতাকা। গুরুর অনন্য শিষ্য শিবাজী ঐ গৈরিক পতাকার তাৎপর্য শুধু নিজের অসামান্য কার্যা-বলীতেই প্রকাশ করেননি, জাতীয় ঐতিহ্যরূপে তাকে দিয়েছিলেন উত্তরকালের মারাঠাদের। শিবাজীর বিশুদ্ধতা ও মন্ত্রানুরাগের প্রশংসাপত্র অপ্রত্যাশিত স্থান হতেও এসেছে। হিন্দু-বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের সুহৃদ দরবারী ঐতিহাসিক কাফি খাঁ শিবাজীকে নরকের কীট বলে বর্ণনা করেছেন ব্যর্থ আক্রোশে, তবুও অবাক বিস্ময়ে একথা না লিখে পারেননি যে, এই ঘৃণ্য কাফের ইস্লামকে কত শ্রদ্ধা করে, মসজিদ নির্মাণে মন্দির নির্মাণের মতোই অর্থ সাহায্য করে, মুসলমান ফকিরকে গুরুর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে, কোরাণকে মুসলিমদের মতোই পবিত্র মনে করে। মারাঠাজাতির পতন ও অবলুপ্তির প্রধান কারণ পেশোয়াদের আমলে আর কোন "আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান" ঘটল না। দারুণভাবে পরাজিত হয়েছিল মারাঠারা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ প্রান্তরের তৃতীয় যুদ্ধে। তার প্রধান কারণ পেশোয়া বালাজী বাজিরাও-এর ধর্মহীন কূটনীতি এবং মারাঠা জাতির জীয়নকাঠি শিবাজীদত্ত মন্ত্রের অপব্যবহার বা অপব্যাখ্যা। মারাঠা আবার জেগেছিল পেশোয়া মাধব রাও, নানা ফড়নবিশ,

মহাদাজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রয়াসে। কিন্তু তা ছিল সাময়িক।

চরম দুর্গত অষ্টাদশ শতাব্দীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে সূর্যোদয় হয়েছিল তার কিরণ ইউরোপীয় (ইংরেজ) বণিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য থেকে ধার করা। তখন কেমন করে 'ভারত' হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে ব্যাপক হানাহানিতে বৃহদাকার ভারত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে গেল, স্থানাভাবে সে কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তা জানেন। স্বামীজীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ "শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী, ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিক্‌দল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল যুদ্ধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূম-ধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজশক্তি।"[২৫] এ যে কত ইতিহাস-সম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রে উদ্দীপিত শিখজাতি শুধু মাতৃভূমি পাঞ্জাবে তার বলিষ্ঠ পতাকা উড্ডীন রেখেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

শিখজাতির উত্থান-পতনের কথা যাঁরা জানেন তাঁরাই উপলব্ধি করবেন স্বামীজীর নিম্নোক্ত মন্তব্যের সারবত্তা। এই সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) "...একজন শক্তিমান্ দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভা-সম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দ সিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।"[২৬] এবং সে কার্যাবলী বা মন্ত্রের অভাবেই শিখজাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বস্ব হারাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হল বাংলার তথা ভারতের পুনর্জাগরণ বা রেনেশাঁস। অপর দিকে ইংরেজ জাতির পরম গর্বের ধন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা, এবং ঐ পুনর্জাগরণের প্রাণকেন্দ্রও কলকাতা। ভারতের আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের সূত্র ধরে আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। কলকাতা এদিক দিয়ে অনন্য। কারণ এ শুধু ইংরেজের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কেন্দ্রভূমি নয়, এ সেই প্রজ্ঞাবান ঋষিপ্রতিম দেশপ্রেমিক মনীষীদেরও বিদ্যানিকেতন—প্রাচীন তক্ষশিলা বা কাশীর মতো—

যেখানে আধুনিক জাতীয় জীবন বিকশিত হয়ে সমগ্র ভারতের বুকে ছড়িয়ে গেছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ থেকে স্বয়ং বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ—এঁরাই তো আধুনিক ভারতীয় জাতির মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, এঁদেরই কর্মভূমি এবং রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের বেলায় জন্মভূমিও এই কলকাতা। স্বামীজীর দেওয়া জাতিগঠনের সূত্রগুলি অবলম্বন করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরতে পারা কঠিন কাজ নয়। বর্তমান লেখক স্থানাভাবের দরুন সে কাজে বিরত হলেন।

॥ ৫ ॥

এবাব সমন্বয়ের (synthesis -এর) কথা। বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সভ্যতা একক বিশিষ্টতাপূর্ণ কোন সভ্যতা নয়। এখানে মিলেছে "বহু সাধকেব বহু সাধনার ধারা", বহু বিদেশী ভাবধারার মিলন ঘটেছে ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতায়। বস্তুত ভারতের প্রগতি ও সমৃদ্ধিব উৎসমুখই এই সমন্বয়। যে ধর্মকে স্বামীজী ইতিহাসের নিয়তি বলেছেন, সেই ধর্মবোধই এই সমন্বয়কে যুগে যুগে সম্ভব করেছে। স্বামীজীর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে এই সমন্বয় রূপ ধরেছে ঃ

> "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
> শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"[২৭]

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ সমন্বয়ীকৃত রূপ ইতিহাসের ধারায় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আমাদেব পাঠ্য পুস্তকে দীর্ঘস্থায়ী আর্য-অনার্য সংঘর্ষ, বহিরাগত জাতিসমূহের সঙ্গে ভারতীয় রাজবংশের অবিরাম সংগ্রাম এবং ফলাফল—এসবই প্রধান হয়ে আছে। কিন্তু সংঘর্ষের পরিসমাপ্তিতে সুদূরপ্রসারী সংহত সুসমঞ্জস ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ততটা প্রাধান্য পায়নি। স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় এটাই প্রধান হয়ে আছে।

আর্য-অনার্য সংঘর্ষের কথাই ধরা যাক। আমাদেব ধারণা আর্য বিজয়ী, এবং ভারতের প্রাক্ আর্য বা অনার্য বিজিত ও আর্যের দাসে পরিণত। আমরা মনে করি যে আমরা শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায় আর্যদের উত্তরাধিকারী। আর তথাকথিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনার্য রক্ত ও সংস্কৃতি প্রবহমান। আপাতদৃষ্টিতে এ ধারণা হয়তো অনৈতিহাসিক নয়।

কিন্তু বাইরের এই ইতিহাসের পশ্চাতে যে একটি নীরব বিপ্লব ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যুগ যুগ ধরে চলেছিল, তার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আমরা আর্য ঋষি ও মনীষীদের দ্বারা রচিত বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও নানা স্থানে ছড়ানো দেখতে পাব। মহাভারত ও রামায়ণের রচনার সঠিক তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও, এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অব্যাহত ধারা—তার বলিষ্ঠ বিকাশ ঐ দুটি মহাগ্রন্থকে বিধৃত করে রেখেছে। রামায়ণের রামচন্দ্র অনার্য সৈন্যের সাহায্য নিয়েই রাবণ বধ করে ধর্ম রক্ষা করেছিলেন, অনার্য ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমানের জীবনচর্যায় আর্যধর্মের মহত্তম দিক প্রস্ফুটিত। মহাভারতের প্রধান ঘটনা যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—তা তো প্রধানত ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে যুদ্ধ। মন্ত্র-দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন পান্ডবদের হাতিয়ার করে, এবং এই ধর্মরাজ্যে তথাকথিত আর্য ও অনার্যের তুল্য মর্যাদা সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বীকৃত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও আমরা দেখতে পাব যে, পান্ডব পক্ষে যোদ্ধারা ছিলেন প্রধানত মহাবীর ঘটোৎকচ প্রমুখ অনার্য বীরবৃন্দ আর কৌরব পক্ষে ছিলেন আর্যাভিমানী সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া আর্য রাজন্যবর্গ। এই সঙ্কীর্ণ, গ্রহণবিমুখ, সমন্বয়বিরোধী, শ্রেণীচেতন ভাবধারা দুর্যোধনের মধ্যে মূর্ত হয়েছে. তাই তাঁর মহীয়সী জননী গান্ধারীও আশীর্বাদকালে তাঁকে বার বার বলেছিলেন—"যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"। কৌরব পক্ষে অলায়ুধের মতো অনার্য বীর ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশজনিত। আর কর্ণ যে সূতপুত্র নন, পরম অভিজাত বংশের (সূর্য ও কুন্তী নন্দন) তা তো তিনি যুদ্ধের আগে থেকেই জানতেন। ব্যক্তিগত আক্রোশেই মহাবীর কর্ণ তাঁর সহোদর ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরাদির বিপক্ষে গিয়েছিলেন, এবং যোগ্যতার দাবিতে দুর্যোধনের প্রধান সুহৃদ হয়েছিলেন।

গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুশাণদের ভারতে রাজ্যবিজয় ও শাসন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে এদেশেরই গৌরবান্বিত অধিবাসী হওয়া, তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ঐ বহিরাগত জাতির কাছেও কম ঋণী নয়। বস্তুত সামঞ্জস্য হয় দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে। গ্রীকদের কাছে ভারত তার শিল্পকলায় অনেক কিছু পেয়েছে। কুশাণ সম্রাট কণিষ্কের মহাযান বৌদ্ধধর্মের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা তো ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

বর্বর হূনরা এদেশে আসতে শুরু করে গুপ্ত যুগে। দীর্ঘকাল লেগেছিল ভারতীয় রাজন্যবর্গের তাদের পর্যুদস্ত করতে। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত, মালবরাজ যশোধর্মন, থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্ধন (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী) এঁদের একে একে

কতই না সংঘর্ষ হয়েছিল দুর্ধর্ষ অমানুষিক নিষ্ঠুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হূনদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত হূনেরা পরাভব মেনে রয়ে গেল মধ্য ও পশ্চিম ভারতে, মিশে গেল হিন্দুর সমাজে। ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেনঃ রাজপুত জাতিবর্গ—যারা অভিমানী ক্ষত্রিয় বলে গর্ব করে মধ্যযুগে মুসলিম সুলতান বা সম্রাটদের কাছে শত পরাজয়েও মনুষ্যত্বের দার্ঢ্যে ও তিতিক্ষার গৌরবে অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, তাদের ধমনীতে হূনরক্ত বহমান। ভারতীয় গুণাবলীর উত্তরাধিকারের সঙ্গে তারা তাই যুক্ত করেছিল হূনসুলভ অসামান্য সহনশক্তি ও অস্বাভাবিক দুর্ধর্ষতা।

সমন্বয়ভিত্তিক আদানপ্রদানের ধারা রুদ্ধ হল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যার ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি আলবেরুনীর পূর্বোক্ত মন্তব্যের উদ্ধৃতিতে। তাই এসেছিল হিন্দুভারতের অবনতি ও পতন। তুর্কী, পাঠান ও মুঘলকে মধ্যযুগের অনুদার হিন্দুসমাজ সহজে আপন করে নিতে পারেনি, তার কারণ অবশ্য বিজয়ী মুসলিমদের মনোবৃত্তি ও কার্যকলাপে নিহিত রয়েছে। দুটি সমাজ (হিন্দু-মুসলিম) পাশাপাশি থেকেও পরস্পর থেকে বহুদূরে, সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততাপূর্ণ, হিন্দু তখন নিজের সংস্কৃতি ও ধর্মকে বাঁচাতে অত্যন্ত রক্ষণশীল, মুসলিম তখন ব্যাপৃত কাফের নিধনে বা অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাতে আর হিন্দুকে মুসলমান করার কার্যে। কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থা চিরদিন চলতে পারে না, মুসলিম তো এদেশকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছে, যদিও এদেশের অধিবাসী তার কাছে ঘৃণ্য জিম্মিমাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকমাত্র। নীরবে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রীতিভাজন না হলেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এলেন সাধুসন্তরা সমন্বয়ের বাণী নিয়ে, একই ঈশ্বরের সন্তানের দাবিতে ঐক্যের বাণী নিয়ে। প্রধানত এঁরা ছিলেন হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, ইসলামের ভাবধারাতেও শ্রদ্ধান্বিত। স্বামীজী বলেছেনঃ মূলত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতেই ছিল এঁদের প্রয়াস এবং তা রক্ষণশীলতার ভিত্তিতে নয়, ঔদার্যের ভিত্তিতে। কিন্তু তাঁরা নূতন মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা উত্তর ভারতে কোন সমন্বয়ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করার সুযোগ পেলেন না। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গত ভারতের আত্মবিলুপ্তি, বিচ্ছিন্নতা, সঙ্কীর্ণতা এবং ব্যভিচারের সুযোগ নিয়েই বিদেশী ইংরেজ বণিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, ইংলন্ডের স্বার্থে চলেছিল তাদের ভারত শাসন ও শোষণ। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য নিরূপণ করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ "পরদেশবিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ...ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত

হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে।"[২৮]

কত গভীরে প্রবেশ করে স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃতি তার কিছু ইঙ্গিত দান করছে। এই সম্ভাবনার ভিত্তি সমন্বয়—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। এবং তার প্রথম পুরোহিত রামমোহন। স্বামীজীর কথাতেই বলিঃ "আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই......। যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।"[২৯] নবজাগরণের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকে সাদরে বরণ করে এবং তাকে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে ভারতের আধুনিক প্রগতিশীল পথের নির্মাণকার্যে তাঁর সমগ্র কর্মজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রচণ্ড বাধা এসেছিল রক্ষণশীল দেশবাসীর কাছ থেকে, কিন্তু রামমোহন তাঁর আদর্শে অবিচল ছিলেন।

ঐতিহাসিক কারণে রামমোহনের কর্মধারা ও বাণীনির্ঝরকে কেন্দ্র করে কালক্রমে আলাদা ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ গড়ে উঠল। বৃহত্তর রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্রাহ্মসমাজও হয়ে উঠল রক্ষণশীল, পরস্পরের ব্যবধান প্রশস্ততর হতে লাগল, অনৈক্য ও সংকীর্ণতার পংককুণ্ডে সমন্বয় ও প্রগতি নানা বিপরীত দোলায় দুলতে লাগল।

এই পটভূমিতে এলেন সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। মাদ্রাজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামীজী তাঁর আচার্যদেবের আবির্ভাবকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবেঃ "এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল ... যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন... যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে ... এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে।... অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত

হইয়াছিল...। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না... কিন্তু প্রত্যেকে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ...ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ-প্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের... উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেনঃ

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"[৩১]

বস্তুত সমন্বয়প্রাণ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রামমোহনে যে জাগরণের শুরু, তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হল শ্রীরামকৃষ্ণে। স্বামীজী গুরুর জীবনরূপী সূত্রকে নিজের কর্ম-জীবনে ভাষ্যের ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময় করে রেখেছেন।

হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুরে বৈদান্তিক মহামনীষী রামমোহন তৎকালীন হিন্দুর আচারসর্বস্ব বহু দেবতার পূজা এবং ধর্মের নামে বহুবিধ অমানুষিক ও অনৈক্যসূচক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের কোলাহল থেকে একেশ্বরবাদ উদ্ধার করলেন। সেই ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কালক্রমে পৌত্তলিক জ্ঞানে বৃহৎ হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা হয়ে মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত শহরবাসীর মধ্যে আবদ্ধ রইল। অনৈক্য ও ব্যবধানের মাত্রা গেল বেড়ে। পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রখর আলোকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৃহদংশের চোখও ধাঁধিয়ে গেল। একটা হীনম্মন্যতাবোধ ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য সাধনার বলে হিন্দুর লৌকিক ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মকে, আধ্যাত্মি-কতার হারানো সুর ফিরিয়ে আনলেন হিন্দুর সাকার পূজার মধ্যে, সহজ সরল কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনায় মিলনের গান গাইলেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মমতে একই ব্রহ্মের সার্থক উপাসনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ অমূল্য বাণী দান করলেনঃ "যত মত তত পথ।" শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক বিবেকানন্দ পশ্চিমকে সাদরে গ্রহণ করে গৌরবান্বিত ভারতীয় হয়ে থাকার সূত্র সমগ্র কর্ম-জীবনে বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরলেন। ধর্মাশ্রয়ী পুনর্জাগরণ সমন্বয়ের সোপান বেয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। ভারত তার হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠে বলিষ্ঠ নব ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হল।

"মদীয় আচার্যদেব" (My Master) গ্রন্থে স্বামীজী বলেছেনঃ "অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"৩২

ভারতীয় জাগরণের পূর্ণরূপ, ভারতের জাতীয়তার সার্থক মূর্তি এই ভাবেই সমন্বয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হল। এই জাগরণের পটভূমিতে আত্ম-বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, ধর্মের বাঁধনে দৃঢ়বদ্ধ, সমন্বয়ের সূত্রে একতাবদ্ধ হল এই জাতি। আদর্শনিষ্ঠ তরুণ সমাজ এক অপূর্ব উন্মাদনায় আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহাশক্তিধর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, যা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে কলুষিত করেছে—তার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশের রাজ-নৈতিক দেশপ্রেমিকবৃন্দ ধর্মাশ্রয়ী সমন্বয়ের পথ থেকে স্খলিত হয়ে রাজ-নীতিক জোড়াতালি বা প্যাক্টের মাধ্যমে আসন-ভাগাভাগির নীতি গ্রহণ করেছিলেন বা পরিস্থিতির চাপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিমের ভুল বোঝাবুঝি তাতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। 'তাকে আর এক মাত্রা বাড়িয়ে দিল সাম্রাজ্য রক্ষায় যত্নবান ইংরেজ শাসকদের ভেদনীতি ও পক্ষ-পাতিত্বের চাতুর্য। নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতের জাতীয়তা-বাদ কলঙ্কিত হল। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বামীজীর উত্তরসাধক নেতাজী হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে অপূর্ব ত্যাগের ভিত্তিতে যে গৌরবান্বিত ভারতীয় বোধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় "আজাদ হিন্দ্" বাহিনী গড়েছিলেন, ঐক্যের সেই মহান আদর্শ আমরা বজায় রাখতে পারিনি।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী সরফরাজ হোসেন নামে এক বন্ধুকে এক লিপি প্রেরণ করে বলেছিলেনঃ "আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। ... বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম-ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই ; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।... আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ

পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্ব্বক মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।”৩৩

“যুগে যুগে ভারত একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে—মুক্তি কোন্ পথে?” এ উক্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, যিনি ছিলেন সমন্বয়প্রাণ ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত স্বরূপ। এ মুক্তির ব্যঞ্জনা ধর্মে, দর্শনে ও সমন্বয়ে। এই মুক্তির প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা। বর্তমানে স্বাধীন ভারতেও আমরা রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরই স্বভাবত জোর দিয়ে থাকি এই বলে যে, এটাই ভারতের যুগধর্ম বা আপদ্‌ধর্ম। এদিকে রাষ্ট্রশাসননীতির নিশ্চয়ই প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। কিন্তু তারও আগে যাদের জন্য এসবের প্রয়োজন তাদের অর্থাৎ ভারতীয়গণের ঐতিহ্যগত নিজস্বতাকে ইতিহাসের গভীর জটিল অরণ্য থেকে খুঁজে পেতে হবে এবং সেভাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সকলের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঋষি ও মনীষীদের এবং ভারতপ্রেমিকদের কর্মে ও মননে সমন্বয়ধর্মী চিরন্তন ভারত যেকথা কয়ে উঠেছিল, তার উপযোগিতা ও প্রয়োজন আজ বোধ হয় আরও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেকুলার ডিমক্রেসির অর্থ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষ নয়, ধর্মমত-নিরপেক্ষ এবং সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অত্যাজ্য আনুষঙ্গিক। এবং স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় ভারত-ইতিহাসের এই ঐতিহ্যই এই জাতির শক্তি ও প্রগতির মূল উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

স্বামীজী ভারতের অতীতকে জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারা বর্তমানের পটভূমিকায় জীবন্ত করে তুলেছেন; এবং বিচার করে ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের দ্বারাই তা করেছেন। শাশ্বত ভারতের মূর্তির ছকে ভারত-ইতিহাসের শত উত্থান-পতনের কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি নির্ণয় করেছেন। ভবিষ্যৎ ভারতের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার সমর্থনে তিনি অতীত ও মধ্যযুগের বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তারই কিয়দংশ আলোচনার কিঞ্চিৎ প্রয়াস বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

একদা মাদুরা-অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেনঃ “...কোন

সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা।"[৩৪] তারও পূর্বে ১৮৯৪ সালে স্বামীজী মাদ্রাজবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকার বোস্টন শহর থেকে প্রেরিত দীর্ঘ এক লিপিতে নানা কথাচ্ছলে লিখেছিলেনঃ "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে।"[৩৫]

স্বামীজীর ইতিহাসচেতনার এই মর্মবাণী ভারতের বর্তমান অবস্থাতে প্রযোজ্য কিনা তা বিচারের ভার ইতিহাসবিদ্ দেশপ্রেমিকদের উপর। ইতিহাস শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে এই চেতনা বা চৈতন্যের আলোকে পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা তাও সুধীজনের বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাস গ্রন্থে গোরার মুখে একটি মূল্যবান কথা বসিয়েছেনঃ "ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরাজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।"[৩৬] আর স্বামীজী বললেনঃ "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই-মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"[৩৭] এই দুইয়ের মর্মার্থ সমপর্যায়ের।

ইতিহাসের যে বিন্যাস বিবেকানন্দের চেতনায় সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে, তাতে নিছক যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী কারও কারও মনে হতে পারে যে, একটি শূন্য আদর্শবাদ মাত্র। কিন্তু যিনি বীরহৃদয় যুবক-বৃন্দকে সম্বোধন করে একদা বলেছিলেনঃ "তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।... অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"[৩৮] —তিনি যে পশ্চাদ্-গামী ঐতিহ্যবাদী মোটেই নন, একজন পরম বিপ্লবী প্রগতিশীল চিন্তানায়ক,—এইটুকু বুঝতে কারও কোন অসুবিধে হবে না। স্বামীজী 'প্রভুর' আসনে এখানে ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্বকে বসিয়েছেন—বর্তমান লেখকের তাই বিশ্বাস। এবং সেই মূলতত্ত্ব ধর্ম, মন্ত্র ও সমন্বয়কে ঘিরে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে।

বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা

প্রস্তাবনা

আজ আমাদের দেশ ও জাতি এক ক্রান্তি লগ্নে উপস্থিত। আমরা প্রতি-মুহূর্তে দেখছি এক পুরাতন সমাজ তার জীর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মূল্যবোধ নিয়ে বিলীয়মান। তার পরিবর্তে যে নূতন সমাজের রূপমণ্ডন চলছে, তা এখনও সর্বাংশে স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের পটপরিবর্তনের এরূপ সন্ধিক্ষণে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য গণমানসে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা স্বাভাবিক। সেজন্য এই আগ্নেয় লগ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও মানবকল্যাণ চিন্তায় যাঁরা নিযুক্ত, তাঁদের দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে সেই ক্রান্তদর্শী ঋষিকে, পুরাতন থেকে নূতনে অবিরাম উত্তরণ ঘটেছে যাঁর জীবনে, মননে ও চেতনায়। অবশ্য বহু মনীষীর যৌথ মননের ফলশ্রুতিতে নূতন কালের রূপমণ্ডন ঘটে। তবুও যাঁর মধ্যে এই নূতন পূর্ণায়িত হয়ে ওঠে, তাঁকেই বিশেষভাবে সেই নূতন যুগের স্রষ্টাপুরুষ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যাঁর মধ্যে এমনি করে একটি সম্পূর্ণ নূতন কাল রূপায়িত হয়ে ওঠে, তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেটি হল এই যে, যেসকল মনীষীর মননের যৌথ প্রয়াস নূতন কালের রূপায়ণ ঘটায়, তাঁর মধ্যে তাঁদের চিন্তারাশির সমন্বয় ঘটবে অর্থাৎ তাঁকে একটি দুরূহ কাজ করতে হয়, তাঁকে ঐ সকল বিচিত্র চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে। সেই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য থেকেই পুরাতনের চৌহদ্দি থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটে, এবং তারই ফলশ্রুতি নূতনের আবির্ভাব।

বর্তমান সময়ে আমরা নিঃসন্দেহে এসকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখি চিন্তানায়ক বিবেকানন্দকে। তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করলে এ সত্য সহজেই প্রতিভাত হয়, যেমন হয়েছিল নিবেদিতার প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে। নিবেদিতার সমীক্ষান্ত সিদ্ধান্তঃ "তাঁর মধ্যে অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারীকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একদিকে, অপরদিকে দেখেছি তাঁর মধ্যে ভাবী নূতন অভ্যুদয়ের এক প্রবর্তক ঋষিকে।"[১] বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে, নিবেদিতার

এ সিদ্ধান্ত নিছক গুরুভক্তিপ্রসূত নয়, এ উক্তি একজন নিপুণ সমাজবিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক প্রজ্ঞাপ্রসূত। যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধি ছাড়া নিবেদিতা কোন সিদ্ধান্ত দেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল একমাত্র সত্য, "কঠিন সত্যের অনুসন্ধান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পরিণতি"[২] —এ নিবেদিতারই কথা।

বিবেকানন্দের সমাজদর্শন এই নূতন কালের সমাজদর্শন, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাও এই নূতন কালের। বস্তুত বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এক "আমূল রূপান্তর", এই "আমূল রূপান্তর"কে রূপ দিতেই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই রূপান্তরকে রূপ দিতে চেয়েছে, সেখানেই এ চিন্তাধারার গুরুত্ব।

কিন্তু বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন সময়ের বহু পূর্বে, সেজন্য তাঁর অগ্রগামী চিন্তাধারার সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমাদের সেদিন ছিল না। সেদিন আমরা তাঁকে শুধু ধর্মাচার্য ও স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী-রূপে দেখেছি। বলা বাহুল্য, সে দেখা ছিল আংশিক। আজ কালের অগ্রগতি তাঁর চিন্তার নূতন দিগন্তসকলকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তারই ফলে তাঁর চিন্তার একটি পুনর্মূল্যায়ন করবার প্রয়াস আমাদের মধ্যে জেগেছে। তারই ফলে আমরা পেয়েছি তাঁর সমাজদর্শনের রূপরেখার পরিচয় এবং তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দিগ্‌দর্শন।

বস্তুত বিবেকানন্দের মধ্যে যে সকল প্রকার মানসিক শক্তির অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, তিনি যে মানুষের সকল প্রকার মানসিক শক্তির মূর্ত সামঞ্জস্য —এ পরম সত্যটি ধারণা করতে না পারলে, তাঁর চিন্তার কোন দিক সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাঁর চিন্তার যে দিকটি নিয়েই আলোচনা করি না কেন, এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিভূমি হতে আরম্ভ না করলে এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকে যে, তাঁর মধ্যে অসংগতি ও স্ববিরোধ আছে। সেজন্য বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনার প্রারম্ভেই সেই সামঞ্জস্য-সূত্রটির সন্ধান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই সামঞ্জস্য-সূত্রটি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ইশারউডের (Christopher Isherwood) ভাষায় এমন "একটি আবির্ভাব" ("a phenomenon"), যা আশ্চর্য হলেও অনস্বীকার্য সত্য, অভিজ্ঞতার বস্তু।[৩] রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে যে সমন্বয় ও ঐক্যকে বিবেকানন্দ মূর্ত দেখেছেন ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে, তারই সম্প্রসারণ তিনি ঘটিয়েছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে, জগতের

সমস্ত ইতিবাচক চিন্তাকে সমন্বিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই সামঞ্জস্য-সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের জীবনবেদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা দর্শনমতকে 'বেদান্ত'—এই প্রাচীন নামেই অভিহিত করেছেন। প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের সংগতি এভাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় ইতিবাচক চিন্তার গ্রহণে এ দর্শনমতের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক বেশী। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেরী লুই বার্ক বলেছেনঃ "স্বামীজী বেদান্ত শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর কিছুটা নিজস্ব। ......ইতিপূর্বে কখনও একে বিশ্বের সকল ধর্ম, সকল বিশ্বাস, মানুষের প্রত্যেক মহৎ প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে—আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতি, বিশ্বাস ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও মিস্টিক অনুভূতি, কর্ম ও ধ্যান, মানুষের সেবা ও একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা—এ সব কিছুকে সমন্বিত করে একক একটি দর্শনমতে পরিণত হতে প্রসার ঘটাননি।"[৪] রোমাঁ রোলাঁর মতেঃ "এখানেই বিবেকানন্দের সাহস ও স্বকীয়তা।"[৫]

এই দুঃসাহসিক চিন্তার সমগ্রতা থেকে বিবেকানন্দের সমাজদর্শন রূপ নিয়েছে। এই সমগ্রতার তাৎপর্য নিবেদিতার একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। বিবেকানন্দের রচনাবলীর মুখবন্ধে নিবেদিতা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলছেনঃ 'বহু' ও 'এক'—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।

বিবেকানন্দের সমাজদর্শনঃ বিবেকানন্দের সমাজদর্শন চিন্তার সমগ্রতার এই গভীর তাৎপর্য থেকে প্রসূত, সেজন্য এ সমাজদর্শন সমগ্রতায় অনন্য, এদিক দিয়ে এর তুলনা নেই। এর মূলে আছে প্রাচীন বেদান্ত দর্শন, কিন্তু বেদান্ত আর এখানে ব্যক্তির মোক্ষশাস্ত্র মাত্র নেই, এর গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটনে এ একটি অগ্নিগর্ভ বিপ্লবদর্শন হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণের জীবনবেদের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটেছে। বিবেকানন্দের সমাজদর্শন মূলত এই বিপ্লব বা রূপান্তরের দর্শন। এর অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আছে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি যাবতীয় মানবিকী বিদ্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিবেকানন্দের গণমানসের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়প্রসূত গভীর জ্ঞান। যাঁরা তাঁর বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের* সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে ভারতে পরিব্রাজক জীবনে এবং

বিশ্বপরিক্রমাকালে তিনি সর্বত্র গণজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিশ্বাস, ধর্ম, নৈতিক আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধিনিয়ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংগঠন প্রভৃতি সব দিক সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন, অগণিত সাধারণ মানুষ, জীবন্ত মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি সকলের আশাআকাঙ্ক্ষা, সমস্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সমাজদর্শনের অন্যতম ভিত্তি এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান। সর্বোপরি বিশ্বসত্য সম্বন্ধে আপন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁকে এই সকল উপাদানকে সমন্বিত করবার দৃষ্টি দিয়েছিল।

এই সকল উপাদানে গঠিত তাঁর সমাজদর্শন বৈজ্ঞানিকতায়, যুক্তির সারবত্তায় ও বাস্তবতায় অনন্য। এর পূর্ণ রূপরেখার আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই, প্রয়োজনও নেই, শুধু সারমর্মটুকু এখানে উল্লেখ করলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে; আমরা তাঁর সমাজদর্শনে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মূল সূত্রগুলির সন্ধান লাভ করব।

সমগ্র অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বকে বিবেকানন্দ দুটি সরলীকৃত মূল সূত্রে পরিণত করেছেনঃ

১। মানুষের দেবত্ব

২। মানবজীবনের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতি

বেদান্তের এই দুটি সূত্র যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে বাস্তব হতেই হবে। একে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়োজনে আরও দুটি মূল সূত্র পাওয়া যায়ঃ

প্রথমত, মানুষের সব সমাজ, সব রাষ্ট্র, সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত দেবত্ব-শক্তির স্বীকৃতির ভিত্তির উপর।

দ্বিতীয়ত, মানুষের সব স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে মানুষের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতির প্রয়োজনে।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত্তি এই দুটি শেষোক্ত সূত্রের উপর।

প্রথম খণ্ড

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তা

রাজনীতিশাস্ত্রঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশসাধন—বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তার এটিই মূল কথা। রাজনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় আলোচনায় লেখনী ধারণ না করেও বিবেকানন্দ বেদান্তের ব্যবহারিক তাৎপর্য আলোচনাক্রমে রাজনীতিশাস্ত্রকে মৌলিক চিন্তার

দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। রাজনীতিশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য—সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, গঠন, বিকাশ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র, রাষ্ট্রবিপ্লব, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি ধারণার ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ কিছু না কিছু নূতন আলোকপাত করেছেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রঃ রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের নিয়ন্ত্রণসংস্থা-সমূহের মধ্যে প্রধান। সেজন্য সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ও সমাজসংগঠনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করার প্রয়োজন হয়। রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভই হয় সমাজ সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে। বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন একটি চিঠিতেঃ "...এক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি।...

"যখন জীবাত্মা এ-কথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী ক'রে নিজের অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শারীর বিবর্তন ক্রমশ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ...ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজে জীবন বলতে বুঝায় ইচ্ছা তৃষ্ণা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, সে-সব একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র। সেটি এই—ইচ্ছার বা কল্পিত 'আমি'র বিসর্জন...।"[৬]

বিবেকানন্দের এই উক্তিতে সমাজগঠনের মূল উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তির ক্রমবিকাশে সহায়তা করা। মানুষের ক্ষেত্রে এ ক্রমবিকাশের তাৎপর্য মনের বিকাশ। ম্যাকাইভার তাঁর 'Society' নামক মহাগ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একথাই বলেছেনঃ সমাজ মানবপ্রকৃতির বিকাশ।[৭] কিন্তু বিবেকানন্দের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অধিকতর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। মানুষকে 'ত্যাগের' পথে উন্নীত করা বা তার স্বরূপ উপলব্ধি বা সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশের জন্যই সমাজ, সমাজের বিধিনিয়ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ।

রাষ্ট্রের লক্ষ্যঃ রাষ্ট্র সমাজের নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র, সেজন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমাজের লক্ষ্য অভিন্ন। সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও প্রচুর চিন্তা করেছেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নৈতিক বিধির রূপায়ণ।[৮] বার্জেসের (Burgess)[৯] মতে রাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য মানুষের পূর্ণতা আর আশু লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা। এঁর মতের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বার্জেস জন্মেছিলেন আমেরিকায়, ১৮৭৪ সালে। তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়। তবে বিবেকানন্দের মতের স্পষ্টতা ও যুক্তির বিস্তার এঁদের কারও মধ্যে দেখা যায় না।

রাষ্ট্রের আদর্শবাদিতত্ত্ব ও বিবেকানন্দঃ হেগেল শেষ পর্যন্ত অভিমত দিয়েছেন রাষ্ট্র স্বয়ংপূর্ণ সংস্থা ("An end in itself")। এ মতের সূচনা দেখা গিয়েছিল গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর মধ্যে, হেগেল ও কান্ট এ মতের বিস্তার ঘটান। কান্ট তাঁর "Metaphysical First Principles of theTheory of Law" গ্রন্থে বলেছেনঃ রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, দৈবীসত্তাসম্পন্ন, তার সর্বশক্তির উৎস ঈশ্বর, সুতরাং রাষ্ট্রের কোন ভুলভ্রান্তি হতে পারে না। হেগেলের মতে রাষ্ট্র হলঃ মানুষের পূর্ণতাসিদ্ধির প্রতীক ("The state is man in his fullness and perfection of development".)। রাষ্ট্রের অধীনতাতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা।[১০]

রাজনীতিশাস্ত্রে এ তত্ত্বের নাম Idealistic Theory of State অর্থাৎ রাষ্ট্রের আদর্শবাদিতত্ত্ব। কেউ কেউ বিবেকানন্দকে এই মতবাদের অনুবর্তী বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ বিবেকানন্দের একটি প্রখ্যাত উক্তিঃ "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।"[১১] এ প্রসঙ্গে রাজনীতিশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেনঃ বিবেকানন্দ "গ্রীনের ন্যায় হেগেলের অনুবর্তী।"[১২] বস্তুত হেগেল ও গ্রীনের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বিবেকানন্দের উপরোক্ত উক্তি "সমষ্টির জীবনে

ব্যষ্টির জীবন"—বেদান্তোক্ত সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দ উক্তিটি করেছেন যে প্রসঙ্গে তা হল এই যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের দাবি যুক্তিসংগত নয়, কারণ তাতে সমষ্টি বঞ্চিত হয়। বিবেকানন্দের উক্তির তাৎপর্য এই যে, শ্রেণী-স্বার্থ যেন জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়। সুতরাং হেগেলের উক্তির যে তাৎপর্য—অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই, আর বিবেকানন্দের উক্তির যে তাৎপর্য—অর্থাৎ জনগণের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য, সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। বেদান্তবাদী হিসাবে বিবেকানন্দ হেগেলের এ মত কখনই সমর্থন করেননি যে, অপূর্ণ জগতের কোন প্রতিষ্ঠান সেই পূর্ণত্বের প্রতীক হতে পারে।

বরঞ্চ বিবেকানন্দ যে রাষ্ট্রকে অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মনে করতেন তার প্রমাণ আছে। ইতিহাস অনুশীলন থেকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ব্যক্তিকে পূর্ণত্বের পথে অগ্রবর্তী করে দেওয়া রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলেও বাস্তবে রাষ্ট্র শ্রেণীশাসকদের হাতে শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি এ বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করছেঃ "একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি ক'রে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো!! পাহারাওয়ালার নাম হ'ল রাজা, মুটের নাম হ'ল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরী করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।"[১৩]

বিবেকানন্দের উপরোক্ত উক্তিতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে, মার্ক্সীয় মতবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। মার্ক্সীয় মতবাদেরও মূল কথা হল এই যে, রাষ্ট্র হল শোষণের যন্ত্র।[১৪] এই সাদৃশ্যের জন্য বিবেকানন্দকে কেউ কেউ মার্ক্সীয়

চিন্তার অনুবর্তী দেখতে পেয়েছেন।[১৫] কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তার পার্থক্য অধিকতর মৌলিক। বিবেকানন্দ মূলত অধ্যাত্মবাদী, মার্ক্স্ কট্টর জড়বাদী, বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী, মার্ক্সের মতে সমাজই সব, এবং সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্ত্রক ক্ষমতার কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণেই সার্থকতা, অবশ্য সে রাষ্ট্র যখন শ্রমিকরাষ্ট্র তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। বিবেকানন্দের মতে শোষণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ঐ ভাবে যদিও ব্যবহার করা হয়েছে।

বিবেকানন্দের চিন্তার স্বকীয়তাঃ সুতরাং দেখা যাচ্ছে হেগেল ও মার্ক্স্ এই দুই প্রান্তের দুই চিন্তানায়ক—এঁদের মধ্যে কারও অনুবর্তী বিবেকানন্দ নন। কিন্তু উভয়েরই চিন্তার যেটুকু সার, সেটুকু বিবেকানন্দের মধ্যে মিলিত হয়েছে। সেজন্য উভয়ের চিন্তার সঙ্গে তাঁর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবেকানন্দের চিন্তার মূল ভিত্তি বেদান্ত। এজন্য বিবেকানন্দের মত স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের সারমর্ম এই যে, রাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য হল ব্যক্তির সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশের সুযোগপ্রদান, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র এ পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি, শক্তিশালী শ্রেণীর কবলিত হয়ে পড়ায় রাষ্ট্র তাদের বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ করেছে এবং তাতে জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র কোন অন্যায় করতে পারে না, অবিচার করতে পারে না বা রাষ্ট্রের অধীনতাতেই ব্যক্তির স্বাধীনতা, যে মত হেগেল পুরোপুরি, মার্ক্স্ও অবস্থা বিশেষে সমর্থন করেছেন, বিবেকানন্দ কোন অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র সমর্থন করেননি।

রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তিঃ রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ মূলত ক্রমবিকাশবাদী। দেবাসুরের সংগ্রামের রূপক সহায়ে বিবেকানন্দ রাষ্ট্র ও সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস উপস্থাপিত করেছেন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে ঃ "দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস ক'রত, তারা অধিকাংশই মাছ ধ'রে জীবিকা নির্বাহ ক'রত; যারা সমতল জমিতে, তাদের—চাষবাস; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস ক'রে শিকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হ'তে লাগলো। ...শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুঠতে আরম্ভ করলে।

সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হ'তে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হ'তে লাগলো।

"...ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হ'তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হ'তে লাগলো। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতা-জিতি চলতে লাগলো।

"এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হ'তে লাগলো,...।"[১৬]

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনটি সিদ্ধান্তঃ

প্রথমত, রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সামাজিক চুক্তির ফল নয়, ক্রমবিকাশের ফল। রুশো,[১৭] হবস, লক এই সামাজিক চুক্তির কথা বলেছেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র একটি সামাজিক চুক্তির ফল। হিউম, বার্ক, গ্রীন প্রভৃতি লেখকগণ এই সামাজিক-চুক্তি-তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য এরূপ কোন সামাজিক চুক্তি যে ঘটেছিল তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ মত বর্তমানে রাজনীতিশাস্ত্রে প্রমাণসিদ্ধ নয় বলে পরিত্যক্ত। বিবেকানন্দ যে ক্রমবিকাশতত্ত্বের কথা বলেছেন, সেটিই বর্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বজন-গৃহীত।

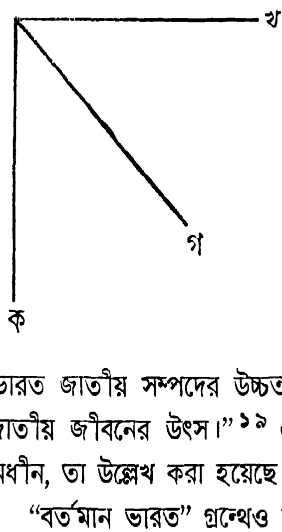
দ্বিতীয়ত যে সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ এখানে দিয়েছেন তা হল এই যে, রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘর্ষ ও শক্তি নিহিত আছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে শক্তিবাদ বা Theory of Force প্রচলিত আছে তার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তা আজকের রাষ্ট্রনীতিবিদেরা স্বীকার করেন।

বিবেকানন্দের তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল এই যে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশেষ সুবিধার মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মার্ক্সীয় রাষ্ট্র-তত্ত্বের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে।

বর্তমানে কালে রাজনীতিবিদেরা বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পশ্চাতে শক্তি-বাদ ও অন্যান্য মতবাদগুলি যে সকল উপাদানের কথা বলেছে সে সবগুলিই কিছু কিছু বর্তমান। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে এ সবগুলি উপাদানেরই কিছু কিছু অবদান রয়েছে। বিবেকানন্দও ঠিক সেই কথাই বলেছেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতিঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমত হল এই যে, এগুলি জীবদেহের অনুরূপ এই অর্থে যে, এদের বিকাশ

ঘটে আভ্যন্তরীণ স্বধর্মে, এদের বিকাশ বাহ্য শক্তির চাপে যান্ত্রিক নিয়মে ঘটে না। ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "Philosophy of Man-making" নামক গবেষণাগ্রন্থে বলেছেন, রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা আংশিকভাবে যান্ত্রিক, আংশিকভাবে জৈবিক।[১৮] কিন্তু রাষ্ট্র যান্ত্রিক নিয়মের অধীন—এ মতের সপক্ষে তিনি বিবেকানন্দের কোন উক্তি উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে নিবেদিতা স্বামীজীর যে মত স্পষ্ট উদ্ধৃত করেছেন তাঁর "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" শীর্ষক গ্রন্থে, সেটি হলঃ "কোন জাতিতে বল সঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে 'ক' বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন 'খ'? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্তী এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন 'গ'। ইহা তো জ্যামিতিক পরিবর্তনমাত্র। এরূপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিতেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ 'ত্যাগ' প্রচার করিলেন এবং ভারত উহা শুনিল। তথাপি এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস।"[১৯] এখানে স্পষ্টতই সমাজবিকাশ জৈবিক নিয়মের অধীন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।



"বর্তমান ভারত" গ্রন্থেও বিবেকানন্দ বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে শাসনক্ষমতা থেকে চ্যুত হয় তা বোঝাতে গিয়ে জীবদেহতত্ত্বের[২০] সাহায্য নিয়েছেন। সেখানে বিষয়টির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতি-বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জী-কৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে

পতিত হয়।"[২১] এখানে জীবদেহের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ সমাজ-জীবনের এই একান্ত সত্যটি অতি দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যে, কোন বিদ্যা বা শক্তি যা হয়তো কোন একটি বিশেষ শ্রেণী অর্জন করেছে, তাতে সেই বিশেষ শ্রেণীরই একাধিপত্য থাকবে তা নয়, সর্বস্তরের মানুষের তাতে অধিকার, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে: সমাজের সর্বস্তরে যদি অধিকৃত বিদ্যা বা শক্তি না পৌঁছাতে পারে, তাহলে সে সমাজ ক্রমে ধ্বংস-কবলিত হয় এ সিদ্ধান্তও তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেনঃ "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।"[২২]

শুধু সমাজই নয় বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংগঠনও যে জৈবিক সংগঠনের অনুরূপ এইটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আরও বলেছেনঃ "রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। শক্তিসমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজশরীরে প্রসৃত।"[২৩] রাষ্ট্রের শক্তি প্রজার স্বার্থসাধনের জন্য, শাসকশ্রেণীর স্বার্থসাধনের জন্য নয়—বিবেকানন্দের এ বিষয়ে একথা হল শেষ কথা। বিবেকানন্দের এই শেষ সিদ্ধান্ত আদর্শরাষ্ট্রবাদীদের ঠিক বিপরীত। রাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা নয় ("End in itself"), রাষ্ট্রের লক্ষ্য প্রজার স্বার্থসাধন।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণার মূল্যায়নঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটি হল এই যে, রাজনীতিশাস্ত্রে বিবেকানন্দের প্রগাঢ় অধিকার ছিল। রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠন, উৎপত্তি ও বিকাশ—এ সব কিছু সম্বন্ধে তিনি নিজস্ব মতামত রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সমন্বয়ী প্রতিভা এখানে যা ঘটিয়েছে তা সত্যই আশ্চর্য। তদানীন্তন বিভিন্ন বিপরীত মতের সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা রাষ্ট্র-নীতিতে অতি মূল্যবান অবদান। তাও শুধু নয়, রাষ্ট্রের ধারণার ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবে যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল যার ফলে (হ্যারল্ড ল্যাস্কি বর্ণিত)[২৪] রাষ্ট্রতত্ত্বে বর্তমানে যে মহাসঙ্কট উপস্থিত, তা দূরীভূত হয়েছে বিবেকানন্দের চিন্তায়।

হেগেল ও মার্ক্সের রাষ্ট্রতত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে প্রতীয়মান। কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে দেখা যায় যে, উভয়ের চিন্তার ভিত্তিতে একই আদর্শ—রাষ্ট্রের বল্গাহীন ক্ষমতার উভয়েই সমর্থক। উভয়েরই মতের তাৎপর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের নিকট ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন, রাষ্ট্রনির্দিষ্ট কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ—উভয়ের প্রতিপাদ্য। মার্ক্স্ কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকার ধনিকশ্রেণীর কবল থেকে উদ্ধার করে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন—কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিতেই রাষ্ট্র হল সার্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন (totalitarian)। মার্ক্স্ অবশ্য বলেছেনঃ শোষণহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না, কারণ রাষ্ট্র হল শোষণের মাধ্যম, তখন রাষ্ট্র শূন্যে মিলিয়ে যাবে ("Wither away")। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান। বিবেকানন্দও ইতিহাস অনুশীলন করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেনঃ ভবিষ্যৎ সমাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু তাঁর মতে শ্রমিক সমাজেও সাম্য-অসাম্যের দ্বন্দ্ব কখনও একেবারে দূরীভূত হবে না, কারণ এ দ্বন্দ্ব চিরদিনের, বেদান্তবাদের প্রতিপাদ্য তাই। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সংকটের কথা ল্যাস্কি বলেছেন তার অবসান ঘটেছে বিবেকানন্দের চিন্তায়।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তার একটি প্রশংসনীয় দিক উপরে উদ্ঘাটিত। সেটি হল এই যে, তাঁর চিন্তায় কোন অবাস্তব আদর্শবাদ স্থান পায়নি,—বস্তুত এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত বাস্তব ও ইতিহাস-আশ্রয়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাষ্ট্র ও সমাজকে তিনি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাদের বিকাশধর্মকে বোঝাবার জন্য, কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো তিনি কখনও এ দাবি করেননি যে রাষ্ট্র একটি স্বতন্ত্র জীবদেহ, তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তার মস্তিষ্ক হল সরকার।[২৫] জীবন্ত মানুষদের সংস্থা রাষ্ট্র ও সমাজ জীবদেহের মতো বিকাশ-নিয়মের অধীন, কিন্তু তা বলে রাষ্ট্র বা সমাজ স্বতন্ত্র জীবদেহ নয়। পুনরায়, রাষ্ট্র শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেণীসমাজে, কিন্তু তা বলে রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য শোষণ নয়। বিবেকানন্দের আশ্চর্য বাস্তবদৃষ্টি ভারসাম্যহীনতা ঘটায়নি কোন ধারণার ক্ষেত্রেই।

শুধু রাষ্ট্রের আদর্শ, উদ্দেশ্য, বিকাশ ও গঠন সম্বন্ধেই বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সীমাবদ্ধ নয়। রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যান্য আরও কয়েকটি ধারণার ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মৌলিক অভিমত রেখেছেন। সেগুলি এবারে আমরা আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

শ্রেণীরাষ্ট্রের বিকাশধারাঃ ইতিহাস-বিশ্লেষণ সহায়ে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর হাতে এসেছে। পুরোহিত, ক্ষত্রিয় অধিকারের যুগ শেষে বর্তমানে বৈশ্য অধিকারের যুগ চলছে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারে আসবে শূদ্রশ্রেণী। তাঁর মতে প্রত্যেকটি শ্রেণীরাষ্ট্রের দোষগুণ বর্তমান। তাঁর ভাষায়ঃ

"পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই...। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে থাকেন।

"ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (Culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

"তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এ সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

"সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, সংস্কৃতির হয়তো অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।"[২৬] দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ প্রতিটি শ্রেণীশাসনের কালের যা কিছু গুণ আছে তা স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শাসন, বৈশ্যশাসন—সমাজকে কোন না কোন দিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সে সমৃদ্ধি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা, বিবেকানন্দ শ্রমিকশাসনের কালকেও আদর্শ বলেননি। শ্রমিকশাসিত সমাজেরও কিছু ত্রুটি থাকবে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আদর্শ রাষ্ট্রঃ বিবেকানন্দের আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা নিম্নোক্তরূপঃ "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই

ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[২৭] এ ধারণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ নিজেই প্রশ্ন তুলেছেনঃ "কিন্তু একি সম্ভব?" বাস্তব জগতে এ যে সম্ভব নয় তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন ঃ "বাস্তব জগৎ—সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে...।[২৮] এখানে বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা অবাস্তব। এ সিদ্ধান্তের জন্য বিবেকানন্দ রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্রে একটি স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, অবাস্তব আদর্শবাদ থেকে এ শাস্ত্রকে তিনি মুক্ত করেছেন।

বিভিন্ন ধরনের শাসনযন্ত্রঃ বিভিন্ন আলোচনায় বিবেকানন্দ মুখ্য দুটি শাসনব্যবস্থা আলোচনা করেছেন। এ দুটি হল—রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। কিন্তু ভারত-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, রাজতন্ত্রের উপর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটেছে। ভারতের ইতিহাসের প্রথম যুগে রাজন্যবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ "কখন বিভীষিকা-সংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখন কৌশলময় নীতি-জাল-বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে।"[২৯] এ ব্যবস্থা কার্যত অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) যদিও নামে রাজতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় শাসনবিধি প্রণয়ন করেন পুরোহিত। এ শাসনব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দন্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য-সাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।"[৩০] এ অবস্থার পরিণতি যে প্রজার শোষণে এবং প্রজাস্বার্থহানিতে সেটি উদ্ঘাটিত করে বিবেকানন্দ বলছেনঃ "রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার

দুগ্ধবতী গাভী।"[৩১] এখানেও বিবেকানন্দ গভীর বাস্তবতাবোধের পরিচয় রেখেছেন। তথাকথিত ঋষিশাসিত সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ ছিল না, এ যে স্বৈরতন্ত্র তা তিনি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে বলেছেন ঃ "কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই...।"[৩২] রাম-রাজ্য সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মোহমুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তঃ "একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব—অতি অল্পসংখ্যক।"[৩৩] তাঁর যুক্তি এখানে স্পষ্টই অকাট্য।

বিবেকানন্দের দৃঢ় অভিমত যে স্ব-শাসনের চেয়ে যতই ন্যায়পরায়ণ রাজ-শাসন হোক তা ভাল হতে পারে না। তাঁর মতেঃ "হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়।... দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না ; রাজমুখা-পেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।"[৩৪] John Stuart Mill তাঁর "Representative Government" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঠিক এই কথাই বলেছেনঃ উত্তম শাসন স্ব-শাসনের কোন পরিবর্ত নয় ("A good government is no substitute for self government")। বিবেকানন্দ বিষয়টির উপর আরও আলোকপাত করেছেন নিম্নলিখিত মন্তব্যেঃ "ঐ সকল নির্দেশ (ঋষিগণ প্রদত্ত)—পুস্তকে। পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্যপরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক।... মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান—সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে।"[৩৫] মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বিচার শক্তির উপর যে অবিচার ঘটে ঋষিশাসিত সমাজের পরিকল্পনায় বিবেকানন্দ তারও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[৩৬]

বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্ষমতা হারায়, রাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তীকালে রাজশক্তির উপর বৈশ্যকুলের প্রাধান্য ঘটে। বিবেকানন্দের

সমীক্ষা অনুসারেঃ "যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্য-শক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মতো ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্যদেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে, আমীর ওমরা সাজিয়া নিজ নিজ গৌরববিস্তারের আস্পদ বলিয়া।"[৩৭] ধনতন্ত্রের কবলিত রাজতন্ত্রের স্বরূপ এখানে অতি সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত।

গণতন্ত্রঃ বিবেকানন্দ যে দ্বিতীয় প্রকার শাসনপদ্ধতির কথা আলোচনা করেছেন—তা হল গণতন্ত্র। তাঁর মতে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। ঋষিগণ-শাসিত ব্যবস্থাও তাঁর সমর্থন পায়নি—একথা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ঋষি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কল্পনামাত্র, বাস্তবে তা কার্যকর হয় না—এ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, ক্রমেই আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকে এবং পুরোহিতগণ আধ্যাত্মিক আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে বিশেষ সুবিধার দাবি করতে থাকেন। বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।"[৩৮] সেজন্য বিবেকানন্দের মতে গণতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা। বিবেকানন্দ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ "শাসিতগণের শাসনকার্যে, অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, 'এ দেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে'...।"[৩৯]

ধনতন্ত্র—গণতন্ত্র—সাম্রাজ্যবাদঃ কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র যে মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে এ বিষয়ে বিবেকানন্দের আশ্চর্য সচেতনতা ও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি এ বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত করেঃ "ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা।"[৪০]

ধনতন্ত্র-ভিত্তিক গণতন্ত্র যে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে তার মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়েছিল। একটি আলো-

চনায় এ প্রসঙ্গে তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে বলছেনঃ "যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হ'লে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল।"[৪১] একথা তিনি বলেছেন যখন লেনিনের 'Imperialism' নামক গ্রন্থ লেখা হয়নি এবং যখন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সাধারণের চেতনা আজকের মতো জাগ্রত হয়নি।

সমাজতন্ত্রবাদঃ আজকের দিনে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক আদর্শ হল সমাজতন্ত্রবাদ। এই আদর্শের সঙ্গে আজ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের নাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আদর্শের ধারণা গঠনে বহু লেখক, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ কথাটির ইংরেজি নাম সোস্যালিজম; কথাটি উদ্ভূত হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রবার্ট ওয়েন "Association of all classes in all Nations" নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। সেই হিসাবে রবার্ট ওয়েনকে সমাজতান্ত্রিক ধারণার আদিপুরুষ বলা যেতে পারে। মার্ক্সের অবদান সমাজতন্ত্রবাদের ধারণাকে পুষ্ট ও সক্রিয় (dynamic) করে তোলে। তাঁর ধারণার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। তাঁর মতে শোষকশ্রেণীর হাতে শোষণের দুটি হাতিয়ার—ধর্ম ও রাষ্ট্র; শোষণহীন সমাজে এ দুটিই বিলুপ্ত হবে। ধর্ম আদিম মানুষের অজ্ঞানতা ও ভীতিসঞ্জাত বস্তু। ধনতন্ত্রের আসন্ন অবসান এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা তার মূল প্রতিপাদ্য। তাঁর মতে শ্রমিকশাসন কালে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হবে।

এই সমাজতান্ত্রিক ধারণার একটি নূতন দিগন্ত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম কথা এদেশে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি যখন সমাজের উপরের তলার মানুষদের উপর নিবদ্ধ ছিল তখন একমাত্র স্বামীজীর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়। তিনিই সর্ব-প্রথম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে জাতি বাস করে কুটিরে, বিধবা-বিবাহ নয়, ধর্মসংস্কার নয়, ভারতের জাতীয় সমস্যা হল জনগণের যে সমস্যা[৪২] সেই সমস্যা অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে তিনি বলেনঃ "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, কোটি কোটি মানুষ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, কোটি কোটি দেব-ঋষির সন্তান পশুপ্রায় হয়ে গিয়েছে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের মতো অজ্ঞানতার অন্ধকার

তাদের ছেয়ে ফেলেছে।"[৪৩] "বর্তমান ভারত" পুস্তকে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন একথা যে শূদ্র বা শ্রমিক অভ্যুত্থান আসন্ন ("তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে"[৪৪])। সেখানে তিনি আরও ঘোষণা করেনঃ "সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" সমকালীন পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তা এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা কোথায় এই শূদ্র অভ্যুত্থান সর্বপ্রথম ঘটবে সে সম্পর্কে এই অভ্রান্ত ঘোষণা করেছিলেনঃ "এই অভ্যুত্থান ঘটবে সর্বপ্রথম হয় চীন না হয়তো রুশ দেশে—ঠিক বলতে পারছি না কোথায়—কারণ, এ দুটি দেশেই জনগণ সর্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতিত।"[৪৫] এবং ১৮৯৬ সালেই এদেশের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেনঃ "আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী।"[৪৬]

কিন্তু তিনি যে শুধু পাশ্চাত্যের সমাজবাদী চিন্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাই নয়, সে চিন্তার ত্রুটি কোথায় সে সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিচার নিম্নোক্তরূপঃ "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি. কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'— এই হিসাবে।"[৪৭] তাঁর মতে শূদ্র শাসনকালে জ্ঞান-বিদ্যার মান নীচ হয়ে যাবে—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। তৎসত্ত্বেও একে তাঁর সমর্থন জানাবার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেনঃ "অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক্। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হ'তে পারে, সেইটাই ভাল।"[৪৮] সমাজতন্ত্রও কেন যে আদর্শ অবস্থা হতে পারে না সে সম্পর্কে তিনি আরও বলেনঃ "জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে

তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।"[৪৯] এই কথা কয়টি বেদান্ত-বাদীর কথা, মায়ার জগতের সৃষ্টি ভালমন্দের সংমিশ্রণে, সেজন্য এখানে কোন ব্যবস্থাই ত্রুটিহীন হতে পারে না।

কিন্তু তা বলে চিরদিন শূদ্রশ্রেণী বঞ্চিত হবে তা কোন ক্রমেই সমর্থন-যোগ্য বলে তিনি মনে করেননি। মার্ক্সের মতো বিবেকানন্দেরও এই মত যে, সমাজে মূল শ্রেণী হল শূদ্রশ্রেণী—যারা উৎপাদন করে; এদেরই পরিশ্রমের ফলে মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার বিস্তার। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষককুলের প্রশস্তি করে তিনি বলেছেনঃ "ঐ যারা চাষা-ভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রম-ফলও তারা পাচ্চে না!

"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া. বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।"[৫০]

শ্রেণীসংগ্রামঃ ইতিহাস যে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এ তত্ত্বও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর নিজস্ব ভারত-ইতিহাস অনুশীলনের মাধ্যমে।[৫১] ভারতের ইতিহাসের প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে সঙ্ঘর্ষ ঘটে, পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ জুটির সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর; বর্তমানে বৈশ্যশ্রেণীর আধিপত্য অন্তে শূদ্র-অভ্যুত্থান অনিবার্য—এ মত তিনি প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন "বর্তমান ভারত" ও "ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয়ে।

তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার এই পর্যন্ত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণার ভিত্তিতে আছে তাঁর দর্শন-মত, তাঁর বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ। "প্রতি মানুষে একই দেবত্ব শক্তি নিহিত", বেদান্তের এই মূল সূত্রটির ফলশ্রুতি বিশেষ অধিকারের অস্বীকার—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। বস্তুত এই বেদান্তদর্শন আমাদের ধর্মদর্শনের উত্তুঙ্গ শিখর। সুতরাং এখানে প্রমাণ মিলছে যে, প্রকৃত ধর্ম শোষণের সহায় নয়, বরঞ্চ বিপরীত, শোষণের মূলে আঘাত করছে বিশেষ অধিকারকে অস্বীকার করে।

কিন্তু বিবেকানন্দের মতে পৌরোহিত্যচক্র শোষণের সহায়। "বেদান্ত ও অধিকার" (Vedanta) শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি পৌরোহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলছেনঃ "পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেই জন্যই যেখানে পুরোহিত-তন্ত্রের উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে ; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।"[৫২] এখানে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন প্রথমত এই কথা যে, পৌরোহিত্য ধর্ম নয়, ধর্মের নামে বিশেষ-সুবিধা-তন্ত্র ; দ্বিতীয়ত বোঝাতে চেয়েছেন একথা যে, প্রকৃত ধর্মে বিশেষ সুবিধার কোন স্থান নেই। সুতরাং তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত পৌরোহিত্য হল ধর্মের অভাব। মার্ক্স্ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীরা এখানেই ভুল করেছেন—তাঁরা পৌরোহিত্য ও ধর্মকে এক ও অভিন্ন মনে করেছেন। সেজন্য তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ধর্ম হল শোষণের হাতিয়ার। বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তঃ পৌরোহিত্য শোষণের হাতিয়ার, আর ধর্ম হল বিশেষ-সুবিধা-তন্ত্রের উপর আঘাত হানবার হাতিয়ার।

ভারত-ইতিহাস থেকে বিবেকানন্দ এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রমাণ দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যথার্থ ধর্মনেতারা বিশেষ অধিকারের উপর আঘাত হেনেছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, দাদু, কবীর, রামানুজ প্রত্যেকে এঁরা এ কাজ করেছেন এবং এজন্য দেখা যায় এঁদের পৌরোহিত্যচক্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে, এঁরা জনগণকে তাদের ন্যায্য মানবিক অধিকার দিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই তত্ত্ব যে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক বিরোধিতা কিছু নেই, বরঞ্চ ধর্ম সমাজতন্ত্রের যেটি মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ সুবিধা চূর্ণ করা—সেই উদ্দেশ্যের পূরক। প্রকৃত ধর্মের প্রতিপাদ্যঃ "কেউ হীন নয়, ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেরই বড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।" বিবেকানন্দ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেনঃ "অজ্ঞ অশক্ত নরনারী সকলেই শোন, সকলেই সেই অজর অমর শাশ্বত আত্মা, সকলেরই বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। অতএব ওঠ, দৌর্বল্যের এ জড়তা হতে জাগো... তোমার জন্মগত অধিকার অস্বীকার কোর না।"[৫৩] বিবেকানন্দ এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতে গণমুক্তির

পরিকল্পনা করেছেন। এবং এজন্যই তিনি ঘোষণা করেনঃ "দেশে রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের পূর্বে তাকে ধর্মের প্লাবনে প্লাবিত কর।" ("Before flooding India with socialistic or political ideas deluge the country with spiritual ideals".)

রাজনীতিশাস্ত্রের দিক থেকে বিবেকানন্দের চিন্তার তাৎপর্য হল এই যে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের ধারণার মধ্যে বিরোধ ঘুচিয়ে সমাজতন্ত্রের ধারণাটিকে তিনি একটি মস্তবড় ত্রুটিমুক্ত করেছেন এবং ধারণাটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করেছেন। বিবেকানন্দের এ অবদানের মূল্য অপরিসীম।

সর্বার্থসাধক রাষ্ট্র (Totalitarian State)ঃ সমাজতন্ত্রের অপর একটি বিরাট ত্রুটি হল এই যে, এই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করেছেন মার্ক্স্ একটি সর্বার্থসাধক ও সর্বাত্মক ক্ষমতাযুক্ত রাষ্ট্রের (totalitarian) ধারণা, যে রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। বিবেকানন্দ এরূপে সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান কোন মতেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেননি। ব্যক্তিস্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূল্যায়ন প্রয়াস করতে গিয়ে তিনি এই মত উপস্থিত করেছেন যে, "ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য।"[৫৪] আধুনিক পাশ্চাত্যে এ প্রশ্ন যে আলোড়ন উপস্থাপিত করেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে দুই প্রান্তের এই দুই মতবাদের মধ্যে যার একটির নাম সোস্যালিজম, অপরটির নাম ইন্ডিভিজুয়ালিজম। তাঁর ভাষায়ঃ "যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্ডিভিজুয়ালিজম্।"[৫৫] কিন্তু ভারতবর্ষও এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। সেখানে ব্যক্তির সমগ্র জীবন কিরূপ কঠোর সমাজ-নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল তা তুলে ধরে বিবেকানন্দ বলছেনঃ "এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই-প্রকার ; এমন কি, মরিবার সময়ও সেইসকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে।"[৫৬] এরূপ ব্যবস্থায় জোর করে ব্যক্তিকে যে আত্ম ইচ্ছা ও আত্মসুখ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয় এবং এ অবস্থায় যে নিয়মের প্রতি চিরদাসত্বের শিক্ষা দেওয়া হয় বিবেকানন্দ তা দেখিয়েছেন। এ চিরদাসত্বের শিক্ষার

পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলছেনঃ "এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে।"[৫৭] কিন্তু এর বিষময় পরিণাম হল এই যে, "এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই,...উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই...।"[৫৮] অর্থাৎ বিবেকানন্দের মতেঃ এ অবস্থায় মানুষ সৃজনী শক্তি ও সৃজনের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সমস্ত অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এরূপ অচলায়তন সমাজের অবনতি ঘটতে বাধ্য। বিবেকানন্দের তীক্ষ্ম ভাষায়ঃ "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিন্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়?"[৫৯] বিবেকানন্দের দৃঢ় অভিমত স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশেই কল্যাণ নিহিত, একটি সামান্য কীটও স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হয় এই যুক্তিতে[৬০] তিনি সর্বাবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেনঃ "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম সর্ত্ত।" ব্যক্তির জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যই ব্যক্তি নয়- এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেনঃ ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত।[৬১] এজন্য সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে জোর করে আত্মত্যাগ করানোর তিনি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। প্রাচীন ভারতে যেরূপ কঠোর বিধিনিয়মের মাধ্যমে এরূপ জোর করে আত্মত্যাগ করানোর ব্যবস্থা ছিল তার তীব্র নিন্দা করে বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে?...কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীত কি হয়?'... বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ?"[৬২] অর্থাৎ সমষ্টির জন্য ব্যষ্টিকে বলপূর্বক আত্মোৎসর্গ করানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এখানে বিবেকানন্দ প্রাচীন সমাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন

এ সত্য যে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে যে সমাজতন্ত্র তা ত্রুটিপূর্ণ—তা কল্যাণকর নয়।

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও অতি উচ্চস্থান দিয়েছেন। একি তাঁর চিন্তাধারায় অসংগতির প্রমাণ? না, তা নয়। রাজনীতিশাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার C. D. Burns তাঁর "Political Ideals" শীর্ষক গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেনঃ "যদি আমরা এমন কোন আদর্শ পেতাম যা একাধারে সমাজতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাহলে জগতের মনস্বীকুলের কাছে তা গ্রহণীয় হত।...কারণ ব্যক্তির বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যেমন ঠিকই করেছেন, ঠিক সেইরকম সমাজতন্ত্রবাদীও ব্যক্তির যৌথ স্বার্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঠিক কাজই করেছেন, কারণ সমষ্টি জীবনে নিজ কর্ম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করবার মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনা।"[৬৩] এ কথাগুলি বিবেকানন্দের অভিমতের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। বিবেকানন্দ এখানে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে যে বাঞ্ছিত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে তাই ঘটিয়েছেন নিজ চিন্তায়। এ সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি এই সূত্রটি—"বৈচিত্র্যে একত্ব"। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বৈচিত্র্যের অবসান ঘটানো নয়, এর মূল লক্ষ্য বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদীদের ভ্রান্তি এইখানে যে, তাঁরা বৈচিত্র্য বা বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। একমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মিলন সম্ভব। সুতরাং বিশ্বের মনস্বীকুল যার অপেক্ষায় আছেন সেই পূর্ণায়ত আদর্শ রূপ পেয়েছে বিবেকানন্দেরই চিন্তায়। ভারতে আজ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের যে রূপায়ণ-প্রয়াস চলেছে তা বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ।

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

আইনঃ রাজনীতিশাস্ত্রের অপর তিনটি মূল্যবান ধারণাঃ 'আইন', 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্য'। আইন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন খুব সামান্য, কিন্তু যেটুকু বলেছেন তা তাঁর গভীর মননশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি বলছেনঃ "আইন করলেন আমীরেরা, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট করবার জন্য; রাজস্ব ভোগ করবেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে

আসছে !!" [৬৪] অর্থাৎ শ্রেণীরাষ্ট্রে আইন শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে নিযুক্ত হয়—এ সত্য স্পষ্ট তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রখ্যাত রাজনীতিশাস্ত্রবিদ্ ল্যাস্কি (Laski) বলেছেনঃ "যে কোন নির্দিষ্ট সমাজের আইন সে সমাজের বিভিন্ন শক্তি-সমূহের চাপের ফল ; সেই শক্তিসমূহকে বাদ দিয়ে আইনগুলির মূল লক্ষ্য ও তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।" [৬৫] ল্যাস্কির এই উক্তি বিবেকানন্দের মতকে সমর্থন করছে। বিবেকানন্দের আরও অভিমতঃ আইন শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত হলে, "...রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয়...।" [৬৬] শাসকশ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত আইন পালিত হবার কারণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলছেনঃ "যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে" ; ল্যাস্কি বলছেনঃ "আইনগুলি মেনে নেওয়া হয় সাধারণত এই কারণে যে, যাঁরা এগুলি অস্বীকার করতে চান তাঁদের আইনের পশ্চাতে যে ক্ষমতা আছে তার মুখোমুখি হবার অবস্থা নেই।" [৬৭] দুজনের কথার তাৎপর্য একই। আইনের স্বরূপ সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তার সমর্থন ল্যাস্কির এই অভিমতে পাওয়া যায়, যা বিশ শতকের ত্রিশ দশকে লিখিত, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বিবেকানন্দ লিখেছেন উনিশ শতকের নব্বই দশকে। বিবেকানন্দের চিন্তায় যে অনেক আগামী যুগের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে—এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাধীনতাঃ সমাজতন্ত্রের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু মিল, বেন্থাম প্রভৃতি উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মিল প্রভৃতির মতে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের অভাব বোঝায়("Liberty is the absence of restraint")। হার্বার্ট স্পেন্সার [৬৮] আবার আরও এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মতে বল্গাহীন প্রতিযোগিতাই স্বাধীনতার লক্ষণ, এবং তাতে যারা শক্তিমান তারাই টিকে থাকবে ("Survival of the fittest")। বিবেকানন্দের স্বাধীনতার ধারণা এরূপ নেতিবাচক নয়, তাঁর স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ ইতিবাচক। তাঁর ধারণাঃ "আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার

ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব। ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার ; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত।"[৬৯] হার্বার্ট স্পেন্সারের শক্তিমানেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে—(এ তত্ত্বের ভাষ্য রচিত হয়েছিল এইরূপ যে, দরিদ্র ও দুর্বলের উন্নতি করবার প্রচেষ্টা বৃথা, বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতায় তাদের টিকে থাকবার শক্তি নেই) বিবেকানন্দ এ মতের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেনঃ "যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃংখল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ...মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃংখল হইবে!!!

"সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!"[৭০] বিবেকানন্দের এ ধারণা সমাজবাদী, তখনকার দিনে স্বাধীনতা সম্পর্কে এরূপ ইতিবাচক ধারণা অনেকেরই ছিল না।

বেদান্তবাদী হিসাবে বিবেকানন্দ স্বাধীনতার ধারণাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন, সামাজিক নিয়মবন্ধনের বাড়াবাড়ি তিনি অন্যায় মনে করেছেন। তাঁর কথা ছিলঃ "...বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল। ...বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে?"[৭১] সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি সীমিত রাখবার পক্ষপাতী, ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করেননি। কিন্তু স্বাধীনতার এটুকুই সব কথা নয়। ব্যক্তির বিকাশে কোন বাধা থাকবে না— স্বাধীনতার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু বিকাশের জন্য বাস্তব সুবিধাগুলিও ব্যক্তিকে দিতে হবে—এও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিবেকানন্দের স্বাধীনতার ধারণার ভিত্তি প্রথমত স্বাধীন বিকাশের বাধা অপসারণ, দ্বিতীয়ত কতকগুলি বাস্তব অধিকার প্রদান।

অধিকারঃ 'অধিকার' রাজনীতিশাস্ত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিবেকানন্দ এই অধিকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন শিক্ষা, ধনার্জন, ধর্মের সুযোগ প্রভৃতির অধিকার। তাঁর অধিকারবাদের ভিত্তি বেদান্ত। এই বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ "অজ্ঞ, অশক্ত নরনারী সকলেই শুনুক কেউ হীন নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেই সেই সর্ব শক্তিমান অজর অমর অনন্ত আত্মা, সকলেরই বড় হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব ওঠো জাগো, তোমার জন্মগত অধিকার দাবি কর।"[৭২] প্রত্যেকের এই জন্মগত অধিকার লাভেই স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা। জন্মগত অধিকার বলতে সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার অবশ্যই এখানে বোঝাচ্ছে।

সাম্যঃ রাজনীতিশাস্ত্রে বর্তমানে যে ধারণাটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সেটি হল সাম্যের ধারণা। বিবেকানন্দ এই ধারণার উপরে প্রভূত আলোকপাত করেছেন এবং তার দ্বারা এটির নিগূঢ় অর্থসকল উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এটি অধিকতর বাস্তব হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দের বক্তব্য হলঃ "আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক—ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না।"[৭৩] একথা এত সত্য যে, তা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলেই একথা জানি। সৃষ্টির মূল কথা বৈচিত্র্য। সেজন্য বিবেকানন্দ বলছেনঃ "যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন ভেদ ও পার্থক্য বিলয়... অসম্ভব।" তাহলে সাম্যের অর্থ কি? সাম্য কি অর্থহীন কবিকল্পনা? বিবেকানন্দ বলছেন তা নয়, ঐক্যও আছে, ঐক্য না থাকলে বৈচিত্র্য উপলব্ধি সম্ভব নয়। ঐক্য কি রূপ? স্বরূপের ঐক্য। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ "একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বর্তমান ; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ।" তা যদি হয় তাহলে শক্তি প্রকাশের একই সুযোগ সকলকে দিতে হবে। বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিদ্যমান... সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই...। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহা প্রকাশ করিবে।"[৭৪] বিবেকানন্দের এ ধারণার ভিত্তি বেদান্ত, বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ, যার সারকথাঃ "অতি ক্ষুদ্র জীবকোষেও

সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত।"[৭৫] বেদান্তের মতেঃ "একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে।" [৭৬] সুতরাং কেউ ছোট নয়, হীন নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেরই বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বেদান্ত কোন বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না। বেদান্তের এই ভিত্তি থেকে দেখা যায়, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা দূর করা যায় না, কিন্তু বিশেষ অধিকার দূর করা যায়। সুতরাং ঐক্য বা সাম্য বলতে বোঝায় বিশেষ অধিকার বিলোপ। সেজন্য বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করিয়া সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।" তাঁর ব্যাখ্যাটি এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জলঃ "এই-সকল বৈচিত্র্য, পার্থক্য অনন্তকাল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য জীবনের অপরিহার্য সারবস্তু। এভাবেই আমরা অনন্তকাল খেলা করিব। তুমি হইবে ধনী এবং আমি হইব দরিদ্র ; তুমি হইবে বলবান্ এবং আমি হইব দুর্বল ; তুমি হইবে বিদ্বান্ এবং আমি হইব মূর্খ ; তুমি হইবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প অধ্যাত্মপ্রবণ। তাহাতে কি আসে যায়? আমাদিগকে এরূপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আমা অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্ বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাও হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই সমতা বর্তমান।" [৭৭] এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান প্রকৃত সাম্য বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে সেটা বাস্তব হতে পারে। বিশেষ অধিকার ভেঙে দেওয়া, সকলকে সমান মানবিক অধিকার দেওয়া—সাম্যের এই হল প্রকৃত তাৎপর্য এবং এই অর্থেই সাম্য আমাদের সমাজজীবনে বাস্তব হতে পারে। সকলকে একরকম করা যাবে না, কিন্তু সকলকে সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। সাম্য সম্বন্ধে বর্তমানে এই ধারণাই গৃহীত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অর্থেই সাম্যের রূপমণ্ডন-প্রয়াস চলছে।

আমূল রূপান্তর ও বিপ্লবঃ সাম্প্রতিক কালের রাজনীতিতে "বিপ্লবের ধারণা"র আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তার কারণ রাজনীতিশাস্ত্র গড়ে ওঠে বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে। বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত রুশ বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা, বর্তমান কালের রাজনৈতিক চিন্তার ধারা এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একথা

হেগেল বা কান্ট কল্পনায়ও আনতে পারেননি, মার্ক্‌স্‌ শ্রেণী রাষ্ট্রে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলেছেন। বাস্তব রুশ বিপ্লব হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রভৃতিকে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রভাবিত করেছে যে, অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জনগণের আছে। বিবেকানন্দ রুশ বিপ্লবের পূর্বেই একথা লিখেছেন, এবং বিপ্লবের পূর্ববর্তী ইউরোপের অগ্নিগর্ভ অবস্থা গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া বিপ্লবপন্থী ক্রোপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং অসম্ভব নয় আরও কিছু বিপ্লবপন্থীদের চিন্তাধারার সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। সেজন্য বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি একটি নিজস্ব সুস্পষ্ট বিচার দিয়েছেন। যে রক্তাক্ত সংঘাতের ফলে রাষ্ট্র এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য এক শ্রেণীর হাতে যায় পাশ্চাত্যের চিন্তানায়কেরা তাকেই বিপ্লব বলেছেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় তারও উল্লেখ আছে। যেমন এক জায়গায় তিনি বলছেন রাজতন্ত্রের ক্ষমতাচ্যুতি সম্পর্কেঃ "পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ।... যেথায় সমাজ-শরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্র-শালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"[৭৮] এই বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করে তিনি আরও বলছেনঃ "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।... পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"[৭৯]

কিন্তু বিবেকানন্দ বিপ্লব বলতে শুধুমাত্র শ্রেণীক্ষমতা হস্তান্তর বা তজ্জন্য যে রক্তপাত তা বোঝাননি। রক্তপাত বিনাই যে ঘটনা ঘটে—এমন একটি বস্তুকেই বুঝিয়েছেন। বিপ্লব বলতে তিনি বুঝেছেন সমাজের আমূল

রূপান্তর এবং ভারত-ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতে এগুলি ঘটেছে বিনা রক্তপাতে ধর্মপ্লাবনের মধ্য দিয়ে। তাঁর বিশ্লেষণের সারাংশ হল তাঁরই ভাষায়ঃ "ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"[৮০] ধর্মনেতারা ধর্মীয় উপলব্ধির মধ্যে জগৎ ও জীবকুলের ঐক্য অনুভব করে সকলকে সমানাধিকার দিতে অগ্রসর হন, তখন তাঁদের পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এরকম ভাবে তাঁরা বিশেষ সুবিধা ভেঙে ফেলতে সহায় হন। জনগণের তাতে মানবিক অধিকার লাভ ঘটে। এই পরিণতি যখন ঘটে তখন মূল্যবোধেও একটি বিপুল পরিবর্তন হয়। সকলের সমান অধিকারকে যখন লোকে মূল্যমানে স্থান দেয়, প্রকৃতপক্ষে তখনই বিপ্লব ঠিক ঠিক সাধিত হয়। বিবেকানন্দ এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন জনগণের সমানাধিকারের স্বীকৃতি ঘটার নামই বিপ্লব, তা রক্ত-পাতের মাধ্যমেও ঘটতে পারে, আবার ধর্মপ্লাবনের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্লাবনের মাধ্যমে ঘটলেও বিশেষ সুবিধা যারা ভোগ করছে তারা তা ছাড়তে চায় না বলে হয়তো সংঘর্ষ কিছু কিছু অনিবার্য হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। কিন্তু রক্তপাতই বিপ্লব নয়, বিপ্লব মূল্যবোধের আমূল রূপান্তর এবং জনগণের অধিকার লাভ। বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণে যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল বিবেকানন্দ তাকে বিপ্লব বলেননি, বলেছেন বুদ্ধ-দেবের বিশেষ সুবিধাকে ভেঙে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে। বিষয়টি ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বলছেনঃ "পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম-কাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত?"[৮১] এখানে "বৌদ্ধ বিপ্লব" কথাটি বিশেষ লক্ষণীয়। ধর্মের এই বৈপ্লবিক ভূমিকা ইতিপূর্বে আর কোনও সমাজবিজ্ঞানী উদ্ঘাটিত করেননি। এটি বিবেকানন্দের সমাজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সবচেয়ে চমকপ্রদ উদ্ঘাটন এ বিষয়ে হল এই কথা যে, শুধু ধর্মের নয় বিপ্লবসাধনে জড়বাদেরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এ তথ্য

বিবেকানন্দ তাঁর ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৌরোহিত্যের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য জনসাধারণ জড়বাদ বরণ করেছে। বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

"সাধারণ মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত ; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়-বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।"[৮২] কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় দেখা যায় এরূপ ঘটে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় ধর্মপ্লাবন ঘটে।

কিন্তু কোন বিপ্লবই সমাজ থেকে অসাম্যকে চিরতরে দূর করতে পারেনি। ভারতবর্ষে "ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেনঃ "সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"[৮৩] অতীত ইতিহাসেই নয়, ভবিষ্যতেও সমস্যার একেবারে সমাধান কোন দিন হওয়া সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ বলছেনঃ "দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে ; একটি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে একটি সুবিধার সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙিয়া যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে।"[৮৪] এই উক্তি বিবেকানন্দের অসামান্য বাস্তবদৃষ্টির প্রমাণ। একেবারে অসাম্য যদি দূর হয়, পূর্ণ সাম্য স্থাপিত হয়, তাহলে চলমান জগতের চলাই বন্ধ হয়ে যায়। সমাজ তো চির-পরিবর্তনশীল, তার বিবর্তন তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং কোন বিপ্লবই সমাজে পূর্ণ সাম্য আনতে পারে না।

ধর্মের বৈপ্লবিক ভূমিকা নির্দেশ করে বিবেকানন্দ সমাজবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন যার অপরিসীম মূল্য রয়েছে মানবকল্যাণ সাধনে।

পারস্পরিক সাহায্য (Mutual Aid) ও বিপ্লবের ধারণাঃ বিবেকানন্দের

রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় আশ্চর্য রকম বিপরীত আদর্শসকলের সমন্বয় ঘটেছে। সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্ম ও সমাজতন্ত্র, ধর্ম ও বিপ্লব ইত্যাদি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বিবেকানন্দের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল্ল নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক প্রিন্স ক্রোপটকিনের ধারণা "Mutual Aid" (পারস্পরিক সাহায্যের ধারণা)-এর অনুরূপ। নিবেদিতা লিখেছেন যে, নরমাংসখাদক কোন জাতির কথা কোন একজন পাশ্চাত্যদেশীয়ের নিকট শুনে বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "সমাজবদ্ধ জীবের ব্যবহার এরূপ হয় না, কারণ এরূপ আচরণ সমাজবদ্ধ জীবনের মূলে আঘাত করে।"[৮৫] নিবেদিতা এর উপর মন্তব্য করেনঃ "যখন একথাগুলি বলা হয়েছিল তখন ক্রোপটকিনের "Mutual Aid" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মানবপ্রেম ও তাঁর একটি সহজাত ধারণা যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড়, তাঁকে এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করেছিল।"[৮৬]

বিবেকানন্দের মতেঃ ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের মাধ্যমে তাকে টিকে থাকতে হয়। ডারউইনের মতবাদ এ পর্যন্ত সত্য। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের যুক্তির বিকাশেই বিকাশ, মানুষ সেজন্য অপরকে ধ্বংস করে টিকে থাকতে তাগিদ অনুভব করে না, মানুষকে বরং দেখা যায় অপরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে। এই অপরের জন্য ত্যাগ-প্রবৃত্তিই মানুষকে ইতর জীবজন্তুর থেকে পৃথক করেছে।

বস্তুত ডারউইনের জীবনসংগ্রাম-তত্ত্বই মার্ক্‌স্‌কে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল তাঁর বিপ্লবের ধারণা গঠনে। সেজন্য তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ তা বলেননি। তিনি বলেছেন দৃঢ়কণ্ঠে একথাঃ "হাজার প্রাণীর প্রাণসংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা থেকে জগতে পাপই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে, জগতে আর পাপ থাকে না।" তাছাড়া তিনি বারবারই বলেছেনঃ "আমি বিকাশে বিশ্বাসী (I believe in growth)।" একটি বীজই কালে মহামহীরুহ হয়ে ওঠে। তিনি সেজন্য চেয়েছেন জনগণকে শিক্ষা দিতে, তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে। তারপর তাদের ভাগ্য তারাই নির্ধারণ করবে, সেটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলজনক—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাঃ রাজনীতিশাস্ত্রের এই দুটি ধারণার উপরও বিবেকানন্দের অসাধারণ মননের আলোক পড়েছে এবং তাদের পুষ্টি

ঘটিয়েছে। তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথা সর্বজনবিদিত। নিবেদিতা লিখেছেনঃ 'তাঁর আরাধ্য দেবী ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি।"[৮৭] "ভারতের সীমানায় উত্থিত এমন একটিও দুঃখবেদনা ছিল না, যা তাঁর হৃদয়ে বাজেনি।"[৮৮] ভারতকে তিনি দিয়েছিলেন একটি মহামন্ত্র—স্বদেশমন্ত্র নামে যেটি খ্যাত। সেই সর্বজনবিদিত স্বদেশমন্ত্রের মধ্যে তাঁর অপূর্ব জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত। সেজন্য এখানে সেটি আমাদের বিশেষ বিবেচ্য। এই স্বদেশমন্ত্রে প্রথমে তিনি বলেছেনঃ "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"[৮৯] এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা যে জাতীয়তা উপলব্ধির উপজীব্য জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ, পরানুকরণ দ্বারা কখনও এই স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগতে পারে না। একমাত্র জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরববোধই সেই স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি এনে দিতে পারে। সেজন্য তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন সে ঐতিহ্যঃ "ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর...।"[৯০] ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য পবিত্রতা ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। ভারতের ধর্ম, ভাষা, আচার আচরণ প্রভৃতিতে অনন্ত বৈচিত্র্য, কিন্তু ঐক্য এই দুটি জাতীয় আদর্শের ক্ষেত্রে। এই ঐক্যবোধই জাতীয়তাবোধের মূলভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। জাতীয়ত্বের ধারণায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশমন্ত্রে বলেছেনঃ "ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"[৯১] বিবেকানন্দ জাতীয় ঐক্যের একটি নূতন তাৎপর্য এখানে যুক্ত করলেন, এ তাৎপর্য তাঁরই আবিষ্কার। জাতি যে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীকে, অগণিত সাধারণ মানুষকে নিয়ে, একথা তাঁর পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনও জাতীয়তাবাদের প্রচারক এমন করে বলেননি। এখানে বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন। বিপরীত আদর্শের মধ্যে এমন আশ্চর্য ঐক্যের কথা আর কোন মনীষী ভাবতে পারেননি।

সমাজতন্ত্রবাদীরা সাধারণত জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণতাবাচক বলে বর্জন করে থাকেন।

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হল এতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। একটি আলোচনায় তিনি বলেছেনঃ "বর্তমানকালে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্চে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অস্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা...।"[৯২] সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ভাষা ধর্ম প্রভৃতির ঐক্য এবং তার ফলশ্রুতি ঐ ঐক্যের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠনের দাবি, তার পরিণাম যে যুদ্ধ ও এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ, বিবেকানন্দ তা এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

"বৈচিত্র্যে একত্ব" তত্ত্বে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সকল জাতির বৈশিষ্ট্য ও মহিমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। নিবেদিতা এ সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করে বলছেনঃ

"Thus a nationality, in the Swami's eyes, had all the sacredness of a church,—a church whose inmost striving was to express its own conception of ideal manhood" [৯৩]

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানবতা সম্পর্কে নিজের ধারণাকে প্রকাশ করছে, সেজন্য প্রতিটি জাতির মধ্যে একই মানবতার প্রকাশ দেখে মানুষ হিসাবে মানুষের মহিমায় গৌরব বোধ করেছেন। দেখা যাচ্ছে জাতীয়তাবাদ আপনা থেকেই বিবেকানন্দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার উদার আদর্শে উন্নীত। এজন্যই জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেনঃ "সত্যই আমার একমাত্র উপাস্য আর বিশ্বই আমার মাতৃভূমি।"

আমরা জানি রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সমগ্র জীবকুলকে এক করেছিল, জন্ম দিয়েছিল এক মহামানবতার। বিবেকানন্দ তারই ভিত্তিতে—রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়ঃ "গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন এক মানবতার মহানগরী।" বিবেকানন্দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের সেই মহান স্বপ্নটিই বাস্তব রূপ পেতে চেয়েছে, যে স্বপ্নের কথা রাজনীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

"Parliament of man and federation of the World".

কোনদিন সব মানুষ একটি রাষ্ট্র গড়বে এ হয়তো স্বপ্ন, কিন্তু সকল জাতীয় রাষ্ট্র যে নিজ নিজ পৃথক বৈচিত্র্যময় অস্তিত্ব রক্ষা করেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পরস্পরকে সহায়তা করে চলতে পারে—এ স্বপ্ন অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য আসতে পারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। বিবেকানন্দ সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন। যেমন তিনি ভেবেছিলেন যে, ভারতকে পাশ্চাত্য দেশ দেবে প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞানের জ্ঞান, ভারত পাশ্চাত্য দেশকে বিনিময়ে দেবে অধ্যাত্মবিদ্যা। এই ভাবে পরা অপরা বিদ্যার সম্মিলনে সমগ্র পৃথিবী এক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনৈতিক চিন্তা

পটভূমিকা—ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশঃ আধুনিক কালে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি আদি প্রবর্তক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন। তাঁরা হলেন—দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। এঁরা সকলেই লিখেছেন উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এঁদের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে রামমোহনের মধ্যে এবং রামমোহনের পরবর্তী নবজাগরণের অপর দুই বিরাট স্রষ্টাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মধ্যে এ চিন্তার আরও পরিণত বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে নবজাগরণের এই তিন বিরাট স্রষ্টাপুরুষকে স্বীকৃতি দেওয়া ঐতিহাসিকের অবশ্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয় ভারতে এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে প্রায় কোন রকম গবেষণা হয়নি। একটিমাত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা[১] এ বিষয়ে আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেটি হল আধুনিক ভারতের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত রচিত। এই পুস্তিকায় ডঃ দত্ত রামমোহনকে স্বীকৃতি প্রদান অন্তে মন্তব্য করেছেনঃ "অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে নেতৃত্ব দিলেন, তাকে অনুসরণ করে ঊনবিংশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে আর কেউ এগিয়ে এলেন না এই ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা রাখতে। নবজাগ্রত ভারতের মনীষা জন স্টুয়ার্ট মিল ও বেন্থাম প্রভৃতির চিন্তার দ্বারা পুষ্ট হলেও ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়নি। সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে একেবারে শেষভাগে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসতে হয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তার স্ফুরণ দেখবার জন্য। এই সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে। অর্থনৈতিক সমস্যাদি সম্বন্ধে আগ্রহ রাজনৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সময়ে সময়োপযোগী আর্থিক আদর্শগুলিকে রূপ দিলেন নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও রাণাডে।"[২] ডঃ দত্তের এ মন্তব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ্‌দের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। কারণ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে অবিচ্ছেদ্য ধারায় শেষার্ধ অবধি অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ধারার এক প্রান্তে রয়েছেন রামমোহন অপর প্রান্তে বিবেকানন্দ।

রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্বর্তী কালঃ পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ শাসকেরা যে ভূমিস্বত্ব নীতি অনুসরণ করতে থাকে তারই প্রতিবাদে দেশের নানাস্থানে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ঘটে—তাঁতী মালঙ্গীদের বিদ্রোহ, বাঁকুড়ার চাষী-বিদ্রোহ, মেদিনীপুরের চুয়ার-বিদ্রোহ, দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। ১৮৫৮—১৮৬০ সালে ঘটে বিখ্যাত নীল-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে কৃষকদের অবস্থা ও কৃষিনীতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ১৮৩১ সালে রামমোহন ইংলন্ডে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৮৩৩ সালে পুনর্বার সনদ দেওয়া হবে কিনা এই প্রশ্নে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কৃষকদের উপর গুরু করভারের প্রতিবাদ জানান। এইসময় বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের জন্ম হয়। বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই সংবাদপত্রগুলি পালন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামমোহনের "সংবাদ কৌমুদী", ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর", "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" (ইয়ংবেঙ্গলের), "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং শিশিরকুমার ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা"র ভূমিকা।

একমাত্র "সংবাদ প্রভাকর"-ই ৯ই এপ্রিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মোট ৬০টি অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটির শিরোনামাঃ "ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লোন ও ডিসকাউন্ট বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি", "শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য", 'সুদ', "কৃষকদের সমস্যা", "লবণ বাণিজ্য", 'স্বর্ণমুদ্রা', "নীলকরদের অত্যাচার", "বঙ্গের কৃষকদের অবস্থা", 'বাজেট', "বঙ্গীয় বাণিজ্য"। অন্যান্য পত্রিকায়ও অনুরূপ প্রবন্ধ লেখা হত। যথা ১৮৮১—১৮৯৭ সালে কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বঙ্গবাসী পত্রিকা" যে সমস্ত মত প্রকাশ করেছে সেগুলি হলঃ ইংলন্ডের শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্যে ধ্বংস এনেছে, অতিরিক্ত উচ্চ কর বসিয়ে কারুশিল্পীদের শোষণ করা হয়েছে, পরিণামে হয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য। এ ছাড়াও ভূমিরাজস্বের উচ্চ হার, ইউরোপীয় কর্মচারীদের উচ্চ বেতন, বস্ত্র শিল্পের উপর আমদানী-কর বর্জনের অযৌক্তিকতা, শ্রম-আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৩] ১৮৮৯–১৮৯০ সালের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। পাটকল শ্রমিকদের মধ্যে এ সময় কাজ করছিলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ভারতের প্রথম শ্রমিকদের মুখপত্র "ভারতে শ্রমজীবী" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নীল-আন্দোলনের সময় তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হয় কৃষকদের নিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "Hindu Patriot" ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Bengalee' পত্রিকায়। বোম্বাইয়ে নারায়ণ মেঘজী লোখান্ডে 'দীনবন্ধু' নামক অপর একটি শ্রমজীবীদের পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পত্রিকা ছাড়াও কৃষক-শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে এবং সাধারণভাবে উচ্চ খাজনা ও কর, শিল্প-বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও মত প্রকাশ করত বিভিন্ন সংস্থা। যথা—"জমিদার সভা", "British Indian Association (1837)", "Indian Association (1875)", "শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪)", "বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা (১৮৬৬)"। ১৮৬৭—১৮৮০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় ভারতের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হত, মূল লক্ষ্য ছিল উক্ত শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন। ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয় "National Society"। এই সংস্থার মুখপত্র ছিল National দৈনিক পত্রিকা। এ পত্রিকা নবগোপাল মিত্রের পরিচালনায় বহুবিধ অর্থ-নৈতিক সমস্যা—বিশেষ করে হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছে। হিন্দুমেলা সংগঠনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের

মধ্যে স্মরণীয় নাম রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। এর কিছুকাল পরেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে।

উপরে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালের অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস [৪] বর্ণিত হয়েছে। এই ইতিহাস গড়ে উঠেছে বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ভারতের দারিদ্র্য, ব্রিটিশ শোষণ, কৃষকদের উপর গুরু করভার, শ্রমিকদের অমানুষিক অবস্থা প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার উপর এযুগে সংবাদপত্র ও সংস্থাদির মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পটভূমিকা রচিত হয়।

উনিশ শতকের অর্থনৈতিক চিন্তার মুখ্য নায়কগণঃ উনিশ শতকের অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে বহু মনীষীর অবদান রয়েছে, এ আমরা উপরে দেখেছি। এঁদের মধ্যে মুখ্য অবদান যাঁদের, অর্থাৎ যাঁরা এ চিন্তায় মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং অন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা হলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—নবজাগরণের তিন মহানায়ক, আর দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। এঁদের মধ্যে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দকে এ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, অন্যদের দেওয়া হয়েছে।

উনিশ শতকের অর্থনীতি বিষয়ের প্রধান চিন্তাবিদ্‌দের সকলেরই চিন্তা তদানীন্তন কালের মুখ্য সমস্যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। অধিকাংশই কৃষি-অর্থনীতি বা কৃষকদের সমস্যা নিয়েই কেবল আলোচনা করেছেন। রাম-মোহন তৎকালীন কৃষি-অর্থনীতির সমস্যার মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রাণাডে কিছু কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। দাদাভাই নওরোজী ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রথম চেষ্টা করে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন, তাত্ত্বিক বিষয়ে তিনি অনুপ্রবেশ করেননি। কিন্তু রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যেসকল ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন, তা অনেক পরবর্তী লেখক রমেশচন্দ্রের নিকট ধরা পড়েনি। রামমোহনের পক্ষে সেকালে বিলাস-দ্রব্যের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব সত্যই অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক। রমেশ-

চন্দ্রের অবদান ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা আলোচনার ভিত্তি স্থাপনায়। রাণাডে পাশ্চাত্য অর্থনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিচয় গভীর ছিল না, সেজন্য জনসংখ্যা-বহুলতা ও বিপুল বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি বড়বহরের জোতে চাষ করবার কথা বলেছেন।

উল্লিখিত চিন্তাবিদ্‌গণ ও স্বামী বিবেকানন্দঃ উনিশ শতকের শেষপাদে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর চিন্তার দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, তিনি ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলদেশ অবধি যেভাবে পেঁাছেছিলেন তা অপর কেউ পারেননি। দ্বিতীয়, তিনি শুধু ভারতের সমস্যারই নয়, পাশ্চাত্যের তথা সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে পেঁাছাতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁর চিন্তায় যে গভীরতা ও প্রসারতা দেখি তা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত। সর্বোপরি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে তা এখানেও লক্ষিত হয়। সেটি হল এই যে, তিনি দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, আগামীকালের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, রূপ পেয়েছে তাঁর ভাষণে ও রচনায়। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর অবদানের মূল্য সবচেয়ে বেশী এবং তিনি অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন।

একথাও এখানে স্মরণযোগ্য যে, রাণাডে প্রভৃতি যে রাজনৈতিক সচেতনতায় জাগ্রত হয়ে কালোপযোগী অর্থনৈতিক আদর্শসকল দিয়েছিলেন, সেই সচেতনতা আনয়নে বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী—যেকথা আজ ঐতিহাসিকেরা কম-বেশী স্বীকার করেন। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতেই নয়, কালোপযোগী অর্থনৈতিক আদর্শের রূপায়ণেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজ আরও ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত একথা বলা সম্ভব নয়, এঁরা কে কতখানি বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে হয়েছিলেন তা মনে করার সংগত কারণ আছে। এঁরা চিন্তার বিস্তার করেছেন, বিবেকানন্দ সে চিন্তার বীজ ছড়িয়েছিলেন। যাই হোক, ব্যাপক গবেষণা ব্যতীত জোর করে কিছু বলা সাজে না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চিন্তার যে শিখরে তাঁর অগ্রগামী চিন্তা-নায়কেরা পেঁাছেছিলেন, যেখানে তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

উপরোক্ত কথাগুলি অতিশয়োক্তি বলে মনে হতেই পারে, কারণ বিবেকানন্দকে আমরা ধর্মাচার্য বলেই জানি, এবং মুখ্যত তিনি তাই-ই। তাঁর যে অর্থনৈতিক চিন্তা থাকতে পারে, এ আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল কালকে এগিয়ে নেবার জন্য, সেজন্য পৃথিবীর কোন

সমস্যা—এমন কি অর্থনৈতিক সমস্যাও তাঁর চিন্তা-পরিধির বহির্ভূত থাকতে পারেনি। তাছাড়া আক্ষরিক অর্থে তিনি সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, অর্থ-নীতিশাস্ত্রেও সত্যই তাঁর রীতিমতো অধিকার ছিল। উপরন্তু, বাস্তব জীবন থেকে তিনি অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমা-কালে। সর্বোপরি, ইতিহাসে তিনি ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। সেজন্য তিনি সেকালের ভারতের অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের অতিক্রম করে আরও বহুদূর অগ্রসর হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমাদের আজকের ধারণা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তাঁর চিন্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন এরকম লোকের সংখ্যা অধিক নেই। সেজন্য অর্থনীতিশাস্ত্রে তাঁর কতখানি অধিকার ছিল সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই। এই কারণে অর্থনৈতিক আলোচনায় তাঁকে বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে একথা আমরা ভাবতেই পারি না, যেজন্য ডঃ ভবতোষ দত্তের মতো মহাপণ্ডিত ব্যক্তিরও এ বিভ্রান্তি ঘটেছে যে, রামমোহনের পর নবজাগরণের অপর কোন চিন্তানায়ক অর্থনীতি বিষয়ে কোন চিন্তা রাখেননি ; তাঁদের চিন্তা সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস চর্চাতেই সীমাবদ্ধ।

বিবেকানন্দের অর্থনীতিশাস্ত্রে জ্ঞানঃ বিবেকানন্দের জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি মিল, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের লেখা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মতো পাঠক মিল প্রভৃতির অর্থনীতি বিষয়ক রচনাদিও নিশ্চয়ই পাঠ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকারেরা এ বিষয়ে আমাদের খুব বেশী আলোকিত করতে পারেননি। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা তথ্যাদি পাই অন্য সূত্র হতে।

অর্থশাস্ত্রে তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান কত সুগভীর ছিল তা পাশ্চাত্য দেশীয় এরিক হ্যামন্ড (Eric Hammond)-এর স্মৃতিচারণায় আমরা পাই। বিবেকা-নন্দের অনন্য ভাষণ প্রথম শোনার সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

"Swamiji soon showed that he was equally versed in history and political economy. He stood among these people on their own ground". [৫]

অর্থনীতিশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান কত প্রগাঢ় ছিল সে বিষয়ে অপর একটি প্রমাণ হলঃ আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীদের সংস্থা American Social Science

Association -এর বার্ষিক সম্মেলনে ধর্মমহাসভায় খ্যাতি অর্জনের পূর্বেই তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে যে বক্তৃতাটি ঐ সম্মেলনে দেন তার বিষয়বস্তু ছিল "ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার"। সেদিন সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিল "অর্থের মান হিসাবে দ্বিধাতু" (Bimetallism)। এ বিষয়ে মেরী লুই বার্ক যেসকল তথ্য আমাদের দিয়েছেন[৬] তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেদিনের মুখ্য বক্তা Col. Jacob L. Greene বলেন, দ্বিধাতুতত্ত্ব (Bimetallism) বিষয়ে, Dr. C. B. Spahr রৌপ্যের মর্যাদা (Status of Silver), E. Benjamin Andrews ভারতে অর্থের মান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (The Monetary experiment in India) বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। দেখা যাচ্ছে যে, সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থনীতির একটি দুরূহতম বিষয়—অর্থবিষয়ক তত্ত্ব (Monetary Economics)। আর সেই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মহলে ভাষণ দিয়ে সেদিন সংবাদপত্রসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বিবেকানন্দ। "Money was the subject" শিরোনামায় Daily Saratogian নামক দৈনিক পত্রিকা মন্তব্য করেনঃ

"At the conclusion of the reading (of papers) Vivekananda, the Hindoo monk addressed the audience in an intelligent and interesting manner, taking for his subject the use of silver in India".[৭] একথা নিশ্চিত সত্য যে, অর্থতত্ত্বে (Monetary Economics) রীতিমতো দখল না থাকলে তিনি উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সম্মুখে ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে কখনই পারতেন না। তিনি যে শুধু তাঁদের সামনে বলেছেন তা নয়, তিনি সেখানে বলে সংবাদপত্রের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

বাস্তব জীবন থেকে পাঠ গ্রহণঃ বিবেকানন্দ তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবলমাত্র গ্রন্থ থেকে আহরণ করেননি, বাস্তব জীবন থেকেও তিনি এ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনি জনজীবনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্যঃ "তাঁহার জীবনে (পরিব্রাজক জীবনে) আর এমন একটি মুহূর্তও রহিল না, যখন তিনি গ্রামে ও নগরে, কি ধনী, কি দরিদ্র জীবিত নরনারীর দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়-অবিচার, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিতে পারিলেন। ...জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া

ধরিল।...বিদ্বজ্জনের বিদ্যার সহিত যেমন ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি, তাহার সম্পর্কেও তাঁহার ছিল তেমনি পরিপূর্ণ চেতনা।"[৮] এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। উত্তর ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে পরিভ্রমণকালে যখন লক্ষ্ণৌতে উপনীত হয়েছেন তখন স্বামীজী তাঁদের লক্ষ্ণৌ শহরের শিল্প ও বিলাসদ্রব্য-উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য কৃষি-ব্যবস্থাও পর্যালোচনা করেনঃ

"The industries and luxuries of Lucknow must needs be dwelt upon . . . Perhaps nowhere did his love seem . . . more intense, than as we passed across the long stretches of the Plains covered with fields and farms and villages. Here his thought was free to brood over the land as a whole and he would spend hours explaining the communal system of agriculture, or describing the daily life of the farm housewife — It was the memory, doubtless, of his own days as a wanderer, that so brightened his eyes and thrilled in his voice, as he told us these things".[৯]

তাঁর বর্ণনা শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন--নিবেদিতা এ মন্তব্যও করেছেন।

বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা কালে ভারতের আর্থিক অবস্থাঃ বিবেকানন্দ যে সময় ভারত পরিক্রমা করছিলেন, তখন ছিল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক মহাসংকটের কাল। ইংরেজ শাসকেরা ভূমিস্বত্ব ও খাজনা সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করছিল প্রধানত তারই ফলে ভারতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০) পর থেকে ইংরেজি ১৯০০ সাল পর্যন্ত শতাধিক বর্ষব্যাপী একটানা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। প্রায় প্রতি বৎসর কোন না কোন অঞ্চল, অধিকাংশ সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়েছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। বিবেকানন্দেব ভারত-ভ্রমণকাল ১৮৮৮—১৮৯৩, এ সময়ে যেসকল দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৮৮—৮৯ সালের গঞ্জাম জেলায় বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৯১—৯২ সালের আজমীড়-মারওয়ারের ও মাদ্রাজের মধ্যাঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লক্ষ লক্ষ

লোকের দুর্গতির অন্ত ছিল না। গুরুভার খাজনা, শিল্পগুলির অবক্ষয়ের ফলে জমির উপর জনচাপ বৃদ্ধি, সেচ-ব্যবস্থার অভাব, মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং যারা মৃত্যুর কবলে পড়েনি তারা জীর্ণ শীর্ণ নিঃসম্বল ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল। সারা ভারতব্যাপী এদের সংখ্যা ছিল কয়েক কোটি।

দেখা যায়, ১৮৯১ সালের জুলাই মাস থেকে এপ্রিল ১৮৯২-র মধ্যে বিবেকানন্দ আজমীড়-মারওয়ারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে করতে অবশেষে গুজরাটে এসে উপনীত হন, ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি বেলগাঁওয়ে পেঁছান।[১০] এই দীর্ঘ ভ্রমণপথে বলা যায় যে তিনি জনজীবনের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। করাল দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপনীত লক্ষ লক্ষ উপায়হীন নরনারীর অশেষ দুর্গতি প্রত্যক্ষ করতে করতে, তাদের অনাহারের ভাগ্যে অংশ গ্রহণ করতে করতে তিনি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। ১৮৯২-র শেষে তিনি মাদ্রাজে এসে পেঁছালেন, তখন সেখানেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে করাল দুর্ভিক্ষের ছায়া বিরাজ করছে। এই অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য ও অবিচার তাঁর হৃদয়কে অগ্নিময় করে তুলেছিল।[১১]

১৮৯২ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিবেকানন্দ বোম্বাই শহরে এসেছিলেন।[১২] ১৮৫০ সালের পরবর্তীকাল ভারতে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের কাল। কিন্তু তখন শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। ১৮৮১ সালে প্রথম শ্রমিক আইন পাশ, ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় শ্রমিক আইন। কিন্তু শ্রমিকদের তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ১৮৭৫ সাল থেকে বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মবিরতি হতে থাকে। ১৮৯০ সালে প্রথম শ্রমিকসংস্থা "Bombay Millhands' Association" গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৫-তে লোখাণ্ডে প্রকাশ করেন 'দীনবন্ধু' নামক শ্রমিকদের প্রথম সংবাদপত্র।[১৩] বিবেকানন্দের মতো তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এই সকল ঘটনাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করেনি। মেরী লুই বার্ক লিখেছেনঃ আমেরিকার মধ্যাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অবস্থা জানতে প্রয়াস করেছিলেন। এ প্রচেষ্টা তিনি নিশ্চিতই নিজের দেশেও করেছিলেন।[১৪]

দেখা যাচ্ছে, জীবনের মহাগ্রন্থ থেকে বিবেকানন্দ অর্থনীতির যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, তা লাভ করার সুযোগ ছিল না সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের, বা উচ্চশ্রেণীর সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী দাদাভাই নওরোজীর, উচ্চ বর্ণের উচ্চপদস্থ রাণাডের, বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের। রমেশ দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের যেটুকু অভিজ্ঞতা জনজীবন সম্পর্কে হয়েছিল, তাই তাঁদের গ্রন্থরচনার ভিত্তি। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার তুলনায় তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ ও কৃষি-শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টাঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দের হৃদয় জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের সংস্পর্শে এসে অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। তিনি দেশীয় রাজাদের এ বিষয়ে অবহিত করে উন্নয়নমূলক কাজে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর জনৈক জীবনীকার এ বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেনঃ "জুনাগড়ের দেওয়ানের ন্যায়, এই (ভুজের) দেওয়ানের সহিতও স্বামীজী রাজ্যের কৃষি, শিল্প ও আর্থিক সমস্যা সকলের এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।"[১৫] সংবাদটি এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনার উপর আলোকপাত করছে। দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণ কালে তিনি এসকল সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তারই ভিত্তিতে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন, সেটি তিনি দেশীয় রাজাদের বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন।

অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশীয় রাজা বা অভিজাত শ্রেণী জনসাধারণের আর্থিক উন্নয়ন ব্যাপারে কিছু করতে আগ্রহী নন। তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেছেন একটি চিঠিতে ঃ "কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিষ্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি।"[১৬] দরিদ্র জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য অতঃপর তিনি যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রয়াস করেন। এ বিষয়ে অপর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেনঃ "আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।...... ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং

যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।"[১৭] দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে ভারতের জনগণের আর্থিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি গ্রন্থরচনার কাজে লাগাতে প্রবৃত্ত হননি। তিনি সৈনিক, সেজন্য কর্মপ্রয়াসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন। তিনি গ্রন্থরচনা না করলেও তাঁর কর্মপ্রয়াস থেকেই আমরা তাঁর অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। অবশ্য তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকেও আমরা এ ধারণা পাই।

পাশ্চাত্যের জনজীবন থেকে অর্থনীতির পাঠ গ্রহণঃ কিন্তু কেবলমাত্র ভারতেই নয়, পাশ্চাত্যেও বিবেকানন্দ জনজীবন থেকে বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে মেরী লুই বার্ক যে আলোকপাত করেছেন প্রসঙ্গক্রমে তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।[১৮]

সেজন্যই দেখা যায়, উনিশ শতকের অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক বেশী। তিনি শুধু ভারতের আর্থিক সমস্যা সমাধানের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন পাশ্চাত্য তথা আজকের পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথাও। বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিবিড় ও ব্যাপক পরিচয় থাকায় তাঁর চিন্তায় একটি অনন্য স্বকীয়তা বা মৌলিকত্ব দেখতে পাওয়া যায় যা আজকের দিনের ভারতেও বিরল। বিদেশী গ্রন্থের চর্বিতচর্বণই আমাদের অধিকাংশ অর্থনীতি চর্চার মূল বৈশিষ্ট্য ও গৌরব। অনেকেই বিচার না করে সম্পূর্ণ অন্য পরিস্থিতিতে যা উপযোগী তা ভারতের জন্য সুপারিশ করেছেন, এমন কি রাণাডেও, কিন্তু বিবেকানন্দ তা করেননি, বাস্তব সমস্যার রূপ অনুযায়ী তিনি সমাধান দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তা শুধু নয়, যেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তাঁর চিন্তা কালের সীমা অতিক্রম করে ভাবীকালকে প্রতিফলিত করেছে, রূপ দিয়েছে। সেদিক থেকে উনিশ শতকের অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌দের তুলনায় তাঁর চিন্তা অনেক সুগঠিত, সুপরিণত ও আধুনিক কালোপযোগী। তবে তিনি যা বলেছেন তা অতি সংক্ষেপে, সূত্রাকারে, স্বল্পকালের গঠনমূলক কর্মে ব্যস্ত তাঁর পক্ষে বিস্তার করবার সময় বা সুযোগ ছিল না। তিনি শুধু তত্ত্বপ্রণেতা বা ব্যাখ্যাতা নন, তিনি ভাবীকালের

রূপকার। তাঁর ভূমিকা স্বতন্ত্র। সেজন্য অতি সংক্ষেপে তিনি যা বলেছেন, তা ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে। এও একটা কারণ, যার জন্য তাঁর এক্ষেত্রের চিন্তা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

শ্রম ও শ্রমবিভাগঃ বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অর্থনীতির পাঠ গ্রহণ করায় যে সমস্যাটি আজকের যুগে কঠিনতম বলে মনে হয়, সেটিই বিবেকানন্দের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে, সকল সময় তাঁর চেতনায় জাগ্রত থেকেছে--সেটি হল ভারত তথা সারা পৃথিবী ব্যাপী শ্রমিক বা শূদ্রশ্রেণীর অবস্থা। বিবেকানন্দ শ্রমকে উৎপাদনের মুখ্য উপাদান বলে মনে করেছেন এবং শ্রমিককে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী বলে অভিহিত করেছেন। শ্রমিকদের কোন সমস্যাই বোধ হয় তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। যেমন, বড়বহরে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রমবিভাগ ঘটে, তার ফলে শ্রমিকদের জীবনে যে সমস্যা দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলছেনঃ "মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি ক'রে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে--এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু পেছুই কচ্চে--আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়।"[১৯] তিনি এখানে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার দুটি মূল ত্রুটি তুলে ধরেছেন, দুটিই শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। একটি হল, উৎপাদনের একটি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ সম্পন্ন করায় শ্রমিকের বর্তমান কাজটি চলে গেলে পরিণাম বেকারত্ব, দ্বিতীয়, এইরূপ একটি আংশিক কাজ যন্ত্রের মতো সম্পন্ন করতে হয় বলে শ্রমিকের সৃজনী শক্তি লোপ পায়, বুদ্ধি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তার কুশলতা লোপ পায়।

উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে যে অগণিত সাধারণ ব্যক্তির অবদান রয়েছে সেই বিষয়টি সুন্দররূপে তুলে ধরে তিনি বলছেনঃ "এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল...কলকারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়—সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাঁকচ হোঁকচ গোরুর গাড়ী থেকে 'জয় জগন্নাথে'র রথ পর্যন্ত, সুতো-কাটা চরকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে

তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরী হ'ল...। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে?"[২০]

শ্রমিকের মজুরী ও সন্ন্যাসীর বাস্তব দৃষ্টিঃ বিবেকানন্দের কোন বিষয়ের আলোচনাই নিছক তাত্ত্বিক পর্যায়ে আবদ্ধ থাকেনি, তার বাস্তব দিক বা সমস্যার দিকে তিনি সকল সময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। সেজন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবদান ও তাদের সমস্যার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। তিনি বলছেনঃ "ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য-জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?"[২১] এখানে বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে শুধু বাস্তবাশ্রয়ী তা নয়, ইতিহাসাশ্রয়ীও বটে। একদিকে যেমন তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন এ তত্ত্ব যে, শ্রমিকের মজুরী তার পরিশ্রমের ফলের সমান নয়, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী—অনুৎপাদক শ্রেণী তাদের তা থেকে বঞ্চিত করেছে, অপরদিকে তুলে ধরেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য যে ভারতীয় শ্রমিকদের উৎপাদিত সম্পদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে। তাঁর মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতির ও ইতিহাসের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটায় তিনি শ্রমিক শোষণের স্বরূপ যুগ যুগ ধরে যা চলেছে এদেশে ও অন্যত্র, যা আজও চলেছে তার স্বরূপ কি—তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এদিকে আরও আলোকপাত করে তিনি বলেছেনঃ "ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব—সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত।...এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত—নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না।"[২২]

ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনঃ সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে শ্রমিক শোষণের উপরে এবং অধিকৃত দেশগুলির সমস্ত সম্পদ হরণ করে—তিনি অতি সুস্পষ্ট তা দেখতে পেয়েছিলেন। রামমোহন, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রাণাডে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজগঠনের মূলভিত্তি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতো তাঁদের স্পষ্ট ধারণা দেখতে পাওয়া যায় না।

ভবিষ্যৎ সমাজে শ্রমিকশোষণের অবসানঃ বিবেকানন্দ ধনতন্ত্রের স্বরূপ এভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এ সত্যও দেখতে পেয়েছিলেন যে, অনতিবিলম্বে এই বঞ্চিত শ্রমিক বা তাঁর ভাষায় শূদ্রশ্রেণীর আধিপত্য ঘটবে। আগামী যুগ এদেরই যুগ, সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হবে। সেজন্যই বলেছেনঃ "কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।" ভারতেও একই ব্যাপার ঘটবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও তিনিই সেযুগে শুনিয়েছেন। বলেছেনঃ "...তোমরা উচ্চ-বর্ণেরা কি বেঁচে আছ? ...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।"[২৩]

উনিশ শতকের ভারতের চেতনায় সমাজতন্ত্রঃ স্পষ্টতই এখানে বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি লক্ষ্য করি যা অন্যদের মধ্যে দেখতে পাই না। এখানেই তিনি ভারতের তদানীন্তন অর্থনীতিকদের অতিক্রম করে অগ্রগামী চিন্তা রেখেছেন। রামমোহনের চিন্তায় কৃষক শ্রমিকদের সমাজে আধিপত্যলাভ সম্বন্ধে কোথাও সুস্পষ্ট উক্তি নেই। ব্রিটিশ শোষণ সম্বন্ধে তাঁর চেতনা থাকলেও অভিজাত-শ্রেণীর শোষণ সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা যায়। বঙ্কিম সাম্যের দার্শনিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, Robert Owen, St. Simon প্রভৃতি ইউটোপীয়ান (Utopian) সমাজবাদীদের প্রভাব তাঁর উপর স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে বা সমাজতন্ত্রের আর্থিক বুনিয়াদ সম্পর্কে তাঁর চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণস্বরূপ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

"'বঙ্গদেশের কৃষকে' এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের

ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে।...অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, *জমীদার দুর্ব্বল।*"[২৪] ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদের একটি নগণ্য অংশকে সামান্য কিছু অধিকার দেওয়া হয়। তারপর বহু আইন পাশ করতে হয়েছে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে—একথা মনে রাখা দরকার স্বল্পসংখ্যক অনুৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বহুসংখ্যক উৎপাদক শ্রেণীর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চনার সুযোগ যে ব্যবস্থায় নিহিত, তাতে সামান্য সংশোধনে মূল ত্রুটি দূর হয় না। বঙ্কিমের ধারণায় এ সত্য প্রতিভাত নয়। তাঁর মধ্যে শ্রমিক বা শূদ্রশ্রেণীর সমাজে প্রাধান্য লাভ সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায় না।

দাদাভাই নওরোজী ও রমেশ দত্তের মধ্যেও আমরা এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেখতে পাই না। রমেশচন্দ্র দত্তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থেকে বোঝা যায়, তাঁর দৃষ্টি কত সীমিত ছিল। বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ত্রুটি তাঁর কাছে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েনি আগামী দিনের প্রবণতা। দাদাভাই ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

এ বিষয়ে রাণাডের চিন্তা আরও অপরিণত। ডঃ ভবতোষ দত্তের সিদ্ধান্তঃ "তিনি ভারত-ইংলন্ড সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, অথচ ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা আদৌ ভাবেননি।"[২৫] দেখা যায় যে, ১৮৮৫ সালের বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তাঁর মতে এটি একটি কমিউনিস্ট প্রস্তাব। সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশ শাসকেরা কমিউনিজমের অনুকূল আইন পাশ করতে পারে, তাঁর এ ধারণা সত্যই হাস্যকর। এই আইনে বারো বৎসর যাঁরা একাদিক্রমে একই জমি চাষ করেছেন, তাঁদের তাতে দখলীস্বত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে। রাণাডের মতঃ চাষীদের যদি দখলীস্বত্ব পেতে হয়, তাহলে তাদের ন্যায্য মূল্যে পাওয়া উচিত। দীন দরিদ্র চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে সেকথা রাণাডে চিন্তা করেননি। এ ক্রয়ক্ষমতা যদি তাদের থাকত তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মুখ্য সমস্যা—ভারতের দারিদ্র্য থাকত না। রাণাডের ভারতের বাস্তব আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণার অভাবই এখানে লক্ষিত হয়।

তুলনায় বিবেকানন্দের চেতনা কত স্পষ্ট, কত পরিণত, কত জাগ্রত, তা নিবেদিতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখছেনঃ "আগামী যুগ শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা সমাধানের যুগ—এই ছিল তাঁর অভিমত। প্রথমবার

পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিনি তার আপাতদৃষ্ট গণতন্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯০০ সালে তিনি ধনিকদের লালসা, অর্থগৃধ্নুতা, তাদের স্বার্থ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল সঙ্ঘবদ্ধতা ও হিংস্র সংগ্রাম দেখে বলেছিলেন—'পশ্চিমের জীবনযাত্রা এখন তাঁর কাছে নরকতুল্য বোধ হয়'।"[২৬] এ বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্য প্রভূত আলোকপ্রদ। তিনি বলছেনঃ "পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের অবগুণ্ঠন মোচন করিবার ফলে যে হিংস্র মুখমণ্ডল প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের চোখে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের চোখে হিংস্র লুব্ধ ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।"[২৭] সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপই শুধু নয়, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের ভবিষ্যৎ রূপটিও। নিবেদিতা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখছেনঃ "তিনি একদিন বলেছিলেন, 'শূদ্রদের সমস্যার সমাধান হবে, কি প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্য দিয়ে, কি তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে'। যেন তিনি ভবিষ্যতের গভীরে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাচ্ছিলেন কি রয়েছে সেখানে লুকিয়ে, তাঁর কণ্ঠস্বরে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যঞ্জনাই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল।"[২৮]

বিবেকানন্দ অভিজাত, উচ্চবর্ণ সম্বন্ধে অতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। তাদের তিনি এমন কি "চলমান শ্মশান", "ভূত কাল" বলে অভিহিত করেছেন।[২৯] তিনি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন তাদের দিন নিঃশেষ। এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ "জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট[৩০] হচ্ছে,

ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। ...এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ। ...তা না হ'লে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই।...এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।"[৩১] এখানে কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই, বিবেকানন্দ স্পষ্ট ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, উচ্চবর্ণের আধিপত্যের অবসান ও সর্বসাধারণের সমাজে আধিপত্য লাভ এসকল বিষয়ে অনেক পরবর্তীকালের চেতনাকে প্রতিফলিত করেছেন।

এখানে এ প্রশ্ন জাগতে পারে বিবেকানন্দ কি কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? বিবেকানন্দের রচনাবলীতে বার বার হেগেল, কান্ট, স্পেন্সার-এর নাম আমরা পাচ্ছি, পাচ্ছি অন্যান্য অনেকের নাম। মার্ক্স-এর নাম কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয়নি। বিবেকানন্দ সেজন্য মোটামুটিভাবে সম্ভবত ঐ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন। তবু তিনি কোথায়ও এ নামটি উল্লেখ করেননি দেখে মনে হয় বিবেকানন্দ তাঁর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি। বিবেকানন্দ যা অভিমত দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সেগুলি নিজস্ব অনুশীলন হতে প্রাপ্ত। ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের চিন্তার গভীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁরা তা জানেন। তাছাড়া মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে, যদিও কিছু কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। সাদৃশ্যের কারণ বাস্তব সত্য যা তা তো একটাই। বিবেকানন্দ ও মার্ক্স দুজনে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় চিন্তা করতে করতে একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। বিবেকানন্দের চিন্তার ধারা অনুসরণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাস্তব আর্থিক অবস্থা ও ইতিহাস বিশ্লেষণ সহায়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ লাভ করেছিলেন।

প্রথম দর্শনে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারণাঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দ শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্যেও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ সহায়ে অর্থনীতির পাঠ নিয়েছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি আমেরিকায় প্রথম উপনীত হয়েছেন, তখন সেখানে শিল্পবিপ্লব পূর্ণ গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য সেখানে উপনীত হয়ে তিনি এক শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত নগরজীবনে প্রতিষ্ঠিত এক ধনবান সমাজকে প্রত্যক্ষ করলেন। ওদেশের অর্থ-

নৈতিক জীবনের যে দুটি দিক দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা হলঃ প্রথমত, ওখানে দারিদ্র্য নেই; দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি ও উন্নত অবস্থা। বেলগাঁওয়ের হরিপদ মিত্রকে লিখেছেনঃ "এ দেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা—খাওয়া-পরা বাদ—দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলি ৬ টাকা রোজের কম খাটে না।"[৩২] ঐ অভূতপূর্ব আর্থিক উন্নতি দেখে তিনি ভারতবর্ষের জন্য অনুরূপ উন্নতি কামনা করলেন। ঐ চিঠিতেই তিনি আরও লিখলেনঃ "গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২্ টাকা। ...আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।"[৩৩]

অতীতে ভারতের আর্থিক উন্নতিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের অতীতদিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সে সম্বন্ধে একটি সমীক্ষায় তিনি বলেছেনঃ "মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হ'তে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হ'তে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমী পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হ'ত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হ'ত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর।"[৩৪] প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে যে, অতীত ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্য একটি তালিকা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এটি তাঁর এ বিষয়ে গভীর অনুশীলনের পরিচায়ক। যাই হোক, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অতুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অধিকারী ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ভারত অতীতে যা পেয়েছিল—যা ব্রিটিশ শাসনের কালে শাসকদের অনুসৃত নীতির ফলে অবক্ষয়ের মুখে পড়েছে, তা পুনর্বার ভারত লাভ করতে পারে। সেজন্য তিনি এ বিষয়ে ভারতকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ "ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই **raw material** (কাঁচামাল) দিয়ে

তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ ক'রে, নানা জিনিস তৈয়ের ক'রে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' ক'রে বেড়াচ্ছিস!' ৩৫

সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য: উপরোক্ত উক্তিটি খেদোক্তি মাত্র নয়, আলোচ্য বিষয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে বিবেকানন্দ উদ্ঘাটিত করেছেন ইংলন্ড-আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং ভারতের মতো পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক অর্থ-নৈতিক (Colonial Economy) কাঠামো, এ দুই-ই। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন প্রথমোক্ত দেশগুলি তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেগুলি নিজেদের দেশে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে, তারপর আবার সেগুলি উপনিবেশগুলিতে পাঠায়। দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশগুলি তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ, আবার তাদের শিল্পজাতদ্রব্যের বাজার। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যই এই—অধীনস্থ দেশগুলি কাঁচামাল রপ্তানি করে, শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসক দেশগুলি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ, তারা পরাধীন দেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি করে এবং নিজেরা রপ্তানি করে শিল্পজাত দ্রব্য। উপনিবেশগুলি সেজন্য আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নতই থাকে, সেখানে শিল্পসমৃদ্ধি ঘটতে পারে না, তার কারণ তাহলে তারা শাসক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করতে ও শিল্পজাত দ্রব্য সে দেশগুলি থেকে আনতে পারে না।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় আর্থিক উন্নতির শোচনীয় পরিণামও এখানে উদ্ঘাটিত। কতগুলি দেশ উন্নত হয়েছে, অপর কতগুলি দেশকে তার মূল্য দিতে হয়েছে—তারা অনুন্নত থেকেছে। এই অসম উন্নতি—উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য—ধনতান্ত্রিক উন্নতির (Capitalist Development) অন্যতম পরিণাম। অনেক পরবর্তীকালে অর্থনীতিজ্ঞদের বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত এই তত্ত্ব বিবেকানন্দের চিন্তায় তখনই সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। তখন কার্ল মার্ক্স্ ঐ ধারায় চিন্তা করছেন, কিন্তু অর্থনীতিশাস্ত্রে তখনও তার প্রভাব অনুভূত হয়নি। অর্থনীতিশাস্ত্রের উন্নতি-তত্ত্ব (Growth Economics) অনেক পরে গড়ে উঠেছে। অর্থনীতি তখনও ভারসাম্য তত্ত্ব (Equilibrium Analysis) -কেন্দ্রিক। সুতরাং এখানে প্রমাণিত

যে, বিবেকানন্দের চিন্তায় পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তা অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়েছে যা তখনকার অন্য কোন লেখকের ক্ষেত্রে হয়নি।

ভারতে আর্থিক উন্নতির উপায়—বৈদেশিক সাহায্যঃ বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য দেশ থেকে মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যাপারে সাহায্য নিয়ে ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আজকের ভারত এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ ঠিক এই পন্থাই গ্রহণ করেছে। তিনি এই সাহায্য লাভের পথকে প্রশস্ত করতেই পাশ্চাত্য দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করে মেরী লুই বার্ক বলেছেনঃ 'ধর্মমহাসভার পূর্ববর্তী ছ সপ্তাহে আমেরিকার অধিবাসীদের তিনি তাঁর সেদেশে আসার কারণ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের বলেন যে, ভারতে ধর্মের অভাব নেই। প্রচুর ধর্ম আছে, যার থেকে অন্যকেও দেওয়া যেতে পারে। তাদের অভাব খাদ্যের, অভাব প্রযুক্তিবিদ্যার।"[৩৬] আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন প্রথার প্রবর্তনই ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের মুখ্য উপায়—একথা তিনি তখন উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি এজন্য এ সময়ে একটি আদানপ্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে আগ্রহশীল হয়েছিলেন। সেটি হল ভারতকে পাশ্চাত্য দেশ দেবে প্রযুক্তি-বিদ্যা, ভারতের যা অভাব, আর পাশ্চাত্যকে ভারত দেবে আধ্যাত্মিকতা, পাশ্চাত্যে যার অভাব। একটি চিঠিতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিখছেনঃ "তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার ক'রব, ক'রে দেশে যাব...আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। ...হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ ক'রে রোজগার ক'রে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) ক'রব or die in the attempt (কিংবা ঐ চেষ্টায় ম'রব)।"[৩৭] বিবেকানন্দ কেবল তত্ত্ব বা পরিকল্পনা দিয়েই সন্তুষ্ট হতেন না। সেটি কর্মে পরিণত করবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করতেন। এ ব্যাপারেও নিজেই পথপ্রদর্শকের কাজ করতে চেয়েছেন। নিজে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দেবার বিনিময়ে অর্থ ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপারে সাহায্য লাভ করে দেশে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মশালা চালু করতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে আমেরিকার একটি সংবাদপত্র কিছু আলোকপাত করেছে। ১৯০০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের Pasadena Star সংবাদ পরিবেশন করছে যে, স্বামী

বিবেকানন্দ ৬ তারিখে Throop Polytechnic Institute পরিদর্শন করে খুব খুশী হয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ শিক্ষাদির প্রবর্তন শীঘ্রই করবেন। মেরী লুই বার্কের গ্রন্থে পরিবেশিত এই সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিবেকানন্দের ভারতের দারিদ্র্য মোচনের উপায় সম্বন্ধে ধারণাকে স্পষ্ট করছে। মেরী লুই বার্ক-এর সমীক্ষায় এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাবে মন্তব্য করা হয়েছে অন্য এক স্থলে। তিনি এখানে বলছেনঃ "স্বামীজীর অন্যতম স্বপ্ন ছিল, যেকথা তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদর্শ ও কৃতিত্বের আদানপ্রদানের স্বপ্ন দেখতেন। মিঃ অ্যালান তাঁর ভারত সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এই কথাটিঃ 'আমাদের যন্ত্রবিদ্ প্রেরণ করুন, যাতে আমরা আমাদের হাতের ব্যবহার করতে শিক্ষা পাই। আমরা আপনাদের আধ্যাত্মিকতা শিক্ষার জন্য প্রচারক পাঠাবো'।"[৩৮] এর উপর মেরী লুই বার্ক নিজে মন্তব্য করেছেনঃ "এ স্বপ্ন শুধু যে সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ছিল তা নয়। এ স্বপ্ন ভবিষ্যতের একটি বাস্তব ঘটনার বীজ বপন করেছিল।"[৩৯] মেরী লুই বার্ক ঠিকই বলেছেন, সেদিন সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে, তাঁর আমল থেকেই, এ আজকের দিনে স্পষ্ট বোঝা যায়।

পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্র সম্বন্ধে পরবর্তী ধারণাঃ তখনকার দিনে ভারতে শিল্পায়ন সম্পর্কে অনেকেই উৎসাহিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। বিবেকানন্দের যেটি বিশেষত্ব সেটি হল এই যে, তখনকার দিনে তাঁর দৃষ্টিতে শুধু শিল্পায়নের সুফলই ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে তার ভিত্তিমূলে যে একটি বিরাট ত্রুটি রয়েছে সেটিও, যেটি তখনকার ভারতীয়দের চিন্তায় একেবারেই অনুপস্থিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ। আশ্চর্য হতে হয় এইজন্য যে, আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতিজ্ঞ না হলেও শিল্পসমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন বিশেষজ্ঞের মতোই। আমেরিকায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি বিষময় পরিণাম—শিল্পে মন্দা ও একচেটিয়া ক্ষমতার সম্প্রসারণ তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। ১৮৯৩-এ তাঁর আমেরিকায় প্রথম পদার্পণের মাত্র তিনবৎসর পূর্বে আমেরিকা একচেটিয়া ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে পাশ করেছে প্রখ্যাত Sherman's Anti-trust Act. ১৮৯২—৯৩-এ আমেরিকায় এক প্রচণ্ড ব্যবসায়িক মন্দা দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৪ সালের ২০শে জুন

হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত চিঠিতে তিনি এই মন্দার কথা উল্লেখ করে লিখেছেনঃ "...এবার আমেরিকায় বড় দুর্বৎসর চলিতেছে, হাজার হাজার গরীব বেকার।"[৪০] তদানীন্তন প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক এলা হুইলার উইলকক্স (Ela Wheeler Wilcox)-এর স্মৃতিচারণায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখছেনঃ "এ হল অর্থনৈতিক দুর্দৈবের, ভয়াবহ শীতকালের কথা, যখন ব্যাঙ্ক ফেল করছে, স্টক ফুটো বেলুনের মত চুপসে যাচ্ছে, নৈরাশ্যের অন্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে ব্যবসায়ীরা, সারা জগতে যেন ওলট্‌পালট।"[৪১]

এই মন্দা প্রভৃতির কুফল লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ শিল্পসমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের ত্রুটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনানুসারে ত্রুটিটি হল নিম্নোক্তরূপঃ

"যন্ত্র-উৎপাদন মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং তার ফলে আজ যেরকম বিশেষ সুবিধা দাবি-করা হচ্ছে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথায়ও মেলে না।"[৪২] যন্ত্র দ্বারা উৎপাদন ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তার ফলে মূলধন সরবরাহকারী অল্পসংখ্যক ধনিকদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এর ফলে তারা সীমাহীন সুবিধা কুক্ষিগত করে, ফলে সাধারণে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের শোষণ করা হচ্ছে যতদূর সম্ভব।

বিবেকানন্দ আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, উক্ত ধনিক একচেটিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণী যে কেবলমাত্র নিজ দেশের মধ্যে সকলকে বঞ্চিত করে সব সুবিধা নিজেদের করতলগত করেছে তা নয়, পণ্যের বাজার হস্তগত করবার জন্য অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের সব সম্পদ লুণ্ঠ করেছে। এ সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মন্তব্য (যা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি) থেকে একথা জানা যায়। মন্তব্যটি হলঃ "যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হ'লে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল. .।"[৪৩]

ধনতান্ত্রিক আর্থিক উন্নতির স্বরূপঃ এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক আর্থিক উন্নতির স্বরূপ তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, দেখেছিলেন স্পষ্ট যে, এ উন্নতির ফলভোগে সাধারণ প্রজার কোন অংশ

নেই, সে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণের জন্য তাকে মরতে পাঠানো হচ্ছে। গৌরবহীন যুদ্ধে ততোধিক গৌরবহীন মৃত্যু ও ধ্বংসই তার ভাগ্য। বিবেকানন্দের বর্ণনায়ঃ

"They think that God Almighty has given them a charter to rule over all the world, to advance His plans, to do anything they like, to turn the world upside down. They have a charter to rob, murder, kill...".[৪৪] এখানে বিবেকানন্দ আশ্চর্যরকমভাবে লেনিনের লেখা 'Imperialism' গ্রন্থের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। 'Imperialism' ও লেনিন তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। উনিশ শতকের ভারতের অন্য কোন চিন্তাবিদ্ এ বিষয়ে ধারণা করতে পারেননি, বিবেকানন্দ এখানে তাঁদের সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছেন।

ছোটবহরের শিল্প সংগঠনঃ বড়বহরের উৎপাদনে অল্পসংখ্যক লোকেদের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। সেজন্য তিনি ছোটবহরের শিল্প-সংস্থার প্রতি সব সময় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। নিবেদিতা বিষয়টির উপর আলোকপাত করে লিখেছেনঃ "ব্যবসাতে অধিক মূলধন নিয়োগে অধিক-লাভের সম্ভাবনা, এইরূপ মতাবলম্বীদের বিপক্ষে তিনি যাহারা অল্প জমিতে চাষ করে, অথবা স্বল্প পুঁজি লইয়া কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্বদা তাহাদের সমর্থন করিতেন।"[৪৫] নিবেদিতা আরও বলেছেনঃ "তিনি সর্ব-ক্ষেত্রেই, সরবরাহের ক্ষেত্রেও—ক্ষুদ্র সংস্থা, ছোট-ব্যবসায়ীর বিলোপসাধন করতে পারে, এরূপ যুক্তিকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, বড় সংগঠনের সংহতিকে তিনি প্রশংসা করতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন হল একদল নেকড়ের সংহতির মধ্যে কোন সৌন্দর্য আছে কি?"[৪৬]

ভারতে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষি-উন্নয়নের সম্ভাবনাঃ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি ক্ষুদ্র জোতের অবস্থানের জন্য বড়বহরে যন্ত্র সহায়ে চাষ সমর্থন করেননি। তিনি যখন আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ওখানকার কৃষিব্যবস্থা দেখে মনে করেছিলেন ভারতেও অনুরূপভাবে যন্ত্র-ব্যবহার সহায়ে চাষ করলে কৃষির উন্নতি ঘটবে। পরে তিনি অনুভব করেন যে, বড় আকারের জোতের অধিকারী আমেরিকার চাষীদের পক্ষেই যন্ত্রের ব্যবহার উপযোগী। ছোটজোতের দেশ ভারতের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

"Like others, he had accepted without thought the assump-

tion that machinery would be a boon to agriculture, but he could now see that while the American farmer, with his several square miles to farm, might be the better for machines, they were likely to do little but harm on the tiny farmlands of the Indian peasantry. The problem was quite different in the two cases." ৪৭

এ বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টি লক্ষণীয়। এই কথাটি বুঝতে আমাদের স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ সময় ও বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়েছিল। যন্ত্রদ্বারা চাষ করতে হলে বড়জোত প্রয়োজন হয় এবং বর্তমান ছোটজোতের স্থানে বড়জোতে যন্ত্রদ্বারা চাষ হলে বহুলোক বেকার হয়ে পড়বে—বিবেকানন্দ (যা আজকের অর্থনীতিবিদ্‌দেরও মত) তা দেখাতে চেয়েছেন। তখন এ উপলব্ধি খুব কম লোকেরই ছিল। যেমন রাণাডে। রাণাডে চেয়েছিলেন বড়জোতের প্রবর্তন। ডঃ ভবতোষ দত্ত এ বিষয়ে বলছেনঃ "শিল্পসংরক্ষণ ব্যতীত অন্যভাবেও রাণাডে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চেয়েছেন—যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছোটবহরের কৃষির পরিবর্তে বড়বহরের কৃষিজোত চেয়েছেন তিনি—এটা তাঁর বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।" ৪৮ কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চাওয়ার মধ্যে যদি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় থেকেও থাকে, ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশে, যেখানে বিপুল-সংখ্যক লোক বেকার, কৃষির উপর জনচাপ অত্যধিক, শিল্প অত্যন্ত অনুন্নত, সেখানে বড়বহরের জোতের পরিণাম বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি—এটি না বুঝে বড়জোত চাওয়ার মধ্যে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় থাকতে পারে না। কিন্তু বিবেকানন্দ বাস্তব পরিস্থিতি অতি উত্তমরূপে জানতেন, এদেশে কৃষি-জোতের পরিমাণ স্বচক্ষে দেখেছেন, সেজন্য এখানে বড়জোত বা ব্যাপক যন্ত্র-প্রয়োগে চাষ—এর কোনটাই যে ভারতে খুব প্রযোজ্য নয়, তা তিনি বুঝতেন।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা—দারিদ্র্যঃ ভারতের যেটি মূল অর্থনৈতিক সমস্যা—ভয়াবহ দারিদ্র্য—প্রত্যক্ষ দেখে বিবেকানন্দ তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যখন বিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পরিক্রমা করছিলেন তখন তিনি এ পরিচয় লাভ করেছিলেন। খুবই আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে, বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্র্যের পরিমাণ মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্‌ যাঁরা তাঁরাই এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। আক্ষরিক অর্থে

অর্থনীতিবিদ্ না হয়েও বিবেকানন্দ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রথম হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট জাতীয় আয় (=১৮৭০) হল ৩০০ কোটি টাকা ও মাথাপিছু আয়— বাৎসরিক গড় আয়—২০ টাকা। বিবেকানন্দ দিয়েছেন মাসিক গড়। বিবেকানন্দ লিখছেনঃ "গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা।"[৪৯] বিবেকানন্দ দাদাভাইয়ের কাছাকাছি হিসাব দিয়েছেন। আর এক জায়গায় লিখেছেনঃ "তাদের গড় আয় মাসিক পাঁচসিকে কি দেড়টাকা।" সম্ভবত বিবেকানন্দ এ বিষয়ে দাদাভাই নওরোজীর প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

ভারতে দারিদ্র্য যে কী ভয়াবহ তা বোঝাবার জন্য তিনি অর্থনীতিজ্ঞের মতো (মাসিক) গড় আয়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি আরও যা বলেছেন নিঃসন্দেহে তার ভিত্তি তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাঃ "ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মহুয়া ফুল সেদ্ধ ক'রে খেয়ে জীবনধারণ করে। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান পুরুষেরাই কেবল ভাত খায়, নারী ও শিশুরা ফেন খেয়ে থাকে। ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়—মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়ের একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।"[৫০]

ভারতের দারিদ্র্যের কারণঃ বিবেকানন্দের মতে এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের মূল কারণ দুটিঃ ১। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ ২। অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিতদের অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ।

দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক কারণঃ ভারতে ইংরেজ শাসনের ফল আলোচনা করতে গিয়েই তিনি ভারতে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক কারণগুলি নির্দেশ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশের যা স্বরূপ ঠিক তাই। তিনি এ বিষয়ে বলছেনঃ "চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পাই, ইংলণ্ড ৩৫ কোটি এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা দিয়ে সম্পদলাভ করেছে। ...ইংরেজ-বিজয়ের কালে বহুদিন ধরে দারুণ সন্ত্রাসের রাজত্ব ভারতে চলেছিল। ইংরেজ-শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড এদেশে ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ পরে দেখা দিয়েছে, তা গ্রাস করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন।... তা না হলে ভারতে তার বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচগুণ লোকের ভরণপোষণের উপযোগী উৎপাদন ও জীবিকার সংস্থান রয়েছে।"[৫১]

উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যে দেখা যায় বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্র্যের দুটি অর্থনৈতিক কারণ নির্দেশ করেছেনঃ

১। ইংরেজের অনুসৃত নীতির ফলে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

২। ইংরেজগণ কর্তৃক ভারতের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন।

ভারতের তদানীন্তন অন্যান্য অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এ দুটিকেই ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। রমেশচন্দ্র প্রথম কারণটির উপর জোর দিয়েছেন, দাদাভাই নওরোজী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Drain Theory (শোষণ-তত্ত্ব) মাধ্যমে দ্বিতীয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবেকানন্দ এ দুটিই আমাদের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে বলে নির্দেশ করেছেন।

সামাজিক কারণঃ কিন্তু তিনি ভারতের দারিদ্র্যের মূলে একটি সামাজিক কারণকেও মুখ্যত দায়ী করেছেন। এটি হলঃ অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রভুত্ব, শোষণ ও অত্যাচার। পৌরোহিত্য চক্রের নির্মম শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে তিনি বলেছেনঃ "যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক!"[৫২] জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর শোষণ সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমরা গরিবদের পায়ে দলেছি অর্থলালসায়, তাদের কান্না শুনিনি, যখন তারা একটুকরো রুটির জন্য কেঁদেছে তখন আমরা সোনা-রুপোর থালায় খেয়েছি, তাদের দিকে দৃক্‌পাত করিনি তার ফল হল, মুসলমানেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে কেটে পরাধীন ক'রে ফেললে। ভারত বারবার এর ফলে **পরাধীন** হয়েছে।"[৫৩]

দারিদ্র্যই ভারতের জাতীয় সমস্যা ঃ সেযুগে আমাদের দেশের সংস্কারকদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রতি। তাঁরা সেজন্য সমাজ-সংস্কার বলতে বুঝেছিলেন সমাজের উপরতলার মানুষদের সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সংস্কার যেমন বিধবাবিবাহ, পর্দাপ্রথা বর্জন ইত্যাদি। সেগুলির যে প্রয়োজন ছিল না, তা নয়, কিন্তু সেগুলিই ভারতের জাতীয় সমস্যা নয়। সে সমস্যাকেই জাতীয় সমস্যা বলে অভিহিত করা যেতে পারে যা হল দেশের অগণিত জনসাধারণের সমস্যা, মুষ্টিমেয়ের সমস্যা নয়। বিবেকানন্দ একমাত্র ব্যক্তি সেযুগে যিনি এইরূপ জাতীয় সমস্যার মূলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেনঃ "...দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই

ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর।"[৫৪] তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারকদের মূল ত্রুটি হল তাদের অর্থনৈতিক চেতনার অভাব। উচ্চ শ্রেণীর শোষণকে আমাদের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে ইঙ্গিত করেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট চেতনা ছিল। তিনি অভিজাতশ্রেণীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেছেনঃ "যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটী লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।"[৫৫]

ভারতের দারিদ্র্যের অবসানের উপায়সমূহ ঃ ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের অবসানের জন্য বিবেকানন্দ কয়েকটি উপায়ের কথা বলেছেন। প্রথম বলেছেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা। আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্মুখে রাখতে গিয়ে ভারত ঐহিক বা আর্থিক উন্নতিকে অবহেলা করেছে, এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর্থিক উন্নতিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ "আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। ...ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? ...বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।"[৫৬] কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর বাস্তবদৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের স্বার্থকে এখানে বিবেকানন্দ সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। কেবল আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে অনুসরণ করলে চলবে না, কারণ আধ্যাত্মিক আদর্শের

উপযুক্ত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বিপুল জনসাধারণের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলাই জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেজন্য শুধু যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু উৎপাদন করলে কর্মপ্রবাহের প্রয়োজনীয় মাত্রা লাভ হবে না। সেজন্য বলেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ-ব্যবহার বৃদ্ধি চাই, চাই. এমন কি বিলাসিতা। মুষ্টিমেয়ের মোক্ষলাভের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনাহার ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করবার পক্ষে তিনি কোন যুক্তি খুঁজে পাননি। সেজন্য তিনি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন।

ভারতের দারিদ্র্যমোচনের জন্য বিবেকানন্দ আরও যে যে উপায়ের কথা বললেন তা হলঃ নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের সামাজিক অধিকার প্রদান। ব্যাপক শিক্ষার প্রসারের উপর তিনি খুব জোর দিয়েছেন, কারণ তা তাদের দক্ষতা বাড়াতে সহায় হবে. তাদের ভিতর নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে চেতনা আনবে. এবং উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করবে। শিক্ষার প্রসার ব্যতীত পৌরোহিত্যের অবসানের উপরও তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশের জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। একটি চিঠিতে লিখছেনঃ "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন। এক কথায়...আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক।...স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত।...ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য-রূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।"[৫৭]

ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিক্ষার প্রসারের উপরে জোর দিয়ে তিনি বলেছেনঃ "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন।... সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।... প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।... দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ

নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙগলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।"[৫৮]

সামাজিক প্রতিবিধান ও শিক্ষার বিস্তার ছাড়াও তিনি ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আরও যে যে উপায়ের কথা বলেছেন সেগুলি হলঃ ১। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সহায়ে শিল্প-সম্প্রসারণ। এ বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ২। ছোটবহরের শিল্পের সম্প্রসারণ, এ বিষয়টিও আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ৩। ছোটবহরের জোতে কৃষিকর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা যাতে বহু লোক নিযুক্ত থাকতে পারে। ৪। বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার কথা তিনি নিম্নোক্তরূপে বলেছেনঃ

"ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে (তাঁর পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্র) কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে।"[৫৯] ছোট ছোট কর্মশালা স্থাপন মাধ্যমে বহুলোকের দ্রুত কর্ম-সংস্থান হবে, উৎপাদিত দ্রব্যগুলির রপ্তানি করে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণাম—দারিদ্র্যঃ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সমাজেও মুষ্টিমেয়ের আধিপত্যের ভয়াবহ পরিণাম উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। বলেছেনঃ "দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের করায়ত্ত। তারা নিজেরা কোনো কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে। ...এমন সামাজিক অবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হতে পারে না। একথা সত্য যে, কলকারখানা দ্রব্যাদি সুলভ করেছে, বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, কিন্তু কেউ ধনী হবার জন্য কেউ লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে, দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হবে, দলে দলে মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হবে—এ জিনিস চলতে পারে না। স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।"[৬০] এ উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, এর মধ্যে দারিদ্র্যের একটি কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে—সেটি হল বর্তমান ধনিক সভ্যতায় মুষ্টিমেয়ের বিশেষ সুবিধাভোগের সুযোগ। বিবেকানন্দ বেদান্তের ভিত্তিতে

দাঁড়িয়ে সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই সব সমস্যার সমাধান নয়ঃ বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তার আলোচনার শেষে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন না যে নিছক শিল্পায়ন ও আর্থিক উন্নতি মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অধ্যাত্ম-আদর্শ-চ্যুত জাগতিক জ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তখন এসকল সম্পদ তার কাছে অর্থহীন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যঃ "নানা কল-কারখানা ক'রে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি ক'রে দিচ্ছে...।"[৬১] ভারত আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত হোক তিনি চেয়েছেন, কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম-আদর্শ হতে যেন চ্যুতি না ঘটে। তাঁর মতে অধ্যাত্ম-আদর্শ থেকে চ্যুত জ্ঞান মানুষকে শয়তান করেঃ "...excess of knowledge and power, without holiness, makes human beings devils."[৬২] ঠিক একই কথা বলেছেন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ পি. এ. সোরোকিন (P. A. Sorokin)। তাঁর কথাগুলি হল নিম্নোক্তরূপঃ

"ইন্দ্রিয়ানুগ (ঐহিক) সভ্যতার মুখ্য ফল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। কিন্তু এ সভ্যতা মানুষের অবনতি ঘটায়। লোভ ও মোহের দাস আত্মসংযমহীন মানুষের হাত বিজ্ঞানকে আজ বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছে। আধ্যাত্মিক সভ্যতা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, তার দিব্যস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। আজ সেজন্য একান্ত প্রয়োজন এই অধ্যাত্মভিত্তিক সভ্যতার।"[৬৩]

আধ্যাত্মিক ও আর্থিক কল্যাণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্তঃ বিবেকানন্দ মোটের উপর ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যে কল্পিত ব্যবধান তা ঘুচিয়েছেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণে দুটিই প্রয়োজন। তিনি তাঁর গুরুর এই কথাটিতে বারংবার আস্থা প্রকাশ করেছেনঃ "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" সেজন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেও ঐহিক উন্নতির সহায়তার উপর জোর দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ "মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপ

উৎসাহবর্ধন...।"[৬৪] তাঁর মতে মানুষের আর্থিক কল্যাণকে রূপ দিতে পারে না, এরকম অবাস্তব ধর্মমত মানুষের জীবনে স্থান পেতে পারে না। তাঁর ভাষায়ঃ "প্রত্যেক ধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা বয়ে চলেছে। মানুষের উপরে ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে পরিচালিত হয় অর্থনীতির দ্বারা।

"সুতরাং যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের হাজার সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য লড়াই করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেই প্রাধান্য লাভ করে। পেটের চিন্তা, অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম চিন্তা।"[৬৫]

এ প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে আরও একটি কথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না। সেটি হল আজকের দিনের গবেষকদের সংগত ক্ষোভের কথা। বিবেকানন্দের টুকরো টুকরো কথাগুলি জুড়ে অনুভব করা যায়, তাঁর অর্থ-নৈতিক চিন্তা কতদূর গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বেশ বোঝা যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা হারিয়ে গিয়েছে। যাঁরা তাঁর কথা বা বক্তৃতা লিপিবন্ধ করেছেন তাঁরা স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার উপর মনে হয় ততটা গুরুত্ব দেননি যতটা দেওয়া উচিত ছিল। ফলে এ বিষয়ে গবেষকদের কাজ খুবই কঠিন হয়েছে এবং তাঁদের দায়িত্বও বেড়ে গিয়েছে। এ দায়িত্বের কথা সব সময় তাঁদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে যে কয়েকটি কথা লিপিবন্ধ হয়েছে, তারও মূল্য অসামান্য। তা থেকে আমাদের একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সমাজসচেতন অর্থনীতি-চিন্তাবিদ্। তিনিই একমাত্র ভারতীয় চিন্তাবিদ্ যিনি তখনকার পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ত্রুটি প্রদর্শন করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই উনিশ শতকে বিশ্বের পটভূমিকায় তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাকে স্থাপিত করেছেন।

পরিসমাপ্তি

বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আলোচনা শেষে আমরা ঠিক সেই সিদ্ধান্তে পেঁছাই যে সিদ্ধান্তে একদা নিবেদিতা পেঁছেছিলেন তাঁর বিবেকানন্দ-সমীক্ষা অন্তে। সেটি হল

এই যে, বিবেকানন্দের সমগ্র চেতনা প্রতিমুহূর্তে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'মানুষ'—বিশেষ করে দুর্বল অসহায় মানুষ। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বত্র নির্যাতিত দুর্বল অসহায় মানুষদের মনুষ্যোচিত অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ, এই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তারই জন্য তাঁর সকল চিন্তা, সকল আয়াস, সকল সংগ্রাম। এ লক্ষ্য থেকে মুহূর্তের জন্যও তিনি কখনও চ্যুত হননি। কখনও তাঁর মধ্যে এই লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস স্তিমিত হয়নি। বারংবার এই চিন্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে তিনি কখনও অক্ষম হননি।[৬৬]

আজকের যুগের মানুষের সংগ্রাম দুর্বল অসহায় নির্যাতিত মানুষদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য। বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার আলোচনায় আমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখেছি, এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রেখেই তিনি ঐগুলিকে রূপ দিয়েছেন। আজ যাঁরাই মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এগুলি মহামূল্য রত্নস্বরূপ। এ ধারণাগুলিই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মে পরিণত হচ্ছে। একটু বিচার করলেই তা ধরা পড়ে।

শুধু আজই বা কেন, পৃথিবীতে অনাগত কালেও যখনই মানুষ মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হবে তখনই বিবেকানন্দের বাণী, তাঁর ধ্যান-ধারণার কাছে তাকে আসতে হবে প্রেরণার জন্য, পথ-নির্দেশের জন্য। এগুলির আবেদন বা প্রয়োজন মানুষের কাছে কোনদিনও নিঃশেষ হবে না। এগুলি মানুষের কাছে চিরকালের অমূল্য সম্পদ। এই হল এগুলির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের সমীক্ষান্ত শেষ সিদ্ধান্ত।

স্বামীজীর কৃষিচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা—এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করাটাই সম্ভবত বিস্ময়কর। কারণ, আমরা, যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে দাবি করি, যারা গোটা সমাজসংস্কারের যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ে 'সুচিন্তিত' মতামত প্রকাশ করতেই আগ্রহী, সেই আমরাও যে তাবৎ জ্ঞানের বহর দিয়েও ভারতের মূল চালিকাশক্তির কাছাকাছি আজও যেতে পারিনি—সেটা কি অস্বীকার করা যায়? ভারত কৃষিনির্ভর—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেও যেমন কৃষিনির্ভর ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রভূত শিল্পবিস্তারের পরও তেমনি কৃষিনির্ভরই আছে। ভারতের সমস্যার সিংহভাগ যেমন কৃষকদের জীবনেই প্রতিফলিত, তেমনি ভারতীয় জীবনধারার আবর্তন বা বিবর্তন সেই কৃষিকেই কেন্দ্র করে। ভাবতে অবাক লাগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ভারতের কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে যেসকল বক্তব্য এবং মতামত প্রকাশ করেছিলেন, যেসকল চিন্তাভাবনা ধারণ ও বহন করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন যেসকল পথনির্দেশ, তা আজও এই আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য। মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমরা তৎকালীন কৃষিজীবনের পরিবেশ এবং পরিস্থিতিটা একটু পর্যালোচনা করে দেখতে পারি এবং সেই অতীত দর্শনের মাধ্যমেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতেই বাংলার বুকে দেখা দিল আবার আগুন। নীলচাষীরা মরণ-পণ করে বিদ্রোহ করেছিলেন নীলচাষের সীমাহীন ছলনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে। সেদিন বিদেশী শাসকরা এই বিদ্রোহের আগুনে শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়ার আশায় "ইন্ডিগো কমিশন" গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত কমিশনের সামনে বিদ্রোহী নীলচাষী দীনু মণ্ডল স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেনঃ "...আমি নীল-চাষ করব না এই কারণে যে নীল-চাষ মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল।"[১] সমসাময়িক "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় বলেছিলেনঃ "বাঙলাদেশ তার কৃষককুল সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে...শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমনকি নেতৃত্ব নেই, তবুও বাঙলার কৃষকরা এমন একটি বিপ্লব সংগঠিত করতে পেরেছে যাকে

অন্যদেশের বিপ্লবের তুলনায় কি ব্যাপকতায়, কি গুরুত্বে কোনদিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না।"২ বিক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুনে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বুক থেকে নীলচাষ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদারতন্ত্র? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? নীলচাষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেও চাষীরা জমিদারতন্ত্রের নাগপাশে তখনও ছিল বন্দী, একান্ত অসহায়-ভাবে বন্দী। "মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ", তারাই "মাটির মালিক" হয়ে বসলেন, আর যারা বুকের রক্ত দিয়ে ফসল ফলায়, সেই কৃষকরা থাকে অনাহারে, থাকে অন্ধকারে। একদিকে জমিদারতন্ত্রের শোষণ, অন্যদিকে মহাজনদের অত্যাচার কৃষিজীবী সমাজের সবটুকু জীবনীশক্তিকে নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছিল। আর তারই ফলে শুধু কৃষকরাই নয়, সমগ্র কৃষিব্যবস্থাই হয়ে পড়েছিল পঙ্গু, হয়ে পড়েছিল অন্তঃসারশূন্য। অবশ্য ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জাঁতাকল থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কয়েকটি আইন সংশোধন এবং নতুন আইন সংযোজন করেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি, বরং নানাভাবে খাজনার হার বাড়িয়ে জমিদারেরা কৃষকদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ ও পরিধি বিস্তৃত করে। যেমন দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন "নীল দর্পণ", তেমনি মীর মুশাররফ রচনা করেন "জমিদার দর্পণ"—এই দুই দর্পণেই তৎকালীন কৃষক সমাজের যন্ত্রণা-কাতর নিঃস্ব রিক্ত কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে প্রতিফলিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেশের শ্রীবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধটির দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে পারি। ইংরেজ শাসনের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায় যখন দেশের শ্রীবৃদ্ধির জয়গানে মুখর, তখন হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্তের দল নিঃসীম অন্ধকারে মাথা গুঁজে বহন করে চলেছে অত্যাচারের জ্বালা। কৃষকদের উন্নতির জন্য যেসকল আইন প্রণীত হয়েছিল, সেগুলিও যে কেন কৃষিজীবীদের সহায় হয়নি, সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেনঃ আইন—সে একটা তামাসামাত্র, বড় লোকেরাই পয়সা খরচ করে সেই তামাসা দেখে থাকে। কৃষক যদি জমির মালিকানা না পায়—তাহলে কৃষির উন্নতি হবে না এবং কৃষির উন্নতি না হলে কৃষকের উন্নতিও ঘটতে পারে না—এই বাস্তব সত্য শুধু আজই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নয়, বহু যুগ আগেই একথা আমরা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণও একদা স্বামীজীকে বলেছিলেনঃ খালি পেটে ধর্ম হয় না। অভুক্ত এবং ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে শুকনো ধর্মের কথা এক নিষ্ঠুর প্রহসনমাত্র।

ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যবস্তুই ঈশ্বর হিসাবে উপস্থিত হয়—এটাও এক বহুশ্রুত প্রবচন। বিবেকানন্দের পরবর্তী চিন্তাধারায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসে নিজেকে সংকুচিত করে রাখেননি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা সদা-সর্বদাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব—একথা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। সব থেকে বিস্ময়ের কথা এই যে, আজকের যুগে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি এবং কৃষিসমস্যার সমাধানে আমরা কমিশনের পর কমিশন গঠন করে যেসকল পথ ও পন্থার সন্ধান করছি, তার প্রায় সবগুলিই বিস্তৃতভাবে না হলেও, স্বামীজী বহুপূর্বেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আমরা চোখ মেলে এতকাল সেদিকে তাকাইনি, তাই দেখতে পাইনি।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি পরিকল্পনার গুরুত্ব যে কতখানি, তা স্বামীজী সম্যকরূপেই অবগত ছিলেন এবং সেই গুরুত্বের মূল কারণ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল। বিবেকানন্দ জানতেন, যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সে দেশে কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে যেমন মানবিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যাবে, তেমনি খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। দেশের চাহিদা মেটাবার জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য পাট, চা, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পপ্রসারের ভিত্তি হিসাবেও কৃষির প্রসার ঘটাতে হবে। আর বিধ্বস্ত ও বিপন্ন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব করে তুলতে পারে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থা। আধুনিক মন নিয়ে আমরা যখন গ্রামীণ সমস্যা ও কৃষির উন্নতি সম্পর্কে এই পটভূমিকায় চিন্তাভাবনা করি, তখন বিবেকানন্দের ধ্যানধারণাকে অতি আধুনিক বলেই মনে হয়।

কৃষির উন্নতি ঘটাতে হলে কি কি করা প্রয়োজন? এ সম্পর্কে স্বামীজী প্রথমেই জমির উপর কৃষকের অধিকার মেনে নেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেনঃ "নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না।"[৩] সেই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত চাষের প্রয়োগকৌশল কৃষকদের শেখাতে হবে, দিতে হবে অন্যান্য সুযোগসুবিধা। মধ্যস্বত্বভোগীদের গ্রাস থেকে যদি জমির মালিকানা উদ্ধার করা যায়, যদি যথার্থ কৃষিজীবীদের হাতেই তুলে দেওয়া যায় জমির মালিকানা—তাহলেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, শুধু আজকের ধারণা নয়, এ ধারণা কয়েক যুগ আগেই স্বামীজী পোষণ করেছিলেন। কিন্তু শুধু মালিকানা তুলে দিলেই হবে না, সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারি-

গরির যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে কৃষিক্ষেত্রে--এটা স্বামীজীর নির্দেশ ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, তিনি ভারতপথিকরূপে যখনই কোন দেশীয় রাজা বা মহারাজার দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই তিনি সেই সকল রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনাকালে কৃষি বা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতেন। দেশীয় রাজাদের তিনি উন্নয়নমূলক কাজে প্রেরণা দিতে সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ থেকে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, স্বামীজী যখন জুনাগড়ে গিয়েছিলেন, তখন সেই রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে তিনি রাজ্যের কৃষি ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তবে তিনি এই সত্য মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশীয় রাজারা কখনই সাধারণ দুঃস্থ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে সবল ও ঋজু করে গড়ে তুলবেন না। অথচ যুগের প্রয়োজনে প্রজা-সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি না হলে কোন রাজ্য মহারাজ্যই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না এবং সমগ্রভাবে বৃহত্তর ভারতের জাগরণও সম্ভব হবে না। তাই তিনি তৎকালীন বহু রাজা-মহারাজাকে মহত্তর মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে অনেক দেশীয় রাজা পরবর্তীকালে প্রজানুরঞ্জকরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ভুজ রাজ্যে যখন তিনি যান, তখন সেখানেও উক্ত রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে কৃষি, আর্থিক উন্নয়ন এবং শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করেন -এমন তথ্যও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়।[৪]

ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের বন্ধনমুক্তির জন্য শিক্ষাবিস্তার একান্ত অপরিহার্য। আজ সমাজশিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। এ সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তাধারা আধুনিক চিন্তার জনক। তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল সমস্যাটাকে বাস্তব পটভূমিকায় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই "My Life and Mission" শীর্ষক ভাষণে তিনি তাঁর পরিকল্পনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"Well then, my plans are, therefore, to reach these masses of India. Suppose you start schools all over India for the poor, still you cannot educate them. How can you? The boy of four years would better go to the plough or to work, than to your school."[৫]

দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে শিক্ষার চাইতে ক্ষুধার অন্ন অনেক বেশী সত্য। অথচ

দারিদ্র্যমুক্তির জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে আমাদের শোষিত ও বঞ্চিত কৃষক সমাজে শিক্ষাবিস্তার এক অপরিহার্য শর্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কৃষিকাজে নিয়োগ করতে হলে শিক্ষিত মন চাই, এটা স্বামীজী মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই তিনি গণশিক্ষা বিস্তারের পথ বলে দিলেনঃ

"But if the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed can come to the mountain. Why should not education go from door to door...If a ploughman's boy cannot come to education, why not meet him at the plough...just wherever he is? Go along with him, like his shadow."[৬]

আধুনিক সমাজশিক্ষার*ধারণা কিংবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলেও দেখতে পাব যে, বৃহত্তর জনসমাজ, যারা কৃষি-নির্ভর, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্য সামনে রেখেই সেসব রচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামীজীই এদেশে পথিকৃৎ। তিনি সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। ..ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।"[৭] "এদিকে (এদেশের) জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।"[৮] এটা ভারতপথিক স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তিনি দেশের কোটি কোটি "জ্যান্ত ঠাকুর"কে বাঁচাবার জন্য কৃষির উন্নতি করে অন্নের সংস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে কৃষকের জীবন পূর্ণায়ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা যখন অনুধাবন করি, তখন যেন মনে হয় সত্তর দশকের কোন মনীষী আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিকে নতুন দিগন্তে পেঁৗছে দিচ্ছেন।

শুধু এদেশে নয়, বিদেশের কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। মেরী লুই বার্ক রচিত "Swami Vivekananda : New Discoveries" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, আমেরিকা পরিভ্রমণকালে স্বামীজী সে দেশের সর্ব-শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আমরা দেখেছিঃ

"Nor was this familiarity acquired through contact with

intellectuals alone...he spoke also with laborers and farmers..."[৯] অর্থাৎ তিনি সে দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

আর এই বিপুল ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, বিজ্ঞান-শিক্ষার পরিপূরক হবে প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজী দেখেছিলেন স্বয়ংনিয়োগ বা আত্মনির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। এর দ্বারা বহুলোককে চাকরির উমেদারি থেকে বাঁচানো যেতে পারে।[১০] অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে যদি চিরাচরিত প্রথা ও পদ্ধতিকে বর্জন করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো যায়, তাহলেই কৃষির উন্নতি ঘটতে পারে। কারণ, "নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান্, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। ...উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়।"[১১]এই মন্তব্য এবং আধুনিক প্রগতিশীল কৃষকের ধারণা কি সমগোত্রীয় নয়? মান্ধাতা আমলের শ্রম ও পদ্ধতিকে বর্জন করার জন্য আজ যে কৃষি-সম্প্রসারণের কার্যসূচী অনুসৃত হচ্ছে, তা কি উপরে উল্লিখিত বক্তব্যেরই অনুসারী নয়? তিনি নানা ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসরণ করতে বলেছেন, যদিও অন্ধ অনুকরণের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ "পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরী গুখুরি ক'রে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে।"[১২] আজ আমরা শিক্ষিত যুবকদের কৃষিকাজে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করেছি এবং পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কৃষির উন্নতিতে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছি। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, আজ আমরা যা করতে চাই, সেটা করার নির্দেশ স্বামীজী বহুপূর্বেই দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিদেশীদের কথায় আমরা যতটা কর্ণপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, স্বদেশীয় চিন্তানায়কদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে হয়েছি ততটা উদাসীন। লজ্জার কি শেষ নেই?

কৃষিকাজকে হেয় জ্ঞান করার যে শতাব্দীপ্রাচীন অশুভ প্রবণতা আমাদের

তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, স্বামীজী তার বিরুদ্ধেও সবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজপুতানার আলোয়ারে অবস্থানকালে জনৈক শিষ্যের সঙ্গে আলোচনায় স্বামীজী যে উক্তি করেছিলেন তা উল্লেখ করতে পারি। তিনি শিষ্যকে বলেছিলেনঃ "দেখ, এ বিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি; কিন্তু দেখতে পাই, চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ বড় চায় না; এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারো মনে সমস্যাও ওঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এমনটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক, আমি তো ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটাই ভাল মনে করছি। চাষবাসের কথা বললেই এখন মনে হয়...দেশসুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে? দেশসুদ্ধ লোক তো চাষা আছেই; তাই না আমাদের এত দুর্গতি! তা নয়, শাস্ত্র পড়ে দেখ, জনক ঋষি এক হাতে লাঙগল দিচ্ছেন, আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। ...আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে।"[১৩] সাম্প্রতিক কালে শিক্ষিত মানুষও কৃষিকাজের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, গড়ে উঠছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়—কিন্তু জনক ঋষির উদাহরণ দিয়ে এদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমাজশিক্ষার সম্প্রসারণে বিশেষ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সম্প্রসারণ শিক্ষা কিংবা সমাজশিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যে ব্যক্তি যে জীবিকায় আছে, সেই ব্যক্তিকে উন্নততর জীবনমানে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষি-কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা উদ্রেক করার জন্য এবং কৃষকের সন্তানকে কৃষিবিজ্ঞানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ "জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল ক'র করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে।"[১৪] পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই সত্যের পুনরুচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছিলেনঃ "মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি,

কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।”[১৫] আধুনিক জনশিক্ষা আন্দোলন কি ও কেন—এ সম্পর্কে স্যার রিচার্ড লিভিং-স্টোনের বক্তব্য হচ্ছেঃ মনের দিক দিয়ে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলাই বড় কথা। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নিজ শক্তির সদ্ব্যবহারের সক্ষমতা—এটাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তার উৎস যে স্বামী বিবেকানন্দ, অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে তিনিই যে পথিকৃৎ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়।

বিদেশের অন্ধ অনুকরণ কিংবা বিদেশী ধাঁচে যে ভারতের কৃষিসমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান হবে তখনই, যখন ভারতীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা রচিত হবে—এটা আজ আমরা অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পর উপলব্ধি করেছি। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, স্বামীজী আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা অনুসারে ভারতীয় কৃষি কাঠামোর সংস্কার করা সম্পর্কে প্রথম যে ধারণা পোষণ করতেন, পরে সেই ধারণার পরিবর্তন করেন। এ সম্পর্কে নিবেদিতার উক্তিটি স্মরণীয়। “The Master As I Saw Him” গ্রন্থে (পৃঃ ২২১) নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যন্ত্রসহায়ে বড়বহরে আমেরিকার মতো এদেশেও চাষবাস করলে ভারতের উন্নতি হবে, এখন তিনি দেখছেন যে সে ধারণা ভুল, কেননা আমেরিকার চাষীর পক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব, তার জোতের পরিমাণ কয়েক মাইল নিয়ে গঠিত, কিন্তু ভারতে ঐ পদ্ধতি অচল, কারণ ভারতে জোতের পরিমাণ অনেক ক্ষুদ্র। স্বামীজীর এই উক্তির আলোকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, তিনি কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন। এদেশের বংশপরম্পরায় জমি খণ্ডিত হচ্ছে এবং খণ্ড খণ্ড জমিতে যন্ত্রনির্ভর চাষ সম্ভব নয়, নয় লাভজনকও। আমেরিকার ধাঁচে এদেশে খামার গড়তে পারলেই, কিংবা কালেক্টিভ ফার্মিং অনুসরণ করতে পারলেই যন্ত্রের ব্যবহার করা যাবে। দীর্ঘকাল আগে স্বামীজী যা বুঝেছিলেন বিশেষজ্ঞের মতোই আমরা আজ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

কৃষিগবেষণা এবং কৃষিশিক্ষার বিষয়ে তিনি অনেক যুগান্তকারী পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, যা আমরা অতি সহজেই বিস্মৃত হয়েছি, অথচ অনুরূপ বিষয়েই আমরা “বিদেশী বিশেষজ্ঞের” বক্তব্যকে অবলীলায় মাথায় তুলে নিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি গৃহীত কৃষকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের কর্মসূচী স্মরণ করা যেতে পারে। স্বামীজী গবেষণা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে ত্রি-সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং প্রথম সূত্রেই তিনি বলেছিলেনঃ “আমার যদি টাকা থাকিত

তোমাদের (ছাত্র-কৃষকদের) প্রত্যেককেই পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।"[১৬] দ্বিতীয়ত, তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সর্বত্র কৃষি সম্পর্কিত গবেষণাসংস্থা, যেখানে কৃষি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চলবে। এরা স্থানীয় কৃষকদের নিয়মিত তথ্যাদি সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেঃ "...চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। .. ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খোলা যাবে।"[১৭] সর্বশেষে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ "বর্তমানে যে সোজা কাজটুকু করা চলে, তা হচ্ছে—ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জন্য বাজার সৃষ্টি করা।"[১৮]

দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার যে আবেগ আধুনিক ভারতবর্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই আবেগের প্রথম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়। তথাকথিত শিক্ষিতজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেছিলেনঃ "তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি - এই তো! এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?"[১৯] আত্মস্বার্থপূরণ নয়, জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নে স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি সেদিনও ছিল এক অভ্রান্ত সত্য, আজও কি তাই নয়? তিনি চেয়েছিলেন এক আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সমাজের বিশাল অভ্যুদয়। তাই গ্রামভিত্তিক আমাদের ম্রিয়মাণ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ "লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না।"[২০]

কৃষি পরিকল্পনার মাধ্যমে এক সুস্থ ও সবল গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলাই ছিল স্বামীজীর ধ্যানজ্ঞান। তাই তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রামীণ

মানুষের শহরমুখী প্রবণতাকে কটাক্ষ করে বলেছিলেনঃ "পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না; শহুরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে। অন্যান্য জাতের মতো আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না। ...উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়াশোনা করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়োয়।"[২১]

এই "স্বধর্ম ত্যাগ" করার অভিশাপ আজও কি আমাদের গ্রামীণ সমাজকে বহন করতে হচ্ছে না? অসার শিক্ষাব্যবস্থা স্বকর্ম পালনে কখনই উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেনি, তাই গ্রামের শিক্ষিতজন শহরবাসী হয়, আর গ্রামগুলি আকণ্ঠ দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার অন্ধকার বক্ষে ধারণ করেই দীনতায় টিকে আছে। গ্রামমুখী বা গ্রামকেন্দ্রিক বৃত্তিশিক্ষা, তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা নয়—এটাই বর্তমান যুগের দাবি এবং এই দাবিই বিবেকানন্দ উত্থাপন করেছিলেনঃ "পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ তো প্রায় হয় না; ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়—চাষীদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে. লেখা-পড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়। ...এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামেশি হয়।"[২২] এটাও কি আমাদের সর্বাধুনিক চিন্তারই প্রতিফলন নয়?

আজ যখন বেকার সমস্যায় বিব্রত হয়ে আমরা কৃষিনির্ভর কর্মসংস্থানের দিকে নজর ফিরিয়েছি, যখন অনুভব করেছি, শুধু উৎপাদনের দিকে নয়, বেকারদের জন্য কাজের সংস্থান করার দিকেও নজর দিতে হবে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেনঃ "প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।"[২৩]

এবার আমরা সঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ শোষিত এবং বঞ্চিত কৃষকদের স্বার্থে বিপ্লব বা বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেননি কেন? এটাও কি বুর্জোয়া মানসিকতার প্রমাণ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তৎকালীন অপ্রস্তুত পরিবেশ এবং

অসংশোধিত পরিস্থিতির কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালেও জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকবিপ্লব এদেশে খন্ড খন্ড চেহারা ধারণ করলেও, সামগ্রিক সাফল্যের পথ খুঁজে পায়নি। তিনি মনেপ্রাণে বিদেশী শাসন এবং শোষণ থেকে এদেশের মুক্তি চেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা-লাভের পরে শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব। তিনি কোনদিনই হিংসাশ্রয়ী শ্রেণীসংঘর্ষে বিশ্বাস করতেন না। কারণ তিনি জানতেন ভারতের মাটিতে শ্রেণীবিদ্বেষ এক ভয়াবহ বিষবৃক্ষ রোপণ করবে। তিনি শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এদেশের আয় ও বণ্টনের সমতাসাধনের জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেনঃ "আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদন্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে... তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! ...আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল?...সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।"[২৪] এই দ্বিধাহীন কণ্ঠের সতর্কবাণী, এটাও কি বৃহত্তর মুক্তিসংগ্রামের পূর্বাভাষ নয়?

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ রীতিমতো সোচ্চার ছিলেন এবং সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণকে তিনি বার বার ধিক্কার জানিয়েছিলেন। রুশনেতা ক্রোপটকিন যখন ইংলন্ডে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সমাজ-তন্ত্রের অভ্যুদয় প্রত্যাশা বিবেকানন্দের কণ্ঠে রীতিমতো সবল ও ঋজুভঙ্গিতে প্রকাশিত। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলঃ "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[২৫] তবুও কি কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই আমরা বিবেকা-নন্দকে বুর্জোয়া হিসাবে চিহ্নিত করব? অজ্ঞতার সীমাহীন প্রতারণা ঐতিহাসিক বিচারে আদৌ ক্ষমার যোগ্য নয়। নীচতলার শোষিত মানুষের জন্য তৎকালীন সমাজে কোন সুসংগঠিত প্রয়াস না দেখে স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেনঃ "আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কার-

সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"[২৬] অর্থাৎ শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজন তিনি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলেন। সব কথা বলার পরও একথা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বিবেকানন্দ রাজনৈতিক নেতা কিংবা অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অপরাজেয় দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী। তিনি বলেছিলেনঃ "এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে!...আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' ক'রে ক'রে লোপ পেয়ে যাবি। ...এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।...এই জন্য বলি, এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান ক'রে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ।"[২৭] অর্থাৎ অসংগঠিত এবং অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াস সফল হয় না, বিদ্রোহ করাটা নিছক হঠকারিতায় পরিণত হয়, এটা স্বামীজী যেমন বুঝেছিলেন, আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায়ও সেটাই প্রমাণ করেছে। সেই-জন্যই তিনি গণশিক্ষা, গণচেতনা এবং গণসংগঠন গড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাতেই মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে এবং তারই ফলে ঘটবে শোষিত মানুষের জগতে গণজাগরণ। হিংসাশ্রয়ী পথে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হয়, সমন্বয়ের পথে সাধিত হয় নতুন সমাজের রূপায়ণ। সুতরাং কৃষক-বিদ্রোহের নামে হঠকারিতার পথ অনুসরণ করাটা যে এক ঐতিহাসিক অপরাধ হত—সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেদিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা কি অনেক রাজনৈতিক নেতা বা অর্থনীতিবিদের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল নয়?

স্বামী বিবেকানন্দ ও গণচেতনা

স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, বেদান্তপন্থী মুক্তিসাধক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সংসারকে একদিকে ত্যাগ করে আর একদিকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সংসারকে মায়া বা অলীক বলে অবহেলা নয়, তার মলিনতা, কলুষ দূর করা ছিল তাঁর কর্মবহুল স্বল্পস্থায়ী মরজীবনের একটি প্রধান অভীপ্সা। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তিনি দেশী ও বিদেশী গণজীবন নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। গণচেতনার জাগরণ প্রসঙ্গ তাঁর কর্মপ্রয়াসে একটি বড় জায়গা দখল করে আছে। অবশ্য এরও কারণ তাঁর অধ্যাত্মজীবনের মর্মমূলেই নিহিত ছিল। ভারতীয় ঔপনিষদিক তথা বৈদান্তিক দৃষ্টিতে জীব-জগতের সর্ববিধ প্রকাশের মধ্যে পরম ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব সুপ্রকট। সুতরাং সাধারণ মানুষ নামে বিশাল জনসমাজকে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা যুগ যুগ ধরে যে শোষণ করে আসছে, তা একান্তভাবে ধর্মবিরুদ্ধ। কারণ ঈশ্বর তো "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সেজন্য স্বামীজীর চিন্তাক্ষেত্রে গণজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

সমকালীন ভারতবর্ষে ভারতীয় গণজীবন যে অধঃপতিত অবস্থায় ছিল, তার জন্য তিনি অনেক জায়গাতেই সমাজের উচ্চবর্গের নেতৃস্থানীয় উৎপীড়ক শ্রেণীকে দায়ী করেছেন। এদের প্রতি তীব্র ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন।[১] তাঁর অপরিসীম আস্থা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণ বা 'গণে'র উপর। তাই তাঁর চিন্তায় দেখি একদিকে গণচেতনার উদ্বোধনের ঐকান্তিক প্রয়াস, অন্যদিকে দেশীয় শিক্ষিত বিত্তবান উচ্চবর্গের মানুষের মন থেকে জনসমাজ সম্বন্ধে ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা এবং শোষণের প্রবৃত্তি দূর করে সমগ্র জনসমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত করার আগ্রহ। স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" নামীয় পুস্তিকাটি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে লেখা। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' এবং "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর 'বিড়াল' রচনায় সম-অধিকারবাদের কথা বললেও কার্ল মার্কসের শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত

শ্রমিকরাজের কল্পনা তখনও ভারতীয় জীবনে অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু "বর্তমান ভারত" গ্রন্থে স্বামীজী শোষক এবং উৎপীড়ক সমাজনেতাদের প্রধান ত্রুটি যে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, একথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষ বা জনসাধারণকে বলেছেন 'শক্ত্যাধার'—সমাজশক্তির উৎসস্থল। এই "শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ"কে অবহেলা করে ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়শ্রেণী ক্ষমতা হারিয়েছে। বৈশ্য বা পুঁজিপতি ব্যবসায়িক ও শিল্পপতি শ্রেণী যদিও সমকালে ক্ষমতার শীর্ষে বিরাজমান, তবু স্বামীজী অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এরাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের 'মৃত্যুবীজ' নিজেরাই বুনে চলেছে। কিন্তু সমস্ত শক্তির আধার হয়েও সমকালীন ভারত ও বৃহত্তর বিশ্বে গণজীবনের ঐ রকম অসহায় অবনমিত অবস্থা ছিল কেন? কি কারণে তাদের এমন দুর্গতি! স্বামীজী নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেনঃ নিজেদের শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, বিফল প্রযত্ন এবং উদ্দেশ্য সাধনে মিলিত উদ্‌যোগের অনস্তিত্বই সেদিন তাদের এই দুরবস্থার কারণ ছিল। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল উচ্চবিত্ত শোষকশ্রেণীর অবিচার এবং কূট কৌশল। কিন্তু একথা তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, গণচেতনার উদ্বোধন এবং দরিদ্র পদানত নিরন্ন সাধারণ দেশবাসীর সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় জীবনের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই। দীর্ঘকাল অবজ্ঞা পেতে পেতে মানুষগুলির নিজেদের উপরই আর কোন আস্থা নেই। স্বামীজীর বিবৃত সেই "প্যাটের গল্প" মনে পড়ে,[২] কিংবা সিংহশিশুর আবাল্য মেষযূথের সঙ্গে বর্ধিত হবার গল্পটি। জন্মাবধি মেষপালের মধ্যে বর্ধিত সিংহটিকে অন্য একটি সিংহ যে মুহূর্তে জোর করে ধরে এনে হ্রদের জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখাল, তখনই সে সিংহস্বরূপ বুঝতে পেরে গর্জন করে মেষপাল থেকে বেরিয়ে গেল। এতকাল সে নিজের সত্তাকে ভুলেছিল, নিজেকে মেষ বলেই ভেবে এসেছিল।[৩]

প্যাট্ এবং ঐ আত্মবিস্মৃত সিংহের মতোই ভারতীয় জনগণ সেদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বামীজী তাই এই মানবসমূহ বা গণের আত্ম-চেতনার উন্মেষ তথা তাদের ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণকে ফলিত বেদান্তের একটি দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। আর এই কারণেই বিশেষভাবে জনশিক্ষা এবং

জনসেবার উপর সমধিক জোর দিয়েছিলেন। জনশিক্ষা এবং জনসেবা কোন্ পরিকল্পনা অনুসারে চালিত করতে হবে, তারও সুস্পষ্ট নীতি ও পথনির্দেশ তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর ভাষণ, কথোপকথন, পত্রাবলী, কবিতা, প্রবন্ধ অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, ভারতীয় গণজীবন সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা কত আন্তরিক ছিল! গণচেতনার জাগরণ এবং গণশক্তির সুসংহতির উপর তাই তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা যেমন প্রাগ্রসর, তাঁর নির্দেশিত পন্থাও তেমনি বাস্তব ও যুক্তিনির্ভর। এ সমস্ত বিষয়ের চিন্তায় তিনি তীক্ষ্ণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন, শুধু ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হননি। একজন প্রকৃত চিন্তানায়কের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনি বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী বিশ্লেষণী দূরদৃষ্টিতে দেশবিদেশে অবশ্যম্ভাবী গণ-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা-মুখে স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' ও "বর্তমান ভারত" গ্রন্থ দুটি রচিত ও প্রকাশিত হয়।[৪]

এই দুটি রচনায় ভারতীয় গণজাগরণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও শিল্প ক্ষেত্রে তার অভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতিতে অধিক সংখ্যায় জনগণের অংশ-গ্রহণ এবং শিল্প (industry) ক্ষেত্রে কর্মি-ঐক্য-সংগঠন (trade unions) সমূহের মাধ্যমে জনগণ যে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে এবং এই অধিকার আদায় করার জন্য সংগ্রামে রত হয়েছে তা স্বামীজীর সুস্থ, প্রাগ্রসর, মহৎ চিন্তারই ফলশ্রুতি। "বর্তমান ভারত" গ্রন্থে তিনি যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছেন, তা আসলে সাধারণ মানুষের চেতনার উদ্বোধনকেই ইঙ্গিত করে। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে, আগামী দিনে শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর (মার্ক্সীয় পরিভাষায় 'প্রলেতারিয়েত') অভ্যুত্থান ঘটবেই। কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা বিভিন্ন যুগে জনগণের শোষণের উপরই নিজেদের সম্পদের পাহাড় জমা করেছে; অথচ যাদের প্রাণান্ত রুধিরস্রাবী পরিশ্রমে সম্পদ উৎপন্ন হচ্ছে, তাদের ঘৃণা ও অবহেলায় নীচে ফেলে রেখেছে। সামাজিক নিয়মে ইতিহাসের ধারাপথেই তাই একদিন বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের

বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[৫] কিন্তু এই চেতনার জাগরণে প্রধান অন্তরায় ছিল সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অনৈক্য এবং আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেদের ভিতর সংহতি স্থাপিত হচ্ছিল এবং আপন শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণ সজাগ হচ্ছিল। স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত-বাক্য ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—"এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...।"[৬] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লব স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৭] কিন্তু ভারতবর্ষে এই গণ-অভ্যুত্থান কোন্ পথে আসবে, সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি। তবে হিংসার পথ যে তাঁর কাম্য নয়, সেকথা সহজে অনুমেয়। কারণ ভারতীয় জীবনাদর্শ এ পথের সমর্থক নয়।[৮]

ভারতীয় গণচেতনাকে সজাগ করার জন্য তাঁর পরিকল্পনায় শিক্ষাবিস্তার একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, ডিগ্রী বা উপাধিলাভ নয়, মানুষের ভিতরে যে অপার সম্ভাবনা আছে, অনন্ত শক্তি আছে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগানো। এই বিশ্বাস জাগানোর জন্য ভারতীয় অধ্যাত্মবোধে গণচেতনাকে পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। তারা যদি বোঝে যে, তারা এসেছে অনন্ত শক্তির উৎস থেকে, অনন্ত শক্তির বিকাশেই তাদের ভাগ্যলিপি নির্ভরশীল, তবে তাদের হীনম্মন্যতা কেটে যাবে, সুপ্ত সিংহ জেগে উঠবে। সমস্ত ভারতবাসী যদি পরস্পরকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারে, তবে

জনজীবনের উন্নয়নে আর কোন দুঃসাধ্য সমস্যা থাকে না। তাই একদিকে প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে আবশ্যক ধর্মশিক্ষার বিস্তার। ভারতীয় জীবনের মূলভিত্তি যেহেতু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য ধর্মকে সমস্ত জাগরণের কেন্দ্রে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে, সেই সঙ্গে নিতে হবে জনকল্যাণের নানা প্রকল্প। দুঃখপীড়িত মানুষের দুঃখ দূর করা, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা, মহামারীগ্রস্তকে চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা—সবই এই জনসেবার লক্ষ্য হতে পারে। আর জনকল্যাণ মানে জনগণকে দয়া নয়, ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা, নররূপী নারায়ণের পূজা। এই 'পূজা' কথাটির উপর তিনি খুবই জোর দিয়েছেন। এই পূজায় পূজক এবং পূজিত উভয়েরই কল্যাণ হয়। ৯

এ প্রসঙ্গ আর বেশীদূর না টেনে আমরা শুধু একথাটিই প্রতিপন্ন করতে চাই যে, স্বামীজী জনসেবাকে ঈশ্বর-আরাধনারই ব্যবহারিক প্রকাশ বলে মনে করেছেন—একে বলেছেন "কর্মে পরিণত বেদান্ত" (Practical Vedanta) জনসেবার উদ্দেশ্য যদি শুধু অসহায় মানুষের দুঃখে সহায়তা ও সহানুভূতি বোঝায় তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। ভারতে পদদলিত, নিপীড়িত জনসাধারণ তখন প্রায় পশুবৎ জীবনযাপন করছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে সেদিন সেবামূলক কাজের খুবই দরকার ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল, জনসাধারণের লুপ্ত মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধার। এরই জন্য শিক্ষা একটি বড় হাতিয়ার। অবশ্য এ শিক্ষা পরীক্ষা পাশের জন্য যান্ত্রিক শিক্ষা নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা, নিজের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার শিক্ষা।

আমরা এ প্রবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করেছি, গণচেতনার দুটি দিকঃ ১। জনগণের চেতনার জাগরণ ; ২। সমাজের শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মন থেকে গণজীবন সম্পর্কে অবজ্ঞা দূর করা। দুটিই সেদিনকার ভারতবর্ষে খুব কঠিন কাজ ছিল। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, গুরু রামানন্দ তাঁর আরাধ্য দেবতার আদেশ পেয়ে পথে বেরোলেন অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের বুকে তুলে নেবেন বলে। শ্মশানে চণ্ডাল নাভা শবদাহ করছিল। রামানন্দ তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হওয়ামাত্র নাভা ভয়ে সাত পা পিছিয়ে গেল। তার করুণ মিনতিঃ "প্রভু, আমি

চণ্ডাল,... হেয় আমার বৃত্তি, অপরাধী করবেন না আমাকে।" যুগ যুগ অবজ্ঞা আর নিপীড়ন সহ্য করতে করতে নাভাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তারা মানুষ নয়। একটা নিঃসীম অপরাধ ও হীনতাবোধের গুরুভার চাপে এদের মনুষ্যত্বচেতনা বিলুপ্ত। উচ্চবর্ণের লোকদের নিষ্পেষণে এরা আজ শুধু "ভারবাহী পশু"। 'পুনশ্চ'[১০] কাব্যগ্রন্থ রচনার অনেক আগেই স্বামীজী 'পরিব্রাজক' ও "বর্তমান ভারত" গ্রন্থে এরকম ভাবের কথা বলেছেন। পত্রাবলী, কথোপকথন, ভাষণ (ভারতে বিবেকানন্দ), প্রবন্ধাবলীর অনেক জায়গাতেই গণচেতনার শতাব্দীসঞ্চিত জড়ত্বের কথা বলেছেন। শত শত বৎসরের অবজ্ঞার চাপে যাদের জীবন শুষ্ক, নিরানন্দ মরুভূমি-প্রায়, তাদের চেতনায় নতুন আশার সঞ্জীবন-শক্তি আনা কী সহজ কথা! এটা করতে গেলে প্রথমে সুবিধাভোগী শ্রেণীকেই অনেকখানি এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে নিষ্কাম সেবাব্রতী কর্মি-দলকে—তা ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল হতে পারে, অথবা সেবাপরায়ণ সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীর দলও হতে পারে। একবার তারা কাজ শুরু করলে ধীরে ধীরে গণমানস থেকে হীনতার ভাব দূর হবে ; আস্তে আস্তে নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন হবে। স্বামীজীর নির্দেশিত পথে কাজ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃত সাফল্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তী-কালে কংগ্রেসের সেবাদল এবং গান্ধীজীর হরিজন-কল্যাণ স্বামীজীর চিন্তার প্রেরণা থেকেই কার্যকর হতে পেরেছিল। অভিজাত-বর্গের মন থেকে সাধারণ মানুষের উপর ঘৃণা ও শোষণের মজ্জাগত অভ্যাস দূর করাও সেদিন কঠিন কাজ ছিল। স্বামীজী এ ব্যাপারেও অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে খেতড়ির রাজা অজিত সিং প্রজাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।[১১] স্বামী অখণ্ডানন্দ খেতড়িতে অবস্থান কালে সাধারণ প্রজার দুঃখদর্শনে ব্যথিত হয়ে ইতিকর্তব্য জানার জন্য আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে চিঠি লেখেন।[১২] উত্তরে স্বামীজী তাঁকে লেখেনঃ

"রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্ম্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।... খেতড়ী সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে।... মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর,

বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম্ম কর তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।...পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব',—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে।"[১৩] দু-বৎসর খেতড়িতে অবস্থান করে স্বামী অখণ্ডানন্দ দরিদ্র প্রজাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রগঠনে ব্রতী হন। গুরুর নির্দেশে খেতড়ির রাজা সানন্দে তাঁকে সবদিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন। পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি-পীড়িতদের মধ্যে যে সেবাকার্য করেন, তাতেও স্বামীজীর অকুণ্ঠ উৎসাহ ও অনুপ্রাণনা ছিল।[১৪]

সন্ন্যাস গ্রহণের পর পদব্রজে সারা ভারত ঘুরে ভারতের অবহেলিত জনসাধারণের দুর্দশার চিত্র নিজ চোখে স্বামীজী দেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই দুর্বল অসহায় বিরাট গণসমাজকে তুলতে হলে আগে সমাজের শিক্ষিত সুবিধাভোগী মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার। সেজন্য শিষ্যদের মধ্যে খেতড়িরাজ, রামনাদরাজ, আলাসিংগা প্রমুখকে বার বার জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। 'পত্রাবলী'তে এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তিনি মনে করতেন যে, সমাজের উচ্চবর্গের লোকদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ তারা কোটি কোটি মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রমে উৎপন্ন সম্পদ ও অর্থের বিনিময়ে শিক্ষিত ও বিত্তবান হচ্ছে। তাই অগণিত মানুষের প্রতি তাদের একটা কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। স্বামীজীর এই বজ্রগর্ভ ঘোষণা তাদের এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই উচ্চারিত হয়েছিলঃ "যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও তাদের কথা একটি বারও চিন্তা করবার অবসর পায় না, তাদের আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করি।"[১৫]

আবার একথাও তিনি জোর দিয়েই প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় জনগণের মধ্যে অপার সহিষ্ণুতা, সুদৃঢ় কর্মক্ষমতা এবং সিংহ-বিক্রম লুকিয়ে আছে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি বহুজনবিদিতঃ

"এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে

অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্য-কালে সিংহের বিক্রম!!"[১৬]

ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত বিরাট সম্ভাবনায় তিনি আস্থাবান ছিলেন বলেই বার বার এদের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন, বিশেষত, তাদের ধর্মজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'কর্মযোগ' বক্তৃতায় ভারতের অতি সাধারণ লোকও কিরূপ অসাধারণ ধর্মতত্ত্বোপলব্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের অধিকারী, তার উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের 'ধর্মব্যাধ' নামক কসাইয়ের কাহিনীটি বিবৃত করেছেন।[১৭] কসাইয়ের বৃত্তিজীবী ধর্মব্যাধ শুধু নিষ্ঠার সংগে নিজ দায়িত্ব এবং মাতৃসেবার সামাজিক কৃত্য সম্পাদন করে উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিল। ভারতের গণসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকুক, কর্মশক্তি এবং ধর্মসম্পদ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ ইউরোপে নানা জায়গায় গণজাগরণ দেখে তিক্তবিরক্ত এবং শঙ্কাকুল হয়ে যে ঘৃণাসূচক বাক্যবাণ গণ-অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছেন,[১৮] স্বামীজীর কল্পনাতেও সেরকম ভীতিমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব আসত না। আমরা এখানে বিশ্ববিশ্রুত স্পেনীয় লেখক গ্যাসেটের কথা বলছি। ইউরোপের স্থানে স্থানে এবং বিশেষ করে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার গণজাগরণ দেখে আশঙ্কা এবং ঘৃণা-মিশ্রিত কণ্ঠে গ্যাসেটের উচ্চারণঃ "We are living, then, under the brutal empire of the masses".[১৯]

তাঁর মতে জনসাধারণের কোন স্বাধীন মতামত, নীতিবোধ এবং সভ্যতা থাকতে পারে না। এগুলি পূর্বতন বুদ্ধিজীবী-সমাজের মুষ্টিমেয় অসাধারণ মানুষের একচেটিয়া সম্পত্তি। আর জনসাধারণ হল "...the assemblage of persons not specially qualified",[২০] এবং "The average man finds himself with 'ideas' in his head, but he lacks the faculty

of ideation".[২১] গণসমাজ একটা বুদ্ধিবৃত্তিবর্জিত জড় মানবসমষ্টিমাত্র, উচ্চ কোন ভাব ধারণের ক্ষমতা তার নেই, সভ্যতা স্থাপনের শক্তি ও কল্পনা তাদের থাকতেই পারে না—তাদের দ্বারা জগতে শুধু "বর্বরের সাম্রাজ্য"ই (brutal empire) প্রতিষ্ঠিত হবে, গ্যাসেটের এই মত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শিক্ষিত লোকদের মনোভাবেরই প্রতিফলন। একে সামন্তপ্রভু এবং 'বুর্জোয়া' বুদ্ধিজীবীর আস্ফালন ও আক্ষেপ বলা যেতে পারে।

কিন্তু বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞান এবং জীবনে তার উপলব্ধি স্বামীজীকে কখনও এই বৃহত্তর গণমানবকে ঘৃণা করার মতো অহঙ্কার বা ভ্রান্তিতে ফেলেনি। ভারতীয় গণসমাজ সম্বন্ধে তাঁর যেমন উচ্চ ধারণা, তেমনি তাদের দুরবস্থার জন্য তাঁর দুঃখবোধও অপরিমেয়। তিনি একথা বার বার বলেছেন যে, ভারতের উন্নতি গণজীবনের উন্নতি ছাড়া কখনও সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ ভারতে যেহেতু শূদ্রযুগ আসবেই, সেই হেতু শূদ্র তথা প্রজাপুঞ্জের আর্থিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। শূদ্রযুগের আগমন-সম্ভাবনাকে স্বামীজী স্বাগত জানিয়েছেন, গ্যাসেটের মতো আক্রোশে বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জন দেননি। তবে যত শীঘ্র সম্ভব গণজীবনকে প্রায়াসন্ন দায়িত্ববহনের যোগ্য করে তোলা যায়, ততই মঙ্গল। স্বামীজীর অনুজ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অগ্রজের ভবিষ্য-দৃষ্টির প্রশংসা করে লিখেছেন যে, স্বামীজী শূদ্র অভ্যুত্থানের আগমনী যখন গেয়েছেন, তখন রাশিয়ার লেনিন সর্বহারাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের চিন্তাও করেননি, চীনের মাও-সে-তুঙ্-এর তখন অভ্যুদয়ই ঘটেনি।[২২] শূদ্ররাজের যে কল্পনা স্বামীজী করেছিলেন, তাকে এক কথায় বলতে পারি গণরাজ। কিন্তু এ গণরাজের দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। "বর্তমান ভারত" পুস্তিকায় দৃঢ় কণ্ঠে তিনি জানিয়ে দিয়েছেনঃ "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[২৩]

একজন লেখক মন্তব্য করেছেনঃ "সমগ্র ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকের সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজশাসনবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি (স্বামীজী) সেই সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই ; শূদ্র-মুচি-

মেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী সত্তাবর্জিত অর্থহীন কথাদ্বারা কৃষকের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এড়াইয়া গিয়াছেন।"[২৪] স্বামীজীর রচনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় থাকলে যে কোন পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, ভারতের কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি কত সচেতন। 'পত্রাবলী', "ভারতে বিবেকানন্দ" এবং "স্বামি শিষ্য সংবাদ" গ্রন্থ তিনটি খুঁটিয়ে দেখলেই আমাদের এ মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর লেখায় যে শূদ্র-মুচি-মেথরের কথা আছে, তারা শ্রেণীসত্তাবর্জিত হবে কেন? তারাই তো এযুগের 'প্রলেতারিয়েত'। একথা বুঝবার জন্য উপরি-উদ্ধৃত "শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য" কথাটার তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার। সর্বহারাশ্রেণীর কাঁধে পূর্ববর্তী যুগের সমাজপ্রভুদের শ্রেণীচরিত্রের অভিমান ভূতের মতো চেপে বসবে না। তাদের অফুরন্ত কর্মশক্তি আপনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথ পাবে। কিন্তু শূদ্রসংহতি সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনার মর্মার্থ তাঁর ভাষাতেই পেশ করা যাকঃ

"If it is possible to form a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last can all be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state."[২৫]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ যদি মিলিত করে একটি পূর্ণায়ত জীবনাদর্শ গড়ে তোলা যায় এবং তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা যায়, তবে আসন্নপ্রায় শূদ্র-যুগ হবে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ। শূদ্রসংস্কৃতির অন্য নাম গণসংস্কৃতি। ভারতীয় গণসংস্কৃতি হবে একটি বিভেদহীন সমন্বিত সংস্কৃতি। এর গতিপ্রকৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মৌলিক নির্দেশ আছে। তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে শূদ্রে অবনমিত করে নয়, শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করেই এই সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এ বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা এই রকমঃ

"জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন।

জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ...।

"উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া (মার্ক্সীয় পরিভাষায় যাকে declassed হওয়া বলে) এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।"[২৬] স্বামীজীর মতেঃ ব্রাহ্মণত্বই হচ্ছে "মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ" আর 'সত্যযুগ' হচ্ছে বিভেদহীন আদর্শ সাম্যসমাজের যুগ। 'সত্যযুগ' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খুবই আধুনিকঃ

"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচন্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, পন্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল-ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।.. ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"[২৭] ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে তাঁর মন্তব্য প্রকাশিতঃ "আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।"[২৮]

দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সত্যযুগ হচ্ছে একটি শ্রেণীবৈষম্যহীন সমন্বিত সাম্যসমাজের যুগ। সেযুগে গণজীবনের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটবে; সর্বদিক থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে শোষণমুক্ত গণরাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আগামী সত্যযুগের প্রত্যাশিত দায়িত্ব।

কিন্তু এই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপে জনগণের আর্থিক সমস্যা নিরাকরণ, অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণ এবং দায়িত্বসচেতন ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার উন্নতি অনেকখানি কৃষককুলের উন্নতির উপর নির্ভর করে। খুব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বামীজী ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। তাদের অবস্থার উন্নতি কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশ যুক্তিভিত্তিকঃ "আমাদের mission

(কার্য্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য ; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।... কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও... চাষাভুষো মৃতপ্রায় ; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র!"[২৯] গণজীবনের মূল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমতে কোনও অস্পষ্টতা নেই। খুব জোর দিয়েই বলেছেনঃ "মনে রেখো,—দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।... জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগের হৃত ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব।"[৩০]

স্বামীজীর গণচেতনার একটি বড় দিক হচ্ছে জনগণের কায়িক শ্রমের মর্যাদাকে স্বীকৃতিদান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।"[৩১] কর্ম এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রাচীন চার বর্ণের বিভাগ হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে, দৈহিক শ্রমজীবী মানুষের উপর উচ্চবর্ণের অবহেলা ঘৃণার নামান্তর হয়ে মানবতাবিরোধী জাতিভেদের রূপ নিল। কিন্তু বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমবণ্টন (division of labour)। এই শ্রমবিভাগের দ্বারা জাতীয় জীবনের কর্মরথটি সচল রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। স্বামীজী তাই কায়িক পরিশ্রমজীবী ভারতের অবহেলিত জনসমাজকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাদের উপর দৃঢ় আস্থা ঘোষণা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই এই মনোভাব ব্যক্ত করা যাকঃ "এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ -এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল

কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই।...তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট কোট পরে সভ্য না হয় নাই হ'তে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?...এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে।"[৩২]

শুধু শ্রমের মর্যাদা স্বীকার নয়, যে ভারতীয় শ্রমজীবীরা বহু প্রাচীন সভ্যতা সমূহের ও জাতি সমূহের উদয়-বিস্তারের মূল নেপথ্য-নায়ক, তাদের তিনি প্রণতি জানিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেছেনঃ "...ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।"[৩৩]

স্বামীজী ভারতীয় শ্রমজীবী গণমানুষের কর্মক্ষমতা, সহনশক্তি, বুদ্ধি ও ধর্মচেতনাকে সাধুবাদ জানিয়ে এযুগের গণচেতনার উদ্বোধন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ন ঐতিহাসিক বিচারের স্বাক্ষর পেয়ে আমরা বিস্ময় মানি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্বসংস্পর্শী মননক্ষমতায় আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, স্বামীজীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। আজ দেশ স্বাধীন। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু স্বামীজী-কল্পিত শ্রেণীহীন সাম্যসমাজ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আজকের স্বাধীন ভারতে জাতির কর্তব্যের কথা স্মরণে আনা যাকঃ

"The nation must ponder about the program of Swami

Vivekananda in the perspective of an independent India, and work out its future advancement."[৩৪]

স্বামীজী বলতেন, গণচেতনার উদ্বোধনে সহায়তা, শিক্ষার প্রসার, কর্মের সুযোগ বাড়াতে চেষ্টা করা হচ্ছে সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী শ্রেণীর কর্তব্য। গণচেতনার জাগরণ ঘটলে ভবিষ্যতে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি আমেরিকা থেকে মাদ্রাজী শিষ্যগণকে লিখিত পত্রে এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেনঃ

"My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody, and then let men and women settle their own fate. Let them know what our forefathers as well as other nations have thought on the most momentous questions of life. Let them see specially what others are doing now, and then decide. We are to put the chemicals together, the crystallisation will be done by nature according to her laws ... keep the motto before you—'Elevation of the massess without injuring their religion'. . .Onward for ever! Sympathy for the poor, the down-trodden, even unto death—this is our motto".[৩৫]

আমরা শুধু রাসায়নিক উপাদানগুলি (Chemicals) এক সঙ্গে মিলিত করব. তারা প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ আকার নেবে। সমাজধারার ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। শিক্ষার দ্বারা জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বাকিটা তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে ঠিক করে নেবে। আধুনিক ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র নানা আকারে প্রচলিত আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জাগ্রত জনগণ। কারণ গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্যের অনেক দেশ ঘুরে সংসদীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) যে রূপ দেখেছিলেন, তাতে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালকদের ত্রুটিতে তাঁর ক্ষোভই জেগেছে। স্বভাব-সুলভ পরিহাসবিজল্পিত স্বরে তিনি সেই ক্ষোভের প্রকাশ দেখিয়েছেনঃ

"ও তোমার 'পার্লেমেন্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট

মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।... অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র!... যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হ'লে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম!"[৩৬] সেদিন দেশে দেশে গণতন্ত্রের এই চেহারা দেখে স্বামীজী হতাশ হয়েছিলেন। আর সেজন্যই বলেছিলেন যে, তিনি একজন সমাজতন্ত্রী (Socialist)। অবশ্যই এই ব্যবস্থাকে যে নির্ভুল বলে মনে করতেন, তা নয়। উন্নততর গণকল্যাণ-মুখী অন্য কোন ব্যবস্থার অভাবেই সেদিন তাঁকে সমাজতন্ত্রের দিকে তাকাতে হয়েছিল।[৩৭]

কিন্তু এই সমাজতন্ত্রও ভারতে সফল হবে না, যদি গণজীবনের অবনতি চলতেই থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষ শাসনব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মিশ্র নীতি অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র-শাসিত সমাজতন্ত্র ভারতে পরীক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার সফলতাও নির্ভর করে গণজীবনের উন্নতির উপরেই। ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষায় গণসমাজকে সুদৃঢ় না করলে ভোট-ব্যালট প্রহসনে দাঁড়ায়। আর শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাবে আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে অগণিত সাধারণ মানুষ বা 'গণে'র দিকে তাকাতেই হবে। তাদের নীচে ফেলে নয়, উপরে তুলেই গণতান্ত্রিক সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যম ফলপ্রসূ হতে পারে। এ পরীক্ষায় ভারত স্বাধীনতার আটাশ বছর পরেও খুব উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ভবিষ্যতে এ পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হবে কিনা তা অনুমানের ব্যাপার। তবে স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারত একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জগতে উন্নত মস্তকে আপন গৌরব ঘোষণা করবে এবং সে গৌরবের ধ্বজা উচ্চে তুলে রাখবে ভারতীয় জনগণ।

নারীজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমান জগতে দেশে-বিদেশে সর্বত্র চলছে নানাবিধ আন্দোলন, কোথাও তার লক্ষ্য সাময়িক সমস্যার দূরীকরণ, কোথাও বা এমন বিশিষ্ট মতবাদ যাকে মনে হয় সর্বকালের সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র অপরিহার্য পন্থা বা নীতি। তাছাড়া আছে বিভিন্ন রাজনীতির আলোড়ন। এরই মধ্যে দেখা যায় একটি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, যার নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। মূলত আধ্যাত্মিক এই আন্দোলনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্যই এ আন্দোলন চমকপ্রদ নয়, তাৎক্ষণিক উত্তেজনা বা আড়ম্বরের সঙ্গে তার যোগ নেই। তার প্রকৃতি শান্ত, কিন্তু গভীর। দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে ভারতের সর্বত্র, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে, চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সমাজের চিন্তাধারার পরিবর্তন আনছে এবং সর্বোপরি, অলক্ষ্যে বহু নরনারীর হৃদয়ে এক মহৎ উচ্চ জীবনযাত্রার প্রেরণা সঞ্চার করছে।

ভারতের পুনরুত্থানকল্পে যে দুটি লক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা হল নারীজাতির মুক্তি ও জনসাধারণের উন্নতি সাধন। তিনি চেয়েছিলেনঃ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের পথ উন্মুক্ত হোক। কোন দেশ বা জাতির সমস্যাগুলি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক বলে বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মূল ভিত্তির উপর স্থাপিত হলে কোন সমস্যার সমাধানই আর দুঃসাধ্য মনে হয় না। স্বামীজীর মতে নারীজাতি ও জন-সাধারণের প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের উপরেই নির্ভর করছে ভারতের উন্নতি ও সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান। ভারতের ধর্ম ও শাশ্বত সনাতন অধ্যাত্ম-ভিত্তিক সংস্কৃতি থাকবে সেই শিক্ষার মূলে।

ভারতের সন্ন্যাসিবৃন্দ সাধনপথের অন্তরায় জ্ঞানে চিরকাল নারীজাতিকে দূরে পরিহার করে এসেছেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিন্তু অত্যন্ত সচেতন-ভাবে নারীজাতির কথা চিন্তা করেছেন, কারণ যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। "একপক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।"

এই প্রসঙ্গে ভারতের নারীজাতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের যেযুগে প্রথম সভ্যতার অভ্যুদয়, সেই বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল বলে স্বীকৃত। পতি এবং পত্নীর একত্র যজ্ঞ সম্পাদনের

অধিকার ছিল। এটা ছিল তদানীন্তন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বহু নারী ছিলেন 'ঋষি'—অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা—সমাজে যাঁদের স্থান সকলের উচ্চে। বাক্‌ঋষির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে তিনি সূক্ত রচনা করেন—যার নাম "দেবী সূক্ত"। সমাজে নারীর অবস্থা পুরুষের অপেক্ষা হীনতর ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতঃপর উপনিষদের যুগেও দেখা যায় নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গী ভারত-ইতিহাসে চিরকাল নারীর সর্বোচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হয়ে থাকবেন—এবং সেযুগে ব্রহ্মবাদিনীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল না। বৌদ্ধযুগেও অধ্যাত্মজগতে নারীর স্থান উচ্চই ছিল, যদিও একথা স্বীকৃত, পরবর্তীকালে সঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান ছিল ভিক্ষুর নিম্নে।

প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি ও পুরাণের যুগ থেকে নারীর অবস্থার অবনতি শুরু। যদিও স্মৃতিকার মনুর মতে ঃ "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এবং "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—অর্থাৎ কন্যাকে যত্নপূর্বক পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত এবং যেখানে নারীগণ পূজিত সেখানেই দেবতাগণ আনন্দলাভ করেন, ইত্যাদি। তথাপি অন্যান্য স্থলে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আর ছিল না। গৃহে মর্যাদা যদি বা থেকে থাকে, সমাজে কিছুই ছিল না। স্মৃতি-পুরাণাদির রচয়িতা পুরুষ, এবং যত প্রকারে সম্ভব গৃহের শ্রী-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার জন্য নারীকে যতটা সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন তার বিন্দুমাত্র বেশী দেননি। স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। মনে বিস্ময় জাগে, পুরুষ না হয় নারীকে স্ববশে রাখতে চেয়েছিল, নারী কেন তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি? মনে হয়, কোমলা, অবলা নারীর দৈহিক কোমলতা অপেক্ষা তার কোমল অন্তঃকরণ ও ভাবপ্রবণ স্বভাবই ছিল প্রধান বাধা। এবং বলা বাহুল্য, তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পুরুষ বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেনি। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে নারীর অবস্থা হীনতর হয়ে অবশেষে অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ হল, কেমন করে একদা ভারতের তেজস্বিনী ব্রহ্মবাদিনী এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শস্থানীয়া উচ্চ অধিকারিণীগণ তাদের ত্যাগবৈরাগ্যপূর্ণ উন্নত জীবনযাত্রা থেকে চ্যুত হয়ে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসাবে কেবল সংসারযাত্রা নির্বাহে সন্তুষ্ট রইল, তার ইতিহাস সত্যই বিস্ময়কর। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। স্মৃতিযুগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু নারীর অবিস্মরণীয় কীর্তিচ্ছটায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই! পরবর্তীকালে বৈদেশিক আক্রমণের যুগ থেকে নারীর ভাগ্যচক্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন—যা অন্ধকারময় মধ্যযুগ বলে সূচিত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের অবস্থা ভয়ংকর। মানুষ মাত্রেরই যে দুটি বিষয়ে জন্মগত অধিকার থাকা উচিত, সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার

দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ। অতঃপর সংসার এবং লোকাচার নিয়ে তার জীবনযাত্রা।

কেবল ভারতেই মেয়েদের অবস্থা হীন ছিল এরূপ মনে করবার কারণ নেই। পশ্চিম বা পূর্বের অন্যান্য দেশগুলিতেও নারীর অবস্থা কিছু উন্নততর ছিল না। তবে শিক্ষার পথ সর্বত্র একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ায় নারীর অবস্থা কী ভয়ঙ্কর ছিল, গোর্কীর আত্মজীবনী তার উদাহরণ। একমাত্র আমেরিকায় নারীজাতির অবস্থা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেখানেও এবং পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের মধ্যে আজ প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে "নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার" এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার লাভের জন্য। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ বলে চিহ্নিত বৎসরে তাদের প্রবল কণ্ঠস্বরে শোনা গিয়েছে বিভিন্ন দাবি। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ উন্নত হলেও নারী সন্তুষ্ট নয়।

আমাদের দেশে জনসাধারণ ও মেয়েদের অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়েছিল তা স্বামীজীর এক পত্রের কয়েকটি ছত্রে পরিস্ফুটঃ "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমা-স্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে... আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[১] আরও লিখেছিলেনঃ "তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশু-জন্ম ঘুচিবে না।"[২] শাস্ত্রকারের উক্তি ঃ "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"—অর্থাৎ পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন। কৃতজ্ঞচিত্তে ও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সব মহাপ্রাণ সমাজসংস্কারকগণকে—যাঁরা স্বামীজীর মতোই উপলব্ধি করেন, নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত ভারতের পুনরুত্থান সম্ভব নয়। যে পুরুষজাতি নারীকে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের শত শৃংখলে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রেখে এবং যত প্রকারে সম্ভব নির্যাতন করে উল্লাস বোধ করেছিল, সেই পুরুষজাতিই বলপূর্বক পতিহীনা সতীকে চিতায় নিক্ষেপ ও বালবিধবার অবরুদ্ধ ক্রন্দনে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করে অগ্রণী হয়েছিল তাদের উদ্ধারকল্পে। সতীদাহপ্রথা রোধ এবং বালবিধবার পুনর্বিবাহ প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে

প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আজ তা ঐতিহাসিক কাহিনী।*

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতে নারীর কাছে প্রথম মুক্তির বার্তা বহন করে আনে। তার শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকার অনুভূত হয়। সেই প্রথম দিকে বিদেশী সরকারের অধীনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দু এবং খ্রীষ্টান মিশনারীগণ পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে গড়ে ওঠা এবং ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রভাববিহীন সে শিক্ষার কতকগুলি অবাঞ্ছিত ফল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। স্বামীজী কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের সেই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেনঃ "দেশে নূতন idea -র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে

---

*নারীজাগরণে যে প্রয়াস গত দুই শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে স্বামীজীর চিন্তাধারার মধ্যে। রামমোহনের চোখে সতীদাহপ্রথাটাই বিসদৃশ ঠেকেছিল, কারণ তাঁর চোখে এটা ছিল নারীনির্যাতনের একটি বীভৎস রূপ। নারীকে এই অত্যাচার থেকে মুক্ত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই চিন্তাধারা অগ্রগতি লাভ করে বিদ্যাসাগরের মধ্যে। বিধবাবিবাহ, বাল-বিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি নারীজাগরণের ক্ষেত্র ব্যাপক করতে প্রয়াসী ছিলেন। স্বামীজী কিন্তু আরও গভীরে প্রবেশ করে সমস্যাটিকে দেখালেন। তিনি নারীকে স্বাবলম্বী করতে চাইলেন। কতকগুলি আইনের সাহায্যে নারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়াটাই তাঁর কাছে সব নয়। ভারতের নারীদের দুরবস্থার কারণ কি—এই প্রশ্নে স্বামীজী বলেছিলেনঃ নারীদের সমস্যা সমাধানে পুরুষেরা তাদের মতামত ও চিন্তাধারা নারীদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। তিনি চাইলেনঃ নারীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেরা চিন্তা করুক, নিজেরাই সমাধান খুঁজে বের করুক। তাই স্বামীজী চাইলেন যথার্থ শিক্ষার উদ্বোধন। ত্যাগী শিক্ষিতা নারীরাই ভার নিক নারীশিক্ষার; তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করুক পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে। বৈদান্তিক তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে কি নারী কি পুরুষ যখন যথার্থ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে দাঁড়াবে তখন স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন, তারা তা নিজেদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারবে। এইভাবে নারীশিক্ষার প্রকৃত উপায়টির দিকে স্বামীজী অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন; নারীজাগরণের এক নতুন দিগন্ত তিনি খুলে দিলেন। তাঁর ভাষায়ঃ "আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর...।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৩]

যায়?"[৩] সেই সঙ্গে মন্তব্য করেনঃ "ধর্মকে centre (কেন্দ্র) ক'রে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।"[৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অন্তঃপুরের বাইরে নারীর পদধ্বনি শোনা যায়—দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ নয়, ভীরু, সঙ্কুচিত, বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। প্রত্যুত, সন্ত্রাসবাদ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর বহু নারীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। দেখা গেল, নারীর প্রথম অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ। সহজেই সে নিজের স্থান করে নিয়েছিল পুরুষের পাশে। স্বাধীন ভারতে নারীজাতির পটভূমি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। দ্বিখণ্ডিত ভারতে দলে দলে উদ্বাস্তুর আগমন, ফলে অর্থনৈতিক চাপ সমাজে বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করে, বাধ্য করে নারীকে স্বনির্ভর হতে। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত। দেশের সর্বত্র স্কুল-কলেজের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নারী আর অন্তঃপুরচারিণী ও কেবল গৃহকর্মে রত নয়। শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম। বিভিন্ন প্রকার কর্মে তার সাফল্য আজ বিস্ময়কর। ভারতের মতো বিশাল এবং সমস্যা-সঙ্কুল দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত একজন মহিলা!

যেসকল সমস্যা যুগ যুগ ধরে নারীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তার অধিকাংশ আজ অন্তর্হিত। অবশ্য বহুতর নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তারও সমাধানের চেষ্টা চলছে নানাভাবে। একথা অনস্বীকার্য যে, এসবই আধুনিক শিক্ষার ফল। আধুনিক শিক্ষাই নারীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে, শিখিয়েছে বহির্জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে, প্রেরণা দিয়েছে বৃহত্তর জগতে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাধীন জীবনযাপনে। স্বামীজীর উক্তি স্মরণ করিঃ "...তোমাদের নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা তোমাদিগকে বলিবে।"[৫] প্রশ্ন ওঠে, তবে কি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং নারীর বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক? কোনক্রমেই নয়। স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে ঠিক, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তবু অশিক্ষিত মেয়ের সংখ্যার হার কী লজ্জাকর! কোথাও পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীর সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত, কোথাও পাশ্চাত্য আদর্শের

হাস্যকর বিকৃত অনুকরণ! তার উপর যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার ফলে অবিবাহিতা মেয়ে শিক্ষালাভ করেও অসহায় বোধ করছে। সুতরাং প্রথমেই দেখা প্রয়োজন গলদ কোথায়। আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন শিক্ষার লক্ষ্য বা জীবনের উদ্দেশ্য অথবা আদর্শ; শিক্ষাব্যবস্থার কথা পরে। একদা অতীত ভারতের মহীয়সী নারীগণ (যথা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি) বহুদিন ধরে ছিলেন নারীজাতির আদর্শ। অর্থাৎ তাঁদের চরিত্রের ছাঁচে চরিত্র গঠন করতে হবে বা করা উচিত—এই রকম একটা ধারণা ছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এর মূল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল—নারী হবে পতিব্রতা। বর্তমানে আদর্শের রূপ পরিবর্তিত। নারী আর কেবল অন্তঃপুরিকা নয়। সুতরাং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্তঃপুরে অবস্থিত নারীকে যে চরিত্রগুলি একটি মাত্র লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেরণা যোগাত, বর্তমানে তার অনুধাবন ও অনুসরণ প্রকৃতই কঠিন। সমুদ্রপারের মোহময় সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ ভারতের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে আছড়ে পড়ছে। স্বামীজী তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেনঃ "সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন-সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে।"[৬]

বলা বাহুল্য, প্রথম চিত্রের আকর্ষণ বর্তমানে সমধিক এবং যুগের স্বাভাবিক আদর্শ বলে গৃহীত। যুগের আদর্শ উপেক্ষা করে চলা কি সম্ভব অথবা সঙ্গত? সুতরাং প্রাচীনপন্থীরা 'হায়' 'হায়' করছেন—সব গেল। প্রগতিপন্থীরা অবজ্ঞাভরে ভাবছেন, কেবল ভারতীয় ভাবটুকু আঁকড়ে ধরে থাকার প্রচেষ্টা কী নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে না? পশ্চিমের ও পূর্বের দেশগুলিতে তো বটেই, ইরাক, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতেও নারী আর পশ্চাৎপদ নয়। জগতে সমস্ত নারীর গতি বা লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, পুরুষের সমান অধিকার দাবির জন্য এগিয়ে চলা—কেবল ভারতের নারীই অতীতের জয়ঢাক পিটিয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে? তাতে কোন্ সিদ্ধিলাভ?

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ আমরা জাগতিক উন্নতিকেই চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিতে চলেছি। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পৃথিবী অতিক্রম করে সুদূর মহাকাশে পরিব্যাপ্ত। বিজ্ঞানসৃষ্ট ভোগবিলাস, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকার বাসনা মানবহৃদয়কে অহরহ আকৃষ্ট করছে। বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য

বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদ্‌গণের কাছে যতই মূল্যবান হোক, সাধারণ নরনারীর প্রতিদিনের সুখদুঃখের জীবনে তার বিশেষ অবদান দেখা যায় না—অন্তত আমাদের দেশে নয়। দারিদ্র্যের অভিশাপ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী। লোভ ও স্বার্থপরতা জীবনকে ক্লিষ্ট করে তুলছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের এক বক্তৃতার কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম তুলে ধরছিঃ

"মানবজাতির সামনে একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক, যে লক্ষ্যে উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষা তাকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং পাশ্চাত্যে যখন ধর্মের অবনতি ঘটল, তখন তার স্থান অধিকার করল বিজ্ঞান। পরিপূর্ণতা লাভের জন্য পাশ্চাত্যে আমরা যদি ধর্মের স্থানে বিজ্ঞানকে বসিয়ে থাকি, তবে তার অর্থ কয়েকটি গাণিতিক প্রতীকের হাতে আত্মসমর্পণ। প্রকৃতিবিদ্‌ হয়তো তাতে অগাধ বৌদ্ধিক আনন্দলাভ করতে পারেন। কিন্তু আত্মার খাদ্য তাতে সংগৃহীত হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান আমাদের সেই চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না—যা আমরা জানতে চাই ; আবার ধর্মও তার বর্তমান রূপে যে পরম সত্তাকে ভালবাসবার জন্য আমাদের হৃদয় আকুল তার আভাস দিতে পারে না।...এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যবাসী একটা সমাধান করবার চেষ্টা করেছে. গত শতাব্দীর শেষভাগে একটা ধারণা ছিল. মানুষ স্বভাবত সৎপ্রকৃতির এবং তার মধ্যে রয়েছে পূর্ণতালাভের অসীম সম্ভাবনা। সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে পারলেই আশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। কারণ তখন সর্বপ্রকার বাধামুক্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষের সৎ প্রকৃতি উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পাবে। তখন আর লোভ থাকবে না। থাকবে না দ্বেষ অথবা ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই পৃথিবীতেই তখন স্বর্গরাজ্য গঠনের জন্য থাকবে কেবল প্রেম, বদান্যতা ও দ্রুত প্রগতি—যেখানে মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকেই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার সুযোগ পাবে। কী সুন্দর! কিন্তু এই ধারণার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের 'মানুষ গড়া ধর্মের' কথা কারোর চিন্তায় আসেনি।"[৭] আমরা জানি, উন্নততর সমাজব্যবস্থা ও আর্থিক উন্নতিই মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনবে এই স্বপ্ন দ্রুত ও নির্মম ভাবে চূর্ণ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যুগান্তর আনবে এ ধারণাও হতাশায় পর্যবসিত। মনীষীমাত্রেই বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক ভয়ংকর রূপের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের মতে বর্তমান আমেরিকায় প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার সুবিধাঃ দ্রব্যের প্রাচুর্য, কর্মসংস্থান এবং আমোদ-প্রমোদ প্রত্যেকের

করতলগত। সাধারণ মানুষ ধনী, তার সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত আহার ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার গৃহিণীর সংসারে আছে সর্বপ্রকার উপকরণের বাহুল্য। দ্রব্যমূল্য ও করভার ক্রমবর্ধমান সত্য, কিন্তু সেই অনুসারে বেতন ও পারিশ্রমিকের হারও ঊর্ধ্বগামী। এই প্রাচুর্য কতদিন চলবে জানা নেই। কিন্তু অনায়াসে বলা যায়ঃ আমেরিকায় এই মুহূর্তে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের কাছে দারিদ্র্য শব্দের অর্থ অজ্ঞাত। এ অবস্থা নিশ্চিতই আনন্দের। তথাপি বলা যায়, ঐহিক উন্নতির সঙ্গে আপনা থেকেই অবিমিশ্র সুখ ও সামাজিক শান্তির যে প্রত্যাশা তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। জীবনে সম্ভোগ অবশ্যই আছে, কিন্তু নেই আনন্দ—নৈরাশ্য ভয়ংকর!*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যেখানে সর্বাধিক সফল, সেই বস্তুতন্ত্রবাদী আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামীজীর দৃষ্টিতে পূর্বেই ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার লিপ্সা শীঘ্রই তাঁর ভুল ভেঙে দেয়। তিনি বুঝেছিলেন—পাশ্চাত্য কোন্ পথে ছুটে চলেছে এবং সমাধানকল্পে তিনি বলেছিলেনঃ "আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে

* আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীজাগরণের নামে (Women's Liberation Movement) যেসব ক্রিয়াকলাপ চলছে তা প্রকৃত কল্যাণ আনতে পারবে কিনা সন্দেহ, কেননা, এসবের মূল লক্ষ্য নারীকে পুরুষের অনুগামী করা। পোশাক, চালচলন, কর্মজীবন ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে পুরুষের অনুকরণ করাই যেন এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। আর এই কারণেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রথমত, পুরুষেরা যা করে তা-ই আদর্শ বলে ধরা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বে নারীদের মৌলিক অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছে। দুটিই ভুল ধারণা। পাশ্চাত্যনারীরা যখন চালচলন ও পোশাকে পুরুষদের নকল করতে উদ্যোগী তখন একথাই মনে হয় যে, নারীদের অবচেতন মনে পুরুষদের শ্রেষ্ঠতা দানা বেঁধে বসে আছে। 'সম-অধিকার', এর অর্থ উন্নতির পথে সমান অধিকার। শিক্ষা-চিকিৎসা-কারিগরি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে যাওয়াটাই জাগরণের চিহ্ন। 'বন্ধন' মানুষের মনেই থাকে। অতএব পোশাকের দিকে নজর না দিয়ে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জন করাটাই নারীজাগরণের লক্ষ্য হওয়া দরকার। পুরুষের অনুকরণ করে বেঁচে থাকাটা কখনও নারীর কাম্য হতে পারে না; বিশ্বে স্বীয় মৌলিক অবদানকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই হল মূল কথা। একটা সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে গেলে নারী ও পুরুষ উভয়কেই মৌলিকভাবে বেড়ে উঠতে হবে। আর কে না জানে, যথার্থ মায়ের অভাবেই আমাদের সমাজ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সমাজ নির্ভর করে পরিবারের উপর, এবং মা-ই হচ্ছেন পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালক হিসাবে পুরুষ চিরকালই ব্যর্থ। এখানে নারীরাই একমাত্র সফল। সংসারের হাল যদি সে ছেড়ে দেয় সমাজ তবে রক্ষা পাবে না। তাই মায়ের হাতেই সমাজসাধনার চাবিকাঠি। নারীরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ুক কিন্তু সংসারের মূল পরিচালক শক্তি হিসাবে তারা স্বীয় দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সাম্প্রতিক তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলন এই দিকটিকে অবহেলা করছে।

প্রকাশ করা চলে, আর তা হল এইঃ মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ ক'রে দিতে হবে।...জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্য-বসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হ'ল—চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য।"[৮] নারীর সমস্যা দৈনন্দিন জীবনে যদি বা কিছু পৃথক থেকে থাকে, নরনারী নির্বি-শেষে সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য সেই চরম সত্য লাভ। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজসংস্কারক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু অন্যান্য সমাজসংস্কারকের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের বিরোধী। তদানীন্তন প্রচলিত উৎকট জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলেও তিনি মনে করতেন না, ঐ দুই প্রথা রহিত হলেই জনগণ ও নারীজাতির উন্নতি আপনা থেকেই হয়ে যাবে। বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাঁর কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ, তিনি জানতেন, বিধবার পুনর্বার স্বামীলাভের উপর একটা জাতির ভাগ্য নির্ভর করে না। তিনি স্পষ্টই লিখে-ছিলেনঃ "...জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।"[৯] উপরন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত—"...নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।"[১০]

আশ্চর্য, যেযুগে মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপুরে বন্দিনী, সেযুগে বিদেশের শত শত শিক্ষিতা উদারহৃদয় মহীয়সী মহিলার সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের অবস্থা তুলনা করে দুঃখে ক্ষোভে তিনি লিখেছিলেনঃ "আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা ক'রে আসছে। একটা কিছু হ'লে কেবল কাঁদতেই মজবুত।"[১১]

সেই যুগেই তিনি লিখেছেনঃ "একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা,

বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি? এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে।"[১২]

"এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি?"[১৩]

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম, কিন্তু সে শিক্ষা কেবল পাঠ্য পুস্তকের বা আক্ষরিক নয়। যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। বস্তুত তাঁর মতে লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ এবং নারীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাকেই স্বামীজী চরম মুক্তি, প্রকৃত স্বাধীনতা বা জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য পরম সত্য লাভ, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। ব্যবহারিক জগতে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তিনি কোন ভেদ করেননি। উপনিষদের "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারীও তুমি—এ তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। "আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।"[১৪]

"আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।"[১৫]

স্বামীজীর বাণীতেই সর্বপ্রথম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা বা জাগরণের পরিচয় লাভ করি। আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতার মতে, যে সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধন দৃঢ় করে, স্বামীজী তাকে কোনক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে নারী

যত বড় হবেন, তিনি ততই নারীসুলভ দুর্বলতাগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন।*

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সমাজে নারীর অবস্থা হীন হলেও সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেছেন, যে কোন সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের যথার্থ পরিচয় বহন করে তার নারীজাতির অবস্থা। মহাকালের যাত্রাপথে বহু উত্থান-পতন ও সংকটের মধ্যে সমাজজীবনে হীনতম অবস্থা সত্ত্বেও মেয়েরাই সর্বদেশে—বিশেষত ভারতে, জ্বালিয়ে রেখেছিল ধর্মের অনির্বাণ দীপশিখা। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট সকল কর্ম, পূজা, ব্রত, উপবাসের মধ্যে ধরে রেখেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি যা যে কোন জাতির প্রাণস্বরূপ। অধিকাংশ মনীষীর জীবনে তাই দেখা যায় জননীর প্রভাব সর্বাধিক।

আজ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথার্থ সংকটকাল উপস্থিত—সেখানে পুরুষ-নারীর ভেদ নেই। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে আদর্শের প্রবল সংঘাত নবীন ও প্রাচীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বেই তা অনুধাবন করে সতর্ক করেন। বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়ে ও যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ধর্মকে কোন ক্রমেই বিসর্জন দেওয়া চলবে না। আমাদের আদর্শ হবে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা ও কর্মকুশলতার সঙ্গে প্রাচীন যুগের মৌন মাধুর্য ও ধ্যানপরায়ণতা!

*নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার সমন্বয় চেয়েছিলেন। ভারতে 'জননী'ই নারীত্বের আদর্শ, পাশ্চাত্যে 'জায়া'। "ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।" [বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩১]। আবার, আমেরিকান নারীদের মধ্যে কর্মশক্তির বিপুল প্রকাশ দেখেও স্বামীজী মুগ্ধ। তিনি তাই এই দুইয়ের সম্মিলন চাইলেন। সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখের শক্তির সঙ্গে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখের জ্ঞান মিলেই তা আদর্শ নারীর সৃষ্টি করতে পারে। স্বামীজী নারীজাগরণের পন্থা হিসাবে এই আদর্শেরই সন্ধান দিয়েছেন। নারী-আদর্শ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে যে ধারণা তা নারীর সামাজিক মুক্তি আনবে; শিক্ষা ও কর্মশক্তিতে নারীকে স্বাবলম্বী করে তুলবে। কিন্তু তার সঙ্গে নারী যদি জননীর ভারতীয় আদর্শ নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে না পারে তবে সমাজকে ধরে রাখা যাবে না। স্বাধীনতা তখন উচ্ছৃংখলতার বেশে আবির্ভূত হয়ে সমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট করে দেবে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের সাহসী, স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত করে তোলা হোক; ব্রহ্মচর্যের আদর্শে তারা ছেলেদের মতোই বেড়ে উঠুক। প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে তারা হয় ত্যাগী হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, অথবা স্বয়ংবর প্রথায় মনোমত পতি নির্বাচন করে সংসারে প্রবেশ করুক। এরপরে নিজেকে আদর্শ জননী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুক তারা; একদিকে বীর-প্রসবিনী, অন্যদিকে সমাজ-কল্যাণে নিবেদিতা।

"ভারতের অস্তিত্ব কি বিলুপ্ত হবে? ভারত কি বিনাশপ্রাপ্ত হবে? তাহলে জগৎ থেকে সমুদয় আধ্যাত্মিকতার অবসান ঘটবে।"[১৬]

"আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে।...বিশ্বাস করুন ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।"[১৭]

"আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম প্রচারিত হইয়াছে ; এখানে—কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।"[১৮]

এই লোকোত্তর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব প্রধানত মানবজীবনের চরম প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু তাঁদের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব পড়ে জীবনের সর্বস্তরে। বস্তুত ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্র পৃথক নয়। ধর্ম যদি মানবজীবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত না করে, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব না থাকে, জীবনের সকল কর্মে তার সুর ধ্বনিত না হয়, তবে সে ধর্ম সাধারণের কাছে অবান্তর হয়ে পড়ে। ধর্ম কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্য নয়, যাঁরা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে লোকালয় পরিহার করে নির্জনে গিরিগুহায় ধ্যানে সমাসীন থাকবেন, অথবা নির্মম চিত্ত অবলম্বন করে বিচরণ করবেন অরণ্যে, প্রান্তরে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে তা যথার্থ ধর্ম নয়।

ভগবান বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত বিবেকানন্দ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেনঃ "ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।...যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।"[১৯]

ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ অতি গৌরবময় উচ্চস্থান অধিকার করে আছে। ভগবান বুদ্ধের চরিত্র, শিক্ষা কেবল বহু নরনারীকে সংসারবিমুখ ও নির্বাণলাভে প্রবুদ্ধ করে তা নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে—মানবতা, সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্যে তার অমিত প্রভাব। অবনতি ঘটল তখনই যখন সে ধর্ম কেবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রইল।

স্বামীজীর মতে ধর্ম সকলের জন্য। যে ধর্ম মোক্ষমার্গে প্রবুদ্ধ করে, সেই ধর্মই স্বধর্মে পরিণত হয়ে সাধারণ নরনারীকে উচ্চ ও সুস্থ জীবনযাপনে প্রেরণা দেয়।

ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিবেকানন্দ সেই সমন্বয়সাধনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন সমাধানের সূত্র। তাঁর উক্তিঃ "আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি।...বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।"[২০] "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"[২১]

পাশ্চাত্যের প্রতি এই মোহ, অথবা কোন নতুন মতবাদ বা 'ইজম'কে স্বামীজী ভয় পেতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি এত শাশ্বত ও শক্তিশালী যে, প্রতীচ্যের সঙ্ঘাতে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে না। আর প্রতীচ্যের জড় সভ্যতা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীও আজ এই আশা পোষণ করছেন।

অসাধারণ বিদুষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও প্রচণ্ড কর্মপরায়ণা ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী উপনীত করেছিলেন শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পদপ্রান্তে, আধুনিক শিক্ষায় যিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যা, লজ্জা ও অবগুণ্ঠনে আবৃতা এবং সর্বতোভাবে তদানীন্তন প্রাচ্য প্রথায় সংরক্ষণশীলা। নিজ স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে উদার অকপট চিত্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতাকে, সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রীশিক্ষারূপ কার্যে। নিবেদিতাও দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর অধ্যাত্মশক্তির কাছে নম্র শ্রদ্ধায় নত

হয়েছিলেন। অপূর্ব মিলন! নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর আশীর্বাণী ছিল "মায়ের হৃদয় আর বীরের সংকল্প" (The mother's heart, the hero's will)।

স্বামীজী এই ধারণা পোষণ করতেন যে, অতীত যুগে যেসব মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন, আগামীকালের নারীর মহত্ত্ব তাঁদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প ও জননীর স্নেহকোমল হৃদয়। নারী হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক।*

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে পরিচালনার মূলে থাকবে নারীর প্রভাব। থাকবে না পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা অধিকার লাভের দাবি। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা নারী নিজের ভাগ্য নিজেই জয় অথবা সৃষ্টি করবে। "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই"— পাশ্চাত্যে নারীর ঐহিক অভ্যুদয় লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেও স্বামীজীর মতে যথার্থ অভ্যুদয় তখনই ঘটবে—যখন তার সঙ্গে যুক্ত হবে প্রাচ্য অধ্যাত্মশক্তি। "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী" এই উক্তির দ্বারা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অধ্যাত্মশক্তি বলেই ঐ নারীগণ যুগ যুগ ধরে স্মরণীয়া ও পূজিতা, ঐহিক উন্নতির সঙ্গে সেই শক্তি অর্জনই নারীর লক্ষ্য। নতুবা, অতীত যুগের উদাহরণের অর্থ হয় না।

প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী মেয়েদের এক অতি উচ্চ নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অথবা সংসারে পুরুষের তুল্য অধিকার

*শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর মধ্যেই স্বামীজী আদর্শ নারীর সন্ধান পেয়েছেন। শ্রীশ্রীমা একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ সহধর্মিণী, অন্যদিকে অসংখ্য তাপিত ভক্তের মা, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী। ঠাকুর সশরীরে বর্তমান থাকতে মা কোনও দিন নিজের দিকে তাকাননি। দিনের পর দিন নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি শুধু স্বীয় পতির ধর্মসাধনায় সাহায্যই করে গেছেন তা নয়, জগৎ-কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় স্বীয় ভূমিকা অবিচল নিষ্ঠায় পালনও করে গেছেন। দেহের সীমা ছাড়িয়ে যথার্থ আত্মিক মিলনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার বিবাহ ও যুক্তসাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেখানে শ্রীশ্রীমা স্বীয় জায়াভাবের পূর্ণ পরিণতি দেখিয়ে গিয়েছেন। আবার পরবর্তী জীবনে সঙ্ঘজননী হিসাবে তিনি দেখালেন ভারতীয় জননীর যথার্থ রূপটি।

স্বামীজী তাই বলেছেন ঃ শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারীজাগরণের উদ্বোধন ঘটবে। শ্রীশ্রীমা একদিকে সীতা-অরুন্ধতীর মতো পতিপ্রাণা, অন্য দিকে দ্রৌপদী-সাবিত্রীর মতো তেজস্বিনী, আবার গার্গী-মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবাদিনী। প্রচণ্ড জ্যোতি, যে জ্যোতিতে দাহের জ্বালা নেই, আছে অসীম শান্তি ও তেজের বিকাশ—সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হওয়াতেই নারীজাগরণের যথার্থ বিকাশ। শ্রীশ্রীমা এই আদর্শটি স্বীয় জীবনে দেখিয়ে গেলেন।

বা সুবিধা অর্জনই তার জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। পূর্ণ জাগরণ বলতে বুঝি গভীর আত্মবিশ্বাস ও পরিপূর্ণ প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ। প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা স্বাধীনতার পথ সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাই আধ্যাত্মিক বিকাশ। তখনই নারীর পক্ষে স্থির করা সহজ হবে, কোন্ জীবন সে বেছে নেবে। আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চস্থান অধিকার করবার জন্য সে প্রয়োগ করবে সব শক্তি, অথবা জীবন উৎসর্গ করবে মানবসেবায়। সমাজ, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণই হবে তার লক্ষ্য—অথবা সাধারণ ভাবে মাতা ও পত্নীর দায়িত্ব পালনই তার অভিপ্রেত হবে! যে পথই সে গ্রহণ করুক, প্রত্যেকটিই তাকে পরিচালনা করবে শ্রেয়ের পথে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মূলকথা যথার্থ সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার সঙ্গে নরনারী নির্বিশেষে মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ঘোষণা।

আশার কথা, নবযুগের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণযৌবনা পত্নীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছিলেন, আবাহন করেছিলেন বিদ্যাশক্তিকে ভারতের তথা জগতের কল্যাণের জন্য। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সেই শক্তির স্ফুরণ হলেই অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটবে। মনে হয় সেদিন আসন্ন! স্বামী বিবেকানন্দ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে কেন্দ্র করেই—সেই মহাশক্তির বিকাশ ঘটবে।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা

উপক্রমণিকা

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার বিশ্লেষণে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণার কিছুটা অবতারণা অপরিহার্য বললেও চলে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, স্বামীজীর সামাজিক ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার পর্যালোচনা করতে হয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা—যাকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাই বলা চলে বেশী দিনের পুরনো নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ষোল শতকের ধর্ম-সংস্কারেরও (Reformation) পরে। ইউরোপে তার আগে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেককে তার উপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ক্ষমতা অনুযায়ীই শিক্ষা দেওয়া হত। অর্থাৎ ঠিক সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা হত না এবং ঢালাও শিক্ষাপ্রসারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকের কাজ ছিল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য নির্ধারণ করে তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে তোলা। তবুও ভল্টেয়ার (Voltaire) একে "বিচারবিহীন নবশব্দ প্রয়োগবিদ্যা" (presumptuous neologism) বলে অভিহিত করেছিলেন।

একই ব্যবস্থাভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সকলের একই ধরনের বোধোদয়ের প্রচেষ্টার সূত্রপাত মধ্যযুগের শেষভাগে কিমিয়াশাস্ত্রের (alchemy) মধ্যেই নিহিত। এবং এই ব্যবস্থার পথিকৃৎ হিসাবে সতেরো শতকের মারইভিয়ার বিশপ জন অ্যামোস কামেনিয়াসেরই (John Amos Comenius) নামোল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম সাত কিংবা বারো পর্যায়ের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর Magna Didactica-য় বিদ্যালয় সমূহকে "প্রত্যেকের জন্য সব কিছু শেখাবার কলাকৌশল" (devices to teach everybody everything) বলে বর্ণনা করে বহুল পরিমাণে জ্ঞানোৎপাদনের এক খসড়া তৈরী করেন। সে খসড়া অনুসারে উৎকর্ষমূলক শিক্ষা শুধু যে সুলভই হবে তাই নয়, ব্যক্তিমানবের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব করবে। কিন্তু কামেনিয়াস মূলত ছিলেন একজন অপরসায়নবিদ্—নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই ছিল তাঁর ব্রত। মানুষের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন তার সত্তার উদ্গতির (sublimation)

মাধ্যমে তাকে উন্নত করতে। কামেনিয়াস তাঁর লক্ষ্যসাধনে সমর্থ না হলেও শিল্পবিপ্লব এক অদৃশ্য নতুন পণ্যের উৎপাদন সম্ভব করে। এরই নাম জনশিক্ষা— mass education। এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজাল দ্বারা পরিবেশের উপযোগী নবমানবগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

কিন্তু জনশিক্ষার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ দিন দিন যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন, দেখা গেল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত এবং ফলে নবসৃষ্ট পরিবেশের অনুপযোগী বলেই ছাত্রসংখ্যা ছাঁটাই করা চলতে লাগল।

শিক্ষার এই নতুন ধারণা 'বিদ্যালয়কে' শুধু অপরিহার্য করেই তুলল না, বিদ্যালয়ের ছাপ যোগাড় করতে অপারগ ব্যক্তিদের দারিদ্র্যকেও যৌগিক প্রক্রিয়ায় বাড়িয়ে তুলল। পাস-ফেলের বিচারে যারা বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে আসতে বাধ্য হল তারা নিজেদের হেয় জ্ঞান করতেই শিখল। সমাজের মূল্যবোধ যান্ত্রিক-প্রক্রিয়া-কবলিত হয়ে মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল। জীবনবেদের প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারাই এই শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা এই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই প্রসারিত। এই শিক্ষাচিন্তা বা শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণা।

পশ্চাৎপট ঃ এই সামাজিক ধ্যানধারণার মধ্যে তাঁর বর্ণচক্রতত্ত্বই (cycle of castes) সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। স্বামীজী ছিলেন হিন্দু কল্পতত্ত্বে (Theory of Cycles) বিশ্বাসী। এই তত্ত্বানুসারেঃ "...এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিল, তারপর পড়িল কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি-সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্যসমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গগতিতেই চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।"[১]

মানবজীবনে এই চিরন্তন চক্র চার অঙ্কের এক নাটক সৃষ্টি করে, চমৎকারিতার দিক দিয়ে যাকে অতুলনীয় বলা চলে। এই নাটকের শেষ অঙ্ক কিন্তু এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। চার অঙ্কে বর্ণচতুষ্টয়--ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—পর্যায়ক্রমে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে ত্যাগ ও সংস্কৃতির প্রতীক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আদর্শচ্যুত হওয়ার পর, প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয়ের শাসন। আবার ক্ষাত্রধর্মচ্যুত ক্ষত্রিয়দের

১। বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ. পৃঃ ২৭০

অপসারণ করে তাদের স্থানাধিকার করে বৈশ্যগণ। বৈশ্যশাসন শোষণেরই নামান্তর। সুতরাং একদিন এরও ঘটে অবসান। তবেই সমগ্র সমাজে প্রবর্তিত হয় শূদ্রবর্ণের আধিপত্য।[২] এই সমাজবিবর্তন নাটকের শেষ অংক এখনও অবশ্য অভিনীত হয়নি। তবে স্বামী বিবেকানন্দ এর এমন চিত্রবৎ বর্ণনা করেছেন যেন তিনি এর চূড়ান্ত মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানেন সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি।

কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো এই বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষয় ও অবলুপ্তির সুস্পষ্ট সূচক স্বামীজীর কাছে প্রতীয়মান হয়নি। বরং তিনি এর মধ্যে দেখেছেন সমাজবিবর্তনের ধারা—যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্ণশাসন বিকৃত হয়ে উঠলে তা অপসারিত হবেই। সুতরাং বিকাশ ও অগ্রগতি কি একই কথা নয়? মানবজীবনযাত্রা ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে। স্বামীজী কিন্তু ব্যক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ করেননি। করলে যে নয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই অস্বীকার করা হত। তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হল পরম-কারণমূলক পদ্ধতিকে (teleological process) ত্বরান্বিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে নবযুগ প্রসবের বেদনা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করা।

এই মুক্তিমন্ত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সমাজের সৌভ্রাত্রমূলক কাঠামোয়, যে কাঠামো বৈদান্তিক শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কথা। তাঁরাও শিক্ষার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন বিপ্লবের প্রতিরোধ ব্যবস্থার।

সমাজসংস্কার ও শিক্ষা: সমাজের সৌভ্রাত্রমূলক কাঠামো গড়ে তোলা অর্থাৎ সমাজের মধ্যে প্রকৃত অর্থে মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টিকে সমাজসংস্কার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। 'সংস্কার' বলতে স্বামীজী অন্তরাগত সম্প্রসারণের (growth from within) পথে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণই বুঝেছিলেন, উপরিতলগত কিছু কিছু রদবদল নয়। এই দিক দিয়ে সংস্কার স্থান-কালের আপেক্ষিক হতে বাধ্য। তবুও কিন্তু মূলত সংস্কার হল জেহাদেরই নামান্তর—বৈষম্য, অন্যায়, ভেদাভেদজ্ঞান, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিশেষাধিকার (privileges) প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ।

সামগ্রিকভাবে এই সংস্কারকার্য শিক্ষাব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। এবং যেহেতু শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সমাজকেন্দ্রিক সেই হেতু এই শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বামীজী শিক্ষার এবং ধর্মের বর্ণনা দিয়েছেন: "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান,

২। বর্তমান ভারত

তারই প্রকাশ। ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[৩] এখন অল্ডাস হাক্সলীর (Aldous Huxley) অনুসরণে ঐশীশক্তিকে যদি "সেই পূর্ণাঙ্গতা, সেই শিবময়তা" (the Perfaction itself, the Goodness itself) বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে শিক্ষা ও ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ একাত্মবোধক—অন্তত একই বিকাশধারার দুটি পৃথক দিক। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ সম্ভব করা।

কিন্তু স্বামীজী সুস্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে, শিক্ষার এই অতি-ধারণা (super-concept) জনসাধারণ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। উপরন্তু ধারণাটির বহুল প্রচারের ফলে ব্যক্তিমন অন্তরাভিমুখী হয়ে ব্যক্তির সামাজিক দিকটার বিনাশ ঘটাবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে তিনি শিক্ষার একটি সংজ্ঞাই নির্দেশ করেছেনঃ "যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে ও ফলপ্রসূ হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা।"[৪]

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

প্রথমত, শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাশক্তির (will power) উদ্বোধন করে তার প্রবাহ সংঘটিত করতে হবে। ব্যক্তি কোন স্বয়ংচল যন্ত্র নয়; শুধু প্রতিবন্ধকাধীন বলে সে যন্ত্রবৎ আচরণ করে। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ গড়া; ধর্মের উদ্দেশ্যও একই।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কি উদ্দেশ্যে? নিশ্চয়ই সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে। কারণ সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয়ত, শিক্ষা হল অনুশীলন যার দ্বারা মানুষের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী—উভয় প্রকৃতিরই সমন্বয়সাধন সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই উন্নয়নমার্গ।

ধারণাটির সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় স্বামীজীরই একটি উক্তিতে। প্রশ্নাকারে উক্তিটি হলঃ "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?"[৫]

কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই চূড়ান্ত সমন্বয়সাধন স্বামীজীর কাছে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। বোধ হয় তাঁর সন্দেহ ছিল যে, কালক্রমে

৩। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৪০০
৪। C. W., Vol. IV, (1955), p. 490
৫। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৭

সমাজের স্থলে ব্যক্তিপ্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে ভারতের "বিজাতি-বিজিত, স্বজাতিনিন্দিত" জনসাধারণ অবহেলিত হতে বাধ্য। সুতরাং তিনি 'জনশিক্ষা'কেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, এবং এর সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই শিক্ষা অপরিহার্য। একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ "যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা-বুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি--রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।" ৬

অতএব স্বামী বিবেকানন্দ-কল্পিত সামাজিক শিক্ষা মৌল প্রকৃতিতে জন-শিক্ষারই নামান্তর। কিন্তু আবার প্রকৃতিগত দিক থেকেই এই জনশিক্ষা কামেনিয়াস-কল্পিত জনশিক্ষা থেকে--ইউরোপে ধর্মসংস্কারের পর প্রবর্তিত জনশিক্ষা থেকে--বহুলাংশে পৃথক। বস্তুত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই কঠিন। এখন স্বামীজীর এই শিক্ষাচিন্তারই বর্ণনা করা যাক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিঃ আমরা দেখেছি যে, স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কখনই তথ্যাধিক্য-ভিত্তিক হতে পারে না। কারণ এ ধরনের শিক্ষা তোতাপাখীরই সৃষ্টি করে—ক্রমে তাদের যন্ত্রবৎ করে তোলে। এ শিক্ষা কেরানিকুল সৃষ্টি কার্যে সার্থক হতে পারে, কিন্তু কোন কিছু মহৎ বা কল্যাণকর সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। অতএব যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা মানুষ-গঠনকারী, চরিত্র গঠনকারী ধ্যানধারণার সমন্বয় না হয়ে পারে না।[৭] পরিপূর্ণ অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ সঙ্গতিসাধনে সমর্থ না হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রীকদের আদর্শ ছিল "সুন্দর দেহাভ্যন্তরে একটি সুন্দর মন।" স্বামী বিবেকানন্দ এর সঙ্গে একটি তৃতীয় উপাদান--মানুষের আত্মা—যোগ করেছেন, এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাকেই আদ্যতা (primacy) প্রদান করেছেন। এরই ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণই স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

বলহীনের পক্ষে যখন আত্মার উপলব্ধি সম্ভবপর নয় তখন বস্তুগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বৈকি। তাছাড়া বুভুক্ষু জনগণকে ধর্মদর্শন শিক্ষা দেওয়া তাদের অপমান করারই সামিল। অতএব স্বামীজীকে যে চিন্তাটি

৬। C. W., Vol. IV, (1955), p. 482

৭। Ibid., Vol. III, (1960), p. 302

বিশেষভাবে বিব্রত করেছিল তা হল কি করে জনগণের মধ্যে অন্নসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা যায়।[৮]

এই বাস্তবধর্মী জ্ঞান বা শিক্ষার মধ্যে থাকবে মনের বলিষ্ঠতা গঠন ও আত্মার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এই শিক্ষাই হল মানুষ গড়ার শিক্ষা- man making education. মানুষ এইভাবে গড়ে উঠলে তার মধ্যে সমাজচেতনা দানা বাঁধতে বাধ্য।

শিক্ষাপদ্ধতিঃ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মৌলিক ধারণা বা thesis হল—কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না। যিনি এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইছেন তাঁর পক্ষে এই রকম ধারণা পোষণ অসংগত মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা স্বামীজীর জীবনে বেদবেদান্তপ্রসূত। বেদান্ত অনুসারে জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। সুতরাং শিক্ষা উপলব্ধি বা জাগরণ ছাড়া আর কিছু নয়। গাছের চারা যেমন সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি কাউকে কিছু শেখানোও যায় না। যা করা যায় তা হল উপলব্ধির পথে সহায়তা করা।

এই উপলব্ধি বা মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান দিনের "হিউরিসটিক পদ্ধতির" (heuristic method) বিশেষ সঙ্গতি আছে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ছাত্রকে স্বয়ং জ্ঞানাহরণ করতে হয়, শিক্ষক তত্ত্বাবধান করেন মাত্র। শিক্ষা ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অতএব ডিকিনসনের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, প্রাচীনরাও আধুনিক,[৯] তা স্বামীজীর শিক্ষাতত্ত্বে পরিস্ফুটিত হয়ে তাঁর দর্শনের অন্যতম শাশ্বত উপাদান হয়ে রয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্যই জনগণের সহজাত গ্রহণশক্তির আপেক্ষিক হবে। জাতীয় চরিত্রবিরোধী কোন শিক্ষাই কার্যকর হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে রুজি-রোজগার সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ধর্মের মাধ্যমেই করা সম্ভব। অন্য কোন পদ্ধতি জনমনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ভারতের ক্ষেত্রে যাকে জাতীয় পদ্ধতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে তার সন্ধান স্বামীজী পেয়েছিলেন গুরুকুল পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসে প্রবর্তিত ছিল)।

গুরুকুল পদ্ধতির মূল কথা হল গুরুর সঙ্গে একত্র বাস। পদ্ধতিটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেনঃ "শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।...বিশ্বাস, নম্রতা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া অমাদের মধ্যে

৮। The Master as I Saw Him, (1953), p. 298

৯। The Greek view of life—D. L. Dickension

কোন রকম সম্প্রসারণই কল্পনা করা যায় না। যে সব দেশ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি সেখানে শিক্ষক কথকেরই (lecturer) ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষকের ভাষণ মস্তিষ্কে ভরে নিয়ে যেতে। তারপর অবশ্য আর কিছু করা হয় না।"[১০]

মানুষ গড়ার পক্ষে বিশেষ কার্যকর বলে স্বামীজী বিশ্বজনীনভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ ঐ একই উদ্দেশ্য তাঁকে সকল সমাজের ক্ষেত্রেই শিক্ষার ধর্মীয় ভিত্তি নির্দেশ করতে প্রণোদিত করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অন্তত কার্যকারিতার দিক দিয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন—উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার উক্তিঃ "স্বামীজীর কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন কোন কিছুই ছিল না।"[১১]

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্ম কি অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে? আপাত-দৃষ্টিতে তা অবশ্য পারে না, কিন্তু মানুষকে নির্ভয় করে তুলে অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে পারে। এর ফলেই আসে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা। ভয়শূন্যতার ফলে বিবেক জাগ্রত হয়, বিমুক্ত ব্যক্তি তখন অযৌক্তিক সামাজিক বিধিনিষেধের অপসারণে অগ্রসর হয়। এই বিমুক্তকরণ-কার্যকে শিক্ষার প্রাথমিক অবদান বলে গণ্য করতে হবে। অতএব স্বামীজী ধর্মকে কেন শিক্ষার ভিত্তিস্থল প্রদান করেছেন তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। অন্য এক দিক দিয়ে দেখলে তাঁর মতে ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার মৌল উপাদান।

শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলপ্রদায়ী (fruit-bearing) করে তোলবার জন্য মৌল উপাদানের পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য উপকরণও অবশ্য প্রয়োজন। এ হল অন্যতম আপেক্ষিকতার সমস্যা (a problem of relativity)। ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়, মূল প্রেরণার জন্য ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস।[১২] এ ছাড়াও অপার অভিনিবেশ (concentration), ভোগবাসনাশূন্যতা (detachment) এবং প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন (communion with Nature)।

স্বামীজী ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। কারণ তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এর মাধ্যমেই সমাজের পরিভৌত ভিত্তি (material base) শক্ত করে গেঁথে "অভাব থেকে মুক্তির" (freedom from want) ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুতরাং চিন্তাপর্যায় বিচারে স্বামীজী-নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ধর্মেরও ঊর্ধ্বে। কারণ উদরপূর্তি হলে তবেই ধর্মসাধনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু উদরপূর্তির পরই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা—শিক্ষা তখন ভোগবাসনাতেই ইন্ধন যোগাতে পারে। এই জন্যই তিনি আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও ধর্ম স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার যৌথ ভিত্তি।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল ব্রহ্ম-সাহচর্যের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা বিশুদ্ধতার রূপই গ্রহণ করে। সর্বক্ষেত্রে চিন্তা, বাক্য ও কার্যে বিশুদ্ধ হতে হবে। সহজ সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায়, ব্রহ্মচর্য হল বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য আত্মসংযম অনুশীলন।

ব্রহ্মচর্যের ফলে প্রবল সক্রিয়তা ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়। অকল্পনীয় বলিষ্ঠতা ও নৈতিক চেতনারও উদ্ভব ঘটে। আবার মনোনিবেশ এবং ভোগ-বাসনাশূন্যতা ব্রহ্মচর্যেরই বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। এই দুই উপাদানের আবির্ভাবের ফলে দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে ভারসাম্যে উপনীত হয়। ফলে, মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের নির্গমনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানের মধ্যেই মেলে পরম সুখের সন্ধান; অজ্ঞতা দুর্দশারই সামিল। জীবনের জ্ঞানালোকে মৃত্যুভয় দূর হয়।

যে পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তি এই জ্ঞানালোকে অবস্থান করতে পারে তাকেই বলা হয় অভিনিবেশ। রসায়নবিদ্ গবেষণাগারে বসে তাঁর সমগ্র মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেন পরীক্ষাধীন উপাদানসমূহের উপর, যাতে তাদের সুপ্ত প্রকৃতি—সকল রহস্য—প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনঃসংযোগ করেন সূর্যতারকা, নভোমণ্ডলের উপর তাদের রহস্য সন্ধানের জন্য। অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল রহস্যদ্বারই ছাত্রের কাছে খুলে যাবে যদি তার জানা থাকে কিভাবে আঘাত করতে হয়। আঘাতের শক্তির প্রাবল্য একমাত্র মনোনিবেশ থেকেই আসতে পারে। [১৩]

কিন্তু মনোনিবেশের সঙ্গে থাকা চাই বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা। কোন বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজনমতো পরমুহূর্তে মন

সরিয়ে নিয়ে অন্য বিষয়ের উপর উপস্থাপিত করার ক্ষমতাও থাকা চাই। নচেৎ, মনোনিবেশ শিক্ষার্থীর জন্য নতুন শৃঙ্খল রচনা করতে পারে।

পরিশেষে, শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ হলঃ প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা লাভ কর ("Let nature be thy teacher")। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। স্বামীজীর মতে, এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।[১৪] সুতরাং তিনি বিদ্যায়তনসমূহের পারিপার্শ্বিক কাঠামো গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাঠক্রম ও শিক্ষার বাহনঃ এই মানুষ-গড়া শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম বিশেষ ব্যাপক -দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যা অপরিহার্য বলে নির্বাচন করেছেন তা হল শরীরচর্চা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা (aesthetics), যুগোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য (classics) এবং ভাষা। এদের মধ্যে অনুপাত অবশ্যই বিশেষ সমাজের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে।

শরীরচর্চার উদ্দেশ্য হল একদিকে শরীর এবং অপরদিকে মন-প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। ভগিনী নিবেদিতার অনুসরণে বলা যায়ঃ "যে প্রাণশক্তিকে এতদিন দেহ-পীড়নে ব্যয় করা হয়েছে, তাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পেশীর অনুশীলনেই নিয়োগ করা উচিত" বলে স্বামীজীর ছিল ধারণা।[১৫]

আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান হবে এই সব শিক্ষাব্যবস্থার যুগল ভিত্তি। বিজ্ঞানশিক্ষার পরিপূরক হবে প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজী দেখেছিলেন স্বয়ংনিয়োগ বা আত্ম-নির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। এর দ্বারা শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে বহু লোককে চাকরির উমেদারি থেকে বাঁচানো যেতে পারে।[১৬]

কান্তিবিদ্যা হল, চারুকলা ও উপযোগের সমন্বয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নপদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। জাপান এই সৃজনকার্য অতি সত্বর সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ঐ দেশের পক্ষে দ্রুত অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে।

কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যপাঠ লোককে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে। জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে জনগণের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ জ্ঞান সংস্কৃতিভিত্তিশীল হচ্ছে, ততক্ষণ জনগণ যে উন্নীত অবস্থাতেই থাকবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার বাহন, তবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য একাধিক ভাষা আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ছাড়া ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা কি করে করা সম্ভব? দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক অনুশীলন কোন পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। এই কারণেই স্বামীজী ভারতে ইংরেজিভাষা চর্চার সুপারিশ করেছিলেন। আবার যদিও তাঁর অভিমত ছিল যে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থভুক্ত মহান ধ্যানধারণাসমূহকে জনগণের ভাষাতেই জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত শিক্ষারও নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কারই জাতিকে মর্যাদা ও শক্তিসামর্থ্য প্রদান করবে।[১৭] বুদ্ধ, কবীর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্যেরা তাঁদের বাণী তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই প্রচার করেছিলেন। ফল কিন্তু স্থায়ী হয়নি—মহান শিক্ষকগণের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিক্ষারও অবলুপ্তি ঘটেছিল।

উপরন্তু, জনগণ সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষার চর্চা উপেক্ষা করলে ফল দাঁড়ায় কতিপয়ের বিশেষাধিকার। এর দরুন সৃষ্ট হয় এক নতুন ও কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা। অতএব কার্যত স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় "ত্রি-ভাষা ফর্মুলা" নির্দেশ করেছেন দেখা যায়।

স্ত্রী-শিক্ষাঃ স্বামীজী-নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। কারণ দ্বিবিধঃ প্রথমত, নারীকুলের সমস্যা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। দ্বিতীয়ত, গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে স্ত্রীলোকদের উপর নির্ভরশীল।

সমাজভেদে নারীদের বিশেষ সমস্যারও প্রকারভেদ ঘটে থাকে। আমাদের মতো দেশে সমস্যা হল অবরোধ প্রথার, পরাধীনতার এবং পরনির্ভরশীলতার। বিদ্যাসাগর নারীসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, স্বামীজী কিন্তু সমাধানের সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন "স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তা"র (self-help and mutual aid) মধ্যে। এর জন্য নারীর পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল নারীকে নারী করে গড়ার শিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের মধ্যে নির্ভীকতা এবং স্বাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলবে। অতএব স্বামীজীর মতে, স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরেজি।

সুশৃঙ্খলিত গৃহস্থালির পক্ষে এর উপরে আরও কিছু প্রয়োজন। সুতরাং তিনি শিক্ষাসূচীর তালিকায় যোগ করেছেন রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্য-

বিজ্ঞান, সন্তানসন্ততির পরিচর্যা ইত্যাদি।[১৮] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই সকল নির্দেশ প্রায় এক শতাব্দী আগে ঘোষিত হয়েছিল, যখন গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বা সন্তানসন্ততির পরিচর্যা স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পাঠক্রমভুক্ত হয়নি।

মূল্যায়নঃ স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যাপকতা স্মরণ করিয়ে দেয় মিল্টনের Treatise on Education (১৬৪৪)-এর কথা। জন স্টুয়ার্ট মিলের জন্য তাঁর পিতা জেম্‌স্‌ মিল যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাও মনে না পড়ে পারে না। আবার শরীরচর্চা, কান্তিবিদ্যা ও কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক্রমভুক্তি শিক্ষাব্যবস্থায় জিমন্যাসটিকস, সঙ্গীত এবং কাব্যের উপর প্লেটো-প্রদত্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। এদের প্রয়োজন হল ব্যক্তিমানবের মধ্যে বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য এবং প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টির। তবে স্বামীজী-পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশী মাধুর্যময় এবং পরিধিতে ব্যাপকতর। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বেদান্তের ধারণানুসারে মানুষ গড়া অর্থাৎ সমাজক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা বা পরম মঙ্গলের উপলব্ধি সম্ভব করা। স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই এই পরিপূর্ণতায় উপনীত হতে পারে।

কেউ কেউ হয়তো তাঁর এই শিক্ষা-পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। আবার কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, বর্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী-নির্দেশিত প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, গুরুগৃহে বাস সংক্রান্ত নির্দেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন এতই গরীব যে তাদের পক্ষে খেতখামারের কাজ ফেলে বিদ্যালয়ে যোগদানই সম্ভব নয়, তখন কি করে আশা করা যায় যে, সে গুরুগৃহে বাস করবে, অথবা বর্তমান অবস্থায় আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করবে? পাঠক্রম সম্পর্কেও বলা যায়, এ অতি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। উপরন্তু এতে শিক্ষার্থীর সমস্ত সময় ব্যয়িত হবে। আদর্শ সমাজের পক্ষেই এ ব্যবস্থা করা সম্ভব। অন্যথায়, এ শিক্ষা মাত্র কতিপয়ের জন্য নির্দিষ্ট অভিজাত শিক্ষা হতে বাধ্য।

আসলে কিন্তু স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকে বিশ্বজনীনভাবে প্রবর্তনের সুপারিশ করেননি। তাঁর কাছে সংখ্যা বা পরিমাণের বিশেষ গুরুত্ব কখনও ছিল না। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল আগে পর্যাপ্ত-সংখ্যক শিক্ষক সৃষ্টি করতে, যে শিক্ষক-সম্প্রদায় সম্প্রসারণ-সেবার (extension service) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সামাজিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব করবেন। সুতরাং ভগিনী ক্রিস্টিন যথার্থই উক্তি করেছেন যে, স্বামীজী-

পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা হল "নতুন সমাজের জন্য নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রচেষ্টা মাত্র।" [১৯]

মাত্র পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার পক্ষেই উন্নয়ন-যাত্রা সম্ভব, এবং এই পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নির্দিষ্ট স্থান থাকতে বাধ্য। শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি কাম্য রূপদান করা যায়, তবে তীর্থযাত্রাপথে সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত হতে বাধ্য। স্বামীজীর আশা ছিল, একবার আন্দোলনের সূচনা করা সম্ভব হলে তার পরবর্তী পর্যায়সমূহের কাজ আপনা থেকেই সম্পাদিত হবে। এ হল আদর্শের উদ্ভবে বিশ্বাস। সুতরাং একে অন্যতম উদ্ভবতত্ত্ব (emergent theory) বলেও আখ্যা দেওয়া যায়। এর মধ্যে যদি কিছু ইচ্ছাপূরণ বা অলীকতার উপাদান থেকে থাকে তবে প্লেটো থেকে মার্ক্স্—সকল আদর্শবাদীর মধ্যেই এই 'ত্রুটি' লক্ষ্য করা যাবে।

স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনা

স্বামী বিবেকানন্দ এক যুগন্ধর পুরুষ, এক লোকোত্তর প্রতিভা। একাধারে ধী, মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবংবিধ সমন্বয় সচরাচর সংঘটিত হতে দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর জীবনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছিল, বাঙালীর মানসসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃতসম ফলরাজি উৎসৃষ্ট হয়েছিল স্বামীজী তার বলিষ্ঠ প্রতিভূ। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও প্রতিভা-সমুজ্জ্বল ইতিহাসে তাঁর তুলনীয় প্রতিভাবান সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় সহস্র বছর পিছিয়ে গেলে তবেই পাওয়া যাবে ভগবান শঙ্করাচার্যকে, একমাত্র যাঁকে পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সঙ্গে তুলনীয় মনে করে থাকেন। এমন কি, প্রতিভার বহুমুখিতার মানদণ্ডে বিচার করে অনেকে স্বামীজীকে শ্রেষ্ঠতর আসন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এহেন সর্বগ্রাসী মনীষায় 'বিজ্ঞান' যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

বলা যেতে পারে, স্বামীজীর মনটি ছিল আতশীকাঁচের (Prism) মতো। তাঁর মনের বিম্বে প্রতিফলিত হয়ে জ্বলে উঠেছিল একটা যুগের বিচ্ছিন্ন এমন কি আপাত-বিরোধী যাবতীয় ভাবধারা। সেই বীর সন্ন্যাসীর মধ্যে সংহত হয়েছিল একাধারে যুক্তিবাদ, মৈত্রীভাবনা, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাদেশিকতা, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিচারপ্রসূত শ্রদ্ধা, ইতিহাসচেতনা এবং বিজ্ঞানচেতনা; অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি।

এইরূপ বহুমুখী মানসচেতনা উনিশ শতকের আর একটি মহাদ্রুম বিদ্যাসাগর চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর অনুরাগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেনঃ "ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নব-নব আলোকপাত করছিলেন। প্রতীচ্যের এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের প্রতি বিদ্যাসাগর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন।"[১] এবং ঐ সব নবাবিষ্কৃত তথ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন মনে করা অসঙ্গত হবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর মানসিক রূপকল্প অতি সুন্দরভাবে

রূপায়িত হয়েছিল উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে। উত্তরপাড়া কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তন কালে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ঐ যুগের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তন কালে জয়কৃষ্ণের ভাষণ যেন খেতড়ির রাজাবাহাদুর কর্তৃক বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন কল্পে স্বামীজীর উপদেশেরই প্রতিধ্বনি।

॥ ২ ॥

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনার সূত্রপাত করার আগে 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা কি বুঝি, তার আধার এবং আধেয় কি সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ও যুক্তিসহ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমেই 'বিজ্ঞান' শব্দটির অভিধা নিয়ে আলোচনা করা অসংগত হবে না।

বিজ্ঞান পরিভাষাটি অতিনিগূঢ় অর্থবাহী, এবং ব্যঞ্জনা বহুপ্রসারী এবং বহুমুখী এর দ্যোতনা। এর বর্ণালীর এক প্রান্তে রয়েছে মোক্ষ অববোধ, এবং অপর প্রান্তে আছে 'কণাণু' (Quark) জিজ্ঞাসা। এই দুই প্রান্ত-সীমার মধ্যে বিধৃত আছে ইন্দ্রিয়ার্থ এবং অতীন্দ্রিয় বিশ্বচরাচরের যাবতীয় বিষয় সকল। সুতরাং বিজ্ঞান কথাটি সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজন। ঐতিহাসিক আলোকে এই শব্দটির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক যুগেই চিন্তাবিদ্‌গণ বহুলার্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। শ্রুতি থেকে আরম্ভ করে উপনিষদ্ দর্শনাদিতে এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে সর্বত্রই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। অমরকোষ অনুযায়ী বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"

স্বর্গত মনীষী নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব, তাঁর চিরবরেণ্য গ্রন্থ 'বিশ্বকোষে' ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেনঃ "বিশেষ এবং সামান্য এই উভয় পদার্থেরই যে অববোধ (উপলব্ধি), তাহাই বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। মোক্ষ (মুক্তি), শিল্প (চিত্রাদি), শাস্ত্র (ব্যাকরণাদি), এই সকল বিশেষ (সূক্ষ্ম) পদার্থের উপলব্ধি এবং সাধারণ ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থের উপ-লব্ধিকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলা হইয়াছে।"[১] অর্থাৎ একদিকে যেমন মোক্ষজ্ঞান তেমনই অপরদিকে ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থেরও সম্যক্ উপলব্ধি সূচিত হয় 'বিজ্ঞান' শব্দটির দ্বারা, আবার বেদান্ত মতে বিজ্ঞানকে বলা হয়েছে মায়া-

বৃত্তি বিশেষ অথবা অবিদ্যাবৃত্তি বিশেষ, বৌদ্ধগণ কিন্তু বিজ্ঞানকেই বলেছেন আত্মরূপজ্ঞান।

এদিকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ৭ম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেনঃ

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥"

পণ্ডিতপ্রবর বসু মহাশয় এর অর্থ করেছেনঃ "এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে এস্থলে জ্ঞান অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ—বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুর জ্ঞানই বিজ্ঞান।"[৩] পরমার্থ জ্ঞানও যেমন বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি ইংরেজিতে যাকে 'Science' বলে সেই আধুনিক বিদ্যার সুষ্ঠু প্রকাশও ঐ বিজ্ঞান শব্দ দ্বারাই সম্ভব। Science শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বিজ্ঞান শব্দটি অতিশয় সুপ্রযুক্ত।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে চিৎ-প্রকৃতি (Cosmopsychical) এবং অচিৎ-প্রকৃতি (Cosmophysical) উভয়ের জ্ঞানই বিজ্ঞানের আওতায় আসছে। চিৎস্বরূপের উপলব্ধিও যেমন বিজ্ঞান, পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত জ্ঞানও সমভাবে বৈজ্ঞানিক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজীর বিজ্ঞান-চেতনার অনুধাবন প্রচেষ্টা সংগত হবে।

আধুনিক তথা পশ্চিমী বিজ্ঞানের কারবার শুধু বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে। অন্তঃপ্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে তার এক্তিয়ারের বাইরে। স্বামীজী কিন্তু বাহ্য ও অন্তঃ, অচিৎ ও চিৎ উভয় প্রকার প্রকৃতিরই কারবারী ছিলেন, স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার অনুধাবনে এই দুই বিশিষ্ট ধারার আলোচনা করাই সংগত।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন যে, ধর্মচেতনা ছাড়া বিজ্ঞান যেমন খঞ্জ, বিজ্ঞানচেতনা ছাড়া ধর্ম তেমনি অন্ধ। স্বামীজী আইনস্টাইনের এই বাণীর মূর্ত বিগ্রহ সন্দেহ নেই।

এখানে অচিৎ-প্রকৃতি বিজ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তি-নির্ভর এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। উপলব্ধি বা অনুমানের স্থান এখানে গৌণ, যদিও প্রকল্পের (hypothesis) সংস্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু

যতক্ষণ না পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রকল্পটি প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তা বৈজ্ঞানিক তথ্য তথা সত্য হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। এটাই ছিল এতদিন আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যবাহী (Classical) মানদণ্ড। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কট্টর মানদণ্ড বুঝি বা আর রাখা চলবে না। বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র যতক্ষণ পরমাণুতে আবদ্ধ ছিল ততদিনও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। অসুবিধা দেখা দিল 'কণা' আবিষ্কার এবং ইলেকট্রন কণার আপাত অহেতুকী ব্যবহারে। তারপর যত দিন যেতে লাগল ততই নতুন নতুন গুণাধিকারী কণাসমূহ আবিষ্কারের সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। আর Classical বিজ্ঞানকে পিছে ফেলে 'কণাণু' বিজ্ঞানের নবযাত্রা শুরু হল। এদিকে বিশ্রুত পদার্থবিদ্ Dirac বলে বসলেন যে, মহাশূন্য শূন্য নয়, "...but filled by a bottomless sea of electrons with negative mass *and consequently negative energy*".[৪] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন যে, "...if anything can be said of a particle of this kind it is that if you try to push it forward, it will move backward, and if you blow at it, it will be sucked into your lungs."[৫]

এ যেন সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'। কিন্তু এই আবোল-তাবোল থেকেই উৎপত্তি হল 'Anti-electron' বা 'প্রতিকণা' তত্ত্বের। এই পথেই আবিষ্কৃত হল নবতম কণা পজিট্রন (Positron)। কিন্তু আবিষ্কারের সঙ্গেই মহা গোলযোগ বাধিয়ে দিল নবজাতক। মানুষের এতদিনের ধ্যানধারণা সব উল্টে-পাল্টে দিতে চাইল এই নবতম কণা। কারণ এই কণার কার্যকলাপ ব্যাখ্যা কল্পে প্রায়-বিশ্বাস-অযোগ্য এক তত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে যার বক্তব্য হচ্ছে যে, "...the positron is nothing but an electron which, for a while, is moving backwards in time..."[৬] একেবারে মহাকালের দরবারে হানা। এতদিন জানা ছিল যে, 'কালের' মোকাবিলা করতে হলে তার কপালের ঝুঁটি (fore-lock) চেপে ধরতে হবে। এখন মহাকাল নিজেই যদি দিক্‌পরিবর্তন করতে চান, তাহলে পুরনো ধারণা টিকে থাকে কি করে? সে যাই হোক, উদ্ভূত হল "দ্বি-মাত্রিক কালতত্ত্ব" (two time dimensions)। প্রথমে বিশ্বজগৎ ছিল 'ত্রি-মাত্রিক' (three dimensional) ; কালক্রমে তাতে সংযুক্ত হল এক নবমাত্রা 'কাল', এবং বিশ্ব হল চতুর্মাত্রিক (four dimensional)।

এখন দেখা যাচ্ছে 'কাল' নিজেই দ্বি-মাত্রিক। সুতরাং এই ভাবেই উৎপন্ন হল পঞ্চ-মাত্রিক অর্থাৎ five dimensional মহাবিশ্বের ধারণা, যার তিনটি স্থান-সংক্রান্ত (spatial) এবং দুটি কাল-সংক্রান্ত (temporal)। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানীদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরও বিস্ময়কর পরিস্থিতি। তাঁরা দেখলেন যে মহাবিশ্বে বিপুল বেগে ধাবমান দুটি কণা পরস্পরকে যখন প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করে তখন কণা দুটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু পরমাশ্চর্যের কথা হল, এই বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলি সর্বতোভাবে আদিম বা প্রারম্ভিক কণাদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমতুল্য।

বিস্ময়ে বিমূঢ় বিজ্ঞানীর দল! প্রশ্ন করলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইজেনবার্গঃ আমরা কি তবে উপনিষদের সেই পরম সত্যের মুখোমুখি হয়েছি? এই কি সেই পূর্ণ, পূর্ণ থেকেই কি পূর্ণ জন্ম-গ্রহণ করছে? পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিযুক্ত করলে পূর্ণই কি অবশেষ থাকছে? এই কি সেই 'এক'?

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

বিজ্ঞানীরা আরও দেখলেন শক্তি ও বস্তুর অভিন্ন রূপ, দেখলেন শক্তির বস্তুতে রূপায়ণ এবং পক্ষান্তরে বস্তুর শক্তিতে প্রতিরূপায়ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের নৈষ্ঠিক পূজারীরা কি অবশেষে শক্তি ও বস্তুর অভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন? অচিৎ-প্রকৃতি (cosmophysical) কি শেষ পর্যন্ত চিৎ-প্রকৃতিতে (cosmopsychical) বিলীন হয়ে গেল, নুনের পুতুল সাগরজলে আপন সত্তা খুঁজে পেল?

॥ ৩ ॥

এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেননি, পরন্তু দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরে আছেন। সেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যুক্তিবাদী, এবং প্রমাণভিত্তিক যুক্তিবাদের উপরেই আধুনিক বিজ্ঞানের অবস্থান এবং প্রমাণের দ্বারাই তার প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কোনও আলোচনাকালে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিপদে তাঁর মৌলিক স্বরূপ স্মরণে রেখে অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে মূলত তিনি অধ্যাত্মবাদী পরম যোগীশ্বর। এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার মূল্যায়নটি সমধিক প্রাসঙ্গিক। নিবেদিতা লিখেছেনঃ "Naren lived in the world

of ideals, where history and philosophy and poetry and all the sciences are recognised as phases of Reality. He possessed a prophetic vision of learning, wherein thought was seen as subservient to the real purpose of life, the intellect being the fuel on which the soul fed and which it burned in its supreme effort to go ultimately beyond the intellect, beyond all thought."[৭]

কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই পরমের উপলব্ধিক্ষণেই তাঁর মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞানের চরম স্ফূর্তি যেন দেখতে পাই যখন তিনি গেয়ে ওঠেন ঃ

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাংক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥"

এ যেন মহাশূন্যে ইলেকট্রন-নিউট্রিনোদের (nutrino) নৃত্যদৃশ্য, পজিট্রনদের (positron) জন্মকথা। এ যেন cosmic beginning এবং cosmic ending -এর প্রতিভাস। প্রশ্ন জাগে মনে, আধুনিক বিজ্ঞান কি এই ভাবরূপকল্পের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে না?

এখানেই কিন্তু বলে রাখা আবশ্যক যে বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের অলৌকিক ইঙ্গিত যে পরস্পরবিরোধী নয় পরন্তু একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সূত্রে তারা গ্রথিত, এই পরম বোধ বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন এবং এই সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁর মানসরসে পাচিত হয়ে যে মহৎ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল তার নাম জীবপ্রেম। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেনঃ "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌' সত্যস্বরূপেই বিবেকানন্দ নিবিষ্ট ছিলেন এবং বিশ্বচরাচরকে এই সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই

পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি বাস্তবকে বিচার করেছেন। এ জগৎ কিন্তু তাঁর কাছে মিথ্যা বা অনর্থক ছিল না। এবং এই বাস্তবের বিচারকালেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

॥ ৪ ॥

সত্যানুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে বিজ্ঞানী সত্যানুসন্ধানে তৎপর হন। সর্ববিষয়ে গভীর কৌতূহল, মনের সচেতনতা এবং একান্ত সত্যনিষ্ঠা বৈজ্ঞানিক মনমেজাজের ভিত্তি। স্বামীজী ছিলেন এই-রূপ মনমেজাজের অধিকারী। ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার লিখেছেনঃ "কৌতূ-হলবৃত্তি তাঁর জন্মগত। যুক্তি ছাড়া কোন কিছুকেই মেনে নিতেন না। যেখানে দেখেছেন কুসংস্কার মানুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেখানেই তিনি তার মূলোচ্ছেদে প্রয়াসী হয়েছেন। চিরন্তন কৌতূহলস্পৃহা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে সত্যানুসন্ধানে।"[৮]

তদুপরি স্বামীজীর আশৈশব জীবনকালে যুক্তিবাদের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সত্যাসত্য যাচাই না করে তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেনঃ "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে বলিতেন, 'কোন কথা পুস্তকে লেখা আছে, অথবা কেহ বলিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করিও না। নিজে সত্য আবিষ্কার কর, উহাই সাক্ষাৎকার'।"[৯] এই যাচাই করে নেবার অদম্য স্পৃহা নরেন্দ্রনাথকে শৈশবকালেই নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত করেছে। এ সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক হাস্যরসাত্মক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা হুঁকো দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই অন্য জাতের জন্য সংরক্ষিত হুঁকো খেলে তাঁর জাত যাবে কি না; এবং তিনি বিভিন্ন জাতের জন্য রক্ষিত হুঁকো থেকে সবেগে ধূমোদ্গিরণ করেও দেখলেন যে তিনি মরেও গেলেন না অথবা পৃথিবী তাঁর ঘাড়ে ভেঙে পড়ল না। ঐ সময়ে হঠাৎ উপস্থিত পিতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি অম্লানবদনে বললেনঃ "দেখছি জাত না মানলে কি হয়", পিতা হেসে উঠলেন। পিতার এরূপ সস্নেহ প্রশ্রয় নরেন্দ্রনাথের মানসগঠনে প্রভূত সাহায্য করে এবং সত্যানুসন্ধানে তথা সত্য-যাচাই স্পৃহাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে সন্দেহ নেই। এই যাচাই করে নেবার ইচ্ছা দিনে দিনে এমন হয়েছিল যে, স্বীয়

গুরুকেও তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এক সময় নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে প্রমাণ না পেয়ে কিছুই বিশ্বাস করো না। "আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি।" কতখানি দৃঢ়চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সত্য-সন্ধানী হলে একথা বলা যায় তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। প্রমাণ চাই। তা না হলে কোনও কিছু বিশ্বাস করব না, এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মৌলিক চরিত্র। মনে হয় এই মৌল ধর্ম স্বামীজীর সহজাত। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে এই ধর্ম শৈশব থেকেই বিকাশলাভ করতে থাকে। এই অনুসন্ধিৎসা, সকল কিছুর গূঢ় রহস্য আয়ত্ত করার এই ইচ্ছাই তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং দেখা যায় পরবর্তীকালে যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বিনা দ্বিধায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেন। এমন কি ধর্ম-বিষয়ের মীমাংসাকল্পেও আধুনিক প্রতীচ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত নিতে পশ্চাৎপদ হননি। বস্তুত তাঁর ধারণায় বিজ্ঞান ও ধর্মের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। এই-রূপ প্রতীতি তৎকালে কেন, বর্তমানেও অতিশয় বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি তাঁর কর্মসাধনা এবং মর্মসাধনার সহায়ক বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি অগাধ প্রত্যয়ের সংগে বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলতে পেরেছিলেনঃ "আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সংগে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"[১০] তিনি আরও বলেনঃ "এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর্। কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ কর্। একটা ক'রে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যাবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।"[১১] এটিকে এক কথায় মনে করা যেতে পারে স্বামীজীর ভবিষ্যৎ মানুষ গঠনের কল্পনার রেখাচিত্র। বিশেষ লক্ষণীয় যে তাঁর এই পরিকল্পনায় (blue print) দুটি জিনিস প্রাধান্য পেয়েছে। তার একটি হল practical science and technology-র উপর গুরুত্বদান এবং দ্বিতীয়টি হল এসকল বিভাগের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে specialist সন্ন্যাসীদের হাতে। মানুষ গঠনে তিনি ঐহিক এবং পারত্রিক শক্তির সংযোগ চেয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

নরেন্দ্রনাথের শৈশবের কথা মনে করলে স্বতঃই তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের কথা মনে আসে। জন্মসূত্রে নরেন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী পিতা বিশ্বনাথ দত্তর কাছে একদিকে যেমন পেয়েছিলেন তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, অন্যদিকে তেমনি পেয়েছিলেন তাঁর স্পর্শকাতর তীব্র সংবেদনশীল চিত্ত ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। মাতার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপ্রাণতার প্রভাবও তাঁর চরিত্রগঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিশোর নরেন্দ্রনাথকে বিশ্বনাথ একদিন বলেছিলেনঃ "জগতে কোন কিছুতে বিস্ময় প্রকাশ করিও না।"[১২] প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন যে বিশ্বনাথের এই উপদেশটি স্বামীজীর অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন যে ঐ সময়ে "পুত্রের সহিত বিশ্বনাথ নানা বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা করিতেন। ফলে নরেন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখরতা লাভ করে, এবং সর্ববিষয়ে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগে। প্রত্যেক বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা তিনি পিতার নিকটেই লাভ করেন।"[১৩] স্বামী গম্ভীরানন্দর কাছ থেকেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ "পুত্রের বুদ্ধিস্ফুরণের জন্য পিতা বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এমন কি পুত্রের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে হার মানিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। অধিকন্তু তখন বিশ্বনাথবাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের সমাগম হইত এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা চলিত। নরেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিতেন ও সুযোগ বুঝিয়া স্থলবিশেষে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।"[১৪] এখানেই নরেন্দ্রনাথের তথা উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনার মূল উৎস, একথা ভাবা অসমীচীন হবে না।

নরেন্দ্রনাথ আর একটি সহজাত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। "প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময়" হয়ে যেতেন। এই প্রবল কল্পনাশক্তি, এই অন্তরের গভীরে তন্ময় হয়ে যাওয়া তাঁর বিপুল জ্ঞানার্জনের অনুকূল হয়েছিল অবশ্য মনে করা যেতে পারে। তাঁর অপর একটি প্রতীতি ছিল কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হওয়া। তিনি পরবর্তীকালে নিউইয়র্কে একটি বক্তৃতায় বলেছেনঃ "প্রকৃতির সম্মুখীন হও, অজ্ঞানের সম্মুখীন হও, মায়ার সম্মুখীন হও; কখনও পশ্চাদপসরণ করো না।"[১৫] (So face nature! Face ignorance! Face illusion! Never fly.)

স্বামীজী কিন্তু কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেননি। শৈশবে কিছুদিন পাঠশালায় কাটাবার পর গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর পাঠাভ্যাস চলতে থাকে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং রামায়ণ এবং মহাভারতের বহু অংশ মুখস্থ করে ফেলতে সমর্থ হন। বালক যে তীক্ষ্ন মেধার অধিকারী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৎসরান্তে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হলেন। কলকাতায় তখন সবে গ্যাসের আলো এবং সোডাওয়াটারের আমদানি হয়েছে। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন যে, "নরেন্দ্র তাঁহার খেলাঘরে ঐ দুটি বস্তু ও রেলগাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন।"[১৬] এই ঘটনাগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি সেই বাল্যকালেই বৈজ্ঞানিক প্রবণতার পরিচয় বহন করে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের "সাধারণ বিভাগে" ভর্তি হয়ে পরে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) যোগ দেন এবং প্রথমে F.A. এবং দর্শনে অনার্সসহ B.A. পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর আইন পড়তে শুরু করেন, কিন্তু নানা কারণে আইন পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। কলেজে তিনি প্রথমে লজিক (পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র) এবং পরে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কলেজে বা স্কুলে সরাসরি বৈজ্ঞানিক কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে কৈশোরের অংকশাস্ত্রের প্রতি তীব্র অনীহা যৌবনে কলেজে শিক্ষাকালে প্রবল অনুরাগে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয় লিখেছেনঃ "কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্রনাথ যে-সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিতজ্যোতিষ (Astronomy) অন্যতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'Godfrey's Astronomy' নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন।"[১৭] তদুপরি তিনি নিজে থেকে কলেজীয় জীবনেই প্যাথলজি (Pathology) এবং জুলজি (Zoology) প্রভৃতি জৈববিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছেন, তারও নজির রয়েছে। এই ভাবেই জৈব এবং অজৈব বিজ্ঞানের উপর তাঁর অধিকার জন্মেছিল

বলে মনে হয়। বেলগাঁও-এর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্রর রচনাতে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মিত্র লিখেছেনঃ "আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার (স্বামীজীর) বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুইচারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।"[১৮] সত্যই এ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার! আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ না করে কেবল নিজের মেধা ও মনীষা বলে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একবার দুবার নয় তিনি বার বার এরকম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

॥ ৬ ॥

মনে হয় নিজের অধ্যয়ন ছাড়াও বহু বিজ্ঞানী ও মনীষীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের যৌবনকালে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের উপর 'তত্ত্ববোধিনীসভা'র সবিশেষ প্রভাব ছিল। ঐ সভার সভ্যগণ ছিলেন মুক্তিমার্গী এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন একজন বিদগ্ধ চিন্তা-বিদ্ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে মননমূলক প্রবন্ধের বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসসম্মত আলোচনার পথ প্রদর্শনে তিনি প্রগতিশীল নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঐ সভার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ঐ সভা এবং সভার সদস্যগণের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

কলেজে সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। শীল-মহাশয় মূলত দার্শনিকোত্তম হলেও বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে অতিশয় গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর "The Positive Sciences of the Ancient Hindus" গ্রন্থে বেদ-বেদান্তের যুগের বিজ্ঞানচিন্তার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই উভয় দিকপাল যে পরস্পরের খুবই কাছে এসেছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে। ঐ সময়কার আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। পর-বর্তীকালে Indian Association for Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা

করে তিনি ভারতীয়গণের পক্ষে উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচর্চার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তার সরকারের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ নানা আলোচনায় সময় অতিবাহিত করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর এক দিকপাল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অবদানে বিজ্ঞানের নবদিগন্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই দুই মহামানবের সাক্ষাৎ-কার হয়েছিল কিনা তা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়নি। কিন্তু উভয়েই যে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপোষণ করতেন এবং উভয়েই যে পরস্পরকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই মহীয়সী নারী একদিকে যেমন ছিলেন রাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতপ্রাণ, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস। ডঃ অমিয় মজুমদার লিখেছেনঃ "বলা যেতে পারে জগদীশচন্দ্রের প্রচণ্ড হোমসাধনায় হবি সংগ্রহকারী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র যদি হন এক বিরাট ল্যাবরেটরী, তাহলে নিবেদিতা সেই গবেষণা-গারের বিদ্যুৎশক্তি—যে শক্তিবলে কর্মে উদ্দীপনা আসে, যে শক্তি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে গবেষককে দেয় নতুন উৎসাহের আলো, যে শক্তির প্রভা হতাশার নিঃসীম অন্ধকারে বিজলীর চমক দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে নতুন পথের সন্ধানে ঠেলে দেয়।"[১৯] ডঃ মজুমদারের এই ধারণা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। এমন কি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাণ্ডুলিপি রচনাতেও তিনি নিজে লিখে জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল স্বামীজীর উৎসাহে। নিবেদিতার মাধ্যমেই আচার্যের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছিল স্বামীজীর কাছে, এবং তিনি তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভার দ্বারা তা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এক চিঠিতে যাতে তিনি লিখেছেনঃ "এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। ...দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন... সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ-মণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!"[২০] এই চিঠিটি একাধারে

তাঁর বিজ্ঞানে অসীম অনুরাগ এবং দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

বিদেশে তাঁর পরিচিত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন কামানের আবিষ্কর্তা হিরাম ম্যাক্সিম (Hiram Stevens Maxim), তড়িৎ বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা (Nikola Tesla), বিশ্ববিখ্যাত তড়িৎ বিজ্ঞানী সার উলিয়ম টমসন (afterwards Lord Kelvin), অধ্যাপক হেলমহোলৎস (Prof. Helmholtz) প্রভৃতি। চিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ শুনে ম্যাক্সিম এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি লিখে গেছেনঃ "His first speech was no less than a revelation." বিজ্ঞানী টেসলার সঙ্গেও তাঁর চিন্তার আদানপ্রদান হত। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এবং নিকোলা টেসলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী নিজেই লিখে গেছেনঃ "মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন গণিতমূলক প্রত্যক্ষপ্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

"তা যদি প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।"[২১] এই চিঠি স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমর্থনে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বামীজীর কাছে আধুনিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র পার্থিব ঘটপটাদির ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিল না, পরন্তু বৈদান্তিক-সৃষ্টি-বিজ্ঞান ব্যাখ্যাকল্পেও একান্ত আবশ্যক ছিল। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব দেখেননি তিনি, বিজ্ঞান ও ধর্ম ছিল তাঁর মতে পরস্পরের পরিপূরক মাত্র।

এই সমস্ত আলোচনায় যে তথ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই যে স্বামীজী স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করে, নিজ অধ্যবসায় গুণে তৎকালে প্রচলিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন মনীষিবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে, এঁদের সঙ্গে আলোচনা-বিচার-বিতর্কে স্বামীজীর জ্ঞানভাণ্ডার অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি তিনি আপন প্রচেষ্টাতেই স্থাপিত করেছিলেন। ভারতের প্রান্ত-উপান্তে

পরিব্রজ্যাকালে তিনি তার বহু প্রমাণ রেখে গেছেন। এই সমস্ত তথ্যাদি বিবেচনা করলে অপর একটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে হয় যে স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্মেরই প্রতিফলন।

॥ ৭ ॥

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যাত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা, মনে হয়, স্বামীজীই প্রথম করেছেন। তিনি ধর্মের জটিল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিচার করে তথাকথিত জড়বাদিগণের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন। প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সাহায্যে তিনি ভারতীয় ধর্মদর্শনকে ব্যাখ্যা করে সহজবোধ্য এবং মনে হয়, সহজগ্রাহ্যও করেছেন। এ এক অভিনব ও বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। জড়বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আঘাতে যখন তাঁর দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাস টলটলায়মান, সেই সময়ে ঐ জড়বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সেই আঘাতকে প্রতিহত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে তিনি কেবল একটা সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেননি, পরন্তু তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিবাদী।

অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুবিখ্যাত 'রাজযোগ' গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকার গোড়াতেই তিনি লিখেছেনঃ "ঐতিহাসিক জগতের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্যন্ত মনুষ্যসমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণেও যেসকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী লোকের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ, যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক সময়েই দেখা যায়, লোকে যে ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নকল। কিন্তু কথা এই, উহারা কাহার নকল? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নহে। যেসকল বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শী নন, তাঁহারা নানাপ্রকার অলৌকিক মনোরাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। অতএব, ইঁহারা—যেসকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন,—তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী।"[২২]

ঐ ভূমিকাতেই তিনি 'রাজযোগ' সম্বন্ধে বলেছেনঃ "রাজযোগ...ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি যদিচ সত্য, কিন্তু মেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষ অথবা পুরুষগণ দ্বারা ঐসকল ব্যাপার সংসাধিত হয়, এইরূপ কুসংস্কার-পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। ইহা সমুদয় মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহাতে আরও এই শিক্ষা দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসনা ও অভাব মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে; সেইরূপ তাহার অন্তরেই তাহার ঐ অভাব মোচনের শক্তিও রহিয়াছে; যখনই এবং যেখানেই কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই এই সমুদয় প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে, উহা কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষ হইতে নহে।"[২৩] এর চেয়ে প্রাঞ্জল তথা বলিষ্ঠ ঘোষণা আর কি হতে পারে, আর কেইবা করেছে? তিনি আরও বলেছেনঃ "অপ্রাকৃতিক বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্ম তদ্রূপ নহে।" আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বামীজীর এই বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার আর উপায় নেই। প্রাগ্রসর পদার্থবিদ্যার ক্রমবিকাশে আজ ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যা (classical physics) এবং কণাবাদী পদার্থবিদ্যা (microphysics) প্রায় দুটি আলাদা স্তরের বিদ্যা, একটি স্থূল সম্পর্কিত অন্যটি সূক্ষ্ম সম্পর্কিত, একটি সহজে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অপরটি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের বাইরে, প্রায় ভাবকল্পনা জগতের।

স্বামীজী পুনরায় বলেছেনঃ "আমাদের সকল জ্ঞানই স্বানুভূতির উপর নির্ভর করে। আনুমানিক জ্ঞানের (সামান্য হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ জ্ঞান, উভয়ের) ভিত্তি—স্বানুভূতি। ...যোগ-বিদ্যার আচার্য্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, 'ধর্ম্ম' যে কেবল পূর্ব্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত, তাহা নহে; —পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। যে বিদ্যার দ্বারা এই সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম যোগ।'.. যাঁহার আত্মার অনুভূতি অথবা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার না হইয়াছে, তাঁহার আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বলিবার অধিকার কি? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহাকে উপলব্ধি করিতে

হইবে। তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল।"[২৪] এ যেন নিশ্চিত-বিজ্ঞানের (exact science) প্রথম প্রস্তাব (fiirst postulate)। নিশ্চিত-বিজ্ঞানী নিজে কতকগুলি জিনিস প্রত্যক্ষ অনুভব করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তখন সেই সিদ্ধান্তগুলিকে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করেন। জনসাধারণও তাদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তা হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হন। স্বামীজী বলেন যে অধ্যাত্মজ্ঞানেও সেই একই কথা। নিজে আগে অনুভব কর তবেই অন্যকে সেই জ্ঞান দানের অধিকার পাবে। রাজযোগের দ্বারাই এই অধিকার অর্জন সম্ভব। তিনি বলেছেনঃ "রাজযোগ-বিদ্যা এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কার্য্যকরী ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানবসমক্ষে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিদ্যারই অনুসন্ধান বা সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তুমি যদি জ্যোতির্ব্বেত্তা হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল জ্যোতিষ জ্যোতিষ বলিয়া চীৎকার কর, জ্যোতিষশাস্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ, উহাতেও একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গমন করিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, উহাদিগকে একত্রিত করিতে হইবে, মাত্রা বিভাগে মিশাইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্ব্বিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গমন করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি জ্যোতির্ব্বিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না...নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া সরলভাবে সাধন করিতে থাক। যদি এই উচ্চতর সত্য লাভ না কর, তাহা হইলে বলিতে পার বটে যে, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নহে।"[২৫]

কী দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে এই উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তিকটিতে। সত্যসন্ধ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কারও পক্ষে এরকম উক্তি করা সম্ভবপর নয়। উদ্ধৃতি অবশ্যই দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু অকারণে নয়। এই উদ্ধৃতি স্বামীজীর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদৃঢ় যুক্তিবাদী মনের এক অবিসংবাদী পরিচয়-লিপি। স্বামীজীর আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কতটা অধিকার ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অথবা তিনি বিজ্ঞানের পাদপীঠে

একজন আইনস্টাইন বা ডিরাক (Dirac) ছিলেন, এ তথ্য প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, স্বামীজী যে বৈজ্ঞানিক মানসের অধিকারী ছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর সর্ব কার্যকলাপ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেমন অধ্যাত্মজগতে, তেমনই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের আলোতেই যে তিনি পথ চলতেন, সরলভাবে তা-ই তুলে ধরা। স্বামীজীর আপন রচনাবলী থেকে তুলে ধরা উদ্ধৃতিগুলি (অনুবাদ), তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে আশা করা যায়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম (spiritual বা আত্মিক অর্থে) একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সে ভিত্তি হল জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তি, তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য থাকতে পারে না। স্বামীজীর মতে তাই জড়-বিজ্ঞানকেও শেষ পর্যন্ত 'জড়' ছেড়ে 'অজড়ে' বা 'চৈতন্যে' পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেছেনঃ "জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোনো একটি, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন, উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।"[২৬]

স্বামীজীর কাছে "Science is nothing but finding of unity" ; বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য "এককের অন্বেষণ মাত্র"। ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই সেই 'এককের' সন্ধানে এগিয়ে চলেছে, এবং সেই 'একেই' উভয়েই বিলীন হবে। "পদার্থবিদ্যা যখন এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিবে যে অন্যান্য সকল শক্তি তাহারই প্রকাশ মাত্র এবং এইরূপ কাজের দ্বারা তাহার কাজের শেষ করিবে তখন সেও থমকিয়া দাঁড়াইবে।" "...যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্য-পরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।"[২৭]

এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। আজকের নবকণাদগণ (microphysicists) যখন শক্তি ও কণার পরস্পরে নিয়ত রূপান্তরণ দেখে স্তব্ধ

বিস্ময়ে ভারতীয় ঋষি-মুনিগণের পদতলে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী, তৎকালে এই অবিশ্বাস্য পরম পরিণতির কথা স্বামীজী কি তাঁর ঋষিকল্প দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ?

স্বামীজীর কথায় মনে হয়, বেদান্ত ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য। তিনি বলেছেনঃ "...আমি একটি মাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে 'জড়' আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। জড়বাদী বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি—ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে।"[২৮] আনন্দের কথা আজকের বিজ্ঞানীরা আর ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর 'জড়ের' ধারণা পোষণ করেন না; বলা যায় ঐরূপ অর্থে 'জড়ের' অস্তিত্বই লুপ্ত হয়েছে।

"চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম—সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান।" তাঁর এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেনঃ "প্রথমে মানুষ যত রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সমস্ত জিনিসগুলি ৯৩টা মূল-দ্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।" তৎকালে ৯৩টি মৌল পদার্থই জানা ছিল, স্বামীজী কিন্তু উহাদের সকলগুলির মৌলত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেননি, পরন্তু তিনি বলেছেন যে, "ঐ মূলদ্রব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রদ্রব্য (compound) বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত্র—বোঝা যাইবে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেনঃ "প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। তারপর দেখিল যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্য সকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নাই মাত্র। তখন খালি দুইটি শ্রেণী রহিল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, আমরা যাহাকে অচেতন বলি, তাহাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।"[২৯] এইরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা দ্বারা তিনি বারে বারেই এক অদ্বৈত সত্যেরই সন্ধান পেয়েছেন, এবং বলেছেন যে; "এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক। মায়াদ্বারা আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র।" এইভাবে স্বামীজীর মানসে

বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বৈদান্তিক সত্য আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ক্রমে একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে 'এককসত্যে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি থেকে এরকম ধারণা করা অসংগত হবে না যে স্বামীজী শুধু অধ্যাত্মবস্তুর ব্যাখ্যাকল্পেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐরূপ অনুমান একান্তই ভ্রান্তিমূলক। স্বামীজী আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তার প্রভূত প্রমাণ তাঁরই সুবিশাল রচনাসম্ভারের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বস্তুত, এসকল ক্ষেত্রেও তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর বললে অত্যুক্তি হবে না।

শরীরতত্ত্ব, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র (স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সমেত) সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 'রাজযোগ' ব্যাখ্যানে, যার সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় বহুজনেরই আছে। তার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং জীবের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন নিয়ে তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন। মনোবিজ্ঞান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং মনোবিদ্যাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এসবের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের নেই। তাই সামান্য কিছু নিদর্শন উল্লেখ করেই আলোচনার সমাপ্তি টানতে হবে।

স্বামীজী ডারউইন সাহেবের ক্রমবিবর্তনবাদ গভীরভাবে অনুধাবন করে-ছিলেন। ডারউইনের "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" (Survival of the fittest) এবং "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (natural selection) তত্ত্বদ্বয় তখন সারা দুনিয়ায় প্রবল আলোড়ন তুলেছে, এবং প্রবল বাধা অতিক্রম করে বিদ্বজ্জন সমাজে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্বামীজী ডারউইন-প্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে জ্ঞানের আলোকে বিচার করলেন, যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলেন, কেবল মাত্র ধর্ম বা ঐতিহ্যের স্মরণ নিলেন না। সুগভীর পর্যালোচনার পর তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তাঁর নিজের কথাতেই তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেনঃ "Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারউইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্য-জগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়।...যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) ব'লে জানি, তাঁদের

বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচার-বুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে progress (উন্নতি) হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণ বিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব)-এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হ'তে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তি-হীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।" [৩০] এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দর কথা মনে আসে। তাঁরও অভিমত হল যে মানুষের পরবর্তী বিবর্তন হবে মনোজগতে। অরবিন্দ এই জীবনকেই চেয়েছিলেন দিব্যজীবনে পরিণত করতে, মনের ঊর্ধ্বায়নে—মনের সাধারণ স্তর থেকে ক্রমে ঊর্ধ্বতর মানসে (higher mind), ভাস্বর মানসে (illumind mind), অধিমানসে (over mind) এবং শেষ পরিণতি অতিমানসে (super mind), এই "জীবনের পূর্ণ পরিণাম"ই শ্রীঅরবিন্দেরও লক্ষ্য ছিল।

এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার সম্যক্ পর্যালোচনা করলে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ডারউইন পন্থীদের চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামীজীর মননের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেটি হল স্বামীজীর 'আত্মার' অস্তিত্বে অখণ্ড আস্থা। যে কোন জীব, তা সে হোক না ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তারও মধ্যে বিকশিত হচ্ছে সেই একই আত্মা, এবং তাই যদি হয়, তবে তো ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে আত্মা নিজেরই বিকাশ সাধন করে চলেছে। এবং এই চিন্তাধারার সঙ্গে involution theory বা ক্রমসঙ্কোচবাদ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে

বাধ্য। স্বামীজী বলেনঃ "যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃত পক্ষে সেই মহাপুরুষেরই 'ক্রমসংকুচিত ভাব'। উহাই পরে মহাপুরুষ-রূপে বিকশিত হয়।" যেমন গাছটি আসে বীজ থেকে, কিন্তু ঐ গাছই আবার বীজ উৎপন্ন করে। শূন্য থেকে তো আর কোন গাছ জন্মাতে পারে না। বীজ ঐ গাছেরই সূক্ষ্মরূপ। একটা প্রকাণ্ড গাছ ক্রমসংকুচিত হয়ে বীজরূপ নিয়েছে। বীজের মধ্যে গাছের সূক্ষ্মরূপ, আর স্থূলরূপী স্বয়ং বৃক্ষটি। ঠিক একই ভাবে মানুষ বিধৃত রয়েছে একটি জীবাণুর মধ্যে। আবার ঐ জীবাণুই ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয় মানুষ রূপে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধিকালে ঐ রকম বিভিন্ন জান্তবস্তরের একটা ক্ষীণ আভাস পাঁওয়া যায়।

স্বামীজীর নিজের কথায় তাঁর নিজস্ব মতবাদটি স্পষ্টতর হবে। তিনি বলেছেনঃ "এই সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল' জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব—এই-সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রম-সংকুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সেই ক্রমসংকুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়।" ৩১ শুধু মানবে এই অভিব্যক্তির শেষ নয় "পূর্ণতম মানবে," supra-mental মানবে তার গতির যতি। আত্মায় বিশ্বাসীর পক্ষে এর চাইতে প্রকৃষ্টতর বিবর্তনবাদ আর কিছু হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।

॥ ৯ ॥

নৃতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের একটি নব সংযোজন। স্বামীজী এই নবীনতম জ্ঞানশিখাকেও আয়ত্ত করেছিলেন, এবং ভারতের নৃতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ পোষণ করতেন। ঐ মতবাদ কিন্তু তৎকালে প্রচলিত বিদেশী-দের দ্বারা রচিত মতবাদের অনুসরণমাত্র ছিল না, পরন্তু বহুক্ষেত্রেই বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেসব প্রায়-মনগড়া মতবাদ প্রচার করেছেন, স্বামীজী তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত তাঁর "Swami Vivekananda: Patriot-Prophet" পুস্তকে এ বিষয়ে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ

"Swami Vivekananda was the first Indian to raise his voice against this false foreign propaganda." স্বামীজীর এই বিরোধিতা পরবর্তীকালে ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই।

স্বামীজী ভারতীয় জাতি সম্পর্কে প্রচলিত মৌলিক ধারণাকে আঘাত করেছেন। যেমন, শূদ্ররা যে অনার্য এবং তারা যে আর্যদের দাস তা তিনি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেনঃ "শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এসব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ...জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছেঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।" তাছাড়া শূদ্র যে অনার্য-সম্ভূত এর কোন নির্ভুল প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। "মনু বলেছেন তারা আর্য।" তদুপরি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের মতেঃ "Nobody has as yet been able to give a clear exposition of the cause of the origin of skin-color, contour of the head, nose etc., amongst different races of mankind." ৩২ সুতরাং এইরূপ প্রায়-কল্পিত সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই সমীচীন মনে হয় না। স্বামীজীও তাই এগুলিকে গ্রাহ্য করেননি। তাঁর বিচারে ভারতবর্ষ একটি প্রকান্ড "নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা"। তাঁর অনবদ্য ভাষায় রচিত "আর্য ও তামিল" প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে তুলে দেওয়া হল। তিনি লিখেছেনঃ "সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান,—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ

করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই-সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"[৩৩]

কী অপূর্ব ভাষা, কী গভীর ব্যঞ্জনা! বিজ্ঞান ও শ্রীজ্ঞানের কী অপূর্ব মিলন! এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'। সাহিত্যিকগুণের কথা বাদ দিলেও উদ্ধৃতিটি যে সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ এ বিষয়ে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। এখানে পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আজকের দিনেও মোটামুটি গ্রাহ্য,• বস্তুত আজ পর্যন্তও এগুলির কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলা যায় না। স্বামীজীর মতে এই বিরাট সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ফলশ্রুতিই ভারতীয় আর্য জাতি; সমগ্র ভারত আর্যময়।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে সমাজের ক্রমবিকাশ, দেবতা ও অসুর, দুই জাতির সংঘাত প্রভৃতি প্রবন্ধনিচয়ে স্বামীজীর নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের পর্যাপ্ত সাক্ষ্যাবলী ছড়িয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

॥ ১০ ॥

স্বামীজীর সর্বগ্রাহী জ্ঞানান্বেষণে মনোবিদ্যা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে মনোবিজ্ঞানকে তিনি কৌলীন্যের আসনে বসিয়েছেন। এই আপাত পক্ষপাতিত্বের অবশ্যই কারণ ছিল। কারণটি হল মানুষের 'মন'। অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের মধ্যে মনই একমাত্র যোগসূত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী। বাহিরের বার্তা ইন্দ্রিয় মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছাবার পর মনই ইচ্ছামতো সেগুলিকে গ্রহণ বা বর্জন করে। গ্রাহ্য বার্তাগুলিকে মন তখন বুদ্ধির দুয়ারে পৌঁছে দেয়। বুদ্ধির প্রসাদে তখন আত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়। মনের যেন দুটি আনন। একটির দৃষ্টি অন্তরাত্মার দিকে নিবদ্ধ, অপরটির ক্রিয়াকলাপ রিপুনিচয় এবং বহিরিন্দ্রিয়-গুলির সঙ্গে। দৈনন্দিন জীবনে মনের এই দ্বিতীয় অর্থাৎ বহির্মুখী আননটির পরিচয়ই সাধারণত পাওয়া যায়। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইন্দ্রিয়-গণই যেন মনের প্রভু হয়ে বসেছে, মন হয়েছে ইন্দ্রিয়ের দাস। মনের এই

নিম্নগতিকে কেমন করে দমন করা যায়, কি করে তাকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনা যায়, কিভাবে অবশেষে মনকে অন্তর্মুখী করা যায়, মনোবিজ্ঞান তারই শিক্ষা দেয়। ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত অন্তর্মুখী মনই পরিশেষে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করে। এই কারণেই তিনি মনোবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর জীবিতকালে মনোবিদ্যা তৎকালীন বিজ্ঞানী সমাজে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি মনোবিদ্যাকে এতটুকু অবজ্ঞা না করে তার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মনোবিদ্যা নিঃসন্দেহে অতীব জটিল বিদ্যা। স্বামীজীর আপন বক্তব্য থেকেই এটি পরিস্ফুট হবে। স্বামীজী বলেছেনঃ "পৃথিবীর সর্বত্র পদার্থবিদ্‌গণ একই ফললাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ সত্যসমূহ এবং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন। তাহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (data) সর্বজনলভ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য এবং সিদ্ধান্তগুলিও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের মতোই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে এমন কোন তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান এখানে নাই, যাহা হইতে মনোবিজ্ঞানীরা একই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারেন।"[৩৪] এই কঠিনতর বিদ্যানুশীলনে ভারতীয়গণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ক্রমে তাঁরা এই বিশেষ বিদ্যার চর্চায় এমন গভীরভাবে নিবিষ্ট হলেন যে জড়বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়ল।

মনোবিদ্যার অনুশীলনে স্বামীজী কপিল দর্শনের উপর নির্ভর করেছেন এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেনঃ "প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়-সমূহের শারীরিক দ্বারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে (স্নায়ুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—উহাকে তাঁহারা 'আত্মা' বলেন। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে

এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্যন্ত এ-বিষয়ে সাংখ্যমনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই।"[৩৫] প্রায় এক শতাব্দী ধরে আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বামীজীর উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছেন; সাফল্য যে একেবারে কিছুই হয়নি তা নয় তবে সাফল্য এখন পর্যন্ত আংশিক মাত্র। সেগুলির আলোচনা বর্তমান বিষয়বহির্ভূত। তাই স্বামীজীর সাংখ্য-প্রোক্ত উপপাদ্যর উপর আস্থা তৎকালে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনের স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেননি। মন কি একটা বস্তু না ভাব মাত্র, না একাধারে উভয়ই! বিজ্ঞানীরা সন্দেহাকুল। স্বামীজীর কাছে এ নিয়ে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর কাছে মন এবং বস্তু বা Matter -এ কোন পার্থক্য ছিল না। অবলীলাক্রমে একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয়। একই সত্তার দুই রূপ। প্রায় একশ বছর লেগেছে জড়বিজ্ঞানীদের এই সত্যটি উপলব্ধি করতে। সে যা হোক, উপরের উদ্ধৃতিটি পাঠ করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে তৎকালে প্রচলিত শারীরবিজ্ঞানে স্বামীজীর বিশেষ অধিকার ছিল, এবং তাঁর মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন প্রাচীন ও আধুনিক উভয় বিদ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর সকল চিন্তা, সকল কর্মের প্রেরণা ছিল মানবের 'পূর্ণতা' লাভ। স্বামীজী বুঝেছিলেন যে মনোবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা এই পূর্ণত্বপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ "এই বিজ্ঞানের উপযোগিতা হচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মত বহিঃপ্রকৃতির হাতের পুতুল হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে অপেক্ষা করতে না দিয়ে তার পূর্ণত্বকে প্রকট ক'রে দেওয়া। এই বিজ্ঞান চায় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে না দিয়ে কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলে নাও, আর এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে চলে যাও। এই হচ্ছে তার মহান উদ্দেশ্য।"[৩৬]

এগুলি ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারাগুলিও স্বামীজী সযত্নে অনুশীলন করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং কারিগরি বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য কেবলমাত্র স্বামীজীর বিজ্ঞান-সচেতনতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, তিনি বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় পারঙ্গম ছিলেন কিনা তার বিস্তারিত প্রমাণ

দাখিল করা নয়, তাই এই সীমাবদ্ধ আলোচনাতেই বর্তমান অধ্যায়ের ইতি করা সমীচীন হবে মনে হয়।

॥ ১১ ॥

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের মধ্যে স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার সহজ ও সাবলীল প্রকাশ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক রসায়নে জড়িত মানসের অধিকারী না হলে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি সহজ নয়। অশনে-বসনে, আহারে-বিহারে, শৌচ-আচমন-অবগাহনে, প্রতিদিনেব প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানচেতনার নিয়ন্ত্রণের বহু নিদর্শন তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সচেতন করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেশবাসীর চরিত্রের গোড়ার গলদটি সঠিক নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই মৌলিক গলদটি হল সর্বনাশা সার্বিক কুসংস্কার। তাঁর পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের আরম্ভেই তিনি অলঙ্কার-ঝঙ্কৃত ভাষায় তাঁর স্বদেশবাসিগণের সম্বন্ধে "ইওরোপীয় পর্যটক"দের ধারণা এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের চোখে আমাদের যে চিত্র এঁকেছেন তা সত্যই অনবদ্য এবং অতুলনীয়। সমস্ত অংশটি তুলে দিতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হবার আশঙ্কায় তা থেকে নিবৃত্ত হতে হল। আবার ভারতবাসীর চক্ষে 'ওঁরা' হলেন "দেহপোষণৈক জীবন" পাশ্চাত্য অসুর মাত্র। কিন্তু একথাও সত্য যে "দুঃখ দারিদ্র্য তো বাস্তবিক ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও নাই।" স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক ও সজাগ করে তাদের দুর্দশা দূর-কল্পে সচেষ্ট হলেন। তিনি কুশলী শল্য চিকিৎসকের মতো আমাদের ব্যাধি-গ্রস্ত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অনাচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেগুলি নির্মূল করতে তৎপর হয়েছিলেন।

তিনি প্রথমেই শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গ তুলে বলেছেনঃ "দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে--পবিত্রতা.. দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নেই যাদেব শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না।" একটু পরেই প্রশ্ন তুলেছেনঃ "আমরা স্নান করি কেন?" এবং নিজেই জবাব দিয়েছেনঃ "অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে ব'লে। আমাদের জল ঢাললেই হ'ল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।" এই একই ধারায় তিনি বলেছেনঃ "ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে

পচ্‌তে দিই। না ছুঁলেই হ'ল! এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্ত্তে হবে না।"[৩৭]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্বামীজীর ব্যবহারিক জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে তিনি আমাদের তথাকথিত পরিচ্ছন্নতা যে কত ঠুনকো তা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন এবং তার মূল্য প্রদান যে পরলোকের জন্য অপেক্ষা না করে দুরন্ত ব্যাধির মধ্য দিয়ে এ জীবনেই দিতে হয় তাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ঘরে বাইরে, নিজদেহে এবং দেহাবরণে, রন্ধন ও রন্ধনশালায়, সর্বত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। শুধু দেহ পরিষ্কার রাখব আর নোংরা কাপড়চোপড় পরব—এ চলবে না। তাঁরই কথায়ঃ "'আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ'—(মনু ১-১০৮); আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া—সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার ভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া, কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!"[৩৮]

এই যে আচারের বিচার, এই যে ব্যাধি মহামারীর মূলে প্রবেশের চেষ্টা, এখানে আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মনই প্রবল। এর প্রতিকার-কল্পে তিনি কোন ঠাকুর-দেবতার স্মরণ নিতে বিধান দেননি। এখানে তাঁর উপদেশ নব্য বিজ্ঞানভিত্তিক। এবং এইরূপ বস্তুবিজ্ঞানভিত্তিক মনোভাবের পরিচয় তিনি ব্যবহারিক ব্যাপারে বরাবর দিয়ে গেছেন।

"আহার ও পানীয়" সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁর এইরূপ মনোভাব স্পষ্টতর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে রামানুজাচার্যের মতামত এবং তদ্বিষয়ে স্বামীজীর বিচার অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপকঃ "রামানুজাচার্য্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তি-বিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য্য কীটকেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে

সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা'। ...একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।"[৩৯] খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গের উৎপত্তি এবং তার অশুভকর পরিণতির এইরূপ ঐতিহাসিক এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা স্বামীজীর আগে আর কেউ দিয়েছেন বলে জানা নেই। ঐ অপসংস্কারের বোঝা আজও আমাদের সমাজের কাঁধে চেপে বসে আছে সিন্ধবাদ নাবিকের কাঁধের বৃদ্ধটির মতো।

নিরামিষ ও আমিষ আহার নিয়ে স্বামীজীও বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে জাতি-কর্ম ভেদে আহারাদি পৃথক হতে পারে। "যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈকি।" আমিষ নিরামিষের কোঁদল থামিয়ে, শরীরকে শুদ্ধ ধারণকল্পে নয়, সুস্থ ও কর্মক্ষম করে তুলবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছেঃ "পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে;— যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?"[৪০] এই সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যগুলিকে আজকের ভাষায় বলা যায় প্রাগমাটিক (Pragmatic) সিদ্ধান্ত এবং এগুলি একান্তভাবে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত। খাদ্যাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর কয়েকটি সূত্রাকৃতি মন্তব্যের উল্লেখ করেই খাদ্যাখাদ্য প্রসঙ্গের ইতি করা যাক। "ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ।" "ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য।" "যদি একান্ত পাউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও।" এবং খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মোক্ষম উক্তিঃ "গরীবরা খাবার জোটেনা বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে"—সেদিনের মতো আজও সত্য। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'দুধ' সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত আমাদের প্রচলিত ধারণাকে প্রবলভাবে পরিবর্তন করবে সন্দেহ নেই। মাতৃস্তন্য পানেই মানুষ সমেত সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবদের জীবনযাত্রার শুরু। স্তন্যদাতৃ গাভী তাই ভারতীয় ব্রহ্মণ্য সমাজে মাতৃজ্ঞানে পূজিতা। স্বামীজী কিন্তু দুগ্ধ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাকুল নন। তিনি বলেছেনঃ "দুধ, পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ যেমন

শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক্ ঢক্ করে দুধ খাওয়ায় আর দু ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কের জন্যও একপোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন ; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বটল' ছাড়া উপায়ান্তর নেই।"[৪১]

দুধ সম্বন্ধে স্বামীজীর উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রও তা মানবে বলে মনে হয় না। যেমন অন্ত্র-ক্ষত (Peptic Ulcer) রোগের চিকিৎসায় দুগ্ধের একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরবিরোধী। একটু বিচার করলে কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। আধুনিক চিকিৎসকেরাও অন্ত্র-ক্ষত চিকিৎসায় অল্প পরিমাণে বারে বারে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা দেন এবং অম্লাধিক্য থাকলে দুধের সঙ্গে অম্লনাশক ঔষধাদি যোগ করে দেন। বর্তমানে দুগ্ধের এ্যালার্জিক (Allergic) দোষ সম্বন্ধে চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা সজাগ হয়ে উঠেছেন। ছ মাসের কম বয়স্ক এক শিশু দুগ্ধ-এ্যালার্জির জন্য মৃত্যুমুখী হয়েছিল—এ অভিজ্ঞতা বর্তমান নিবন্ধকারেরই আছে। অতি কষ্টে শিশুটির প্রাণরক্ষা হয়। দুধের এ্যালার্জি-দোষ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদীরা কিন্তু সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। 'তরুণ' সর্দিজ্বর অথবা অতিসারে তাঁদের মতে দুগ্ধ-পথ্য নিষিদ্ধ ছিল।

খাদ্যাদির পরে আসে বেশভূষা। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও যেমন, পোশাক-আসাকের ব্যাপারেও ঠিক তেমনই তিনি দেশবিদেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তদ্দেশীয়দের জীবনযাত্রাপ্রণালীর সম্যক্ পর্যালোচনা করে পরিবেশের উপরে বেশভূষার প্রয়োজনীয়তা ও বিবর্তনের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি পোশাক-আসাকের সামাজিক দিকটা অবহেলা করেননি। তিনি নিজেই বলেছেনঃ "সকলদেশেই কাপড় চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে।" আবার কিছুটা রাজনৈতিক চাপও যে পোশাকের বিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি লিখেছেনঃ "সিকন্দর সা ইরাণ জয় করে, ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার জামা চালিয়ে দিলেন।"[৪২]

এগুলি সবই পোশাকের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশভূষার ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা হল প্রাকৃতিক পরিবেশের। তাই তিনি লিখেছেনঃ "গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীন মাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা পাজামা ইত্যাদি নানান খানা হয়।"[৪৩]

এইভাবে স্বামীজী তাঁর স্বদেশীয়দের এবং বিদেশীদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে, তাঁর এই বিচারের মূলে রয়েছে এক অতি স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোন সংস্কার বা কুসংস্কারই তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আচ্ছন্ন করেনি এবং এসব ক্ষেত্রে তিনি কখনই ঈশ্বরের দোহাই পাড়েননি। "Art, Science and religion are but three different ways of expressing a single truth" ("কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়") স্বামীজীর এই গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিটি তাঁর মহান জীবনে, তাঁর নিজের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

মোক্ষ উপলব্ধি থেকে ঘটপটাদি যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুর উপলব্ধি, এ সকলই বিজ্ঞানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার মধ্যে শিল্প (চিত্রাদি) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নন্দনতত্ত্ব বিজ্ঞানেরই এক তত্ত্ব। বিজ্ঞানের এই শাখায়ও স্বামীজীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অধ্যাত্মসাধনা তাঁকে শিল্পবিমুখ করেনি, বরং তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে শাণিত করে এক নতুন স্তরে উন্নমিত করেছে। শৈশবকাল থেকেই স্বামীজী সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ক্ষমতা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে। বস্তুত এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর অপর একটি নান্দনিক প্রতিভার কথা কিন্তু ততটা প্রচারিত হয়নি। সেটি হল তাঁর চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এগুলিতেও তাঁর অধিকার ছিল অতি উচ্চমানের। বস্তুত স্বামীজী ছিলেন ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত বোদ্ধা।

"অধ্যাত্মসাধনা স্বামীজীকে শিল্পবিমুখ করে তোলেনি। বরং তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর কাছে শিল্পী, ভক্ত তথা সাধক একই গোত্রীয়। শিল্পী যেমন সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজে পান আকাঙ্ক্ষিত পরম সুন্দরকে, আর সেই সঙ্গে নিজেকেও, ভক্তও তেমনি তাঁর সাধনার সিদ্ধি হিসাবে

প্রত্যক্ষ করেন চির সুন্দরের মোহন মূর্তি। সেই দর্শন আত্মদর্শনও বটে।”[৪৪] নন্দনতাত্ত্বিক বোধ ও তীক্ষ্ন সৌন্দর্যচেতনা এনে দিতে পারে ইতিমূলক উদার প্রসন্ন বৈরাগ্য। তখন সাধকের মতো শিল্পীরও ঘটে ব্রহ্মসাক্ষাৎ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিল্পীর সাধনা এবং ভক্তের সাধনা স্বামীজীর কাছে ছিল সমগোত্রীয়। ঈশ্বরসাধনার মতো এই সৌন্দর্যসাধনাও বাসনামুক্ত হওয়া চাই। তাঁর কাছে সমগ্র ব্রহ্মান্ডই একটি চিত্রস্বরূপ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হবে, “তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনাবেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকারবোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি চিত্রের মতো।” এইভাবে মহৎ শিল্পসাধনা ঈশ্বরসাধনারই নামান্তর, সৌন্দর্যের মধ্যেই ঈশ্বর প্রতিফলিত হন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর “বিবেকানন্দ চরিত”-এ লিখেছেনঃ “একবার ইটালীতে সূর্যাস্তের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ নিবেদিতাকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ‘বহির্জ্জগতে সৌন্দর্য্যের যে বিকাশ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্ত্তমান বাহিরে উহার কোন অস্তিত্ব নাই...’।”[৪৫] তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অধ্যাত্মচেতনাই স্বামীজীকে সৌন্দর্য-সাগরে ডুব দিতে প্ররোচিত করেছে।

॥ ১২ ॥

ইউরোপীয় রেনেসাঁ-পরবর্তী মানবসমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষারূঢ় হয়ে অচিন্তনীয় বেগে ছুটে চলেছে “মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি। চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা...” পিছে ফেলে। তার এই দুর্মদ যাত্রাপথে সে বিশাল ব্যাপ্ত মহা-প্রকৃতিকে জয় করতে চায়, উদ্ঘাটন করতে চায় প্রকৃতির গূঢ় গোপন সত্যকে। এই প্রচেষ্টায় তার করায়ত্ত হয়েছে এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব শক্তির আধার। মানব আজ মহাশক্তিধর। কি করবে সে এই শক্তি নিয়ে। দেবাদিদেব মহাদেবের বরে বলীয়ান, শক্তিমদে মত্ত দৈত্যের মতো সে কি দেবাদিদেবের উপরেই তা পরখ করে দেখতে চেষ্টা করবে, অথবা মোহভ্রষ্ট হয়ে আপন ধ্বংসসাধনে নিয়োজিত হবে? অথবা আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে মহাবিশ্বের মহদোপকার সাধনে ব্রতী হবে—জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হবে? বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মনুর পুত্রগণ এই কূট প্রশ্নের সম্মুখীন। বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষ আজ তার

স্থান-কাল-পাত্রের সীমার সীমানা সম্বন্ধে সংশয়িত। এতদিন তার কাছে একটা অলঙ্ঘ্য সীমা ছিল "আলোকের গতি" যার চাইতে দ্রুততর কিছু সে কল্পনাও করতে পারেনি। আজ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সুদর্শন প্রস্তাবিত "টাইকিয়ন কণা" (Tychyon) আলোকের "ফোটন কণা" (Photon) -কে পিছে ফেলে দ্রুততর বেগে ছুটে চলেছে। এতে যদি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, যদি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আপন সর্বনাশ ডেকে আনতে উন্মুখ হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? এই মহাবিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনা। অচিৎ-বিজ্ঞান যদি চিৎ-বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই সেটা সম্ভব, অন্য কোন পথেই তা সম্ভব নয়। পরমাশ্চর্যের কথা যে এখন থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বাংলার অমিততেজ মহাবীর্যবান বীর সন্ন্যাসীর ঋষিকল্প দৃষ্টিতে মানুষের এই জীবনমরণ সমস্যাটি ধরা পড়েছিল। তাই তিনি কম্বু-কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন সতর্কবাণী। আবার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলেন পরম আশ্বাস। বলেছিলেন মানুষকে তার আপন স্বরূপ চিনে নিতে। বলেছিলেন মানুষের আধিভৌতিক স্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে তার অধ্যাত্মস্বরূপ। এই দুয়ে মিলেই তার অখণ্ড স্বরূপ। এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ, এদের আলাদা করা যায় না, আলাদা করা সম্ভব নয়, আলাদা করতে গেলেই ইষ্ট নষ্ট। তবু মানুষ ভুল করে। ভুল করেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের পুরোধাগণ। তাঁরা দেখলেন বস্তুবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞানকে আলাদা করে। আধ্যাত্মিক চেতনাহীন বস্তুবিজ্ঞান অন্ধবেগে ছুটে চলল অজানা তিমির গহ্বরের দিকে। আবার এদিকে অধ্যাত্মবাদীরা বস্তুবিজ্ঞানকে তুচ্ছ করলেন, তাকে পরমার্থবিরোধী ভাবলেন। দুয়ের মধ্যে সৃষ্টি হল বৈরী ভাব। কত বরেণ্য, বর্তমানে প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী প্রাণ দিলেন তাঁদের জ্ঞানচিকীর্ষার মূল্য হিসাবে। আপাতদৃষ্টিতে দুই ভিন্নপথে এগিয়ে চললেন জিজ্ঞাসুর দল। সেই সময়েই স্বামীজী আনলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি দেখালেন যে মানুষের পক্ষে পার্থিব চিন্তা এবং পরমার্থচিন্তা, উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে চলতেই হবে ধুলোমাটির পথে। সেটাই মানবজীবনের অতি বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু সেই চলার পথ আলোকিত করতে হবে অধ্যাত্ম-আলোকে। পৃথিবীতে চলার পথ বস্তুবিজ্ঞানের পথ। তাই বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া মানুষের চলার উপায় নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞানকেও হতে হবে অধ্যাত্মচেতনা-ভিত্তিক। স্বামীজী বস্তুবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখতে পাননি। পরন্তু দুয়ের মধ্যে একাত্মতা দেখেছেন। পরমাশ্চর্যের কথা, সেই যুগেই তিনি বিজ্ঞানের উপমা দিয়ে পরম চৈতন্যের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করেছেন। আবার আধ্যাত্মিক উপমা দিয়ে বস্তুবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ প্রাগ্রসর বিজ্ঞান যেন অধ্যাত্মচৈতন্যের মধ্যে নিজস্ব

বিশিষ্ট স্বরূপ হারিয়ে ফেলে 'পূর্ণত্ব' লাভ করতে চলেছে। আর এই পরম বিস্ময়কর সত্যের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরই মহান চেতনায় এই সত্য প্রথম ধরা পড়েছিল যে বিজ্ঞানের পথ ধরে আরও নিদিধ্যাসনার ফলশ্রুতিতে মানুষ একদিন জড়বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ভূমার গভীরে চলে যেতে সমর্থ হবে। বিজ্ঞানের অল্পজ্ঞানই আমাদের অধ্যাত্ম-জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়—কিন্তু গভীরতর বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা শেষ পর্যন্ত মানুষকে মহত্তম আধ্যাত্মিকায় বোধিস্মান করে—আজকের বিজ্ঞান এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর স্বামীজী অনেক আগেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁর যথার্থ ঋষিত্ব। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা সহজেই মেনে নেওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রিয় উপমাঃ "ঊষাকালের শিশিরসম্পাতের মতো অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে অপরূপ গোলাপকলিকে ফুটিয়ে তোলা।" বিশ্বমানসে তাঁর মতে উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের প্রভাব এই জাতীয়। উপমাটি ঘুরে ফিরে স্বামীজীর বাণী ও রচনায় নানাভাবে দেখা দিয়েছে। "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থের "সর্বাবয়ব বেদান্ত" বক্তৃতার সূচনায় অথবা "জগতের কাছে ভারতের বাণী" নামে তাঁর অসমাপ্ত রচনাটিতে এ উপমা প্রয়োগের অন্যতম উদাহরণ।[১] উপমাটির অনন্যতা বিবেকানন্দের কবিসত্তারই নিজস্ব প্রকাশ। কিন্তু এ উপমায় সমগ্র ভারত-ইতিহাসের সত্যটি ব্যঞ্জনালাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ প্রচার বক্তৃতা নয়, জীবন, শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অতিকথন নয়, ব্যঞ্জনা। স্বামীজীর জীবনে ও সাহিত্যে তার নিশ্চিত প্রমাণ।

প্রথাগত শব্দপ্রয়োগের মানসিক জড়তা আমাদের চিন্তাধারাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে বলে আচরণের অন্তরালে জীবনের সত্য অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। যে বিবেকানন্দ মনে করতেন যে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর কবিসত্তায়, যিনি সংস্কৃতে, বাংলায়, ইংরেজিতে, এমন কি হিন্দীতেও স্তোত্র, গান, কবিতা রচনা করে আপন কবিত্বের মূর্ত প্রমাণ রেখে গেছেন, তিনি যে কবি, বাংলা গদ্যের সাধু এবং চলিতরূপের প্রকাশে যাঁর অনন্যতা পত্রে, প্রবন্ধে, রসরচনায়, ভ্রমণসাহিত্যে বারংবার পাঠককে মুগ্ধ ও মননসমৃদ্ধ করে, তিনি যে সাহিত্যিক একথা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনেকটা অধ্যাপক রাইট-সাহেবের সেই ব্যঙ্গোক্তিকে মনে করিয়ে দেয়, যার তাৎপর্য—সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার বাতুলতা। আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে এইটুকু ভূতশুদ্ধি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক শব্দ দুটি মূলত মননের ও প্রকাশের যুগ্ম-সার্থকতার অপেক্ষা রাখে। শুধুমাত্র লেখাকেই যাঁরা সর্বস্ব করেছেন, তাঁরা সাহিত্যিক সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন ও সাধনার নানাদিকে ব্যাপৃত থেকেও যাঁরা 'প্রাণসত্যের' বাঙ্ময় আত্মপ্রকাশে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাও স্বধর্মেই সাহিত্যিক। স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিত্বের উদাহরণ উপনিষদ্ এমনই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের বাণীরূপ! রীতিমতো ছাপা হবে বা জীবিকার সহায়তা হবে বলে প্রাচীন ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেননি, তাঁদের অবলম্বন করে সত্য ও সুন্দরের অসামান্য প্রকাশ ঘটেছিল বলেই তাঁরা 'স্রষ্টা'র

সীমায় না থেকে 'দ্রষ্টা'য় পরিণত। বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

পেশাদার সাহিত্যিক তিনি অবশ্যই নন। কারণ সাহিত্যসাধনা মানুষের মহত্তম স্বরূপের উন্মোচনে সহায়ক, এই তাঁর ধারণা। আগে সাধনা, তারপর সাহিত্য। উপনিষদ্ যেমন, আগে উপলব্ধি তারপর মন্ত্রময় প্রকাশ। পরবর্তীকালে তাঁর এই চিন্তাধারা সবচেয়ে অনুপ্রাণিত করেছে শ্রীঅরবিন্দকে।

আবার অনুভূতির তুরীয়লোকেই ঊর্ধ্বায়িত সাহিত্যসাধনাও তাঁর নয়। সর্বমানবের ইতিহাসে দেশে দেশে কালে কালে সজীব সচল এক মানবপ্রেমিক সত্তা তাঁকে চারপাশের মানুষ সম্বন্ধে ভাবায়, যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ইতিহাসের দৃষ্টি খুলে দেয়। সহজ রসিক আনন্দময় সত্তায় কখন পাঠকের একান্ত আপন সখা ও সারথি হয়ে ওঠেন। "ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু"- বিবেকানন্দ-সাহিত্য সর্বত্র "সেই প্রেমময়।" সাহিত্যিক বিবেকানন্দ একাধারে মহত্তম ও নিকটতম। জীবনদৃষ্টির এই ব্যাপ্তি ও গভীরতায় বিবেকানন্দ-সাহিত্য মহত্তম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিবেকানন্দের বাংলা ও ইংরেজি রচনা ও ভাষণাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তা পাঠকের হৃদয় ও মনকে সচকিত ও অভিনিবিষ্ট করে অন্তরবাসী আত্মস্বরূপকে জাগিয়ে তোলে। তিনি বলতেনঃ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—এই অভয়বাণী শোনাতে আমার জন্ম"—সেকথা তাঁর রচনাবলীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রমাণিত। সীমায়িত মর্ত্যজীবনের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর বাণীময় স্বরূপ। রচনাবলী অবলম্বনে তাঁর সেই ভাবময় সত্তা মানবপ্রাণের সর্ববন্ধন-বিমোচনের ব্রত পালন করে চলেছে।

সেযুগের উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিতে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয় হলেও বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব, কারুশিল্প, স্থাপত্য, ভাষাতত্ত্ব -এমনি নানামুখী বিদ্যায় সহজাত অনুরাগ স্বভাবতই তাঁকে বিশ্বকোষ-অবলম্বনে জ্ঞানের বিচিত্র বিস্তারের পথে নিয়ে গেছে। সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলীর কল্পনাজগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে রীতিমতো গভীর সে সাক্ষ্য ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ ও বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ (শীল) দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (চণ্ডীমঙ্গল), ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল), রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতা, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর রীতিমতো পরিচয় তো ছিলই, রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গেও কিছু পরিমাণ পরিচিতি তাঁর ছিল—একথা তাঁর গাওয়া গানের তালিকার মধ্যে ধরা পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেদ, উপনিষদ্ থেকে আরম্ভ করে কালিদাসের রচনাবলী, বৌদ্ধ সাহিত্যে ললিতবিস্তর, শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি

তাঁর সাহিত্যরুচি ও শৈলীকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া সাংখ্যদর্শন, মীমাংসা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ ও তার মহাভাষ্য, নারদীয় ভক্তিসূত্র প্রভৃতির সংগে তাঁর পরিচয়ও সাহিত্যচিন্তার পটভূমি নির্মাণে অল্পবিস্তর প্রভাব রেখেছে।

সাহিত্যচর্চা স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক কখন থেকে শুরু করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক নজির এখনও মেলেনি। কিন্তু সাহিত্যপঠনের বিস্তৃতি তাঁর সাহিত্যরুচিকে যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, একথা পূর্বোদ্ধৃত নজির-গুলির দ্বারা অনেকটা প্রমাণিত হয়। প্রথম জীবনে তিনি বাংলা কেমন লিখতেন, তার কিছু উদাহরণ আমরা তাঁর অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ 'শিক্ষা' এবং "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থের সংগীত সম্বন্ধে লেখা বিস্তৃত ভূমিকা থেকে স্মরণ করতে পারি।

"সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ফল বিবেচনা করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে, তাহা নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা বলিয়াই আনন্দদায়ক হইবে। আবার যে বিষয়ে আনন্দ সহকারে শিখা যায়, তাহা অন্য বিষয়াপেক্ষা অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় আনন্দ প্রদান করে তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক মনে থাকে।"[২]

"আধুনিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষালব্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিক ভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিত্ব নীরস অথবা কষ্টকল্পিত ভাবের আলয়, প্রাথমিক মনুষ্যের সরল হৃদয় প্রকৃতির রঙ্গভূমি। অনন্ত সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধিপ্রতিঘাতী প্রভা, নিবিড় অরণ্যের মহান স্তব্ধভাব, গিরি-নির্ঝরের গম্ভীর-হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর ধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপু, নদী সকলের অর্ধস্ফুট সংগীত ধ্বনি, বনবিহঙ্গের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শকারী সংগীত প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত।"[৩]

প্রথম উদাহরণটি অনুবাদ হলেও স্বামীজীর প্রথম জীবনের গদ্যরীতির স্বচ্ছন্দতা প্রমাণ করে, দ্বিতীয় উদাহরণটিতে তাঁর নিজস্ব গদ্যভঙ্গির কাব্যময় প্রবাহধর্ম দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনায় এ জাতীয় প্রবাহধর্মিতা ও ধ্বনিগাম্ভীর্য অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের কাব্য সৃষ্টি করেছে,[৪] মাঝে মাঝে চিঠিপত্রেও এমন উদাহরণ মেলে।

প্রথম জীবনের এই সব রচনা যদি ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে ধরা যায় (আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে তাই মনে হয়) তাহলে এরই পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথের কবিতা বা গান লেখার সাক্ষ্যও স্মরণীয়। সম্প্রতি স্বামীজীর যে "গানের খাতা"-টি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে স্বামীজীর নিজের সই ইংরেজিতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তারিখ হিসাবে ২২শে জানুয়ারি, ১৮৮৬ লেখা আছে। এই গানের খাতাতেই আমরা "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ" এবং "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ" গান দুটি যেভাবে গাওয়া হবে সেই ভাবেই লেখা দেখতে পাই। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজীর সমাধি-অবস্থার কথা মনে থাকলে এ গান দুটির ভাব-উৎস যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি গান দুটির রচনাকালও যে কাছাকাছি সময়ের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। লক্ষণীয়, ১২৯৫ সালে প্রকাশিত "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণেই আমরা "তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা" —গানটি সহ পূর্বোক্ত দুটি গান "নরেন্দ্রনাথ দত্তে"র নামে সংকলিত দেখি। "কথামৃতে"র সাক্ষ্য অনুসারে "তাথেইয়া তাথেইয়া" গানটি ১৮৮৭ সালের শিবরাত্রির অব্যবহিত আগে লেখা।[৫]

সমকালীন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ পারংগমতা তো ছিলই। সেই সংগে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসে একদিকে অদ্বৈত অনুভব ও আর একদিকে সাকার উপাসনার মাধুর্যের মিলন ঘটল। ফলে নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সংগীত রচনাতেই আমরা অধ্যাত্ম অনুভবের পরম মুহূর্তটির প্রকাশ দেখি। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাগানের পরে আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গশীর্ষ স্বামীজীর "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ" এবং "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ" গান দুটির মধ্যেই মেলে। এ গান দুটির সংগে উপনিষদের প্রত্যক্ষ যোগ। বাংলাভাষায় অদ্বৈতোপলব্ধির আভাসের অনন্য উদাহরণরূপে "নাহি সূর্য" গানটি উদ্ধৃত করিঃ

> "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাংক সুন্দর,
> ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
> অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
> ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
> ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
> বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
> সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
> 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥"

ব্রহ্মস্বরূপ-নির্দেশে কঠোপনিষদের "ন তত্র সূর্যো ভাতি" শ্লোকটির সঙ্গে আমরা এখানে শংকরাচার্যের বিবেকচূড়ামণির সাক্ষ্যও মনে রাখতে পারিঃ

"প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা--
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥"[৬]

উপলব্ধির এই মহামৌনতার শিখর থেকেই একদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পরিব্রজ্যারত বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অবতরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তরুণ নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমজীবনে সাহিত্যজগতের সঙ্গে যেভাবে পরিচিত হয়েছিলেন. শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে সে ভাবের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের উদার মানসিকতায়, পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহে, আবাল্য নিজেদের বাড়ীতে সমাগত সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জনদের সান্নিধ্যে, সমকালীন বাংলা-সাহিত্যচর্চায়, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ের ফলে এতদিন তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের আভিজাত্যের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপচারী শুনে বুঝলেন আমাদের প্রতিদিনের সর্বজনপরিচিত মুখের ভাষাই কেমন করে উপমায়, শব্দচয়নে, উপলব্ধির প্রত্যক্ষ স্পর্শে এক অসামান্য ভাষাসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মৌখিক ভাষার সঙ্গে এসে মিলল নরেন্দ্রনাথের উত্তর কলকাতা অঞ্চলের বাক্পদ্ধতি। তারপর থেকে আর বাংলা গদ্যের পোশাকী দূরত্বরক্ষা সম্ভব হল না। স্বামীজীর প্রাণদৃপ্ত একান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ সখাসম্মিত ভঙ্গিমায় বাংলা গদ্য তার চলতি রূপেই সব দিকে বিস্তারলাভ করতে লাগল। প্রথম দিকে সে ঘটনা সাধারণের চোখের আড়ালে তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি যখন 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, সেই সময় থেকেই চলতি ভাষার রাজপথ-নির্মাণের শুরু। সেই সঙ্গে অবশ্য সাধুভাষাও তাঁর কাছে সমাদৃত। তবু, সাধনার ক্ষেত্রে যেমন নিজের মুক্তির চেয়ে বিশ্বজনের মুক্তিই তাঁর প্রার্থিত, তেমনি আকাঙ্ক্ষিত—"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি... সেই ভাব, সেই ভঙ্গি...।"[৭] বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে তাই সর্বজন-

বোধ্য ভাষা ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা" (১৮৫৪) থেকে স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) এক বিপুল অগ্রগতি। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) চলতি গদ্যকে মৌখিক রীতি থেকে আবার লেখ্যরীতির প্রসাধনকলার দিকে নিয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর চলতি গদ্য আর বিবেকানন্দের চলতি গদ্যের ধাতুপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অকৃত্রিম সহজ প্রকাশে (যে ভাষায় আলোচনা করি এবং মনে চিন্তা করি) স্বামীজীর চলতি গদ্য আজও অনতিক্রান্ত।[৮] আর তাঁর সাধুগদ্য প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরিণতরূপে সম্পূর্ণ নিজস্ব শৈলী গড়ে তুলেছে। "বর্তমান ভারতে"-র মতো চিরায়ত গ্রন্থ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বস্তুত একই কালে একই সঙ্গে সাধু ও চলতি গদ্যে স্বামীজীব দুটি বিভিন্ন শৈলী গড়ে তোলা তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যপ্রতিভার অনতম সেরা প্রমাণ। 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠায় তাঁর সাধু গদ্যে "বর্তমান ভারত" (১৩০৫-৭) রচনার প্রায় কাছাকাছি সময়েই "বিলাতযাত্রীর পত্র" (১৩০৫-৮) (পরে 'পরিব্রাজক') প্রকাশিত হতে থাকে এবং "বর্তমান ভারত" শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" (১৩০৭-৮) শুরু হয়ে যায়। সাধু ও চলতি—উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীজী বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ গদ্যশিল্পী।

স্বামীজীর মুখের ভাষা কেমন করে তাঁর কলমের ভাষা হয়ে উঠেছে, তার অনেক উদাহরণ আছে 'পত্রাবলী'তে। পরিব্রাজক জীবন থেকে তাঁর অগোচরেই চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবহ হয়ে উঠেছে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ এ জাতীয় গদ্যরীতির নমুনা হিসাবে স্মরণীয়ঃ "যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out. (নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটি জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর)—বল্, আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।' খবরদার, No 'নেই নেই' (নেই নেই নয়); বল্,—'হ্যাঁ হ্যাঁ', 'সোঽহং সোঽহং'।"[৯]

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকে ক্রমপ্রকাশিত "বিলাতযাত্রীর পত্র" বা

'পরিব্রাজক' (নামটি 'উদ্বোধনে'ই পরিবর্তিত) রচনায় এই গদ্যভঙ্গিই নতুন ভারতের আহ্বানমন্ত্রে পরিণতঃ "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে।...এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।" ১০

'পরিব্রাজক' রচনাটি উদ্বোধনে "বিলাতযাত্রীর পত্র" নামে বেরুবার সময়ই চলতিভাষার সর্বময় উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যায়। ১৯০০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা তাঁর যে চিঠিটি 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধ নামে উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল, বাংলা চলতি গদ্যের বিজয়দুন্দুভিরূপে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। এই রচনাটিতে সর্ববিধ রচনার ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ যে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর নিজস্ব ভাষা-সিদ্ধির বিচারেও সে ঘোষণার মূল্য অনেকখানিঃ "... যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। ...ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। ...এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাব-রাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।" ১১ এক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রত্যাশিত গদ্যরীতির আদর্শ তিনি স্বয়ং, আর হয়তো এই জন্যই, তাঁর অনন্য-ব্যক্তিত্ব আর কোথাও সম্ভব নয় বলেই স্বামীজীর গদ্যের ঠিক অনুকরণ সম্ভব নয়। গদ্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ—এঁদের অবলম্বন করে বাংলা গদ্যের যে অগণিত অনুসরণকারী পদাতিকের দল দেখা দিয়েছে, তা ঠিক স্বামীজীর ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। অথচ মুখের ভাষা ধীরে ধীরে লেখার ভাষাকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে গদ্যশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছে। এর কারণ কি? মনে হয়, স্বামীজীর গদ্যভঙ্গিমার যোগ্য

উত্তরাধিকারী শিল্পী এখনও দেখা দেননি। 'উদ্বোধনে'র প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলি, বিনয়কুমার সরকারের আলাপচারী ও লেখনভঙ্গি, কিছু পরিমাণে একালের সৈয়দ মুজতবা আলি (বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অন্যতম রসজ্ঞ) এঁদের কথা বাদ দিলে আজ অবধি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গদ্যশৈলীর ক্ষেত্রে অননুকরণীয়ই থেকে গেছেন। কিন্তু তেমন যোগ্য প্রতিভাধর দেখা দিলে যে তাঁর চলতি গদ্য-রীতির সম্ভাবনা অপরিসীম, সেকথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়।

নিজের রচনাশক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কি ছিল? 'উদ্বোধন' পত্রিকার আবির্ভাবকালে ঘোষণাই করা হয়েছিল—"স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।" [১২] স্বামীজী তখন এদেশেই রয়েছেন এবং এই ঘোষণার মূল্য যে কি, তাও নিশ্চয় জানতেন। 'উদ্বোধন' প্রকাশের আগে থেকেই তিনি বাংলা গদ্যের রূপান্তর-সাধনের কথা ভাবছেনঃ "...বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব।" [১৩] এ সংকল্প অবশ্য সাধুগদ্য প্রসঙ্গে, কিন্তু শুধুমাত্র সাধুগদ্যই এ সংকল্পে রূপান্তরিত হল না, চলতি গদ্যের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। বাংলা গদ্যের রূপান্তরে স্বামীজীর ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণার জন্য 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' প্রবন্ধটি এবং "বর্তমান ভারত" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি একদিকে, অন্যদিকে "ভাববার কথা" (রসরচনাগুচ্ছ) ও "বিলাতযাত্রীর পত্র" (পরিব্রাজক) পাশাপাশি সাজানো যায়। প্রথমটিতে বাংলা সাধুগদ্যের চিরায়ত ভঙ্গি। এ ভঙ্গি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী হলেও নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র। ক্রিয়াপদের হ্রাস ও ক্রিয়াস্থলে বিশেষণ এ ভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থগূঢ়, ঘনবদ্ধ, গতিবেগসম্পন্ন এক নতুন ধরনের সাধু-গদ্যরীতির স্রষ্টা বিবেকানন্দ তাঁর চলতি গদ্যভঙ্গিমার মধ্যেও মাঝে মাঝে তৎসম ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারের দ্বারা ভাষায় ধ্রুপদীগুণ নিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। [১৪] অন্যদিকে মুক্ত স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গ পরিহাসোজ্জ্বল ভঙ্গিমার দ্বারা দেশী শব্দে, ঘরোয়া ভঙ্গিতে মুখের কথাকে সম্পূর্ণ নতুন এক লেখ্য গদ্যে রূপান্তরিত করেছেন, যে ভাষার চিরনবীনতা আজও আমাদের বিস্ময়ের সামগ্রী। উচ্চতম মননের জন্য তাঁর 'উদ্বোধনে'র পরিকল্পনা, কিন্তু শুধুমাত্র 'ভট্টাচাজ্জিগিরি'র দ্বারা যে পত্রিকা চলে না এও তিনি ভেবেছেন; যে রসবোধ ও সহৃদয়তার দ্বারা সাধারণ পাঠক মুগ্ধ হয় তার জন্য ভ্রমণকাহিনী জাতীয় রচনার প্রয়োজন। সে জাতীয় রচনা প্রকাশ হলেই পত্রিকা 'গড়-গড়িয়ে'

চলবে।[১৫] "ভাববার কথা", 'পরিব্রাজক', "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"—'উদ্বোধনে' প্রকাশিত এ জাতীয় রচনার মূলে সাধারণ পাঠকের সঙ্গে স্বামীজীর সহৃদয়তা। পরবর্তীকালে স্বামীজীর যাবতীয় প্রবন্ধ ও রসরচনা একত্র সংকলন করে "ভাববার কথা" নামে প্রকাশিত।

'উদ্বোধন' পত্রিকাকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর নিয়মিত সাহিত্য প্রয়াস। এ প্রয়াসের পিছনে রয়েছে তাঁর পাঠক-সচেতন লেখকসত্তা। তিনি একই সঙ্গে পাঠক শ্রেণীর অন্তরঙ্গ ও পথনির্দেশক। যথার্থ সাহিত্যিক বলতে আমরা যা বুঝি, শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের আদর্শ বলতে আমাদের যা ধারণা—স্বামীজীর সাহিত্য-সৃষ্টিতে সেই সত্তারই পরিচয় মেলে।

'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় স্বামীজীর বক্তব্যের অংশবিশেষ তাঁর গদ্যরীতি প্রসঙ্গে এবং তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুগামীদের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে উদ্ধৃতিযোগ্যঃ "ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতি-বাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।

"যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"[১৬]

উদ্ধৃত অংশটুকু শুধুমাত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার উদ্দেশ্যই প্রতিভাত করে

না, সমগ্র জাতীয় জীবনের মূল সংকট অনুধাবন করে ভবিষ্যৎ পথ-নির্দেশের যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাঁর ছিল সে সম্বন্ধেও আজকের পাঠককে সচেতন করে। তাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মতো 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায়ও শাশ্বত ভারতের চিরন্তন আশ্বাস। অপরপক্ষে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য মোহের যে সম্ভাবনার কথা তিনি ভেবেছিলেন, স্বাধীনতালাভের পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়েই বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ। সেই আদর্শেরই অন্যতম চূড়ান্ত পরিণতি উদ্বোধনে প্রকাশিত "বর্তমান ভারত"। জাতীয় আদর্শ ও ভাষা বিপ্লবের আদর্শকে কেবল নিজের ক্ষেত্রেই স্বামীজী পালনীয় মনে করেননি, অন্যদেরও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁর নিজস্ব সাধুগদ্যভংগি অনুসরণ করতে বলেছিলেনঃ "বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি।"[১৭] স্বামীজীর সাধু-গদ্যভংগির দিক থেকে বিচার করলে স্বামী সারদানন্দজীর গদ্যরীতিই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভাষাগঠনের উদ্দেশ্যও স্বামীজীর মতে জাতিগঠন। "আহার চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।"[১৮] স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত রজো-গুণপ্রবাহের মতোই তাঁর সাহিত্যশৈলীও প্রধানত রজোগুণদৃপ্ত।

কিন্তু এই রজোগুণদীপ্তির মূল লক্ষ্য ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সত্ত্ব-গুণাশ্রিত জীবনানুভব। তাই সাহিত্যের সার্থকতা কিসে, এই প্রশ্ন নিয়ে তরুণ বয়স থেকে স্বামীজী চিন্তারত। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে কেমন করে তাঁর জীবনের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সমকালীন বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাক্ষ্যে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনায় স্বামীজী শুধু যে জীবনের লক্ষ্যই খুঁজে পেয়েছেন তা নয়, তাঁর সাহিত্যাদর্শও তরুণ বয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতিলোককেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অন্বিষ্ট বলে মনে করেছে। স্বামী সারদানন্দজীর কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণে সাহিত্যিক বন্ধুর সংগে তর্করত নরেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, স্বামীজীর পরিণত জীবনের সাহিত্যচিন্তার তা-ই দিকনির্দেশক।

তরুণ বন্ধুর সংগে নরেন্দ্রনাথের বিতর্কের বিষয় ছিল, সব ধরনের ভাবের

প্রকাশকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করা চলে কিনা। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, প্রচলিত অর্থে গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভাব নরেন্দ্রনাথের নয়। তবু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে মহত্তম ভাবেরই ধারক ও বাহক হবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। তাঁর মতেঃ "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শ-বিশেষকে প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্ত্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্ব্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে They idealise what is apparently real. (প্রত্যক্ষ বাস্তবকেই তারা আদর্শায়িত করতে চায়।) পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শ-সকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে -They want to realise the ideal. (আদর্শকে তারা বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়।) ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সে জন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।" [১২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই দিব্যপ্রেরণার বাণীবহরূপে বিশ্বপরিক্রমাকালে তিনি যথাসম্ভব ব্যক্তিরূপে গুরুর উল্লেখ না করে ভারতীয় বেদান্তচিন্তার বা উপনিষদের কথাই বারংবার বলেছেন। তবু যখন যেটুকু উল্লেখ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতায় দেখা দিয়েছে, তা সেই দেবমানবের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের বন্দনায় পরিপূর্ণ। এই বন্দনারই স্তোত্ররূপ বাংলায় 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' আরাত্রিক সঙ্গীতটি, সংস্কৃতে "ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো" ও অন্যান্য স্তোত্রগীতি এবং "গাই গীত শুনাতে তোমায়" নামে দীর্ঘ একটি কবিতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনকথা লিখতে তিনি চাননি, পাছে বিষয়ের যোগ্য মর্যাদা না ঘটে। হয়তো শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ভাষায় আবদ্ধ করা যায় না বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের অন্তরতম সত্য বলেই সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন এত কম।

এক হিসাবে বিবেকানন্দ-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতবর্ষ। তাঁর দৃষ্টিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের দ্বারাই ভারতের নবজাগরণের পূর্ণতা। "হিন্দুধর্ম কি?" নামে ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটি (পরে 'উদ্বোধনে'র চতুর্থ বর্ষে "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামে প্রকাশিত) তাঁর বাংলা গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকল্পের শুভসূচনা।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকাশ যেভাবে ঘটেছে, তার দুটি উদাহরণ এখানে স্মরণ করি। প্রথমত, বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণঃ "বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন-সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

"এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃ-পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"[২০]

দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও ব্রহ্মরূপী শ্রীরামকৃষ্ণঃ

"গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
... ...
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
... ...
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

এই 'আমি' 'তুমি'র সম্বন্ধ পেরিয়ে অনাহত ধ্বনি বাজে—বিবেকানন্দ-চিত্তে প্রতিধ্বনিত সেই বাণীঃ

"'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা

জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে এই রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে যাত্রার প্রবণতার মূলেও বিবেকানন্দ-ধ্যানলব্ধ সাহিত্যতত্ত্বের একটি মূল সূত্র। সে সূত্রের উৎস উপনিষদ্। পরমসত্যকে প্রকাশের জন্য বাইরের প্রকৃতিকে আমরা অবলম্বন করি বটে, কিন্তু সে প্রকৃতিও বস্তুত সীমাবদ্ধ। তাই একদা উপনিষদের কবিরা জড়ের ভাষায় আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা না করে ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্যের আভাসদ্যোতক এক নতুন ভাষাদর্শের সৃষ্টি করলেন। উপনিষদের "ন তত্র সূর্যো ভাতি", "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া", "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' প্রভৃতি শ্লোক বা শ্লোকাংশে সেই পরম কবিত্বের আভাস। স্বামীজীর মতে উপনিষদ্ এমন এক জাতির সাহিত্য, যে জাতি তেজে বীর্যে পরিপূর্ণ মহিমায় ভাস্বর। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যও ভারতের অন্তর্নিহিত অগ্নির সাক্ষ্যস্বরূপ।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে সমগ্র কঠোপনিষদ্‌ই এক অপূর্ব কাব্য। আর উপনিষদের ভাবধারার মূর্ত প্রতীক তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবঃ "...যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ...সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে।"[২১] উপনিষদের কবিত্ব যেমন স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছে, উপনিষদের অন্তর্নিহিত সমন্বয়াদর্শের (দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত চিন্তাধারায় সমন্বয়) ভাবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসত্যপ্রচারকে তিনি তেমনি আপন জীবনব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় ভারত ও জগতের বহু সাধনার ধারা এসে যেভাবে মিলেছিল, তার মধ্যে স্বামীজী নিঃশব্দে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঋগ্বেদের "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" পর্যন্ত সমন্বয়ের মহাবাণীই ভারতের মহত্তম সত্যোপলব্ধি। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাধ্যমে বিবেকানন্দ আর একটি বিশেষ দিকও জীবনসত্যের অন্যতম প্রকাশরূপে গ্রহণ করেছেন, রামকৃষ্ণদেবের ভাষা অনুসরণে বলা যায় তা ব্রহ্মের শক্তিরূপ। "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।"—তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার সূত্রপাত ও সারাজীবনের ভাবসাধনা ব্রহ্মের শক্তিরূপ বা কালীরূপকে অবলম্বন করেই দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সগুণ ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের পক্ষে 'কালী'র মর্ম গ্রহণ করা একদিনেই সম্ভব হয়নি।

যে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বলে খাপখোলা তলোয়ার নরেন্দ্রনাথ একদা বিনা তর্কে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না, জগতের দুঃখবেদনার সঙ্গে একাত্ম পরিচয়ের ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একদিন তিনিই সেই পরম ইচ্ছাময়ীর খেলাকে অনুভব করলেন। ঠিক কি যে এ ঘটনার রহস্য, স্বামীজী তা প্রকাশ করে যাননি। কিন্তু দুঃখ বেদনা নৈরাশ্য মর্মযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহাসত্য উপলব্ধি করা যায়, একদা সেই সত্যকেই সর্বাগ্রে বন্দনা জানিয়ে তিনি বৃন্দাবনের লীলাভিরাম শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্মশানবাসিনী মহাকালীকেই বীর ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের প্রবল ঝঞ্ঝাগতির সঙ্গে সংহাররূপা ভয়ংকরী কালীর কোথাও মর্মগত মিল আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁকে কালীর চরণে উৎসর্গ করে গেছেন। 'কালী'-প্রতীক অবলম্বনে বিবেকানন্দের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা গড়ে উঠেছে। "Kali The Mother", "নাচুক তাহাতে শ্যামা", "Who Knows How The Mother Plays"—এ তিনটি কবিতাই অনুভবজগতের উচ্চতম সম্পদ। তাঁর সমগ্র জীবনবেদের প্রতীক "সখার প্রতি" কবিতায় এই সংহাররূপিণীই মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিত —"মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের কালীকে অবলম্বন করে নবযুগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিবেকানন্দের কবিতায় কালীর নবতম ধ্যানমন্ত্র উচ্চারিতঃ

> "সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
> করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া।।
> মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
> প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী।।
> মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
> মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।"

মাতৃমন্ত্রের সাধকদের উদ্দেশে তাই তাঁর আহ্বানঃ

> "জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
> দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।।
> পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
> চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।"

মধুসূদনের পর বাংলা কবিতায় বীররসের এমন অভিব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু এ বীররস ভক্তিরসাশ্রিত। বাংলা শাক্তকবিতার নিজস্ব এ সম্পদ স্বামীজীর কবিতায় সার্থকতা লাভ করেছে।

বেদ-বেদান্তের গূঢ়াহিত ব্রহ্ম একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মাধ্যমে বিবেকানন্দের বেদান্তদৃষ্টিকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেই "বহুরূপে সম্মুখে তোমার" ঈশ্বরকে স্বামীজী অভিজ্ঞতার সারাৎসারে বাণীরূপ দিয়েছেন "সখার প্রতি" কবিতায়। আজীবন অন্বেষণের যে উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, এক অপূর্ব উপমায় তা প্রকাশ করেছেনঃ

"যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?"

এই বৃথা চেষ্টার ঘূর্ণচক্র থেকে সেবা ও প্রেমের পথে ীর আহ্বানঃ

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার।"

বিশ্বময় এই প্রেমরূপেই বিবেকানন্দের চরম ও পরম সত্যের আত্মপ্রকাশ।

স্বামীজীর কবিতা ও গদ্যরচনার সর্বত্র শেষ অবধি মানবমানসের মহত্তম সমুন্নয়নই লক্ষ্য। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনব্রতের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। তবু কেবলমাত্র তত্ত্বকথা বা উপদেশের বীজমাত্র না হয়ে শব্দে, সঙ্গীতে, ছন্দে, উপমায়, সৌন্দর্যদৃষ্টিতে, ভাষানৈপুণ্যে ও অনন্তের ব্যঞ্জনায় মিলে তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনার সাহিত্যগুণ সূক্ষ্মদর্শী পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তরুণ নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে আদর্শই বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। কালিদাস, গ্যেটে, টলস্টয় বা রবীন্দ্রনাথ কি অনেকক্ষেত্রে তারই উদাহরণ নন? কিন্তু এঁরা কেউই মানুষের ঐ পরম সত্তার উন্মোচনের আদর্শে সব সময় অবিচল থাকতে পারেননি। শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির মুহূর্তগুলি অবশ্যই বন্দনীয়, তবু পরমুহূর্তেই অথবা অন্য সময়ে এবং অন্যান্য রচনাতে ইন্দ্রিয়জ সুখান্বেষণের জগৎ এঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করে। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রধান লক্ষ্য ও সুর মানবাত্মার বন্ধনমুক্তি—আত্মসত্যের অনন্তমহিমা।

হয়তো সেই কারণেই এক ধরনের নিরাসক্ত সুদূরতা স্বামীজীর ভ্রমণ-কাহিনীতে, সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায়, ভারত-ইতিহাস-পরিক্রমায় অথবা রঙ্গব্যঙ্গ পরিহাসে দেখা দেয়। এও তাঁর স্বধর্ম। খেলার আনন্দ যে খেলোয়াড়ের চাইতে দর্শকেরই বেশী—এও তো তাঁর জীবনদর্শন। "মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফল খাওয়া" (পরিব্রাজক) যাঁর অভ্যাস, তাঁর কাছে সমাজ-তত্ত্ব, ইতিহাস-অনুসন্ধান, মানবিকতার আদর্শ এ সব কিছুর আড়ালে নিত্য নির্লিপ্ত একটি সত্তা চিরজাগ্রত হয়ে থাকে। আবার এই নির্লিপ্ততার জন্যই হয়তো তিনি শ্রমিক, কৃষক, গরীব, অনাথ, মূর্খ, পতিত—সকলের মধ্যে নিহিত মনুষ্যত্বের অমল উপাদান লক্ষ্য করতে পারেন: পৃথিবীর ইতিহাস পর্যায়ক্রমে বঞ্চিত শোষিত মানুষের নবযুগকে আসন্ন করে তুলছে, একথাও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখতে পান। অধ্যাত্মদৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ঊর্ধ্বতম মানস-লোকের অধিবাসী, গণচেতনার ক্ষেত্রে সাধারণতম মানুষের সমতলবিহারী। দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গুরুতর তত্ত্বকে অনবদ্য সরসতায় হৃদ্য পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত, আবার মননের উচ্চতম আদর্শে শাস্ত্রীয় সূত্রপ্রবচনের মতো গূঢ়ার্থদ্রষ্টা। আবার এ সব কিছুরই ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকে পরিহাসে ব্যঙ্গে প্রাণচঞ্চল আত্মীয়োপম লেখক। এসব দিক থেকে বিবেকানন্দের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষভাবেই তুলনা চলে, তবে বঙ্কিমের আধ্যাত্মিক আলোচনা মূলত বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণ, বিবেকানন্দের অধ্যাত্মব্যঞ্জনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিদর্শন। বঙ্কিম সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় সব সময়ই গুরুর আসনে বসেছেন, বিবেকানন্দ হতে চেয়েছেন বন্ধু।

'পরিব্রাজকে' আমরা স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে" সরলতম ভাষায় বিশ্ব-ইতিহাসের আলোচনায় অংশভাগী, "বর্তমান ভারতে" ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস-পর্যায় অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ভারতের অবশ্যম্ভাবী কেন্দ্রভূমিকার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই অন্তহীন আত্মপ্রত্যয়—আমরাও তাঁর গতির বিদ্যুতে প্রাণস্পন্দিত।

ভাষাকে তিনি "সাফ ইস্পাত" করতে চেয়েছিলেনঃ "...মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"[২২] তাঁর মতেঃ "ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।" আবার ঐ একই চিঠিতে লিখেছেনঃ "ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।" জাতীয় জীবনে নবচেতনার স্পন্দন এলে ভাবের জোয়ার দেখা দেয়। ভাষা তখন আপনি গতিশক্তি লাভ করে।

স্বামীজীর ভাব ও ভাষার মৌলিকত্ব ঐখানে। প্রয়োজনবোধে "কলকেতার

ভাষা" থেকে সংস্কৃতপ্রধান সাধুগদ্য—সবই তিনি ব্যবহার করেছেন, ভাবের অভিব্যক্তি অনুযায়ী ভাষাও বদলেছে। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতা, মৌলিকতা ও মহত্ত্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে সর্বত্র এক আভিজাত্য দান করেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এর উল্টোটাও দেখা যায়। স্বামীজী লিখেছেনঃ "হীরেমতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়?" সংস্কৃত সাহিত্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন অতি-অলঙ্করণ আসলে ভাবের অবক্ষয়। এযুগের বাংলাসাহিত্যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাকে অতিশোভন ভাষায় প্রকাশের যে জোয়ার চলেছে তার মূলেও অসার মনুষ্যত্বহীনতা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কিন্তু আমাদের কাছে স্বামীজীর ভাষায় সেই কথাটিই মনে করিয়ে দেয়—"অনন্তের তুমি অধিকারী।" গ্যেটের 'ফাউস্ট', টলস্টয়ের 'রেসারেকশন', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'গীতাঞ্জলি' (বাংলা অথবা ইংরেজি—যেটিই নেওয়া যাক)—এ ধরনের সব শ্রেষ্ঠ কীর্তির মূলে জ্যোতির্ময় আত্মার উদ্ভাসন কাহিনী, হয়তো ধীরে ধীরে সে উন্মোচন ঘটে বলেই মানুষের মহিমা তাতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের কথা। বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা সেই সত্যেরই ঘোষণা।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, রচনা, কর্মের যে কোন রকম আলোচনা করার প্রারম্ভেই আলোচক একটি গভীর বিস্ময় অনুভব করেন, এই বিস্ময়ের প্রকটন পাওয়া যায় "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" শীর্ষক জন্মশত-বার্ষিকী গ্রন্থাবলীতে প্রথম খণ্ডে প্রকাশকের নিবেদনে বিধৃত একটি উক্তিতেঃ

"মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্ত্যলোকে অবস্থান করেন, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল...এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিস্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ বহুদিন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বৎসর (১৮৯৩-১৯০০), অবশ্য পত্র-রচনার কাল ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী (১৮৮৮-১৯০২)।" [১] আমাদের বিস্ময় দুই কারণে। প্রথমত, মানবজীবনের, বিশেষত ভারতীয় জীবনের, এমন কোন দিকই নেই যে বিষয়ে স্বামীজী কোন না কোন মহার্ঘ উক্তি করেননি। দ্বিতীয়ত, এই সব চিন্তা ও উক্তি উচ্ছ্রিত হওয়ার কালসীমা সাত বৎসর, মাত্র সাত বৎসর। এই সঙ্গে একটি তৃতীয় কারণও জুড়তে পারি। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক বলছেনঃ "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশানুরূপভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই।" [২] পাঠকচিত্তে এমন সংশয় জাগ্রত হওয়া অন্যায় নয় যে, সম্পাদক-প্রকাশকের অপরিসীম প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু পত্রাদি তো বটেই, হয়তো কিছু প্রবন্ধও, আজ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে, অতএব আজও গবেষণাকর্মের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাশিত উক্তিগুলির বৈচিত্র্য, গভীরতা, মহার্ঘতার আভাস পেয়ে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, সে বিস্ময় নিবিড়তর হয় যখন ভাবি, আরও তো উক্তি ছিল, আরও তো উক্তি আছে যার হদিস আমরা পাইনি। তবুও যা পেয়েছি তার সমীক্ষা তো কেবল একজন ব্যক্তির সাধ্য নয়। স্বামীজীর চিন্তা, উক্তি, কর্ম তো মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক উদ্ভাসিত করেছে, যে উদ্ভাসের প্রতিফলনে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারিঃ

"তার অন্ত নাই গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।"

সেই অন্তহীন আনন্দ আমরা পাই স্বামীজীর সর্বধাত্রী চিন্তার অণু-পরমাণু থেকেও। সেজন্যই বর্তমান প্রবন্ধসংগ্রহে স্বামীজীর সর্বব্যাপী চিন্তার এক একটি অংশ এক এক জনের আলোচনার বিষয় হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক ও নান্দনিক চিন্তার কথা মনে করুন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই চিন্তার চেয়ে বহুগুণ মূল্যবান চিন্তা তো আরও কতই আছে স্বামীজীর রচনাসংগ্রহে—ঈশ্বরতত্ত্ব, স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক, একস্বার্থকেন্দ্রিকতা ও ভূমাচেতনা, দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, দেশপ্রেম প্রভৃতি কত না বিষয়ে চিন্তা। এসবের তুলনায় সাহিত্য-নন্দনতত্ত্ব স্বতন্ত্র-রূপে আলোচিত হয়নি এই রচনাবলীতে, তবুও (আমরা যেন কোন মতেই ভুলে না যাই) যতটুকু প্রক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-নন্দনবিষয়ক উক্তি আমরা পাই সেটুকু নিঃসংশয়েই স্বামীজীর মূল জীবনচিন্তার ও জীবনতত্ত্বেরই অচ্ছেদ্য অংশ। এই সব উক্তি প্রণিধান করে আমরা স্বামীজীর মূল ভাবনায় পেঁছাতে পারি, কেননা তাঁর প্রতিটি কর্ম প্রতিটি চিন্তা প্রতিটি উচ্চারণ একই অখণ্ড নির্বিশেষ ভাবনা থেকে উৎসারিত। ফরাসী লেখক লা ফঁতেন বলেছিলেনঃ All roads lead to Rome—যে কোনও রাস্তা বেয়ে চলেই রোম মহানগরীতে পেঁছানো যায়। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সদ্‌ব্রহ্মকে নানা জনে নানা নামে ডাকে। আমরা স্বামীজীর অন্য চিন্তায় যদি এগুতে না পারি, শুধু যদি তাঁর সাহিত্য-নন্দনচিন্তায় নিমগ্ন হই তাহলেও সদ্‌ব্রহ্মকে পাব, তাঁর মৌল ভাবনায় পেঁছাতে পারব। এই রচনাবলীর ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নিবেদিতার যে প্রবন্ধ তার অমূল্য বাক্যটি স্মরণ করিঃ "এক সময় তিনি (স্বামীজী) বলিয়াছিলেন. 'চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়'।"[৩] স্বামীজীর এই চারুকলা-চিন্তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ ২ ॥

কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তা করেছেন, মত প্রকাশ করেছেন?

এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রমথনাথ বসু কর্তৃক লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে।[৪] নরেন্দ্র বাল্যজীবনে নিজেদের বাড়ীতে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই নাট্যগৃহে প্রবেশ মূল্য ছিল এক

আনা। জীবনীকার বলছেনঃ "তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন...।"[৫] এবং পাদটীকায় লিখেছেন যে, স্বামীজীর সুকণ্ঠ পিতা নিধুবাবুর টপ্পা গাইতে পারতেন, তাঁর মাতাও বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের গান একবার শুনেই সুর-তাল-লয় সহকারে আয়ত্ত করতে পারতেন।[৬] জীবনীকার বলছেন যে, নরেন্দ্র পঠদ্দশায় "কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন।"[৭] ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে "কাব্যগগনের ধ্রুবতারা" মনে করতেন। এর পরে জীবনীকার আরও বলছেনঃ "তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প...।"[৮] —আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি মূল্যবান কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনীকার এই উক্তির অথবা অনুরূপ কোনও উক্তির উৎস নির্দেশ করেননি। সৌভাগ্যবশত স্বামীজীর নিজ পত্রাদিতে, গ্রন্থে, ভাষণে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান, নির্ভরযোগ্য সর্বোজ্জ্বলকারী যেসব বাণী পাওয়া যায় সেসবের নির্দেশ ও প্রয়োগ এই প্রবন্ধে ক্রমে করা হবে এবং প্রয়োগকালে আমরা দেখতে পাব চারুকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর আদর্শ বস্তুত কোন্ ধরনের ছিল। তরুণ নরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে এই জীবনীকার আরও বলছেনঃ "ইঁনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন।"[৯] বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পুত্রের সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন বেণী গুপ্ত নামক একজন ওস্তাদ।[১০] এই ওস্তাদের কাছে তিনি অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফারসী গান শিখেছিলেন। কোনও দরিদ্র পুস্তক-প্রকাশকের সাহায্যার্থে তরুণ নরেন্দ্রনাথ একবার "ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ একটি সঙ্গীতগ্রন্থের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন।[১১] জীবনীকার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন যে, খেতড়ি রাজসভাতে স্বামীজী দরবারী, কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী গেয়েছিলেন, মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন। এই জীবনী থেকে জানতে পাই যে, নরেন্দ্রনাথ "যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন।"[১২] আরও জানতে পাই যে, এই সঙ্গীত-নৃত্য-পটু তরুণ সখের

থিয়েটার করতে ভালবাসতেন।[১৩]

যখন সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরেছিলেন তখনও এই প্রদীপ্তানন তরুণের সহজাত চারুকলাস্পৃহা সদাজাগ্রত ছিল। আলোয়ারে রাজস্থানী ভক্তদের কাছে বাংলা কীর্তন গাইতেন, একদা গেয়েছিলেনঃ "(আমি) গেরুয়া বসন অংগেতে পরিয়ে শংখের কুণ্ডল পরি।"[১৪] গাইতে গাইতে তাঁর অবিরল অশ্রুপাত হত। "মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত"। মহীশূর রাজসভায় একদা জনৈক অস্ট্রিয়ান সংগীত-বিশারদের সংগে ইউরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন।[১৫]

১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে, গুরুর নামে এক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয়ঃ

"(ক) যাহাতে সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় এরূপ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকপ্রণয়ন।

(খ) শিল্প-কলাদির বিবর্দ্ধন ও উৎসাহদান।

(গ) বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।"[১৬]

দেখা যাচ্ছে শিল্পকলা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ নিছক ব্যক্তিগত ছিল না, শিল্পকলাকে তিনি এবং তাঁর সহকর্মিগণ সমাজের, দেশের, মানব-জাতির পক্ষেই অমূল্য সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন।

॥ ৩ ॥

চারুকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা যে কত ব্যাপক, কত সর্বগ্রাহী, কত মৌলিক এবং কত গভীর ছিল সেকথা বুঝতে পারা যায় তাঁর জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর অসম্যক্ আলোচনা থেকে নয়, "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" থেকে।[১৭] বস্তুত এই গ্রন্থাবলীর খণ্ডে খণ্ডে যে কত উক্তি, কত অভিজ্ঞতার কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার সম্পূর্ণ শুমারি করা আধুনিক গবেষণার পরিশ্রমী বিশদ প্রণালীতেই সম্ভব হলেও তার কিছু তালিকা এই

প্রবন্ধের অন্ত্যটীকায় সন্নিবেশিত হল। বিবেকানন্দ এই সব চারুকলা সম্বন্ধে কোন না কোন সময় উক্তি করেছেনঃ সংগীত (সেই সংগে নৃত্য ও বাদ্য); চিত্রকলা; স্থাপত্যশিল্প; ভাস্কর্যশিল্প; সাহিত্য (কাব্য, নাটক, ভাব প্রকাশের ভাষা)। চারুকলার এই সব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চিন্তায় এবং স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাত্মচিন্তায়ও বিধৃত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের নন্দনতত্ত্ব। তিনি কেবল সংগীত বা ভাস্কর্য বা কাব্য সম্বন্ধে চিন্তা করেননি, যাবতীয় চারুকলার অন্তস্তলে যে অব্যয় অক্ষয় শিল্পতত্ত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন সে শিল্পতত্ত্ব কোনও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্যের ও তত্ত্বের সংগে সমার্থ।

বিবিধ চারুকলার মধ্যে চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি নিতান্ত বিরল না হলেও অপ্রচুর। স্বামীজীর অনেক চিন্তা যে সচরাচর চিত্রধর্মী ছিল তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় সানফ্রান্সিস্কো শহরে ১৯০০ সালে ২৯শে মার্চ তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে; সেখানে তিনি বলছেন গুরু ও শিষ্যের কথা, গুরুর গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না বয়োবার্ধক্য দ্বারা, এবং একথা বলার সময় 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র' স্মরণ করছেনঃ

> "চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
> গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।।"[১৮]

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কটি স্বামীজীর মানসপটে চিত্ররূপে প্রতিভাত হল। এই চিত্রধর্মী কল্পনাশক্তির বলে তিনি ভারতীয় চিত্রকর্মের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের ও সমসাময়িক দৈন্যের উল্লেখ করেছেন। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থের শেষ স্তবক কয়টির কিছু অংশ তুলছিঃ

"ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র ক'রত... নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা ব'লে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!!... আমাদের এখন ওদের মতো শিল্প-সংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন করতে হবে, না—না? ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হ'তে আমাদের এখনও ঢের দেরি! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু...বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীদের) নকল ক'রে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায়

মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।" [১৯] শিল্প ও স্থাপত্য দেখতে গিয়ে স্বামীজী সব সময়ই কল্পনার চোখে দেখতে চাইতেন শিল্পী ও স্থপতিকে, বুঝতে চাইতেন শিল্পী-মনের মূলভাবটিকে। রবিবর্মার পাশ্চাত্য ঢংয়ে আঁকা ছবি তাই তাঁকে মুগ্ধ করেনি, কিন্তু প্যারী শিল্প প্রদর্শনীর "Art unveiling nature" ভাস্কর্যটির প্রশংসা করেছেন। মহৎ শিল্পের অনুকরণ নয়, তিনি চাইতেন মানুষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে নিজে মহৎ সৃষ্টি করুক। ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে প্রকৃতির মৌন বাণী যখন শিল্পী বুঝতে পারছেন স্বামীজীর চোখে তখন সেই শিল্প 'সুন্দর' হয়ে দেখা দিয়েছে।

সুন্দরের অভিব্যক্তিতে স্বামীজী চেয়েছেন লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন। স্বতোৎসারিত শিল্পে মানবজীবনের সহজ হাসি-কান্না, তার দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটে ওঠে। আর লোকশিল্প (folk-art) দেখিয়ে দেয় সমাজের বিভিন্ন অংগ কিভাবে প্রকৃতির আহবানে সাড়া দিয়েছে। স্বামীজীর চোখে তাই লোকশিল্পের ভূমিকা গভীর ও ব্যাপক। এর মধ্যেই পাওয়া যায় মানব-মিছিলের বৈচিত্র্য ও ধারাবাহিকতা। যে গভীর মানবপ্রেম তাঁকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয়নি, সেই মানবপ্রেমই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল লোক-শিল্পের প্রতি। যাদের কথা কেউ ভাবে না, কেউ বলে না, সেই সহজ সরল মানুষগুলির প্রাণের অভিব্যক্তি, হৃদয়ের ভাষা স্বামীজী জানতে চেয়েছিলেন। আর লোকশিল্পই তো তার মাধ্যম। লোকশিল্প তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'। এই গভীর মানবপ্রেমেই তিনি চেয়েছিলেন কথ্যভাষা হোক সাহিত্যের বাহন। বুদ্ধ, রামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণের কথ্যভাষায় ধর্মোপদেশ তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'। এই বলিষ্ঠ উক্তি থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারিঃ স্বামীজী জাতির শৈল্পিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে চান কিন্তু তাই বলে নতুনকে অগ্রাহ্য করছেন না। শিল্পের একটা ঘরোয়া রূপ আছে, সে রূপ ঘরোয়া এবং সেজন্য সর্বজনের রূপচেতনার অভিব্যক্তি। এই সর্বজনচেতনার চিন্তা স্বামীজীর বাণীতে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আরও একটি সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। স্বামীজী বলিষ্ঠ বর্ণপ্রয়োগ পছন্দ করতেন—চালচিত্রের ঝক্‌ঝকে রং, জয়পুরী সোনালি রং। তিনি বলেননি বটে কিন্তু তাঁর এই বর্ণপ্রীতি থেকে অনুমান করতে পারি যে, তাঁর সমসাময়িক ইমপ্রেসানিস্ট চিত্র (বিশেষত ফরাসী দেশের—ক্লোদ মোনে, কামিল্লে পিসারো, পোল সেজাঁ, এডগার দেগা, অগুস্ত রেনোয়া—যাঁদের নিয়ে চিত্রজগতে খুব হৈচৈ হচ্ছিল ১৮৯০ দশকে ও তার পরে, যেকালে বিবেকানন্দ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, কিছুকাল প্যারি নগরীতে বাসও করেছিলেন)

তাঁর মনঃপূত ছিল না, কেননা ইমপ্রেসানিস্ট চিত্রাঙ্কনের মূল রীতি ছিল বর্ণে বর্ণে ধূসর আত্মবিলোপ। অপরপক্ষে, দেখতে পাই, তিনি ইউরোপীয় রিয়্যালিজম (বাস্তববাদ) পছন্দ করেননি। ভিয়েনা শহরের চিত্রশালিকায় গিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ "চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বা'র করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধ'রে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল...।"[২০] আমার অনুমান যে, স্বামীজী যেসব ওলন্দাজ শিল্পীর চিত্র দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত ষোল-সতেরো শতকী শিল্পী ছিলেন ডেভিড দ্য হীম (ফলের ছবি আঁকতেন), জেরার্ড ড্যু (মাংসওয়ালার দোকানের ছবি) অথবা মহত্তর শিল্পী, যথা ফ্রানজ হালস, রেমব্রান্ট। ন্যাচারালিজম নামক শিল্পতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল হল্যান্ডে, কিন্তু অবশ্যই সে তত্ত্বে ও সে চিত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। এবং মূলত এই কারণেই স্বামীজী গ্রীক কলারও অনুরাগী হতে পারেননি। তিনি গ্রীক কলার তিন পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন 'পরিব্রাজক' পুস্তকে; সেখানে বলেছেন যে, যেকাল অবধি (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ সাল অবধি মিসেনি শিল্পের কাল ও তারপরে খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ সাল পর্যন্ত হেলেনিক শিল্পের কাল) গ্রীক শিল্প এশীয় শিল্পের অনুগামী ছিল, সেকালে গ্রীকের কলাকৃতি মহৎ হয়েছিল। পক্ষান্তরে যেকালে (আর্কেইক যুগে, ক্লাসিক যুগে) এশীয় শিল্প থেকে এই শিল্প দূরে সরে গেল, কলাকৃতির অধোগতিও শুরু হল। এই অধোগতির একটি বড় লক্ষণ ছিল আড়ম্বরপ্রিয়তা, অতি অলঙ্কার বিলাস, শিল্পের অন্তরতম সত্তাকে অবহেলা করে তার বহিরঙ্গ নিয়ে বিলাস। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার এই অলঙ্কারপ্রিয়তার তুচ্ছতা নির্দেশ করেছেন, শুধু চিত্রকলায় নয়, যাবতীয় চারুকলায়।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ও সামাজিক ভূমিকাটিই স্বামীজীর চোখে বড়; প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পের স্থূলতা তিনি পছন্দ করেননি। শিল্প ও প্রচার এক কথা নয়। শিল্প-সাহিত্য মানুষকে বড় হওয়ার তাগিদ দেবে, তাকে মহান করে তুলবে, কিন্তু নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করে নয়। স্বামীজী বলেছেন যুধিষ্ঠিরের গল্পঃ রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবেরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দ্রৌপদী সরোষে একদিন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন—তুমি এত 'ধর্ম-ধর্ম' কর, কিন্তু ধর্ম তোমায় কি দিয়েছে? স্মিত হাসিতে যুধিষ্ঠির হিমালয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—দ্রৌপদী, ঐ বিরাট পাহাড়ও তো আমায় কিছুই

দেয়নি! তবু হিমালয়কে আমি ভালবাসি, কারণ সে বৃহৎ, সে মহৎ। স্বামীজী তাই প্রয়োজনকে একমাত্র মাপকাঠি ধরেননি নান্দনিক বিচারে। কুরুক্ষেত্রের গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের ছবি কেমন হবে তা নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন। প্রয়োজনকেও শৈল্পিক সুষমায় সুন্দর করে তুলতে হবে—স্বামীজীর এই মত।

॥ ৪ ॥

চিত্রকলার বিচারে স্বামীজীর যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও তেমনি সুদক্ষ মূল্যজ্ঞান লক্ষ্য করি। এই দক্ষতা আমার বিবেচনায় একান্তই অসাধারণ কেননা যদিও সম্ভবত স্বামীজী অজন্তা ইলোরার অথবা পাহাড়ী চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তেমনি তাঁর নিয়তকর্মভারা-ক্রান্ত চল্লিশনূ্যন জীবৎকালের মধ্যে স্বদেশীয় স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের কিছু মূল্যবান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করারও সুযোগ হয়নি। তিনি পুরী ভুবনেশ্বর সাঁচি দেখেননি, চোল রাজবংশের বা খাজুরাহোর অনবদ্য স্থাপত্যের পরিচিতি পাননি, মাণ্ডু নালন্দা পাহাড়পুর গৌড়াবশেষ, বিষ্ণুপুর দেখেননি, যবদ্বীপ বোরোবুদুর এবং সুমাত্রা ও বর্তমান তাইল্যাণ্ডের অজস্র হিন্দু স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের বিষয় তাঁর কালে প্রায় অনুদ্ঘাটিত ছিল, তথাপি ভারতীয় শৈল্পিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটিও তাত্ত্বিক উক্তি, একটিও সাধারণী-কৃতি (generalization) ত্রুটিদুষ্ট নয়।* কেন ত্রুটিদুষ্ট হয়নি? তার কারণ তাঁর মৌল চিন্তার পূর্ণ বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধতার দরুন চারুকলা-সংক্রান্ত যে প্রাথমিক কাঠামো তিনি তৈরী করেছিলেন, সেই কাঠামোটিই পূর্ণ শুদ্ধ, অতএব এই কাঠামো থেকে যেসব শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়েছে সেসবও

*স্বামীজী ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মূল্যবান নিদর্শন দেখেছিলেনও যথেষ্ট এবং দেখেছিলেন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। ২৮ মে ১৮৯৬, ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে স্বামীজীর যে কথোপকথন হয়, সেই আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিলঃ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। এই আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পাই প্রিয়নাথ সিংহের একটি প্রবন্ধে ("প্রবুদ্ধ ভারত", নভেম্বর ১৯০৬)। আলোচ্য বিষয়ে স্বামীজীর জোরালো মতামত ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ এবং গভীর পরিচয়েরই সাক্ষ্য বহন করে। রাজস্থানী এবং মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা সুবিদিত। রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তকে তিনি বলেছিলেনঃ "পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৬-৮৭]

পূর্ণ শুদ্ধ। দুটি চারটি পাঁচটি দশটি খুঁটিনাটি, কয়েকটি বিষয়প্রত্যঙ্গ, যদি তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার আবেষ্টনীতে নাও এসে থাকে, তাহলেও তাঁর মৌলতত্ত্ব বিশুদ্ধ থেকেই যাচ্ছে।

জগতের ইতিহাসে যা দেখা গেছে—ভারতীয় ইতিহাসে সেকথা সর্বৈব সত্য—প্রাচীন কালে যাবতীয় সভ্য সমাজে দেবপূজার সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীন সমাজে মানুষ নিজেদের বাসস্থান যে ধারণায় যে প্রয়োজনে নির্মাণ করত, দেবস্থান নির্মাণ করত তা থেকে অনেক ভিন্ন ধারণায় ও প্রয়োজনে। স্বামীজী বলছেনঃ "হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ী তৈরি করা স্বার্থপরতার কাজ; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ী তৈরি করা যেতে পারে। সেই জন্য লোকে ভগবানের নিবাস-রূপে মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে থাকে।"[২১]

অতএব দেবগৃহ সুন্দর হত, এমন মালমশলা দিয়ে, এমন দক্ষতা সহকারে নির্মিত হত যাতে এই গৃহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারত, শতাব্দীর পরে শতাব্দী উচ্চশির হয়ে থাকতে পারত। দেবগৃহ কিন্তু যে কোন স্থানে নির্মিত হতে পারত না। স্বামীজী বলছেনঃ "ভগবান্‌কে উপাসনা করিবার জন্য মন্দিরনির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা কর না কেন? কারণ না জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সকলে প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে। যে ব্যক্তির অন্তরে বেশী সত্ত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। ...যদি সে স্থানে সর্বদা অসাধু লোকই যাতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মতোই অপবিত্র হইয়া যাইবে।"[২২] বাড়ীঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। মন্দির প্রসঙ্গে স্বামীজীর অন্য একটি কথাও চিন্তা-উদ্দীপক। নিবেদিতার "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, একদা তাঁরা (কাশ্মীর ভ্রমণকালে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গিগণ) তখৎ-ই-সুলেমান নামক "এক ক্ষুদ্র মন্দির" দেখেছিলেন (ওটি আসলে ছিল জনৈক মুসলিম পীর সাহেবের মাজার, সমাধিক্ষেত্র, নিবেদিতা মনে করেছিলেন হিন্দু মন্দির)। এই সুন্দর

'মন্দির' দর্শন উপলক্ষ্যে স্বামীজী "...একটির পর একটি করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং প্রধান প্রধান স্থানগুলি পূজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিত্রতামণ্ডিত করিয়া তুলিতেন।"[২৩] একথা স্বামীজী অনেক পূর্বেই তাঁর প্রথম আমেরিকা ভ্রমণকালেই বলেছিলেন, যেকালে সেদেশের পত্রিকাগুলি তাঁকে বলত ভি. ভি. কানন্দ।[২৪]

হিন্দু সংস্কৃতিতে স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। মন্দির মানে কোন দেবদেবীর মূর্তিসমৃদ্ধ গৃহ। হিন্দুদের মূর্তিপূজা (যে প্রথা পৌত্তলিকতা নামে বহু অহিন্দু কর্তৃক ধিক্কৃত হয়েছে, এখনও হয়) সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা দিয়েছেন অজস্রবার, তাঁর অনুপম ভাষায়, কখনও নিশ্ছিদ্র যুক্তিবহুল, কখনও আবেগমণ্ডিত, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সুগভীর জ্ঞানসমুখ এই চিন্তা নস্যাৎ করার শক্তি বা ভাষা কারুর হয়নি। এই জটিল বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে মাত্র উত্থাপিত করছি এই কারণে যে, দেবদেবীর বিগ্রহ নির্মাণে ভারতীয় নান্দনিক প্রতিভার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিমাপূজা করি কেন? মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছেঃ

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্‌ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা।।"

চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনের নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে দীর্ঘ অমূল্য ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তন্ত্রের উপরোক্ত শ্লোক স্মরণে রেখে বলেছিলেনঃ বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা। তথাপি অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তো বাহ্যপূজা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃত মানুষ কজন সেই ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ সনাতন অশ্বত্থের ধারণা করতে পারে? কজনের কল্পনা ও বুদ্ধি পৌঁছায় সেই অতীন্দ্রিয় জগতে—"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"—কজনের উপলব্ধিতে আসে সেই আশ্চর্য চেতনা "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"? অতএব স্বামীজী নিষ্কম্প বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেনঃ "যে একাগ্র সাধক জানু প্যাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন...তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে পাপ বলেন না।"[২৫] তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন।

এই ব্যাখ্যার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী প্রগাঢ় জ্ঞানমণ্ডিত উক্তি করেছেনঃ "হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেনঃ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ।"[২৬]

এই মনোভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু উপাসনায় প্রতিমাস্থাপন সর্বতো-ভাবে স্বাভাবিক। হিন্দু ভাস্কর্য এই কারণেই মূলত দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণে ব্যাপৃত। স্বামীজী এই কারণেই নিবেদিতা প্রমুখের সন্নিধানে গান্ধার ভাস্কর্যের কথা বলতে গিয়ে ইউরোপীয় সমালোচকদের অন্যায় দাবির ("কলা-বিদ্যা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে") নিরাকরণ করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন[২৭] এবং অন্য এক সময় চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "মিস লককে ব'লো, আমি যে তাকে বলেছিলাম 'মানবমূর্তির ভাস্কর্য গ্রীসে যতটা উন্নত হয়েছিল, ভারতে ততটা হয়নি'—এ মত আমার ভুল।"[২৮]

মনে হয় যাবতীয় চারুকলার মধ্যে সংগীতের দিকেই স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হত। তিনি বলছেনঃ "সুমধুর সংগীতশ্রবণে কাহারও কাহারও মন শান্ত হইয়া যায়...।"[২৯] "সুললিত সংগীত শ্রবণকালে আমাদের মন সেই সংগীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা মন সরাইয়া লইতে পারি না।"[৩০] অতএব সংগীত উপাসনার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। স্বামীজী নিজে যে কত গান গেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই, এমন কি প্রাণের আবেগে অবাঙালীদের সাহচর্যেও বাংলা গান গাইতেন, যেমন গেয়ে-ছিলেন আলোয়ারে রাজস্থানী ভক্তদের সামনে এবং কাশ্মীরে নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড, মিস বুল-এর সামনে। সংগীত যে কত পবিত্র এবং পূত ভাব-সঞ্চারী সে বিষয়ে স্বামীজীর এক অমূল্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল খেতড়ির এক বাইজীর কাছে। খেতড়িরাজ স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করেন সেই বাইজীর গান শোনার জন্য। গোড়ায় সে আহ্বানে স্বামীজী ঘৃণা বোধ করেন, বাইজী যখন গান ধরেন, "প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম তুমহারো;"—সুরদাসের প্রসিদ্ধ গান, অপরূপ ব্যঞ্জনামণ্ডিত গান, স্বামীজী বলছেন এই গান শুনে যেন তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে একটি পর্দা উঠে গেল। বিদেশে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য সংগীতেও আনন্দ পেতেন। হাঙ্গেরীয় সংগীতের

প্রশংসা করেছেন বহুবার, প্যারি নগরীতে মাদাম কালভের গানে আকৃষ্ট হয়েছেন, মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস, মঁসিয় জাঁ দ্য রেসকি, মঁসিয় প্লাস প্রভৃতির গান শুনে আনন্দিত হয়েছেন। নিজে অর্কেস্ট্রার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানেন না বলে স্বীকার করেছেন[৩১] কিন্তু মিস অ্যালবার্টা স্টার্জেসের কাছে স্বরগ্রাম শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।[৩২] দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের স্বধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। সর্বোপরি, নিছক দেশপ্রেম থেকে নয়, জ্ঞান থেকেই বলছেনঃ "সংগীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সংগীত উপভোগ করিয়াছি।"[৩৩] সংগীতের চিন্তায়ও স্বামীজীর মনস্বিতার দুটি মুখ্য দিক উজ্জ্বল হয়েছেঃ প্রথমত, তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ-প্রেম; দ্বিতীয়ত, সংগীতের সাহায্যে আত্মার ঊর্ধ্বায়নের সম্ভাবনা। আমরা দেখতে পাব এই যাবতীয় চিন্তায় ও ধারণায় স্বামীজীর মানসে একটি সুদৃঢ় নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল।

॥ ৫ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে গায়ক ছিলেন, সংগীত সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন, তেমনি কাব্যপাঠক ছিলেন, স্বয়ং কবিতা রচনা করেছিলেন বাংলায়, ইংরেজিতে, সংস্কৃতে। সংগীতে যেমন (বস্তুত অন্য চারুকলাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য) কাব্যেও তিনি অনুরূপভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতিতে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। তিনি বলছেনঃ "সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা-নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত'। 'ঈসপ্‌স্‌ ফেব্‌ল্‌স্‌' নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান...।"[৩৪]

কাব্যের বাইরে অন্য সাহিত্যে তাঁর কোনও উৎসাহের প্রমাণ পাই না, "পচা নভেল-নাটক" সম্বন্ধে অবজ্ঞাই ছিল। তিনি নিজে যেসব কবিতা—বাংলায় ও ইংরেজিতে—রচনা করেছিলেন, এবং একদা একটি ছোটগল্প রচনা শুরু করে-ছিলেন,[৩৫] যেসব পূর্বতন সাহিত্যকথা (রামায়ণ মহাভারত হোক অথবা

বিল্বমঙ্গলের কাহিনী হোক) তাঁর বিদেশীয় ভক্ত ও শ্রোতাদের মঙ্গলার্থে প্রাঞ্জল করে বলেছিলেন, সেসবের সাহিত্যিক মূল্যচিন্তার স্থান বর্তমান প্রবন্ধে নেই, তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বঙ্কিমোত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অসার্থক, যদিও তেমন অসম্যক্ রচনা আমাদের ইতিহাসকারদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্যের সাহিত্যের মধ্যে তিনি কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিছু রচনার ও গ্রন্থের: অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ উল্লিখিত হয়েছে একাধিকবার, স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর ইংরেজি অনুবাদের পরে কালিদাসের এই অনবদ্য নাটকটি শ্লেগেল, গ্যয়টে প্রমুখ মহৎ লেখকদের কাছে কী সোৎসাহ সংবর্ধনা পেয়েছিল; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কথা বলেছেন; সুফী কবিতার উল্লেখ করেছেন, চৈতন্য চরিতামৃতের অপরূপ ছত্রটির উল্লেখ করেছেন, "না সো রমণ না হাম রমণী";[৩৬] তুলসীদাস, মীরাবাঈ, ভক্তমাল থেকে আবৃত্তি করেছেন, বিশেষত ভক্তমালের বিল্বমঙ্গল কাহিনীটি [আমরা বুঝতে পারি কেন এই কাহিনী নিয়ে জি. সি. (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ) নাটক লিখেছিলেন]। রামপ্রসাদ তাঁর প্রিয় ছিল, কমলাকান্ত থেকে গান ধরেছেন, গিরিশ ঘোষের দরুন দীনবন্ধু মিত্রের উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজী "নানা ঠাট্টাতামাসা" করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত'।"[৩৭] এর পরেই তিনি মাইকেল সম্বন্ধে বলতে থাকেন: "ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস...এই 'মেঘনাদবধকাব্য'—যা তোদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধকাব্য' লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? সেই 'মেঘনাদবধকাব্য' এখনও হিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে?"[৩৮] 'মেঘনাদবধকাব্য' তাই স্বামীজীর চোখে সুন্দর। বীরভ্রাতা, ইন্দ্রজয়ী পুত্র হারিয়েও রাবণ মাথা নীচু করতে রাজী নয়, অবধারিত মৃত্যু জেনেও সে সংগ্রামে পিছু পা নয়। মাইকেলের রাবণ-চরিত্রের এই দুর্দমনীয় ভাব স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছে। রাবণের যত দোষই থাকুক, সীমিত

সামর্থ্য নিয়েও সে বৃহৎকে পেতে চেয়েছে। একদিকে সে হৃদয়ের দুঃখকে সরিয়ে কর্তব্যের আহ্বানে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বহিঃপ্রকৃতির কাছে পরাজয় স্বীকারে রাজী নয়। রাবণের 'বীরত্ব' তাই স্বামীজীর চোখে 'সুন্দর'। এ কারণেই "প্যারাডাইস লস্টে"র "What though the field be lost?/All is not lost; the unconquerable will" কথাগুলি তাঁর চোখে সুন্দর। শত দুঃখ বিঘ্নের মধ্যেও মানবাত্মার জয় ঘোষিত হচ্ছে—শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও মানুষ তার অব্যক্ত ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিবলে নতুন প্রেরণা পাচ্ছে—স্বামীজী একেই বলেছেন 'সুন্দর'। "মৃত্যুরূপা কালী" স্বামীজীর তাই এত প্রিয়। উপনিষদের শ্লোক আর মীরার ভজন তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর, কারণ অসীমের সঙ্গে মিলনের আকুতি এমন করে কোথায় আর প্রকাশ পেয়েছে? বিল্বমঙ্গল, গীতগোবিন্দ তাঁর চোখে সুন্দর কারণ মানবপ্রেম এখানে ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে পাত্র-পাত্রীদের উত্তরণ ঘটিয়েছে। দেহবাদী প্রেম দেহের সীমা ছাড়িয়ে আত্মায় ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে। তাজমহল এজন্যই তাঁর চোখে সুন্দর। বিপরীতদিকে সমসাময়িক সাধারণ বাঙালী কবিদের বিদ্রূপ করে লিখেছেনঃ "ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু...।"[৩৯] কাপুরুষের প্রেম, দেহবাদী প্রেম স্বামীজীর চোখে 'পিরীত' মাত্র, তা অসুন্দরেরই প্রতীক।

এই কথোপকথন সমাপ্ত হয় স্বামীজীর "মেঘনাদবধ কাব্য" থেকে পাঠে। তিনি "এই কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট" বলে পড়ে শোনালেন কাব্যটির সপ্তম সর্গ থেকে, বিশেষত ৩২৯ ছত্র থেকে ৩৮৯ ছত্র, যেখানে মন্দোদরী রাবণকে রণ-ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছেন এবং মহাবলী কর্তব্যপরায়ণ রাবণ বলছেনঃ

"বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!"[৪০]

স্বামীজীর মাইকেল-প্রীতি থেকে একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা অচিরেই দেখতে পাব যে স্বামীজী সারাজীবন বাগাড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। মাইকেলের বাগাড়ম্বর নিঃসন্দেহ। বাগাড়ম্বর বিষয়ে তাঁর গুরু মিল্টন সম্বন্ধে টি এস এলিয়ট বলেছেনঃ "Milton writes English as if it were a dead language", এবং মাইকেলের ভাষা বিদ্রূপ করে শুধু যে তাঁর কোন সমসাময়ী "ছুছুন্দরীবধ কাব্য" রচনা করেছিলেন তা-ই নয়, খ্যাতনামা বাঙালী লেখক-সমালোচকও এই ভাষা নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তাহলে স্বামীজী কেন মাইকেলের ভাষার প্রশংসা করলেন? আমরা ভাবতে পারি যে, স্বামীজীর সাহিত্যচেতনা শুধু ভাষানির্ভর ছিল না, সেই চেতনায় বিষয়বস্তুই প্রধান ছিল। বীর্যের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দের সমর্থন লঙ্কাধীশ রাবণের প্রতি যিনি জানেন শোকের, বিলাপের সময় প্রচুর মিলবে আগামীতে কিন্তু এই মুহূর্তটি হচ্ছে প্রতিশোধের, সংগ্রামের মুহূর্ত, অতএব শোককে চিত্তের এক কোণে সরিয়ে রেখে নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে, অর্থাৎ সমরাঙ্গনে। এমনই হচ্ছে সংযত-আবেগ, বীরধর্মী, কর্মৈষণা-প্রণোদিত স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ। এই জন্যই তিনি মাইকেল-বিরোধিতার বিরোধী ছিলেন, এই জন্যই মিল্টনের "প্যারাডাইস লস্ট" মহাকাব্য থেকে মহাবীর সেটানের বহুবিশ্রুত বাণী আবৃত্তি করেছিলেনঃ

> "What though the field be lost?
> All is not lost; the unconquerable will
> And study of revenge, immortal hate,
> And courage never to submit or yield,
> And what is else not to be overcome;" ৪১

> "Fallen Cherub, to be weak is miserable,
> Doing or suffering;" ৪২

স্বামীজী ইউরোপীয় সাহিত্য যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ পাই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে "সং অব সলোমনে"র, হোমারের, দান্তের 'ইনফার্নো'র, শেক্সপিয়রের (উদ্ধৃতি পাই "অ্যাজ ইয়ু লাইক ইট" এবং "মিড সামার নাইটস ড্রীমে"র), ভিক্টর হিউগো-লামার্টিন-জুল ভার্ণের,

কার্লাইল-ব্রাউনিং-এডুইন আর্নল্ডের। এছাড়া এতাবৎ অনির্দিষ্ট বহু উল্লেখ আরও আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুখানা কাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ ও প্রশস্তি পুনরাবৃত্ত। প্রথম কাব্যটি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। স্বামীজী বলছেনঃ "এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত।...ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।...শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই-সকল উপদেশই গীতাকে পরমাশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।"[৪৩] উপনিষদের কবিত্ব-মূল্য সম্বন্ধে স্বামীজী "ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা" শীর্ষক ভাষণে বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে তারই কিছু অংশ উল্লেখ করছিঃ "...ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান্ ভাবের যেমন অতি অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমন নাই।... যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনার চেষ্টা--বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্মন্ত্রে বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব যতদূর উচ্চ-ভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।"[৪৪] সেই অন্য পথ রূপকের পথ, বাক্‌প্রতিমার পথ, প্রতীকের পথ। স্বামীজী উদ্ধৃত করেছেন কঠোপনিষদ্ থেকে "ন তত্র সূর্যো ভাতি" এবং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর থেকে সেই অবিস্মরণীয় ছত্রগুলি, যে ছত্র রচনা একমাত্র প্রাচীন ভারতেই সম্ভব ছিলঃ

> "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
> সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
> যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

স্বামীজীর বাণীতে ও রচনায় বহুবার এই অতুলনীয় রূপকটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, পঞ্চম খণ্ডেই উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরে ব্যাখ্যা আছে। এবার একটি স্তবকের উদ্ধৃতি করছি যেটি দীর্ঘ হলেও স্বামী বিবেকানন্দের মনোভঙ্গির উজ্জ্বল সাক্ষ্যঃ "...উপনিষদের ভাষা, ভাব সব কিছুরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই, উহার প্রত্যেক কথাই তরবারি-ফলকের মতো, হাতুড়ির ঘায়ের মতো সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই...কোন ঘোরফের নাই. একটিও অসম্বন্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক-বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ভাবটিকে ক্রমাগত জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল, তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এ-ধরনের চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।"[৪৫] এই পরম স্বচ্ছ, স্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বামীজী-নিন্দিত জটিলতার প্রলাপ সৃষ্টি হবে।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা পৌঁছাই স্বামীজীর অন্য এক চিন্তায়। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন—ভাষাপ্রয়োগ সম্বন্ধে। সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর যে সব শিষ্য ভাষণ দানে, প্রচার কর্মে, শিক্ষণকর্মে, পত্রিকাচালনায় নিরত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে কোন্ ধরনের ভাষা প্রয়োগ সংগত? এই প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তাঁর বাণীতে ও রচনায় অগণিতবার। একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের অলঙ্কারপ্রিয়তা তিনি সহ্য করেছেন, এমন কি তার প্রশংসাও করেছেন কারণ এই ত্রুটির বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্থিতপ্রজ্ঞের বীর্য। কিন্তু অন্য দিকে দেখি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন যে অধুনা ভারতীয় চারুকলায় মৌলিকতার দৈন্যে অলঙ্কারপ্রিয়তার আধিক্য ঘটেছে, অলঙ্কারবাহুল্য কোনও কালেই কোনও সাহিত্যে সংগত নয়।[৪৬] শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ পাই রচনাবলীতে বহুবারঃ

> "বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
> বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।।"[৪৭]

শব্দঝরী বাগ্‌বিস্তার তো বস্তুতই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের এক খেলা. তাঁদের

খেলা তাঁরা করুন কিন্তু মুক্তিকামী কি করবেন এসব দিয়ে? স্বামীজীর লেখা একটি পত্রপ্রবন্ধ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অমূল্য রচনা কিন্তু, কী আশ্চর্য, এই প্রবন্ধটির মর্যাদা দেখতে পাই না বাংলা শিক্ষার জগতে, যদিও পক্ষান্তরে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কিছুটা অনুরূপ উক্তি (তিনি বলেছিলেন কবিতার ভাষা হবে কথ্য ভাষা, চাষীর ভাষা) নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে তো রীতিমতো একটি অনবশেষ তাত্ত্বিক তর্ক চলেছে। স্বামীজীর এই পত্রপ্রবন্ধটি (আদিতে পত্র হিসাবে লিখিত হয়েছিল) 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের কাল থেকে এটি আর ব্যক্তিগত উপদেশ বা পরামর্শ বা আদেশ নেই, এটি এখন সর্বজনের চিন্তার উৎস, একটি চিরন্তন তত্ত্বের আধার হয়েছে। প্রবন্ধটির কিছু বাক্য তুলছিঃ "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন...চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ একচাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।

"...বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। ..যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।"[৪৮] লোক-হিতকারী কর্মের ভাষা চলিত ভাষা, শিল্প-নৈপুণ্যের ভাষাও চলিত ভাষা। স্বামীজী-সমর্থিত "কলকেতার ভাষা" আজ বাংলা ভাষায় চলেছে, প্রবলভাবেই চলেছে, সাহিত্যিক রচনায়, তথ্যভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক, তর্কভিত্তিক আলোচনায়ও

চলেছে, এবং এই চলতি ভাষার প্রয়োগে শিল্প-নৈপুণ্যের কিছু মাত্র ঘাটতি হয়নি। স্বামীজীর মূল যুক্তির প্রবাহে ("যে ভাষায় ঘরে কথা কও") আজ বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে "কলকেতার ভাষা" ছাড়া বঙ্গদেশীয় অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা (dialect) অবধি কখনও প্রবেশ করছে, করছে নিঃসঙ্কোচে, গ্রাহ্য হচ্ছেও নিঃসঙ্কোচে। ভাষাপ্রয়োগের এই অব্যর্থ শক্তিমান যুক্তি পেশ করে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দৃঢ় ও অবিস্মরণীয় শিলাস্তম্ভ হয়ে রইলেন।

॥ ৬ ॥

শিল্পের নানারকম দিক নিয়ে যে মহামনীষী চিন্তা করেছিলেন, তাঁর সমগ্র মানসে কি নানা শিল্প সমন্বয়ী কোন সার্বিক নন্দনতত্ত্ব বিরাজ করত? ইস্থেটিক্স শাস্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কতখানি?

স্বামী বিবেকানন্দকে যদি মাত্র একটি আখ্যায় গুণান্বিত করা অনুমোদিত হয়, তাহলে তাঁকে সমন্বয়ী প্রতিভা বলা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না। সমন্বয় তখনই সম্ভব, তখনই ধ্রুব, যখন যাবতীয় বস্তুতে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তায় একই সূক্ষ্ম কারণ ক্রিয়াশীল। বিবেকানন্দ জেনেছিলেন—তাঁর গুরুর শিক্ষায়, নিজ কর্মজীবনে ও সাধনায়, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই সর্বমূলাধার অন্বয় শক্তি থেকে সমুত্থ। যেহেতু জীবনের সব কিছুই এই মৌল ভাবকেন্দ্র থেকে উৎসারিত, যাবতীয় চারুকলার মূলস্থ নন্দনতত্ত্বও এই ভাবকেন্দ্রের অন্যতম শাখা।

ইস্থেটিক্স-শাস্ত্রের, নন্দনতত্ত্বের, গোড়ার কথা হচ্ছে সৌন্দর্যের ধারণা। সৌন্দর্য কি, কাকে বলি ও কেন বলি সুন্দর, সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কি এবং কোথায়? অবশ্যই এ বিষয়ে বিবেকানন্দের আলোচনা তেমন বিস্তৃত নয় যেমনটি আমরা পেতে পারি হেগেল বা ক্রোচের গ্রন্থ থেকে। তবুও তাঁর রচনাবলী থেকে ইতস্তত অনেক অমূল্য তাত্ত্বিক উক্তি খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন নয়। তাঁর সৌন্দর্যের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ভক্তিযোগের আলোচনায়ঃ "সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। ...'তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!'—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে—সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে। ...মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের

সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র।”[৪৯]

সৌন্দর্য তাহলে ঐশ্বরিক শক্তি। সৃষ্ট জীবের ও বস্তুর সৌন্দর্য পরম স্রষ্টার সৌন্দর্য থেকেই পাওয়া এবং সেই সৌন্দর্যেরই ক্ষণিক আভাস। বিবেকানন্দের এই প্রত্যয়ে আমাদের সৌন্দর্যচিন্তা নিমেষে বিনাশশীল জড় জগতের বহু ঊর্ধ্বে অক্ষয়, অব্যয় স্তরে উন্নীত হয়। আমরা দেখি যে এমন কি প্লেটো তাঁর 'সিম্পোসিয়াম' নামক গ্রন্থে ডিওটিমার জবানিতে যে সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তার তুলনায় স্বামীজীর চিন্তা কত বেশী গ্রাহ্য, কত বেশী মহৎ! স্বামীজী আরও বলেছেন যে সৌন্দর্য ও আনন্দ অভিন্ন। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৪।৩।৬২) স্মরণে রেখে বলছেনঃ “'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে'।”[৫০] সৌন্দর্যের ও আনন্দের সম্মিলিত সত্তায় আরও একটি উত্তুঙ্গ গুণের কথা বলেছেন স্বামীজী, জ্ঞানের কথাঃ “অপরে যে মুখ অতি সুন্দর বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।”[৫১]

মানবচিত্তে যখন সৌন্দর্যের বোধ জন্মাল, তখন প্রশ্ন জাগল, শিল্প কাহাকে বলে? প্রশ্নটি জাগল কেননা সৌন্দর্য তো অনায়াস স্বভাবজ গুণ হতে পারে, হয়ওঃ আকাশের তারা, গাছের ফল, শিশুর আনন। কিন্তু শিল্প বলতে বুঝি মানুষ যখন তার অন্তরস্থ সৌন্দর্যাদর্শ রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে স্বভাবজ অনায়াস মূর্তির পরিবর্তন করে, তখন এই স্বেচ্ছাবৃত কর্মটিই শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন হংসবলাকার অভিগমন উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেই দর্শন রূপায়িত হল 'বলাকা' কবিতায়। হুইসলার তাঁর বৃদ্ধা মাতার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু চিত্রটি হয়ে গেছে প্রাকৃতোত্তর শিল্পকর্ম। শাহ্‌জাহান তাঁর প্রেয়সীর সমাধিস্থলে যে হর্ম্য নির্মাণ করলেন সে হর্ম্য সাধারণ কবরস্থানের পর্যায় ছাড়িয়ে চলে গেল কোন্ ঊর্ধ্বলোকে। তাহলে আমরা দেখছি যে শিল্পকর্মের ভিত্তি যদিও স্বভাবজ প্রাকৃত রূপে, তবুও মানুষের কল্পনার ও সৃজনীশক্তির প্রভাবে কর্মটি প্রাকৃতোত্তর রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পকর্মটি মানুষী, শিল্পী মানুষ; প্রকৃতি ঐশী, প্রকৃতির গণনাতীত রূপ ঈশ্বরের গণনাতীত রূপসৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই যে প্রভেদ এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নন্দনতত্ত্বের অনবশেষ তর্ক-বিতর্ক। প্লেটো নিজেই কবি ছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন যে, শিল্পীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাকৃত জগৎকে রূপায়িত করা, শিল্পীর উচিত

মধ্যবর্তী প্রাকৃত জগৎকে বাদ দিয়ে সরাসরি ঈশ্বরচিন্তায় আত্মনিয়োজন করা। প্লেটোর যুক্তিতে আত্মার মুক্তির ঊর্ধ্বযাত্রায় 'নেচার'-চিন্তা অনাবশ্যক। প্লেটোর এই সুবিখ্যাত যুক্তি ছাড়া (এই যুক্তি আজও যাবতীয় নান্দনিক চিন্তায় প্রভাবশীল) অন্য একটি আপত্তিও শিল্পের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। অনেক ধর্মচিন্তায় বলা হয়েছে যে শিল্পকর্ম দ্বারা শুধু শিল্পোৎসাহীর চিত্তে কামজ ভোগবাসনার উদ্রেক করা হয়, অতএব শিল্পকর্ম অপবিত্র। বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধ ঘোষ তাঁর 'বিশুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থে নিন্দা করেছেন চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত-শিল্পীদের, কেননা এঁদের শিল্পকর্মের উপভোগে কামনাবাসনাদি নীচ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়।

এই তর্কের পরিপ্রেক্ষিতে "স্বামি শিষ্য সংবাদ" গ্রন্থে স্বামীজীর মহা-মূল্যবান একটি দীর্ঘ উক্তির কয়েক পঙ্‌ক্তি তুলে ধরছিঃ

"যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে।"[৫২]

এর পরে স্বামীজী যেকথা বললেন তাকে বলতে পারি গভীরতম প্রজ্ঞার নির্যাসঃ "প্রথম শ্রেণীর জাতের Nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্প বিকাশের মূল কারণ।"[৫৩]

স্বামীজীর স্মরণ আছে যে, প্যারি শিল্প প্রদর্শনীতে একটি মূর্তির নীচে লেখা ছিলঃ Art unveiling nature। অন্যত্র স্বামীজী বলছেনঃ Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না।[৫৪] এই বলতে স্বামীজী যা বুঝিয়েছেন, সেকথা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর একটি ভঙ্গিতে। কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা বলছেন, "তখন তার central idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। এই বলিয়া স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন...।"[৫৫] স্বামীজী যেন নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন (মনে রাখতে হবে যে তিনি অভিনয়কুশল ছিলেন),

হয়ে তাঁর বন্ধুকে বললেনঃ "সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হ'ল গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।"[৫৬]

স্বামীজীর চিন্তায় শিল্পের মূল ভিত্তিঃ primary basis of art[৫৭] দু-রকমের হতে পারে; Nature এবং Ideality নিসর্গ এবং কল্পাদর্শ। অন্যান্য নান্দনিক হয় এক ভিত্তি ধরেছেন নতুবা অন্য ভিত্তি ধরেছেন, এবং এহেন ভিত্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে শিল্প হয়ে গেছে কোথাও প্রধানত প্রকৃতি-পরবশ, বাস্তববাদী (যার ফলে বৌদ্ধগণনিন্দিত তাৎক্ষণিক মরজগৎ মানবজাতির পক্ষে প্রলোভনের আগার হয়ে ওঠে) অথবা প্রকৃতি-পরাঙ্মুখ, অবাস্তব (যার ফলে দুর্বল শিল্পী কল্পাদর্শ-সত্তাকে বিকৃত করে ফেলেন)। কোন্ পর্যায়ে আইডিয়াল ভাব, কল্পাদর্শ-সত্তা মহত্তম প্রকাশ পেতে পারে তার তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই "বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" গ্রন্থে। প্রথমত, গীতানিষ্যন্দী শ্রীকৃষ্ণের দেহভঙ্গি (যার উল্লেখ উপরে করেছি); দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর "Kali the Mother" কবিতা-পাঠ; তৃতীয়ত, রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের চিত্র-পরিকল্পনার ব্যাখ্যা।

"Kali the Mother" কবিতাটি যখন স্বামীজী পাঠ করলেন, তখন "শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনা-সমক্ষে নৃত্য করিতেছে।"[৫৮] মহৎ কবিতা তো শব্দঝরী বাক্‌চাতুরী নয়, কবিতার ভাষার মাধ্যম দিয়ে, কবিতার প্রতীকী বহিরঙ্গ ভেদ করে, আমরা পৌঁছাতে পারি সেই নিভৃততম বোধিতে যেখানে "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকম্।" এই কবিতায় শিল্পের মহত্তম রূপ প্রকাশ পেয়েছে, যে রূপ জড় পদার্থের অগম্য ঊর্ধ্বে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীকী ভাবনা। স্বামীজীর এই অতুলনীয় শিল্পতত্ত্ব আরও প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি "রামকৃষ্ণ মিশনের সীল-মোহরের জন্য বিকশিত কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিতা" চিত্রের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ

"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ

পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।"[৫৯]

আমরা এখন স্বামীজীর চিন্তাধৃত শিল্পের মূলতত্ত্বে পৌঁছেছি। শিল্প-কর্ম, চরম বিচারে, একটি পথ মাত্র, একটি সরণি যার অন্তে বিদ্যমান সেই প্রগাঢ় পরম লক্ষ্যস্থল যার জন্য জীবাত্মার চিরন্তন ব্যাকুল অভিসার। তাহলে শিল্পের জন্য শিল্প, art for art's sake, সে এক অন্তঃসারহীন অলীক উক্তি, কেননা শিল্প তো পরম লক্ষ্য হতেই পারে না, শিল্প শুধু মাধ্যম। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের স্বচ্ছন্দ প্রগতির জন্য শিল্প। তার মানে, শিল্পের সর্বোচ্চ গুণ তার প্রতীকী অভিধা, যেমন অভিধা সীলমোহরের চিত্রের ব্যাখ্যায় আভাসিত হয়েছে। সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীক সম্বন্ধে উক্তি করেছেন[৬০] বারংবার, কেবল প্রতিমা পূজার সমর্থনের জন্যই নয়, বরং ৎ কথা বলার জন্য যে,—"জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"[৬১]

নিবেদিতা বলেছেনঃ "সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে-কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না।"[৬২] স্বামী বিবেকানন্দের নন্দনতত্ত্ব তাঁর সর্বধাত্রী জীবনতত্ত্বেরই অঙ্গাঙ্গি অংশ মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায়
শিল্প ও স্থাপত্য

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দের নানামুখী চিন্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। জাতীয় অভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসাবে তাঁর শক্তিশালী চরিত্র এবং প্রেরণাপূর্ণ বাণীর দিকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট ছিল, ফলে ভারত ও পৃথিবীর প্রগতির জন্য তিনি যে অসামান্য চিন্তাসম্পদ রেখে গেছেন, তা অপেক্ষাকৃত অলক্ষিত থেকে গেছে। বর্তমানে সেই সকল দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন—প্রয়োজন ইতিহাসের, যেহেতু তিনি ভারতীয় ইতিহাসের একালের এক প্রধান পুরুষ; প্রয়োজন জীবনের, যেহেতু সেই চিন্তাস্রোত থেকে পানীয় তুলে এখনও পান করতে পারি এবং ভবিষ্যতেও পারব।

বিবেকানন্দের মনীষার অবহেলিত একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এখানে—তাঁর শিল্পচিন্তা। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট স্বীকৃত নয়, দুঃখের বিষয়। অথচ একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পাব—পরবর্তী বাংলাদেশের কলাশিল্প-আন্দোলন তাঁর চিন্তাসূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে—এবং যেখানে তাঁর চিন্তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, সেইখানেই তা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কলাশিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যের অধিকারে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, বহু বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, তার মধ্যে শিল্পও ছিল, সুতরাং কিছু পুঁথিপড়া মন্তব্য করেছেন—এইটুকু? না, তা ঠিক নয়। অবশ্যই তিনি শিল্প-ইতিহাসে এবং শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে—শিল্পের "পাগল প্রেমিক" ছিলেন, এবং ভারত-বর্ষ ও সারা পৃথিবীর শিল্পনিদর্শন এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখেছেন যে, তাঁর সমকালে কোন ভারতবাসী ঐভাবে তা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন (কিংবা দেখতে চেয়েছেন) কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে আছে। তারই পটভূমিকায় স্বামীজীর শিল্পচিন্তাকে উপস্থিত করলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে।

তার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে, ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের বিশেষ উল্লেখ না থাকার কারণও আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন বড় শিল্পীকে হাতে ধরে কাজ শেখাননি। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী

যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ বড় শিল্পী নন। জুবিলী আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের শিল্পালোচনার বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু একদিনের আলোচনায় রণদাপ্রসাদ কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিলেন, বলতে পারব না। "রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী"—একথা আমরা জেনেছি; স্বামীজীর কথায় তিনি "হৃদয়ে মহা উৎসাহ" পেয়েছিলেন, সেকথাও; স্বামীজীর প্রেরণাতেই তিনি স্বামীজীর "কালী দি মাদার" কবিতার ভাবকে চিত্ররূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; এবং স্বামীজীর শিল্পচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে বলেছিলেনঃ "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলা-বিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত; শিল্পবিষয়ে আপনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি; আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল ভাব পেলাম, তা যেন কার্যে পরিণত করতে পারি।"[১] রণদাপ্রসাদের এসকল কথার অবশ্যই দাম ছিল, কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নগণ্য ব্যক্তি নন; হ্যাভেল সাহেব আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত করলে যেসব ছাত্র বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছিলেন, রণদাপ্রসাদ তাঁদের নেতা ছিলেন; তিনি ১৮৯৭ সালে বৌবাজারের আর্ট একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন ও দুই দশক সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন।[২]

১। C.W., Vol. VII. (1958), pp. 204-05

২। যোগেশচন্দ্র বাগল বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেনঃ

"The seceders under the leadership of Ranada Prasad Gupta, a student of the third year class, started in 1897 a new school of art at Bowbazar, Calcutta. 1897 being the Diamond Jubilee Year of the Queen Victoria, the School was named the Jubilee Art Academy. A real lover of art, Ranada Prasad, though a student, conducted the school with a great zeal and courage rarely to be found in young men of little or no experience. A section of the elite of the city came to his support from the very beginning and we find the Municipality of Calcutta granting pecuniary aid to the institution from time to time. The School continued to exist for more than two decades and the personal contribution of Ranada Prasad Gupta cannot be over estimated." [History of the Govt. College of Art and Craft, p. 22]

যোগেশচন্দ্রের রচনা থেকে রণদাপ্রসাদের সাহসিক ভূমিকার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বোঝা যায়, শিল্পের জাতীয়করণ করতে গিয়ে হ্যাভেল 'পরানুকরণপ্রিয়' ভারতীয়দের কতখানি চঞ্চল করেছিলেন।

রণদাপ্রসাদের নিজস্ব শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনা হয়েছিল। রণদাপ্রসাদ সুস্পষ্ট-ভাবে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্যের বর্জন চাইতেন না, কিন্তু পুরো বিদেশী পদ্ধতিতে দেশীয় প্রাণ মন আত্মার শিল্পগত অভিব্যক্তি সম্ভব, নিশ্চয় একথাও বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পর রণদাপ্রসাদ নূতন পথ বা মিশ্র পথ ধরেছিলেন, ততক্ষণ ঐ ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হলো না। রণদা-প্রসাদের শিল্পরীতিতে যদি স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হয়ও, যেহেতু তিনি শিল্প-আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত বিরাট কোন ভূমিকা নিতে পারেননি, তাই স্বামীজীর প্রভাবের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হবে না। আমরা জানি, হ্যাভেল-নিবেদিতার চেষ্টায় এবং অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রতিভায় শিল্প-আন্দোলন প্রাচ্য ধারাতেই চলেছিল কয়েক দশক ধরে। তাছাড়া আরও বলতে হবে, স্বামীজী স্বয়ং শিল্পী নন; সেজন্য তাঁর আঁকা ছবি দেখে কারও পক্ষে প্রেরণা পাওয়াও সম্ভব নয়, যেমন পাওয়া সম্ভব ছিল, ধরা যাক, তাঁর গদ্যরচনা থেকে, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে অন্যের মাধ্যমে—শিল্পতত্ত্বে যাঁদের তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা, কিংবা তাঁর স্বল্প পরিমাণ শিল্প-বিষয়ক রচনা থেকে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তেজে জ্বলন্ত।

সব জড়িয়ে আমাদের বলতে হবে, স্বামীজীর প্রভাব অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু তা, অধিকন্তু বলছি, মোটেই সামান্য নয়। ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা প্রচণ্ড এক প্রেরণা—সেই নিবেদিতার ভারতশিল্পবোধ স্বামীজীই দান করেছেন, এবং ভারতশিল্পের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পী নন্দলাল বসু প্রথমে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, পরে সাক্ষাৎভাবে, স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

এই সঙ্গে আরও জানানো যায়, ভারতের শিল্প-আন্দোলনে যাঁর বিশেষ প্রভাব, সেই ওকাকুরার বিখ্যাত "আইডিয়ালস অব দি ইস্ট" গ্রন্থের অংশবিশেষে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাবই আছে। এবং পরবর্তীকালে ভারত-শিল্প ও প্রাচ্যশিল্পের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্যই স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাও আমাদের জানা আছে। হ্যাভেল, উডরফ প্রভৃতিও স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দো-লনের সঙ্গে সেইকালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা এইসব সংবাদ উপযুক্তভাবে সংগ্রহ করে রাখেননি, তাই আজ আর সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

তথাপি শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর ভাবনেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বীকৃতি একেবারে নেই তা নয়। এই পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী, ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী" গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেনঃ "আমার ধারণা, স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল।" 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৫৬) ডঃ কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধের নামই হল—"ভারতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়।" ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-ও তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে শিল্পসমালোচক রূপে স্বামীজীর ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ঐ সকল রচনা মূল্যবান—কিন্তু স্বামীজীর ভূমিকার মূল্যের তুলনায় অপ্রচুর। আরও সন্ধান করে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাড় করতে পেরেছি। সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে—বিবেকানন্দ ভারতের শিল্প-জাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঋষি। সেই সকল তথ্য-প্রমাণ আমরা ক্রমে উপস্থিত করব, তার আগে বলে নিতে চাই, বিবেকানন্দ যদি প্রত্যক্ষভাবে শিল্পবিষয়ক কোন বক্তব্য উপস্থিত নাও করতেন, তবু এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবপুরুষ তিনিই হতেন, কারণ, একালে সামগ্রিক ভারত-চেতনা প্রথম তিনিই এনেছেন, ভারতশিল্পে যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে আলিঙ্গন করে উত্থিত হয়েছিলেন, আর ভারতশিল্পেও দেখি অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া রীতি মিলিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্যের অলংকরণ। ভারতশিল্পের মূল ধারার পাশে লোকশিল্প অবলম্বন করে যে স্বতন্ত্র একটি ধারা গড়ে উঠেছে, তাও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহধর্মিতা করে। "স্বামী বিবেকানন্দ"—ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—"এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তিনি এর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতার প্রতীক। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন, বাণী দিয়েছেন।"[৩]

স্বামীজীর ব্যক্তিগত শিল্পপ্রয়াস

শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আলোচনায় আসার আগে একটি চিত্তাকর্ষক গবেষণা সেরে নেওয়া যায়—শিল্পের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত

যোগ কতখানি ছিল, এবং ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তিনি কতখানি পরিচিত ছিলেন? শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু উদ্ধত সিদ্ধান্ত অগ্রিম জানিয়ে দেওয়া যায়—স্বামীজী সম্ভবত তাঁর কালের 'বিখ্যাত' ভারতীয়-দের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টি স্বচক্ষে দেখে-ছিলেন।* স্বামীজী কি পরিমাণে শিল্পকীর্তি দেখেছেন, সেকথায় আসার আগে বলে নেওয়া ভাল, তিনি শিল্পী না হলেও রং-তুলি নিজের হাতে নিয়ে-ছেন বাল্যকাল থেকেই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত তথ্য থেকে জানতে পারি, এগারো-বারো বছর বয়সে তিনি পারিবারিক অভিনয়ের মঞ্চে রঙিন দৃশ্যপট আঁকতেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে যে খাতবদল হল তাতে রং-তুলির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিন্তু তাঁর কলাকুতূহল যে যায়নি, তার প্রমাণ পেয়েছি নিবেদিতার চিঠি থেকে। ১৮৯৯, ১৮ অক্টোবরের এক চিঠিতে নিবেদিতা আমেরিকা থাকাকালে স্বামীজীর পোরট্রেট-আঁকায় মহা উৎসাহের কথা জানিয়েছেন। উৎসাহ অবশ্য যতখানি, নৈপুণ্য সম্ভবত ততখানি নয়, ব্যাপারটা সাময়িক খেয়ালেরই. এবং এই খেয়ালের শিকার যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা ঐ উৎসাহী শিল্পীর হাতে স্বমুখের বিচিত্র রূপান্তর দেখে আনন্দে আঁতকে উঠেছিলেন। অন্তত নিবেদিতা—মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর ১৮ অক্টোবর, ১৮৯৯-এর চিঠি থেকে তাই দেখতে পাচ্ছিঃ "আমরা মধ্যাহ্নভোজনের অবসরে মজা করে স্বামীজীকে খোঁচাতে লাগলাম—ধর্মাচার্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর উদাসীনতা এবং পোরট্রেট আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব নিয়ে। তিনি আমার তিন-চারটি পোরট্রেট এঁকে ফেলেছেন। সেগুলি অন্য সকলে বলছে যে, এমনকি আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর! কিন্তু তাঁর তো স্ফূর্তির সীমা নেই!"

এক্ষেত্রে স্বামীজীর শিল্পগুরু কিন্তু নিবেদিতার মতো কঠোর হতে পারেননি। চিত্রশিল্পী শ্রীমতী মড স্টামের কাছেই ঐকালে স্বামীজী শিল্পদীক্ষা নিয়েছিলেন। এবং তিনি স্বামীজীকে যোগ্য ছাত্ররূপেই দেখেছিলেন। অবশ্য মড স্টামের কাছে বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত চিত্রের স্রষ্টা অপেক্ষা চিত্রের উপাদানরূপেই অধিক বরণীয়। তিনি তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিপ্রসঙ্গে বলেছেনঃ "অপূর্ব তাঁর কথা, অপূর্ব তাঁর ধর্মভাষণ। আর অগ্নিশিখার মতো রেশমী

পোশাকে আবৃত দেহ—কী অসাধারণ আকার—মন-প্রাণ-হৃদয়-কল্পনাকে একেবারে ক্রীতদাস করে রাখে। হলঘরে আগুনের পাশে যখন তিনি বসে থাকতেন—তাঁর দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে একের পর অন্যের উপর দিয়ে সরে যেত—সঘন কৃষ্ণ আর্দ্র গভীর নয়ন—প্রাচ্য উপমার ভ্রমররাজির মতো। ...আর যখন তিনি রিজলির লনে তাঁর অগ্নিবর্ণ পোশাক পরে পাদচারণ করতেন—তখন সে কী আকার-মহিমা! কবিরা যে পদক্ষেপের কথা বলেছেন—'প্রতি পদক্ষেপে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যাত হয় পৃথিবী'—স্বামীজীর পদপাত সেই কল্পনারই নিকট প্রকাশ—যাকে এ জীবনে আর কখনও দেখব বলে আশা করি না।"[৪]

শ্রীমতী মড স্টাম তাঁর প্রফেট-শিষ্যের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নের বিবরণ দিয়েছেনঃ

"একদিন স্বামীজী আমাকে বললেন, তিনি এমন কিছু কাজ চান যা তাঁকে ব্যস্ত রাখবে এবং ঐকালে যে চিন্তা তাঁকে উত্যক্ত করছিল, তাকে দূর করবে। আমি কি তাঁকে অঙ্কনশিক্ষা দিতে পারি না? তদনুযায়ী আঁকার সরঞ্জামাদি এল, একেবারে নির্ধারিত সময়ে তিনি হাজির হলেন। খুবই বিনীত কুণ্ঠিতভাবে তিনি একটি মস্ত লাল আপেল আমার হাতে দিয়ে নত হয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। এই ফল দানের তাৎপর্য কি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—'শিক্ষা যাতে ফলপ্রদ হয় তার প্রণামী'। কী অদ্ভুত ছাত্র তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন! শুধু একবার একটা কিছু বললেই হয়ে যেত। অসাধারণ তাঁর স্মরণশক্তি ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা—নবশিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর ড্রইং অদ্ভুতভাবে বুদ্ধিযুক্ত ও নিখুঁত। চতুর্থ পাঠ নেবার কালেই তিনি পোরট্রেট আঁকার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছেন বলে অনুভব করলেন। সুতরাং ...তুরীয়ানন্দ মডেল হয়ে বসলেন—ব্রোঞ্জমূর্তির মতো—তাঁর ছবিও আঁকা হল উৎকৃষ্টভাবে। মিঃ লেগেটের পাঠগৃহই স্টুডিও হয়ে দাঁড়াল। ...পরবর্তী বৎসরগুলিতে ঐ ঘরে অনেক বৃহৎ মানুষ হয়তো আসবেন, আসবেনই, কিন্তু সেই শিশুর মতো মানুষটিকে ওখানে আর পাওয়া যাবে না—ক্রেয়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, এমন মন-প্রাণ তাতে ঢেলে দিয়েছেন, মনে হয় যে, ঐ বুঝি তাঁর বৃত্তি। ছবি আঁকা থেকে তিনি কত আনন্দ পেয়েছেন, শিখতে পেরে তাঁর কত গভীর উল্লাস—সেসবের জন্য তিনি যে কতবার আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন!"[৫]

শিল্পসৃষ্টির আনন্দে মগ্ন থাকার মতো যথেষ্ট অবসর স্বামীজী তাঁর

জীবনে খুঁজে পাননি, যদিও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রয়োজনে এক্ষেত্রে কিছু সক্রিয় তাঁকে হতে হয়েছিলই। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর প্রেরণায় যখন মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা বেরোয়, তখন স্বামীজী পত্রিকাটির শ্রীহীন প্রচ্ছদের বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। তারপর মাদ্রাজ থেকেই, একই গোষ্ঠীর চেষ্টায় পরের বছরে স্বামীজীর প্রেরণাতে আবার অন্য একটি পত্রিকা, "প্রবুদ্ধ ভারত" বেরুল—তার পরিচালকেরা স্বামীজীকে তুষ্ট করবার জন্য পত্রিকার প্রচ্ছদে চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠা ঘটালেন। প্রচ্ছদে দেখা গেল, অংকিত আছেঃ ভারতের অরণ্যভূমে শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেয়েছেন প্রাণদায়িনী নদীতটে বৃদ্ধ বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাচীন ঋষি উপবিষ্ট, তাঁর মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রাচীনতর, স্নিগ্ধতর, প্রাণরসপূর্ণ দর্শনধারা, সাহেব-মেম তাতে একেবারে বিমোহিত।—এহেন বিরাট বিষয় নিয়ে আঁকা একটি জটিল ছবি পরিবেশন করতে পেরে স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্তগণ বিশেষ পুলকিত হয়েছিলেন, পুলকিত হয়েছিলেন শিক্ষিত ভারতীয়গণ, কারণ, ভারতীয় চিত্রশিল্পের তৎকালীন মান অনুযায়ী ছবিটি দর্শনীয় ছিল। তাই পুনার বিখ্যাত 'মারাঠা' কাগজ লিখেছিলঃ "The front page is almost picturesque" কিন্তু বিদেশে বসে সেই ছবি দেখে স্বামীজীর লজ্জার সীমা ছিল না। ১৪ জুলাই, ১৮৯৬-তে ডঃ ননজুন্ডা রাওকে এ সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ "একটা বিষয়ে মন্তব্য করতেই হচ্ছে, প্রচ্ছদটা একেবারে বর্বর, বীভৎস, কদর্য। সম্ভব হয় তো বদলে ফেলুন। ওটাকে সহজ করুন—ওতে প্রতীক-ভাব দিন। মানুষের চেহারা একদম নয়। বটবৃক্ষ জাগরণের চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিও নয়, ইউরোপীয় দম্পতিও নয়। পদ্মই হল জাগরণের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা দুঃখজনকভাবে পেছিয়ে আছি, বিশেষত চিত্র-শিল্পে।" ৬

স্বামীজীর কড়া সমালোচনা থেকে তাঁর ভক্তগণ অবিলম্বে কতখানি শিল্প শিখেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তা বোঝা যায়। স্বামীজী তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের শিল্পবুদ্ধিতে আস্থা রাখতে না পেরে লিখে পাঠিয়েছিলেন—'ব্রহ্মবাদিন' ও "প্রবুদ্ধ ভারতে"র জন্য লোহার ব্লক-সমেত নক্সা তিনি পাশ্চাত্যদেশ থেকে পাঠিয়ে দেবেন।

স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন' ও "প্রবুদ্ধ ভারতে"র জন্য ঐ জিনিসগুলি পাঠিয়ে-ছিলেন কি না জানি না, সম্ভবত সময়ের অভাবে ওগুলি পাঠিয়ে উঠতে পারেন-নি, কিন্তু তাঁর রচিত একটি নক্সা আমরা পেয়েছি, ভারত ও পৃথিবীর নানা স্থানে এখন যা পরিচিত—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকচিহ্নটি। এই নক্সার ভাব-

তাৎপর্য স্বামীজী একাধিকবার ব্যাখ্যা করেছেন দেখতে পাই।[৭]

চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কম ছিল না, বরং মনে হয়, আপেক্ষিকভাবে কিছু বেশী ছিল। ভারতবর্ষে তখন চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নমুনা বেশী প্রাপ্তব্য ছিল। এবং স্বামীজী, শিল্পের ক্ষেত্রে একালের ভারতবর্ষের সর্বোত্তম একটি সৃষ্টির কারণ হয়েছিলেন, যা তাঁর কল্পনাকে কিছু অংশে গ্রহণ করে তাঁর দেহান্তের পরে আকার ধারণ করেছিল। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নিঃসংশয়ে আধুনিক ভারতবর্ষে গঠনমহিমার দিক দিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম?) সৃষ্টি। মন্দিরটির ছন্দ এবং সামঞ্জস্য অনবদ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনায় স্বামীজী সর্বদা আনন্দলাভ করতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-রীতির মিশ্রণ কিভাবে এই মন্দিরে ঘটবে, তা বহুভাবে বলেছেন, এবং তিনি স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাহায্যে এই মন্দিরের নক্সা তৈরী কারয়েছিলেন স্বামীজীর কল্পনাকে সম্পূর্ণ মান্য করে অবশ্য মন্দিরটি তৈরী

৭। শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে মিশনের সীলমোহর নিয়ে স্বামীজীর কথাবার্তার বিবরণ দিয়েছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর "স্বামি শিষ্য সংবাদে"। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ঐ আলোচনা হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তারিখে নিউইয়র্ক থেকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছে প্রতীকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। মনে হয়, ঐ সময়েই স্বামীজী প্রতীকটি প্রথম তৈরী করেছিলেন এবং তার ব্লক করিয়েছিলেন নিউইয়র্ক থেকেই। যাই হোক, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনায় প্রতীক-প্রসঙ্গ এই প্রকারঃ

"স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্য বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংস-বিরাজিত সর্পবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেনঃ "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির, এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯০]

রণদাপ্রসাদ স্বামীজীর ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেনঃ "'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হ'তে পারত'।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯০]

রণদাপ্রসাদের এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায়, ভারতীয় শিল্পকলার প্রতীকী ভাষা সম্বন্ধে ঐকালে ভারতীয় শিল্পশিক্ষকেরা কতদূর অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে, হ্যাভেলের বিরুদ্ধে রণদাপ্রসাদের পূর্বকথিত বিদ্রোহের পিছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ ছিল না।

করা যায়নি, আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা তার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, স্বামীজীর কল্পনা বড় বেশী কল্পনা বলে হয়তো মনে হয়েছিল, কিন্তু তা যে অসম্ভব কোন কল্পনা নয়, তা আধুনিক রূপকল্পনাময় পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে। এবং স্বামীজী এই মন্দির কল্পনা করবার সময়ে কেবল ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। রণদা-বাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নক্সা দেখাবার পরে বলেছিলেনঃ "এই ভাবী মঠ মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব।"[৮] কিভাবে "বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর" স্থাপিত প্রকাণ্ড নাট-মন্দির তৈরী হবে, যার "দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে", "মন্দিরের মধ্যে একটি রাজহংসের উপরে ঠাকুরের মূর্তি" রাখা হবে, এবং প্রবেশদ্বারের কাছে সিংহ ও মেষের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে মহাশক্তি ও মহা-নম্রতার মিলন দেখানো হবে—তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন। মন্দিরের বহিরবয়ব সম্বন্ধেই তিনি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনায় সবচেয়ে আনন্দবোধ করে-ছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে মনে হবে।"[৯]

৮। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯১

৯। শিল্প বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনায় স্বামীজী ভরপুর থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলঃ "ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।" [বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯১]। শিল্প একটি প্রধান বিদ্যা। স্বামীজী চাইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠকে কেন্দ্র করে ভারতশিল্পের নবজাগরণ ঘটুক। ১৯২৯, ১৩ মার্চ বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে লিখিত একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাবকল্পনার কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন। মঠ তখনও বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে; বর্তমান মঠের জমি সবে কেনা হয়েছে; স্বামীজীর আদেশে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী প্রস্তাবিত মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করেন অনেক দিনের চেষ্টায়; ঐ নক্সা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে; এমনি এক সময়ে স্বামীজী সদ্য-কেনা মঠের জমিতে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পায়চারি করছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে অখণ্ডানন্দ লিখেছিলেনঃ "আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের নক্সার কথা পাড়িলাম। তাহা শুনিয়া স্বামীজী...কোথায় তাঁহার সেই 'অর্ধচন্দ্রাকার' মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলুঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপরে হীরা-চুনি-পান্না-খচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঁকার থাকিবে—তাহাই তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।"

হীরা-চুনি-পান্নার কথা শুনেই গরীবের বন্ধু অখণ্ডানন্দ আপত্তি তুলেছিলেন। গরীবের

স্বামীজীর প্রত্যক্ষ শিল্পদর্শনের অভিজ্ঞতা

(ক) **ভারতীয় শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা**: যে গবেষণাটি স্থগিত আছে তা সেরে নেওয়া যাক। ভারত ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলির এক শ্রেষ্ঠ দর্শক স্বামীজী—কোন্ সংবাদের উপর নির্ভর করে ঐ দাবি আমরা করছি?

প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেব, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দ বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ দেখেছেন—অতীতের ভারতবর্ষকে স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে এবং বর্তমানের ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে। স্বামীজীর দুই বিশাল চোখ ছিল (এবং তৃতীয় নয়ন), তাদেব যখন ধ্যানে ঢাকতেন না তখন তারা উন্মোচিত থাকত, এবং ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সুন্দর শিল্পকীর্তিগুলিকেও দেখত, দেখতই, কারণ তাঁর মতে, আর্ট ধর্মের অঙ্গ। ভারতশিল্প কেবল অতীত নিদর্শনের মধ্যে নয়, বর্তমানেও কিভাবে লোকজীবনের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান রয়েছে, তাও ছিল তাঁর সানন্দ দর্শনের বস্তু।

ভারতশিল্পের কোন্ কোন্ নিদর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, এখন তা ঠিকভাবে বলা শক্ত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি অভাবের কথা জানাতে পারি—তিনি উড়িষ্যা যাননি, অথচ উড়িষ্যা হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনায় পূর্ণ এবং উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তি নিয়ে আলোচনা পূর্বেই শুরু হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল ভারত সরকারের আনুকূল্যে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "দি অ্যান্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা" (The Antiquities of Orissa)—প্রায় একশ বছর পরেও সে গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টে মুদ্রিত ছবিগুলি দেখে চমকে উঠেছি। ধরে নিতে পারি, স্বামীজী মিউজিয়ামে গিয়ে উড়িষ্যার শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, এবং আমরা জানি, তিনি রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ সাগ্রহ পরিচয়ের বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্যকীর্তির প্রভূত প্রশস্তি তিনি করেছেন, যথা, আলো-

আরও বড় বন্ধু বিবেকানন্দ ব্যাপারটির অন্য রূপ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর কল্পনায় এই মন্দির ভারতবর্ষে শিল্পের নবজন্মের গর্ভগৃহ।—"উত্তরে তিনি (স্বামীজী) সেই সময়ে যে-পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় এই নবযুগের ক্রমাভিব্যক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি কথাই আমার বেশ মনে আছে। প্রথমেই বলিলেন, 'এই রেনেসাঁসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর্টের বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী'।" [উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬]

য়ারের বা দিল্লী-আগ্রার স্থাপত্যের। মুঘল স্থাপত্যের প্রশংসা তিনি করেছেন একথা বললে যথেষ্ট বলা হয় না—কার্যত তিনি তাদের বন্দনা করেছেন।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং সমসাময়িক রবিবর্মার ছবি তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিলেন।

চারুকলার বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে স্বামীজীর সুগভীর আকর্ষণের একটি মজার কাহিনী আছে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী মহীশূরে উপস্থিত হলে, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে মহারাজা বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং জনৈক রাজ-কর্মচারীকে দিয়ে স্বামীজীকে বাজারে পাঠিয়ে দেন গাড়ি করে--যাতে তিনি তাঁর পছন্দসই যে কোন জিনিস কিনে নিতে পারেন। মহীশূরের বহু দোকানে স্বামীজী উক্ত কর্মচারীর সঙ্গে ঘুরেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার পয়সা দামের একটি চুরুটের বেশী কেনবার যোগ্য বস্তু তিনি দেখতে পাননি। ফলে রাজকর্মচারীটি মনঃক্ষুণ্ণ হন—স্বামীজীর কেনার সূত্রে তাঁর অর্থপ্রাপ্তি ঘটেনি বলে। আসল ব্যাপার ছিল—স্বামীজী কিছু কেনার জন্য দোকানে দোকানে ঘোরেননি—তিনি মহীশূরের সর্বপ্রকার শিল্পদ্রব্য দেখতে চাইছিলেন।[১০]

স্বামীজীর পার্শ্ববর্তী মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলাশিল্প সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন না, অন্তত তাঁর ভারতীয় সঙ্গী বা ভক্তগণের সম্বন্ধে একথা সত্য। সুতরাং তাঁরা যে সমস্ত স্মৃতিকথা বা বিবরণ রেখে গেছেন তার মধ্যে স্বামীজীর জীবনের এই দিকটি অবজ্ঞাত। তাহলেও, সকল ঔদাসীন্যের মধ্য থেকেও, কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ এসে পোঁছেছে—ঐ সমস্ত বিবরণ থেকেই। ১৮৯৭-১৮৯৮ সালে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর সংকলনগ্রন্থ "ভারতে বিবেকানন্দে"র মধ্যে পাই, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বামীজী প্রথম সিংহলে পদার্পণ করেন (সিংহল তখন ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত) ও তার অভ্যন্তরে অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। সেইকালে তিনি প্রত্নকীর্তির নানা নিদর্শন দেখেছিলেন, বিশেষভাবে অনুরাধাপুরে। "অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন শহর। এখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। সেই সকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম শহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বর্তমান আছে। যথা—বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একটি শাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্য-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর, 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপসমূহ।"[১১]

ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসে স্বামীজী তাঁর পূর্বে-দেখা মন্দিরাদি পুনশ্চ নতুন আগ্রহে দেখেছিলেন। "(রামেশ্বর) মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামীজী সমস্ত মন্দিরটি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্যসকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্রস্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামীজী দেখিলেন।"[১২] "মাদুরায় অবস্থিতিকালে স্বামীজী একদিন তথাকার সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ মন্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম!"[১৩]

১৮৯৭-এর শেষভাগে স্বামীজী উত্তর ভারত সফর করেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজী লাহোরে মিউজিয়াম দর্শন করেছিলেন, যার সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল (কি, তা পরে লক্ষ্য করব)—অথচ তার বিষয়ে সামান্য উল্লেখের বেশী ("স্বামীজী সঙ্গিগণসহ লাহোরের মিউজিয়াম বেড়াইয়া গেলেন") পাই না।

স্বামীজীর পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অবস্থানকালের অন্যতম সঙ্গী আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দ যে সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রেখেছিলেন, যার কিয়দংশ মাত্র "ভারতে বিবেকানন্দে"র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে দেখতে পাই, ১০ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে স্বামীজীকে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং "ছবি ও পুস্তক" দেখিয়েছিলেন। "২২ সেপ্টেম্বর—নৌকাযোগে অনন্তনাগ-গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ-দর্শন।

"২৩শে সেপ্টেম্বর—অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মার্তণ্ডে গমন।

"২৪শে সেপ্টেম্বর—মার্তণ্ড ধর্মশালা...হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল)-যাত্রা। রাস্তায় লোকেরা একটি মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত, এমন উত্তম মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামীজী ঘোড়ায় চলিলেন। এখানে নানাবিধ চর্চা হইল।"[১৪]

এই পর্যায়ে স্বামীজী দিল্লীতে শিল্পকীর্তিগুলি পুনশ্চ দেখেছিলেন—সে সম্বন্ধে উৎসাহিতভাবে উক্ত গ্রন্থে যে তিনটি পূর্ণ বাক্য ব্যয় করা হয়েছে, তা কিন্তু আমাদের অতৃপ্তির বেশী কিছু দিতে পারেনি।—"দিল্লীর কেল্লা, কুতুবমিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিজী সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা,

কত ইতিহাসের কথা, গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।"[১৫]

তা যে সত্যই পারত, ঠিক পরবৎসর স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণের পরে নিবেদিতা যে ডায়েরী রেখেছিলেন, তার প্রকাশিত রূপ থেকেই দেখতে পাই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে দীক্ষা নিবেদিতা যে স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, তা নিবেদিতার স্বীকারোক্তি থেকেই পাই। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ভারতীয় প্রত্নকীর্তির আলোচনার সময়ে নিবেদিতা আঙ্গিকের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিতে ওতপ্রোত ভাবের সত্যকে যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তা অংশবিশেষে এখনও অনতিক্রান্ত হয়ে আছে।

পরের বছরই (১৮৯৮) স্বামীজী আবার উত্তর ভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণে যান। পূর্ববর্তী ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা, এবারে উদ্দেশ্য নিবেদিতাদিকে, বিশেষত, নিবেদিতাকে, ভারত দেখানো, অর্থাৎ তাঁকে প্রস্তুত করে তোলা, যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা তিনি হতে পারেন। নিবেদিতা যে তা হবেন—স্বামীজী ধরেই নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতার কীর্তির দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে মন্তব্য করা হয়েছে—এই পর্বে নিবেদিতার গঠন ভিন্ন স্বামীজী যদি আর কিছু নাও করতেন, তাহলেও বলা যেত না, অকৃতার্থ হয়েছে তাঁর কাজ।

নিবেদিতা "দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম" গ্রন্থে স্বামীজী কিভাবে তাঁদের ভারতীয় শিল্পকীর্তি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি বুঝিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। পাটলীপুত্র বা পাটনা থেকেই স্বামীজীর শিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছিল, "জগতের দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম" কাশীর গঙ্গার ঘাটের "সাগ্রহ প্রশংসা" স্বামীজী যথেষ্ট করেছিলেন, এবং "লক্ষ্ণৌ-এ যেসব শিল্পদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা" তাঁর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নিবেদিতারা শুনেছিলেন। স্বামীজীর "অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্যবোধ" লক্ষ্য করে নিবেদিতা অভিভূত হয়েছিলেন। নিবেদিতা এইসঙ্গে জানিয়েছেন, স্বামীজী যে কেবল "যে-সকল মহানগরীর সৌন্দর্য সর্বস্বীকৃত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ" তাদের বিষয়েই বলেছিলেন তা নয়, আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত, খামার এবং গ্রামবহুল সমতল প্রদেশের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সৌন্দর্যরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণেও ব্যগ্র ও উন্মুখ ছিলেন। এরই ফলে আমরা দেখতে পাব, নিবেদিতা পরবর্তীকালে কেবল অজন্তা, ইলোরা, বিহার, কাশীর প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতা হননি—ভারতীয় জীবনের অব্যাহত ছন্দের মহান কাব্যস্রষ্টা হতে পেরেছিলেন—তাঁর

"দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ" এবং "স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম" গ্রন্থের মধ্যে।

উত্তর ভারত পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে স্বামীজী যখন সদলবলে চলেছিলেন, তখনও পথিমধ্যে মন্দির দেখে নিতে ভোলেননি। নিবেদিতা "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থে লিখেছেনঃ "পরদিন (২০ জুন, ১৮৯৮) গিরিসঙ্কটের সবচেয়ে সুন্দর অংশটির মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গীর্জার আকারবিশিষ্ট পাহাড়গুলি ও একটি প্রাচীন সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা বারামুল্লায় পৌঁছিলাম।" [১৬]

শ্রীনগরে পৌঁছাবার পরে মন্দিরসম্বন্ধীয় স্বামীজীর একটি বিশেষ ধারণার সমর্থক-প্রমাণ নিবেদিতা কিভাবে পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে লিখেছেনঃ "আর একদিন (২৯ জুন) আমরা নিজেরা বিনা আড়ম্বরে দুই-তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারি ভারি উপকরণে গঠিত তখ্‌ৎ-ই সুলেমান নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। তথায় শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছিল এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি নিম্নে চারিপাশে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের মধ্যে হিন্দুদের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় আছে—এই কথার সমর্থনে স্বামীজীর যুক্তিতর্কের পক্ষে বিরাট দৃষ্টান্তের মতো ছিল এই মন্দিরটি। যেমন, লন্ডনে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, ঋষিরা নিসর্গসৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পর্বতশীর্ষে বাস করেন; আর এখন একের পর এক দৃষ্টান্তযোগে তিনি দেখাইয়া দিলেন, ভারতবাসীরা চিরকাল বিশেষ সৌন্দর্য-পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পূজামন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাকে পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তোলে। সমগ্র উপত্যকাটি যে স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, এমন একটি গিরিশীর্ষের সুমহিম অবস্থানে নির্মিত ক্ষুদ্র তখ্‌ৎ-মন্দিরটি স্বামীজীর বক্তব্যের পক্ষে অন্যতম সাক্ষ্যরূপে বর্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।" [১৭]

স্বামীজী কিভাবে নিবেদিতাকে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ নিবেদিতার রচনা থেকে উদ্ধার করা যাকঃ

"১৯শে জুলাই। প্রথমে অপরাহ্ণে আমরা ঝিলাম নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিত পান্ড্রেনথান (পাণ্ড্রেস্থান—বা পাণ্ডবদের স্থান?) মন্দির খুঁজিয়া পাইলাম।

"ক্ষুদ্র মন্দিরটি গাঢ় ফেনায় পূর্ণ একটি সরোবরের মধ্য হইতে উঠিয়াছে—

ভারী ধূসর চুনা পাথরে নির্মিত, ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—চারিদিকে চারটি দ্বার। বাহির হইতে দেখিতে, ইহা চৌতারায় বসানো চারিপার্শ্বে ফোকরবিশিষ্ট একটি মাথাকাটা পিরামিডের মতো সরু হইয়া উঠিয়াছে—মাথায় ঝোপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্যকৌশলে দেখা গেল—অদ্ভুতভাবে ত্রিপত্র ও ত্রিভুজাকার খিলান পরস্পর মেলানো হইয়াছিল, সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল সরল রেখাকার সরদাল (লিন্টেল)। অসাধারণ দৃঢ়ভাবে মন্দিরটি নির্মিত, এবং বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতির জন্য যে পার্থক্যটুকুর চিহ্ন অবশ্যম্ভাবী তা ভারী ভারী কারুকার্যের দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছিল।

"বনমধ্যে সরোবরের ধারে পোঁছিয়া দেখিলাম ক্ষুদ্র মন্দিরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আভ্যন্তরীণ কারুকার্যগুলি পরীক্ষা করা যাইবে না (যাইবার অসুবিধার জন্য), তাহাতে আমরা খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। গাইড-বইয়ে মন্দিরটি সম্বন্ধে 'যথার্থই ক্ল্যাসিকাল' অর্থাৎ আদ্যন্ত আকারে ও কারিগরিতে গ্রীক ও রোমান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।"[১৮]

নিবেদিতাদের বিষাদ অবশ্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল যখন হাজি অর্থাৎ মাঝিরা একটি নৌকা যোগাড় করে অনেক কষ্টে তাঁদের মন্দিরের মধ্যে তুলে দিয়েছিল। তারপর—

"স্বামীজী ছাড়া আমাদের সকলের পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতে-খড়ি। সুতরাং নিজের দেখা শেষ করিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়া দিলেন কিভাবে ভিতরটি দেখিতে হইবে।

"ভিতর-ছাতের মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণের মধ্যে এক বৃহৎ সূর্যমূর্তিবিশিষ্ট চক্র বসানো রহিয়াছে। তাহার চারিটি কোণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাতটির চারি কোণে চারিটি সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নারী-পুরুষের অল্প খোদাইকরা অতি সুন্দর কারুকার্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে যেসকল খালি জায়গা পড়িয়া আছে, সেই সকল স্থানে একসারি স্তূপ ছিল মনে হয়।

"বাহিরেও খোদাইয়ের কাজ সমভাবে বিন্যস্ত। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটিতে—সম্ভবত পূর্ব দরজার উপরে যে খিলানটি তাহাতেই—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—এই সুন্দর মূর্তিটি রহিয়াছে। এই থাম দুইটির শিরোদেশ ব্যাপিয়া বর্তমান একটি বৃক্ষতলে এক রমণী আসীনা—এইরূপ খোদিত রহিয়াছে। মূর্তিটি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

অপর তিনটি দরজার খিলানে কোন নক্সা ছিল না; কিন্তু পুকুরপাড়ে যে চাবড়াখানি পড়িয়াছিল, সেটি ইহাদেরই কোন স্থান হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল মনে হইল। ইহাতে বাজেভাবে তৈরী একটি রাজার মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা উহাকে সূর্যের মূর্তি বলে। ক্ষুদ্র মন্দিরটির গাঁথুনি অনবদ্য। সম্ভবত সেই কারণেই উহা এতদিন টিকিয়া আছে। পাথরের চাঙগড়গুলি এমনভাবে কাটা হইয়াছে যে, সেগুলি দেওয়ালের ইঁটের মতো না হইয়া স্থপতির পরিকল্পনার অংশস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐসকল পাথরের কোণ ঘুরিয়া গিয়া দুইটি বা কোথাও তিনটি দেওয়ালের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারটি হইতে মন্দিরটি অতি প্রাচীন, এমন কি মার্তণ্ড মন্দির হইতেও প্রাচীনতর মনে হইল। কারিগরের কাজের ধরন গৃহস্থাপত্য-নির্মাণপদ্ধতি অপেক্ষা সূত্রধরের কাজের রীতির সঙ্গে অধিক ঐক্যযুক্ত ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণের জলরাশি সম্ভবত কোন কুণ্ড ছাপাইয়া সৃষ্টি হইয়াছে—সেই কুণ্ডের স্মারক হিসাবেই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে—স্বামীজী তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন।

"স্বামীজীর চোখে স্থানটি ইতিহাসের আনন্দপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ স্মারকভূমি। কাশ্মীরের ইতিহাসে যে-চারিটি ধর্মযুগ রহিয়াছে তাহার একটির পরিচয় মন্দিরটিতে রহিয়াছে। (১) কাশ্মীরে বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ, যাহা হইতে কুণ্ডগুলির নাগশব্দান্ত নামকরণ হইয়াছে, যথা ভেরিনাগ ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধধর্মের যুগ, (৩) হিন্দুধর্মের যুগ, যাহা সূর্য-উপাসনার আকারে বর্তমান ছিল, (৪) মুসলমানধর্মের যুগ। স্বামীজী বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট শিল্প; সূর্যচিহ্নিত চক্র বা পদ্ম ঐ যুগের অতি প্রচলিত অলঙ্করণ। সর্পযুক্ত মূর্তিগুলি প্রাক্-বৌদ্ধ-যুগের স্মারক। সূর্য-উপাসনার (হিন্দু) যুগে ভাস্কর্যের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল, সেই কারণে পূর্বোক্ত সূর্যমূর্তির ঐ স্থূল আকার।"[১৯]

পাণ্ড্রেস্থানের মন্দিরটিকে সেইকালে নিবেদিতারা যত প্রাচীন মনে করেছিলেন (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত), ততখানি প্রাচীন কিনা সে বিষয়ে পরে সন্দেহবোধ করেন। সে যাই হোক, ঐকালে তাঁদের চোখের সামনে সুদূর অতীতের দৃশ্যাবলী জেগে উঠেছিল, ভাববার চেষ্টা করেছিলেন, আঠারোশ বছর আগে পৃথিবী যখন বিরাট বিরাট ঘটনার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন্ দেবতাকে মানুষ পূজা করত! ভিতরে কোনও দেবতার মূর্তি না পেলেও বাহির দ্বারে শিক্ষাদানরত বুদ্ধের যে মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর পাদমূলেই প্রণত হবার সৌভাগ্যে তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং—

"আমরা একটি চিত্র মানসনেত্রে ফোটাতে পেরেছিলাম—বিশাল একটি দারুময় নগরী—কেন্দ্রস্থলে ছিল এই মন্দিরটি—বহুদিন পরে কোন অগ্নিকাণ্ডে নগর ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং তা সরে যায় প্রায় পাঁচ মাইল দূরে।"[২০] এই স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনা করে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তরুরাজির মধ্য দিয়ে যখন তাঁরা নদীতীরে ফিরে এসেছিলেন—তখন যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলেন, তা স্বামীজীকে পুনশ্চ সেই ভাবকল্পনার জগতে নিয়ে গিয়েছিল, যা সকল চারুকলার কেন্দ্রীয় ভাবজগৎ।

"তখন সূর্যাস্তের সময়—অপরূপ! পশ্চিমের পর্বতগুলি রক্তরঙে ঝলসিত। আরও উত্তরে মেঘে ও তুষারে সেগুলি নীলাভ। আকাশ সবুজে হলুদে মাখা, তাহার উপর লালের ছোপ—নীল এবং 'ওপ্যাল' পটভূমিকার উপরে ড্যাফোডিল ফুলের তুল্য হরিদ্রাবর্ণ এবং অগ্নিশিখার উজ্জ্বল বর্ণ। আমরা দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তারপরে আচার্যদেবের দৃষ্টি গিয়া পড়িল 'সুলেমানের সিংহাসনে'র উপর (ইতিমধ্যেই যাহা আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে)—তিনি আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'মন্দিরের স্থান নির্বাচনে হিন্দুর প্রতিভার কী পরিচয়! সব সময়েই সে মহান নিসর্গ সৌন্দর্যের স্থানটি বেছে নেয়। দেখ, তথ্‌ৎ হইতে সমস্ত কাশ্মীরটি দেখা যায়। নীল জলরাশিব ভিতর হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে—যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িত-ভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে রহিয়াছে উপত্যকাটি!'"[২১]

স্বামীজীর সঙ্গে মার্তণ্ড মন্দির দর্শনের বিবরণও নিবেদিতা দিয়েছেন। "মন্দিরটির অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ"; তাতে মন্দির অপেক্ষা মঠের লক্ষণই অধিক; "বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর ঐ মন্দির-মঠে বিভিন্নযুগের নির্মাণ-পদ্ধতির চিহ্ন"—এই সকল বিষয়ের উল্লেখের পরে নিবেদিতা বিস্তৃতভাবে মন্দিরটির গঠনভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছেনঃ "প্রত্যেক সৌধ এত সর্বাঙ্গসুন্দর এবং তাহাদের মধ্যে দুই নির্মাণ-যুগের উদ্দেশ্য এত স্পষ্ট ছিল যে, মন্দিরটির অঙ্গসংস্থান দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল।"[২২] নিবেদিতা অবিলম্বে মন্দিরটির বহিরবয়বের স্কেচ করে ফেলে-ছিলেন। মন্দিরটির স্থাপত্যরীতির বর্ণনায় স্বামীজীর উৎসাহ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেনঃ "ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামীজী অবেক্ষণ ও

উদ্দেশ্য নিরূপণে যার পর নাই ব্যস্ত হইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে যে কার্নিশ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপরিভাগে পূর্বোক্ত খিলান দুটির উচ্চ ত্রিপত্র আবার একটি frieze-ও বর্তমান। সেইসঙ্গে দেবশিশুমূর্তিবিশিষ্ট প্যানেলগুলিও আমাদের দেখাইয়া দিলেন।"[২৩]

(খ) স্বামীজীর বহির্ভারতে শিল্পদর্শনের অভিজ্ঞতাঃ রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম।"[২৪] এই সাক্ষাৎদর্শন এবং শিল্পবিষয়ক পড়াশোনার ফলে স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল, "ইউরোপীয় ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা" বলবেন। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থের একেবারে শেষভাগে প্রকাশিত তাঁর সেই অভিপ্রায়, পরম দুঃখের বিষয়, তিনি সিদ্ধ করে যেতে পারেননি।

ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পের সঙ্গে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিষয়ে কিছু সংবাদ এবার দেওয়া যাক।

(১) অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে আমেরিকা যাওয়ার পথে চীনের ক্যান্টন শহরে তিনি একটি মন্দির দেখে আসেন, যার কাঠের মূর্তিগুলি "সুন্দররূপে খোদিত"। একই পথে জাপানের যেটুকু দেখেছিলেন তাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবিক রূপচর্চার দিক দিয়ে জাপানকে 'সৌন্দর্যভূমি' বলে মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে জাপানের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য দেখে তিনি এমনই মোহিত হন যে, খেতড়ির রাজাকে জানিয়েছিলেন, টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কের মারফত আগেই আমেরিকা চলে না যেত, তাহলে তিনি হয়তো জাপানের শিল্পদ্রব্য কিনে দেশে ফিরে আসতেন—আমেরিকা যাওয়া আর হত না।[২৫] সত্যই তা করতেন কিনা জানি না—কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্য থেকে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্যাশনের চেহারা দেখা যায়। জাপানের শিল্পানুরাগের কথা তিনি অক্লান্তভাবে বলে যেতেন।

(২) আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর মতো শিল্পতৃষ্ণ মানুষ মিউজিয়ামে ঘুরে শিল্পসংগ্রহ দেখবেন সহজেই বোঝা যায়। আমেরিকার নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি বড় কিছু না হতে পারে, কিন্তু অপরিমিত তার অর্থ ও তদনুরূপ তার সংগ্রহবাসনা। ইংলন্ডের সম্বন্ধে মোটামুটি একই কথা বলা যায়।

লুই বার্কের বিখ্যাত গ্রন্থ "স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ডিস্কভারিজ"-এর মধ্যে শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর আগ্রহের ও বক্তব্যের বিক্ষিপ্ত

কিছু উল্লেখ পাই। ডেট্রইটে বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী চার্লস এল ফ্রিয়ার সামাজিক আকর্ষণের লক্ষ্যবস্তু স্বামী বিবেকানন্দের ("The Social lion of the day, Swami Vivekananda, the Hindoo **monk**") সম্মানে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। চার্লস ফ্রিয়ার ধনী ব্যবসায়ী হলেও ব্যতিক্রম মানুষ ছিলেন—"তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবস্তু ছিল প্রাচ্য শিল্প। চার্লস ফ্রিয়ার, একথা বলা হয়, আমেরিকায় চীনা ও জাপানী শিল্পের বৃহত্তম সংগ্রহের অধিকারী ছিলেন।" লুই বার্ক জানিয়েছেন, ১৯০০ খৃীষ্টাব্দ থেকে চার্লস ফ্রিয়ার পুরোদমে তাঁর শিল্পসংগ্রহেব কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাহলেও এই ১৮৯৪ খৃীষ্টাব্দেই তাঁর ভবন, যেখানে স্বামীজী নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, প্রাচ্যশিল্পের মিউজিয়াম হতে আরম্ভ করেছিল। স্বামীজী এই শিল্পনিদর্শনগুলি সাগ্রহে পরীক্ষা করেছিলেন, একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

(৩) আমেরিকা থেকে ইংলন্ডের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রথমবারের জন্য যাত্রা করেন ১৮৯৫, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। ঐ মাসের শেষের দিকে প্যারিসে পেঁছান। প্যারিসে যাওয়ার কারণ—স্বামীজীর বন্ধু মিঃ লেগেটের বিবাহ-উৎসব। প্যারিসে এই পর্যায়ে স্বল্পকালীন অবস্থানে (২৪ আগস্ট—৯ সেপ্টেম্বর) স্বামীজীকে বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে নিশ্চয় বেশ কিছু সময় আটকে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু প্রথম প্যারিস দর্শনকে শিল্পদর্শনের পরম আনন্দে পরিবর্তিত করতে তিনি ত্রুটি করেননি। তাঁর ইংরেজি জীবনীতে পাইঃ

"He made the most of his brief stay by visiting its museums, its churches, its Cathedrals, its art galleries, and was pleased to see how highly the artistic instincts of the French nation were developed."[২৬]

এইবারই তিনি বোধ হয় প্যারিসের লুভার মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন (১৮৯৫-তে প্যারিসে তাঁর দুবার অবস্থান, একদিন-দুদিনের বেশী সময়ের জন্য নয়), কারণ ১৮৯৭, ৩০ মে তিনি তাঁর স্নেহের 'ভগিনী' মেরী হেলকে সকৌতুকে এক প্রসঙ্গে "ভেনাস ডি মিলো"-র মূর্তি দেখার কথা জানিয়েছিলেন।[২৭]

(৪) ১৮৯৬-এর জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লন্ডন থেকে কন্টিনেন্ট ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে জেনিভা দেখেছিলেন। সেখানে যেসব স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি দেখেন, তাদের মধ্যে "ক্যাসল অব শিল" (Castle of Chilon) ছিল। রাইন নদীর তীরে কোলন (Cologne) শহরের বিরাট ক্যাথিড্রল দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। জার্মানীর কিয়েল শহরে বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক পল ডয়সনের সঙ্গে যখন কাটিয়েছিলেন, তখন উক্ত অধ্যাপকের অনুরোধে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখতে যান, যাতে কলা-শিল্পের যথেষ্ট নমুনা সংগৃহীত ছিল।

স্বামীজীর এই কন্টিনেন্ট ভ্রমণের কোনও ভাল বিবরণ নেই। তাঁর ইংরেজি জীবনী থেকে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণের উল্লেখ উপরে করেছি, কিন্তু ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী লন্ডন ত্যাগ করে কন্টিনেন্টের মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন—তার কিয়দংশের অর্থাৎ রোম দর্শনের কিছু বিস্তারিত সংবাদ আমরা অন্যতম সঙ্গিনী মিসেস সেভিয়ারের একটি রচনা থেকে পাই।[২৮] সে বিবরণ উপস্থিত করার আগে ইংরেজি জীবনীতে রোম দর্শনের পূর্বে এই পর্বে স্বামীজী যেসব শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, তার বিষয়ে লেখা আছেঃ তিনি মিলানে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির "লাস্ট সাপার" ছবি দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। মিলান শহরেই স্বামীজীর সঙ্গে ইতালির প্রথম পরিচয়। মিলান শহর থেকে তিনি সদলবলে পিসা গিয়ে সুবিখ্যাত হেলানো টাওয়ার দেখেন, সেইসঙ্গে "ক্যাম্পো ম্যান্টো" নামক ক্যাথিড্রালটিও। মিলান ও পিসায় শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের অপূর্ব ব্যবহারের সবিশেষ প্রশংসা তিনি করেছিলেন। অতঃপর সুন্দরী ফ্লোরেন্স নগরীতে গিয়ে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে আর্ট গ্যালারিগুলিও দেখেছিলেন। ফ্লোরেন্স ইউরোপের প্রধান শিল্পকেন্দ্র, এবং এখানকার সংগ্রহশালায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনেক সৃষ্টিই আছে।

"চিরনগরী রোম"—সেখানে সকল আগ্রহেরই খাদ্য রয়েছে—মিসেস সেভিয়ার লিখেছেনঃ "বস্তুত পক্ষে রোম শহরটিই একটি মিউজিয়াম; যদি কেউ ছবি চায়, তার সেরা নমুনা এখানে পাবে; যদি স্থাপত্যের ভক্ত হয়,

তাহলে ল্যাটিন মনোধর্মের রহস্য তার কাছে উন্মোচন করে দেবে গির্জার সৌন্দর্যমহিমা; যাঁরা প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী, যাঁরা অতীতের শুষ্ক পঞ্জরের মধ্যে সন্ধান করে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের কোন কোন পৃষ্ঠাকে আবিষ্কার করতে উৎসুক—তাঁদের প্রীতিপূর্ণ আগ্রহের কাছে রোম বিপুল উপাদান-স্তূপ"; "এই রোমে স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ভ্রমণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হয়েছিল।"[২৯] মিসেস সেভিয়ার আরও লিখেছেনঃ "অতীব উদাসীন অলস ভ্রমণকারীও এই চিরনগরীতে প্রথম প্রবেশকালে নূতন ভাবোন্মাদনা বোধ করবেন; সেখানে আমাদের সঙ্গী অন্য কেউ নন স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টিশক্তি এবং ইতিহাসের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার সুগভীর সহজাত ক্ষমতা।"[৩০]

রোমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভ্রমণের ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়ে প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন সিজারের প্রাসাদে, তারপর ফোরাম-এ। যাবার পথে তাঁরা "পিয়াজা ডি সপাগ্না"র ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, অতি সুন্দর সিঁড়িগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—যা গিয়ে পেঁছেছিল "সেন্ট ট্রিনিটা ডি মন্টি" নামক গির্জায়। ঐ গির্জাটি "ক্রুশ থেকে অবতরণ" নামক চিত্রের জন্য বিখ্যাত। সিজারদের অপূর্ব প্রাসাদগুলি তাঁরা দেখেছিলেন, ক্রমান্বয়ে বিরাজিত সেগুলি। তার নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন অগস্টাস সিজার—পরবর্তী সিজারগণ ক্রমেই সংখ্যা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে গেছেন। নীরো তৈরী করেছিলেন দুটি প্রাসাদ, যার প্রথমটিতে যখন আগুন লেগেছিল তখন তিনি তাঁর ইতিহাসবিখ্যাত বীণাবাদন করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি—যেটুকু পেরে-ছিলেন তাতেই তাকে মণিরত্নে, স্বর্ণরৌপ্যে, মূর্তিতে, চিত্রে এমনই অলঙ্কৃত করেছিলেন যে, 'স্বর্ণভবন' নামে তা পরিচিত হয়েছে। প্রাচীন প্রাসাদের পাশে খনন কাজ চালিয়ে প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নমুনা আবিস্কৃত হয়েছে।

বিশাল স্থাপত্যসমূহে গৌরবান্বিত ফোরাম-এ গিয়ে স্বামীজী রোমের সুন্দরতম স্তম্ভ ট্রাজান পিলার খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ১১৭ ফুট উঁচু, বাস-রিলিফে অলঙ্কৃত, ট্রাজানদের কীর্তিস্মারক এই স্তম্ভটিতে দুহাজারের বেশী মনুষ্যমূর্তি রয়েছে। জেরুজালেম অধিকারের স্মারক, ৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত টিটাস বিজয় তোরণ এখনও সুন্দরভাবে বর্তমান। "স্বামীজী গোড়ার দিকে নীরব ছিলেন; কিন্তু ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর আপাত শান্তভাবের ভিতরে তিনি কতখানি উৎসুক উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রাচীন রোমের চিন্তায়

মগ্ন ছিলেন, যে রোম তার বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকে মহাবিস্ময়কর আকার ও সৌন্দর্যের স্থাপত্যকর্মে রূপায়িত করেছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পথে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন; ইতিহাস এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য, যা ঐ প্রাচীন কীর্তিগুলিকে যেন আবৃত করে দিল ইন্দ্রজালে।"[৩১]

অতি পুরাতন এবং অত্যন্ত পূজার্হ, রোমের গৃহদেবী ভেস্ট্যার মন্দির তাঁরা দেখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল পবিত্র বর্ম ও পবিত্র অগ্নি। তাঁরা দেখেছিলেন সুমহান স্থাপত্যসৌন্দর্যপূর্ণ রোমের সাধারণ স্নানাগারগুলিকে, যেখানে কেবল স্নানব্যবস্থাই নয়, অধিকন্তু ছিল ক্রীড়াঙ্গন, ব্যায়ামাগার, সভাগৃহ, গ্রন্থাগার। টাইটান ও ক্যারাকালার স্নানাগারগুলি তো বিস্ময়ের মহাসৃষ্টি।

দর্শনীয় রোমেও দর্শনীয় স্থান কলোসিয়াম—রোমের বিশাল শক্তি ঐ সুন্দরতম অ্যাম্ফিথিয়েটারটির সৃষ্টি করেছিল। বারো হাজার ইহুদি ও খ্রীষ্টানের ক্রীতদাস-বাধ্য পরিশ্রমে এক বছরের মধ্যে নির্মিত, লক্ষাধিক দর্শকের উপবেশনের উপযোগী সেই রঙ্গস্থলটির অবশ্য অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কনস্টানটাইনের অতিখ্যাত বিজয় তোরণ দেখতে, তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন নির্মল সুন্দর চন্দ্রালোকে কলোসিয়াম দেখতে। "সেই বিশাল রঙ্গস্থলের উপরে ছড়িয়ে ছিল ঘননীল আকাশ, সেখানে জ্বলছিল নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ, আমাদের চতুর্দিকে মৃত্যুর মতই স্তব্ধ নীরবতা—অপূর্ব, অপূর্ব সেই মহিমা।"

কনস্টানটাইন-নির্মিত "সেন্ট জন ল্যাটেরন" চার্চই রোমের প্রধান গির্জা। এর প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যসৌন্দর্য একে অবশ্য দর্শনীয় করে রেখেছে। যে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়ে যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শেষ বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা রয়েছে এখানে, এর প্রতিটি অংশ খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ—এর মধ্য দিয়েও তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন।

রোমের গির্জাগুলি কেবল ধর্মের নয়, শিল্পেরও আগার। যাঁরা ভাস্কর্যে আগ্রহী তাঁরা কেউ ভিঙ্কোলোয় সেন্ট পিয়েত্রো চার্চ দেখতে ভোলেন না, কারণ সেখানে রয়েছে মোজেস-এর মূর্তি—এঁরাও সে ভুল করেননি। মোজেসমূর্তি মাইকেল এঞ্জেলোর মহত্তম সৃষ্টির একটি—মানবিক শক্তিমহিমার অপূর্ব আদর্শায়িত রূপ। চিত্তাকর্ষক ছিল সঙ্গীতের ঋষি-গুরু সেন্ট সিসিলিয়ার মর্মরমূর্তি দর্শন—তাঁর নামাঙ্কিত গির্জার অভ্যন্তরে। এবং সেইসঙ্গে রোমের সবচেয়ে জমকালো সমাধিস্থল—হাড্রিয়ান সমাধিভূমি—যা পূর্বে ভূষিত ছিল বহু অলঙ্কারে।

ক্রুশের আকারে নির্মিত সর্ববৃহৎ গির্জা সেন্ট পিটারস চার্চ তাঁরা দেখেছিলেন। গির্জার দৈর্ঘ্য ৬১৩ ফুট—সর্বোচ্চ শিখর ৪৪৮ ফুট—ভিতরে ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ। বড়দিনের সময়ে বিপুল জাঁকজমকের যে রূপ তাঁরা দেখেছিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু অভিভূত হলেও আত্মা ছিল অতৃপ্ত। স্বামীজী চাপা স্বরে শুধিয়েছিলেনঃ "এই যে গির্জায় অনুষ্ঠানের এমন বাহুল্য, ঐশ্বর্যের ব্যাপক আড়ম্বর—এখানকার কর্মকর্তারা কি সেই আনত খ্রীষ্টের অনুগামী, যিনি তাঁর মাথাটি রাখবার ঠাঁইটুকু খুঁজে পাননি?" স্বামীজী আরও বলেছিলেনঃ "বাইরের অনুষ্ঠানের সেইটুকুই মূল্য যেখানে সে অন্তরের পবিত্রতা বিকাশে সহায়তা করে। যদি জীবনের বিকাশে তা সমর্থ না হয়, তাহলে মায়া না রেখে তাঁকে চূর্ণ ক'রে ফেলো।"

খ্রীষ্টের প্রতিনিধি পোপের বাসস্থান—এগারো হাজার কক্ষসমন্বিত ভ্যাটিকান প্রাসাদের অন্যান্য বিতৃষ্ণাকর ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিন্তু আকর্ষক ঐশ্বর্যও ছিল—শিল্পের ঐশ্বর্য। সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিংয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রাবলী; বেদীপার্শ্বের দেওয়ালে একই শিল্পীর আঁকা "শেষ বিচারের" চিত্র। সেই সঙ্গে রয়েছে বটিচেল্লী, পেরুগিনো, সিনরেল্লীর চিত্রাবলী। আরও আছে—র‍্যাফেল ও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীর খিলানে আঁকা ছবি।

ভাস্কর্য গ্যালারিতে মেলে বিশাল সর্পের সঙ্গে যুদ্ধরত লাওকুনের অসাধারণ ভাস্কর্য—শিল্পরসিকেরা যার তুলনা খুঁজে পান না; এবং আরও বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সিঁড়ির পাশে দুই মিশরীয় সিংহের মূর্তি, ক্যাস্টর ও পলুক্সের দুই বিশাল প্রতিমূর্তি, মার্কস অরেলিয়াসের অশ্বারূঢ় ব্রোঞ্জমূর্তি। শেষোক্ত মূর্তিটিতে মাইকেল এঞ্জেলো-সুলভ জীবনাবেগ এতই বেশী যে, দেখলে মনে হয়, এখনি ছুটতে শুরু করবে। মার্কস অরেলিয়াসের মধ্যে দুর্ধর্ষ জীবনগতির সঙ্গে যুক্ত ছিল সুগভীর ধ্যানলীনতা—মূর্তিতে তাও প্রকাশিত। ক্যাপিটল প্রাসাদের মিউজিয়ামে মুমূর্ষু গ্ল্যাডিয়েটর-এর মূর্তি বিখ্যাত। এবং চিত্ররসিকেরা বারবেরিনি প্রাসাদের মধ্যে গুইদো রেনী-কৃত বিয়েট্রিস সেনসির পোরট্রেট স্বতঃই দেখে থাকেন, সেইসঙ্গে রেসপিগলিওসি প্রাসাদের দেওয়ালের সুন্দর চিত্রগুলিও। এই সকলের মধ্যে যথার্থ চিত্রসৃষ্টিরূপে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ভ্যাটিকানে র‍্যাফেল-অঙ্কিত যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক রূপান্তরের ছবি এবং ডিমিনিচিনো-অঙ্কিত সেন্ট জেরোমের চিত্র।

গির্জা ও মিউজিয়ামের অভ্যন্তর থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীজী সদলবলে চলে গিয়েছিলেন রোমের বিখ্যাত সমাধিভূমে. সেখানেও দেখেছিলেন মৃত্যুকে গরিমাময় ঐশ্বর্যে ভূষিত করবার রোমীয় প্রয়াস। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে—সামনে পিছনে উপরে নীচে বিস্তৃত বিশাল শান্তি। তাঁরা অনুভব করেছিলেন—সৃষ্টির আনন্দের মতোই বা ততোধিক

গভীর বস্তু হল—সৃষ্টি-সমাপনের মৌন প্রত্যাহার।

রোম থেকে নেপলস। সেখান থেকে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন। "স্বামীজী বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন খননের ফলে সদ্য-আবিষ্কৃত একটি গৃহের বিষয়ে, যার মধ্যে পূর্বের মতই বর্তমান আছে ফ্রেস্কো, প্রতিমূর্তি এবং ফোয়ারা।" পম্পেই স্বামীজীর মন লুটে নিয়েছিল।

(৫) ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। ১৯০০, আগস্টের গোড়া থেকে প্রায় তিনমাস তিনি ফ্রান্সে ছিলেন – যার অনেকটা সময় প্যারিসে কেটেছিল। এবারও তিনি মিঃ ও মিসেস লেগেটের অতিথি। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন "ধর্মেতিহাস সভায়" যোগ দিতে। "এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম"[৩২] -স্বামীজী লিখেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। লেগেট-ভবনে, যেখানে স্বামীজী ছিলেন, সেখানে মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে সমবেত হতেন ফ্রান্সের ও অন্যান্য স্থানের বহু বিদগ্ধজন। "মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন..। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিঃ লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ..."[৩৩] -এহেন মণ্ডলীতেও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কেন্দ্র-পুরুষ। এই সমাবেশে স্বামীজীকে কিছুকাল দর্শন করে, তারপর অন্যত্র গিয়ে, নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে ঐ প্রসঙ্গ লিখেছিলেন (তারিখ অনির্ণীত): "By this time I suppose Swami has all Paris at his feet."

নোবেল, অগস্ত রদ্যাঁ, প্রিন্সেস ডোরিয়া, ডিউক অব নিউক্যাসল, লেডী অ্যাংলেসী, স্যার হিরাম ম্যাকসিম, ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু।

এঁদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন রদ্যাঁর কথায়। "শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর" বলে কথিত রদ্যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়েছিল—এটা একটা চিত্তাকর্ষক সংবাদ. কিন্তু হায় সে আলাপের বিষয়বস্তু আমরা জানতে পারিনি। স্বামীজী কি রদ্যাঁর শিল্পশালায় গিয়েছিলেন? নিবেদিতার চিঠি থেকে এইটুকু পেয়েছি —ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা রদ্যাঁর প্রদর্শনীতে পরমানন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

মিস ম্যাকলাউডকে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা অ্যালবার্টার চিঠি থেকে বিবেকানন্দ-রদ্যাঁ সাক্ষাতের সংবাদ পাইঃ

"Swami is in a splendid mood last night and our little dinner was consequently a great success...He enjoyed seeing Paris, was meeting all artists and thinkers, Rodin etc."

একই চিঠিতে জনৈক নামকরা ফরাসী চিত্রশিল্পীর কাছে স্বামীজীর গমনের সংবাদ পাই, যদিও দুঃখের বিষয়, উক্ত শিল্পীর নাম অ্যালবার্টা চিঠিতে জানাননিঃ

"Swami will go to Brittany next Monday, as Thursday he goes to visit a french painter of note in the country."

স্বামীজী প্যারিসে থাকাকালে প্রায় প্রতিদিন সকালে প্যাট্রিক গেডেস ও মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস-প্রদর্শনীতে গিয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ হয়েছিল—প্যারিসবাসীর চোখে তা বহু স্থূল বর্বর বস্তুর সমাবেশ—কিন্তু প্যারিসবাসীর কিছু আকর্ষণ-বস্তুও প্রদর্শনীতে ছিল, যার কথা ফরাসী লেখক আঁদ্রে হ্যালীস তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন--সে জিনিসগুলি নানাদেশের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজী ঐ শিল্পদ্রব্যগুলি সযত্নে দেখেছিলেন।

স্বামীজীর অনুরাগীরা তাঁকে শিল্পের পটভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্যারিসের শিক্ষাকেন্দ্র সরবোন প্রাসাদে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন, ধর্মেতিহাস সভায়। সরবোনের বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটারের সভাগৃহে ৭৫ ফুট দীর্ঘ এক বিখ্যাত ম্যুরাল আছে, তার শিল্পী ফরাসী, নাম পুভি-দ্য-শ্যাভাঁনে; চিত্রের নাম "পবিত্র অরণ্য"; বিষয়—সরবোনের অধিষ্ঠাত্রী বসে আছেন বনমধ্যে সিংহাসনের উপরে—এবং পরিবৃত হয়ে আছেন সাহিত্য, বাগ্মিতা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীদের দ্বারা। এহেন পটভূমিকার উপরে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দ—সুমহান দৃশ্য!! উচ্ছ্বসিত কল্পনায় মিসেস লেগেট লিখে পাঠিয়েছিলেন মিস ম্যাকলাউডকেঃ

"Swami at the Sorbonne! enfin. What would I give for a

photograph of him with the Puvis de Chavannes background!" ৩৪

এইবারও স্বামীজী প্যারিসের লুভারে গিয়েছেন, এবং সেখানে গ্রীক-শিল্পের নিদর্শন খুঁটিয়ে দেখেন।

প্যারিস থেকে স্বামীজী নরম্যান্ডিতে সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর নির্মিত মঠ "মন্ট সেন্ট মাইকেল" দেখতে গিয়েছিলেন। আর্ক-এঞ্জেল মাইকেলের স্মরণে নির্মিত এই মধ্যযুগীয় মঠটিতে স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্তমান ছিল। সর্বোচ্চ স্থানটিতে নির্মিত হয়েছিল একটি উচ্চাঙ্গের গথিক রীতির গির্জা—তার চূড়ায় পাখা-মেলে-দেওয়া আর্ক-এঞ্জেলের মূর্তি। গির্জার পার্শ্বস্থ খিলানপথটির দুইপাশে ছিল একশো কুড়িটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ। এই খিলানপথটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক পরিবেশে, স্থাপত্যসৌন্দর্যে এবং স্থানমহিমায় মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "ধ্যানের পক্ষে কী অপূর্ব এই স্থান!"

(৬) কেবল লুভারে বা অন্য কোন মিউজিয়ামে নয়, গ্রীকশিল্পের নিদর্শন গ্রীসের বাস্তব পটভূমিকায় দেখার সুযোগও এইবারই কিছুদিনের মধ্যে ঘটে যায়। স্বামীজীর জীবনীতে পাই—প্যারিস থেকে বেরিয়ে স্বামীজী বিখ্যাত অপেরা-গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হিসাবে কিছুকাল বেড়িয়েছিলেন। ঐ ভ্রমণদলে আরও ছিলেন মঁসিয়ে জুল বোয়া, পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নী এবং জোসেফিন ম্যাকলাউড। এইবারই স্বামীজী ভিয়েনা যান, সেখানে তিনদিন থেকে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখেন, তার অন্যতম সানবোর্ন প্রাসাদ, যার প্রতিটি কক্ষ বিভিন্ন শিল্পরীতিতে ও শিল্পদ্রব্যে সজ্জিত ছিল। ভারতীয় ও চীনা-সজ্জায় ভূষিত কক্ষ দেখে স্বামীজী খুশী হন। ভারতীয় অলঙ্করণ তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন। মিউজিয়াম দেখেছিলেন—এবং সেখানে রক্ষিত ডাচ শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রাবলী।

তারপর গিয়েছিলেন কনস্টানটিনোপল। গ্রীক সম্রাটদের প্রাচীন অন্দরমহলে স্থাপিত মিউজিয়াম দেখেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল শবদেহ রক্ষার প্রস্তরনির্মিত 'অপূর্ব' আধারগুলি (sarcophage)।

গ্রীস তারপর—শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী এথেন্স। এথেন্সে স্বামীজী চারদিন কাটিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই শিল্পপরিব্রজ্যাকে ভাষারূপ দেবার চেষ্টা কেউ পরবর্তীকালে করেননি, যদিও এই ভ্রমণের অপূর্বত্বের কথা সঙ্গীরা বলেছেন। অগত্যা আমরা স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী থেকে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করে দিচ্ছিঃ

"কনস্টানটিনোপলে কয়েকদিন কাটিয়ে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা এথেন্সের

স্টিমার ধরলেন। পথিমধ্যে তাঁরা 'গোল্ডেন হর্ন' এবং মারমোরা দ্বীপ দেখলেন। শেষোক্ত স্থানে একটি গ্রীক মঠ দেখে তাঁর বিশেষ ভাল লাগে।. ঐতিহাসিক এথেন্স নগরী ও আশেপাশের সকল ধ্বংসাবশেষ স্বামীজী দর্শন করেছিলেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিজয়দেবীর মন্দির, পার্থেনন...অলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়োনিসিস থিয়েটার...ইলিউসিস। এই শেষোক্ত স্থানটি প্রাচীন ইলিউসীয় রহস্যের কেন্দ্রস্থল, এবং এটি স্বামীজীকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করেছিল। এথেন্স ত্যাগের আগে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭৬-৪৮৬ কালের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাগিলাডাস-এর ভাস্কর্য দেখতে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন শিল্পাচার্যের তিন মহান শিষ্য কিডিয়াস, মাইরন ও পলিকলিটাসের শিল্প-কর্মও দেখেছিলেন।"

আর এক পুরাতন পৃথিবী—মিশরে—অতঃপর তাঁরা গিয়েছিলেন। কায়রো মিউজিয়াম যে তাঁরা সযত্নে দেখেছিলেন, সেকথা না বললেও চলে; সেইসঙ্গে ফিঙ্কস ও পিরামিড। এই প্রসঙ্গে মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ

"স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, গ্রীস ও মিশরদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়েছিলাম। ... কী সুন্দর এই তীর্থ-যাত্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বামীজীর অজ্ঞাত কিছুই নাই। . খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তর্কের সময়ে স্বামীজী একখানি প্রাচীন দলিল অবিকল মুখস্থ বলিলেন, এবং একটি চার্চ-কাউন্সিলের তারিখ জানাইলেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও (খ্রীষ্টান শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাগ্মী যিনি) নির্দিষ্টভাবে বলিতে পারিলেন না।

"আমরা গ্রীসে ইউলিসিস দর্শন করিলাম। স্বামীজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন। আমাদিগকে বেদী ও মন্দিরগুলি দেখাইলেন; কোন্‌খানে কি হইত বুঝাইয়া দিলেন; পুরোহিতগণের উপাসনা ও পূজার বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রাচীন মন্ত্র ও গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।

"আবার একদিন মিশর দেশে—এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তিনি আমাদিগকে সুদূর অতীতে লইয়া গেলেন—ফিঙ্কসের ছায়ায় বসিয়া রহস্যময় ভাষায় কত ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন।"

স্বামীজীর জীবনী ও অন্যান্য সূত্র থেকে শিল্পকীর্তির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাই উপস্থিত করলাম। এই অসম্পূর্ণ রেখাচিত্রও পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে—শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর তুল্য বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় তৎকালীন ভারতবর্ষে অল্পই ছিলেন, কিংবা কেউ ছিলেন না।

শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের সংকলন

স্বামীজীর শিল্পবক্তব্য কোন্ কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত

স্বামীজী যে পরিমাণে শিল্প নিদর্শন দেখেছেন ও ঘরোয়াভাবে সেসব বিষয়ে বলেছেন, সেই পরিমাণে কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা লেখায় শিল্পপ্রসঙ্গ করেননি। সেই কারণেই এতদিন স্বামীজীর মনোজীবন ও ভাবজীবনের এই দিকটির উপরে উপযুক্তভাবে আলোকসম্পাত করা হয়নি। তবু নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর শিল্পধারণার একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা লাভ করেছি। স্বামীজী ধর্মবেত্তা ও ধর্মপ্রচারক ; তাই ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বিষয়েই তিনি প্রধানত কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন। তা হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যখন দিতে গেছেন তখন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা না বলে পারেননি। যেমন ধরা যাক, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মেমফিস শহরে "ভারতের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে ভারতের স্থাপত্যশিল্পের গৌরবের কথা তিনি বলেছিলেন। "অ্যাপীল অ্যাভালেঞ্চ" পত্রিকার ২১ জানুয়ারির (১৮৯৪) বিবরণের মধ্যে ছিলঃ

"His (Swamiji's) description of the ancient mausoleums and temples were beautiful beyond comparison, and goes to show that the ancients possessed scientific knowledge far superior to the most expert artisans of the present day."[৩৫]

খুবই দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মন্দিরাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর ঐ "অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা"র কোন অংশই উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণে নেই।

ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে রমাবাঈ-গোষ্ঠীর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কুৎসার বিরুদ্ধে স্বামীজী যখন আমেরিকায় একা প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন অনেক সময়েই তাঁকে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দানের বিষয়ে বলতে হয়েছে। ঐ ধরনের একটি বক্তৃতার রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫-এর "ব্রুকলিন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন" পত্রিকায়। বক্তৃতার মধ্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, সংগীতে, এমন কি খেলাতে পর্যন্ত ভারতের দানের কথা তিনি বলেছিলেন—শিল্পদ্রব্যের কথাও অবশ্যই বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল উল্লেখের অধিক কিছুই পাই না সংবাদপত্রের বিবরণে।[৩৬]

সানফ্রানসিস্কোয় স্বামীজী "ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান"—এই নামেই একটি বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু অতি সামান্য কয়েক লাইন রিপোর্টের

অতিরিক্ত কিছু আমাদের ভাগ্যে এক্ষেত্রেও জোটেনি। যেটুকু পাচ্ছি তার মধ্যে আছে, স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার পর বলেছিলেন—এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকার যুগ, এবং ভারত একদিন সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করেছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় ভারতবাসীকে, তার জন্য তাদের শিল্প ও সাহিত্য নিছক অনুকরণের বেশী কিছু নয়।[৩৭]

স্বামীজীর শিল্প বিষয়ের বক্তব্য প্রধানত পাই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ডায়েরী, প্রিয়নাথ সিংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা, স্বামীজীর কয়েকটি চিঠি এবং 'পরিব্রাজক', "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য থেকে। শিল্প সম্বন্ধে যখনই সুযোগ ঘটেছে তখনই স্বামীজী আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বেও স্বামীজী কতখানি উৎসাহের সঙ্গে শিল্পালোচনায় যোগ দিতেন, তা "কাশীধামে বিবেকানন্দ" গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়।[৩৮]

ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক : শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পবোধ

স্বামীজীর শিল্প-বক্তব্য আলোচনার আগে এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য করবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে, অন্তত সে প্রশ্ন কেউ কেউ করেছেন। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে জনৈক ইউরোপীয়ান পরিষ্কার বলেছিলেনঃ স্বামীজীকে তিনি ছবি সম্বন্ধে কখনও সঠিক বিচার করতে দেখেননি, কারণ ছবি ইন্দ্রিয়-

জগতের ব্যাপার, আর স্বামীজী অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষ। উক্ত ইউরোপীয়ান অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত খুব ভাল বুঝতেন। প্রিয়নাথ সিংহ "প্রবুদ্ধ ভারতে" এক প্রবন্ধে[৩৯] উক্ত ইউরোপীয়ানের মতের প্রতিবাদ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন— স্বামীজী শিল্পে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলেননি— বিবেকানন্দের চিত্রবিচার সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের মনঃপূত হতে পারে না, যেহেতু তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য বর্তমান। উক্ত ইউরোপীয়দের বক্তব্যের আর একটি অসম্পূর্ণতার কথাও প্রিয়নাথ সিংহ বলেননি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিল্পের যতখানি বিরোধের কথা উক্ত ইউরোপীয় বলেছেন ততখানি বিরোধ সত্যই ছিল না ; তার প্রমাণ বৌদ্ধ মঠের ও সংঘারামের শিল্পনিদর্শন। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেকথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও কি বহুলাংশে সত্য নয়? গির্জাগুলির শিল্পনিদর্শন কোন্ সাক্ষ্য দেয়?

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ বুঝতে বিবেকানন্দের পক্ষে ইতিহাসের মধ্যে পিছুহটার প্রয়োজন ছিল না। যাঁকে দেখে স্বামীজী সর্বোচ্চ ধর্ম কি, তা শিখেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুগভীর শিল্পানুভূতিতে সর্বদা স্পন্দিত হতেন না?

স্বামীজী বলেছিলেন, "ওরে আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অংগ। ঠাকুর নিজে কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই আর্টিস্ট ছিলেন, সে বিষয়ে 'শিল্পদীপংকর' নন্দলাল বসুর উক্তি অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈয়ারী করতেন। শুধু idealist নয়, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আংগিকের (technique) বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভাব ও গড়ন (form) ভুল হলে তা ঠিক করে দিতে পারতেন। মথুরবাবু একবার তাঁর করা শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালী মন্দিরে পরে মাকে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেলে তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত জুড়ে দিয়েছিলেন।

"দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরে থাকতেন তার বারদিকের উত্তর দেয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল। ৪′×৫′ আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ (স্বামীজীর সহপাঠী) উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে একটি আতাগাছ আর তাতে টিয়া পাখি সব বসে।

ঐ ছবি দুটি কাঁচ দিয়ে দেয়ালে ফ্রেম করে দেবার জন্য রামলালদাকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি, উহার উপর চুনকাম করে ঢেকে ফেলা হয়েছে।[৪০] তাঁহার ছেলেবেলায় কামারপুকুর থাকার সময় ঐরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪১] দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় guide (চালনা) করতেন। তিনি প্রতিমার উপরে চালচিত্র আঁকার ভারও কখন কখন নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে

সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজশিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন। ছবি দেখতে বড় ভালবাসতেন, কাহারও ভাল ছবির সংগ্রহ থাকলে দেখবার জন্য ব্যগ্র হতেন।

"আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হল, তাঁহার প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষায় কাজল-কাল মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গী হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্পবিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার তিনি সবই জানতেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁহার নিকট প্রথমে শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁহার প্রতিভার অন্ত ছিল না। ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ (observe) করতেন। একবার স্বামীজীর observation -এ চাতক পাখি ও চামচিকের মধ্যে তফাত সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত। ... স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট শিল্পবিষয়ে অনেক জেনেছেন। আর সিস্টার (নিবেদিতা) পরে স্বামীজীর কাছ থেকে (aesthetics) সৌন্দর্যবোধ, রুচি বিজ্ঞানও শিখেছেন।"[৪২]

বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিল্পদৃষ্টির চমৎকার তুলনাও নন্দলাল করেছেন ঃ

"শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone -এর মত, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের) ছিল aesthetics পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ (অনুভবের) বিকাশ।

দুজনারই ছিল aesthetics (অনুভবের) ও জ্ঞানের পূর্ণতা। কেবল পথ চলার process ভিন্ন রকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরেরই অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশী উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ঐ পথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী; জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। (শিল্পীদের মায়া নিয়েই কারবার।) তবে অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে, শিল্পীর পতন হবার সম্ভাবনা। আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব ও রসের সাধনে পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে prophet-দের আলাদা কথা। তাঁদের সবই দুর্জ্ঞেয়।"[৪৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু মন্তব্য

শিল্পালোচনায় স্বামীজীর মূল কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের উল্লেখ করতে পারি।

ইউরোপীয় শিল্পকলার ব্যাপারে স্বামীজী স্বভাবতই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাচ শিল্প তাঁকে খুশী করতে পারেনি। শেষোক্ত বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলার সঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"ভিয়েনা-শহরে... চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক ; ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বা'র করবার চেষ্টা বড়ই কম ; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধ'রে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকারজনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান!!"[৪৪]

সুবিখ্যাত ডাচ-শিল্প এবং তার অধিকতর খ্যাতনাম্নী মাংসল মহিলাগণ সম্বন্ধে স্বামীজীর সাপট মন্তব্য অনেককেই ব্যস্ত করবে।

ইউরোপের শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপারে স্বামীজী, এককথায়, ফ্রান্সের প্রেমে

পড়ে গিয়েছিলেন। কোন নির্দিষ্ট শিল্পসৃষ্টি নয়—সর্বাঙ্গীণ ফরাসী শিল্প-সংস্কৃতির অত্যুচ্চ প্রশংসাই তিনি করেছেন। উল্টোপক্ষে জার্মানী বা ইংলন্ড এইক্ষেত্রে তাঁর উচ্চহাস্য-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর তুলনা এইভাবে করেছেন ঃ

"কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস ; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্যজগতে আর নগরী নাই ; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্প-সুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ; জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ ; জার্মানিব রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসী সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। ...জার্মান, ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্চেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ী দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে!"[৪৫]

ফ্রান্সের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ভোগবিলাসের তুলনা করে সালঙ্কার তীব্র পরিহাসের সঙ্গে স্বামীজী একবার যা বলেছিলেন, তা শিল্পসংস্কৃতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য ঃ

"অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির—ময়লা সোনার পাতমোড়া ; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরেব পেখমধরা নাচে যে তফাত অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।"[৪৬]

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—তাঁর কাছে ইংরেজি শিল্প, যা সমস্ত ইউরোপের উপহাসের বস্তু—কোন্ চোখে ধরা পড়বে, তা না বললেও চলে। বিলেতী কলাশিল্প সম্বন্ধে অতীব অশ্রদ্ধার মন্তব্য তিনি করেছেন। ইংরেজ জীব-জন্তু আর ল্যান্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাদের

জীবনে যেটুকু সৌন্দর্যবোধ, তা এসেছে প্রাচ্যের সংস্রবে। ইংরেজ-জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি, আর ভারতের আর্ট—স্বামীজী বলতে চেয়েছেন।

ভারতের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তার মধ্যে মধ্যযুগের মুঘলশিল্পের প্রতি তাঁর সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কুড়ি বছর যিনি কার্যত ভারতসম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই "জগতের আলো" নূরজাহানের অপূর্ব আকর্ষক বর্ণনা দেবার সময়ে স্বামীজী তাঁর শিল্পপ্রীতির কথা জানাতে ভোলেননি। "নূরজাহানের রূপকে ধারণ ক'রে সোনার মূল্য গেছে বেড়ে"—নূরজাহানের মুখাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার উপরে জাহাঙ্গীর কথাগুলি লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন- সেই নূরজাহানের ও জাহাঙ্গীরের শিল্পভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেনঃ

"নূরজাহানের আধিপত্যকালের মধ্যেই স্থাপত্যের নব্যরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আকবরের লালপাথরের পুরুষোচিত বলিষ্ঠ সৌধের স্থান গ্রহণ করল রমণীয় স্থাপত্যরীতি—এল শুভ্রমর্মর, তাতে খচিত হল নানা মূল্যের প্রস্তর; অমসৃণ রক্ত প্রস্তরের স্থানে বহুমূল্য মাণিক্য অলঙ্কৃত দেওয়াল; মধ্য এশিয়ায় মালভূমির বলবীর্যের পরিবর্তে পারস্যের সুচারুকোমল লাবণ্য। পরবর্তীকালের জন্য এই রীতির দান—তাজমহল এবং আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের মর্মর প্রাসাদগুলি। যমুনার অপর পারে ইতমদউদ্দৌলা নামে যে চমৎকার সমাধিসৌধটি রয়েছে, তা নূরজাহান তাঁর পিতার স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন। নূতন স্থাপত্যরীতির প্রথম সৃষ্টিগুলির এক একটি। শোনা যায়, এর গায়ে পাথরগুলি বসিয়েছিল নূরজাহানের ক্রীতদাসেরা। এই প্রাথমিক অসম্পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী তাজমহলের পূর্ণ নিখুঁতরূপের তুলনাব ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক হবে। তাজমহলে একটি গোলাপের পাপড়ির চারু বর্ণরূপ ফোটাতে চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন ধরনের লালপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। নৈপুণ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি।

"আগ্রা প্রাসাদে সমনবুর্গ নামে নূরজাহানের নিজ মহলটি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করা হয়েছিল। শিল্পকলার তিনি যথার্থ পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।"[৪৭]

স্বামীজী স্বভাবতই মুঘলযুগে শিল্পপোষ্টারূপে অনতিক্রান্ত ভূমিকা যাঁর, সেই সাজাহানের মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন। মুঘল রাজাদের শিল্পপ্রীতির সম্বন্ধে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ প্রশংসার কিছু বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছেনঃ "তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের বা মোঘলবংশের ইতিহাসের সারসঙ্কলন

করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্মঋতুটিতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটি ক্ষীণালোক স্থান—তারপর একটি সমাধি'—এইরূপে বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, আহা তিনিই মোগলকুলের গৌরব-স্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যচেতনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তিনি নিজেও আবার শিল্পী। আমি নিজে তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি—সেটি ভারতের অন্যতম শিল্পসম্পদ। কী প্রতিভা!"[৪৮]

তাজমহলের ভাবসত্যের কথা স্বামীজী অন্যত্রও বলেছেন, আমরা পরে উদ্ধৃত করব। আলোয়ারের স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর সমাদরের পরিচয় পরে দেব।

হিন্দু ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দ

হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা স্বামীজীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাই। এক্ষেত্রেই স্বামীজী অংশত পথিকৃতের মর্যাদা পাবার যোগ্য। স্বামীজীর নিজের চিন্তার মধ্যে কিছু বিবর্তনও ঘটেছিল। সাবধানে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

গোড়ায় হিন্দু ও গ্রীক—এই দুই শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলেছেন দেখে নেওয়া উচিত। তারও আগে জানাতে পারি, স্বামীজী নানা প্রসঙ্গে বহুবার হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তর্মুখ অধ্যাত্ম-ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দুসভ্যতায়, বহির্মুখ ঐহিক ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীক-সভ্যতায়। মাদ্রাজে ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি মাসে "আমাদের উপস্থিত কর্তব্য" নামক বক্তৃতার সূচনায় হিন্দু ও গ্রীকসভ্যতার বিশেষ চরিত্রের পিছনে কোন্ নৈসর্গিক প্রভাব ছিল, তা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে কি ধরনের সৃষ্টি উভয় ভূমিতে ঘটেছিল তাও বলেছিলেনঃ

"পৃথিবীতে আশ্চর্য দুই জাতি দেখা গিয়েছে; তারা একই উৎস থেকে উত্থিত হয়েও ভিন্ন পরিবেশে স্থাপিত হয়ে, ভিন্ন ঘটনাচক্রে নিজেদের জীবন-

সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে নিজস্ব বিভিন্ন পন্থায়। আমি এখানে প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথাই বলছি। উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমালয়ের দ্বারা আবদ্ধ, প্রবহমান তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মতো স্বচ্ছসলিল নদীধারার দ্বারা সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত, চারিদিকে অনন্ত অরণ্য, যেন পৃথিবীপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—এই পরিবেশে অবস্থিত থেকে ভারতীয় আর্যগণের মন অন্তর্মুখ হয়েছে ; তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক এই সুমহান প্রাকৃতিক পরিবেশের অংকভুক্ত হয়ে স্বতঃই আত্মানুসন্ধানপ্রিয় হয়েছিল। নিজ মনের বিশ্লেষণই ছিল ভারতীয় আর্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে গ্রীকরা পৃথিবীর যে অংশে উপনীত হয়েছিল, সে স্থানের নিসর্গপ্রকৃতি যতখানি না সুমহান, সুগম্ভীর, ততোধিক সুন্দর—দ্বীপপুঞ্জের মনোরম ভূখণ্ডগুলির সহজ অথচ বদান্যরূপ—সেই পরিবেশে স্বভাবতই বহির্মুখ হয়েছিল তাদের মন। তারা বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল বিশেষভাবে।"[৪৯]

হিন্দুর অন্তর্মুখ মনঃস্বভাবকে তার সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে দেখা যায় এবং সমগ্র প্রাচ্যভূমে তার প্রভাব রয়েছে। অপরদিকে গ্রীসের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলেছেনঃ

"ইংলন্ড, শুধু ইংলন্ড কেন সমগ্র ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সবকিছুর মধ্যেই গ্রীসের কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সৌধ, তার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম—সর্বত্রই গ্রীসের ছাপ। ইউরোপের কলাশিল্প ও বিজ্ঞান—সবই গ্রীসের ছায়ায় সৃষ্ট।"[৫০]

গ্রীকশিল্প ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা স্বামীজী নিম্নোক্ত প্রকারে করেছেনঃ

"গ্রীক আর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য আদর্শকে প্রতিফলিত করা। গ্রীকশিল্পের শক্তি ব্যয়িত হয়, ধরা যাক, একখণ্ড মাংসের যথাযথ চিত্রণে; সেকাজে তার এমনই সাফল্য যে, একটি কুকুর পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে সেটিকে আসল মাংস বলে মনে করে এবং কামড়াতে যায়। কিন্তু প্রকৃতির এই নিছক অনুকরণে গৌরব কোথায়! কুকুরের সামনে একখণ্ড আসল মাংসই ছবির বদলে ফেলে দাও না কেন!

"অপরদিকে আদর্শকে—অতীন্দ্রিয়কে—পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়। তার পরিণতি বিকট সব মূর্তি রচনায়। খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই

সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।"[৫১]

শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজী বস্তুবাদী নন, আবার বিশুদ্ধ রসবাদী বা কলা-কৈবল্যবাদীও নন—তিনি ভাববাদী। জীবনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য; জীবনের অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র শিল্পেরও থাকবে তাই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সুতরাং তাঁর মতেঃ "স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাত হল, প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি নিছক একটি কাঠামো, প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী। কি পরিমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে, তার উপরে কোন জিনিসের মূল্য নির্ভর করে।"[৫২]

স্বামীজী গ্রীকশিল্পের সমঝদার ছিলেন আমরা জানি, এবং গ্রীকস্থাপত্য যে ক্ষেত্রবিশেষে ভাবপ্রকাশক, এও তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয় স্থাপত্যে ঐ ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্য অধিকতর।[৫৩]

ভারতীয় শিল্প এবং গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না। ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সর্বব্যাপক পরিচয়ের অভাবে গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা ছিল—মূর্তিশিল্পের দিকে ভারতের চেয়ে গ্রীস অগ্রসর। আগেই বলেছি, তিনি ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পীঠস্থান উড়িষ্যায় যাননি। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবজাত পূর্বোক্ত ধারণাকে তিনি পরে সংশোধন করেন। ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারি মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজী কিছু মন্তব্য করেছিলেন, তার অংশবিশেষ আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই দরকারীঃ

"পাশ্চাত্যের অন্য সব কিছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাধিক উপভোগ করেছি। পম্পেই দেখার পরে আমি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি বাদ দিলে বাকি সব কিছুই তাদের ছিল—আর আধুনিকদের চেয়ে অনন্ত গুণ বেশী তাদের শিল্পবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা।

"মিস লককে বল, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—'মানবমূর্তির ভাস্কর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যেসব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাতে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয়নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে কোনও গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকান্ড নারীকঙ্কাল—যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা ভয়ঙ্কর ও পীড়াদায়ক। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন অলিন্দের একটি নারীমূর্তি একেবারে ভেনাস তে মেডিচির মতো। এইরকম আরও। অবশ্যই মনে রেখ, মূর্তিদ্বেষী মুসলমানেরা প্রায় সব কিছু ধ্বংস করে ফেলেছে। তবু যা আছে তা সমগ্র ইউরোপের ধ্বংসস্তূপ জুড়লে যা হয়, তারও চেয়ে বেশী। আমি আট বছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিই দেখা হয়নি।

"ভগিনী লককে বল, ভারতের অরণ্যের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে,

দেয়। প্রকৃতির লজ্জাগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের দু-একটি ঝলক শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে—তাকেই স্থায়ী রূপ দেয় সে। এই হল শিল্পীর আসল কাজ। ঐ ভাস্কর্যটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর নয়নের আরাধনা-দৃষ্টি; তার শরীরের আনতভঙ্গি, মাথার হেলানো ছন্দ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থানের রূপ—সব কিছুই শিল্পী ও তার দেবীর পবিত্র সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কের পূর্ণরূপের ধারণা করবার পরেই ভাস্কর এই মাস্টারপিস্ সৃষ্টি করেছেন।"

রণদাপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময়েও প্যারিস প্রদর্শনীর ঐ ভাস্কর্যটির কথা স্বামীজী বলেছিলেন।

ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থিননকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন—একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটি ঐ কল্পনার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের প্রকাশক। পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী ইত্যাদি ভারত-সারাসেন স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।"[৫৪]

এখানে সময়ের একটু হিসাব নেওয়া দরকার। ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারিতে স্বামীজী যখন ঐ চিঠি লিখছেন, তখন তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্যভ্রমণ শেষ করে ভারতের পথে; এখনও দেশে পৌঁছাননি। সুতরাং নতুন করে এদেশের শিল্পনিদর্শনগুলি পরীক্ষা করবার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবু ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর মত বদলাল কি করে—কি করে সেগুলিকে তিনি গ্রীকমূর্তির সমতুল মনে করলেন? তা কি ফার্গুসনের গ্রন্থের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের ফলে? ফার্গুসনের বই কি তিনি আগে পড়েননি? ঐ চিঠিতে অন্য বিশেষজ্ঞদের কথাও তিনি বলেছেন—তাঁদের মধ্যে কি "Antiquities of Orissa" গ্রন্থের ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন? উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে ঐ বিখ্যাত গ্রন্থও কি তিনি পড়েননি? স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় কিন্তু দেখেছি, তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থ পড়তে দেখেছিলেন। আমাদের কি ধরে নিতে হবে—বিদেশের মিউজিয়ামে বিদেশীয় নিদর্শনের পাশাপাশি এদেশীয় শিল্প নিদর্শন দেখে (এবং তার বিষয়ে আরও অবহিত হয়ে) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল? স্পষ্ট উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।[৫৫]

এইবার একটি প্রশ্ন করা চলে—ভারতীয় শিল্পে গ্রীকপ্রভাবের অতিরঞ্জিত ইউরোপীয় থিওরির বিরুদ্ধে স্বামীজীর অধুনাখ্যাত মনোভাব কখন গঠিত হয়েছিল? ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে ন্যূন নয়, এই ধারণার উদ্ভবের কালেই কি তা জেগেছিল—যখন তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা দেখব, পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি যাঁরা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্বামীজীর মতের অনুবর্তী হয়েছিলেন।

নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি থেকে জাতীয়তার বৃদ্ধি ঘটে—পরাধীন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদীরা পছন্দ করবেন, এমন আশা করা যায় না। তাই ভারতীয় পুরাকীর্তির পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানানোর প্রয়োজন হয়েছিল—এইসব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যেরই দীর্ঘ বিস্তারিত হস্ত, অর্থাৎ—ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু মিশ্র শিল্প, যার নাম গান্ধার শিল্প, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুবিধা করে দিয়েছিল। ভারতশিল্পে গ্রীক-প্রভাব খণ্ডনের চেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ নাম- অসাধারণ এক মনস্বীর নাম—ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[৫৬] রাজেন্দ্রলালই বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতশিল্পের উপরে গ্রীকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টা করে-ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ নন (যেমন অনেকের ধারণা), এবং সেকাজ তিনি করেছিলেন—স্বামীজী যখন নিতান্তই বালক।

স্বামীজী এইক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আগেই দেখেছি, স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, তিনি কুড়ি-একুশ বছরের নরেন্দ্রনাথকে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' বইটি পড়তে দেখেছিলেন। এই বইয়ের

মধ্যেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকটি বইয়ের মতোই গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খন্ডনের চেষ্টা করেছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে চোখের সামনে রেখেই স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে আমরা সক্ষম হব। প্রথম কারণ, গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খন্ডন করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যুক্তি এনেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না; রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য সেই শূন্য পূরণের কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই উপস্থিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, আমরা এও দেখব, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কোথায় তা করেছিলেন, তাও জানা দরকার।

স্বামীজী কর্তৃক হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা

রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন, স্বামীজী সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। হিন্দুস্থাপত্যের উদ্ভবে গ্রীকপ্রভাবতত্ত্বকে সাফল্যের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দূর করেছিলেন (এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছি) এবং সেই সিদ্ধান্তকে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে ইউরোপীয় ধারণাকে তিনি শেষ পর্যন্ত মান্য করায় তাঁর পক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্রে, বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গ্রীসের আদি প্রভাবের কথা তখন বহু কণ্ঠে কথিত হচ্ছিলই। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে, রাজেন্দ্রলালের ঐ বীরত্বপূর্ণ ও পান্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে প্রায় কোন মূল্যই পায়নি, কারণ প্রথমত, দেশীয় পন্ডিতদের মধ্যে এইসব বিষয়ের চর্চা প্রায় ছিল না, দ্বিতীয়ত, চর্চা যেখানে ছিল সেখানে শ্বেত পন্ডিতমহাশয়দের প্রতি ভক্তিও অটুট ছিল।[৫৭] এই

পরিস্থিতিতেই স্বামীজী ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীকপ্রভাবতত্ত্বের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সেকাজ আদি কাজ না হলেও এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে অতীব প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছিল, এবং আরও বড় কথা, ঐ ধারণাটি তিনি এমন একজন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের সময়ে উক্ত ধারণার পক্ষসমর্থনে নেত্রীত্ব করবেন। আমি ভগিনী নিবেদিতার কথাই বলছি।

এবং স্বামীজী আরও এগিয়েছিলেন। তিনি একেবারে উল্টোপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি গ্রীকশিল্পে প্রাচ্যপ্রভাব পর্যন্ত কল্পনা করছিলেন, দ্বিতীয়ত, হিন্দুভাস্কর্যকে গ্রীকভাস্কর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। এটা চাকার একেবারে উল্টোপাক, এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক বক্তব্য। প্রথমোক্ত বক্তব্যটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের আংশিক স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। স্বামীজী যে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন, তাকে এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

স্বামীজী তাঁর শেষোক্ত ধারণাগঠনের সময়ে অনেককেই ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও ছিলেন। গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনযুদ্ধে ভারতপক্ষে মহারথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি ভাবতে পেরেছিলেন—উল্টো দাবি করাও সম্ভবপর—ভারতের কাছেই গ্রীস ঋণী? ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৃপাপূর্ণ প্রশংসাজীবিত ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দাবি করবে, এও কি তাঁর কল্পনায় এসেছিল? রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্তত শেষোক্ত দাবির পক্ষে ছিলেন না, এবং আমাদের অনুমান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কিছুদিনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবরূপে বর্তমান ছিল। আমরা আগে দেখেছি, গ্রীকভাস্কর্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্বামীজীর মনে বহুদিন বজায় ছিল, যেকথা তিনি দুঃখের সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত ৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ তারিখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন।

স্বামীজীর সর্বশেষ ধারণার প্রথম প্রকাশ কবে দেখা যায়? এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তদনুযায়ী ১৮৯৬-এর ২৮ মে তারিখে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে লন্ডনে আলোচনাকালেই স্বামীজীকে তাঁর ঐ ধারণার কথা প্রথম বলতে দেখা গেছে। স্বামীজী তাঁর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। তারই কিছু অংশঃ

"ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধ-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীকসৃষ্টির কিছু ঐক্য আছে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল—তাই বলা যায়, হয়তো ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষ্ন উত্তর দেন—'যদি গ্রীকদের ভারতে নিছক উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়, গ্রীকশিল্প ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোন সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী, আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্ঘাটনে ইচ্ছুক—তার জন্য বাস্তবতাকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শারীর সংস্থানের খুঁটিনাটির রূপায়ণে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোন মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী। ভারতে প্রাচীনকালে প্রতি ভাস্করই নিপুণ মিস্ত্রী; গয়া জেলায় তার সাক্ষ্য এখনও মিলবে। গয়ার কিছু মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে ব্রাহ্মণজাতির ভাস্কর-মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, যাদের বংশধরেরা এখনও সেই জেলার গ্রামে বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যদি গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগুলি সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিতে? গ্রীকরা আসলে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই, শিল্প বা বিজ্ঞান শেখাতে নয়। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সব সময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীকস্থাপত্য যা করেনি'।"[৫৮]

ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প কিভাবে ভাবপ্রকাশ করে থাকে, সে বিষয়ে স্বামীজী ঐ সঙ্গে আরও যা বলেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহের বিবরণে তার রূপঃ

"ভারতে স্থপতি, মুসলমান স্থপতিও, কোনও একটি ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনও। রাজপুতানায় ভ্রমণকালে স্বামীজী আলোয়ারের একটি মিনারের ভাবপ্রকাশক অনবদ্য সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন। তাজমহল দেখে

বলেছিলেন, এই মর্মরের যে-কোন অংশ পেষণ করলেই রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়বে। লোকে বলে, কলকাতা নাকি প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাড়ীগুলো বাক্সের মতো—একের পর এক সাজানো—ভাব বলে একটুও কিছু নেই। রাজপুতানায় এখনও খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোন ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে, তা যেন হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে তার উদার আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য; মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে, তার ভিতর-বাহিরে দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটীর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ করছে—গৃহস্বামীর মনটিকে সে যেন খুলে ধরেছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য আর মাত্র দেখেছি ইতালিতে।"[৫৯]

প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেনঃ "ইতালীয় শিল্পের প্রতি স্বামীজীর গভীর অনুরাগ ছিল।"[৬০]

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে স্বামীজীর এই আলোচনা কবে হয়েছিল? স্বামীজীর স্বদেশে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৮৯৭-৯৮-এর মধ্যে কিংবা দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৯০১-১৯০২-এর মধ্যে কোন সময়ে। আলোচনাকালের উল্লেখ প্রিয়নাথ করেননি। কিন্তু প্রথম পর্বেও হতে পারে, যদিও দ্বিতীয় পর্বেই হওয়া সম্ভব, কারণ দ্বিতীয়বার বিদেশ-ভ্রমণের সময়েই তিনি গ্রীকস্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কেবল মিউজিয়ামে নয়, একেবারে গ্রীসের ভূমিতে দাঁড়িয়েই দেখেছিলেন। কিন্তু তার আগেই যে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বদলাতে আরম্ভ করেছে, তা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলোচনায়, ১৮৯৭-এর জানুয়ারির গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠি থেকে দেখতে পাই।

ভারতশিল্প ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিভাবে সর্বশেষ পরিণতি পেয়েছিল, তার কিছু পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার রচনায় পাওয়া যায়। স্বামীজী ৫ নভেম্বর, ১৮৯৭ লাহোরে পৌঁছে দশ-বারো দিন ছিলেন। এইকালের মধ্যে তিনি লাহোর মিউজিয়াম দেখেন—সেখানে গান্ধারশিল্প-নমুনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, এবং তার ফলেই স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—ভারতের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ১৪ জুন, ১৮৯৮-এর ডায়েরীতে পূর্ববৎসরে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে লিখেছেনঃ

"স্বামীজী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন।

সেগুলিকে তিনি নিশ্চয়ই পূর্ববৎসর লাহোরের মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পবিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনোদিন গ্রীসের চরণতলে বসিয়াছিল এই ইউরোপীয় থিয়োরী খন্ডন করিতে তিনি ঘৃণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।"৬১

স্বামীজীর মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট কালনির্দেশ উপরে পেলাম। এর সওয়া দু-বছর পরে স্বামীজী প্রকাশ্যে পন্ডিতদের সভায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন। তা করেছিলেন ১৯০০-এর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় "প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায়"।

প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায় স্বামীজী কোন রচনা পাঠ করেননি, মৌখিক বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তিনি স্বয়ং লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা-ই এতদিন আমাদের অবলম্বন ছিল। সম্প্রতি স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ "প্যারিসে বিবেকানন্দ" পর্যায়ে কিছু গবেষণা করেছেন, এবং ধর্মেতিহাস সভায় মুদ্রিত বিবরণী থেকে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ উদ্ধৃতও করেছেন, কিন্তু শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও নতুন কিছু পাই না। অথচ শিল্পবিষয়ে উক্ত সভায় কথিত স্বামীজীর বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এক্ষেত্রে উপায়ান্তরহীন হয়ে স্বামীজীর পাঠানো বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করতে হচ্ছে। স্বামীজী উক্ত সভায় কেবল শিল্পের উপরে নয়, ভারতীয় সকল বিদ্যার উপরেই গ্রীক-প্রভাব আছে, এই তত্ত্বের নিরাকরণ করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, অনেক ভারততাত্ত্বিক ইউরোপীয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বামীজী কার্যত চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর তীব্র মনোভাবের কারণ —তিনি ইউরোপীয় পান্ডিত্যের মধ্যে কোন সংযমের লক্ষণ তো দেখেননি, উপরন্তু নতুন বিসদৃশ দাবি উপস্থিত করার প্রগল্‌ভতা দেখেছিলেন। যেমন, পূর্ববর্তী একটি সভায় ওপার্ট নামক জনৈক জার্মান পন্ডিত শালগ্রাম সম্বন্ধে "অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রাসঙ্গিক" যৌনব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, যার খন্ডনও স্বামীজী করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা কিভাবে ভারতের ঘাড়ে নির্বিচারে গ্রীসকে চাপাতে ব্যস্ত সে সম্বন্ধে স্বামীজী উক্ত "পারি প্রদর্শনী" নামক রচনায় লিখেছিলেনঃ

"কতকগুলি পাশ্চাত্য পন্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে,

জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীক সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতিসাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া!!" ৬২

যেসব যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রীক-প্রভাব কল্পনা করেন, সেইসব যুক্তির ফাঁকি দেখিয়ে দেবার পরে স্বামীজী লিখেছেনঃ

"ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্যনাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি (আপতিত?) হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কি না? যাঁহারা উভয় ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা-জগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটকের আর এক।

"আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

"শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোন হিন্দু কোনও কালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

"তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীক প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।" ৬৩

শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর রিপোর্টে মাত্র একলাইন থাকলেও স্বামীজী নিশ্চয় ব্যাপারটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন—কি বলে-ছিলেন তা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই, এবং অনুমানের ভিত্তি ইতিমধ্যেই আমরা রচনা করে এসেছি—রাজেন্দ্রলালের যুক্তি ও স্বামীজীর অন্যত্র-প্রকাশিত মনোভাবের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী যখন প্যারিসের ধর্মেতিহাস সভায় উপরিকথিত বিষয়ে বলছিলেন, ঠিক তারই কাছাকাছি সময়ে পুনশ্চ লুভারে গিয়ে গ্রীকশিল্পকলার নিদর্শন-গুলি পরীক্ষা করছিলেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ সম্বন্ধে তাঁর

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোট দেওয়া আছে—খুবই দুঃখের বিষয়, ঐ নোটকে পূর্ণাঙ্গ রচনার আকার তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। এই ডায়েরী-নোটের মধ্যেই দেখা যায়, স্বামীজী গ্রীকশিল্পের একেবারে প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যপ্রভাব অনুমান করেছেন।

স্বামীজী উক্ত নোটে লিখেছেনঃ "(লুভার) মিউজিয়াম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম।"[৬৪] এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হল প্রাচীন অজ্ঞাতকাল থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ পর্যন্ত; দ্বিতীয় পর্ব ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত; তৃতীয় পর্ব ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে পরবর্তীকাল। •

প্রথম পর্ব অর্থাৎ ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের গ্রীকশিল্পকে 'মিসেনি' শিল্পের কাল বলা হয়। স্বামীজী বলতে চান—এই প্রথম পর্ব অর্থাৎ মিসেনি পর্বে গ্রীকশিল্প প্রাচ্যপ্রভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের "আর্চেনি রাজ্য, সন্নিহিত রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেইসঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এই-রূপেই প্রথম গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব।" স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, "প্রধানতঃ এশিয়া-শিল্পের অনুকরণে ব্যাপৃত" ঐকালীন মিসেনিশিল্প খাঁটি গ্রীকশিল্প নয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬-১৪৬ পর্যন্ত সময়ের দ্বিতীয় পর্বকে স্বামীজী খাঁটি গ্রীকশিল্পের কাল বলেছেন। তা বলার কারণ, এইকালে গ্রীকশিল্প "এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা" আরম্ভ করেছিল। এশিয়া-শিল্প বাস্তবের অনুকরণ চেষ্টা করে না, আর গ্রীকশিল্পের লক্ষণ—"প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহের বর্ণনা।"

এই দ্বিতীয় অর্থাৎ হেলেনিক পর্ব আবার তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, "আর্কেইক গ্রীকশিল্প", সময় ৭৭৬-৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের শিল্প-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যঃ "এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ বিষয়ে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা ক'রে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সঙ্গে জড়ানো, তালপাকানো—পতনশীল বস্ত্রের মতো নয়।"[৬৫]

দ্বিতীয় ভাগের নাম, "ক্লাসিক গ্রীকশিল্প"; সময় ৪৭৫-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

অর্থাৎ "এথেন্সের প্রভুত্বকাল হ'তে আরম্ভ হয়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-কাল পর্যন্ত...।" গ্রীকশিল্পের এইটাই গৌরবযুগ। এই গৌরবের স্বরূপ বোঝাতে স্বামীজী জনৈক ফরাসী শিল্পবেত্তার উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতিকালে বিধিবন্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যেকালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" [৬৬]

এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্প গ্রীসের দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম, আটিকা রাজ্যের সম্প্রদায় (এথেন্স যার প্রধান শহর), দ্বিতীয়, পিলো-পনেশিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায়।

আটিক সম্প্রদায়ের আবার দুই ভাব। একটি ভাব সৃষ্টি করেছিলেন "মহাশিল্পী ফিডিয়াস", যাঁর বিষয়ে স্বামীজী জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধার করেছেনঃ "অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনকালে মানব-মনে আপন অধিকার হারাইবে না।" দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক স্কোপাস ও প্র্যাক্সিটেলেস। "এই সম্প্রদায়ের কার্য শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হ'তে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।" [৬৭]

ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—পিলোপনেশিয়ান সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক দুজন, পলিক্লেটাস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) এবং লিসিপাস (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ)। "এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরের গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখবার নিয়ম প্রবর্তিত করা।" [৬৮]

স্বামীজী বলেছেন, খ্রীঃ পূঃ ৩২৩-১৪৬ পর্যন্ত সময় ক্লাসিক গ্রীক-শিল্পের অবনতিকাল। এর আরম্ভে আলেকজান্ডারের মৃত্যু, শেষে রোমানদের দ্বারা আটিকা বিজয়। "জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।" [৬৯]

গ্রীকশিল্পের তৃতীয় পর্যায় খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ থেকে পরবর্তীকাল। এই

একেবারে পতনকাল সম্বন্ধে স্বামীজী অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেনঃ "রোমানদের গ্রীস অধিকার-সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে হুবহু কোন লোকের মুখ নকল করা।"৭০

গ্রীকশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস যেভাবে স্বামীজীর ডায়েরী-নোটে পাচ্ছি, সন্দেহ নেই, তা করা হয়েছিল বিশেষজ্ঞরচিত শিল্পের ইতিহাসগ্রন্থেরই অনুসরণে। ঐ নোটের উপর নির্ভর করে স্বামীজী যদি প্রবন্ধ রচনা করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যথেষ্ট পেতাম। তাহলেও, ঐ সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোটের ভিতর থেকেই, স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা পাই। গ্রীকশিল্পের আদিতে তিনি প্রাচ্যপ্রভাবের কথা বলেছেন বটে কিন্তু কদাপি তাকে গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণরূপে দাঁড় করাননি, বরং বলেছেন, ঐ প্রভাব ত্যাগ করার ফলেই গ্রীকশিল্প নিজ মহিমা লাভ করেছিল। স্বামীজী সব সময়েই স্বাধীন আত্মপ্রকাশের পক্ষে; বাইরের প্রভাব গ্রহণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে জাতীয় প্রবণতাকে উৎপাটিত না করে, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং তিনি গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠ মহিমা তখনই দেখলেন যখন তা প্রাচ্যপ্রভাবমুক্ত। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীকশিল্প, "বিধিনিষেধের বহির্ভূত" হয়ে সগৌরবে বিকশিত হয়েছিল। এইকালের শিল্পের মধ্যেই তিনি ভাববিকাশের চেষ্টা ও তার সাফল্য দেখেছিলেন (যেমন ফিডিয়াসের রচনার মধ্যে)। অপরদিকে যেসব গ্রীকশিল্পী-সম্প্রদায় নিছক প্রকৃতির অনুকরণ করাকেই লক্ষ্য বলে ধরেছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অধিক সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ অনুরাগহীন।

গ্রীকশিল্পের সামগ্রিক শক্তি ও সৌন্দর্যমহিমা স্বীকার করার পরেও আমরা দেখব, শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি ঐ শিল্পকে সর্বোচ্চ নমস্কার জানাতে পারেনি। তাঁর কাছে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্প, যা স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও সর্বাধিক ভাবপ্রকাশ করতে সমর্থ, এবং যেহেতু আধ্যাত্মিকতাই তাঁর কাছে ভাবের শিখর, তাই—আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে সমর্থ শিল্পই সর্বোচ্চ শিল্প। সুতরাং রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ

"পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোঘল বাদশাহের সময়েও ঐ বিদ্যার

বিশেষ বিকাশ হয়েছিল ; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea expression (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ...যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী) তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। এইরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধ'রে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীতে প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ব'লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।" ৭১

পাশ্চাত্যের তুলনায় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে ভারতীয় শিল্পের সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেনঃ

"গ্রীকরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের রহস্য অনুধাবন করেনি। তা যদি করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীযুক্ত করে দেখাতে পারত না। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের শরীর কখনই পেশল হয় না। এক্ষেত্রে বুদ্ধ-মূর্তির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোন জাতির শিল্প পরীক্ষা করলেই তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি যে কখন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেছিল শিল্পে তার সামান্য পরিচয়ও নেই। অপর পক্ষে, ভারতীয় শিল্প শুধু আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসরণ করে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে অধঃপতিত হয়েছে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির পার্থক্য বিচারে স্বামীজীর প্রতিভার ঝলক বারে বারে দেখা গেছে। নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে তেমনি একটি প্রদীপ্ত অথচ সুগভীর বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়। নিবেদিতা লিখেছেনঃ

"আমাদের অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'যন্ত্রণাপূজা'র সম্বন্ধে স্বামীজীর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে ভারতীয়দের স্বচ্ছ চিন্তার রূপ। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁকে বলেছিলেন, বুদ্ধের মহিমার আবেদন অনেক বেশী হত যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে 'রোমক পাশবিকতা' বলে চিহ্নিত করতে তাঁর কোন দ্বিধাই ছিল না। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চমকপ্রদ ঘটনার বা কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ঐ হল সর্বনিম্নস্তরের অতিজান্তব পক্ষপাত। ঐ জন্যই পৃথিবীর মানুষ এপিক কাব্যকে সর্বদা অত ভালবাসে। ভারতের সৌভাগ্য, সে 'খাড়া গভীর অন্ধ গহ্বরে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষিপ্ত'-বিষয়ের কবি মিল্টনকে কদাপি সৃষ্টি করেনি। ঐ গোটা কাব্যটার বদলে ব্রাউনিং-এর কয়েকটি লাইনও যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। স্বামীজীর মতে, খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ারূপ ঘটনার এপিক উগ্রশক্তিই রোমকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল—রোমান জগতে খ্রীষ্টধর্মকে ঐ ঘটনাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'ঠিক! ঠিক!' তিনি যোগ করে দিলেন, পাশ্চাত্যের লোক, তোমরা চাও অ্যাকশন্—তোমরা জীবনের প্রতিটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কবিত্ব রয়েছে, তাকে বুঝতে চাও না! তরুণী-মাতা, তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এসে ছিলেন সেই ঘটনার থেকে বেশী সৌন্দর্য আর কোন্ ঘটনায় সম্ভব? কিংবা বুদ্ধ-কর্তৃক ছাগশিশুর জীবনরক্ষার ঘটনাটি। দেখ, বুদ্ধের সংসারত্যাগের বিরাট ঘটনাটি ভারতের কাছে কিছু অভিনব নয়। গৌতম ছোট একটি রাজ্যের রাজার ছেলে—অমন সম্পদ আগে অনেকবার অনেকে ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু নির্বাণের পর?—কী কবিত্ব তখন—

"বর্ষণমুখর রাত্রি; এক গোপের কুটিরে এসে ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে তিনি (বুদ্ধ) দাঁড়িয়েছিলেন; অবিরল জল পড়ছে, ক্রমেই প্রবল হচ্ছে বায়ু।

"ভিতর থেকে গোপ জানালা দিয়ে চকিতে একটি মুখ দেখতে পেল; মনে মনে বলল, 'হাঃ হাঃ গেরুয়াধারী! বটে! ওখানেই থাক তাহলে, তোমার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট ভাল ঠাঁই।' তারপর সেই গোপ গাইতে লাগল, 'আমার গোরু-বাছুর ঘরে উঠেছে; এখানে আগুন জ্বলছে ভালভাবে; আমার পত্নী নিরাপদ; সুখে ঘুমোচ্ছে বাচ্ছারা। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।'

"বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, মন আমার সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত, হৃদয় আমার দৃঢ়, সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।

"গোপ আবার গাইল, 'ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে, খড়গুলি খামারে ভালভাবে রাখা আছে, নদীতে ভরা জল, পথগুলি বেশ শক্ত। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পার।'

"এইভাবে চলতে লাগল। অবশেষে গোপ বিস্ময়ে ও অনুতাপে উঠে পড়ে তাঁর কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব নিল।"[৭২]

স্বামীজীর সমকালে ও কিছু পূর্বকালে কলকাতার শিল্পপ্রয়াসঃ বিভিন্ন আর্ট স্কুল

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনকে স্বামীজী তার আত্মমর্যাদার ভিত্তি দিলেন, দেখতে পেলাম। তারও বড় কথা, এই শিল্পের প্রাণসত্য উদ্ঘাটিত করলেন—সেই সঙ্গে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সকল শিল্পের প্রাণসত্যকেই। অতঃপর আমরা দেখব, স্বামীজীর খুলে-দেওয়া পথ দিয়েই নিবেদিতা, ওকাকুরা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অরবিন্দ, উডরফ প্রভৃতি সকলেই চলেছেন। এঁরা যদি স্বামীজীর দ্বারা প্রত্যক্ষে চালিত নাও হন ক্ষতি নেই, আমাদের পক্ষে এটুকু সংবাদই প্রয়োজনীয়, স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত পথে এঁরা এগিয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ স্বামীজী করলেন তা হল—তিনি ভ্রান্ত আদর্শ নিবারণ করলেন; ভারতীয় শিল্পচেষ্টা তখন যে পথে চলেছিল, কঠোরভাবে তার সমালোচনা করলেন। সেই সমালোচনা তৎকালীন পরিবেশে আকস্মিক, বিস্ময়কর এবং বোধ হয় বিরক্তিকর ঠেকেছিল।

আমি স্বামীজী কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনার কথাই বলতে চাইছি।

কলকাতায় শিল্পচেষ্টা এইকালে ও কিছু পূর্বকালে কোন্ পথে চলেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ইতিহাস প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু সংবাদ রয়েছে।[৭৩] ২৯ জুন, ১৮৬৪ সালে সরকারী আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠাব আগেই কলকাতায় শিল্পচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। প্রধানত ইউরেশিয়ান তরুণদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "দি মেকানিক্স ইনস্টিটিউট", যেখানে 'মেকানিক্যাল'-শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রতিষ্ঠান বেশীদিন বাঁচেনি। কিন্তু তারপর "ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট"-এর উন্নতির জন্য ইউরোপীয় ও দেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবর্তিত "দি স্কুল অব ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট" নামক যে প্রতিষ্ঠান ১৬ আগস্ট,

১৮৫৪ তারিখে যাত্রারম্ভ করেছিল—সে প্রতিষ্ঠান নামান্তর গ্রহণ করে আজও জীবিত আছে। গরাণহাটার এই বেসরকারী ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলটিতে স্বভাবতই ক্লে-মডেলিং এবং এনগ্রেভিং-এর উপর বেশী জোর দেওয়া হত। এখানকার ছাত্ররা এইসব কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৮৫৮, ৯ সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার আর্থার ডবলিউ বুলার সবিশেষ প্রশংসা করে যেকথা বলেছিলেন, তার মধ্যেই ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তৎকালীন বিদেশীয় সহানুভূতিশীলদের দৃষ্টিভঙ্গির ও ধারণার সংকীর্ণতা ধরা পড়ে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেনঃ "কিছু সুযোগ পেলেই এই স্কুলের ছাত্ররা শীঘ্রই চারু ও কারুশিল্প সম্বন্ধে তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রীতির যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারবে, এবং কুতুবমিনার, তাজমহল ও মসলিনের দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে।"

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি ২৯ জুন, ১৮৬৪ সাল থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং মিঃ এইচ এইচ লক এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লকের প্রেরণাপূর্ণ নেতৃত্ব এবং কর্মক্ষমতা বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছিল। বাঙালী শিল্পীরা "উত্তম নকলকারী" ছাড়া আর কিছু নয়—তৎকালীন ইউরোপীয় মহলে বলবৎ এই ধারণার বিপরীত ধারণা মিঃ লকের ছিল বলেই তিনি বহুভাবে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। স্কুলের ছাত্ররা নানা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার পেয়েছিল। তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে নানা শিল্পকাজ করেছিল, যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ, সরকারী ভবনের বা গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলংকরণের কাজ, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চিত্রাংকনের কাজ। এঁরা সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ চিত্রিতকরণের কাজও করেছিলেন।

ঐকালের শিল্পীদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। প্রিন্সিপ্যাল লক অন্নদাপ্রসাদের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। অন্যরাও করেছেন।*

এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে কিন্তু ভারতীয়তা বা মৌলিকতার পরিচয় একেবারেই ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল নকলনবিশি—হয় বিষয়ের, নয়

রীতির। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে শিল্পচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তা ঐ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে এবং পরাধীনের হীনম্মন্যতাকে কাটিয়ে সৃষ্টিশীলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি। আর্টগ্যালারির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৭৬, এপ্রিল মাসে। উদ্দেশ্য ছিল--ঐ গ্যালারিতে অতীত ও বর্তমানের ইউরোপের মানুষ ও বস্তুর ছবি ভারতীয়দের চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, যাতে তারা ইউরোপীয় নকলপদ্ধতি শিখে নিয়ে নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মনুষ্যজীবন ও স্থাপত্যকীর্তিগুলিকে এঁকে তুলতে পারে। আসলে কিন্তু ভারতীয় কোন কিছু এই শিল্পশিক্ষার কাছাকাছি ছিল না। এবং পরে যখন ভারতীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়, তখন শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন্নতার কারণে কিংবা আর্থিক ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কায়, ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা দেখিয়েছিল। ১৮৮৫-৮৬-তে পাঠ্যসূচীর মধ্যে খাঁটি ভারতীয় আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ফ্রেসকো আঁকা শেখানোর ব্যবস্থা করা হলে, ছাত্রদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গিলার্ডি তাঁর ১৮৮৫-৮৬-এর রিপোর্টে বলেছেনঃ

"The late Mr. Schaumburg pointed out to me the necessity of reinstating Indian decorative art in its original brilliancy, but both he and myself were fully aware that we should have been undertaking a task beyond our power for this reason that we should have found in the native students themselves the chief and the strongest opposition to our efforts. It is for this reason that our newly established fresco-painting class numbers only eight students."

ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় পদ্ধতি শেখানো যখন গিলার্ডি ও স্কামবাগ অসম্ভব কাজ মনে করেছিলেন, তখন তাকে 'সম্ভব' করতে অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দুর্ধর্ষ সাহসের প্রয়োজন ছিল—তা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পশিক্ষা-ইতিহাসের ঐতিহাসিক পুরুষ ই বি হ্যাভেল। হ্যাভেলের ছিল সহজাত শিল্পবোধ; সন্ধান ও চর্চার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বাসনাময় ভালবাসা; আর উল্টোদিকে দেখেছিলেন, কলকাতার আর্ট স্কুলে অনুসৃত হচ্ছে "ইংরেজদের প্রাদেশিক শিল্পের চল্লিশ বছরের পুরোনো, জঘন্য এক ঐতিহ্যরীতি।" পরাধীন দেশের মানুষকে আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, এই স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অস্বীকৃত সত্যটিকে শেখাতে হ্যাভেলকে কঠিন হতে হয়েছিল —নির্মম হাতে পরিষ্কার করতে হয়েছিল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমুনার আবর্জনাকে—যে ধরনের বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হয় রোগীর মতিচ্ছন্নতার সময়ে।

হ্যাভেলের সংস্কারচেষ্টার বেশ কিছু বছর আগেই কিন্তু ভারতীয় শিল্প-জগতে নতুন তরঙ্গের উদয় হয়েছিল, এবং তা এসেছিল ভারতীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ নিয়েই; ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠেছিল সেই পৌরাণিক নাটকের একালীন চিত্রাভিনয় দেখে; রবিবর্মা অচিরে স্বীকৃত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলে। হ্যাঁ, রবিবর্মাই নতুন আন্দোলন এনেছিলেন।

বিবেকানন্দ কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনা

যে কালের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন রবিবর্মার ছবির স্থূলতার কথা আর কেউ ভেবেছিলেন বা বলেছিলেন কিনা আমরা এখনও জানি না। রবিবর্মা সম্বন্ধে স্বামীজীর অশ্রদ্ধাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিখ্যাত একটি উক্তি আছে—যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দশ বছরের মধ্যে বাংলা বা ভারতের শিল্পালোচনা পূর্ণ হয়ে যাবে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে স্বামীজী রবিবর্মা সম্বন্ধে সেকালের হিসাবে যে দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন, তা এইঃ

"ওদের (ইউরোপীদের) নকল ক'রে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।" [৭৪]

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উক্তি। তৎকালীন শিল্পধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন। পটচিত্র ও রাজপুতচিত্র তাঁর কাছে রবিবর্মার নকলনবিশির চেয়ে অনেক ভাল বলে মনে হয়েছিল, এবং দেশীয় ছবির বর্ণরাগের প্রশংসা পর্যন্ত তিনি করেছেন। বাংলার শিল্পান্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন—স্বামীজীর ধারণাকে কিছু পরিমাণে অঙ্গীকার করেই নতুন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

স্বামীজী রবিবর্মার মূল ছবির সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচিত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সভায়, যেমন ত্রিবাঙ্কুরে বা মহীশূরে রবিবর্মার ছবি দেখেছিলেন, অন্তত বরোদায় যে রবিবর্মার পূর্বোক্ত বিখ্যাত রামায়ণ-মহাভারত সিরিজ দেখেছিলেন, তা জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে বরোদা থেকে লেখা ২৬ এপ্রিল, ১৮৯২-এর চিঠিতে দেখা যায়ঃ "আমি লাইব্রেরী ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি; এখানে দেখবার মতো এই তো আছে।" [৭৫]

রবিবর্মার ছবি "দেখবার যোগ্য" এই কথার অর্থ নয় যে, তা সমর্থনের যোগ্য। এরই মধ্যে যে তিনি রবিবর্মার ছবির কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছেন, সে বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ডঃ দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছেন, মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন স্থানীয় এক ব্যারিস্টারের বাড়ীতে ছিলেন তখন তিনি রবিবর্মার ছবির ত্রুটির রূপ আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, তিনি অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর এই ধরনের কথা শুনে অবাক। ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সমালোচনা করছেন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী! গৃহস্বামী অবশ্য উক্ত ব্যক্তিকে সমঝে জানিয়েছিলেন—সন্ন্যাসী শিল্পতত্ত্বে কতখানি পারঙ্গম।

স্বামীজী কর্তৃক সমকালীন ভারতীয় শিল্পে পরানুকরণের সমালোচনা

শিল্পের ক্ষেত্রে "পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার" কঠোর সমালোচনা স্বামীজী বহুভাবে করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি দেখেছিলেন, শিল্প-শিক্ষার্থী ভারতীয়রা সেই দেশের ছবির নকল করতে চাইছে, যে দেশ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ বলে অবজ্ঞাত। স্বামীজীর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ যখন বলেছিলেন, "সাহেবদের (ইংরেজদের) তো art বেশ", তখন স্বামীজী ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেনঃ "দূর মূর্খ; আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্‌টাকে সোনা দেখছে।" স্বামীজীর মতে, ইংরেজদের জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি। তাদের বাড়িঘর, পোশাক, সব রূপহীন। তিনি বলেছিলেনঃ "সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট।" ইংরেজদের স্থাপত্যের এবং পোশাকের উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "ওদের জলখাবার গ্লাস আর আমাদের ঘটি—কোনটায় আর্ট আছে?" কিন্তু যেহেতু এযুগে ইউটিলিটিকে বর্জন করা সম্ভব নয়, তাই বলেছিলেনঃ "এখন চাই আর্ট এবং ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট করে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে।"[৭৬]

জীবজন্তু আর ল্যান্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল যে ইংরেজ, তার শিল্প-বোধ সম্বন্ধে রীতিমতো কঠিন ভাষাতেই স্বামীজী কথা বলেছেন, যদিও তাদের কাব্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলঃ

"The Anglo-Saxon people have always been badly fitted for

art. They have good poetry—for instance, how wonderful is the blank verse of Shakespeare."[৭৭]

ভারতীয় গণজীবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আর একটি মূল্যবান অংশের উল্লেখ এখানে করে নিতে হয়, যার কথা ইংরেজ ও ভারতীয়ের শিল্পবোধের তুলনা-প্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল। শিল্পকে স্বামীজী যেহেতু কেবল কতকগুলি মানুষের ব্যক্তিগত আকৃতির প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি, সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঐ শিল্পবোধের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার রূপচ্ছন্দের দিকে তাকিয়ে যথার্থ গৌরবের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতীয় বা এশিয়াবাসীর সভ্যতার এক বিশেষ মহিমা—শিল্প তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি। জাপানের প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেনঃ "ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত-বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।"[৭৮]

গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌল-প্রত্যয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্প, অর্থসম্পদ কোন কিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উচিত নয়। কোন সভ্যতার মহিমা কিছুসংখ্যক সর্বোচ্চ-শ্রেণীর মানুষকে সৃষ্টি করার উপরে নির্ভর করে না, বহুসংখ্যক উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার উপরই তা নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সর্বপর্যায়ে না পারুক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরেছিল। ইংরেজ-আমলে স্বামীজী তথাকথিত গণতন্ত্রের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু গোষ্ঠী-অধিকার কায়েম করার চেষ্টাই দেখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অনুস্যূত জাতীয় শিল্পচেতনার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ধরনের স্থূল ভোগের স্বার্থপরতা এনেছিল, স্বামীজী তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ

"বিশেষ দুর্দশা হয়েছে (বাংলাদেশের) শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘর-দোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র ক'রত। বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা ব'লে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসোগে! কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী যন্ত্র কেনা!!"[৭৯]

মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২-এর এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি শিল্পসৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। গ্রামটি নিঃসন্দেহে আঁটপুর, যা ইদানীন্তনকালে শিল্পরসিক বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্বামীজী বলেছিলেনঃ

"আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম 'বাংলো'।"[৮০]

"প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম! তবে এখনও যেকটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্তত একটিও।"[৮১]

৭৯। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ ২১৪

৮০। Letters, (1960), pp. 540-41

৮১। আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের গ্রাম। স্বামীজী বহুবার এখানে এসেছেন, এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন, এই গ্রামটির কতখানি ঐতিহাসিক মূল্য। এখানেই ১৮৮৬ ডিসেম্বর, বড়দিনের রাত্রে নরেন্দ্রনাথ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্ত করেন।

আঁটপুরের আটচালা এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "দেখা হয় নাই" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। আঁটপুর নিয়ে আলোচনা আগে অনেকবার হলেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিশেষ মূল্য এইখানে—পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্বন্ধে এতখানি প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই আছে। "সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েক হাজার মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি পর্যবেক্ষণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য" তাঁর হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, আঁটপুরের "বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপটি...পোড়ামাটির

পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের বিষয়ে আর একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসে-ছিলেন এবং গোড়ায় বেলুড়মঠে স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন। চীন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ঐ সকলের উৎসভূমি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়ে-ছিলেন, এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকলাভ করেছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ আগেই দিয়ে এসেছি। স্বামীজীর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে ওকাকুরা প্রথম ভারতের শিল্পতীর্থগুলি ঘুরে দেখেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে ওকাকুরা অবশ্যই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্মের কথা জেনেছিলেন, উল্টোপক্ষে স্বামীজীও নিশ্চয় ওকাকুরার মতো বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জাপানের ও প্রাচ্যদেশের শিল্প কতখানি ভারতীয়, তা শুনে পুলকিত হয়েছিলেন। তার দ্বারা স্বামীজীর পুরাতন ধারণাই সমর্থিত হয়েছিল। শিল্পে এশিয়া এক—এই বক্তব্য যতখানি ওকাকুরার, ঠিক ততখানি বা ততোধিক পরিমাণে বিবেকানন্দের, সেই সঙ্গে নিবেদিতার।

অলঙ্করণ ও কাঠখোদাইয়ের উৎকর্ষের দিক দিয়ে...পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাত্র নেই।" মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তঃ "টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের এ-জাতীয় দেবালয়েব মধ্যে (এটি) সর্বোচ্চ।" চণ্ডীমণ্ডপটি সম্বন্ধে বক্তব্যঃ "চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারুকার্যও এত অপরূপ যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আটপুর এ-বিষয়েও প্রায় অনন্য।" চণ্ডীমণ্ডপটির গঠনশৈলী আলোচনা মধ্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "চালের ভারবাহী গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুলি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বরগা ও খুঁটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুলকারি বা অনুরূপ নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য। ...চণ্ডীমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের ভিতরের দিক ময়ূর-পালকের শাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছাপানো শরকাটি বা বেতের চিলতে দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। রঙিন কাঠির টানাপোড়েনে নানারকম জ্যামিতিক বা ফুলকারি নক্সার সৃষ্টি করা হত, যার নাম ছিল 'রূপসী কাজ'। এ-জাতীয় চারুশিল্পের অক্ষত নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা জানি না।" শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেনঃ "বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেকালের 'সূত্রধর' পদবীর শিল্পীরা...একাধারে কাঠখোদাই ও টেরাকোটা অলঙ্করণের কাজ করতেন।" আলোচ্য চণ্ডীমণ্ডপটির ইতিহাস আলোচনা করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—চণ্ডীমণ্ডপটি ২৪৮ বৎসরের পুরাতন।

ওকাকুরার "আইডিয়ালস অব দি ইস্ট" গ্রন্থের ভাষাতেই কেবল নয়, বক্তব্যেও যে নিবেদিতার প্রচুর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তার পক্ষে বহু প্রমাণ আমরা অন্যত্র দিয়েছি।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ওকাকুরা বাংলার শিল্প-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, একথা সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরাকে স্বামীজী কতখানি অবহিত করেছিলেন, তার অতি সামান্য সংবাদ এখন আমরা পেতে পারি। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর পূর্বে-উল্লিখিত ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২-এর চিঠি দেখিয়ে দেয়—স্বামীজীর শিল্পশিক্ষা কতখানি ব্যাপক ছিলঃ

"ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে।

"বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিল—গতকাল এই শহরে এসেছে। কলাশিল্প সম্বন্ধে সে বিশেষ আগ্রহী। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এই যুবকই ওকাকুরাকে শিল্পভারত (যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার একেবারে ঠিক লোক। আর আমার বিশ্বাস সে ওকাকুরার কথা শুনে খুবই উপকৃত হবে। ওকাকুরা সদ্য এখানে ভৃত্যরা ব্যবহার করে, এমন একটি পোড়ামাটির জলপাত্র দেখেছেন। সেটির আকার এবং তার উপরে খোদাই কাজ দেখে তিনি একেবারে চমৎকৃত। কিন্তু এটি সাধারণ মৃৎপাত্র—পথের ধকল সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে না। ওকাকুরা তাই এর একটি পিতলের নকল তৈরী করিয়ে দেবার অনুরোধ করে গেছেন। কি করি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তার কয়েকঘণ্টা পরে যুবক-বন্ধুটি এসে হাজির। এই কাজের ভার নিতে সে যে কেবল রাজি তাই নয়, সেই সঙ্গে বলেছেন, ওকাকুরার পছন্দের ঐ পোড়ামাটির কাজের চেয়ে হাজারগুণ ভাল কারুকার্য করা শত শত পোড়ামাটির পাত্র সে দেখাতে পারে।

"সেই পুরাতন অপূর্ব শৈলীতে আঁকা পুরাতন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। পুরনো শৈলীতে এখনও আঁকতে পারে, এমন একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। ঐ পরিবারের একজন একটি মটরদানার উপরে গোটা মৃগয়ার দৃশ্য এঁকেছে—খুঁটিনাটি বিবরণ আর অ্যাকশনের নিখুঁত ছবি।

"আশা করি ওকাকুরা ভ্রমণ শেষ করে শহরে ফিরে এই ভদ্রলোকের অতিথি হবেন, এবং অবশিষ্ট শিল্পনিদর্শনগুলির কিছু নমুনা দেখে নেবেন।

"নিরঞ্জন মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছে। ওকাকুরা জাপানী বলে তাঁর

কোন মন্দিরে ঢোকায় আপত্তি করা হয়নি। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন। মন্দিরে ওকাকুরাকে শিবপ্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।"[৮২]

স্বামীজীর এই চিঠিটি কয়েকটি কারণে মূল্যবান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিল্পবিষয়ে বিনিময়ের সংবাদ তো এর মধ্যে আছেই, অধিকন্তু আছে, মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর মুগ্ধ মনোভাবের পরিচয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর যেসব বক্তব্য ইতিমধ্যে উপস্থিত করেছি, তার মধ্যে পাঠক লক্ষ্য করেছেন, চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তব্য প্রায় নেই—সবই প্রায় স্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে। বিস্ময়ের কথা, অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর কোন কথা পাই না। তা কি অপরিচয়ের জন্য, তিনি কি গ্রিফিথের বই দেখেননি (লেডি হ্যারিংহামের বই অবশ্য আরও প্রায় দশ বছর পরে জন্ম নেবে), তিনি কি অজন্তার ছবি দেখে খুশী হননি (তা কি সম্ভব?), কিংবা অপরপক্ষে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন, লিখিত হয়নি বলেই তার কথা আমরা জানি না? শেষোক্ত ধারণাই ঠিক বলে মনে হয়। আলোচ্য চিঠিতে কিন্তু মুঘল-রাজপুত চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচ্চ প্রশংসাবাণী পাচ্ছি।

ভারতশিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দঃ রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের প্রশ্নঃ শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর যেসকল বক্তব্য তুলে ধরেছি, এবং পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছি, তার থেকে কেউ যেন একথা ধরে না নেন—বাংলাদেশের পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির সবটুকু স্বামীজীর পছন্দের আকার ধরে গড়ে উঠেছিল। শিল্পে ভাবের প্রকাশ হোক, স্বামীজী চাইতেন, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার ভাব নিশ্চয় নয়। ভারতীয় শিল্প তার ভাব-প্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্যের জন্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি বলেছেন দেখে এসেছি, কিন্তু ঐ প্রয়াসের অনভিপ্রেত পরিণতির রূপও নির্মমভাবে জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। শিল্পের ক্ষেত্রে ভাব কখনও অশরীরী হতে পারে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনরূপকে একেবারে অগ্রাহ্য করে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। স্বামীজী সব কিছুকে সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদি মূল প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতীয় শিল্পের প্রাণহীন আলঙ্কারিকতার বিরুদ্ধে

তাঁর কঠোর সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করতে চাইছি। ১৮৯৭-এর গোড়ায় মাদ্রাজে "আমাদের উপস্থিত কর্তব্য" নামক বক্তৃতায় হিন্দু ও গ্রীক শিল্পসংস্কৃতির তুলনা করার পরে তিনি বলেছিলেন, কোন জিনিসকে বহির্মুখভাবে দেখার জন্য গ্রীসের "শ্রেণী বিভাগাত্মক বিজ্ঞান সমূহের (Sciences of Generalisation) এবং অন্তর্মুখভাবে দেখার জন্য ভারতে বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান সমূহে"র (Analytical Sciences) উদ্ভব হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির বাড়াবাড়িতে কি ফল হয়, তা স্বামীজী অতঃপর বলেছেনঃ

"তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল—মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের দু-এক শতাব্দী আগেই সম্ভবত তা হয়েছিল—তখন ভারতের ঐ জাতিগত প্রবণতার এমন বাড়াবাড়ি প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সব কিছুতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশালতা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে গেল—তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল। গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত—এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জগাখিচুড়ির মতো—মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন। অন্যান্য ভাবধারণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বত্র একই প্রকার আলঙ্কারিকতা, এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম—সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ন।"[৮৩]

এই বক্তব্যই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি "বাংলা ভাষা" নামক প্রবন্ধে কিছুদিনের মধ্যে লিখলেন। উপযুক্ত ভাবহীন অলঙ্কৃতি, তাঁর নিষ্ঠুর উপমায়—"হীরে-মোতির সাজপরানো-ঘোড়ার উপরে বাঁদর-বসানো"র মতো কাণ্ড। দেশ উৎসন্ন গেলেই সমাস, শ্লেষ ও বিশেষণের বাড়াবাড়ি হয়। স্বামীজীর কথায় ওসব মড়ার লক্ষণ। "যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"[৮৪] স্বামীজী আরও বলেছেনঃ

"ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব,

না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব!"[৮৫]

সুতরাং জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ চাই-ই, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। স্বামীজীর একটি মৌখিক চিত্র-সমালোচনার বিবরণ দিয়েছেন প্রিয়নাথ সিংহ। ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পাশ্চাত্যযাত্রার ঠিক আগে স্বামীজী একদিন কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁর বন্ধু "কৃষ্ণার্জুন সংবাদ"—এই বিষয়ের একটি ছবি আঁকিয়েছেন। ছবিতে কৃষ্ণ রথের ঘোড়ার লাগাম-হাতে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবির মালিক ছবির সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত বন্ধু "দোষগুণ বিচার করে" বলতে জিদ করলে স্বামীজীকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, "কিছু হয়নি।" কেন কিছু হয়নি, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমত বলেছিলেন, কৃষ্ণের রথ আজকালকার "প্যাগোডা রথ" ছিল না। প্রিয়নাথ সিংহ "প্যাগোডা রথের" ধারণায় বাস করতেন। সুতরাং তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন সবিস্ময়ে—প্যাগোডা রথ নয় কেন? উত্তরে স্বামীজীকে বলতে হলঃ "ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতনায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো! গ্রীসিয়ান মাইথোলজির ছবিতে যে-রথ আঁকা আছে—দু'চাকার, পিছন দিয়ে ওঠানামা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিয়ে তবে ছবি দাঁড়ায়। ট্রুথ রিপ্রেজেন্ট করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে, যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় পেন্টিং শিখতে। তাদের দ্বারা কি কোনো ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা পারফেক্ট ড্রামা লেখা একই কথা।"[৮৬]

স্বামীজী, বলা বাহুল্য ছবিকে ড্রামাটিক শিল্প করবার কথা বলেননি, তিনি নাটকের সর্বাঙ্গীণ ভাববিকাশ চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করেই ঐকথা বলেছিলেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত?—তাতে স্বামীজী বলেনঃ "শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস্?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান্)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তার central idea (মুখ্যভাব)-টি—তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বামীজী এইসঙ্গে ভঙ্গি করে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) "এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো

এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গালয় ও এই চিত্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। স্বামিজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতেছিলেন। সহসা তাঁহার যবনিকার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে ইহা হঠাৎ তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয় সমাপ্তে তিনি কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকটে আসিলেন। কারণ স্বামিজী কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অভ্যাগত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামিজীকে বহুলোকে সম্মান করিত। ...যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে-অংশটি স্বামিজী অপরিস্ফুট বলিয়া নির্দেশ করিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রকৃতই দোষ আছে এবং স্বামিজী যে প্রকার উল্লেখ করিতেছেন তাহাই সত্য।"

[কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭১-২]

উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ দেওয়া না থাকলেও ধরে নিতে পারি, স্বামীজী যখন "প্যারিস কংগ্রেস" উপলক্ষ্যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখনই ঐ ব্যাপারটি ঘটেছিল। স্বামীজীকে রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি মিঃ লেগেট ছাড়া আর কেউ নন। এখানে আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামীজী যখন সারা বার্নহার্ড-অভিনীত ইৎসীল দেখতে গিয়েছিলেন তখনই। 'ইৎসীল' বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত; নিউইয়র্কে ১৮৯৬ সালে স্বামীজী এটি প্রথম দেখেন এবং তখনই সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসেও সম্ভবত একই অভিনয় দেখতে স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' লিখেছেনঃ "বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে' (tres ancien tres civilise) —অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া ক'রে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা--বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি।' বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে ম° র‍্যাভ (c'est mon rave) সে ম° র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন।" [বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৯]

শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় Action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন...। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। ...সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত!"[৮৭]

ছবি সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রূপই উপরের বিবরণের মধ্যে পেলাম। পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার স্বাধীনতার নামে অযথা তথ্যবিচ্যুতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ ভাব যদি তথ্যকে ছাপিয়ে উঠতে না পারে, কোন শিল্পই যে হয় না, সে বিষয়ে দ্বিধাহীন তাঁর বক্তব্য। স্বামীজী রণদাপ্রসাদকে নিজের অপরোক্ষ দর্শনজাত "কালী দি মাদার" কবিতার বিষয়-বস্তুকে চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে জানতেন কত কঠিন ঐ চেষ্টা। ভাববিষয়কে, বিশেষত অধ্যাত্ম বিষয়কে শিল্পায়িত করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প কিভাবে অতি-প্রতীকী উদ্ভট রূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে নিবেদিতাকে তিনি ১৯০০, ১৫ জুলাই নিউইয়র্কে যেকথা বলেছিলেন, সেগুলি খুবই মূল্যবান। ঐ সম্বন্ধে নিবেদিতার সদ্য-রিপোর্টঃ

"And he (Swamiji) suggested that Hindu painting and sculpture had been rendered grotesque by the national tendency to infuse psychic into physical conceptions. He said that he himself knew of his own experience that most physical or material things had psychic symbols, which were often to the material eye grotesquely unlike their physical counterparts."[৮৮]

স্বামীজীর কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব এইখানে--তিনি একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলেছেন যে, বহির্গত বস্তু অধিমানসলোকে যখন প্রতীক-রূপ ধারণ করে, তখন প্রায়শ তা তার বাইরের রূপের তুলনায় উদ্ভটভাবে পৃথক হয়। আক্ষেপের বিষয়, কিভাবে তা হয়, তা দৃষ্টান্তযোগে নিবেদিতার বিবরণে ব্যাখ্যাত পাইনি। তবে স্বামীজী জড়বস্তুর মধ্যে কিভাবে অন্তর্নিহিত ছন্দ অনুভব করতেন তার উল্লেখ তাঁর জীবনীতে ভূরি ভূরি মেলে। গঙ্গাজলে

স্বামীজী হর্‌ হর্‌ ধ্বনি শুনতেন, তা তাঁর লেখাতেই পাই। ১৮৯১ সালে পরিব্রাজক অবস্থায় একদিন তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, আজ গঙ্গা কেদার-রাগিণী গাইছে শুনেছি। পাখির কাকলি তিনি অনুধাবন করতেন এবং তাদের ঠিক সুরটি গেয়ে দেখাতেন। ঝর্ণার গান শুনেও তার সুর বলতেন। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, দেবপ্রতিমা মিথ্যে নয়, সাধকের দৃষ্ট-বস্তু তারা। এক্ষেত্রে স্বামীজীর চরম কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি, নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন—যার থেকে গম্ভীর মহান প্রকাশ অল্পই সম্ভব। কাশ্মীরে হিমালয়কে সামনে রেখে, স্বামীজী একদিন দাঁড়িয়ে আছেন, সেই সময় একজন ইউরোপীয় মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিমার সামনে ভক্তরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে কেন? "এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, 'এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া কি একই কথা নয়'?"[৮৯]

প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন্‌ বিরাট ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, তার অসাধারণ অভিব্যক্তি এখানে পাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য স্বামীজী দেহ-মন-প্রাণের অখণ্ড একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক মনে করতেন, যার দ্বারা অতিমানস চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। একজন কুস্তিগীরও ভারতবর্ষে তার সাধনার ক্ষেত্রে ঐ একাগ্রতা অর্জনের প্রয়াসী। ঐ জিনিস, স্বামীজীর মতে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। "যে মানুষ স্বার্থসিদ্ধিতে বা মন্দকাজে নিজেকে ক্ষয় করেছে, সে কখনও কোন মহান ম্যাডোনামূর্তি আঁকতে পারবে না, বা মাধ্যাকর্ষণ-নীতি আবিষ্কার করতে পারবে না।" নিবেদিতা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে আরও বলেছেনঃ "যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য বা হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানুষকে প্রধানত ভোগাধিকারযোগ্য শরীর বলে মনে করে এবং গৌণভাবে মাত্র তাকে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি-রূপ মন ও আত্মা বিবেচনা করে—স্বামীজীর সমাদর ঐ ধরনের সাহিত্য বা ললিতকলার ধারে-কাছে কখনও এগোত না। আমাদের পাশ্চাত্য আইডিয়ালিজমের সবটা না হলেও অনেকটাই তাঁর কাছে ঐ শরীরভাবের দ্বারা গভীররূপে মণ্ডিত মনে হত এবং তাকে তিনি 'ফুলে ঢাকা মৃতদেহের' সঙ্গে তুলনা করতেন।"[৯০]

একদিকে স্থূল শারীরিকতা, অন্যদিকে জীবনীশক্তিহীন আধ্যাত্মিকতার অভিনয়—স্বামীজীর শিল্পাদর্শ এই দুই অতিরেককে অগ্রাহ্য করে সুস্থ

সামঞ্জস্যের পথে চলেছিল। সবশেষে তাঁর উদ্দীপ্ত কথাগুলি স্মরণ করতে পারিঃ

"যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সংগীত প্রভৃতি আপনি আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, বাড়ি-ঘরদোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।"

অপূর্ব কথা—প্রাণের আগুনে জ্বলছে। শিল্পাচার্য নন্দলাল, স্বামীজীর ভাবাদর্শের একালীন প্রধান শিল্পী যিনি, তিনি পরিষ্কার বলেছেনঃ "বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির মত চলতি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও ঐ পথে বাঙলা ভাষাকে চালিত করেছিলেন।.. (তিনি) শিল্পে বহুদিনের জটিল mannerism-কে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগতকালের শিল্প তাঁহার বাণী অনুসরণ করে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মত...।" ৯১

স্বামীজীর আদর্শ অন্তত নন্দলালের শিল্পের 'মেরুদণ্ড' হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য, নন্দলাল ভিন্ন স্বামীজীর সরল মহান অথচ বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ গ্রহণ করবার মতো সামর্থ্য আর কোন আধুনিক চিত্র-শিল্পীর নেই। প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন কিভাবে গীতার কৃষ্ণকে আঁকতে হবে—সেই আদর্শে নন্দলাল অনেকগুলি 'পার্থসারথি' ছবি এঁকেছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। আলমোড়ায় একদিন ঊষাকালে দাঁড়িয়ে স্বামীজী হিমালয়ের চিরতুষারের উপরে অরুণোদয় দেখছিলেন; "তারপর অরুণরঞ্জিত পর্বতশিখরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছিলেনঃ "ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি—ঐ হল শিব আর তাঁর উপরে যে-আলোকসম্পাত হয়েছে, তাই হল জগতের জননী।"

অরূপের সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে ওঠে, স্বামীজী মহান ভাষায় তারই কথা বলেছিলেন এবং মহান শিল্পীরা চিরদিন এই তত্ত্বেরই রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল তেমন একজন সার্থক রূপকার।

সঙ্গীতভাবনায় বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সংগীতভাবনার বিকাশে কতকগুলি পর্যায় বা স্তর লক্ষণীয়। এই স্তরগুলির সঙ্গে বিবেকানন্দের সংগীতরুচি, শিক্ষা ও সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কিত। ঐ প্রতিটি স্তরের মধ্যেই দেখি চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে জীবনের সংঘাত, ক্রমপরিণতি ও পূর্ণতার স্থিতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার ত্রিমুখী শক্তিধারা ও গতি সকল মানুষের জীবনছন্দকেই করে সংহত ও নিয়মিত, উন্নত এবং কুসুমায়িত। তাই বিবেকানন্দের সংগীতভাবনায়ও দেখি ঐ তিনটি শক্তিরই খেলা ও বিস্তৃতি এবং ঐ ত্রিশক্তির পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েই বিবেকানন্দের সংগীতভাবনা ও সংগীতজীবন পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল।

পূর্বাভাস

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি। তাঁর অভ্যুদয়ের প্রায় ৮৭ বছর পূর্বে রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ও বাংলার ইতিহাসে দেখি ঊনবিংশ শতক ছিল এক জীবনজাগৃতির যুগ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল এক নবযুগের সূচনা।

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগও ছিল এক বিবর্তনের যুগ। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে সমর্পণ করেন। তিনি ছিলেন দিল্লীর মসনদে আসীন ভারতের প্রায় শেষ মোগল সম্রাট। তাঁর দুর্বলতা ও শাসনক্ষমতায় অক্ষমতার জন্য বহু বিদগ্ধ হিন্দু মুসলমান সংগীতশিল্পী তাঁর রাজদরবার পরিত্যাগ করে ভারতের সর্বত্র ও বিশেষ করে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন।

স্মরণযোগ্য যে, মোগল সম্রাট আকবর, জাহাংগীর ও শাহ্জাহানের সময়ে (১৫৫৬ খ্রীঃ—১৬৫৭ খ্রীঃ) আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন ও দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যের দরবারগুলিতে সংগীতের যেরকম বহুল অনুশীলন ছিল, সম্রাট আওরংগজেব বা আলমগীরের (১৬৫৮ খ্রীঃ —১৭০৭ খ্রীঃ) ও তার পরবর্তী সময়ে হিন্দু রাজাদের ও মুসলমান নবাবদের দরবারে সংগীতের অনুশীলন সে তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান হয়েছিল। বিশেষ করে সম্রাট

শাহ্ আলমের রাজত্বকালে দিল্লীতে ও দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে একদিকে সংগীত সরস্বতীর যে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে বাংলাদেশের ভাগ্যে তা-ই আশীর্বাদরূপে গণ্য হয়েছিল, কেননা দিল্লীর মসনদ থেকে আগত বহু বিদগ্ধ সংগীতশিল্পী কলকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ, গোবরডাঙ্গা, বেতিয়া, ময়মনসিংহ-গৌরীপুর, আসাম-গৌরীপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে, রাজদরবারে ও জমিদারবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে, বাংলাদেশে অভিজাত সংগীতানুশীলনের ক্ষেত্র প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বিবেকানন্দের সংগীতশিক্ষার পরিবেশ

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ও শিমুলিয়ার* দত্তবাড়ী তখন কলাবতী বা ক্ল্যাসিকাল সংগীতের সাধনকেন্দ্র ও পীঠস্থানরূপে পরিচিত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সংগীতসমারোহ ও সংগীতপরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে বিশেষভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা বিকাশের প্রসঙ্গে নানানভাবে, কিন্তু শিমুলিয়ার দত্তবাড়ীর সংগীতপরিবেশ ও সংগীতসাধনা নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি আজ পর্যন্ত। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির বেশ প্রচলন ছিল তদানীন্তনকালে। তাছাড়া ঊনবিংশ শতকের পূর্ব থেকেই কৃষ্ণকীর্তন, পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, সহজিয়াগান, হাফ্আখড়াই, কথকতা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, শ্যামাসংগীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি গীতরীতির প্রচলন ছিলই। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী, দেওয়ান রঘুনাথ, নিধুবাবু প্রভৃতি সংগীতরচয়িতাদের গান বাংলার সংগীত সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বৈঠকী গান হিসাবে টপ্পাচালের বাংলা খেয়ালসংগীত বাংলার দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপগুলিকে মুখরিত করে রেখেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান কলাবিদ্ তথা ওস্তাদদের উচ্চাঙ্গের ক্ল্যাসিকাল সংগীতের পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন এবং অনেক সময় তাঁদের গান শুনে শুনে অনুকরণ ও অভ্যাস করতেন প্রথমের দিকে, তেমনি শিমুলিয়ার দত্তবাড়ীতেও প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবারে দুদিন কলাবতী সংগীতের আসর বসত তা নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ সুকুমার বয়স থেকেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কিছু কিছু গানের নকলও করতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ও অন্যান্য গৃহপতিরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশেষ সমঝদার ও উৎসাহদাতা

ছিলেন, তেমনি শিমুলিয়া দত্তবাড়ীতেও নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্ত, পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রভৃতিরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসগ্রাহী ও সমর্থক ছিলেন। শোনা যায়, "পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন।"[১] পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বিশেষভাবে সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেনঃ "পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সঙ্গীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান কালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সুস্বরে গাহিতেন।"[২]

বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষা

আইন ব্যবসায়ীরূপে বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে কর্মোপলক্ষে; লক্ষ্মৌ, দিল্লী, লাহোর, রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে থাকার জন্য তিনি সেই সেই স্থানে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ সঙ্গীত-সংস্কারের অধিকারী হয়েছিলেন প্রধানত তাঁর পিতার কাছ থেকেই। তাছাড়া অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), বেণী ওস্তাদ, ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি বিবেকানন্দের সঙ্গীতরুচি ও সঙ্গীতানুশীলনকে সচল ও প্রাণবান করেছিলেন।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও সংস্কৃতিবান পিতা যে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল (হাবুবাবু) ও সুরেন্দ্রনাথের (তমুবাবু) মতো বিবেকানন্দেরও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন কলকাতার ও কলকাতার আশেপাশেব অভিজাত সমাজে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের বিশেষ প্রচলন ও সমাদর ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মৌ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ যখন কলকাতায় মেটিয়াবুরুজ-অঞ্চলে এসে বসবাস করেন তখন থেকে বাংলাদেশে ঠুংরিগানের বেশ প্রচলন হয়। ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ, রামপুর-দরবারের উজির খাঁ, গয়ার কানাই লাল ঢেড়ী, ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী ওস্তাদ (বেণী গুপ্ত) প্রভৃতির কাছে বিবেকানন্দ সঙ্গীতের প্রেরণা

পেয়েছিলেন। তিনি সংগীত শিক্ষা করেন বিশেষভাবে ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের কাছে। আহম্মদ খাঁ বেশ কিছু দিন কলকাতায় ছিলেন এবং শোনা যায় আন্দুলের রাজবাড়ীতে কিছু দিন সংগীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে তিনি খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন ছেলেবেলায়। তাছাড়া এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলাও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের গীতিকার ও সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

সুতরাং বাংলা ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, ধামার এবং ব্রহ্মসংগীতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তাছাড়া কীর্তনগান, বৈঠকী বাংলা টপ্‌খেয়াল, (শ্যামাসংগীত), কবীর ও সুরদাস প্রভৃতি সাধকদের হিন্দী ভজন গান তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন।

বিবেকানন্দের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, অর্থাৎ ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধ্রুপদ-গায়করূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "Swami Vivekananda : Patriot Prophet" গ্রন্থে লিখেছিলেনঃ "Naren....could play many instruments, though he excelled in songs."[৩]

তিনি আরও লিখেছেনঃ

"Narendra was an expert singer in classical music. He inherited that taste from his father who practised it for sometime in his youth. Narendranath learned music from an *Ostad* (teacher) named 'Beni'. The writer has heard from his mother that Kasi Ghosal was also one of his (Narendranath's) *ostads*. It is said that Kasi Ghosal used to play *pakhwaj*, etc., at the Adi Brahmo Samaj. Perhaps he learnt to play on the same instrument and along with it on *Bauya* and *Tabla* from him."[৪] কিন্তু প্রকৃত কথা কি, আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীতরচয়িতা, গায়ক ও বাদক (মৃদঙ্গবাদক) কাশী ঘোষালের কাছে বিবেকানন্দ পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা করেছিলেন কিনা তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পাখোয়াজ ও তবলার সঙ্গে সঙ্গে এসরাজ শিক্ষা করেছিলেন একথা ঠিক।

স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত ও সতেজ, সুমিষ্ট ও গম্ভীর।

শিশুকাল থেকেই পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সযত্ন শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিকাল সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন--সেকথা বলেছি। শিশুকালের সংগীতপ্রবণতা ও সংগীতসংস্কার তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন-কাল থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিব্রাজক জীবন পর্যন্ত তাঁর সংগীতানুশীলনের জীবন ছিল সবল।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থে (১৯৬৩) লিখেছেন ঃ "ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত 'নববৃন্দাবন' নাটকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে (বিবেকানন্দ) অভিনয়ও করে-ছিলেন।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠপরিচালিত মাসিক 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ নিয়মিতভাবে 'নববৃন্দাবন' নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'নববৃন্দাবন' নাটকে যোগিবর অভেদা-নন্দজীর* ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ বলেন ঃ "গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নববিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।"[৬] "শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত সেদিন অন্ততঃ নরেন্দ্রনাথ যোগিবরের অভিনয় করেছিলেন।"[৭] যোগিবর অভেদানন্দের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ নাকি একটি বাউল সুরের, একটি কীর্তন সুরের ও তিনটি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত গান করেছিলেন— যদিও এ সম্বন্ধে কিছু মতান্তর আছে। মোট কথা, এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ সংগীতখ্যাতির জন্যই নববিধানের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ 'নববৃন্দাবন' নাটকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের সংগীতজীবন

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা। কর্মচঞ্চল অথচ সংযত ও জ্ঞানানুসন্ধানী ছিল তাঁর জীবন। ইতিহাস, গণিত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ক্রীড়াকৌতুক, নাটকানুষ্ঠান ও অভিনয়, রন্ধনবিদ্যা, দাবাখেলা, নৌকাচালনা, অসিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও

বিবেকানন্দ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মোট কথা, আবাল্য তিনি ছিলেন মেধাবী, তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি, সহৃদয় ও সাহসী এবং তারই জন্য সকল কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মতো সংগীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভা লক্ষ্য করেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন ঃ নরেনের মধ্যে আঠারোটি শক্তি খেলা করছে। "নরেন্দ্র খুব ভাল, একাধারে কতগুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে।"

ছাত্রাবস্থায়ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিলন হয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথমে মিলিত হন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর মাসে কলকাতায় শিমুলিয়া পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে। তারপর তখনকার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (এখন যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যাপক হেস্টি সাহেবের প্রেরণায় ঈশ্বরপাগল শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখতে যান দক্ষিণেশ্বরে। তাছাড়া বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে কিন্তু সংগীত; অর্থাৎ বিবেকানন্দের সুমধুর গানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আকৃষ্ট হন বিবেকানন্দের প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথমে গান করেন বিবেকানন্দ দুটি ঃ (১) "মন চল নিজ নিকেতনে..." (ব্রাহ্ম সমাজের অযোধ্যানাথ পাক্‌ড়াশী রচিত) ও (২) "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে..." (বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রচিত)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান শুনেই বুঝেছিলেন নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ তাঁর "আপন লোক"। তারপর কত গান হয়েছে গাওয়া—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, কীর্তন, বাংলা ও হিন্দী ভজন প্রভৃতি, নিবিড় থেকে নিবিড়তম হয়েছে তাঁর জীবনের সম্পর্ক দক্ষিণেশ্বরতীর্থপতি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি গানও বিবেকানন্দ গেয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে। যেমন, (১) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে যে গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখে নিজেই সুর যোজনা করেছিলেন ও গীতরীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে সে গানটি ঃ

"দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বল দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়... .."

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২০ এবং বিবেকানন্দের ১৮ বছরের কিছু বেশী। (২) "দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন..." (ব্রহ্মসঙ্গীত,

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, 'রবিছায়া' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। (৩) "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা..." (বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে গাওয়া, 'রবিছায়া' গ্রন্থে গানটি দ্রষ্টব্য)। (৪) "মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ..." ('রবিছায়া' গ্রন্থে গানটি দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) প্রখ্যাত ধ্রুপদগায়ক যদুভট্ট কর্তৃক হিন্দী ঃ "আজু বহত সুমন্দ পবন..." এবং "কৌন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ..." গান দুটির বাংলায় রূপান্তর "আজ বহিছে বসন্ত পবন, সুমন্দ তোমার সুগন্ধ হে..." এবং "মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ..." গান দুটি ; রবীন্দ্রনাথ রচিত—"তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন..." (বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল) প্রভৃতি গান বিবেকানন্দ গাইতেন। এবং একথা সকলেরই বিদিত যে ঐ বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল গানটির ছাঁচে তিনি তাঁর সৃষ্টিবিষয়ক—"একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন..." প্রভৃতি গানটি রচনা করেন। এই গানটির ভাবতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন..." প্রভৃতি, গুরু নানক রচিত "গগনময় থাল রবি, চন্দ্র দীপক বনে..."[৯] এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত বাংলা গান "গগনের থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে.." প্রভৃতি গানের ভাবতত্ত্বের একান্ত মিল পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ ভাবের সাধক ছিলেন, তাই গানের কথা বা সাহিত্য ও সুরের মিশ্রণে যে অপার্থিব রস ও ভাব সৃষ্টি হয় তারই তিনি মরমী বোদ্ধা ও অনুভাবক ছিলেন।

ধ্রুপদের পথচারী রূপে বিবেকানন্দ হরিদাস স্বামী, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, মিঞা তানসেন প্রভৃতি বিদগ্ধ শিল্পী ও সুরসাধকদের গানই গাইতেন। তাছাড়া তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রচিত "মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়..." এবং ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গীতরচয়িতাদের এবং সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত কীর্তনাদি গান করতেন সেকথা বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের গানে কখনও সমাধিস্থ হতেন, কখনও বা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতেন।

বিবেকানন্দের ভাবসমৃদ্ধ গান কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণকে আলোড়িত ও সমাহিত করত তার দু-একটি নিদর্শন যেমন ঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৪ই জুলাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে। বহু ভক্ত সমাগত। বিবেকানন্দ গান করলেন একটির পর একটি ঃ

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা...।
(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি...।
(৩) কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার...।
(৪) এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো...।
(৫) আমার মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা...।
(৬) কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী...।
(৭) কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী...।

জীবনে ঘুম-পাড়ানো, আবার ঘুম-ভাঙানো সেই গান। গানের সুরতরঙ্গে গৃহের পরিবেশ ও আকাশবাতাস সমাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও সমাধিস্থ, কখনও আনন্দে পুলকিত, কখনও অশ্রুসিক্ত। গায়ক বিবেকানন্দও আত্ম-সমাহিত, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিত "আমার জীবনকথা" গ্রন্থেও বিবেকানন্দের একটি সংগীতপ্রসংগ আছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন ঃ "একবার রামবাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের ধ্রপদ-গানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রামবাবু প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিককে* নরেন্দ্রনাথের গানের সহিত বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।...নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিল এবং গোপাল মল্লিক মহাশয় অপূর্ব ছন্দে পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন।... সেইদিন নরেন্দ্রনাথের গান কী যে অনবদ্য হইয়াছিল তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বলরাম বসুর বাড়ীতেও নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হইত।"[১০]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোপাল মল্লিক মহাশয় তদানীন্তন বাংলার সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী নামে সমাদৃত ছিলেন, সুতরাং তাঁর পাখোয়াজ সংগতের সঙ্গে গান করতে হলে গায়কের যথেষ্ট পরিমাণে সুর, তাল ও লয়জ্ঞানের পরিপক্কতা থাকা উচিত।

বিবেকানন্দের সংগীতরচনা

প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ গান রচনা করেছিলেন মাত্র পাঁচটি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক গান রচনা করেছিলেন একটি, যাদের ভাষা, সাহিত্যসৌন্দর্য ও তত্ত্ব-

সমৃদ্ধি ছিল ভাবগম্ভীর ও অতুলনীয়। তিনি রচনা করেছিলেন ঃ

(১) একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ,
অতীত-আগামী-কাল-হীন ... (বড়োহংস-সারঙ্গ—চৌতাল)

(২) নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ... (বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা),

(৩) তাথৈইয়া তাথৈইয়া নাচে ভোলা,
ব্যোম্ বব বাজে গাল, ... (কর্ণাটি- একতাল),

(৪) হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি ... (সাহানা-কানাড়া -সুর-ফাঁকতাল),

(৫) মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া,
জানেকো দে ... (ধানীমিশ্র—কাওয়ালী),

(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-গান
খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥

এই আরাত্রিক গানটি পরে সামান্য তিনি পরিবর্তন করেন। গানগুলির রচনাকাল নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। আমরা আশ্বিন সংখ্যা (১৩৮২ সাল, ৭৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত (পৃঃ ৪৪৯—৪৫৮) "স্বামীজীর গানের খাতা" (প্রবন্ধটি সংগ্রহ করেছেন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ), এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রচিত "আমার জীবন-কথা" ও শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করব গানগুলি রচনার কাল বা সময় সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে। স্বর্গত প্রমথনাথ বসু লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" (৩য় সংস্করণ) ও স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখিত "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" (২য় সংস্করণ) প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐ গানগুলি রচনার কাল সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

একথা সকলেই জানেন। ঐ গানের খাতায় পেন্সিলে লেখা "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ" গানটিও আছে, এবং গানটি স্বামীজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি লাভের পরেই রচনা করেন, এবং এর সমর্থনও পাওয়া যায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিত "আমার জীবন কথা" (২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) গ্রন্থে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেনঃ "এই (নির্বিকল্প সমাধিতে) উপলব্ধির পর নরেন দু'টি গান রচনা করেন 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' ইত্যাদি এবং 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন, দেশহীন, সর্বহীন, নেতি নেতি বিরাম যথায়' প্রভৃতি। এই দু'টি গান গাহিয়া আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন।"[১২]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ উদ্বোধনে লিখেছেন ঃ "তাঁহার (বিবেকানন্দের) রচিত গানগুলির মধ্যে তিনটি গান এই খাতায় পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭-র মধ্যেই রচিত। কারণ এই তিনটি গানের মধ্যে যেটি এই খাতায় শেষে লেখা হইয়াছে, সেই 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটি মাষ্টার মহাশয় ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭ শিবরাত্রির দিন সকাল বেলা স্বামী শিবানন্দের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, 'এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন'।"[১৩] এর সমর্থনে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রচিত "আমার জীবন কথা" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বলি ঃ "শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ শিব-বিষয়ক একটি গান রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল,

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম বব বাজে গাল।
ডিমি ডিন ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মালা॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল॥

নরেন্দ্রনাথ শিবের আবেশে তন্ময় হইয়া গানটি রচনা করিয়াছিল এবং এমনই ভাবে বিভোর হইয়া গান করিয়াছিল যেন ভোলানাথ শিব নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে এক সুন্দর পরিবেশ! নরেন্দ্রনাথের

কিন্নরকণ্ঠে ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজিও আমার মনে জাগরূক আছে।" ১৪

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ প্রকাশিত "স্বামীজীর গানের খাতা" নিবন্ধের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ" গানটির এবং ৪৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ" গানটির স্বরলিপি বা স্বরলিখন এবং ১৫৬ পৃষ্ঠার পর এর একটি আলোকচিত্রও দেওয়া আছে। স্বরলিপিতে গানের কথার পাশে স্বরবর্ণ এ, আ, ই প্রভৃতি সঙ্কেত আছে—যেগুলিকে সঙ্গীতশাস্ত্রে "রসকলাত্মক উচ্চারণকলা" বলে; অর্থাৎ সঙ্গীতের কথায় বা সাহিত্যে স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় বর্ণেরই সমাবেশ থাকে এবং সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রে এ দুটি বর্ণকে শক্তি ও শিব বলে কল্পনা করা হয়েছে। স্বরবর্ণ শক্তি, তাই কথায়, সাহিত্যে ও রচনায় অর্থের সঙ্গে সঙ্গে রস ও ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে। এই স্পন্দনই কথা বা সাহিত্যের প্রাণ। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গীতরীতির কথায় রস ও ভাব সৃষ্টি করতে হলে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি রসকলাত্মক স্বরবর্ণের ব্যবহার করতে হয়। বিবেকানন্দ সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই, স্বরলিখনে এই স্বরবর্ণের ব্যবহার করেছেন গানগুলিকে স্বরের ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য।

বিবেকানন্দ পরে "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ" গানটির কথায় (সাহিত্যে) বা রচনায় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ঐ গানটির স্বরলিপির সঙ্গে উল্লেখ করা আছে 'বড়-সারঙ্গ' (অর্থাৎ বড়োহংস-সারঙ্গ)। সারঙ্গকে চলিত কথায় 'সারেঙ' নামেও ব্যবহার করা হয়। (গানের কথায় পরিবর্তন দ্রষ্টব্যঃ শারদীয়া উদ্বোধন, পৃঃ ৪৫৬)।

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা"—শিব বিষয়ক গানটির কথায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়; যেমন, 'তাথৈয়া' বা 'তাথইয়া' শব্দের স্থানে "তাথীয় তাথীয়" সংশোধন বা ব্যবহার করেছেন (পরিবর্তিত শব্দগুলি "শারদীয়া উদ্বোধন", পৃঃ ৪৫৭ দ্রষ্টব্য)। এই খাতায় গানগুলি প্রায় সমস্তই পেন্সিলে লেখা। "সঙ্গীতভাবনায় বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ প্রকাশিত "স্বামীজীর গানের খাতা"র কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম প্রাসঙ্গিক আলোচনারূপে। গানের খাতাটির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

"হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি, যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি"—গানটির রচনাকাল ঠিক জানা যায়নি, তবে গানটি যে শ্মশানচারী ভোলানাথ শিবের মহিমা বর্ণনায় মুখরিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর "মুঝে

বারি বনোয়ারী সেঁইয়া জানেকো দে" গানটি কোন প্রসিদ্ধ হিন্দীগানের অনুকরণে রচিত এবং এতে পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নায়িকা কোন সখীর আকুল মিনতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের ভাব সুস্পষ্ট। আর আরাত্রিকের বাংলা গান বা ভজনটি বলিষ্ঠ শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসসজ্জা নিয়ে ভক্তি সরসতার সঙ্গে এক অপার্থিব আনন্দপরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

বিবেকানন্দের সংগীতগ্রন্থ রচনা

সংগীতের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ঔপপত্তিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞান ছিল গভীর এবং ১২৯৪ সাল তথা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। বরানগর মঠ স্থাপিত হবার পূর্বেই গীতরচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্নিধানে থাকাকালেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিবেকানন্দ "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থের রচনা ও সংকলন কার্য আরম্ভ করেন। শোনা যায়, তারও পূর্বে এবং সন্ন্যাস গ্রহণেরও পূর্বে 'সংগীত' বিষয়ক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ নাকি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন সন্ধান আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কিংবা প্রমথনাথ বসু যে তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থের প্রথমভাগে (পৃঃ ৭৫) উল্লেখ করেছেন—"ভারতীয় সংগীততত্ত্ব" নামক একটি বৃহৎ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন—সেটি ঐ 'সংগীত' বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে অভিন্ন কিনা তাও ঠিক জানা যায় না। তাছাড়া "সংগীত কল্পতরু" সংগীতগ্রন্থে প্রকাশিত 'ভূমিকা' ও ঐ "ভারতীয় সংগীততত্ত্ব" প্রবন্ধটি এক কিনা তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান হয় যে, "সংগীত কল্পতরু"র ভূমিকা ও "ভারতীয় সংগীততত্ত্ব" একই নিবন্ধ।

"সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থ যখন ১১৮ নং আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত আর্য-পুস্তকালয় থেকে "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি.এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক" কর্তৃক সম্পাদিত ও ১ নং উমেশ দত্ত লেন থেকে "জ্ঞান যন্ত্রে" শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় তখন বিবেকানন্দের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। বিবেকানন্দ 'গীতগোবিন্দ' পদগানেরও একটি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পাখোয়াজ ও তবলা বিষয়ক কোন বাদ্যযন্ত্রের গ্রন্থ তিনি রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন কিনা তার সঠিক কোন প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না—যদিও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেকথা উল্লেখ করেছেন তাঁর ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর জীবনীতে।

"সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তুর অনেক অংশ পরে পরিবর্তিত

হয়ে বটতলা থেকে "সচিত্র বিশ্বসংগীত" নামে প্রকাশিত হয় (নূতন প্রথম সংস্করণরূপে ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসে) এবং তা থেকে বিবেকানন্দ-লিখিত ভূমিকাটি বহু অংশে পরিবর্তিত ও বর্জিত হয়। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয় তাঁর নূতন সংস্করণের মুখবন্ধে এইকথা বলেনঃ "প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলন-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি.এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।"

সংগীততত্ত্ব-ভাবনায় বিবেকানন্দ

সংগীতভাবনা সংগীততত্ত্ব-ভাবনা ছাড়া প্রাণহীন ও মূল্যহীন। সংগীত-ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হলেও তার প্রাথমিক উপকরণ সার্থক বহিরাবরণকে নিয়ে, কিন্তু তাছাড়াও আছে আন্তরিকতত্ত্ব বা ভাবতত্ত্ব যা সার্থক করে সংগীতের জীবনছন্দকে বা প্রাণস্পন্দনকে। শ্রুতি, স্বর, রাগরাগিণী, মূর্ছনা, আরোহী প্রভৃতি বর্ণ, অলঙ্কার, তাল, লয় ও বিচিত্র গীতরীতি প্রভৃতির প্রয়োজন সংগীতের বাইরের রূপকে সাজানোর জন্য, অন্তররূপ হল রসতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব ও রাগরাগিণীদের মাধুর্যময় মূর্তিতত্ত্ব এবং এখানেই প্রয়োজন অধ্যাত্মদৃষ্টি ও জীবনের অনুভূতি। বিবেকানন্দের সংগীতভাবনায় এই উভয় দিকেরই ছিল বিকাশ। তিনি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পূর্ণ চেতনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থের কলেবর সাজিয়েছেন ঔপপত্তিক আলোচনা দিয়ে এবং সংগীত রচনার ক্ষেত্রে দর্শনের দৃষ্টি ও অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতি নিয়ে অপরূপভাবে প্রকাশিত করেছেন সংগীতের প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক অংশ। তাই তাঁর সংগীতভাবনায় ও সংগীতের তত্ত্বভাবনায় দেখি দুয়েরই সমন্বয়—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক সংগীতভাবনার পূর্ণ পরিণতি।

"সংগীত কল্পতরু" রচনা ও সংকলনের প্রায় একই সময়ে (১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) বিবেকানন্দ রচনা করেন "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ" প্রভৃতি পাঁচখানি গান—যেগুলি সাহিত্য, ছন্দ ও রস সম্পদে এবং তত্ত্বসৌন্দর্যে পূর্ণ। তিনি "সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থে ঔপপত্তিক ও বৈজ্ঞানিক অংশের আলোচনা রূপে প্রথমেই পরিচয় দিয়েছেন সংগীত ও বাদ্যের, কেননা সংগীত ও সংগীতের সংগতি রক্ষা করে বাদ্য, তাই দুটির সার্থকতা সংগীতে সমধিক। তিনি সাংগীতিক শব্দ ও শব্দকম্পনের কারণের পরিচয় দিয়েছেন বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন শব্দকে বা শব্দতরঙ্গকে তিনি তুলনা করেছেন

বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে। তারপর পরিচয় দিয়েছেন সঙ্গীতের পরিমাপক সুর (টিউন) সম্বন্ধে—যা স্বর বা টোনেরই ফলশ্রুতি বলা যায়। যদিও সুর ও স্বর (টিউন বা টোন) ঠিক এক কথা নয়, তাহলেও সুরের (টিউনের) রূপ ও প্রকাশকে সার্থক করে স্বর বা টোন। তারপর আলোচনা করেছেন "সঙ্গীত কল্পতরু"র ঔপপত্তিক অংশে স্বরগ্রামের রহস্যকথা। স রি গ ম প ধ নি—এই সাত স্বরকে নিয়ে গঠিত হয় স্বরগ্রাম এবং এই স্বরগ্রামের ষড়্জ, ঋষভাদি স্বরনামগুলির পরিচয় দিয়েছেন তিনি অভিনবভাবে। বিবেকানন্দ সকল সময়েই সকল মতবাদ ও ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুনি ভরত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতক—খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) বীণার (চলবীণা ও অচলবীণার কথা) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন বীণার তারকে অঙ্গুলির দ্বারা ঘর্ষণ করে ক্রমোচ্চ-বিকাশের মাধ্যমে ষড়্জাদি সাতস্বরের স্বরস্থান নির্ণয় করতে।[১৫] বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাচীন সমাজ-বাসী মানুষ কিভাবে প্রকৃতির তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে শব্দতরঙ্গ বা শব্দের কম্পন থেকে সাঙ্গীতিক স্বরগুলির রূপ ও স্থান নির্ণয় করেছিল তা লক্ষ্যের বিষয়। তিনি বলেছেনঃ "যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠিত, ...ক্রমে আমরা দেখিব যে, তাঁহারা এই অতি দুরূহ বিজ্ঞানকে মধুময়ী কল্পনা সাহায্যে কি প্রকারে সর্বজন মনোরম করিয়াছেন।"[১৬] বিবেকানন্দের বর্ণনা এখানে রসপূর্ণ ও প্রাণময়ী, তিনি ছন্দ ও শব্দ চয়নে বর্ণনার মধ্যে এক অপূর্ব সাহিত্যসম্পদ সৃষ্টি করেছেন। শব্দঝঙ্কার ও অলঙ্কারশোভায় বিবেকানন্দের সঙ্গীত-বর্ণনার ভাষা এখানে সচেতন ও সতেজ।

তিনি সাতস্বরের উচ্চারণ বা প্রকাশ সম্বন্ধেও বলেছেনঃ সঙ্গীতের কথা বা সাহিত্য[১৭] উচ্চনীচ ও কোমলকঠিন স্বরব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাছাড়া সকল স্বরই উচ্চনীচ কম্পনসংখ্যার সাহায্যে সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিজ্ঞানও অনুরূপ সিদ্ধান্তই করে। সঙ্গীতের কোমল ও তীব্র স্বর-গুলিও শব্দকম্পনেরই উচ্চনীচ প্রকাশ।

তিনি বাদ্যযন্ত্রগুলিকে স্বরে ও সুরে বাঁধার কথাও বলেছেন, কারণ স্বর-সংগতি ও সুরসাম্য ছাড়া সঙ্গীতের প্রাণবস্তু কোনদিনই সবল হতে পারে না। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, কীর্তন প্রভৃতি গীতরীতির গঠন ও

প্রকাশভঙ্গির কথা নিয়েও তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে কেবল ধ্রুপদেরই পরিচালনা ছিল। মুসলমানদের রাজত্বের পর খেয়াল টপ্পা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।"[১৮]

তিনি রাগ ও রাগিণীর বিভাগের সার্থকতা স্বীকার করেছেন। এবং রাগ-রাগিণী যে নৈসর্গিক শব্দসৌন্দর্যেরই বিচিত্র ও সুসংগত রূপ ও বিকাশ ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বিভিন্ন ভাষার গঠন ও গতিপ্রকৃতির কথা স্বীকার করেছেন ও বলেছেন যে, বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গের গান রচনা ও তাদের প্রকাশ করা সম্ভব। জাতীয় ভাষায় গান রচনা করলে গানের অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই বাংলাভাষায় গান রচনা করার সার্থকতা যথেষ্ট। বিবেকানন্দের এই মন্তব্য বলিষ্ঠ ও অর্থপূর্ণ।

বিবেকানন্দ ভারতীয় সংগীতকে উপলক্ষ্য করে জাতীয় জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেনঃ "আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সংগীতেও তাহা লক্ষিত হয়।

"যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারেনা, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এই-রূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করেনা। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। ...গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দি ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। ...ইঁহারা সংগীতের মূল সূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। ...কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা-মালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল হইবেনা? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সংগীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাংলা ভাষায় নূতন নূতন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দি গানও বাংলা ভাষায় না গাহিলে চলিবেনা।"[১৯]

বিবেকানন্দের এই নির্ভীক ও দৃপ্ত ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত সর্বকালের জন্য, তাছাড়া তিনি যেন এসকল কথা অতি-আধুনিক বর্তমান সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন। অচলায়তনের পারে যাবার কথাই—শুধু সংগীতে নয়, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সমাজব্যবস্থা ও জীবনচিন্তা এই সকল কিছুর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার কথাই বিবেকানন্দ সকলকে বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দ "সংগীত কল্পতরু"র সকল সংস্করণেই কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। আমরা "সংগীত কল্পতরু"র একটি সংস্করণে দেখেছি তিনি মুদ্রিত গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার এদিকে সেদিকে বহু কিছু নূতন বিষয় ও বক্তব্য লিখে রেখেছেন—যেগুলি আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

তুলনামূলক আলোচনা



মানবতাবাদ ঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ

গুণদোষ নির্বিচারে দেশজাতি নির্বিশেষে মানবের প্রতি প্রেম-সহানুভূতি এবং মানবের দুঃখমোচনে ব্রতী হওয়ার ভাব মানবতাবাদের মূল কথা। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ (হিউম্যানিজম), স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ এবং বুদ্ধদেবের মানবতাবাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা যথেষ্ট থাকলেও এই মানব-প্রেম, এই মানবসেবা যে সর্বপ্রকার মানবতাবাদের প্রাণস্বরূপ, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বুদ্ধদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্থূলভাবেও পরিচিত পাঠক সহজে স্বীকার করবেন—মানবপ্রেম ও মানবসেবার ভূমিতে তাঁরা উভয়েই মহামানব। প্রেমের গভীরতায়, সেবার ব্যাপকতায় উভয়ে মানব-ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধানে আবির্ভূত হলেও তাঁদের উভয়কে সমপ্রকৃতি, সমমর্মী বলে চিহ্নিত করতে কষ্ট হয় না। স্বামীজীকে অনেক সময় যে বুদ্ধহৃদয় বিবেকানন্দ অথবা বুদ্ধাবতার বিবেকানন্দ অভিধায় নির্দেশ করা হয়, তা কোন মতেই অযথার্থ নয়। উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য কতখানি ছিল আমরা জানি না, তবে উভয়ের হৃদয়-আকর্ষণকারী ধ্যানমূর্তির সৌসাদৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে।

॥ ২ ॥

উভয়ের জীবনের মূল সুর—মানবপ্রেম। উভয়ের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার একমাত্র লক্ষ্য—মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন, যাতে তাঁর অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বাল্য থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন সুগভীর জীবপ্রেমের অমৃতধারায় রসময় হয়ে আছে। উভয়ের জীবনে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় আছে, বয়স ও পরিবেশোচিত কর্মে, যুগোপযোগী কর্তব্যসম্পাদনায় দক্ষতার প্রমাণ আছে, কিন্তু ঐ সব কিছুর মধ্যে "সূত্রে মণিগণা ইব" অনুস্যূত রয়েছে একটি পরদুঃখকাতর হৃদয়ের স্নেহপেলব স্পর্শ—যা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিচারে মানুষের—শুধু মানুষের বলি কেন, ইতর প্রাণীর পর্যন্ত—অন্তর স্পর্শ করে। আর সে স্পর্শ ধীরে অথচ অব্যর্থভাবে তার দিব্যজীবনে উত্তরণ ঘটায়। উভয়ের জীবন এরূপ অজস্র ঘটনার সমাবেশে সমুজ্জ্বল। বাল্যে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদসন্নিহিত উপবনে, উদাস অন্তর্মুখী

মনে বসে রয়েছেন। সহসা দেবদত্ত-শরাঘাতে আহত একটি হংস সন্নিকটে নিপতিত হল। জননীসুলভ যত্নে সিদ্ধার্থ হংসটিকে সবে বাঁচিয়ে তুলেছেন, এমন সময় সদম্ভ পদক্ষেপে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন দেবদত্ত; দাবি করলেন তাঁর শিকারের হংস। শান্তকণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেনঃ "প্রাণীটি কার হবে? যে তাকে মারে তার? না যে তাকে প্রাণ দেয় তার?" কিন্তু কে শোনে সে যুক্তি! সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত বললেনঃ "বরং শাক্যরাজ্য ছেড়ে দেব তোমায়, কিন্তু আহত এ হংস আমি দেব না।"

আরও পরের কথা। নৃপতি বিম্বিসারের কাছে বুদ্ধদেব নিজের প্রাণের বিনিময়ে ছাগশিশুর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বললেনঃ যদি আপনি মনে করেন যে, বলিদান বিনা দেবারাধনা সম্পূর্ণ হবে না, তবে ছাগশিশু বলি দিয়ে আপনার যা পুণ্য হবে, আমায় বলি দিলে আরও বেশী পুণ্য হবে। আমায় বলি দিয়ে ছাগশিশুগুলিকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

"দ্বাদশ বৎসর ক'রেছি কঠোর তপ—
যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,—
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।"

আশৈশব নরেন্দ্রনাথের পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাই। আর্তের আর্তি দেখলে যেন আর রক্ষা নেই। বাড়ীর যা কিছু পান, তাদের দিয়ে ফেলতেন। এরূপ ছেলেকে নিয়ে সংসার করা দায়। মা বিরক্ত হয়ে ছেলেকে দোতলায় গৃহবন্দী করেছিলেন। তার ফলে জানালার ফাঁক দিয়ে ছেলে বাড়ীর মূল্যবান বস্ত্র গরীবদুঃখীদের দিতে শুরু করেছিলেন। রাস্তায় কচি এক বালক গাড়ী-চাপায় মৃত্যুর মুখোমুখি। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নরেন্দ্র তার জীবন রক্ষা করল। খেলার মাঠে দোলনার কাঠ ওঠাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। সাহায্যকারী বিদেশী নাবিক আহত হল। সঙ্গীরা অধিকাংশ পালাল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ দু-চারজনকে নিয়ে নাবিকের সেবাশুশ্রূষায় রত হল। পরীক্ষার 'ফি'-র অভাবে সহপাঠীর দুর্ভাবনা নরেন্দ্রনাথ নিজের বুকে টেনে নিলেন। তার বেতন মকুব করার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব বহু কষ্টে কৌশলে পালন করেছিলেন।

আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তির পথ আবিষ্কারের দুর্লভ দুর্জয় সংকল্প সিদ্ধার্থকে রাজপ্রাসাদ-ছাড়া করে সন্ন্যাসের ধূলিধূসরিত পথে নামিয়েছিল, আমরা জানি। কিন্তু তাঁর ঐ সংকল্প কখনও ব্যক্তিগত দুঃখের অবসানস্পৃহা অথবা নির্বাণপিপাসা-প্রসূত ছিল না। সন্ন্যাস অবলম্বন ও সাধনার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, কারণ বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর দুঃখময় ক্রন্দন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছিল এবং তাঁর করুণার্দ্র হৃদয় জগতের ব্যথাদ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

> "This will I do because the woful cry
> Of life and all flesh living cometh up
> Into my ears, and all my soul is full
> Of pity for the sickness of this world ;" [১]

বস্তুত, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির, সমাধি ও কর্মের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল-- মানুষের দুঃখ দূর করা। দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। এমন কি দৃশ্যমান জীবজগতের অন্তরালস্থিত পরমার্থসত্য-অন্বেষণস্পৃহাও তাঁর সাধনার হেতুভূত কারণ নয়। সত্যান্বেষণ যা তিনি করেছেন, তা মানুষের দুঃখমোচনের জন্যই। সত্যের জন্যই সত্যান্বেষণ তাঁর ঈপ্সিত ছিল না-- স্পষ্টই মনে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দেরও জীবনে ছিল ঐ একটিমাত্র সুর—সীমাহীন নিঃস্বার্থ-পরতা, যার অপর নাম বিশুদ্ধ মানবপ্রেম। ব্যক্তিগত জাগতিক সুখ তো নয়ই, ব্যক্তিগত সমাধিসুখও তাঁর কাম্য ছিল না। শৈশব থেকেই তাঁর যেন মজ্জাগত ধারণা যে তিনি ব্যক্তিসুখলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেননি। ঈশ্বরদর্শনের জন্য, জগৎ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে অবস্থিত পরমসত্যলাভের জন্য যখন তিনি অশান্ত উদ্বেল প্রাণে সাধক থেকে সাধকান্তরের কাছে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, অথবা যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হবার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, তখন মানুষের ব্যথাদরদী তাঁর হৃদয়খানি অন্তর্লীন হয়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল, বেশ অনুমান করা যায়। যে পরমসত্য-অমৃত তিনি জগৎ-বাসীকে বিলাবেন, তা তো আগে অর্জন করা চাই! মনে হয়, সাধনকালে তাঁর ঈশ্বরদর্শন বা সমাধিনিমজ্জনস্পৃহা যে অন্য সব কিছুকে এমন কি লোকহিতকামনাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল, সেও ঐ মানবপ্রেমকে সার্থক বিকাশের পথ দেখাবার জন্যই। নিজ প্রার্থনামতো নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের তিনি সাক্ষাৎকার

করলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আজীবন-বিস্মৃত-হবেন-না—এমন তিরস্কারও লাভ করলেনঃ "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!" [২] বিবেকানন্দ যে নিজের মুক্তিতে তৃপ্ত থাকেননি—সর্বমুক্তি যে তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়েছিল, সেকথা তাঁর উত্তরজীবন সন্দেহাতীতভাবে সপ্রমাণ করছে। এই বিবেকানন্দই এক সময় ভারতের নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় করুণাশ্রু-ছলছল হয়ে বলছেন গিরিশচন্দ্রকেঃ "দেখ, গিরিশবাবু, মনে হয় এই জাতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।" [৩] অথবা ভারতের পথে লন্ডন থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে প্রাণস্পর্শী ভাষায়ঃ "আমার হয়তো এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেহ হইতে মুক্ত হওয়া—পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় ইহাকে ছুঁড়িয়া ফেলাই সমীচীন। কিন্তু যতদিন মানবজাতির সকলে সর্বোত্তম সত্যকে জানিতে না পারিবে, ততদিন আমি কখনও প্রচারকার্য বা সাহায্যবিতরণ হইতে বিরত হইব না।" [৪] সম্বোধি-লাভের পর মানুষকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখাতে, তাকে সেবাযত্ন, আশাভরসা, উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা সেপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বুদ্ধদেব কিভাবে জীবনের অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বছর [৫] তিল তিল করে ক্ষয় করেছেন, ইতিহাসের পাতায় মনে হয়, তার একটা আবছা চিত্র মাত্র অঙ্কিত রয়েছে। অল্প যেসব ঘটনা আমরা জানি, তা যখন আমরা অনুধ্যান করি, তখন মানবতার এই একনিষ্ঠ পূজারীর একটা মাতৃহৃদয় আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। চোখের সামনে জেগে ওঠে নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমালের শ্রমণ অঙ্গুলিমালে রূপান্তরের দিব্য কাহিনী। জেগে ওঠে সেই চিত্র যেখানে তিনি দরদভরা প্রাণে পুত্রশোকাতুরা জননীকে দ্বারে দ্বারে পাঠাচ্ছেন এমন বাড়ী থেকে একমুষ্টি সর্ষপ সংগ্রহণের জন্য, যে বাড়ীতে কেউ কখনও মরেনি। মনে পড়ে সেই দৃশ্য যেখানে তিনি রাজপুরুষের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সমাজের ঘৃণা-অবহেলিত গণিকা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তাকে কৃতার্থ করছেন, অথবা নারীজাতির প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তাঁদের সন্ন্যাসিসঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি

দিচ্ছেন। আর মনে পড়ে সেই অন্তিম দৃশ্যটি যখন মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে দরিদ্র ভক্ত চুন্দ প্রদত্ত গুরুপাক আহার গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করছেন, আর মহাপরিনির্বাণ-প্রাক্কালে চুন্দের কাছে পেঁছে দেবার জন্য রেখে যাচ্ছেন স্নেহ-মধুর কয়েকটি কথাঃ "চুন্দ যেন দুঃখ না করে যে তার প্রদত্ত আহার্য গ্রহণে বুদ্ধ দেহত্যাগ করলেন বরং যেন আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, যেমন সুজাতার পায়সান্ন ভক্ষণের পর বুদ্ধ নির্বাণ পদবী লাভ করেছিলেন, তেমনি তিনি চুন্দ-নিবেদিত আহার্য গ্রহণান্তে মহাপরিনির্বাণলাভ করবেন।" বুদ্ধদেব কঠোর জীবনচর্যায় প্রত্যহ ৮/১০ মাইল পথ পরিব্রাজন করে দ্বারে দ্বারে, নির্বাণে উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলের অবারিত অধিকার, নৈতিক জীবনযাপনে সকলের প্রয়োজন—এই নববার্তা পেঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সৃষ্টি করলেন এক নবীন উদার শ্রমণ (সন্ন্যাসী)-সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণ্যমান্যরা সে সম্প্রদায়ে যেমন স্থান পেল, তেমনিভাবে স্থান পেল ক্ষৌরকার তনয় উপালীর মতো তৎকালীন সমাজের অবহেলিত মানুষ।[৬] সেবার মহান ব্রতে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের উদ্বুদ্ধ করলেনঃ "'যাও ভিক্ষুগণ, দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর—বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এই মহদ্ধর্ম্মের প্রচারব্রত গ্রহণ কর'।"[৭] দিকে দিকে অন্ন, বস্ত্র, ওষুধ, পথ্য, শিক্ষা ও ধর্ম সর্ববিধ উপায়ে মানবসেবার দ্বার উন্মোচিত হল। শুধু হাসপাতাল আর পিঞ্জরাপোল নয়, নালন্দা-তক্ষশিলার মতো ধর্মশিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষায়তন, সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজীবন-শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে অজস্র বৌদ্ধবিহার। সেবা, প্রেম ও মৈত্রীভাবনার একটা প্লাবনে দেশ ভরে গেল। সে প্লাবনের পলিমাটিতে দেশের সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, রীতিনীতি, আচারবিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান নতুন স্বাস্থ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গিরিগুহায় তপশ্চরণের ব্রত নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বেশীদিন ডুবে থাকতে পারলেন না। যে মানবপ্রেমের বাহুডোরে বাঁধা পড়ে সপ্তর্ষিলোক থেকে তাঁর অন্তরাত্মা ধরণীর ধূলিতে নেমে এসেছিল, সে তাঁকে স্থির থাকতে দেবে কেন? আজ রাজপ্রাসাদ, কাল তরুমূলে বাস, আজ গণ্য-মান্যের সাহচর্যে, কাল সমাজের অন্ত্যজ পদদলিতের পর্ণকুটিরে, এইভাবে আসমুদ্রহিমালয় ভারতপরিক্রমা করে ভারতের লক্ষকোটি নরনারায়ণের অধ্যাত্ম-জীবনের গতিপ্রকৃতি শুধু নয়, লৌকিক, প্রাত্যহিক, জাগতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, আশানিরাশার সঙ্গে সহানুভূতিতে এক হয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। হৃদয়টা এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে, যেন ছটফট করছিলেন—

দুর্গত মানুষের সেবার জন্য কিছু করতে। আমেরিকা রওনা হবার প্রাক্কালে আবু রোডে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ)-কে, "মুখে একটা গভীর বিপদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে কম্পিতকলেবরে" বলেছিলেনঃ "'হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।...কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!' তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন না—চোখের জল পড়তে লাগল।"[৮] স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলতে বলতে স্বামী তুরীয়ানন্দও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ অশ্রুসিক্তনয়নে নীরবে বসে রইলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলেছিলেনঃ "স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন...আমি ভাবছিলামঃ 'বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?...আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল'।"[৯] পরবর্তীকালের অনুরূপ একটি ঘটনা—স্থান কলিকাতাস্থ বলরাম বসুর বাসভবন। প্রত্যক্ষদ্রষ্টা স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেনঃ "স্বামীজীকে দেখতে এসে দেখি, তিনি এত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বারান্ডায় পায়চারি করছেন যে, আমার আগমন টেরই পেলেন না। পাছে তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ে এই ভয়ে আমি চুপ করে রইলাম। একটু পরে স্বামীজী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মীরাবাই এর একটি বিখ্যাত গান গুন গুন করে গাইতে লাগলেন। পরে নিজের হাত দুখানিতে মুখ লুকিয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে বিষাদভরে গাইলেন, 'দরদ না জানে কই!'... 'ঘায়ল কী খত ঘায়ল জানে, আওর না জানে কই'—এই বিষাদময় গানে যেন সমস্ত আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হচ্ছিল।...একটু পরেই বুঝতে পারলাম—জগতের দুঃখিত নিপীড়িতদের দুঃখের প্রতি এক অপার সহানুভূতিতেই তাঁর এই ব্যথা!"[১০] বিবেকানন্দকে কেন বুদ্ধহৃদয় বলা হয় তার ব্যাখ্যা এরপর নিষ্প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে রয়েছেন (এপ্রিল ১৮৯৮)। সংবাদ পেলেন কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং তা করালমূর্তি ধারণ করার সম্ভাবনা। বিশ্রামসুখ স্বামীজীর বিস্বাদ লাগল। পাহাড় থেকে নেমে শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় সেবাকার্যের বড়,

পরিকল্পনায়, ব্যবস্থাপনায় রত হলেন। যখন প্রশ্ন করা হলঃ "টাকা আসবে কোথা থেকে?" স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেনঃ "কেন, দরকার হলে নূতন মঠের (বেলুড়মঠ স্থাপনের জন্য নূতন ক্রীত জমি) জমি-জায়গা বিক্রি করে দেব।" কার্যত বেলুড়মঠ বিক্রি করতে হয়নি সত্য। কিন্তু কতবড় মহাপ্রাণ ছিলেন স্বামীজী! যে মঠস্থাপনের স্বপ্ন সুদীর্ঘ বারো বছরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে রূপ দিতে যাচ্ছেন, তা এত সহজে অম্লানবদনে আর্তসেবার জন্য বিক্রি করার প্রস্তাব বিবেকানন্দের মতো মানবপ্রেমিকই পারেন।

দরিদ্র পদদলিত নিপীড়িত ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে তিনি যে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, কত উষ্ণ অশ্রু মোক্ষণ করেছেন, কে তার ইয়ত্তা করে! আমেরিকা থেকে ২০।৮।১৮৯৩ তারিখে লিখছেনঃ "আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর!...ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।... দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে।...আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।...স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। প্রত্যুত, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব।...কেবল বিশ্বাসী হও।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।"[১১] বেলুড়মঠে কায়িককর্মে রত সাঁওতাল স্ত্রীপুরুষদের নিজে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে স্বামীজী বলছেনঃ "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ

নারায়ণ। এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি।... এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি?...ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রী করে দিই, এইসব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?...আহা! দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!...আমরা দিনরাত তাদের কেবল বলছি—ছুঁসনে ছুঁসনে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাঠি!...তোরা সব বুদ্ধিমান ছেলে, হেথায় এতদিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি?...এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।"[১২]

বস্তুত, স্বামীজী যে অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতির কথা বলেছেন, তিনি নিজে ছিলেন সেই বিশ্বাস, সহানুভূতি ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।

বুদ্ধের মানবপ্রেম যেমন নিছক একটা হৃদয়বৃত্তিরূপে তাঁর মানসলোকে সীমাবদ্ধ থাকেনি, মানবসেবার বিচিত্র ক্ষেত্রে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও মানবসেবার কর্মভূমিতে বহু উপায়ে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। শরীরের ক্ষুধা, বুদ্ধির ক্ষুধা এবং বোধির ক্ষুধা দূর করবার, অন্ন, বিদ্যা ও ধর্ম দিয়ে তাঁর বহুমুখী সেবাযজ্ঞের কথা সর্বজনবিদিত। দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সাধারণ শিক্ষা, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সেবাযজ্ঞের নানা অঙ্গমাত্র।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম ও ভারতসেবা তাঁর মানবপ্রেম ও মানবসেবারই একটি দিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও কারও মনে সন্দেহ জাগে বুঝিবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম নির্বিশেষ মানবপ্রেম নয়—গণ্ডিবদ্ধ স্বদেশপ্রেম; তাঁর মানবতাবাদ আসলে হয়তো বা শুধু স্বদেশপ্রেম। স্বামীজীর জীবনের কেবলমাত্র একজাতীয় ঘটনা ও উক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচারের ফলে এরূপ ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর অন্যরূপ উক্তি এবং অন্য তাৎপর্যব্যঞ্জক

ঘটনাগুলি জানলে তাঁর মানবতাবাদ যে শুধু ভারতবাসীকে কেন্দ্র করে নেই—দেশ-জাতি-কুল নির্বিশেষে মানুষকেই আশ্রয় করে রয়েছে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। ভারতবর্ষের নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁর প্রেম সহানুভূতি সেবাপ্রবৃত্তি ভারতবাসীর দিকে স্বভাবতই প্রথমে ধাবিত হয়েছে, যেমন বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশনা ও পরিব্রাজনের প্রথম ফলভাগী হয়েছে তাঁর জন্মস্থানের, পূর্বভারতের অধিবাসিবৃন্দ। কিন্তু প্রথম ফলভাগী তারা হলেও বুদ্ধের জীবন ও বাণী যেমন সার্বজনীন মানুষের উদ্দেশ্যে আচরিত ও কথিত, এক্ষেত্রে স্বামীজীর জীবন ও বাণী তেমনিভাবে সর্বদেশের মানুষের কল্যাণকামনায় উদ্‌যাপিত ও কথিত। তবুও স্বামীজীর নিবিড় স্বদেশপ্রেম তাঁর মানবতাবাদকে সংশয়ের বিষয় করে তোলে অগভীর পাঠকের কাছে। স্বামীজী বলছেনঃ "যতদিন এদেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন আমার ধর্ম হবে সে কুকুরকে খাওয়ান।"[১৩] বিদেশে যে ধর্ম-প্রচার করতে গেছেন—সেখানেও তার আদিকারণ বলেছেন—ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা, অন্তত ভারতের কাজের জন্য একটা বিহিত করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রতীচ্যে বেদান্তপ্রচার যেন শুধু ভারতকে সাহায্য করার জন্য—প্রতীচ্যের স্বার্থে নয়। ২০শে জুন, ১৮৯৪ তারিখে শ্রীহরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে স্বামীজী লিখছেনঃ "আমার এখানে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য অন্য একটি বিশেষ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।" পত্রমধ্যে ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ বিশেষ কাজটি হল ভারতের জনসাধারণের উন্নয়নকর্ম তাঁর পরিকল্পনামতো শুরু করা।[১৪] ২০শে আগস্ট, ১৮৯৩ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখছেনঃ "দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি।...হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্য-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।"[১৫] স্বামীজীর মনোভাব উপরিউক্ত দুটি উদ্ধৃতিতে সুব্যক্ত। স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে সাধারণ শ্রোতা ও বিশিষ্ট অনুরাগিবৃন্দ-প্রদত্ত কিছু অর্থ এনেছিলেন যার দ্বারা বেলুড়মঠের পত্তন সম্ভব হয়েছিল—এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে স্বামীজীর জীবনোদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মানুষগুলিকে লক্ষ্য করে আবর্তিত হয়েছে মনে করলে মহা ভুল

হবে। ভারতের ক্ষুধাপীড়িত, অশিক্ষামজ্জিত আর্ত মানুষের আর্তিহরণের জন্য আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী আর এক ধরনের আর্ত পীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। দেখলেনঃ সে মানুষ দারিদ্র্যবশত নয়, ঐহিক আতিশয্যবশত বড় দুঃখী, বড় অসহায়। বড় বড় প্রাসাদ, সুন্দর সুন্দর গাড়ী, বর্ণাঢ্য হ্যাটকোট প্যান্টলুনের আড়ালে, অজস্র আরাম-বিলাস-বিভবের অন্তরালে সে মানুষের অন্তরে যে একটা করুণ আর্তনাদ, একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, বিবেকানন্দের মর্মে তা সাড়া দিয়েছিল। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চিনেছিলেন দেবলোকের—সপ্ত-ঋষির অন্যতম বলে, মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে—শুধু ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখী হয়ে নয়—ধরাধামে অবতীর্ণ ঋষিরূপে। সে স্বরূপ তাঁর যাবে কোথা? আর তাঁর গুরু ছিলেন মানবপ্রেমে আপনহারা পাগলপারা—স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও বুদ্ধি নেই, বিতরণের ক্ষেত্রে কোনও হিসাব নেই। বেহিসাবী গুরুর বেহিসাবী চেলা বিবেকানন্দেরও বিদেশে গিয়ে সব হিসাব যেন গোল হয়ে গেল। দেনাপাওনার কথা ভুলে গিয়ে অধ্যাত্মক্ষুধাতুর, ঈশ্বরাদর্শহীন মানুষের ব্যথা দূর করার জন্য, তাদের জীবনকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র আলোকে সমুজ্জ্বল করার জন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বৎসর অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম ভারতেই রয়েছে। তাকে শুধু বিশোধিত করে কাজে লাগাতে হবে আর বাইরে থেকে বিজ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা এনে ভারতের মানুষগুলির সেবা করতে হবে। —এই হল সংক্ষেপে ভারতের সম্বন্ধে স্বামীজীর প্ল্যান। তেমনিভাবে পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসার্হ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে তাদের জীবনে অন্তর্মুখিতা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এ হল প্রতীচ্যের সম্বন্ধে স্বামীজীর প্ল্যান। কাজেই পাশ্চাত্যে গিয়ে পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্যই সার্বজনীন ধর্মপ্রচারে স্বামীজী তিলে তিলে নিজেকে প্রায় ক্ষয় করলেন। তাঁর এই বিশ্বজনীন ব্রত স্বামীজীর কাছে সর্বদা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডিকে তিনি লিখছেন (নিউইয়র্ক, ৯ই আগস্ট, ১৮৯৫)ঃ "ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ যাহাদিগকে লোকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক।"[১৬] বস্তুত, "যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর, এবং তাঁহার উপর ভারতবর্ষ একা কোন বিশেষ দাবি করিতে পারে না। নরনারীকে তাহাদের দিব্যভাব সম্বন্ধে সচেতন করা—মানবজাতির ঐক্য

সম্বন্ধে সকলকে জাগ্রত করাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্য।"[১৭] স্বামীজী যখন প্রতীচ্যে অধ্যাত্মসাধনার প্রচার ও শিক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বাস্তবিকই তাঁকে সেদেশের অধিবাসিবৃন্দ একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, পরমপ্রেমময় আচার্য বলে অন্তর থেকে অনুভব করতেন। অবশ্য ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসার অন্যতর কারণও ছিল। সে কারণটি হল ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ এবং তার মানবসভ্যতাকে অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত রাখার ক্ষমতা। প্রত্যক্ষভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন এবং জগতের ইতিহাসপাঠ-জনিত জ্ঞানদ্বারা স্বামীজী নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে, ভারত তার অধ্যাত্মসম্পদের দ্বারা মানবসভ্যতার অধ্যাত্মসাধনারূপ অঙ্গটি বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতবাসীর বিপর্যয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মসংস্কৃতির বিলোপ। ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি-উৎসাদনে বিশ্বসভ্যতা-সংস্কৃতির সমূহ সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। "ভারত কি মরে যাবে? তা যদি হয় সারা পৃথিবী থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; সর্বপ্রকারের নৈতিক পূর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে...। এরূপ কখনও হতে পারে না।"[১৮] যাতে এরূপ না হয়, সেজন্য স্বামীজী ভারতবর্ষকে, ভারতবাসীকে বিশেষভাবে ভালবেসেছেন। জগতের মানুষকে সমভাবে ভালবাসেন বলেই ভারতকে বিশেষভাবে ভালবাসা। ভারতের ভাল হবার উপর পৃথিবীর ভাল হওয়া, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে। কিন্তু স্বামীজী সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেনঃ "আমি যেমন ভারতের তেমন বিশ্বের।"[১৯] সত্যই, গভীরতর স্বদেশপ্রেমের সহিত উদারতম বিশ্বপ্রেমের দুর্লভ মিলন স্বামীজীর জীবনে সংঘটিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, স্বামীজীর ভাষণ ও রচনাদি পড়লে কোনও সন্দেহ থাকে না যে ভারতের কল্যাণপ্রচেষ্টায় তিনি বেশীরকম ব্যাপৃত থাকলেও তাঁর লক্ষ্য মানব-জাতির কল্যাণ, তাঁর ব্রত মানুষকে দেবতা করার ব্রত। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব পরিস্ফুট হতে সাহায্য করা ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর অন্য কাজ, অন্য প্রেম (অর্থাৎ ভারতপ্রেম) ঐ মানবপ্রেম-পারাবারে তরঙ্গ বিশেষ। "স্বামীজী... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূখণ্ডের কল্যাণচিন্তায় ও মঙ্গলসাধনে ব্রতী—সব দেশই তাঁহার আপনার দেশ, সব মানুষই তাঁহার আপনার জন।"[২০] তিনি তাঁর যে জীবনাদর্শ বিবৃত করেছেন ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ৭ই জুন, ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে, তাতে কোন দেশকালের গণ্ডিবদ্ধ মানুষের

ধারণাই নেই। তিনি লিখছেন ঃ "আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্ব্বকার্য্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্দ্ধারণ করে দিতে হবে।"[২১] "আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত" হবার জন্য, "ভোগবাদজাত দানবনাশে"র জন্য দেশকাল নির্বিশেষে তিনি মানুষকেই আহ্বান করেছেন, শুধু ভারতবাসীকে নয়। "হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে?"[২২] বস্তুত, স্বামীজী আজীবন এই মহত্তম কাজটি—মানুষের দেবত্বকে উদ্বোধিত করার কাজটিই শুধু করেছেন। মানবতার পূজারী হিসাবে তাঁকে বিচার করার সময় এই সত্যটুকু সর্বদা মনে রাখতে হবে। তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি কিরূপ দয়ার্দ্র ব্যবহার করতেন তার বহু বিবরণ তাঁর জীবনীতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এই সব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, লাঞ্ছনা দেখলেই স্বামীজী নিশ্চিতভাবে দুর্গতদের পক্ষ নিতেন, নিজের ভারতবাসী বোধ পর্যন্ত যেন মুছে যেত। ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা তাঁর আমেরিকা যাওয়ার অন্তত প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল, আমরা জানি। কিন্তু সেখানে যে অর্থ বক্তৃতাদ্বারা পাচ্ছিলেন—ভাবতে অবাক লাগে—"এই স্বোপার্জিত অর্থও আবার অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিতেন...।"[২৩] তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে আমেরিকায় তাঁর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন—আদর্শ জীবনযাপন করে, নিখিলবিশ্বকে আপনার দেশ মনে করে পাশ্চাত্যের লোকের মনে অধ্যাত্মভাব জাগ্রত করতে আর ভারতবর্ষকে ভুলে যেতে, অর্থাৎ স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরীয় ভাবপূর্ণ মানবিকতার ভূমিতে বাস করতে। "হরি ভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভুলে যাও।"[২৪] এই ছিল তাঁর মুখোচ্চারিত কথা, তুরীয়ানন্দের প্রতি। আমেরিকায় অবস্থানকালে একসময় এক হোটেলওয়ালা তাঁকে নিগ্রো মনে করে হোটেলে প্রবেশ করতে দিল না বরং অভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিল। তবুও তিনি বললেন না যে, তিনি ভারতীয় হিন্দু, নিগ্রো নন। কারণ এরূপ বলে তিনি হোটেলে সহজে

স্থান পেলেও তার দ্বারা এটা বোঝাত যে, মানুষ হিসাবে নিগ্রোরা ছোট এটা যেন তিনি মেনে নিলেন। অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে স্বামীজী পরে সেই শহরে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন; হোটেলওয়ালা নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চাইল। এক নাপিতের দোকান থেকেও একবার এভাবে তাঁকে অপমানিত হয়ে সরে যেতে হয়েছে। সেখানেও স্বামীজী "আমি নিগ্রো নই—আমি ভারতীয়" এভাবে আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের সুবিধা খুঁজে নেননি। "কেন তিনি এসব স্থলে আত্মপরিচয় দিলেন না"—জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যের এ প্রশ্নের উত্তরে পরে বলেছিলেনঃ "কি, অপরকে ছোট ক'রে আমি বড় হব? আমি তো পৃথিবীতে সেজন্য আসিনি!"[২৫] মানবতার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম; মানবতাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এমন কি জাতিগত লাভালাভের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে গৌণ।

পাশ্চাত্য থেকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের কালে কায়রোর পথে একটি ঘটনা। সঙ্গীদের সাথে স্বামীজী পথ হারিয়ে শহরের একটি কুখ্যাত গণিকা-বেষ্টিত অঞ্চলে এসে পড়েছেন। সঙ্গিগণ অপ্রস্তুত! পথের ধারে বিচিত্র-ভূষণে ভূষিত রমণীরা দ্বারপ্রান্তে বসে আছে। তাদের কেউ কেউ স্বামীজী ও সঙ্গীদের আহ্বান করাতে সকলের চমক ভাঙল। বন্ধুগণ দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। করুণাবিগলিতহৃদয় স্বামীজী কিন্তু ধীরে ধীরে সঙ্গীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বেঞ্চিতে উপবিষ্টা রমণীদের দিকে এগিয়ে চললেন। বলতে লাগলেনঃ "আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা ওদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবত্ব বলি দিয়েছে। এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!" স্বামীজী অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। নারীগুলি নীরব, লজ্জিত, অভিভূত হল। কেউবা, নতজানু হয়ে স্বামীজীর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করে স্পেনিশ ভাষায় মৃদুস্বরে বলতে লাগলঃ "'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ,' 'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ', 'ইনি ভগবানের লোক'!"[২৬]

স্বামীজীর জীবনদর্শন, জীবনব্রত আলোচনা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তিনি যখন যেদেশে, যে জাতির মধ্যে থেকে কর্মে ব্যাপৃত থাকুন না কেন, সর্বদাই তিনি মহামানবের—মানবরূপ নারায়ণেরই—সেবা করেছেন। তিনি চাইতেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি সমাজ এমনভাবে গঠিত হোক যেখানে মানুষ তার শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ পাবে। ভারতবর্ষে অধ্যাত্মজীবন গঠনের জন্য সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কত সুযোগসুবিধা পায়, অথচ সেই মানুষ যদি একটু বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য

অর্জন করতে চায়, তবে তার পথে অসংখ্য বাধা। তেমনিভাবে পাশ্চাত্যে টাকা-পয়সা ভোগসুখ অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের পর্যন্ত সব দরজা খোলা, অথচ সে যদি ধ্যানপরায়ণ জীবন কাটাতে যায়, সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ তাকে আদৌ সাহায্য করে না; বরং প্রতিকূলতা করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ২৭।১।১৯০০ তারিখে "আমার জীবন ও ব্রত" বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেনঃ "আমার মতে দুই দেশের ধারণাই ভুল। আমি বুঝতে পারি না এদেশে (আমেরিকায়) যদি কোনও লোক চায় সে কেন স্থির হয়ে বসে ধ্যানের সুযোগ পাবে না।... ঠিক তেমনিভাবে এটাও আমি বুঝতে পারি না ভারতবর্ষে কোনও লোক যদি ইহজীবনের একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগ, একটু অর্থ-উপার্জন করতে চায় সে কেন প্রয়োজনীয় সুযোগ পাবে না!"[২৭] আলমোড়া থেকে মিঃ মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে ১০।৬।১৮৯৮ তারিখে লিখেছিলেনঃ "আমরা মানব-জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই ; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।"[২৮] স্বামীজীর মতে আদর্শ সমাজ হবে সেইটি, যেখানে জগতের মহত্তম সত্যগুলি (মানবাত্মার দেবত্ব, অমরত্ব, ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি) রূপায়িত করা যায়। এবং সমাজ যদি সে সত্য অনুশীলনের যোগ্য ক্ষেত্র না হয়ে থাকে তবে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব সেরূপ ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। "*That society is the greatest, where the highest truths become practical.* That is my opinion ; and if society is not fit for the highest truths, make it so ; and the sooner, the better."[২৯]

পূর্বেই দেখেছি মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশসাধন স্বামীজীর জীবন-ব্রত। তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে সমাজের জন্য যে কাজই করুন না কেন, যে কর্তব্যসূচীর প্রস্তাবই দেন না কেন, তা তাঁর ঐ ব্রতেরই –মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর-আনয়নরূপ উদ্দেশ্যেরই—পরিপোষক। বৈষয়িক ভোগ-তৃপ্ত পাশ্চাত্যে অধ্যাত্মভাবধারামাত্রের প্রচার ও অনুশীলন প্রয়োজন। তাই সেদেশে তিনি ঐ ধরনের কর্মধারা পত্তন করেছেন। আবার ভারতবর্ষে ইহ-জীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা বিধানপূর্বক তাঁর নিজস্ব সভ্যতানিহিত ধর্মভাব জাগ্রত করা দরকার। সে কারণে ভারতে তাঁর অবলম্বিত কর্মসূচী পাশ্চাত্যের কর্মসূচী থেকে কিছু পৃথক হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একই—যে জাতির যে অভাব, সে অভাবপূরণ দ্বারা তাকে তার পূর্ণমহিমায় এবং ক্রমে তার আধ্যাত্মিক স্বারাজ্যে, প্রতিষ্ঠিত করা।

॥ ৪ ॥

এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলাম বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ, উভয়ের মানব-প্রেমের গভীরতা সমভাবেই অপরিমেয়; উভয়েই শুধু দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষকে সেবা করতে বলছেন না—তাকে সেবা করতে বলছেন আরও দুই উপায়ে—বিদ্যাবিতরণ ও আধ্যাত্মিকতা-বিতরণের দ্বারাও। এর কারণ, উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা—তাকে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা বা মোক্ষ বা নির্বাণ যে নামেই নির্দেশ করা হোক না কেন—ব্যতীত মানুষের দুঃখ দূর করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধদেব বা বিবেকানন্দ কেউই দেহের ক্ষুধা ও বুদ্ধির ক্ষুধাকে কিংবা এই দুই ক্ষুধার অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করেননি। দেহের ক্ষুধা, বুদ্ধির ক্ষুধা না মিটলে আধ্যাত্মিক জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে না—মনে হয়, উভয়েই এ বিষয়ে সমভাবে সচেতন ছিলেন। "মনে হয়" বলার কারণ বুদ্ধদেবের ঐ মর্মের উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি। তবে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর শিষ্যদের সর্বপ্রকার সেবাকর্মে নিযুক্ত হতে দেখে এ ধারণা সংগতভাবেই জন্মে। এ বিষয়ে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট থেকেই শুনেছিলেনঃ খালি পেটে ধর্ম হয় না, এবং বুভুক্ষাপীড়িত জনসাধারণের সংগে পরিব্রাজনকালে সুনিবিড় পরিচয়ের ফলে সে সত্য নির্মমভাবে যাচাই করেও নিয়েছিলেন। তাই তাঁর মানবসেবার সূচীতে অন্নবিতরণ (অর্থাৎ বৈষয়িক অভ্যুদয়ার্থ সেবা), বিদ্যাবিতরণ ও ধর্মবিতরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কৃষি, শিল্পের সম্প্রসারণ, দুর্ভিক্ষে অন্নবস্ত্র-বাসস্থান-ওষুধপত্রের বিতরণ, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-কারিগরিশিক্ষার প্রবর্তন, এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের পঠনপাঠন, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগের শিক্ষণ—তাঁর কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংগ।

বুদ্ধদেবের মানবতা এবং বিবেকানন্দের মানবতা সেবার ক্ষেত্রে প্রায় একরূপ হলেও দুটি দুইপ্রকার আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের, দুইপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিধৃত। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য এই যে, দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেদিক দিয়ে বিচার করে বলা চলে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই পাশ্চাত্য দৃষ্টবাদ (Positivism) সমর্থিত ফরাসী মনীষী কোঁতের (Comte) মানবতাবাদ অথবা আধুনিক অস্তিত্ববাদ (Existentialism) সমর্থিত মানবতাবাদ থেকে বিলক্ষণ পৃথক।

কিন্তু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের 'মানবতা'র লক্ষ্য আত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তি বা সর্ব-আত্মভাবের উপলব্ধি এবং তার প্রতিষ্ঠা আত্মতত্ত্বে। বুদ্ধদেবের মানবতার লক্ষ্য নির্বাণ এবং তার প্রতিষ্ঠা 'নিরাত্মা'-তত্ত্বে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কি এবং সে পার্থক্য যে যুগ-

প্রয়োজন মিটাবার জন্য হয়েছিল, আমরা তা এখন বুঝবার চেষ্টা করব। স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবা ও মানবপ্রেমের মূলীভূত দর্শন নিম্নের কবিতাংশে সুন্দররূপে অভিব্যক্তঃ

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

"যত্র জীব তত্র শিব", "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" কথাগুলির মধ্যেও স্বামীজীর সেবাব্রতের দর্শনটি সূত্রাকারে বিবৃত দেখি। স্বামীজীর আর একটি উক্তিঃ "আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আব নেই।—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।"[৩০] স্বামীজীর সমজাতীয় উক্তিগুলির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের একমাত্র সত্য, কিন্তু তিনি জীবজগতের ঊর্ধ্বে কোন সুদূর স্বর্গে বসে নেই। তিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ব্যাপ্ত করে, একটি অজর, অমর, জ্ঞানময়, প্রেমময় চৈতন্যসত্তারূপে, আত্মারূপে বিরাজ করছেন। বস্তুত, জীবের আসল স্বরূপ হল এই আত্মা।—অদ্বৈতবেদান্তমতে এই আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৩১] (আমিই ব্রহ্ম), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[৩২] (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'তত্ত্বমসি'[৩৩] (তুমিই সেই ব্রহ্ম) প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বেদান্তের অন্য শাখামতে, যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে, জীবের আত্মা এই ব্রহ্মের অংশ বা অঙ্গ। কাজেই, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তির আধার জগৎকারণ ব্রহ্ম যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে পূর্ণত বা অংশত বিরাজ করছেন, তাতে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও মতেরই সংশয় নেই। জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, শিবের অধিষ্ঠান। অতএব জীবের সেবাই শিবের সেবা, ঈশ্বরের সেবা। স্বার্থশূন্যভাবে জীবসেবার দ্বারা, সর্বভূতে-ঈশ্বরের-অধিষ্ঠান-চিন্তাদ্বারা মানুষের মন সর্বপ্রকার ভোগ-বাসনা (বা তৃষ্ণা)-নির্মুক্ত হয়, পরিশুদ্ধ হয় আর তখনই আমরা আমাদের

যথার্থ স্বরূপের, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে পারি। নিজেকে যখনই আমরা অজর, অমর, আত্মা বলে জানতে পারি, তখনই আমরা সর্বপ্রকার দুঃখেরও অতীত হই, কেননা দেহমনের পরিবর্তনে তখন আমরা কোনমতেই বিচলিত হই না। চরম দুঃখনিবৃত্তির এটাই পথ। বেদান্ত তাই বলেনঃ "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" [৩৪] —আত্মবিদ্ সর্বপ্রকার দুঃখশোক অতিক্রম করেন। আবার আত্মার এই স্বরূপ-অনুভূতিদ্বারা শুধু যে দুঃখ-অতিক্রমণ হল তা নয়, পরমসত্যকেও পাওয়া গেল। আত্মলাভে হৃদয়ের আনন্দস্পৃহা শুধু তৃপ্ত হল না; বুদ্ধির জ্ঞানস্পৃহাও তার লক্ষ্যে পৌঁছাল। কেননা আত্মা বা ব্রহ্ম একটা কাল্পনিক বস্তু নয়, পরিবর্তনশীল জীবজগতের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যও বটে। এই সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু যুক্তি-তর্ক-অনুমানদ্বারা সিদ্ধ করেননি, শুধু তুলনামূলক ধর্ম-দর্শন অধ্যয়নদ্বারা লাভ করেননি, নিজের প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে দেখেছিলেন, জেনেছিলেন। অনুভব ও যুক্তি—উভয়ের দ্বারাই আত্মতত্ত্বকে বিবেকানন্দ যাচাই করে নিয়েছিলেন। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বিচারপ্রবণতার যুগে তিনি জগৎসমক্ষে এই আত্মতত্ত্বের বার্তা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন।

আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপর (আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কেননা আত্মা কখনও ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়) বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও মানবসেবাদর্শন এইভাবেই স্থাপিতঃ যদি সত্যকে লাভ করতে চাই, এবং সর্ব-প্রকার দুঃখকে অতিক্রম করতে চাই তবে ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে, কেননা ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মকে অনুভব করা, ধারণা করা, উপাসনা করা, সেবা করা মানেই হল সর্বজীবদেহবাসী ব্রহ্মের ধারণা করা, উপাসনা করা, সেবা করা। স্বামীজী তাই বলেনঃ "তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন?" [৩৫] জাতিবর্ণ নির্বিচারে মানুষকে এইরূপ ঈশ্বরবুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তানবুদ্ধিতে সেবা করার আরও কয়েকটা বিশেষ দিক আছে। প্রথমত, মানুষের মহত্ত্ববোধ। যে মানুষকে সেবা করব, সে মানুষের প্রতি থাকবে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। কারণ সে মানুষ জড়বাদসমর্থিত রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নয়, অথবা কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক-অনুমিত ভাবনা-চিন্তা-আবেগ-আকৃতির একটা জটিল সমষ্টিও নয়, সে মানুষ 'অণোরণীয়ান্' "মহতো মহীয়ান্" আত্মা, সে মানুষ স্বরূপত বিশ্বপিতার অংশ, বিশ্বপিতার সন্তান বা

বিশ্বপিতা স্বয়ং। শুধু তাই নয়, সেব্য মানুষের প্রতি থাকবে সেবক মানুষেরই কৃতজ্ঞতাবোধ। কেননা যিনি সেবা করছেন, তিনি সেবাচর্চার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে ঈশ্বরোপলব্ধির, আত্মোপলব্ধির অপূর্ব সুযোগসহায়তা লাভ করছেন। কাজেই যে দুর্গত মানুষকে, যে দুর্গত নররূপী নারায়ণকে সেবা করা হবে, তার প্রতি অনুকম্পার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মানবসেবার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। মানুষকে যখন ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান বলে জানা গেল, তখন মানুষরূপী সেই ঈশ্বরের সেবার পরিধি অনেক বেড়ে গেল। মানুষকে 'দেহ'মাত্র বলে জানলে তাকে অন্নবস্ত্র দিয়ে বিদায় করা যায়; দেহমনের সমষ্টিমাত্র বলে জানলে অন্ন, বস্ত্র ও বুদ্ধির উৎকর্ষ আনে এমন বিদ্যা-উপচারেই তার সেবা সাঙ্গ করা যায়। কিন্তু যখন তাকে দেহমন-বিশিষ্ট আত্মা বলে জানলাম, তখন তার আত্মিক ক্ষুধা না মিটানো পর্যন্ত তার সেবার শেষ হবে না। নররূপী নারায়ণকে শেষ পর্যন্ত তার 'নারায়ণত্ব' বিকশিত করার সব রকম সুযোগ, সব রকম সেবা-উপচার দিতেই হবে। বিবেকানন্দের 'জীবশিব'-দৃষ্টিভঙ্গিপূত মানব-সেবায় সেবাক্ষেত্র তাই বহুবিস্তৃত। ব্যষ্টিমানবের জৈবক্ষুধা নিবারণে যেমন এই সেবার পর্যবসান নয়, তেমনি সমষ্টিমানবের অর্থাৎ সমাজের এবং সর্ব-শেষে মানবজাতির জৈবক্ষুধা নিবারণে—শরীরমনের বিকাশসাধনে—সে সেবার পরিসমাপ্তি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যে "মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তরের" কথা বলেছেন, সে আধ্যাত্মিক রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত, জগতের প্রত্যেকটি মানুষের দেবত্ব-উপলব্ধি পর্যন্ত এ সেবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে। অন্যভাবে বলতে হয়, এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা মানবের সেবা করবেন, তাঁদের পরিকল্পনার আওতায় মানবের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণ-প্রকল্পের স্থান পাওয়া চাই-ই।

তৃতীয়ত, মানবের আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন। জীবশিববাদী মানবতায় সেব্য মানব ও সেবিত মানব উভয়েই বিশ্বাস করবে সে অজর, অমর, আত্মা। যদিও আজ মলিন দেহমনের খাঁচায় থাকার দরুন তার সব গুণ, সব মহিমা প্রকাশ করতে পারছে না, তবুও সে আত্মা, গুণগুলি তার অবশ্য রয়েছে, সুপ্তভাবে। জগতে এমন কোনও শক্তি নেই যে তার দেবত্বকে চিরকালের জন্য চেপে রাখতে পারে। শিবজ্ঞানে জীবসেবার দ্বারা মানুষের আত্মভাব, দেবভাব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হবেই হবে। স্বামীজী বলছেন বেদান্তেরই কথাঃ

"...সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তো উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ।" ৩৬

"কি জানিস, জ্ঞান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট ব'লে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল ক'রে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।"[৩৭]

"Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings...you are souls immortal, spirits free, blest and eternal ; ye are not matter, ye are not bodies ; matter is your servant, not you the servant of matter."[৩৮]

"Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God—this is the secret of greatness."[৩৯] "That faith calls out the divinity within."[৪০]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবশিব-সত্যাশ্রয়ী মানবতাবাদের এই তাৎপর্যগুলি বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কেননা কোন না কোন রূপে মানবতার ভাব—মানুষ ছোট নয়, উপেক্ষা-অবহেলার পাত্র নয়, ত্রুটিবিচ্যুতি-ভুলভ্রান্তি-শতদোষ সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে হবে, তার সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সব রকমের হিতসাধনচেষ্টাকেই জীবনের সর্বোত্তম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে হবে, এই ভাব—নানা আকারে অন্তত গত দুই শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হচ্ছে; সমস্ত দেশের মানুষকে, তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে। সচরাচর প্রচলিত সেই মানবতায় বিবেকানন্দ-প্রচারিত (কিন্তু বিবেকানন্দ-উদ্ভাবিত নয়) মানবের দেবত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গই নেই। যেমন, ঊনবিংশ শতকের 'পজিটিভিজম' (Positivism) "ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে পুরোপুরি বরবাদ না করলেও একে কোণঠাসা করে শুধু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রত্যভিজ্ঞামূলক প্রতীতির ওপর অধিকতর নির্ভর"[৪১] করেছে। "কোঁৎ (Comte) তো ধর্ম ও দর্শনকে পজিটিভিজম্-এর তুলনায় নীচুতে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানবসভ্যতা ত্রিধারায় অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ধারা—ধর্মের যুগ। ...তখন সে জড়বস্তু ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এক-ধরনের *fetichism*-কেই (ফেটিসিজম্) জীবনচেতনায় গ্রহণ

করেছিল।"[৪২] পরের পর্বের নাম "দর্শনের যুগ"। "কিন্তু এই যুগেও মানব-মনের চরম উন্নতি হয় নি; সে উন্নতি এল আধুনিক কালে, উনিশ শতকে—যখন 'পজিটিভ' দর্শনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল।...অধুনা মানুষ বস্তুহীন বৃথা দার্শনিক চিন্তায় সময় কাটায় না, বা প্রকৃতির ব্যাপারে কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকেও টেনে আনে না। এখন মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝে নিয়েছে যে, বিশ্বের প্রাণবিন্দু হচ্ছে এই মানুষ; জ্ঞানবিজ্ঞান-লব্ধ আত্মপ্রত্যয় হল তার একমাত্র নিয়ন্তা—ঈশ্বরও নয়, দর্শনও নয়। মোটামুটি কোঁৎ-পরিকল্পিত 'পজি-টিভ' দর্শন বা ধ্রুববাদ এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।"[৪৩] কোঁতের মানবতাবাদে যেমন, অস্তিত্ববাদ (Existentialism) দর্শনে তেমন—মানুষের দেবত্বের কোনও ধারণা, মানুষের দেবত্বে কোনও আস্থা সেখানে নেই। "এমন কি মানুষ মানবীয়গুণে একসময় পূর্ণতা অর্জন করবে"—এ আশাটুকু পর্যন্ত অস্তিত্ববাদ-সমর্থিত মানবতাবাদে নেই।

"With its emphasis on individuality, existentialism is undoubtedly a predominantly liberal philosophy, but it is a liberalism with no belief in a natural social harmony and no hope in man's perfectibility."[৪৪]

বস্তুত, "পাশ্চাত্য মানবতাবাদে (Humanism) মানবের প্রতি প্রীতি আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই। মানব দুর্বল ও নিঃসহায়, পতিত ও পাপপূর্ণ, অশুদ্ধ ও অপূর্ণ; সেজন্য তাকে আমরা যেন সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করি; তাকে আমরা যেন অসত্য থেকে সত্যে, পাপ থেকে পুণ্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাই—এইটিই হ'ল সাধারণ মানবতাবাদের মর্মের কথা।"[৪৫]

এযুগের এই প্রকার মানবিকতাচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এই মানবিকতাকে সচরাচর ইউরোপীয় মানবিকতা বলা হয়—যদিও কথাটা একেবারে নির্ভুল নয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে এইজাতীয় (অর্থাৎ দেবত্বতত্ত্ববর্জিত, মুক্তিভাবনারহিত) মানবিকতার পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে "এই নবভাবের প্রেরণা নিশ্চয়ই ইংরাজী শিক্ষার ফলে জাগে নাই, দেশীয় শিক্ষা বা ধর্মসংস্কারও তার অনুকূল ছিল না।" তাই স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার বোধ হয় সংগতভাবেই সিদ্ধান্ত

করেছেন যে, মানবের মহত্ত্ববোধ, আর মানবের হিতসাধন—এটা একালের যুগ-প্রবৃত্তি। "...এ যেন ওই যুগেরই প্রবৃত্তি—কালধর্ম্মের অনিবার্য্য তাড়নাই আমাদের সমাজের সহৃদয় ও শক্তিমান ব্যক্তিগণকে কোন-না-কোন আকারে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। ...ইংরেজী-শিক্ষা সেই আবির্ভাবের পক্ষে বড়ই অনুকূল ও উপযোগী হইয়াছিল।"[৪৬] যাই হোক, উৎপত্তি যেখানেই হোক, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা এ যুগপ্রবৃত্তিকে মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের যন্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করেছে।

এই যুগপ্রবৃত্তি বা "য়ুরোপীয় মানবিকতা" মানবের মহত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক মানুষের এই বিশ্বাসকে আঘাত করেননি। কিন্তু তিনি দেখাচ্ছেন যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের বিস্ময়কর কৃতিত্ব মানুষের মহিমা অল্পই প্রকাশিত করেছে; আরও বেশী মহিমা, দিব্যমহিমা, সদ্‌গুণ বিকাশের আরও অজস্র সম্ভাবনা তার মধ্যে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মানুষের মধ্যে 'দেবত্ব' আছে—যা তার শ্রেষ্ঠ মহিমা। সে দেবত্বের বিকাশে ব্যক্তিগতভাবে সে ধন্য হবে; সমাজ এক দিব্যসমাজে রূপান্তরিত হবে।

ইউরোপীয় মানবিকতা মানুষের 'হিতসাধন'-প্রচেষ্টাকে মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে কর্তব্য বলে গ্রহণ করে। স্বামীজীর ভাবধারায়—এই হিতসাধন-প্রচেষ্টা অহমিকার বশবর্তী হয়ে নয়, অনুকম্পার দৃষ্টিতে নয়, বিনয়নম্র শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। শুধু তাই নয়, যেহেতু মানুষ শুধু "দেহধর্মী জীব" নয়, কিন্তু "জীবরূপী ব্রহ্ম", সেহেতু মানবের হিতসাধন মানে "মানুষের একমাত্র জৈব সত্তার উৎকর্ষ ও বিকাশ" নয়; হিতসাধন মানে মানুষের জৈবসত্তার সাথে সাথে তার দৈবসত্তার বিকাশ ঘটানো। অর্থাৎ নরকে 'নরোত্তম' করে ক্ষান্ত হওয়া নয়, নরকে নারায়ণে পরিণত করা—বিবেকানন্দের মানবিকতার লক্ষ্য।[৪৭] আজকের সাধারণ মানুষ মানুষের জৈবসত্তায় বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে যে, মানুষমাত্রেই একটা দেহ আর একটা বুদ্ধির সমষ্টি। তাই তার সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এমনভাবে সে গড়ে তুলতে সচেষ্ট যাতে তার দেহ শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যলাভ করে, তার বুদ্ধি সর্বোৎকৃষ্টরূপে মার্জিত হয়। সে মানুষ বিশ্বাস করে না যে, মানুষমাত্রেই দেহমন্দিরস্থ একটা আত্মা, একটা দেবসত্তা। তাই যাতে এই দেবসত্তার স্ফুরণ হয়, এমনভাবে সে তার সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, সমাজসংস্কৃতিকে গড়তে উদ্যোগী নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—যতই মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবশিব-সত্যাশ্রয়ী মানবিকতাকে গ্রহণ

করছে, ততই তার কর্মসূচীও পালটে যাচ্ছে; আত্মিক ক্ষুধা মিটানোর প্রয়াস, দৈবসত্তা-বিকাশ-উপযোগী সুযোগ-সুবিধা-পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস সে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আজ মানবসভ্যতার একটা সংকটকাল। এই কালে ভৌগোলিক দূরত্ব নষ্ট হয়ে গেছে; চরম মারণাস্ত্র, জটিলতম মানবশোষণাস্ত্রও মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এ অবস্থায় মানুষের জৈবপ্রবৃত্তির উপর যদি তার দৈবপ্রবৃত্তি জয়ী না হয়, তবে মানবসমাজের কী অন্ধকারময় ভবিষ্যৎই না নেমে আসবে! স্বামী বিবেকানন্দের মানবদেবত্ব-সত্যাশ্রয়ী মানবিকতা সে কৃষ্ণ-ভবিষ্যতেরই প্রতিষেধক। কিন্তু লক্ষণীয় এই, স্বামীজীর মানবিকতা সে সর্বনাশা পরিণাম প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুগপ্রবৃত্তিকে, যুগের হৃদয়াকূতিকে অস্বীকার করছে না, খর্ব করছে না, বরং তাকে পরিপূর্ণ করছে, দিব্যায়িত করছে। সে মানবিকতা যেমন তার মানবমহিমাবোধকে মানবদেবত্ববোধে উন্নীত করেছে, তেমনি মানুষের আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়, আরও মহৎ করে তুলছে। এযুগের মানুষ বিশ্বাস করে যে দেহও বুদ্ধির সংঘাত। তাই দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধির শক্তি বিকাশেই তার চেষ্টা ক্ষান্ত। বিবেকানন্দের মানবিকতায় বিশ্বাসী হয়ে সে যেমন নিজের দেবত্বে বিশ্বাসী হচ্ছে, তেমনি তার মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম, সেবা, সততা প্রভৃতি দৈবগুণেরও বিকাশ হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনবদ্য ভাষায় আরও অফুরন্ত দৈবশক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে আমাদের বলছেনঃ

"Do you know how much energy, how many powers, how many forces, are still lurking behind that frame of yours? What scientist has known all that is in man? Millions of years have passed since man first came here, and yet but one infinitesimal part of his powers has been manifested. Therefore, you must not say that you are weak. How do you know what possibilities lie behind that degradation on the surface? You know but little of that which is within you. For behind you is the ocean of infinite power and blessedness." [৪৮]

এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকতা যেমন বেদান্তের আত্মতত্ত্বভিত্তিক, তেমনভাবে অন্যান্য ধর্মের উপরও প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের মতে তাঁর প্রচারিত মানবের দেবত্ব শুধু বেদান্তের ঘোষণা নয়। জগতের অন্য প্রধান প্রধান ধর্মগুলিও কোথাও স্বচ্ছ সরল ভাষায় কোথাও গল্প বা রূপকের ভাষায় এই মানবের দেবত্বই ঘোষণা করছে, হিন্দু-

ধর্মের সব শাখা তো বটেই। যেমন, "হিব্রুদের নিউ টেস্টামেন্ট স্বীকার করে যে, মানুষ প্রথমে পূর্ণস্বভাব ছিল এবং নিজকৃত কর্মের দ্বারা সে নিজেকে অপবিত্র করেছে। কিন্তু তাকে তার সনাতন পবিত্র স্বভাব ফিরে পেতে হবে। কেউ কেউ এই কথাগুলি গল্প, রূপক বা প্রতীকচিহ্ন দিয়ে বলে, কিন্তু এই সব বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, এই বাক্যগুলি শুধু এইটাই শিক্ষা দিচ্ছেঃ মানুষ স্বভাবতই পূর্ণস্বভাব এবং এই পূর্ণস্বভাবকেই তার ফিরে পেতে হবে।"[৪৯] স্বামীজী আরও বলছেনঃ "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, এই 'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হ'তে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা', তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্যে.. ।"[৫০] উদ্ধৃতিগুলি এইটাই প্রতিপন্ন করছে যে, বিবেকানন্দ-মানবতার জীবদেবত্বতত্ত্ব শুধু তাঁর বা তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূত সত্য নয়, সর্বধর্মস্বীকৃত সত্যও বটে।

বুদ্ধদেবের মানবিকতায় বাহ্যত আত্মতত্ত্বের স্থান নেই কিন্তু কার্যত আছে। একটা স্থায়ী অজর, অমর, আত্মা বুদ্ধদেব স্বীকার করেননি—কিন্তু চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সত্যতা স্বীকার করেছেন। যেমন, একক্ষণের প্রদীপশিখা পরক্ষণের শিখার জন্ম দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; বুদ্ধদেবের মতেঃ একক্ষণের বিজ্ঞান বা চৈতন্য পরক্ষণে একটি বিজ্ঞান বা চৈতন্য সৃষ্টি করে নিজে ধ্বংস হয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মানুষের স্বরূপ হল এই 'বিজ্ঞান'-ধারা বা চৈতন্যপ্রবাহ।[৫১] সেখানে চিরস্থায়ী আত্মার স্বীকৃতি নেই। আত্মার স্বীকৃতি নেই বলে আত্মমুক্তির প্রসঙ্গও নেই। আত্মা যখন নেই, তখন আবার আত্মার মুক্তি কি? যার মাথা নেই তার মাথাব্যথা? কিন্তু লক্ষণীয় এইঃ বেদান্তোক্ত আত্মতত্ত্বের অভাব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জাগরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাঁর মহৎ মানবিকতাধর্মে সুরক্ষিত রেখেছেন। আত্মা নেই বলে ইউ-রোপীয় মানবিকতার মতো তাঁর মানবিকতা শুধু জৈবস্তরের সেবাধর্মে মানুষকে নিয়োজিত করেনি; ক্ষমা-প্রেম-পবিত্রতা-সংযম, সর্বোপরি নিঃস্বার্থ সেবা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দৈবগুণের চর্চায় মানুষকে লিপ্ত করেছে। স্বার্থচিন্তার পরিবর্তে সর্বজীবের মৈত্রীভাবনায় মানুষকে নিয়োজিত করেছে।

বুদ্ধদেবের মানবিকতার—মানবপ্রেম ও মানবসেবার দর্শন—সংক্ষেপে এই-

রূপ। বুদ্ধদেব বলছেনঃ জটিল দার্শনিক প্রশ্নের চুলচেরা বিচারে সময় ও শক্তির অপচয় কোর না। কতকাংশে যেন দৃষ্টবাদী বা পজিটিভিস্টদের মতো বুদ্ধদেব বলছেনঃ দৃষ্ট জগতের সত্য এই যে, জীবনে দুঃখ আছে। জগতের কোন কিছুই কারণ ছাড়া হয় না। অতএব মানুষের এই দুঃখেরও কারণ আছে। এই কারণ—দ্বাদশ নিদান, যার মধ্যে প্রধান হল তৃষ্ণা (তন্হা) বা বাসনা। কারণনাশে কার্যের নাশ হয়। অতএব তৃষ্ণার নাশে দুঃখের নাশ। বাসনা কামনা বা তৃষ্ণার নাশই নির্বাণ। নির্বাণে সকলের অধিকার সমান। তৃষ্ণার আগুন নির্বাপণের জন্য পুরোহিত বা শাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হবে না। এজন্য নিজেকে উদ্যোগী হয়ে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ ধ্যান প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করতে হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান কথাগুলি হলঃ সর্বভূতে মৈত্রী, অহিংসা এবং নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা। আমরা পূর্বেই দেখেছি এই সেবার পরিধি সুদূরবিস্তৃত। জৈবজীবনের অভাব মিটিয়ে দৈবজীবনের আস্বাদ পাওয়ানো, নির্বাণের দ্বারপ্রান্তে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সে সেবাব্রতের কর্মসূচী। কাজেই বিবেকানন্দের মতো বুদ্ধদেবও মানবজীবনের দিব্যায়নের (spiritualization of human life) ব্রতধারী। দিব্যায়ন ছাড়া দুঃখকে অশেষরূপে এড়াবার অন্য কোনও প্রতিষেধক তিনি দেননি।

শিষ্যদের বুদ্ধদেব বলেছেনঃ বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় কর্ম করতে, সেবা করতে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে।

"কুকর্ম না করাই শ্রেয়; উহা পরিশেষে অনুশোচনার কারণ হয়। সুকর্ম করাই শ্রেয়; উহা করিলে অনুতপ্ত হইতে হয় না।" [৫২]

" ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।

অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥" [৫৩]

"বিদ্বেষের দ্বারা কখনই বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না; বিদ্বেষহীনতার দ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয়।"

শুধু সৎকর্ম নয়, সর্বজীবের প্রতি 'মৈত্রীভাবনা' করতে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছেন। "দৃষ্ট কি, কি অদৃষ্ট, দূরবাসী কি নিকটবাসী, বর্তমানে রয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে—এমন সমস্ত প্রাণীই সুখী হোক।" "মাতা যেমন নিজের প্রাণ দিয়েও নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত দয়াভাব দেখাবে।"

কিন্তু সর্বপ্রাণীর সেবা ও সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবনা কেন করব এ

প্রশ্নের বুদ্ধমতে উত্তরঃ কারণ এর দ্বারা তোমার স্বার্থবাসনা দূর হবে, বাসনা বা তৃষ্ণা (তন্‌হা) গেলে দুঃখনিবৃত্তি হবে, নির্বাণলাভ হবে। "আত্মা বলে কিছু নেই।" "দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'—মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' ব'লে কিছু নেই, তা হলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকে সুখী করতে পারব।"[৫৪] পরের সেবা ও মৈত্রীভাবনা 'অহং'-এর জন্য নয়, কেননা 'অহং' যে ভ্রান্তি!

স্বামী বিবেকানন্দ বলেনঃ বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে বেদান্তের ব্রহ্ম ও আত্মাতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। "আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। ...সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেনঃ মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত ক'রে আমি নিজেকেই আঘাত করি।"[৫৫]

স্বামী বিবেকানন্দের মতো বুদ্ধদেবও মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছেন। নির্বাণ-অর্জনে জাতিবর্ণ দেশকাল নির্বিশেষে সকলের অধিকার আছে, যোগ্যতাও আছে। যে কেউ চেষ্টা করবে, সে পরার্থ-কর্ম ও শুভচিন্তার দ্বারা—একজন্ম অথবা জন্মজন্মব্যাপী চেষ্টার দ্বারা—এই নির্বাণ লাভ করবে। এর পিছনে বুদ্ধদেবের যুক্তি হলঃ জগতে সব কিছুই কার্যকারণশৃঙ্খলে বাঁধা। আমরা নিজেদের স্বার্থশূন্য বা স্বার্থপূর্ণ কর্ম ও চিন্তার দ্বারা ভাল বা মন্দ হই। জগতের অন্য কোন শক্তি আমাদের ভাল বা মন্দ করতে পারে না। কাজেই, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা, ব্যক্তিমানুষের মহিমাবোধ বিবেকানন্দের মানবিকতাবাদের মতো বুদ্ধদেবের মানবিকতাবাদকে অপরিমেয় শক্তির উৎসে পরিণত করেছে। কিন্তু লক্ষণীয় এইঃ আত্মশক্তির ও আত্মপ্রত্যয়ের সপক্ষে বিবেকানন্দের যুক্তি আরও জোরালো। কর্মবাদকে তিনি গ্রহণ করে বলেনঃ মানুষই তার ভাগ্যের নির্মাতা।[৫৬] তবে তিনি আরও বলেনঃ এর কারণ মানুষের আত্মা, যে স্বরূপত ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে সে বিশ্বাস করবে না কেন? নিশ্চয়ই করবে। তবে এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তো আকাশে বসে নেই। তিনি তোমার অন্তরাত্মা। তোমার বুদ্ধিতে তাঁরই জ্যোতি, তোমার বাহুতে তাঁরই

শক্তি। মানুষকে তিনি বলেনঃ উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—ওঠো, জাগো, আত্মার অনন্ত শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী হও; সে শক্তি তাহলে জাগ্রত হবেই হবে।

আসলে বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর ও আত্মাতত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন, সে শুধু ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ও আত্মাসম্বন্ধীয় প্রচলিত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাকে অস্বীকার করা। বস্তুতপক্ষে মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমন কেঁদেছিল যে, তিনি জটিল দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রবেশ করতে চাইতেন না—নির্বাক থাকতেন। তিনি বলতেনঃ যদি কারও ঘরে আগুন লাগে তবে তার কাজ হবে জল দিয়ে আগুন নিবানো; অগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করা নয়। স্বার্থদুষ্ট বাসনার অগ্নিতে জীব যখন দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তখন পরার্থসেবা ও মৈত্রী-ভাবনাদি দ্বারা সে অগ্নি নির্বাপণই তার একমাত্র কাজ। এর মানে এই নয় যে, বুদ্ধদেব ব্রহ্ম আত্মা প্রভৃতির তত্ত্ব জানতেন না বা মানতেন না। তিনি একসময় ভিক্ষুদের বলেছিলেনঃ “আমি তোমাদের যা কিছু বলি তার চাইতে আমার জানা কিন্তু না-বলা তত্ত্ব অনেক বেশী রয়েছে। সব কিছু তত্ত্ব তোমাদের না বল্‌বার কারণ, এতে তোমাদের প্রকৃত বাসনা-মুক্তি ঘটবেনা, বোধি লাভও হবেনা। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি তোমাদের দুঃখের স্বরূপ, তার উৎপত্তির কারণ, তার নিরোধের পথ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে ত্রুটি করিনি।”[৫৭] এসব গভীরতত্ত্ব না বলার আরও কারণ ছিল। তিনি মানুষকে পুরোহিততন্ত্রের অত্যাচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময় বহু দার্শনিকসম্প্রদায়ে দেশ ভরা ছিল এবং তারা অতিসূক্ষ্ম তর্কে জনসাধারণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করত। আবার বৈদিক সংস্কৃতির বাইরে যে বিরাট জনসমুদ্র ছিল, বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতি গ্রহণ করার পথে তাদের সামাজিক বাধা ছিল যথেষ্ট। তাদের এবং বিশ্বের সমস্ত সাধারণ মানুষকে, জটিল দার্শনিক-তত্ত্ববর্জিত সাম্যবাদ-আশ্রয়ী ধর্ম দেবার জন্য, তাঁর মানবপ্রেমই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল ঈশ্বর-আত্মাদি সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রেম ও সেবার ধর্ম প্রচার করতে। তাছাড়া, বুদ্ধদেব বিবেকানন্দের মতোই বিশ্বাস করতেন—ধর্ম অনুভবের জিনিস, কেবল যুক্তিতর্ক-অনুমানের বিষয় নয়। উত্তরকালে অনুধাবন করে মনীষীরা ও দার্শনিকরা বলেছেনঃ বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্বাণ আসলে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত আত্মমুক্তি, আত্মস্বাধীনতা। তিনি ব্যবহারিক আত্মাকে অস্বীকার করলেও শাশ্বত অপরিবর্তনীয় আত্মাকে অস্বীকার করেননি। তাছাড়াও বড় কথা এই যে, বেদান্তের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে নির্বাক থেকেও সে তত্ত্বকে তিনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছিলেন। বেদান্তের আত্মতত্ত্বকে সমাজে প্রয়োগ করা হলে আত্মপ্রত্যয়, সর্বজীবের প্রতি

প্রেম, মৈত্রীভাব এবং সর্বজীবসেবা—এগুলি আসতে বাধ্য। বুদ্ধদেব এগুলির প্রচার করে পরোক্ষে বেদান্তই প্রচার করেছিলেন। যুগের প্রয়োজনে, পৃথিবীর তৎকালীন ও অনাগত কালের অগণন সাধারণ মানুষের প্রতি করুণাবশত বেদান্তের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছিল। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ

"To develop his theory Buddha had only to...set aside the transcendental aspect as being indemonstrable to thought and unnecessary to morals, and emphasise the ethical universalism of the Upanisads. Early Buddhism, we venture to hazard a conjecture, is only a restatement of the thought of the Upanisads from a new standpoint." [৫৮]

অর্থাৎ "তাঁর (নবীন) মতবাদকে গড়ে তুলবার জন্য বুদ্ধদেবকে উপনিষদের জগদতীত তত্ত্বাংশটিকে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল, কেননা ঐ তত্ত্বাংশকে যুক্তি-চিন্তার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলে এবং নৈতিক জীবনযাপনের জন্য নিষ্প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি উপনিষদের সর্বজনীন নৈতিক জীবনাদর্শের উপর জোর দিয়েছিলেন। আমাদের অনুমান গোড়ার দিকের বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের চিন্তাকে অন্য আকারে প্রকাশ করেছিল মাত্র।" স্বামী বিবেকানন্দ এর বহুপূর্বেই সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেনঃ "যে ধর্ম্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)।" [৫৯]

বর্তমান যুগ যুক্তিবিচারের যুগ। বুদ্ধদেবের মানবপ্রেম ও মানবসেবা আজ যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে প্রয়োজন সে প্রেম ও সেবার তাত্ত্বিক দিকও যুক্তিগর্বিত মানুষের কাছে পরিষ্কার করে বলা। প্রাচীন বেদান্ত মানবপ্রেম ও সেবার তাত্ত্বিক দিক অকাট্য যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাকে নামাতে পারেনি। বুদ্ধদেব তাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামিয়েছিলেন, কিন্তু তাত্ত্বিক দিকটি তখনকার যুগপ্রয়োজনে অনুচ্চ রেখে। স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেনঃ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের যুগে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়ে বেদান্তের মানবপ্রেম ও মানবসেবার আদর্শ প্রচারিত

ও অনুশীলিত হোক; বেদান্তের মতবাদ ও বুদ্ধের হৃদয়বত্তার সমন্বয় হোক। তাঁর নিজের মধ্যে এই 'মণিকাঞ্চন-যোগ' ঘটেছিল।[৬০] যেন যুগপ্রয়োজনে শংকরাচার্য ও বুদ্ধদেব তাঁর মধ্যে অভিন্নাত্মা হয়ে মানবতার নতুন অবতাররূপে হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্ত

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে যে ধর্মাচার্যেরা অবতীর্ণ হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যের স্ব-অনুভূত উপলব্ধি বহন করে এনে মানুষের কল্যাণে প্রচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি। গত শতাব্দীর বেশ কিছু আগে থেকেই সমস্ত বিশ্ব এমন এক যুগসংকটে পড়েছিল যা পরিণামে এক প্রলয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারত। সে সময়ে করুণাময় বিধাতার আশীর্বাদে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাব পৃথিবীর সেই প্রলয়োন্মুখ গতিকে স্তব্ধ করে চালিত করল কল্যাণময় পথে, মানবসমাজে করল নতুন প্রাণসঞ্চার।

সকল যুগে সমস্ত ধর্মাচার্যই যে সামগ্রিক পথের আলোকে ধর্ম-উপদেশ দেন, তা নয়। যদিও 'ধর্ম' শব্দটি শাস্ত্রবিহিত কল্যাণকর সাধনপথ হিসাবে সম্প্রদায়গত পথকে বোঝায়, তবুও এই প্রবন্ধে আমরা 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করব। অর্থাৎ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, বা কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—এই সামগ্রিক দৃষ্টিতেই আমরা 'ধর্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করব। শাস্ত্র-উপদিষ্ট যজ্ঞ, দান, হোম, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি কর্মে মানুষ স্বর্গে যায়। আর এই সব কাজ নিষ্কামভাবে করলে মানুষের মনে বৈরাগ্য হয় ও জ্ঞানলাভের ইচ্ছা জন্মে। রাজযোগ বা সমাধি, জ্ঞান বা মুক্তির সাধন। ভক্তিও তেমনি জ্ঞানের সাধন। অর্থাৎ যোগ বা ভক্তির ফলে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয় যার পরিণামে সাধক মুক্ত হন। কর্মমীমাংসক আচার্যেরা কর্মরূপ ধর্মের প্রচার করেছিলেন। সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রমুখ আচার্যেরা জ্ঞানরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম ধর্মের (জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ) উপদেশ দিয়ে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ভগবান শংকরাচার্য জ্ঞানরূপ ধর্মের এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মপথের সমন্বয় সাধন করেছেন।

স্বামীজী সকল পথকেই শ্রদ্ধা জানালেও আমরা এখানে তাঁর উপদিষ্ট জ্ঞানপথ সম্বন্ধে আলোচনা করব। 'বেদান্ত' শব্দটি একদিকে যেমন উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্মসূত্র এবং তার ভাষ্য টীকা ইত্যাদি গ্রন্থকে বোঝায়, তেমনি বেদান্ত-তত্ত্বের প্রতিপাদক সব কিছুকেই বোঝায়। এই হিসাবে স্বামীজীর বাণীকেও 'বেদান্ত' শব্দে উল্লেখ করা যায়।

অনেকে স্বামীজীর মতকে 'নববেদান্ত' (Neo-Vedanta) বলেন। এই নববেদান্ত বলতে কি বোঝায়? সাধারণত 'নব' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে

পারে। প্রথমত, অ-পূর্ব (নতুন) অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না কিন্তু বর্তমানে সত্তালাভ করেছে তাকে 'নব' বলা যায়। যেমন নবজাতক। কোন লোকের সন্তান জন্মালে তাকে 'নব' বলা যায়। সেই পুত্র (সঠিকার্থে পুত্রশরীর) পূর্বে ছিল না, এখন হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারে 'নব', যেমন—রাম নামে কোন লোকের শরীর কঠিন অসুখে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, পরে ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত হয়ে নতুন হল। স্বামীজীর 'নববেদান্ত'-এর 'নবত্ব'টি দ্বিতীয় প্রকারের। পূর্ব পূর্ব যুগে যে বেদান্ত প্রচারিত হয়েছিল, তা কালপ্রবাহেই হোক কি মানুষের কামনাবাসনার ফলেই হোক, বিকৃত হয়ে অন্যভাবে প্রচারিত হচ্ছিল অথবা লোকে তা ভুলে গিয়েছিল। স্বামীজীর আবির্ভাবে আবার সেই বেদান্ত নবীনভাব ধারণ করল। স্বামীজী সেই মুমূর্ষু বেদান্তের প্রাণকে সঞ্জীবিত করলেন। কিভাবে তিনি এই বেদান্তের উপদেশ করেছেন তা আমরা এখন আলোচনা করব।

উত্তরগীতায় বেদান্তের মূলতত্ত্ব বলা হয়েছেঃ

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ অসংখ্য গ্রন্থে যে বেদান্ততত্ত্ব বলা হয়েছে, তা আমি (ভগবান) অর্ধেক শ্লোকে বলছি—ব্রহ্মই সত্য। জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তে যত গ্রন্থকার, ব্যাখ্যাকার, প্রবন্ধকার রয়েছেন, বেদান্তের এই মূলতত্ত্বে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ নেই, যদিও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামান্য কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

বেদান্তে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম বা আত্মার কোন ভেদ নেই। স্বামীজী এই আত্মার একত্ব নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন।

"হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। অনন্ত কখনও দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে কেবল একটিমাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে—তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র, অনন্ত ও সর্বব্যাপী...।" [১]

আত্মার একত্ব বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদের যুক্তি স্বামীজীরই অনুরূপ। তাঁরা বলেন—আত্মত্ব ধর্মটি (attribute) বহু বস্তুতে থাকতে পারে না। কারণ

আত্মত্ব হল বিভুমাত্র-বৃত্তি (significative function)। সর্বব্যাপী পদার্থকে 'বিভু' বলে এবং বিভুত্ব (একমাত্র) সর্বব্যাপী পদার্থমাত্রেই থাকে। অতএব উহা নানা পদার্থে থাকে না।

দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রমুখ যদি প্রশ্ন করেন—এর দৃষ্টান্ত কি? অথবা বিভু-মাত্র-বৃত্তি ধর্মে নানা-বৃত্তিত্ব অভাবের ব্যাপ্তির (invariable concomitance; পাশ্চাত্য লজিকে major premise)[২] উদাহরণ কি?

অদ্বৈতবাদী তার উত্তরে নৈয়ায়িকের স্বীকৃত পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে বলেন—আকাশত্ব। নৈয়ায়িক-বৈশেষিক প্রমুখ বাদী আকাশকে বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং নিত্য ও এক বলেন। তাহলে আকাশত্ব ধর্মটি কেবল-মাত্র বিভু আকাশকেই আশ্রয় করে থাকছে। আর যেহেতু আকাশ একটিই, সেহেতু আকাশ একাধিক পদার্থে নেই। (অবশ্য যদিও অদ্বৈতবাদীরা একাধিক সর্বব্যাপী পদার্থ স্বীকার করেন না, তবুও দ্বৈতবাদীর মতানুসারে একাধিক সর্বব্যাপী পদার্থ আপাতত স্বীকার করে নিয়েও আত্মার একত্ব প্রমাণ করেন।)

এর বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী বলেনঃ আকাশের ধর্ম যে আকাশত্ব, তা কোন জাতি (generic attribute) নয়।[৩] আকাশত্ব জাতি নয় বলেই তা কেবল-মাত্র একমাত্র সর্বব্যাপী আকাশে থাকে। জাতি বহু পদার্থে থাকে; একমাত্র-বৃত্তি ধর্ম জাতি নয়। আত্মত্ব ধর্মটি জাতি বলে বহু পদার্থে থাকে, অর্থাৎ আত্মা অনেক।

অদ্বৈতবাদী এর উত্তরে বলেনঃ (১) আত্মত্ব ধর্মটি অনেক পদার্থে থাকে,

২। অনুমান (inference)-এর ব্যাপারে বৈদান্তিক ও পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের মিল বোঝাতে একটি উদাহরণ দেখা যাক।

বৈদান্তিক ন্যায়	উদাহরণ	পাশ্চাত্য ন্যায়
উপনয়	—পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে	—Minor premises
উদাহরণ	—যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন যেমন রান্নাঘরে	—Major premises
নিগমন	—সুতরাং পাহাড়ের মধ্যে আগুন আছে	—Conclusion

এই দৃষ্টান্তে 'আগুন' হল সাধ্য (thing to be inferred, major term), 'ধোঁয়া' হেতু (middle term) এবং 'পাহাড়' পক্ষ (minor term)। ধোঁয়া সব সময়ে আগুনের সঙ্গেই থাকে—এই জ্ঞানকেই ব্যাপ্তিজ্ঞান বলা হয় (ever-dependence of the middle term on the major term)। ব্যাপ্তিজ্ঞানই হচ্ছে অনুমানের আসল কারণ। বিস্তৃত আলোচনার জন্য বেদান্ত-পরিভাষার দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩। 'জাতি' হল এক ধরনের classification, গোত্ব (cowhood) একটি জাতি। গরুতে এই 'গোত্ব' জাতি রয়েছে। একটি গরু মরে গেলে 'গোত্ব' জাতি নষ্ট হয় না, কারণ অন্যান্য গরুতে এটি তখনও থাকছে। জাতি একাধিক পদার্থে থাকে। কিন্তু 'আকাশত্ব' কেবলমাত্র আকাশেই থাকে এবং আকাশ একটি। সেজন্য 'আকাশত্ব' জাতি নয়।

একথা বললে আত্মত্ব 'জাতি' বলে গণ্য হবে; এবং (২) আত্মত্ব 'জাতি' বলে তা বহু পদার্থে থাকবে। তাহলে এখানে অন্যোহন্যাশ্রয় (mutual dependence) দোষ ঘটছে। তাই আত্মত্ব ধর্মের সাহায্যে বহু আত্মার প্রমাণ করা যায় না।

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, আত্মায় অবস্থিত 'আত্মত্ব'-টি কোন 'জাতি' নয়। যে জাতিগুলি ব্যাপক (inclusive) নয়, কিন্তু একটা মধ্যবর্তী ব্যাপক জাতির ব্যাপ্য, সেই রকম জাতি বিভু দ্রব্যে থাকে না। যেমন, দ্রব্যত্ব জাতি (substancehood) সত্তা (existence) অপেক্ষা ব্যাপ্য হলেও পৃথিবীত্ব জলত্ব ইত্যাদি জাতির চেয়ে ব্যাপক এবং সেজন্য মধ্যবর্তী ব্যাপক জাতি। তা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতিকে ব্যেপে থাকে; কিন্তু বিভু আকাশে থাকে না। এই-ভাবে আত্মাও বিভু বলে তাতে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি থাকতে পারে না। অতএব 'আত্মত্ব' জাতি নয়। আত্মত্বকে জাতি বলে মানলে তা দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হয়ে যায়; এবং তা আত্মাতেও থাকায় আত্মা আর 'বিভু' হতে পারে না। অথচ নৈয়ায়িক প্রমুখ দ্বৈতবাদী আত্মাকে বিভু (সর্বব্যাপী) বলেন। এইভাবে যুক্তিদ্বারা আত্মার একত্ব স্থাপিত হয়।

তখন প্রশ্ন—উল্লিখিত যুক্তির সাহায্যে আত্মা এক বলে প্রমাণিত হলেও আকাশ (space) —কাল (time)—দিক্ (direction) এই তিনটি বিভু পদার্থ এবং পৃথিবী জল ইত্যাদি দ্রব্য (substance), গুণ (quality), কর্ম (action) প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থের সত্তা (existence) থাকায় অদ্বৈতবাদ তো দাঁড়াতে পারে না? এর উত্তরে স্বামীজী বলছেনঃ "যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তদ্রূপ সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক।... এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা... তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়াছেন।"[৪]

দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে এক অদ্বৈত আত্মা সিদ্ধ হয়। এখন দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা—এটা কি করে প্রমাণিত হয়? এর উত্তরে স্বামীজী একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেনঃ "আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না।"[৫]

সমুদ্রই সত্য, তরঙ্গ বুদ্বুদ ইত্যাদি যেমন মিথ্যা, তেমনি এক আত্মাই সত্য, সমগ্র জগৎ সেই আত্মাতে কল্পিত। অতএব আত্মা ভিন্ন সব মিথ্যা বলে এক অদ্বিতীয় আত্মাই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদীরা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণে অসংখ্য যুক্তি দিয়েছেন।[৬] তার কিছু আলোচনা করা যাক।

আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন সব কিছুই তাহলে মিথ্যা। স্বপ্নে যা দেখি তা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে তা মিথ্যা। শুক্তিতে (ঝিনুক) ভ্রমবশত দৃশ্যমান রজতও (রুপো) মিথ্যা যেহেতু এটি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। প্রশ্ন উঠতে পারে—স্বপ্নের দৃশ্য এবং শুক্তিতে দৃশ্যমান রজত মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু এই জগতের বিভিন্ন পদার্থও কি করে মিথ্যা হবে? এইগুলি মিথ্যা বলে কেউ তো অনুভব করে না? এর উত্তরঃ সাধ্যের (Major term) ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতু (Middle term) যদি পক্ষে (Minor term) থাকে তাহলে

৬। স্বামীজীর মতে 'মায়া' হল "Statement of facts"—ঘটনার বর্ণনাই মায়া। একটি বস্তুই সব কিছুর মূলে, সব কিছুর কারণ; ঐ একটি মূল বস্তুর বদলে অন্য কিছু দেখাটাই মায়া। বেদান্তে 'মায়া' একটি পারিভাষিক শব্দ (technical term)। যা অনুভব করা যায় (seeming reality) অথচ যুক্তিবিচারে টেঁকে না (invalid from the logical standpoint) তাই-ই মায়া। যেমন, পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের ঘোরা। সূর্যের এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণ সকলেই অনুভব করে কিন্তু যুক্তিবিচারে মানতে পারে না। সূর্যের এই ঘোরা ব্যাপারটি তাহলে মায়া। স্বামীজী বলছেন যে, মানুষের সকল ব্যবহারই এরকম মায়া; বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বও মায়া। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও ক্রমশ এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছেন। অতীতে বৈজ্ঞানিকেরা 'জড়' (matter) ও 'শক্তি' (energy) এই দুই ভাগে সব কিছুকে গণ্য করতেন, পরে তাঁরা দেখলেন, জড় আর কিছুই নয়, তা শক্তিরই বিশেষ অবস্থামাত্র (matter is nothing but bottled-up energy)। সাম্প্রতিককালে তাঁরা 'তরঙ্গ' (wave) দিয়ে সব কিছুকে বোঝাতে চাইছেন এবং "সম্ভাবনার তরঙ্গ" (wave of probability) নামে একে নির্দেশ করছেন। যদি প্রশ্ন হয় যে, তরঙ্গ কিসের? বিজ্ঞানীরা তার উত্তর দিতে পারছেন না। আসলে এই তরঙ্গও শুধুমাত্র গাণিতিক ব্যাখ্যামাত্র (mathematical interpretation)। কোন কোন বিজ্ঞানী এই তরঙ্গকেও 'অলীক' বলে মনে করছেন। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ তো সরাসরিই বলে দিলেনঃ "..the waves which form the universe, are in all probability fictitious." [The Mysterious Universe, (1948), p. 70]. এডিংটন আরও এক পা এগিয়ে বললেনঃ "The frank realisation that physical science is concerned with a world of shadows is one of the most significant of recent advances.

In the world of physics we watch a shadowgraph performance of the drama of familiar life. The shadow of my elbow rests on the shadow table as the shadow ink flows over the shadow paper. It is all symbolic, and as a symbol the physicist leaves it." [The Nature of the Physical World, introduction, (1929), pp. xvii & xvi]

পক্ষধর্মতার কারণে সাধ্য অনুমিত (inferred) হবেই।[৭] সুতরাং এখানেও শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি (invariable concomitance) ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব হেতুতে নিশ্চিত হওয়ায়, তার দ্বারা সমগ্র জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন হতে পারেঃ সকলের প্রত্যক্ষ (perception) দ্বারা জগতের সত্যত্ব অনুভূত হয়, এবং প্রত্যক্ষ অনুমানের চেয়ে বলবত্তর বলে পূর্বোক্ত অনুমানে বাধদোষ থাকায় ঐ অনুমানের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা এই জগৎকে যে সত্য বলে অনুভব করি [যেমন চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নদী, বন, পর্বত, গাছ ইত্যাদিকে "এটি সৎ (it exists) ঐটি সৎ (that exists)" বলে অনুভব করি] এই 'সত্য' বলতে আমরা কি বুঝি? এই সত্যত্বটি কি প্রমাবিষয়ত্ব (regarding right knowledge) অথবা ভ্রমাবিষয়ত্ব (regarding the super-imposed knowledge)?[৮] এই দুটোর মধ্যে যাকেই সত্যত্ব বলা হোক না

স্বামীজী আর এক দিক দিয়ে 'মায়া' ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেনঃ জগৎটাকে যেভাবে আমরা দেখছি সেটাই কি তার প্রকৃত রূপ? এক-ইন্দ্রিয় প্রাণী এই জগৎকে একভাবে অনুভব করে। দুই-ইন্দ্রিয় প্রাণী অনুভব করে অন্যভাবে। পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণী মানুষের অনুভূতি আরও ব্যাপক। অ্যামিবা, কেঁচো, কুমীর, মানুষ—প্রত্যেকেই নিজস্ব শক্তিসামর্থ্য দিয়ে জগৎটাকে অনুভব করছে। অ্যামিবা-কেঁচো-কুমীর মানুষের অনুভবকে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে না! অতএব ভবিষ্যতে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে যদি ছয় বা সাত-ইন্দ্রিয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, তবে সে প্রাণীর জ্ঞান মানুষের চেয়েও ব্যাপক হবে। তখন কার অনুভবকে আমরা 'সত্য' বলব? আসলে সব প্রাণীই আলোছায়া-ঘেরা অনুভূতির রাজ্যে বর্তমান। এই ঘটনাটিই মায়া। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ (১৯৩২ সনে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) তাঁর অনির্দেশ্যবাদতত্ত্বে (Theory of Indeterminacy) বলেছেন যে, জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ কোনদিনই জানতে পারবে না। প্রকৃতির (nature) মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মায়ার গণ্ডি (margin of error) রয়েছে যেখানে সূক্ষ্মতম মাপজোখের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইলেকট্রনের স্থিতি (position) ও ভরবেগের (momentum) গণনা একই সঙ্গে করা অসম্ভব—এই তথ্য থেকেই হাইজেনবার্গ স্বীয় তত্ত্ব রচনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই মায়ার পিছনে অপরিবর্তনীয় সত্য কোন সত্তাকে ধরতে পারছেন না। স্বামীজী বলছেনঃ "মায়া ঠিক ভ্রান্তি নহে; যে বস্তু প্রকৃত যাহা, তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখাকেই 'মায়া' বলে।" অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ জীন্স্ঃ "We can only see nature blurred by the clouds of dust we ourselves make." [The New Background of Science, (1933), p. 4]

৭। জ্ঞানযোগ, ১৯শ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮

৮। একটি দড়িকে যখন অন্ধকারে সাপ বলে মনে করছি তখন সেই 'সর্পজ্ঞান'টি হচ্ছে ভ্রমবিষয়ক জ্ঞান। আর যখন দড়ি বলে দেখব তখন তা প্রমাবিষয়ক জ্ঞান।

কেন, এরকম 'সত্যত্ব' চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অতএব ঐ প্রমা বা ভ্রমঘটিত বিষয়তা বা বিষয়তার অভাবও প্রত্যক্ষ হতে পারে না।

প্রত্যুত্তরে বলা যায়ঃ সত্তা জাতি (existence as a generic attribute), কার্যকারিতা (utility) বা অসৎ-ভিন্নতাকে (opposite to non-existence) সত্যত্ব বলে। যেমন, "জল সৎ, পর্বত সৎ, বৃক্ষ সৎ" ইত্যাদি রূপে সত্তা জাতির প্রত্যক্ষ হয়। আর এই জগতের সব বস্তুই কিছু না কিছু প্রয়োজন সাধন করে বলে এগুলির কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ এবং আকাশকুসুম ইত্যাদি অসৎ (non-existent, unreal)। নদী-বন-পর্বত-গাছ সমন্বিত জগৎকে সেই অসদ্-ভিন্ন বলে দেখি। সুতরাং জগতের সত্যত্ব প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রমাণিত হচ্ছে।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ দেখ, তুমি যে তিন রকম সত্যত্ব বলছ (অর্থাৎ সত্তাজাতি, কার্যকারিতা ও অসৎ-ভিন্নতা) সেরকম সত্যত্ব তো দড়িতে ভ্রমবিষয়ীভূত সাপেও থাকে। (অন্ধকারে একটা দড়ি পড়ে থাকলে মানুষ ভুলবশত সেটিকে যেমন সাপ বলে মনে করে। সেই সর্পজ্ঞানকে এখানে বিচার করা হচ্ছে।) সেই সর্পজ্ঞানের সময়ে সাপে সত্তা জাতি থাকে। কার্যকারিতাও থাকে, কারণ মানুষ তখন ভয় পেয়ে পালাতে চায়। আর ঐ সাপ তো আকাশকুসুমের মতো একেবারে অসৎ বা অলীক নয়। অসৎ হলে সাপটিকে দেখা যেত না, সর্পজ্ঞানও হত না। অতএব এটি অসৎ-ভিন্ন। তাহলে এরকম সত্যত্ব (অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম) মিথ্যাত্বের বিরোধী হয় না বলে জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ক যে অনুমান আমরা করি তাও প্রমাণিত হয়।

মিথ্যাত্বের অভাব, মিথ্যা-ভিন্নত্ব বা মিথ্যাত্বের অধিকরণে (substratum) অবৃত্তি ধর্ম—এইগুলি মিথ্যাত্বের বিরোধী [৯] হতে পারে।

পূর্বপক্ষী যদি বলেন ঃ বেশ, তোমরা যাকে বা যে রূপকে (form) মিথ্যা বল, তার অভাবকেই আমরা সত্য বলব। আর এরকম সত্যত্ব তো লোকেরা জগতেও প্রত্যক্ষ করে।

তার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন ঃ দেখ, এরকম মিথ্যাত্বের অভাব আকাশকুসুমের মতো অলীকেও থাকে। তাহলে কি আকাশকুসুম সত্য?

এবারে যদি প্রশ্ন হয়ঃ অদ্বৈতবেদান্তীর মিথ্যাত্বটির স্বরূপ কি? তবে তার উত্তর হলঃ যা (that) কোন না কোন আশ্রয়ে (substratum) সৎ বলে (existing) জ্ঞাত হয়েও (appearing) বস্তুত তিন কালে

(অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) থাকে না, তা-ই মিথ্যা। আকাশকুসুম ইত্যাদি অলীক বস্তু কোন আধারে (substraturm) সৎ বলে কখনও প্রত্যক্ষ হয় না। শুক্তি-রজত, মরীচিকা-জল ইত্যাদিতে "এই রজত", "এই সাপ" ইত্যাদি ভ্রমকালে (during illusion) সৎ বলে প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ভ্রম দূর হলে বোঝা যায় যে, ওখানে সাপ বা রজত কোন কালেই ছিল না।

এইভাবে স্বপ্নের দৃশ্যগুলিও মিথ্যা।[১০] সেরকম সমস্ত জগৎকেই কোন না কোন আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি দ্বারা জানা গেলেও ব্রহ্ম থেকে জগৎ ভিন্ন বলে সেগুলিও মিথ্যা এটা প্রমাণিত। এই জগতের সত্যত্ব, প্রত্যক্ষের দ্বারা যখন প্রমাণিত হল না, তখন অনুমান ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হবে না। অতএব বেদান্তীর জগৎমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়।

উল্লিখিত অনুমান ছাড়াও অদ্বৈতবাদী প্রত্যেক জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করে সেগুলির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করেন। পর্বত মিথ্যা কারণ পর্বত জড়, অথবা যেহেতু এটি দৃশ্য, বা পরিচ্ছিন্ন (দেশ-কাল ইত্যাদির দ্বারা সীমিত), যেমন স্বপ্নদৃশ্য। এখানে দৃশ্য বলতে "জ্ঞানের বিষয়" (object of knowledge) বুঝতে হবে। এই জগতে যা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তা-ই মিথ্যা—এটাই অদ্বৈত-বেদান্তীর বক্তব্য। স্বপ্নে আমরা যা কিছু অনুভব করি তা যে মিথ্যা, এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। মরুভূমিতে যে জলের ভ্রম হয় সেই জল মিথ্যা। এইভাবে স্বপ্ন ও অন্যান্য সকল দৃশ্যও মিথ্যা। এটি প্রমাণিত হওয়ায় জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান ইত্যাদি সবই জ্ঞানের বিষয় হয় বলে সবই মিথ্যা।

প্রশ্ন হতে পারেঃ এমন কোন বস্তু তো থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞেয় নয়? অজ্ঞেয় বস্তু আছে—একথা অজ্ঞেয়বাদীরা বলেন—এবং সেই বস্তুই সত্য।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেনঃ ভাল কথা, আমরাও তাই বলি। তবে অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে অজ্ঞেয় বস্তু বলছেন, তা জড় অথবা চেতন? যদি জড় হয় তাহলে তো তাকে অজ্ঞেয় বলা চলে না। তাছাড়া সত্য বস্তুটি যদি সত্যিই অজ্ঞেয় হয় তাহলে "সেটি আছে" একথা তাঁরা কি করে বলেন? কোন কিছুর জ্ঞান ছাড়া তো "সেটি আছে" বলা চলে না। লোকে জগতে "জ্ঞেয় বস্তু" সম্বন্ধে দুভাবে বলেন। কোন বস্তু বিশেষভাবে (particularly) জ্ঞেয়, কোন বস্তু সামান্যভাবে (in some aspect) জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে আমরা বিশেষভাবে জানি বলে সেগুলি বিশেষভাবে জ্ঞেয়। আর যেগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যেগুলি অনুমানের সাহায্যে জানতে হয় সেগুলি সামান্যভাবে জ্ঞেয়। অতএব অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে 'অজ্ঞেয়' বলেন, সেটি যদি জড় হয় তাহলে তা সামান্যভাবে জ্ঞেয়।

অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদীরা বা কোন বৈজ্ঞানিক বহু অনুসন্ধান করে বলছেন যে, একটা কিছু বস্তু সমস্ত জগতের কারণরূপে আছে, যেটিকে আমরা ঠিক বলতে পারছি না।

এর স্বরূপটা (essential nature) কি? তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেই বস্তুকে তাঁরা সামান্যভাবে একটা সত্তা বা শক্তি বলে অনুমান করছেন, কিন্তু তার বিশেষ রূপ জানতে পারছেন না।

কোন বস্তু যদি সামান্যভাবেও জ্ঞেয় হয় তবে আর তা অজ্ঞেয় রইল না। সামান্যভাবে যা জ্ঞেয় তা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে পড়ল। সুতরাং তা জড় এবং জড় হলেই তা অনিত্য ও মিথ্যা হবেই। আর যদি অজ্ঞেয়বাদীরা সেই অজ্ঞেয় বস্তুকে 'অ-জড়' বলেন, তাহলে অদ্বৈতবেদান্তীর সঙ্গে তাঁদের মতের বিরোধ হয় না, যেহেতু বেদান্তীরা তাকে 'জ্ঞান', 'চৈতন্য', 'আত্মা' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বোঝান।

যদিও সেই বস্তু ব্যবহারের যোগ্য নয়, তাহলেও বেদান্তী তাকে "নেতি নেতি" অর্থাৎ ব্যতিরেক-মুখে কিছুটা বোঝাতে চান। যা জ্ঞেয় তা-ই জড়। অতএব যা অজড় বা জ্ঞান তা অজ্ঞেয়। 'অজ্ঞেয়' এই জন্য যে, সেই বস্তুর দ্বারা সব কিছু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাকে প্রকাশিত করার অন্য বস্তু নেই। সুতরাং তা স্বয়ংপ্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। আর ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান 'জ্ঞেয়' নয় বলে তা 'মিথ্যা' নয়। অতএব ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানই একমাত্র সত্যবস্তু। এটিই আমাদের আত্মার স্বরূপ বা আত্মা। এই কথাই স্বামীজী সূত্রাকারে বলেছেনঃ "এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। যখন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই,

একটি বস্তু আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়াছেন। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নির্গুণ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময়।"[১১]

আত্মা যে জ্ঞানস্বরূপ তা বোঝাতে স্বামীজী বলেছেনঃ "মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সবই সসীম। অতএব সেই 'ব্রহ্মকে জানা'—একথা আবার স্ববিরোধী।...তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয়।"[১২] "তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ।...জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মস্বরূপ।"[১৩]

স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেনঃ সেই ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞাতও নন, অজ্ঞাতও নন, জ্ঞাত হতে আরও অধিক কিছু। ব্রহ্ম জ্ঞাত নন—কথাটার অর্থ কি? এখানে 'জ্ঞাত' মানে জ্ঞানের বিষয়, আর জ্ঞান বলতে বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষকে ধরা হয়েছে। এই জগতে সব কিছুই আমরা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জানি (যদিও কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কোন কিছুরই জ্ঞান বা প্রকাশ হয় না, কারণ বুদ্ধি জড় বলে বুদ্ধিবৃত্তিও জড়)।

জড়ের দ্বারা জড়কে বা চেতনাকে প্রকাশ করা যায় না। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি জড়বস্তুকে প্রকাশ করে। তখনই আমরা বলি বা বুঝি যে, পর্বত আমার জ্ঞাত, আকাশ জ্ঞাত, নদী সমুদ্র প্রভৃতি জ্ঞাত। কিন্তু এইভাবে (অর্থাৎ জড় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা) আত্মা বা ব্রহ্ম বা নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞাত হয় না। যেহেতু সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তি অন্য সব বস্তুকে জানে, তখন আবার সেই বুদ্ধিবৃত্তি কি করে সেই চৈতন্যাত্মক জ্ঞানকে জানবে বা প্রকাশ করবে? সূর্যের আলোয় প্রকাশমান হয়ে চন্দ্র অন্যান্য বস্তুকে প্রকাশিত করলেও সূর্যকে সে প্রকাশিত করতে পারে না। সেরকম বুদ্ধিবৃত্তিও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা বা চৈতন্য-প্রতিবিম্বযুক্ত হয়ে চৈতন্যকে জানতে পারে না। এই হিসাবে বলা হয়েছে যে, তিনি (ব্রহ্ম বা আত্মা) জ্ঞাত নন।

যে বস্তুর জ্ঞান বা প্রকাশ হয় না তাকে আমরা অজ্ঞাত বলি; অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বা চিৎপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমরা যাকে জানতে পারি না তাই অজ্ঞাত। বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা (nescience)। সেই অবিদ্যাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জানতে পারি না। সেজন্য অবিদ্যাকে আমরা অজ্ঞাত বলতে

পারি। অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে অবিদ্যার প্রকাশ হয় না বলে এই হিসাবে অবিদ্যা অজ্ঞাত। অথচ অবিদ্যা জড়, নিজেও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নিত্যজ্ঞান বা চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলে তাঁর অপ্রকাশ সম্ভব নয়। তিনি সদাপ্রকাশস্বভাব। সেজন্য তাঁকে অজ্ঞাত বলা চলে না। তিনি অজ্ঞাত হতে ভিন্ন।

তারপর স্বামীজী বলেছেন যে, ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞাত নন কিন্তু জ্ঞাত থেকে আরও অধিক কিছু। এর অর্থও তিনি বলেছেন। সেই আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিব দ্বারা জ্ঞাত না হলেও স্বয়ংপ্রকাশ বলে জ্ঞাত থেকে অধিক কিছু। কখনও তাঁর অপ্রকাশ হয় না। (এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে—বুদ্ধিবৃত্তি বা চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবিদ্যাকে জানা যায় না বলে এই হিসাবে অবিদ্যা অজ্ঞাত হলেও বেদান্তসিদ্ধান্তে অবিদ্যা অজ্ঞাত নয়, কারণ সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা অবিদ্যা প্রকাশিত হয়। এই জন্য অবিদ্যাকে কেবল-সাক্ষিভাস্য বলা হয়।)

এ পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা গেল, জড়বস্তুমাত্রই মিথ্যা, অজড় বা চৈতন্য অথবা অন্যভাষায় বিশুদ্ধ জ্ঞানই সত্য। প্রশ্ন হতে পারেঃ কেন জ্ঞান সত্য? জ্ঞানকেও মিথ্যা বলি যদি?

তার উত্তরে বেদান্তী বলছেনঃ দেখ, মিথ্যাপদার্থ একটা সত্যবস্তুতে অধ্যস্ত বা আরোপিত (superimposed) হয়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন, মিথ্যা সাপ দড়িতে অধ্যস্ত, মিথ্যা রজত সত্য ঝিনুকে অধ্যস্ত, মিথ্যা মরুমরীচিকা-জল সত্য সূর্যরশ্মিসংযুক্ত বালিতে অধ্যস্ত। এইভাবে সমস্ত মিথ্যা জড়পদার্থই একটা কোন কিছু সত্যতে অধ্যস্ত হয়ে আছে। যেহেতু মিথ্যা জড়বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে, সুতরাং তার অধিষ্ঠান (substratum) রূপে একটা সত্যবস্তুকে স্বীকার করতেই হবে। জড়বস্তুমাত্রেই যখন মিথ্যা, তখন জড়াতিরিক্ত চৈতন্যকেই সত্যবস্তু বলতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারেঃ বেশ, চৈতন্য বা বিশুদ্ধজ্ঞান সত্যবস্তু হোক। তাহলেও তা অনিত্য হবে। বৌদ্ধেরাও বলেন যে, সত্যবস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণ মাত্র থাকে। যা সৎ তা ক্ষণিক, চৈতন্য নিত্য হতে পারে না।

উত্তরে বেদান্তী সংক্ষেপে বলবেনঃ জ্ঞান ক্ষণিক বললে তার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, একথা মানতে হয়। এখন জ্ঞানের উৎপত্তি বা বিনাশ বুঝবে কিসের সাহায্যে? জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চয়? (কারণ জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তো প্রমাণ করা যায় না) তাহলে একটি জ্ঞানের সাহায্যে অন্য একটি জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বোঝা যাবে কি করে? 'ক' জ্ঞানের সাহায্যে 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বুঝতে হলে 'ক' জ্ঞানকে 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ দুইকালেই থাকতে হবে। তাহলে 'ক' জ্ঞানকে আর ক্ষণিক বলা যাবে না,

কারণ 'খ' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ একই ক্ষণে হতে পারে না, অন্তত দুই ক্ষণ প্রয়োজন। যদি বলা যায়, 'ক' জ্ঞানকে দুইক্ষণ-স্থায়ী বলব, তাহলে প্রশ্ন হবে এই দুইক্ষণ-স্থায়ী 'ক' জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ বুঝতে হলে তিনক্ষণ-স্থায়ী আর একটি 'গ' জ্ঞানের দরকার। এই 'গ' জ্ঞানকে বুঝতে আবার চারক্ষণ-স্থায়ী 'ঘ' জ্ঞান দরকার। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটা চিরস্থায়ী জ্ঞান স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং যা নিত্য বা সত্য তাই-ই বস্তুত জ্ঞান।

আশঙ্কা হতে পারে, এই যে নিত্যজ্ঞান প্রমাণিত হল সেই জ্ঞানকে আত্মা না বলে ঐ জ্ঞানসম্পন্ন নিত্যদ্রব্যকেই আত্মা বললে ক্ষতি কি? বৈশেষিক প্রমুখ দার্শনিকেরা আত্মাকে জ্ঞানবান বলেন। [অবশ্য তাঁদের মতে জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য এবং ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। জীবাত্মা ও ঈশ্বরের ভেদ তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তে ঈশ্বর ও জীবাত্মার বাস্তব ভেদ (ultimate difference) স্বীকার করা হয় না। একটি মাত্র আত্মা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান, এবং তিনি ঈশ্বর হতে অভিন্ন। স্বামীজীও এটা প্রতিপাদন করেছেন যার উল্লেখ আমরা পরে করব।] এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ আত্মা 'জ্ঞানবান' (Atman posseses knowledge) এই কথা বললে 'জ্ঞান' ও তার আশ্রয় (substratum, এখানে 'আত্মা') দ্রব্যের সঙ্গে ভেদ (different) অথবা অভেদ (identical) কিংবা ভেদাভেদ (different yet identical) এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে। যদি জ্ঞান ও তার আশ্রয়দ্রব্যের ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহলে আত্মা ও জ্ঞান অনিত্য হয়ে পড়বে, কারণ যেখানে যেখানে 'ভেদ' আছে সেখানে সেখানে 'অনিত্যত্ব'ও থাকে। সর্ববাদিসম্মত ঘট, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ ভেদ থাকায় সেগুলি অনিত্য। তাহলে তো বিপক্ষমতাবলম্বীদের আকাশ ইত্যাদিও অনিত্য হয়ে পড়ে। আর জ্ঞান ও আশ্রয়দ্রব্যের অভেদ স্বীকার করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ যা অদ্বৈতবাদীরা মানেন। জ্ঞান ব্যতীত সবই মিথ্যা—এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে জ্ঞানই আত্মা। আর ভেদাভেদ বিরুদ্ধ বলে এটি স্বীকৃত হতে পারে না।

তাহলে দেখা গেল যে, বিশুদ্ধজ্ঞান নিত্য বা সত্য, আর এটিই আত্মা। এখন একটা আশঙ্কা উঠতে পারেঃ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিত্য হলেও বহু নিত্যজ্ঞান অর্থাৎ বহু আত্মা স্বীকার না করে এক অদ্বিতীয় আত্মার স্বীকার কেন করব? লোকেরা নিজের নিজের আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে মনে করে। তাছাড়া "আত্মা একটি" স্বীকার করলে একজনের মুক্তি হলেই সকলের মুক্তি হয়ে যায় বলে ধরতে হবে। "এক আত্মা" মানলে একজন বদ্ধ আর একজন মুক্ত কিভাবে হতে পারে?

এর উত্তরে স্বামীজী বলছেনঃ "বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই।...শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। যেখানেই দুই সেইখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই গোল।"[১৪] "আত্মা জানেন তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ, আত্মা যে সুখী তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ।"[১৫]

"জ্ঞান তো সসীম;...তিনি (ব্রহ্ম)...বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ।"[১৬]

"অনন্ত কখনও দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে কেবল একটিমাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে...ইহা সত্য নহে।"[১৭]

অনন্ত (Infinite) বললে দেশ (space) কাল (time) বা বস্তুব (matter) দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (unlimited) বোঝায়। পদার্থ তিনভাবে সান্ত (with an end) হতে পারে। যেমন, হিমালয় পর্বত বিশেষ দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (limited); আবার কালের দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন। যেহেতু হিমালয় পর্বত একটি সময়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন এক কালে বিনষ্ট হবে। এটি আবার বস্তুর দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন; যেমন, বিন্ধ্য পর্বত ইত্যাদি থেকে হিমালয় ভিন্ন। আকাশ (sky) দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হলেও কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। যাঁরা আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন না, তাঁদের মতেও আকাশ বস্তু-পরিচ্ছিন্ন, কারণ পৃথিবী ইত্যাদি হতে আকাশ ভিন্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বস্তু স্বীকার করলেই তাদের পরস্পর ভেদ থাকায় তারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সান্ত হবেই। কিন্তু আত্মা অনন্ত বলে একমাত্র আত্মাই আছে, দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। যে দ্বৈত জগৎ আমরা অনুভব করছি, তা মিথ্যা। আগেই এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করে এসেছি।

এখন জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ বলে দুটি সত্যজ্ঞান রয়েছে একথা প্রমাণ করা যায় না। দুটি স্বীকার করলেই তা সান্ত হয়ে যাবে। তবে যে আমরা রূপের জ্ঞান, গাছের জ্ঞান, জলের জ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অনুভব করি, বস্তুত সেটি জ্ঞানের স্বরূপগতভেদ (difference in true sense) নয়। আসলে এক অদ্বিতীয় আকাশকে ঘট, গৃহ ইত্যাদি উপাধি (limiting adjunct) ভেদে ঘটাকাশ, গৃহাকাশ ইত্যাদি রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ বলে মনে করি। ঠিক

সেরকম ঘট, জল, পৃথিবী ইত্যাদি উপাধিরূপ বিষয়ের ভেদবশত জ্ঞানের ভেদ মনে করি। উপাধিগুলিকে বাদ দিলে জ্ঞানের কোন ভেদ থাকে না। চিন্তা করেও শুদ্ধ জ্ঞানে (knowledge in its true sense) ভেদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অদ্বৈতবাদীরা অতি বিস্তৃতভাবে ভেদের খণ্ডন করেছেন। ভেদ খণ্ডিত হলে এক অদ্বৈত বস্তুই অবশিষ্ট থাকে। এ বিষয়ে দু-একটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ জ্ঞাত হয় না; কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়—এই জল, এই পাহাড়, এই গাছ ইত্যাদি রূপে। ভিন্ন জল, ভিন্ন পাহাড় এভাবে তো প্রত্যক্ষ হয় না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে (determinate perception) জল, জলত্ব ও তাদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, ভেদের জ্ঞান হয় না। পূর্বপক্ষী হয়তো বলতে পারেন "এই জল" ইত্যাদি প্রত্যক্ষে জল, জলত্ব ও তাদের যে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, সেখানে বৈশিষ্ট্য বলতে জল ও জলত্ব থেকে অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না, কিন্তু জলে জল-ভিন্ন বস্তুর ভেদই দেখা যায়। তাছাড়া এখানে বৈশিষ্ট্য বলতে জল ও জলত্বের সম্বন্ধকে (relation between water and watery) বোঝায় একথাও বলা চলে না, কারণ 'জল-জলত্ব-সম্বন্ধ' এরকম জ্ঞান আর "এটি জল" এরকম জ্ঞানের একরূপতা-আপত্তি হয়। সুতরাং জল, জলত্ব ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যই ভেদ। এবং এটি সবিকল্পক প্রত্যক্ষে জানা যায়।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেনঃ বৈশিষ্ট্যকে ভেদ বলা চলে না। কারণ যেখানে "নীল পদ্ম" বলা হয়েছে, সেখানে অ-নীল বা নীলভিন্নের জ্ঞান হয় না বলে নীলভিন্নের ভেদের জ্ঞান হয় না। যদি বলা যায়, সেখানে পূর্বানুভূত অ-নীলের স্মৃতি হতে পারে, তাহলে তার উত্তর হবে যে, যার প্রথমেই নীল পদ্মরূপে নীলের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হয়, তার এ জন্মে অ-নীলের অনুভব হয়নি বলে অ-নীলের স্মৃতি হতে পারে না, এবং সেজন্য অ-নীলের ভেদের জ্ঞানও হতে পারে না। যদি বল যে, সেই ব্যক্তির পূর্বজন্মানুভূত অ-নীলের স্মৃতি হয়, তাহলে বলব যে, এতে অনেক গুরুতর কল্পনার প্রসঙ্গ হয়। তাছাড়া "এটি জল", "এটি গরু" এভাবেই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। "এটি অ-জল ভিন্ন", "এটি অ-গো ভিন্ন" এইভাবে কারও জ্ঞান হয় না। আর জলে জলত্ব বা গরুতে গোত্বকে অ-জল ব্যাবৃত্তি (অ-জল ভেদ) বা অ-গো ব্যাবৃত্তি রূপে জল, গরু ইত্যাদি পদার্থের অবচ্ছেদক (পদার্থতাবচ্ছেদক, determining characteristic) বললে 'জলত্ব', 'গোত্ব' ইত্যাদি ধর্মের (attribute) উচ্ছেদ হয়ে যায়। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ভেদ বিষয় হয় না।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেও (indeterminate perception) ভেদ জ্ঞান হয় না, কারণ এতে জল ও জলত্ব অবিশিষ্ট (non-different) রূপেই জানা যায়।

যদি বলা হয়ঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে জল ও জলত্ব বিষয় হয়, তাতেই ভেদও বিষয়রূপে সিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ জলের স্বরূপ (essential nature) হচ্ছে স্বরূপভেদ, আর জলত্ব হচ্ছে বৈধর্ম্যভেদ।

তার উত্তর হবেঃ না, জল বা জলত্বকে ভেদত্বরূপে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে জানা যায় না।

যদি পূর্বপক্ষী বলেনঃ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ভেদত্বরূপে ভেদের জ্ঞান না হোক, জল আর জলত্ব এই বস্তুগুলি তো স্বরূপত ভেদই। তাহলে ভেদের জ্ঞান হল না কি করে?

তার উত্তরে বলা হয়ঃ দেখ, 'ভেদ' বিষয়টিই এখনও প্রমাণিত হল না। তাহলে কি করে তা বস্তুর স্বরূপ বলে প্রতিপাদিত হবে? বাস্তবিক পক্ষে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে নির্ধর্মক (without any attribute) বস্তুমাত্রই বিষয় হয় বলে অভেদই এই জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেও ভেদ বিষয় হয় না।

প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ প্রমাণিত না হওয়ায়, অনুমানাদি দ্বারাও ভেদ প্রমাণিত হয় না। তবে যে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন, সেখানে সাধারণ লোকের ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয় কল্পিত ভেদকে অবলম্বন করেই তার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করেন। এতে ভেদের পারমার্থিকত্ব (ultimate existence) প্রমাণিত হয় না। এইভাবে ভেদই যখন কোন ভাবে প্রমাণিত হয় না, তখন একটি সত্য বস্তুই প্রতিপাদিত হয়। আর সেই বস্তু 'জ্ঞান' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ জ্ঞান অনেক নয়, কিন্তু এক, অদ্বিতীয়। আর ঐ জ্ঞানই আত্মা।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—এটাও স্বামীজী পরিষ্কারভাবে বলেছেন। আবার ঐ জ্ঞান নিত্য বা সত্য, তাও বলেছেন। সত্য মানে সত্তাবান (possessing existence) নয়। কিন্তু সত্তাস্বরূপ। অবাধিত সত্তাস্বরূপ জ্ঞানই আত্মা। আত্মাকে সত্তাবান বললে সত্তা (existence) আত্মার ধর্ম (attribute) এবং আত্মা ধর্মী—একথা বলতে হয়। কিন্তু ধর্ম-ধর্মীভাব যেখানেই থাকে, তা অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন (limited) ও জড় হয়। সেজন্য আত্মা অবাধিত সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। এই আত্মা আবার আনন্দস্বরূপও। কারণ সমস্ত প্রাণীরই স্বীয় আত্মার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম রয়েছে। কেউই ইচ্ছা করে না বা চিন্তা করে না যে, সে একসময়ে একেবারে থাকবে না। সকলেই চায়, আমি বরাবর থাকব। অন্য বিষয়ে বা অন্য লোকের উপরে যে ভালবাসা তা সব সময় থাকে না। কিন্তু নিজেকে সবাই ভালবাসে এবং এই ভালবাসা অব্যভিচারী (non-ceasing)। অন্যের উপর ভালবাসা সোপাধিক (mixed with an attribute, a quality) বা কৃত্রিম। এইভাবে মানুষের নিজের উপর ভালবাসা দেখে বোঝা যায় যে, আত্মা সুখস্বরূপ,

আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ না হলে আত্মাতে প্রত্যেক জীবের অকৃত্রিম ভালবাসা হত না। স্বামীজী এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। আত্মা বস্তুত এক হলেও দেহাদি রূপ উপাধির (limiting adjuncts) ভেদবশত বহু বলে মনে হয়। তাই একদেহ-অবচ্ছেদে (limited to one body) আত্মার মুক্তি হলেও অপরদেহ-অবচ্ছেদে আত্মার বন্ধন সম্ভব হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির অব্যবস্থা (contradiction) হয় না। সকল দেহে বস্তুত একই আত্মা আছেন—এটি না জানার জন্যই জগতে যত বিভেদ, মারামারি দেখা যায়।

বেদান্তের এই অদ্বৈততত্ত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে এক আত্মা—এটি সকলে উপলব্ধি করতে পারে না, সাধনা (spiritual practice) না থাকায়। অনেকে এই অভিন্ন (non-dual) আত্মার ধারণাই (conception) করতে পারে না। সেজন্য অতীতে এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীর উপর খুব জোর দেওয়া হত। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীকেই এই জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হত। কিন্তু স্বামীজী বলেছেনঃ এই অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে সকল মানুষের অধিকার আছে; বিশেষত এই আধুনিক যুগে পৃথিবীর সবাইকে এই তত্ত্ব শোনানো প্রয়োজন। এইখানেই স্বামীজীর উদারতা ও অপূর্বতা। কারণ অতীতে প্রায় কেউই সকল মানুষকে এই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করেননি। স্বামীজী বলছেনঃ "অদ্বৈত-বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ...কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্বলতা-নিবারণের একমাত্র ঔষধ। ...এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট, সকলকেই কেন না বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও?"[১৮] বেদান্তের এই অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী বহু প্রশংসা করে একেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। "আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না।"[১৯] পৃথিবীর সকল মানুষকে বেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার দেওয়া স্বামীজীরই সম্পূর্ণ নূতন এক মহান অবদান।

এ ছাড়াও আর একটি নূতনত্ব স্বামীজীর অবদান। অতীতে ভাবা হত যে, যাঁরা বেদান্ততত্ত্বের বিচার করবেন বা বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের সাধন করবেন, তাঁরা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে ঐ রকম সাধনা করবেন। কিন্তু স্বামীজী বলেছেনঃ এই বেদান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও লাগাতে হবে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার দরকার নেই। যাঁরা

বেদান্ততত্ত্বের বিচার করবেন তাঁরা কর্মকেই সেই দৃষ্টিতে কাজে লাগাবেন। যোদ্ধা যুদ্ধ করুক, ব্যবসায়ী ব্যবসা করুক, কৃষক জমি চাষ করুক, কিন্তু তারা যেন সকলেই নিজের নিজের কর্মকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে অনুষ্ঠান করে। অর্থাৎ গাড়ী ব্রহ্ম, চালক ব্রহ্ম, চালনক্রিয়া ব্রহ্ম—এরকম চিন্তা করেই কাজ করতে হবে। অথবা সকল জীবকে শিব বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেবা করতে হবে। এরকম দৃষ্টিতে কর্ম করলে সেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হবে না। বরং জ্ঞানের উৎপাদন দ্বারা মুক্তির কারণ হবে। "বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবার মতো হইতে হইবে। ...শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে. .।"[২০]

এখানে স্বামীজী বলতে চান যে, উপনিষদে সর্বত্র বেদান্তবেদ্য আত্মচিন্তার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রেও সেই চিন্তার ধারা চালানোর উপদেশ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" ইত্যাদি ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, সমস্ত জগৎকে ঈশ্বর বা পরমাত্মারূপে চিন্তা করতে হবে; আবার "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি" ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে ঈশ্বরাত্মবুদ্ধি করে কর্মও করতে হবে। গীতাতে ভগবান সর্বত্র এই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগের কথাও বলেছেন। সেই গীতাতেই ভগবান বলছেনঃ পূর্বে এই জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে বলেছিলেন, মনু তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন। এই ক্রমে ক্ষত্রিয় রাজারা এই যোগ জানতেন। তাঁরা মহাকর্মীও ছিলেন, আবার একাধারে জ্ঞানীও ছিলেন। ক্ষত্রিয় অজাতশত্রুও এই জ্ঞান ব্রাহ্মণ গার্গ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, যতক্ষণ অপরোক্ষানুভূতি না হচ্ছে, ততক্ষণ বেদান্ততত্ত্বজ্ঞানের সাধনাও করতে হবে এবং তার সহায়ক হিসাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠানও করতে হবে। অপরোক্ষানুভূতি দৃঢ় হলে তখন আর কর্ম না করলে ক্ষতি নেই। অবশ্য ঐরূপ জ্ঞানী বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ কর্ম করেন না, আবার কেউ কেউ লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করেন।

"যাঁহারা এই সত্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা বনে অথবা পর্বত-গুহায় বাস করিতেন না, অথবা সাধারণ লোকও ছিলেন না, কিন্তু যাঁহারা (আমাদের বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে) বিশেষরূপে কর্মময় জীবন-যাপন করিতেন...তথাপি তাঁহারা এই সকল তত্ত্বের চিন্তার, উহাদিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন।"[২১] "বেদান্ত

আমাদিগকে কার্য করিতে নিষেধ করেন না, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে...ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য—সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সক্ষম হইবে।"[২২] "বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর... প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া অবশ্য আমাদিগকে কার্য করিয়া যাইতে হইবে। ...এইরূপ করিলে কর্মফল তোমাদিগকে লিপ্ত করিতে পারিবে না।"[২৩]

"যাঁহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন, দোষ তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাঁহারা কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও মুক্তিলাভ হয়।"[২৪]

এইভাবে স্বামীজী বেদান্ততত্ত্বের প্রচার আর তার সহায়ক উপাসনারূপে কর্মযোগের প্রচার করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তিনি বেদান্ততত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি সম্পন্ন বরাবরই ছিলেন বলে তাঁর কথাগুলির মধ্যে এত জোর। আর তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই বেদান্ততত্ত্বকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে হবে। কেবল মুখে আওড়ালে চলবে না।

"যখনই আমাদের আত্মার এই প্রত্যক্ষানুভূতি আরম্ভ হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে।"[২৫] "ধর্ম চিরকালই একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে।"[২৬] "ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না।"[২৭]

স্বামীজী বেদান্ততত্ত্বকে যেমন সহজভাবে বুঝিয়েছেন সেরকম সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করার উপায়ও সরল এবং বিস্তৃতভাবে বলেছেন। সেসব তাঁর "বাণী ও রচনা" থেকে আমরা দেখতে পাই। সেসব আলোচনা এত বিস্তৃত ও বিশাল যে তার ব্যাখ্যা করতে অসংখ্য গ্রন্থ ভবিষ্যতে রচিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব স্বীয় বুদ্ধিতে তা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করলাম।

"ওঁ বিবেকানন্দার্পণমস্তু"

নবজাগরণের আলোকে ঃ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ

প্রস্তাবনা

মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী একজন সন্ন্যাসী! দুই একটি মঠ-মন্দির স্থাপনা, কিছু শিষ্য-শিষ্যাকে মন্ত্রদান, পরজীবনের মোক্ষলাভ প্রসঙ্গে কিছু বাণী বিতরণ, কিছু পাঠ কথকতা, পূজো-আহ্নিক-জপতপ, ধ্যান-প্রাণায়াম, খুব বড়জোর সাধারণ দুঃস্থ দুঃখী মানুষের জন্য একটি-দুটি সেবাপ্রকল্পের উদ্বোধনঃ সাধু-সন্ন্যাসী বলতে এই সব জীবনকৃত্যই তো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। স্বামীজীও কি এদেরই একজন? এই কি তাঁর পরিচয়? তাই যদি হত, তাহলে, বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধ লেখার কোন প্রয়োজন হত না। বহিরঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ হলেও স্বামীজীর জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। তাঁর সমগ্র জীবনসাধনাই একান্তভাবে জীবন-অভিমুখী। বিশেষ এক যুগ-সংকটে একটি সমগ্রজাতির সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির মহান রূপকার। স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই অন্য আর এক ভারতপুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত এযুগের মহা কবির সেই বিশ্রুত পঙ্ক্তি দুটি মনে পড়েঃ "একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।" প্রায় আটশ বছরের পরাধীন পরপদলাঞ্ছিত ভগ্ন-ভ্রষ্ট-রুগ্ন-লোভী-ভীরু-দুর্বল, আত্মবিশ্বাসহীন ভারত-বর্ষকে তিনি যথার্থই একধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সে ধর্মের নাম মানবধর্ম, জীবনধর্ম। বস্তুতপক্ষে, অতল অন্ধকারের আবর্ত থেকে গোটা একটা জাতিকে এক ঝটকায় তিনি নবযুগের সূর্যকরোজ্জ্বল উপকূলে নিয়ে এসেছিলেন। আধুনিক পৃথিবীর প্রাণরঙ্গমঞ্চে মাথা উঁচু করে স্বনির্ভর দাঁড়াবার স্বাধিকার তুলে দিয়েছিলেন জাতির বিদীর্ণ শীর্ণ পাণ্ডুর করপুটে। ভালবাসার মহান মন্ত্রে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নের মধ্যে নিয়ে এলেন সমন্বয়ের সুস্থ সুন্দর প্রাগ্রসর জীবনচেতনা। স্বামীজীর এই অবিশ্বাস্য কর্মসম্পাদন-প্রতিভা দেখেই রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ

"He himself was the embodied unity of a nation containing a hundred different nations, wherein each nation, divided and subdivided into castes and sub-castes, seems like one of those diseased persons whose blood is too liquid to congeal—and his ideal was unity, both of thought and of action. His claim to greatness lies in the fact that he not only *proved* its unity by

reason, but *stamped* it upon the heart of India in flashes of illumination."[১]

সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই তাঁর আজীবনের সাধনা। সামগ্রিক সুন্দর সমন্বয়ী পরিপূর্ণ জীবনের তিনি রূপকার। ইউরোপীয় জীবননীতিতে যাই হোক, আমাদের ভারতসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত যাঁদের জানা আছে, তাঁরা জানেন এদেশে ইহ-পরকাল, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার মধ্যে সত্যিকার কোন দুস্তর প্রভেদ নেই। সর্বাত্মক, সমগ্র, পরিপূর্ণ জীবনের উদ্বোধনই আমাদের সাধনা। এই কারণেই "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি, আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;" —কেবল কবিকথন নয়, জীবনানুগ বাস্তব সত্য। "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এ আমাদের চিরন্তন জীবনসংস্কার। "সোনে ভরিতী করুণা নাবী"[২] আমাদের কাছে কোন আশ্চর্য সংবাদ নয়। "সুনকরুণরি অভিনচারে কাঅবাক্‌চিএ"[৩] – অর্থাৎ শুদ্ধ কায়বাকচিত্তে শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন মিলন এদেশের মাটিতে চিরকাল সম্ভব হয়েছে। তাই সর্বমোহমুক্ত কৈবল্যমুক্তির পরমানন্দে স্থিত 'জ্ঞানাগ্নি-শুষ্ক' সন্ন্যাসীর "আঁখি-পল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত"।[৪] আমাদের সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এমন সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির উদাত্ত ধ্রুপদী সংগীত। এ বন্ধন কেবল মোহের বন্ধন নয়, অশিক্ষার, অজ্ঞতার, ক্ষুধার, তৃষ্ণার, ব্যাধির-যন্ত্রণার কুসংস্কারেরঃ সমস্ত বন্ধন থেকেই অখণ্ড মুক্তির পিপাসা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক—সব রকম বন্ধনমুক্তির আকূতি পরিস্ফুট হতে দেখি বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সমস্ত চর্যায় আচরণে, কর্মে-কথায়-তপস্যায়। এই সমন্বয়ের আদর্শই ভারতসংস্কৃতির মূল ঘোষণা। আমাদের ভিতরে যা কিছু সুপ্ত, ঘুমন্ত, অস্ফুট, তাকে জাগাতে হবে। পতিত মানবজমিতে ফসল ফলাবার, পাথরে ফুল ফোটাবার সাধনাই আমাদের। হয়ে ওঠা, এই life becoming, এই অবিরাম অপাবৃতির তপস্যাই আমাদের জীবনচর্যা, পরম অন্বিষ্ট। সবাইকে, সমাজের প্রতিটি মানুষকে একদিন পূর্ণের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতেই হবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই অবাক ঐকতানের আবাহন এবং তার মধ্যেই গড়ে ওঠে সুস্থ সুন্দর সচ্ছল সম্পন্ন সমাজব্যবস্থা। এই সমাজই মহামায়ার ছায়া এবং আমাদের সমগ্র জীবনের নিয়ামক। ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম হয়তো আমাদের ছিল না, কিন্তু সমাজের প্রতি স্তরের প্রতিটি

মানুষের সহজ স্বচ্ছন্দভাবে হয়ে ওঠার অধিকার স্বীকৃত ছিল আমাদের দেশে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভই আমাদের পরম পুরুষার্থ। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি অবস্থা ও পরিণতি আমাদের মৌল অস্তিময় সত্তাকে পরিচর্যা করে পূর্ণ করে তোলে এবং বৃহতের অভিমুখে সম্প্রসারিত করে। জীবনকে ত্যাগ করে কিছু নয়, জীবনকে মেনেই জীবনকে নানাভাবে প্রসারিত করার সাধনাই আমাদের জীবনসাধনা। সন্ন্যাসের মতো তাই গার্হস্থ্যকেও আমরা আশ্রম বলে সম্মান করেছি। ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় বন্ধনের থেকে আমাদের এই সামাজিক সংহতি ও সম্পর্ক ছিল তাই আরও গভীর ও ব্যাপক।

সর্বব্যাপী আত্মার অখণ্ড অবিনশ্বর অস্তিত্ব এবং "সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা মহাত্মা"—সেই 'এক'-এর আরাধনায় দেহ-মন-আত্মার সর্ব-সমর্পণ এবং সঙ্গে সঙ্গে "বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায়" কিংবা "সব্বে সুখিতা হোন্তু" জীবন-পরিকল্পনা ভারতবর্ষের চিরন্তন জাতীয় সংস্কার। ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সর্বাত্মক হয়ে ওঠার সাধনা, দেহে মনে আত্মায় পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠার আদর্শ আমাদের চিরকালের—এই কথাই, এ বিস্মৃত জীবনাদর্শই এযুগের মতো করে নতুন ভাবে বললেন স্বামীজী; বললেন বঙ্কিমচন্দ্র। বললেন নবজাগরণের মনীষিবৃন্দ। বঙ্কিমের অনুশীলনধর্ম সেই সনাতন ধর্মেরই যুগোপযোগী জীবনভাষ্য। পূর্ণের অভিযোজনায় ফুলে ফসলে হয়ে ওঠার অধিকার আমাদের সমাজে ছিল সহজ স্বীকৃত সত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সেই পূর্ণের সাধনা থেকে হলাম বিচ্যুত। খণ্ডিত হল জীবন-বোধ। আশ্রয় করলাম কোনমতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শম্বুকবৃত্তি। ফলে জাতি ও দেশ হিসাবে ঘটল আমাদের অপমৃত্যু। তাই নতুন করে আবার বেঁচে ওঠার ঊষালগ্নে নতুন করে আবার বলতে হল সেই সব প্রাচীন জীবন-সত্যকে যুগোপযোগী করে। জাতি হিসাবে এই নতুন করে বেঁচে ওঠার নবার্জিত আত্মপ্রত্যয়েরই অন্য নাম রেনেসাঁ (renaissance) বা পুনর্জাগরণ।

বিশাল ব্যাপ্ত মহিমময় সেই মহাভারতীয় সভ্যতার কি করে এমন বিনষ্টির অন্ধকারে অবলুপ্তি ঘটল—সে ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং জটিল। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনারও অবকাশ নেই এখানে। এক কথায় বলা চলে ইহজীবনের প্রতি প্রচণ্ড ভ্রান্ত অনীহাই সেই সমন্বিত মহাজীবনের থেকে পতনের মূলীভূত কারণ। যে কোন সভ্যতার দুটি দিক আছে ঃ কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ী সভ্যতা। বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করে সুখে ও সচ্ছলতার মধ্যে বেঁচে থাকার বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহই কাত্যায়নী সভ্যতার অবদান। আর "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্" বলে নিজেকে জানার, অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে ধ্যানের গভীরে আত্ম-প্রসারিত করার যে আকৃতি, বিশাল ব্যাপ্ত অব্যক্ত অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার, মহামিলনের যে তপস্যা, তাকেই বলি মৈত্রেয়ী সভ্যতা। এই দুইয়ে মিলেই

তো সমগ্র জীবন। একটি সম্পন্ন সুন্দর ছবির মতো রঙে রেখায় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা থাকে কিছু অংশে, আর বাকিটা অবকাশ (sky)। এই দুই নিয়েই ছবিটির অখণ্ড পূর্ণ সৌন্দর্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি পূর্ণাঙ্গ সার্থক জীবনের অধিবাসনাও সম্ভব হয় এই দুটি সভ্যতার সমান কর্ষণায়। স্বামীজী কথিত H^3 ফর্মুলা (Head, Hand and Heart) মস্তিষ্ক বাহু ও হৃদয়ের সমন্বয়—একদিন ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু আমরা অতিরিক্ত অধ্যাত্ম-চর্চার দিকে মনঃসংযোগ করার ফলে প্রত্যহজীবনে সচ্ছল সুস্থ সার্বিক চেতনায় বেঁচে থাকার সংগ্রামকে করেছি অস্বীকার। এবং অতঃপর শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা থেকেও পতিত হয়েছি আমরা আচারবিচারের অন্ধ নানা কুসংস্কারের অতল অন্ধকার বৃত্তে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার ভণ্ডামিকেই প্রশ্রয় দিয়েছি আধ্যাত্মিকতার নামে। বনস্পতির যেমন শিকড়-সন্নিধি থাকে মাটির গভীরে, তেমনি উপরে থাকে ফুল্লকুসুমিত রূপ; পত্র-পল্লব-ফল-ফুলের সমৃদ্ধ সমারোহ। অর্থাৎ একটি বৃক্ষের পক্ষে তার ফুল ফলও যেমন সত্য, অন্ধকার ভূমিগর্ভে শিকড়ের নিত্য অভিযানও ততটা সত্য। এক সত্যকে ছেড়ে আর এক সত্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।"—এই জীবনচর্যায় আস্থাশীল বলেই একদিন ধনে-জনে-সম্পদে, মেধায়, মননে, বীর্যে-পরাক্রমে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ (centripetal & centrifugal) শক্তির সমন্বয়েই জীবনের অস্তিত্ব। স্থিতি এবং গতির সমন্বয়েই জীবন। ভারসাম্য নষ্ট হলেই সব হারিয়ে যায়। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি দুইয়ের বিরুদ্ধেই মানবসভ্যতার অভিযান। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন বহিঃপ্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে অন্তঃ-প্রকৃতি বিজয়েই সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য-উদ্যম বিনিয়োগ করেছিল। ফলে, বহিঃ-প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে তার উপরে। একে বলা যায় প্রকৃতির প্রতিশোধ। জাতি হিসাবে পতিত হয়েছি বিনষ্টির অন্ধকার আবর্তে। নবজাগরণের ঊষালগ্নে স্বামীজী এই কথাটিই নতুনভাবে শোনালেন ভারতবর্ষকে ঃ "যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে।" "বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করাই হল মানুষের হয়ে ওঠার উপায়। তাই যুগপৎ চাই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মচিন্তা।" "এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।...এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।"[৫] নতুন ভারতবর্ষকে আবার পূর্বগৌরবে

প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই স্বামীজীর এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের যুগবাণী, জাতির কাছে এই মঙ্গল-সুসমাচার।

অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত ঃ আগেই বলেছি জাতির জীবনে এই অধঃপতন, অবক্ষয় ও অন্ধকারের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা খুব সহজ নয়। কিন্তু রেনেসাঁ বা নবজাগরণের আলোকাভিসারের অর্থদ্যুতি স্পষ্ট প্রতিভাত করার জন্য সেই অতল গাঢ় অন্ধকারের চেহারাটা একটু দেখা দরকার। বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানাভাবে সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য ও আত্ম-আবিষ্কারের নব নব সৃষ্টিসম্ভার বহন করে নিয়ে এলেও এই বৌদ্ধধর্মের অন্ত্যপর্বেই অবক্ষয় ও অন্ধকারের প্রথম পদপাত। একই নৌকায় করুণা ও শূন্যতার বা তথতার পসার বহন করা আর হয়ে উঠল না। প্রথমে কেবলমাত্র শূন্যতার আধিচর্চা এবং অতঃপর করুণার অংশ ভারী হতে হতে শেষ পর্যন্ত নৌকাডুবির সম্ভাবনা দেখা দিল। হৃদয়-অনুভব-ধ্যানের চেয়ে বহিরঙ্গ কর্মকাণ্ড ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদির দিকে অত্যধিক প্রবণতাই একদা ত্বরান্বিত করেছিল যজ্ঞনিন্দাকারী বুদ্ধ-অবতারের আবির্ভাব। আসলে ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য বিনষ্ট হলেই তখন সেখানে শুরু হয় ঝড়ের আলোড়ন বা বিদ্রোহ। নিসর্গনিয়মের মতো মানুষের সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসেও ঐ একই সত্য ক্রিয়াশীল। বুদ্ধের মহৎ ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে বৌদ্ধধর্মের শেষ অধ্যায়ে সকলের জন্য ঢালাও সন্ন্যাসদান, অহেতুক অহিংসা-নীতির সর্বত্র অন্ধ অনুবর্তন এবং মঠে ও সঙ্ঘারামে করুণা ও হৃদয়বৃত্তির সমধিক চর্চা ও প্রশ্রয়ঃ এই সব কারণই শেষ পর্যন্ত জাতি হিসাবে আমাদের বাস্তবজীবন-বিমুখ করে তুলেছিল। অবাধ করুণাচর্চার প্রশ্রয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারামগুলি হয়ে উঠেছিল নেড়ানেড়ীর লীলা-বিহার এবং বিকৃত কামচর্চার কেন্দ্র। এবং তখনই ঘটে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। শঙ্কর অত্যধিক অস্বাস্থ্যকর হৃদয়চর্চার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কপ্রধান অদ্বৈতবাদ এনে জাতির জীবনে ভারসাম্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর অনতিকাল পরেই শুরু হল তুর্কী তাতারদের বর্বর বিজয়-অভিযান। ইহসর্বস্ব সেমিটিক সভ্যতার প্রতিনিধি মুসলমান-আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন বিধ্বস্ত হল কাত্যায়নী সভ্যতার প্রকর্ষে দুর্বল ভারতবর্ষ। কাত্যায়নী সভ্যতার অন্যায় অবহেলা এমনি করে জাতির জীবনে নিয়ে এল চরম অভিশাপ ও দুর্গতি। তারপর কয়েকশ বছরের অন্ধকার ইতিহাসে অবিরাম সঙ্ঘর্ষ, হানাহানি, লুটতরাজ, লোভ-হিংসা-ষড়যন্ত্রের পুনরাবৃত্তি। ভারতসংস্কৃতি শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করে কোনমতে বেঁচে থাকতে প্রয়াসী হল। নানা নিয়ম-নীতি-নিষেধের ডোরে, স্মৃতির দায়ভাগে বন্দী, হাঁচি-টিকটিকি-পঞ্জিকা-পদী-পিসির অক্ষম অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনদশা মেনে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে বেঁচে রইল এক কোণে। বাংলায় পাল ও সেন

বংশের পর পাঠান রাজত্বে এবং পরবর্তী মোগল আমলে, মাঝে মধ্যে কিছুটা বহিরঙ্গ শান্তি-ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আরও প্রগাঢ় তমসায় আচ্ছাদিত হয়ে গেল সমগ্র দেশ।

প্রথম নবজাগরণঃ মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পথে আর একবার দেশে এসেছিল নবজাগরণের জোয়ার। নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আর্ত-লাঞ্ছিত-দুঃখী-দুঃস্থ মানুষের সপক্ষে, উজ্জ্বল উদাত্ত মানবতার উদ্বোধনে, সমন্বয়ী জীবন রচনার অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল দেশ ও জাতি। কিন্তু সে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব ভারতে। তাছাড়া পাঠান মোগল তুর্কী সকল মুসলমান বিজেতাই এই দেশে থেকে গিয়েছিল বলে, শেষ পর্যন্ত এদেশের মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আপসের পথে একটি সমন্বয়ী ঐক্যে মিলেমিশে গিয়েছিল। নিজেদের প্রয়োজনেই মোটামুটি একটি সামাজিক শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হতে হয়েছিল। ইসলামের সঙ্গে সংঘাতে-সংঘর্ষে-সমন্বয়ে কিছু কিছু রূপান্তরণের মধ্য দিয়েও, ভারতসংস্কৃতির মৌল ধারাটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণভাবেই প্রবাহিত ছিল। এবং এই দুই সভ্যতার সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে কিছু কিছু নতুন ফসলও জাতির ভাণ্ডারে জমা পড়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, বহিরঙ্গ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাই হোক, মুসলমান যুগেও গ্রামে গাঁথা কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ সামান্য শিথিল ও ভ্রষ্ট হলেও, কখনও একেবারে ভেঙে পড়েনি। কারণ হিন্দুযুগে প্রচলিত জমির উপর সাধারণ শ্রেণীর মানুষের অধিকারে কোন রাষ্ট্রনায়কই কখনও অকারণে হস্তক্ষেপ করেননি। স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ও পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের সহজ জীবনচর্যা নিরবচ্ছিন্নভাবেই দুঃস্থতার মধ্যে, নানা বিপরীত তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করেও তাই এগিয়ে চলেছিল।

ইংরেজ আগমনঃ কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের প্রহসনের পশ্চাতে সুড়ঙ্গপথে যারা এদেশে এল, তাদের আক্রমণের চেহারা গোড়া থেকেই অন্য-রকম। ইংরেজ সর্বদিক থেকেই এদেশে একান্তভাবে বিদেশী। এবং আক্রমণও সর্বাত্মক। এদেশের মাটিতে বসতি স্থাপন করে এদেশকে তারা আপন করে নিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান রাজশক্তির পরাজয় ও পতন, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ কর্তৃক দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমের কাছ থেকে কোম্পানির নামে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিশের চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ এসবের সম্মিলিত প্রভাবে বাংলার আকাশে ঘনিয়ে এল চরমতম দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার কালো মেঘ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ এমনি করেই

আমাদের ইতিহাসে শুরু হল কালান্তর। এমনি করেই আমরা জড়িয়ে পড়লাম বিশ্বধনতন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে। অবাধ লুণ্ঠন, শাসনের নামে নির্মম শোষণ, উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণ, ধনতন্ত্রের এই নীতিহীন নীতি আমাদের শেষতম জাতীয় সম্পদটুকুও গ্রাস করতে উদ্যত হল। ভিতরে বাইরে সর্বদিকে একসঙ্গে আঘাত হানল ব্রিটিশ রাজশক্তি। ক্রমে স্বদেশে পরবাসী হলাম আমরা। যদিও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেতনা তখনও জাতির অন্তরে উন্মেষিত হয়নি, তবু ভিতরে ভিতরে একটা প্রতিবাদ ও প্রত্যাঘাতের ঝড় উঠেছিল জাতির মগ্নচৈতন্যের অন্তরে। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা গেল তার সামান্য প্রকাশ। হরণ করা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওয়েলেসলির সময়ে। জড়তায় তামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির নানা দিক থেকে আঘাতের পর আঘাতে ছিন্নভিন্ন, খণ্ড-ক্ষিপ্ত, বিমূঢ় বেদনায় বিব্রত ব্যতিব্যস্ত। ইংরেজ শাসন ও শোষণই যে কেবল আমাদের জীবন ও জীবিকাকে আঘাত করল, বিনষ্ট করতে উদ্যত হল আমাদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত, তাই নয়, তাদের শিক্ষা ও সাহিত্য, তাদের জীবনাদর্শ ও পদ্ধতির আপাতরমণীয় চাকচিক্য নিয়ে প্রবেশ করল একেবারে আমাদের জীবনের মর্মমূলে। আমাদের অন্ধ তামসিকতা, আমাদের যুগ-সঞ্চিত জড়তা, কুসংস্কার, অন্ধ লোকাচার—এসবের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারী পাদরীর দল ও রাজপুরুষেরা তাদের সাহিত্য-শিল্প, তাদের কাত্যায়নী সভ্যতার বিলাস ও ভোগের নানা সুলভ উপকরণ নিয়ে আঘাত হানল আমাদের ভাবজগতে। বাইরের বিজেতার ভূমিকার অন্তরালে একেবারে প্রবিষ্ট হল আমাদের গৃহাভ্যন্তরে।

ইংরেজ আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল ঃ এদিকে অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব হল ইংরেজদের প্রধান সহায়। একদিকে শক্তিচালিত তাঁত, বাষ্পযান, রেলপথ, লোহার বাষ্পীয় পোত, অন্যদিকে ধানের কল, পাটকল, ছাপাখানা, ঘড়ি, বৈজ্ঞানিক নানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রত্যহজীবনের নানা সম্ভারে সজ্জিত হয়ে দিগ্বিজয়ে নামল তারা। ফলে, আমাদের চিরাচরিত দুর্বল উৎপাদন রীতি ও গতির ঘটল আমূল পরিবর্তন। এবং স্বয়ংনির্ভর কুটিরশিল্প-প্রধান আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ইংলন্ডের অনুসরণে এদেশেও ক্রমে নগরমুখী নতুন বণিকসভ্যতার পত্তন হল। ধ্বংস হয়ে গেল আমাদের বহুকালের পল্লীজীবনের ধীর-মন্থর ধারা এবং মগ্ন মধুর নিথর প্রশান্তি।

নবজাগরণের রূপরীতি ও প্রয়োগ ঃ এই অর্থনৈতিক শোষণ মারাত্মক সন্দেহ নেই, তবু সেদিনকার ভাববিপ্লব বা ভাবের আঘাতই জাতির কাছে সবচেয়ে নিদারুণ আত্মিক সঙ্কটরূপে দেখা দিল। শত্রু যদি সোজাসুজি এসে

দুর্গে আঘাত হানে, তবে তাকে চেনা যায়। তার সঙ্গে সংগ্রামে সমবেত হওয়া চলে। কিন্তু গোপন সুড়ঙ্গপথে যদি ছদ্মবেশে একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বসে, তখন আর কিছু করার থাকে না। বস্তুত, ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি সিংহাসনে কায়েমী হয়ে বসেছে এই সব নানা বাঁকা পথের অন্ধকারের অন্তরাল দিয়ে। শুধু ভাববিপ্লব নয়, সর্বাত্মক সে আক্রমণ। প্রায় একই সময় একদিকে ফোর্ট উইলিয়মের সংস্কার এবং অন্যদিকে হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন। দেশের মানুষকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মভ্রষ্ট করে সমস্ত জাতটাকে কালো সাহেব বানিয়ে ভারতবর্ষকে তারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার মতো আর একটি উপনিবেশ বানাতে চেয়েছিল। সেদিনকার ভাববিপ্লবের বিরুদ্ধে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাদের সে অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমাদের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয়দের অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি ব্রিটিশ বেনিয়ার নির্মম অর্থনৈতিক শোষণের দিকে। কারণ আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন ছিল একান্তই নগরকেন্দ্রিক। মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালীবাবু-সম্প্রদায়ই সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই অবাধ বাণিজ্যের নামে বিদেশী বেনিয়াদের যথেচ্ছ লুণ্ঠনে, নতুন সৃষ্ট জমিদার-ভূস্বামীদের অত্যাচার উৎপীড়নে, নীলকর সাহেবদের হিংস্র নির্মম আক্রমণে এবং শিল্পবিপ্লবে সমৃদ্ধ ইংলন্ডের নতুন উৎপাদন-রীতির প্রয়োগে গ্রামে গাঁথা এই দরিদ্র দেশের কোটি কোটি কৃষক, মজুর, কুটিরশিল্পের নিপুণ অথচ অসহায় কারিগরশ্রেণী যে ক্রমশই নিষ্পিষ্ট নিপীড়িত হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, একদা মসলিনস্রষ্টা বস্ত্রশিল্পীরা যে কত যন্ত্রণায় নিজেদের শিল্পনিপুণ আঙুল বিসর্জন দিয়ে নিরন্ন নিষ্প্রাণ ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল—সেদিকে তাঁদের নজর পড়েনি। দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ যে কোনমতে ভিক্ষান্নে ক্লিষ্ট ক্লান্ত প্রাণ অতি কষ্টে বাঁচিয়ে রাখছিল সে সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন সেদিনকার আন্দোলনকারী নব্য নগর-বাসীরা। কখনও আবেদন-নিবেদনে, সভাসমিতি করে, নানা সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে, নরম গরম বক্তৃতা দিয়ে, অজস্র পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ রচনা করে মুষ্টিমেয় রাজা-রাজড়া, জমিদার-ভূস্বামী, বেনিয়া-মুৎসুদ্দী, নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রভৃতি উচ্চবৃত্তের মানুষেরা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ-সংরক্ষণে সেদিন সচেষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন এবং অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠান ও সমিতিগুলির উৎপত্তিকাহিনী এবং তাদের কর্মপদ্ধতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবু এই সব বহিরঙ্গ কর্ম-প্রয়াসকেই তাঁরা জাতীয়তাবাদের পরাকাষ্ঠা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্কহীন তাঁদের কর্মপ্রয়াস তাই কখনও ফলদা স্বাতীর পুণ্যবারি হয়ে সমগ্র জাতিকে সামান্যতম প্রাপ্তির পুণ্য স্নানে

অভিষিক্ত করতে পারেনি। এই কারণেই সেদিনকার নবজাগরণ যথার্থই নবজাগরণ ছিল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ একে বলেছেন আধখানা নবজাগরণ। কেউ বা বলেছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাময়িক উত্তেজনামাত্র। আমাদের নবজাগরণ সার্বিক কোন সম্পন্ন ফসলে জাতির রিক্ত ভাণ্ডার কোন দিক থেকেই তেমন পরিপূর্ণ করে দিতে পারেনি বলেও প্রশ্ন উঠেছে। এসব মন্তব্য এবং অভিমতের পশ্চাতে যে সত্য নেই তা বলছি না, বরং আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের রূপ-রীতি-আদর্শ ও কর্মপ্রয়োগবিধি আন্দোলনের অপূর্ণতা এবং কখনও কখনও ব্যর্থতাকেই প্রমাণিত করে।

কিন্তু বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর এ আন্দোলনের চেহারাটাই পালটে গেল। স্বামীজীর নতুন জীবনাদর্শ সামনে রেখে যথার্থ অর্থেই এ আন্দোলন তখন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্বিত হয়ে উঠল। কারণ স্বামীজীর সমগ্র আন্দোলনই ঐ মূর্খ, দরিদ্র, নির্যাতিত-নিপীড়িত-নিরন্ন জনতা ও ইতর সাধারণকে নিয়ে। অবহেলিত এই জনসাধারণের উন্নতিই একমাত্র জাতীয় কর্তব্য ও লক্ষ্য রূপে তিনি ঘোষণা করলেন। বাইরে থেকে কিছু সমাজ-সংস্কার বা ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তন করে জাতির মূল সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নয় একথা তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। কজন বিধবার বিবাহ হল বা কোন্ পদ্ধতিতে কতজন লোক কোন্ মন্দিরে উপাসনা করল বা ঘোমটা খুলে কতজন মহিলা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিল তার উপরে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে না। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে বললেনঃ "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে?... সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।"[৬] অথচ আমাদের নবজাগরণ-আন্দোলনের সমস্ত আয়োজন ছিল এই সব বহিরঙ্গ তুচ্ছতাকে কেন্দ্র করেই। তাই স্বামীজী আরও বললেনঃ "আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না!"[৭] আবেদন-

নিবেদনের বক্তৃতাসর্বস্ব সৌখিন রাজনীতি নয়, সতীদাহনিরোধ-আইন বা বিধবাবিবাহ-আন্দোলন নয়, ধর্মসংস্কার বা সমাজহিতের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা নয়, ভারতের মূল জাতীয় সমস্যা ও সংকট হল ইতর সাধারণ মানুষের দারুণ দারিদ্র্য ও চরম অশিক্ষা। তিনিই এদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বামীজীই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ জাতি বাস করে জীর্ণ পর্ণকুটিরে; এবং সেদিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বললেন ঃ "আমার মনে হয় এই জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষাই একটি জাতীয় পাপ এবং ভারতবর্ষের পতনের ইহাই অন্যতম কারণ। কোনপ্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া-পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হইতেছে। তাহারা আমাদের শিক্ষাদান ও মন্দির-নির্মাণের জন্য অর্থ দান করিতেছে অথচ পরিবর্তে পাইতেছে পদাঘাত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের দাসত্ব করিতেছে। যদি আমরা ভারতের পুনরভ্যুত্থান কামনা করি তবে তাহাদের জন্য কাজ করিতে হইবে।"[৮]

জাতীয় চরিত্রের এই ত্রুটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচিত করে দেখালেন এবং বললেন ঃ "পৃথিবীতে কোন ধর্ম হিন্দুধর্মের ন্যায় মানবতার মহিমা এরূপ উচ্চভাবে ঘোষণা করে নাই, আবার পৃথিবীর কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের ন্যায় নিম্ন এবং দরিদ্রশ্রেণীকে এভাবে পদদলিত করে নাই।"[৯] জাতির যথার্থ নবজাগরণ ঘটাতে হলে হৃদয়কে প্রসারিত করতে হবে ভারতের দুঃস্থ দুঃখী ইতর সাধারণের জন্য। এছাড়া আর কোন পথ নেই। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাদের সুখদুঃখ-স্বপ্ন-সাধনায় একাত্ম হয়ে যেতে হবে। তাই তিনি এযাবৎ ব্যর্থ নবজাগরণ-আন্দোলনের শ্রেণীসচেতন, অহমিকায় আক্রান্ত কর্মীদের হৃদয়ে অনুভব সঞ্চারিত করবার জন্যই তাদের উদ্দেশ্য করেই যেন বললেনঃ "তোমরা কি অনুভব কর যে ঈশ্বরের ও ঋষিদের লক্ষ লক্ষ বংশধরগণ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে? তুমি কি অনুভব কর যে লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও অনশনে কালযাপন করিতেছে এবং যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনশন করিয়া আসিতেছে? তুমি কি অনুভব কর সমগ্রদেশ অজ্ঞান অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন? ইহা কি তোমাকে বিনিদ্র ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে? হৃদয়স্পন্দনের সহিত একীভূত হইয়া ইহা কি তোমার শোণিত ও শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত? এই চিন্তা কি তোমাকে উন্মাদপ্রায় করিয়াছে? এই একটিমাত্র চিন্তায় অভিভূত হইয়া তুমি কি তোমার নাম, যশ,

স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছ? দেশপ্রেমিকের ইহাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।" ১০

অবশ্য এখানে একথাও স্মর্তব্য যে, দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় নিয়ে স্বামীজীর আগেও কেউ কেউ যে আলোচনা করেননি তা নয়, তবে একই সংগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকার এবং ভারতীয় ভূস্বামী ও অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের হাতে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের অন্তহীন শোষণ, নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী এর আগে কেউ এমন করে তুলে ধরেননি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের কৃষকদের উপর গুরু করভারের প্রতিবাদ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজী এবং গোবিন্দ রাণাডে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮৫৮-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল-আন্দোলনের মূল কারণও অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও অসাম্য। অষ্টাদশ শতকের পরার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত কালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহ হয়েছিল তারও মূল কারণ অর্থনৈতিক অসন্তোষ। "সংবাদ কৌমুদী", "সংবাদ প্রভাকর", 'স্পেক্টেটর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীও এ প্রসংগে স্মরণযোগ্য অবদান। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র-হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা এ প্রবন্ধে পরে উল্লেখিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার দানও কম নয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইতর সাধারণের অন্নহীনতা ও অশিক্ষাই যে সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের মূলীভূত কারণ তা এমন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় এবং অনুভব দিয়ে স্বামীজীর আগে বা পরে কেউ কোনও দিন এত স্পষ্ট প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেননি। এবং অবশ্যম্ভাবী শূদ্ররাজত্বের কথাও স্বামীজীর আগে কারও চেতনায় ধরা দেয়নি:

ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মান্দোলনেরও মূল উদ্দেশ্য যে একটি সুস্থ সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে, জাতির চেতনায় প্রাণসঞ্চার করে তাকে সমন্বয়ী এক সার্বভৌম জীবনের অভিমুখী করে গড়ে তোলা- এই সত্য বিস্মৃত হয়ে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বহিরঙ্গ আলোচনায় এবং বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে, বিশেষ বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে কিংবা নব নব ধর্মমতের আমদানি করে তার সপক্ষে নতুন নতুন যুক্তি উপস্থাপনা করার দিকেই স্বামীজী-পূর্ব ধর্মান্দোলনকারীদের সমস্ত শ্রম, বুদ্ধি, মেধা, সময় এবং সমস্ত কর্মোদ্যম অকারণ ব্যয়িত

হচ্ছিল। ধর্ম সম্পর্কে এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা নতুন উদ্ভাবিত কোন বিশেষ ধর্মের নিগড়ে জাতিকে বেঁধে দেবার প্রয়াস—কিছুই যে শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতির কোন উপকারে আসবে না—তা স্বামীজী সুনিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নতুন কোন ধর্ম স্থাপন না করে নতুন যুগের নব মানবধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেনঃ "ঈশ্বরলাভের জন্য তুমি কোথায় যাইবে; এই দীন, দরিদ্র ও দুর্বল ইহারা সকলেই কি ঈশ্বর নহে? প্রথমে তাহাদেরই পূজা কর না কেন? গঙ্গাতীরে কূপ খননের কি প্রয়োজন? যদি তুমি প্রকৃত সংস্কারক হইতে চাহ তবে তিনটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমে অনুভব কর, সত্যই কি তুমি আমাদের ভ্রাতৃগণের জন্য অনুভব কর? সত্যই কি তুমি অনুভব কর যে এই জগতে এত দুঃখ, এত অজ্ঞতা ও এত কুসংস্কার রহিয়াছে? সত্যই কি তুমি অনুভব কর যে এই সব ব্যক্তিগণ তোমার ভ্রাতা? তোমার সমগ্র সত্তায় কি এই ভাবধারা প্রবাহিত? ইহা কি তোমার শিরায়, শিরায় অনুরণিত? ইহা কি তোমার দেহের প্রতিটি তন্ত্রী ও স্নায়ুতে প্রবাহিত? সেই সহানুভূতির ভাব কি পূর্ণমাত্রায় তোমার মধ্যে রহিয়াছে? যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে এইটিই হইল প্রথম পদক্ষেপ। ইহার যদি কোনরূপ প্রতিকার করিতে পার তবেই অন্য চিন্তা। হইতে পারে, সমুদয় প্রাচীন ভাবধারাই কুসংস্কারযুক্ত, কিন্তু এইসকল কুসংস্কারের আবর্জনার মধ্যে সদ্যগঠিত সোনার তাল এবং সত্যও ত থাকিতে পারে। কোনরূপ উপায় আবিষ্কারে কি সক্ষম হইয়াছ যাহাতে এই স্বর্ণকে খাদ্‌বিহীন করা যায়? আরও একটি জিনিস প্রয়োজন। তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি নিশ্চিত যে নাম, যশ ও কাঞ্চনলাভের তৃষ্ণার জন্য এইসব কার্যে লিপ্ত নও?"[১১]

জাতির সার্বিক শুভ এবং কল্যাণের কথা চিন্তা করেই নবজাগরণের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে যথার্থ জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায়ে এবং প্রয়োজনেই স্বামীজী তৎকালীন সঙ্কটমুহূর্তে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক আত্মোন্নতিমূলক ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপাসনার কোন প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করলেন। অথচ অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশের কথা ভুলে, মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালীকে খাঁটি আধুনিক বানাবার প্রয়োজনেই তাঁদের সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। একেশ্বরবাদী এক এবং অদ্বিতীয় ব্রাহ্মধর্মের বুলডজার চালিয়ে সমগ্র জাতিকে অখণ্ড ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমাদের সমস্ত প্রাচীন ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তাঁরা এক নতুন ধর্ম স্থাপনে

তৎপর হলেন। অথচ প্রাচীনকে পরিত্যাগ না করে, তার যুগোপযোগী সংস্কার-সাধনই যে শ্রেয় পন্থা, এটাই যে বেঁচে থাকার পথ, জীবনের পথ, তাও উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজী প্রকাশ করলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রণালী এই দুদিক থেকেই স্বামীজী মুষ্টিমেয় ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসচেতন নব্য বাবুসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং খণ্ডিত নব-জাগরণের আন্দোলনকে যথার্থ এক মহান জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করলেন। সুতরাং সাধারণ দুঃস্থ-দুঃখী শ্রমিক-কৃষক-গ্রামবাসীরা নবজাগরণ-আন্দোলনের কোনদিন শরিক হতে পারেনি, সামগ্রিক বিচারে এ সিদ্ধান্তকে অতঃপর আর সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। স্বামীজীর আবির্ভাবের পর, অন্তত শেষ পর্বে, এই নবজাগ্রত মহাজীবনের আলোকচ্ছটা সুদূর গ্রামপ্রান্তে সাধারণ মানুষের কুটির প্রাঙ্গণেও পৌঁছেছিল—এতে কোন সন্দেহ নেই।

নবজাগরণের তরঙ্গাঘাতে একসঙ্গে ঘুম ভেঙেছিল অনেকেরই। দারুণ ভাঙনের মুখে সম্মুখ সারির বহু মনীষী ব্যক্তিই সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন নতুন করে জীবনরচনার মহান দায়িত্ববোধে। একদিকে যেমন আকস্মিক উত্তেজনায় অনেকে বিভ্রান্ত, হতচকিত, ভয়বিহ্বল, অনেকে আবার নিদারুণ তরঙ্গস্রোতে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেদের, বিদেশী জীবনচর্যার অন্ধ মোহে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গ্রহণ করল পরধর্ম—, ঠিক তেমনি অন্যদিকে আমাদেরই কেউ কেউ নবজীবনের তরঙ্গকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন ভগীরথের মতো। সর্বত্র একটা উদ্দাম চঞ্চলতা আকুল করেছিল সমগ্র জাতির মানস-চৈতন্য। দিকে দিকে নানা ভাবে সেদিন ঘটেছিল তার বিচিত্র আত্মপ্রকাশ। মনে রাখতে হবে বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্ঘাত ও সঙ্ঘর্ষে কেবল হলাহলই ওঠেনি, কিছু দুর্লভ অমৃতের অধিকারও আমরা অর্জন করেছিলাম। কারণ ইংরেজ-রাজশক্তি শুধু এদেশে কামান-বন্দুক-গোলাবারুদ, শাঠ্য-লোভ-ষড়যন্ত্র-হিংসা-হানাহানির কুৎসিত সাম্রাজ্যবাদের অক্ষম উত্তরাধিকারই সঙ্গে নিয়ে আসেনি, সঙ্গে ছিল তাদের ইউরোপীয় রেনেসাঁর উৎকৃষ্ট ফসলসম্ভারঃ ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতা-প্রীতি, প্রকৃতিবাদ, কর্মৈষণা, রজোগুণাশ্রিত জীবনপদ্ধতির আরও নানা উজ্জ্বল মানবিকতার দায়ভাগও। আমাদের দেশের অনেক মনীষী মহাপুরুষ মহৎ জ্যেষ্ঠেরা সে সঞ্জীবনীর সন্ধানও জানতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীতমুখী সভ্যতার সঙ্ঘাতে চিন্তা ও ভাবজগতে যে আন্দোলন ও আলোড়ন শুরু হল দেশব্যাপী, তা একই সঙ্গে নানা চিত্তে নানা বিচিত্র ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। নানামুখী কর্মপ্রয়াসে আত্মপ্রকাশ করল এই আন্দোলন। ধর্ম-সাহিত্য-শিল্প-শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি—সব কিছুর মধ্য দিয়েই জাতির প্রাণের গভীরতম মর্মমূলে একটি শুদ্ধ স্বদেশপ্রীতি এবং ক্রমশ একটি

প্রবল জাতীয়তাবোধ ও উদ্দাম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে সমগ্র গণচেতনায়ই এই নবযুগের উৎকণ্ঠা ও প্রাণচাঞ্চল্য ধরা পড়লেও বিশেষ কয়েকজন মনীষী ও মহৎ জ্যেষ্ঠের মধ্যে এই নবযুগলক্ষণ বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করল যাঁরা যথার্থভাবে এই দেশ ও জাতিকে নবজীবনদানে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁদের জীবনচর্যা ও কর্মপ্রয়াস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে বাংলার নবযুগরচনায়, দেশ ও জাতিকে স্বাধিকারে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠায় কার কতটা অবদান।

রামমোহন ও বিবেকানন্দঃ কালের বিচারে এই নবজাগরণের প্রথম প্রাণ-পুরুষ রামমোহন- এ সম্পর্কে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত। এই নব-জন্মের আবেগ-উৎকণ্ঠা, আনন্দ-যন্ত্রণা প্রথম স্পর্শ করেছিল যুগন্ধর পুরুষ রামমোহনকে এবং নবযুগের সমস্ত কর্মপ্রয়াসেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। মোহিতলালের ভাষায়ঃ "সকল বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজশাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন: রামমোহনই সর্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার ভানমুক্ত করিয়া একটা রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।" "অতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাসবৈরাগ্য ও সর্ব্বপ্রকার গুহ্যসাধনা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করা, যাহা একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল -তাহার উচ্ছেদ-সাধন, ইহাই সে যুগের প্রথম বিদ্রোহঘোষণা।"[১২] ধর্ম ও সমাজচিন্তায় জাতির যে অন্ধ তামসিকতা, চিরাচরিত প্রথানুগত্য ও জড়ত্বময় কর্মহীনতা—তার বিরুদ্ধে রামমোহনের মতো বিবেকানন্দও সক্রিয় কর্মোদ্যমে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে অধ্যাত্মবোধ ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যেই যেমন মৌলিকতা ছিল, তেমনি পার্থক্যও ছিল প্রচুর। স্বামীজী পরবর্তীকালে যে practical vedanta -কে নবভারত সংগঠনের প্রয়োজনে, তাঁর সমস্ত কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে এক এবং অদ্বিতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, রামমোহনও সেই বেদান্ত-ধর্মকেই জাতীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে একজনের কাছে যা ছিল creed বা বিশ্বাস, অন্য জনের কাছে তা policy বা সাময়িক কর্মপন্থামাত্র। যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতার (humanism) উপরই নবজাগ্রত জাতির প্রতিষ্ঠা রামমোহনের কাঙ্ক্ষিত ছিল, এবং যেহেতু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মূর্তি-পূজক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মধ্যে একটি সার্বভৌম ধর্মের প্রতিষ্ঠা

ছাড়া জাতীয় জীবনে ঐক্যচেতনা আসবে না এবং ঐক্যচেতনা ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে কোন রাজনৈতিক অধিকার বা সামাজিক সুযোগসুবিধা লাভ করা সম্ভব হবে না, সেই হেতুই বেদান্তকে নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডিগবীর কাছে এক পত্রে তিনি লিখলেনঃ

"It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."[১৩]

রামমোহন কোন আধ্যাত্মিক আকুতির পথে ধর্মান্দোলনে নামেননি। ব্যক্তি-জীবনেও রামমোহন ছিলেন সৌখিন ও বিলাসী ভোগী পুরুষ।[১৪]

ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মর্ত্যপ্রীতি, প্রকৃতিবাদ এবং সুস্থ স্বাভাবিক মানবিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই রামমোহন প্রায় হুবহু ইউরোপীয় জীবনাদর্শেই আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মেকলে-প্রবর্তিত ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার এবং ইংরেজি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থারও একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তিনি আমহার্স্ট সাহেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৃহৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উন্মুখ একটি সমন্বয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষাবাহিনী শিক্ষাব্যবস্থা যে ঐশ্বর্যময়ী শক্তিশালী ভারতগঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য স্বামীজীও একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন শিক্ষাব্যবস্থাই পরিণামে কল্যাণপ্রদ হতে পারে বলে স্বামীজী মনে করতেন না। কারণ ঐ ধরনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে কিছু সুখসুবিধা অর্জন করে আনতে পারলেও মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের সহায়ক হতে পারে না। আর মনুষ্যত্বহীন শিক্ষাব্যবস্থা কোন সমাজের পক্ষেই গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠির অনেক অংশ সমর্থনযোগ্য নয়। রামমোহন সমর্থিত শিক্ষানীতি এদেশের পক্ষে কতটা উপযোগী হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে, এমন কি সমকাল পর্যন্ত সময়ে, তা কতটা পরিণাম-রমণীয় হয়েছে, এ সম্পর্কে সমাজদার্শনিক এবং শিক্ষা-তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে। এতৎসত্ত্বেও নবযুগরচনায় রামমোহনের অবদান প্রচুর; বহুবৃত্ত ও বহুমুখী কর্মপ্রয়াসে দেদীপ্যমান তাঁর সমগ্র জীবন। দেশ ও জাতির নানা সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে তিনি ভেবেছেন এবং নিজের

জ্ঞানবুদ্ধিমতো দেশের সামূহিক কল্যাণ ও প্রগতির জন্য সারা জীবন বহু কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তবে দেশ ও জাতির জন্য তিনি যা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী গৌরব ও গুণগরিমা তাঁর উপর আরোপিত করা হয়েছে কিনা, তা বিচার্য। আচার্য মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "বাংলার নবযুগ" গ্রন্থে এবং অতি সাম্প্রতিককালে বিশ্রুত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার "On Rammohan Roy" গ্রন্থে রামমোহন প্রসঙ্গে বহুকাল প্রচলিত এবং সযত্নলালিত যে অতিশয়োক্তির ধূম্রজাল বা রামমোহন-মিথ বিরচিত হয়েছিল, বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবিশ্লেষণে ও ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে তা বিদূরিত করে দিয়েছেন। তবুও ব্যক্তির স্বাধিকার স্থাপনের জন্য সমস্ত শাস্ত্রবিধি ও সমাজশাসনের অন্ধকার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের মধ্যে অতি প্রত্যক্ষ। তাঁর যুক্তিবাদী সংস্কারকের ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতাস্পৃহা, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও দেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর কর্ম-প্রয়াস প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আত্মীয় সভা (১৮১৮) এবং ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮২৮), ব্রাহ্মণসেবধি, সম্বাদকৌমুদী ও ফার্সী সংবাদপত্র মীরাৎ-উল্-আখবার প্রভৃতির প্রকাশ, এ ছাড়াও উপনিষদ্ প্রভৃতির অনুবাদসহ প্রায় সত্তরখানি গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রামে এবং ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র-আইনের প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের ভাষা আমাদের দেশে নতুন। দেশীয় প্রেসের স্বাধীনতা ও রায়তের অধিকার প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে পঞ্চাশটি অনুচ্ছেদব্যাপী যে চিঠি তিনি চতুর্থ জর্জকে লিখে-ছিলেন, বিশ্বের মুক্তিচিন্তার ইতিহাসে তা অনেকের মতে (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতি) দ্বিতীয় অ্যারিওপ্যাজিটিকা বলে অভিহিত। প্রথম না হলেও সতীদাহ-আন্দোলনে তাঁর অগ্রণীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সমাজসংস্কার এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে বাংলা গদ্যের একজন আদি রূপকার রূপে তাঁর দান অপরিসীম। যদিও শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদারের মতে যেমন তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা নন, তেমনি প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক কিংবা বাংলা গদ্যের আদি স্রষ্টার সম্মান—একটাও তাঁর প্রাপ্য নয়। "On Rammohan Roy" গ্রন্থে এ সম্পর্কে আনুপূর্বিক আলোচনা আছে। সতীদাহপ্রথানিবারণ সম্পর্কেও রামমোহনের অনেক আগে একদিকে যেমন তৎ-কালীন ব্রিটিশ সরকার সচেতন ও উদ্যোগী হয়েছিল, অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। তাছাড়া লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে যখন সতীদাহ-

প্রথা বন্ধ করার আয়োজন করেছিলেন, রামমোহন নাকি তার বিরোধিতা করেছিলেনঃ তথ্যাভাত্তিক এ মন্তব্যও রমেশচন্দ্র মজুমদারের।

প্রগতিবাদী রামমোহন হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথারও বিরোধী ছিলেন। এবং তিনি শুধু সমাজসংস্কার ও দেশের মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত নন, সারা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত বঞ্চিত পরাধীন মানুষের সমস্ত মুক্তি-আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর মহান ভূমিকাও শ্লাঘ্য। নেপলস-এর মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ ব্যথিত রামমোহন নেপলস-এর জনযুদ্ধকে তাঁর ব্যক্তিগত যুদ্ধ এবং এ পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেনঃ

"Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be, ultimately successful."[১৫]

তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসংগ্রামী গ্রীসকে, ঔপনিবেশিক স্পেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার গণ-অভ্যুত্থানকে এবং গণতন্ত্রের জন্য ফরাসীদের ন্যায়সংগ্রামকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তৎকালীন আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সেখানেও ছিল রামমোহনের সক্রিয় ভূমিকা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন। তাঁর এই বিশ্ববোধ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রগতিবাদেরই স্মারক। রামমোহনের এই আন্তর্জাতিকতা, সমন্বয়চেতনা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্বসংযোগ ও বৃহত্তর মানবতাবোধ স্মরণ করেই স্বামীজী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেনঃ "...যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।"[১৬]

এত সব প্রগতিশীল উজ্জ্বল মানবিকতাবোধসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন-চরিত্রের অনেক অসংগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের চেতনাকে ব্যথায় বিপন্ন করে। শুধু সমকালীনের বিচারে নয়, একালের বিশ্রুত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে চিরকালই প্রগতির দুশমন এবং সামন্ততন্ত্রবাদের তল্পিবাহক বলে এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত সতীদাহসংস্কার সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোন আন্তরিক প্রয়াস ছিল না। উদ্যোগী ব্রিটিশ সরকারের সংগে তিনি কিঞ্চিৎ সহযোগিতা করেছিলেন মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ঐশ্বর্যপ্রিয়তা, ভোগাসক্তি ও মদ্যপান অনেকে পছন্দ করেন না। তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জনসূত্রের উপরও কটাক্ষপাত করে ক্যালকাটা রিভিউতে (Vol. IV. No. VIII : page 364) কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেনঃ

"By serving in this capacity, (Dewan), he is said to have realised as much money as enabled him to become a Zemindar with an income of Rs. 'ten thousand a year.' If this assertion be true, it must raise in the mind a strong suspicion of the moral character of this extraordinary man."[১৭]

রেভারেন্ড কে. এস. ম্যাকডোনাল্ডও ঐ একই অভিযোগ ব্যক্ত করেছেন।[১৮] "রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার (রামমোহনের) কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপ্রশংসাসূচক কথা ('unfavourable mention of his conduct') আমার কানে আসিয়াছে।" এ মন্তব্য তৎকালীন ব্রিটিশ-রাজের রেভেনিউ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বুরিশ ক্রীসপ-এর। ক্রীসপ-এর স্বহস্ত লিখিত এই মন্তব্য নিজের চোখে দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একথা উল্লেখ করেছেন সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১ম খণ্ডে ত্রিশ পৃষ্ঠায়।[১৯] ধর্মস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মনামে নন্দলাল ঠাকুর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাষণ্ডপীড়নের এক জায়গায় রামমোহনের যবনীগমন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন—এ তথ্য আমরা সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত (১৯৪৫) রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ডে (৬৫ পৃষ্ঠা) পাই। এবং রামমোহন রচনাবলীর কোথাও এই যবনীগমনের সংবাদ অস্বীকার করা হয়নি।[২০] রামমোহনের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে উপরোক্ত সংবাদগুলি যদি সত্য হয়, তবে তাঁর জীবনব্যাপী সমস্ত মানবিক কুশল কর্মানুষ্ঠান কিরকম আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ ভারতবর্ষে আমরা শুদ্ধ সংযমী নির্মল ব্যক্তিচরিত্রকে সর্বাধিক মূল্য দিয়ে থাকি। যেহেতু ইউরোপীয় জীবনাদর্শের বিপরীত আমাদের শাস্ত্রের উক্তি হল "আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে"। বিশেষ করে দেশ ও জাতির সৈনাপত্য এবং যথার্থ শিক্ষক ও সংস্কারকের ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের কাছে সংযম ও চরিত্রশুদ্ধি আমাদের প্রাথমিক প্রত্যাশা। ব্যক্তিচরিত্রের শুদ্ধি ও শুচিতা-সম্পর্কহীন কুশল কর্মপ্রয়াসে ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে না। ভারতবর্ষের মানুষ আগে মানুষটাকে দেখে তারপর তার কর্মের বিচার করে। ইংরেজ-জীবনের আদর্শে ও অনুকরণে ব্যক্তিচরিত্রের সম্পর্কহীন ইউরোপীয় কর্মবাদ—এই বিজাতীয় ভ্রান্ত জীবন-

নীতি যে এদেশের মাটিতে ভাল ফসল ফলাতে পারেনি তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ একালের আমরা—তাঁর অক্ষম অপদার্থ উত্তরপুরুষেরা। আজ তাই আমাদের সমকালীন সমাজে পরিপূর্ণ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। বহু উৎকৃষ্ট কবি-শিল্পী-সাংবাদিক-চিকিৎসক-সাহিত্যিক-দার্শনিক, শিক্ষক-রাজনীতিজ্ঞ-যন্ত্রবিদ্-আইনজ্ঞ-স্থপতি আমাদের দেশে আছেন—যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল; কিন্তু মনুষ্যধর্মে প্রায় সকলেই দেউলিয়া। চারিদিকে সব আধখানা মানুষ, ভাঙা মানুষ, ফাঁপা মানুষ। যথেচ্ছ মদ্যপান এবং মহিলাচর্চা করেন না, কিংবা অন্ধ কাঞ্চনলুব্ধতা ও পরস্বাপহরণ-তৎপরতা নেই, জীবনের সব ক্ষেত্রেই এরকম কৃতী মানুষ ক্রমশই দুর্লভ হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, এই সব অপকর্ম ও পাশব ভ্রষ্টাচারকেই একালের আমরা এখন অত্যাধুনিকতা বলে সদম্ভে ঘোষণা করছি। জাতির এই চূড়ান্ত অধঃপতনের জন্য কাকে দায়ী করব জানি না, কিন্তু রামমোহন প্রবর্তিত ব্যক্তিচরিত্রের শুচিতা ও শুদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন ইউরোপীয় কর্মবাদ ও ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সত্যিকারের মানবতা ও মনুষ্যধর্মের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে -এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে স্বামীজী তাঁর আপন নিষ্কলঙ্ক শুচিশুভ্র অমল চরিত্রমহিমায় জাতির জীবনাদর্শকে উন্নীত করে নতুন কর্মবাদের প্রয়োজনায় অনেকটাই এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন সত্য, অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিলেন জাঙাল বেঁধে অধঃপতনের গতিকে কিছুটা রোধ করতে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের চেয়ে শয়তানের শক্তি কম নয়, পাপের প্রলোভন অনেক বেশী সার্বভৌম এবং পথও পিচ্ছিল। যাই হোক, রামমোহন-চরিত্রের আরও কয়েকটি অসঙ্গতির কথা এখানে সত্যের প্রয়োজনেই উল্লেখ করা যায়। তিনি জাতিভেদ মানতেন না, সমস্ত প্রথানুগত্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মসংগ্রাম (crusade), অথচ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে রামমোহনের সহকর্মী মিঃ অ্যাডামের উক্তির সমর্থনে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার যা বললেন তা রামমোহন-চরিত্রের নিদারুণ অসঙ্গতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেঃ

"Rammohan condemned the caste system as an obstacle to the national improvement, but did not start any agitation against it ; on the other hand, he not only fully observed the rules of caste distinction, as Adam says, but even symbolised his spirit in this respect by keeping on his body the sacred thread....till his death in Bristol." [২১]

১৮২৩ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের নিজের রচনা 'পথ্যপ্রদান' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অতঃপর ডঃ মজুমদার লিখছেনঃ

"...in the opinion of Rammohan though both the remarriage of widows and the drinking of wine and eating meat have been prescribed by the *Śāstras* the first cannot be regarded as good conduct (Sadācâra) because it is forbidden by all sections of people, while the other is good conduct because many men drink wine and eat meat as prescribed by the *Śāstras*." [২২]

উপরোক্ত মন্তব্যে আর যাই হোক, মানবিকতা বা নীতিবোধের সন্ধান মেলে না। শুধু তাই নয়, অন্ধ দেশাচারের এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েও রামমোহন কিন্তু স্বগৃহে উৎসবে-অনুষ্ঠানে বাইজীর নৃত্য-গীতের ও মদ্য পরিবেশনার ব্যবস্থা করতেন। ফ্যানী পার্কস-এর "Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque during four and twenty years in the east" (Vol. I. London. 1850) গ্রন্থে রামমোহনের বাড়ীর একটি উৎসবের বর্ণনা (২৯-৩০ পৃষ্ঠা) থেকে এ তথ্য আমরা জানতে পারি। পরাধীন ভারতের জননেতা, নবজাগরণের আদি পুরুষ, লোকহিত ও বৃহত্তর মানবকল্যাণ যাঁর জীবনতপস্যা, দেশের বিদেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য যাঁর এত অনুভব, তাঁর পক্ষে এরকম বিলাসবহুল জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করে বাইজী এনে এবং মদ্য পরিবেশনায় অনর্থক অর্থব্যয় কতটা সমর্থনযোগ্য ভেবে দেখা দরকার। তাঁর যবনী উপপত্নীর সঙ্গে শৈববিবাহও বিশুদ্ধ নীতিবাদ এবং আমাদের জাতীয় আদর্শের দিক থেকে মেনে নেওয়া যায় না। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বললেনঃ

"...Rammohan supports the Śaiva marriage according to Tantrik rites which would be regarded today as tantamount to concubinage." [২৩]

পুত্র বলে পরিচিত রাজারাম এই যবনী উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান কিনা— এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রামমোহন-জীবনীকার মেরী কারপেন্টার রাজারামকে হরিদ্বারের মেলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এবং রামমোহন কর্তৃক পুত্ররূপে প্রতিপালিত ছেলে বলে উল্লেখ করলেও "অনেকের মতে রাজারাম রামমোহনের শৈববিবাহের মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। এই বিবাহের ফলে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করে এবং হুগলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাহার বিবাহ

দেওয়া হয়।”[২৪] ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ও ৮ই নভেম্বরের “সমাচার চন্দ্রিকা”য় প্রকাশিত দ্বিজরাজের খেদোক্তিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[২৫] শ্রদ্ধেয় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ও রামমোহন-চরিত্রের এই সব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেনঃ “কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচারে” তিনি মদ্যপান সমর্থন এবং শিবের আজ্ঞাবলে যে কোন বয়সের এবং যে কোন জাতির স্ত্রীলোককে চক্রের সাধনায় শৈব বিবাহে শক্তিরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা বলেছেন, বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় শৈব বিবাহের স্ত্রীও অবশ্য গম্যা হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাজা রামমোহন কোন মুসলমানীকে শক্তি-রূপে গ্রহণ করে বহুদিন পর্যন্ত তন্ত্রের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন।[২৬] “রামমোহন তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থক, অথচ সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত সাধনা ব্যাপারের উপর বিশেষরূপে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যকে তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছেন।” এবং ধর্মবিচার প্রসঙ্গে “রামমোহন হইতে তাঁহার (বিবেকানন্দের) সূক্ষ্মদৃষ্টির” কথা উল্লেখ করেছেন গিরিজাশঙ্কর। পুরাণ ও তন্ত্রযুগ সম্পর্কে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের একদেশদর্শী দৃষ্টির চেয়ে বিবেকানন্দের অপক্ষপাত উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও মানবিক বলেও গিরিজাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন।[২৭] এখানে একটি কথা অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করা যেতে পারে যে, জাতির মানসমুক্তির প্রধান পুরোহিত এবং নানা দিক থেকে আধুনিকতার অগ্রদূত হিসাবে সম্মানিত এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেও রামমোহন মূলত কিন্তু এক ক্ষয়িষ্ণু পতনশীল সামন্ততান্ত্রিক মুঘল সম্রাটের প্রতিভূ হয়েই সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন—এবং যে সামন্ততান্ত্রিকতা সমস্ত আধুনিক প্রগতি এবং উজ্জ্বল মানবিকতার ও মানবতার শত্রু ও প্রধান অন্তরায় হিসাবে ইতিহাসে নিন্দিত। শেষ মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় আকবর শাহ্‌র রাজদূত হয়ে তাঁর ফরমান হাতে নিয়েই রামমোহন ইউরোপ-যাত্রা করেছিলেন। তাঁর রাজা উপাধিটিও বাদশাহ্-প্রদত্ত। সুতরাং রামমোহনের ভাবে ও ভাবনায়, চেতনায় ও চরিত্রে, তাঁর সমস্ত চর্যায় ও কর্মপ্রয়াসে বিপুল অসঙ্গতি ও বিষম বৈপরীত্য স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। তাছাড়া যে যুগসন্ধিক্ষণে রামমোহনের আবির্ভাব

সেকালে একই চরিত্রের মধ্যে এই রকম সব বিপরীতমুখী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমাবেশ এবং বৈপরীত্য ও অসংগতির সমাহার সময়ের নিয়মেই সহজাত।

বলা হয়ে থাকে, অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বোধহীন যুক্তিহীন জড়তায় আক্রান্ত জাতীয় মনকে অশুভ ধর্মান্ধতা এবং তামসিকতা থেকে মুক্ত করার জন্যই রামমোহনের বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার। এবং ঐ একই কারণে হিন্দুর মূর্তিপূজোকে তিনি মনে করতেন কুসংস্কার এবং মানবতাবিরোধী। তাই দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য তার সমূল উচ্ছেদসাধনে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। মুণ্ডক এবং কেনোপনিষদের অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখলেনঃ

"..idol-worship,—the source of prejudice and superstition, and of the total destruction of moral principle, as countenancing criminal intercourse, suicide, female murder and human sacrifice."[২৮]

তাঁর ধারণা ছিলঃ

"Idolatrous notions...have checked or rather destroyed every mark of reason, and darkened any beam of understanding."[২৯]

প্রাচীন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করলেনঃ

"Hindus..'have subjected themselves to disgrace and ridicule by the worship of idols, very often under the most shameful forms, accompanied with the foulest language, and most indecent hymns and gestures.' "[৩০]

দেশ ও জাতির পরম হিতৈষী, নবজাগরণের প্রথম পথিকৃৎ হয়ে একদিকে রামমোহন যে ভাবে ও ভাষায় প্রাচীন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ এবং অন্যদিকে আমাদের স্বাধীনতাহননকারী বিদেশী স্বৈরাচারী রাজশক্তির ভাষা ও সভ্যতাকে সমর্থন করেছিলেন তা তাঁর মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে কোন কারণেই প্রত্যাশিত নয়। শুধু ব্রিটিশ-রাজ, তাদের ভাষা ও সভ্যতাই নয়, এমন কি যে নীলকরদের অত্যাচারে উৎপীড়নে সারা দেশ জর্জরিত এবং এককালে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' যাদের হিংস্র অমানুষিকতা, ভয়াবহ বীভৎস বর্বরতা ও অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তাদের পর্যন্ত রামমোহন (জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনে)

সমর্থন করতেন। রামমোহন-চরিত্রের এই অসঙ্গতির প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচিত হয়েছে রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে।[৩১] শুধু রমেশচন্দ্র মজুমদারই নন, তিনি যে ভারতে ইংরেজ-রাজের সমর্থক ছিলেন তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তা প্রমাণ করা চলেঃ "ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাহারা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের লর্ডগণ ও ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ভারতবাসিগণের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।"[৩২] "ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্ট এবং ইংলণ্ডের সমাজ-নায়কগণের উদারতা ও সদিচ্ছায় রামমোহনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংলণ্ড ভারতের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও মুক্তিদাতা।"[৩৩] "রামমোহন ছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।"[৩৪] একথাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ইংলণ্ডের রাজার কাছে যে লিখিত আবেদন পেশ করেছিলেন তাতে তিনি ভারতবাসীকে "মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের অতি বশংবদ প্রজাবৃন্দ" বলে উল্লেখ করেছিলেন। "বস্তুতঃ রামমোহনের অধিকাংশ কর্মপ্রয়াসই ভারতের অভিজাত জমিদার শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। এঁদের অনেকের মতেই ইংরেজ শাসন ছিল সমাজ প্রগতির বাহন।" সমালোচকের এ উক্তির মধ্যেও অনেক সত্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত উক্তিরাশির কথা মনে পড়ে। খোদ পাশ্চাত্য দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বললেনঃ "ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা।..." ইত্যাদি।[৩৫] স্বাধীনতা সম্পর্কে বললেনঃ "তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক. স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।"[৩৬]

Press ordinance of 1823 প্রভৃতি বৃটিশ সরকারের যেসব নীতি ও অনুশাসন তাঁর মনঃপূত ছিল না তার বিরুদ্ধে রামমোহন বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করে গেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাজাত্যাভিমান ও

আত্মসম্মানবোধ অনেক সময়ই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে—একথাও সত্য ঃ কিন্তু যথার্থ স্বদেশপ্রেম বলতে যা বুঝায়—, সেই সর্বসমর্পণ ও আত্মনিবেদন রামমোহনের মধ্যে কতটা ছিল এ নিয়ে সংশয় আছে। বরং বলা চলে, প্রায় সমসাময়িক স্বাধীন চিন্তাবীর ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যেই আমরা অনেকটা স্বদেশানুরাগের পরিচয় পেয়েছিলাম। ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষই প্রথম মাতৃভূমি প্রসঙ্গে স্বদেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট কবিতা লেখেন। এবং ইংরেজ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই ডিরোজিও এবং তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাই প্রথম যথার্থ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। রামমোহনের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতি এক ধরনের বিমূর্তপ্রিয়তা (abstract love) ছিল ঠিকই, তাঁর আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধও শ্লাঘ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতে জাতীয়তা এবং স্বদেশপ্রেমের গুরু হিসাবে সম্মান তাঁর কতটা প্রাপ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে ঃ এ মন্তব্যও শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের। তা সত্ত্বেও রামমোহনের বিশাল ব্যক্তিত্ব, নির্ভীকতা ও স্বাজাত্যাভিমান একমাত্র পরবর্তী-কালের বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়। তাঁর জীবনের এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় এখানে। ভাগলপুরের তৎকালীন কালেক্টর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের অন্যায় অমানবিক আদেশ ও গালিগালাজ অগ্রাহ্য করে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেভাবে পালকিতে চেপে রামমোহন চলে গিয়েছিলেন তা নানা দিক থেকে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এই অপমানের প্রতিকারের জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিদেশী শাসকদের সামনে দেশীয় লোকদের পালকি থেকে নেমে যাবার বেআইনী আইন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩৭]

রামমোহন ঃ বিবেকানন্দ ঃ ব্রাহ্মসমাজ ঃ নবজাগরণের ঊষালগ্নে রামমোহন দেশ ও জাতির পুনর্গঠন সম্পর্কে নিশ্চয়ই গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং নিদারুণ জাতীয় সঙ্কট ও নানা সমস্যার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানেরও (নিজের যুক্তিবুদ্ধি মতো) সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু মূলত বুদ্ধিবাদী বলে বুদ্ধি দিয়েই সব কিছু বিচার করে গেছেন, হৃদয় দিয়ে সমস্যাকে তত বুঝতে চাননি। অথচ হৃদয় ও বুদ্ধির সম্যক্ সমন্বয় না ঘটলে কোন জিনিসকেই তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব নয়। রামমোহনও তাই দেশ ও জাতির বহু সমস্যাকেই সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। রামমোহন যেভাবে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, দেশাচার, এমন কি পুরাণ-ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে গেছেন, অস্বীকার করে গেছেন ঐতিহ্যকে, তাতে তাঁর সীমিত

দৃষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষাই হল সত্য থেকে অধিকতর সত্যের দিকেই অভিযাত্রা, কখনও মিথ্যা থেকে সত্যের অভিমুখে ইতিহাসের গতি নয়। এই সহজ সত্যটা রামমোহন কি করে বুঝলেন না? স্বামীজীর এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমতঃ "হিন্দু বিশ্বাস করে মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না। অগ্রসর হয় সত্য থেকে সত্যের দিকে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে।"৩৮ এই কারণেই শূন্যে সৌধনির্মাণ সম্ভব নয়। ধর্মে-রাজনীতিতে, শিক্ষাপদ্ধতি-সমাজসংস্কার-রাষ্ট্রপুনর্গঠন প্রভৃতি প্রতি ব্যাপারেই রামমোহন ঐ একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। সব কিছুই একেবারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন। এবং এই নতুনকে ভাললাগা ও প্রাচীনের প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়ার ব্যাপারটাও একেবারে একান্তই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। কিন্তু শুধুমাত্র নিজেব রুচিকে সম্বল করে একটা জাতির পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন জাতিই কখনও আর এক জাতির ছাঁচে হুবহু তারই মতো গড়ে উঠতে পারে না। কারণ একজনের কাছে যা স্বধর্ম, অন্যের কাছে তাই পরধর্ম। এবং পরধর্ম স্বভাবতই ভয়াবহ। রামমোহন সেই অঘটন ঘটাতে গিয়েই ব্যর্থতা ডেকে এনেছিলেন। ঐক্য ভিতরের জিনিস (unity within)—তাকে অশেষ নৈপুণ্যে, ভালবাসার উত্তাপে ফোটাতে হয়। বাইরে থেকে আমদানি করে ঐক্যবোধ কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি কোথাও এভাবে ঐক্য বা সমন্বয়-স্থাপন-প্রয়াস সত্য হয়ে উঠতে পারে না। রামমোহনের বেদান্ত ধর্ম এই কারণেই জাতীয় ধর্ম হয়ে উঠতে পারল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ঐ একই ছাঁচে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভুল করলেন।

এর দ্বারা মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি দেশ ও জাতির প্রতি তাঁদের বিরূপতা ছিল? যেখানে ভালবাসা থাকে, সুনিবিড় হৃদয়ের সম্পর্ক, সেখানে বিসর্জনের প্রশ্ন আসে না, পরিত্যাগের কথা মনে পড়ে না। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের যদি দেশ ও জাতির প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা থাকত, মমতা থাকত এর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর, তাহলে জাতির এই অধঃপতন, ধর্মের গ্লানি ও দেশের মানুষের জড়তা ও কুসংস্কার-প্রবণতাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের গোপালমূর্তি পূজারীর হাত থেকে অসাবধানে পড়ে ভেঙে গেলে তর্করত্ন তর্কচঞ্চু ভট্টাচার্যের দল যখন ভগ্ন মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জনের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন রাণী রাসমণিকে এই ভালবাসার সুসমাচারই শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর জামাতা যদি পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলেন তবে কি ডাক্তাব ডেকে ভাঙা হাত-পায়ের

চিকিৎসা করাবেন, না জামাতাকে গঙ্গায় ফেলে দেবেন? ভালবাসার জনকে ফেলে দেওয়া যায় না। বিসর্জন দিয়ে সেখানে আর একটি এনে প্রতিষ্ঠাও করা যায় না। ভগ্ন ভ্রষ্ট আহতকে সারিয়ে তুলতে হয়। ঠাকুর তাই করেছিলেন। ভগ্ন গোপালের মূর্তিকে ঠাকুর নিজের হাতেই জোড়া দিয়ে আবার তাকে সিংহাসনে তুলে এনেছিলেন। ভগ্ন-ভ্রষ্ট ভারত-আত্মার প্রাণরূপী গোপালকেও ঠাকুর-স্বামীজী এমনি করেই প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপিত করেছিলেন। এটাই জীবনের পথ। বাঁচার পথ। "I love thee with all thy faults"—এই হল ভালবাসার কথা, প্রেমের উচ্চারণ, যথার্থ জীবনদৃষ্টি। যথার্থ অনুভব কি বস্তু, দেশপ্রেম কাকে বলে, দেশ ও জাতির জন্য সর্বসমর্পিত প্রেয়োবোধ ও ভালবাসা বলতে কি বোঝায়, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। এবং ভালবাসার এই অধিকার অর্জন করলে তখন নিজেদের চরিত্রের দোষত্রুটি উল্লেখ করে নিন্দাবাক্যও উচ্চারণ করা যায়। বস্তুত স্বামীজী যেমন করে যেভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্রের নির্মম সমালোচনা করেছেন, স্বজাতিকে তিরস্কার করেছেন এমন খুব কম নেতাই আছেন। কিন্তু কত অশ্রুর বিনিময়ে, এই পরাধীন জাতির প্রতিটি মানুষের জন্য কত গভীরতম প্রেমের অনুভব বুকে করে, স্নেহময় পিতার মতো তিনি সেই সব তিরস্কার বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, আত্মবিশ্লেষণে উন্মুখ হয়েছিলেন—আজও যেন সেই সব ভাষার শরীরে রক্তক্ষরণের দাগ, অশ্রুর স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়ে আছে। সে ভাব, সে ভাষা কাউকে আঘাত করে না, বরং আত্মগ্লানিতে, বেদনায়, আত্মমোক্ষণের অনুপ্রেরণায় আমাদের কর্মদীপ্ত হতে সাহায্য করে। স্বামীজী ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও তাদের জীবনপদ্ধতির, তাদের কর্মদক্ষতারও কম প্রশংসা করেননি। কারণ তিনি জানতেন ব্যক্তির মতোই প্রত্যেক জাতির চরিত্রেও দোষগুণের সমাবেশ থাকে। ইউরোপীয় জাতি হিসাবে ব্রিটিশ জাতিরও নিশ্চয়ই অনেক সদ্‌গুণ আছে। এবং সেসব গুণাবলী তিনি বার বার অকপটে উল্লেখ করেছেন। যার যতটুকু প্রাপ্য তা দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। সত্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি।

বিভিন্ন বাসনালোক এবং রুচিপ্রকৃতি নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র। অধিকার-ভেদেরও প্রশ্ন আছে। সকলের জন্য তাই একই পথনির্দেশ সম্ভব নয়। তাছাড়া কত ভক্তসাধক আমাদের দেশের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। পুরাণেরও একসময়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। অথচ রামমোহন এবং ব্রাহ্মধর্ম আমাদের পুরাণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি, হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা সবই বর্জন করলেন। অথচ এই সব বিচিত্র সাধন-পথের অভিজ্ঞতা ছাড়া, এ সম্পর্কে যথার্থ অধিকারী না হয়ে, বিভিন্ন ধর্মপন্থার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। রামমোহন এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুগামীরা

সকলেই নতুনের প্রয়োজনে প্রাচীনকে, প্রাচীনের অনেক কিছুকেই অস্বীকার করলেন। কৃষ্ণকে লম্পট বললেই ভাগবদ্ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় না। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈবধর্ম সম্পর্কে যেমন, ঠিক তেমনি দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সকলই সত্য। বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন পথ। এটাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। যুগের আশু প্রয়োজনে, সহজ সমাধানের প্রত্যাশায় রামমোহন-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে অতীতকে অনেকাংশে অস্বীকার করে ভুল করলেন, অথচ বিবেকানন্দ বহু বিষয়ে রামমোহন-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতৈক্য রেখেও একই সঙ্গে যুগের অর্থাৎ সমকালের এবং চিরকালের সংগঠন-পরিকল্পনা রচনা করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন জাতির সম্মুখে। কারণ পরিব্রাজক বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী ভারতবর্ষকেঃ তাঁর প্রকৃতি, তাঁর মানুষকে, তাঁর ঐশ্বর্য-আনন্দ, শক্তি-সাধনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি-দুর্বলতা নিয়ে চিনেছিলেন, দেখেছিলেন, অনুভব করেছিলেন। এই অনুভবের ঐশ্বর্যেই স্বামীজীর প্রতিটি পরিকল্পনা এত জীবন-অভিমুখী হয়েও মহান আদর্শের অঙ্গীকারে এত সম্পন্ন ও সার্থক।

অথচ রেনেসাঁর যে অন্যতম দান অসাম্প্রদায়িকতা তা কিন্তু রামমোহনের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে কেউ কেউ রামমোহনকে বিবেকানন্দের পূর্বসূরী বলেছেন বটে, কিন্তু প্রাচ্যের ভূমিকা সেখানে অধমর্ণের। রামমোহন সমমর্যাদায় পারস্পরিক ভাববিনিময়ের চেয়ে ইউরোপীয় জীবনদর্শনের আনুগত্য এবং ইংরেজ তথা ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার কথাই বেশী বলেছেন। ইংরেজি শিখলে এবং ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে, (intercourse with European gentlemen), তাদের আচার-আচরণে দীক্ষিত হলে আমরা সভ্য হব, উপকৃত হব এবং সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রভূত উন্নতি হবে—রামমোহন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। পক্ষান্তরে, স্বামীজীর ভূমিকা একদিকে যেমন গ্রহীতার, অন্যদিকে তেমনি অধ্যাত্মসম্পদে ধনী দাতারও। স্বামীজী যে মিলনের কথা, দেওয়া-নেওয়ার কথা বলেছেন তা সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে। ঐহিক প্রয়োজনে আমরা অনেক জিনিস তোমাদের কাছ থেকে নেব ঠিকই, কিন্তু আমরাও দেব। আমাদেরও দেবার মতো বহু সম্পদ আছে যা তোমাদের নেই। আমরাও দেব—সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে দেব। কারণ স্বামীজীর স্থির বিশ্বাসঃ "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া...।"[৩৯] "ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে...

চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে।... এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।"[৪০]

"আমি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য এই মূলমতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বাদবিসম্বাদ!" —এ উক্তি রামমোহনের। অথচ প্রাচীন হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে, বেদান্ত ছাড়া অন্যান্য ধর্মসাধনপন্থা ও সম্প্রদায় প্রসঙ্গে, বিশেষ করে হিন্দুর মূর্তিপূজা সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু ঐ "অবান্তর ভেদ লইয়া বাদবিসম্বাদেরই" উদাহরণ। এতৎসত্ত্বেও রামমোহনের বিশ্বভাবুকতা, উদার সর্বজনীন আন্তর্জাতিকতা, ভোগবাদের প্রশ্রয়ে লালিত হলেও সুস্থ সচ্ছল মানবিকতা, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারকল্পে তাঁর কর্মপ্রয়াস, নারীমুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অগ্রগামীর ভূমিকা, তাঁর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং তাঁর বেদান্তধর্ম গ্রহণ ও প্রচার—এসবের জন্য তিনি নবযুগরচনার একজন আদি রূপকার সন্দেহ নেই। এই কারণেই স্বামীজীর মতো মহামনস্বীও অন্তত তিনটি বিষয়ে রামমোহনের ঋণ স্বীকার করেছেনঃ

"...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu."[৪১]

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ ঃ অতঃপর বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করব। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়ঃ "জাগরণের দ্বিতীয়যুগ বিদ্যাসাগরের যুগ; এই যুগেই যুগ-লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ...ব্যক্তির তথা জাতির জীবনে বৈষয়িক সিদ্ধিলাভকে পরমপুরুষার্থরূপে বরণ করিবার জন্য যে বুদ্ধি-ধর্ম্ম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ রামমোহনের বিদ্রোহ-ঘোষণার মূলে বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাই সত্যকার মানবপ্রীতি ও মানবসেবায় এক উদারতর ও গভীরতর প্রেরণা হইয়া দেখা দিল; যাহা মস্তিষ্কগত ছিল তাহাই এক্ষণে প্রাণশক্তিরূপে হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; তাহার মন্ত্র হইল আরও স্পষ্ট, আরও প্রাণময়, আরও উদার।"[৪২] দেশ জাতি ও তার সভ্যতাসংস্কৃতিকে আর চোখের আলোয়

চোখের বাহিরে দেখা নয়, এবারে অন্তরের গভীরে উপলব্ধির আলোকে প্রত্যক্ষ করা। দেশের মানুষের দুঃখ-দৈন্য-ব্যথা-ব্যর্থতা, পরাধীনতার জ্বালা বিদ্যাসাগর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্তু শুধু অশ্রুর তর্পণেই তাঁর কৃত্য সম্পাদন করেননি। তাঁর সমস্ত উদ্গত অশ্রুরাশিকে তিনি কর্মে ও সেবাধর্মে নিবেদিত করেছিলেন। স্বামীজীর মতো বিদ্যাসাগরের জীবনেও ইউরোপের কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করার মতো। বিদ্যাসাগরের সেবাধর্মের পশ্চাতে ছিল মানবতা। কিন্তু স্বামীজীর জনসেবার পশ্চাতে মানবতা ছাড়াও ক্রিয়াশীল ছিল অখণ্ড চৈতন্যময় এক বিশ্বাত্মবোধ। অহেতুক সেবাধর্ম বা মানব-অর্চনা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন স্থিরতম বিশ্বাসের ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে, কোন গভীরতর দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বা মানবিক প্রত্যয় বা তন্ত্রে বিশ্বাসী না হয়ে মানুষের পক্ষে বড় কোন কাজ করে যাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের সেবাধর্ম তাই শেষ জীবনে অন্তহীন শূন্যতায় অবসিত হয়েছে। কারমাটারে তাঁর নিঃসঙ্গ একক জীবনযাপনের করুণ কাহিনী কারও অবিদিত নেই। পক্ষান্তরে স্থিরতম একটি মহৎ প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই স্বামীজীর জীবনব্যাপী সেবাধর্ম অন্বয় আনন্দদীপ্ত এক অখণ্ড পূর্ণতায় প্রশান্তি লাভ করেছে।

কর্মোদ্যমের বিভিন্নমুখিতায় রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মিল থাকলেও, বিবেকানন্দের সঙ্গেই যেন তাঁর আত্মিক যোগ অনেক বেশী। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নির্ভীকতা ও স্বাজাত্যাভিমান অভীঃ মন্ত্রের উপাসক বিবেকানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও মানব ও মানবতার সপক্ষে সমান সংগ্রামশীল। মনুষ্যত্বের প্রাঙ্গণে নারীকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণায় রামমোহন সতীর সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন। আর ঐ একই প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন। মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির যে আন্দোলন আমরা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, তার সূচনা এখান থেকেই। ঐ একই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের সমস্ত কর্মপ্রয়াস। বস্তুত বিদ্যাসাগরের সেবাধর্ম, শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস, বিধবাবিবাহ-আন্দোলন, তাঁর সাহিত্যরচনা, বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট রূপায়ণ, ভাষাশিক্ষার পুস্তক প্রণয়ন, সবই সেই একটি উদ্দেশ্যে নিবেদিতঃ মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি। তাঁর সেবাধর্মও আসলে বিপ্লবের নামান্তর। আগেই বলেছি বহিরঙ্গ সেবাধর্মে স্বামীজী ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়। "যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না।"[৪৩] কোন মন্দিরে যে কিছু

উপকার হবে না একথা বিদ্যাসাগরও বিশ্বাস করতেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে "তাঁহারই উপাসনা করা হইতেছে"—তা তিনি বুঝতেন না বা বুঝতে চাইতেন না। কিংবা স্বামীজী যখন বলেনঃ "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি।... সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোন লাভ নাই।"[৪৪] মনে হয় যেন এগুলি বিদ্যাসাগরেরই কথা। দেশপ্রেম বা দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা একাত্ম উপলব্ধির সহায়ক নিশ্চয়ই, এবং ভালবাসাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যোগ তাতেও কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তবে আর তার কোন প্রতিকূল তরঙ্গে নিমজ্জিত হবার আশংকা থাকে না। স্বামীজীর Practical Vedanta তাঁর দেশপ্রেমের এবং অখণ্ড মানবত্ববোধেরও একমাত্র স্থির এবং স্থায়ী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি। স্বামীজীর বক্তব্যের মধ্যে কোন জড়তা নেইঃ "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within, by controlling nature, external and internal."[৪৫]

বাইরের আচারবিচার সংবলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার প্রভৃতি, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব অলৌকিক ভক্তি এগুলি যে যথার্থ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পরিপন্থী—এ সার্বিক ঘোষণাটি নবজাগৃতির সমস্ত প্রধান পুরুষের কণ্ঠেই বার বার উচ্চারিত। তবু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এবং অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগরের নামই এ প্রসঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথমে মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও বহু বিষয়ে ইউরোপীয় জীবনচর্যার অনুগত। তিনিও সমন্বয়ী। কিন্তু আমাদের 'অস্তি'র স্থিরপ্রত্যয়ী ভূমি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বলেই মনে হয়। জাতীয় ভিত্তির কোন্ স্তরের উপর ইউরোপীয় জীবন-দর্শনের মালমশলা, উপাদান যুক্ত করে জাতীয় মন্দির গড়তে হবে সে সম্পর্কে স্বামীজীর মতো কোন স্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিতে পারেননি জাতিকে। পারেননি তার প্রমাণ তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও আশু প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের প্রাচীন ষড়্দর্শনে "আধুনিক কালের পক্ষে শিক্ষণীয় কিছু নেই"—একথা বলতে পারলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসূচী থেকে তিনি বেদান্তদর্শনকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। অনায়াসে একথাও উচ্চারণ করতে পারলেনঃ "বেদান্ত

ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।"[৪৬] অথচ ভারতীয়দের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেই যে বিদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষার সার্থকতা—শিক্ষানীতির এই প্রাথমিক কথাটা তাঁর মতো মনীষী কি করে বিস্মৃত হলেন, ভাবা যায় না। কারণ স্বভূমিতে সুদৃঢ় শিকড়-সান্নিধি না থাকলে কোন বৃক্ষশাখায়ই ফুল ফুটতে পারে না। ফল ধরে না। ধর্মই যে জাতীয় শক্তির পরম উৎস এ সত্যও তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। স্বামীজীর মতে ধর্ম মানে rituals-এর অনুবর্তন নয়, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কান্ডবারিধির অনুষ্ঠান বা অন্ধ প্রথানুগত্য নয়, পরন্তু ধর্মের অপর নাম আত্মবিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা। "মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তা প্রকাশ করাই স্বামীজীর কাছে ধর্ম।" "ধর্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায়, তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, উহা কতগুলি ব্যক্তির মতবাদমাত্র।" তাই স্বামীজীর মতে হিন্দুধর্ম মানেই মানবধর্ম--সর্বজনীন ধর্ম—জীবনধর্ম—পরিপূর্ণরূপে একসঙ্গে সকলের সুস্থ সবল সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকার ধর্ম! এই ধর্মকে অস্বীকার করে কোন মহৎ কর্ম-প্রয়াস, জীবনসংগঠন সার্থক হয়ে উঠতে পারে না—বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশে।

বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনী ও কর্মপ্রয়াস আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্যের অভাবে, সুনির্দিষ্ট একটি প্রত্যয় বা উদ্দেশ্যের অভাবে তাঁর কর্মপ্রতিভা এত অসাধারণ এবং বিচিত্রমুখী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সার্থকতা সম্পাদন করতে পারেনি। অথচ তাঁর কী না ছিল! অজেয় পৌরুষ, অসীম আত্মবিশ্বাস, যুক্তিনিষ্ঠা, অশেষ কর্মৈষণা, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিবৎসলতা, দুঃস্থ মানুষের জন্য অপরিসীম সহানুভূতি ও বেদনাবোধ, বিশাল ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ নির্ভীকতা, উজ্জ্বল মানবতাবাদঃ সব থেকেও সব মিলেমিশে একটি মহৎ ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বাদ দিলে দেশের সংস্কৃতি ও প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অসাধারণ। রামমোহনের মতো সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদকর্ম বিদ্যাসাগরের জীবনেও দেখা যায়। আগেই বলেছি নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন তিনি সংগ্রামী ছিলেন। শিক্ষার প্রসারে তাঁর কর্ম-যজ্ঞের তুলনা নেই। সবই সেই মহৎ মানবিকতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অবশ্য দেশাচার, অন্ধ প্রথানুগত্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এসব সাধারণ যুগলক্ষণ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সকলের মধ্যেই স্পষ্ট। স্ত্রীজাতির জন্য অকপট অনুভব ও সহানুভূতি, তাদের দুঃসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার

থেকে মুক্তি-আন্দোলনে রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ডিরোজিও, তাঁর শিষ্যগণ ও অনুরাগিবৃন্দ. বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত এযুগের সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু নারীজাতি সম্পর্কে আন্তরিক অনুভবের গভীরতায় একমাত্র ঠাকুর-স্বামীজীর সঙ্গেই বিদ্যাসাগর তুলনীয়। দেশের দরিদ্র দুঃস্থ জনসাধারণ সম্পর্কেও করুণাসাগরের অপরিসীম আর্ত বেদনাবোধের একমাত্র তুলনা মেলে স্বামীজীর মধ্যে। কারণ দেশের দুঃস্থ দুঃখীর জীবন সম্পর্কে দুজনেরই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তাঁর ধর্ম-চেতনা, স্বাজাত্যাভিমান, স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, সেবাধর্ম, সমাজসংস্কার সবই যে কেবল শুদ্ধ মানবিকতা ও মহৎ মঙ্গলের কাছে সর্ব-সমর্পিত তাই নয়, পরন্তু একই সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্য ও সাধনার প্রতি একান্ত অনুগত হয়েও বৃহৎ একটি অস্তিত্ববোধের অমল ঊর্ধ্বায়নে বিধৃত। এই জন্যই স্বামীজীর প্রতিটি কর্মপ্রয়াস সাফল্যে মণ্ডিত, আগামী পনেরো শত বছরের জন্য ভারতবর্ষকে একটি পরিপূর্ণ জীবনপথের সন্ধান দিয়ে গেছেন স্বামীজী। অথচ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে স্বামীজীর চরিত্রের অনেক মিল। এই মহৎ জ্যেষ্ঠের কাছ থেকে দেশসেবার, সমাজসংস্কারের এবং মনুষ্যধর্মের অনেক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার তিনি সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেছিলেন। "উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রভাব না পড়িয়াছে!"[৪৭] নিবেদিতার কাছে একদা স্বামীজী নিজেই বলেছিলেন একথা। আত্মপ্রত্যয় এবং তেজস্বিতায় তো বটেই,—এমন কি দুজনের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্যহীন সারল্য ও উদাসীন সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও প্রাচ্য ঐতিহ্যের সমন্বয় প্রয়াসেও দুজন ছিলেন সমধর্মী। সবচেয়ে এই দুই মহৎ চরিত্রের যেখানে মিল তা হল কথায় নয়, বক্তৃতায় নয়, প্রত্যহ-জীবনচর্যায় ও বাস্তব জীবনে নিষ্ঠা ও মহৎ নীতি, সংযম ও আদর্শকে রূপান্বিত করার তপস্যা ও অধ্যবসায়ঃ বুদ্ধিতে নয় বোধে, যুক্তিতে নয় কর্মে, বক্তৃতায় নয় উপলব্ধিতে—আদর্শের একান্ত অনুসরণ। কর্মে ও কথায় সত্যিকার আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন দুজনেই। তাই একজন অজ্ঞেয়বাদী প্রায় নাস্তিক, অন্যজন ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ন্যাসী হয়েও দুজনের চরিত্রে এত মিল, এত গভীর সাদৃশ্য।

তবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বামীজীর প্রজ্ঞাপ্রসারিত সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি বিদ্যাসাগরের ছিল না। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি ছিল খণ্ডিত। তাছাড়া বোধ হয় দেশ ও জাতির সর্বাত্মক অগ্রগতির সংগ্রামে সৈনাপত্য করার ক্ষমতাও

বিদ্যাসাগরের ছিল না। কিন্তু একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবিধ কর্মপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর জাতির আত্মস্থ হবার প্রয়োজনে যা করে গেছেন তা তুলনারহিত। এই খণ্ডিত সীমিত দৃষ্টির ফলেই জাতির চরিত্রের কোথায় ত্রুটি, এদেশের মানুষের চরিত্রে কি কি দুর্বলতা এসব জেনেও বিদ্যাসাগর জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। স্বামীজী কেবলমাত্র আমাদের দোষত্রুটি দুর্বলতা পাপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি এদেশের মানুষের কোথায় শক্তি, কি তাদের গুণ এ সম্পর্কে কেবল সমান সচেতন ছিলেন তাই নয়, তিনি তাদের ডেকে অনন্ত সম্ভাবনার কথাও সস্নেহে অশ্রুর সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে উচ্চারণ করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি যেমন দুঃখে ব্যথায় আহত আর্তনাদে তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করেছেন জাতির উদ্দেশ্যে, তেমনি আবার বলেছেনঃ "এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা... এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ্ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!"[৪৮] কিংবা "বলিও না আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন।" "...'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে'...সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।'"[৪৯] স্বামীজীর রচনাবলী থেকে এরকম অজস্র উদ্ধৃতি উদ্ধার করা যায়। এমন আশ্বাস, এমন অভয়, এমন ভরসার কথা, এমন বিশ্বাসের বাণী কেউ কোনদিন মৃত জাতির কর্ণকুহরে শিবমন্ত্রের মতো এর আগে বা পরে উচ্চারণ করেননি। বিদ্যাসাগরও দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর মমতাবোধের থেকেই স্বদেশবাসীর আচার-আচরণে, হীনতায়, হীনম্মন্যতায়, কাপুরুষতায় এবং অমানবিক নানা আত্মপ্রকাশে ব্যথিত হয়েছেন, তাদের আঘাত করেছেন, কিন্তু স্বামীজীর মতো ভালোবেসে সমব্যথী হয়ে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, মিলেমিশে এক হয়ে যেতে পারেননি। পারেননি বলেই তাদের শক্তির উৎস উদ্ধার করে আবার বেঁচে উঠবার পথের সন্ধান দিতে পারেননি। প্রেমের স্বর্গ থেকে সঞ্জীবনী এনে, বিশ্বাসের ছবি রচনা করে আবার ভ্রষ্ট স্বর্গোদ্ধারের

সঙ্কল্পে তাদের প্রতিষ্ঠ করতে পারেননি জীবনের বরবোধিমূলে স্বামীজীর মতো।

সাধারণ দুঃস্থ দুঃখী আর্ত মানুষের জন্য সর্বস্ব পণ করে অনেক কিছুই তিনি করেছেন সত্য, কিন্তু সব সময়ই মানসিকতার দিক থেকে একটি নিঃসঙ্গ দূরত্বের ব্যবধান রক্ষা করে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অতিরিক্ত স্পর্শপ্রবণতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছিল। এই কারণেই জাতির ব্যাধি ও নিদান নির্ণয় করেও সঠিক ঔষধ এবং শুশ্রূষার সন্ধান দিতে পারেননি। সন্ধান দিতে পারেননি বলেই শেষ জীবনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, দেশ ও জাতির সকলের সঙ্গে সম্পর্কহীন একক নিঃসঙ্গ হয়ে চরম ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যে কেটেছে তাঁর উত্তরজীবন।

নবজাগরণ ও মধুসূদনঃ মোহিতলাল মজুমদারের "বাংলার নবযুগ" গ্রন্থে নতুন ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অদ্বিতীয় রূপকার হিসাবে অতঃপর যে দুজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম করা হয়েছে তাঁরা হলেন মহাকবি শ্রীমধুসূদন এবং অনুশীলনধর্মের প্রবক্তা, বন্দেমাতরম্-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম। "রামমোহনে যাহা যুক্তিতর্কের বিষয় ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা প্রেম ও কর্ম্মের প্রেরণা...মধুসূদনের অন্তরে তাহাই কেবলমাত্র মুক্তিচেতনার অসীম আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।"[৫০] এবং তারই আত্মপ্রকাশ "মেঘনাদবধ কাব্য"। মধুসূদনই সর্বপ্রথম এই মানবধর্মকে, সকল যুক্তিতর্ক জ্ঞানবিচারের বাইরে, সকল প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অতীতরূপে অতিশয় স্বাধীন কাব্যকল্পনায় লাভ করলেন, অর্থাৎ প্রাণের বিশুদ্ধতম আবেগরূপে অনুভব করলেনঃ এ মন্তব্যও মোহিতলালের। একথাই শ্রীগৌর পাল অন্যভাবে উচ্চারণ করেছেনঃ "...মাইকেল...সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গমে জাতীয়তার প্রবাহকে অনন্য সাধনায় মিলিত করেছিলেন।..মধুসূদন কবিতায় যা করেছেন বিদ্যাসাগরও তাই করেছেন স্বক্ষেত্রে। দুজনেই সহযোদ্ধার মতো শৃঙ্খল ভেঙেছেন, একজন কাব্য সংস্কারের অন্যজন সামাজিক সংস্কারের।"[৫১]

নতুন ঊষার দীপ্ত স্বর্ণচ্ছটার আবির্ভাবে আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল একদিন জাতি। জাতির এই আত্ম-আবিষ্কারের গানই হল মেঘনাদবধ মহাকাব্য। জীবন ও জগৎকে নতুন করে দেখার আনন্দ, নিজের মুখ নতুন করে দেখার, নিজেকে জানার, নিজেকে চেনার এ যেন এক অবাক সূর্যস্বরলিপি। মেঘনাদবধ আসলে জাতির আত্মবন্দনা। এই কারণেই

স্বামীজী এই কাব্যের উৎসাহী পাঠক, এই কবির গুণগ্রাহী ভক্ত। এই কাব্যের মহত্তম ভাবব্যঞ্জনা এবং অপরাজেয় মানবমহিমার সার্বিক রূপকল্পনার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাকবি প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেনঃ "কাল প্রসন্ন, য়ুরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দঃ "রামমোহনে যাহা প্রধানতঃ বিচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা সেবা-ধর্ম্মের আবরণে কতকটা আবৃত ছিল, এবং মধুসূদনে যাহা নিরুপদ্রব রসসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল...তাহাই এক্ষণে গুরুতর সমস্যারূপে...শুধুই মানবধর্ম্ম নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারূপে এক নূতন প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে।"[৫২] দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে ওঠায় যথার্থ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হল। ইতিমধ্যে এই নবযুগের আন্দোলন নানা রূপে ও নানা দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনের নানা স্রোত-ধারায় জাতির চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠল। একদিকে সব রকমভাবে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ থেকে চ্যুত, অবক্ষয়ের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, দীর্ঘকালের অবসাদ ও জড়তাগ্রস্ত বিপন্ন জাতি সামাজিক অর্থহীন বিধিনিষেধের নানা নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে হৃতশ্বাস, অন্যদিকে ভোগাশ্রয়ী ইউরোপীয় সভ্যতা বহিরঙ্গ ভোগের নানা বিলাস-উপকরণ নিয়ে চোখের সামনে উপস্থিত। তখন আত্মাব-মাননায় বিধ্বস্ত শীর্ণ শুষ্ক রোগপাণ্ডুর জাতি স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে হাত বাড়াবে এটাই স্বাভাবিক। দেশে ও সমাজের সর্বত্র এই দুই বিপরীতের অবস্থানে দেশব্যাপী শুরু হল চরম বিশৃঙ্খলা এবং সার্বিক চঞ্চলতা। সেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও চাঞ্চল্যের মধ্যে সমন্বয়-সংহতি এনে দেশ ও জাতিকে যাঁরা একটি সুস্থির জীবনপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। স্বাধীনতার আবেগ এযুগে স্বৈরাচারে পর্যবসিত হল, উচ্ছৃঙ্খলতাই যেন জীবনের অন্য নাম হয়ে দেখা দিল। জাতির জীবনে তীব্র হয়ে দেখা দিল চরম আধ্যাত্মিক সঙ্কট। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই যে যার মতো করে একটা সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। যুগলক্ষণ তখন তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নিয়ে চারিদিকে স্বপ্রকাশঃ "কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগরের সেবাধর্ম ও শিক্ষাবিস্তার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা, আচার্য কৃষ্ণকমলের প্রজ্ঞাসাধনা ও মানব-উপাসনা"ঃ এ সবই সেই যুগ-আন্দোলনের ক্রিয়াবিক্রিয়ার নানা আত্মপ্রকাশ এবং

জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বিচ্ছিন্নভাবে এবং ঐক্যবিহীনভাবে হলেও প্রথম ওষধিপ্রয়োগ।

ইউরোপীয় জীবন-অভিমুখে জাতির চূড়ান্ত প্রবণতার মুহূর্তে বঙ্কিম ইউরোপীয় জীবনবাদের মৌল প্রেরণাকে অস্বীকার করেননি, তবে তাকে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করে, ধর্ম, শিক্ষা ও সবিশেষে মানব-প্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির দিব্যমন্ত্রে শোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁর অনুশীলন-ধর্ম সামঞ্জস্য ও ঐক্যবন্ধনের মধ্য দিয়ে সমগ্র জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করার ধর্ম,—বর্জনের পথনির্দেশ নয়। ঠাকুর-স্বামীজীও জীবনকে গ্রহণ করার শিক্ষা ও সাধনাই জাতির কাছে তাঁদের একমাত্র অমল উত্তরাধিকাররূপে রেখে গিয়েছেন। বঙ্কিমে যা শুরু, অপূর্ণ, অসমাপ্ত, তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে যথার্থ সত্যপথের সন্ধান দিয়ে গেছে। বিজ্ঞানসম্মত মানবসেবাধর্ম এবং লোকহিতকে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ জীবননীতির অঙ্গীভূত করেছেন, কারণ ব্যক্তিমানুষের চেয়ে মনুষ্যজাতির কল্যাণকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সমাজ বাঁচলে, দেশ বাঁচলে, মনুষ্যজাতি বাঁচলে ব্যক্তি-মানুষও বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করে নিতে পারবে—এই তাঁর বিশ্বাস। ঐ একই কারণে শিক্ষা ও ধর্মের অনুশীলনে তিনি এত জোর দিয়েছিলেন। তাঁর এই সমন্বয়সাধনার ধর্ম তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজী যেমন রজোগুণকেই সমকালীন দেশবাসীর পরমগ্রাহ্য ধর্ম বলে মনে করেছিলেন, সর্ব দেবদেবীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দেশজননীকে একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে মনে করেছিলেন, বঙ্কিমের চিন্তায়, তাঁর সমগ্র রচনায় তারই পূর্বাভাস। স্বামীজীর মতে, বঙ্কিম মনুষ্যজীবনে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। মহৎ কর্মের প্রেরণাদায়করূপেই বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা ও ভাষ্য। মহাভারতের পার্থসারথি কৃষ্ণই তাঁর উপাস্য, গোপীজনবল্লভ বংশীধারী নন। এখানেও স্বামীজীর সঙ্গে আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। বঙ্কিম-প্রবর্তিত সন্তানধর্মে এই কর্মেরই জয়গান, এই রজোগুণেরই সংহত আত্মপ্রকাশ এবং বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে তার পূর্ণ পরিণতি। এই জন্যই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় যুবকদলের কাছে স্বামীজী বলেছিলেনঃ আনন্দমঠের সন্তানদের মতো দেশভক্তি লাভ করে জন্মভূমির সেবা সর্বপ্রধান কর্তব্য। "আগামী পঞ্চাশ বৎসর জন্মভূমি ভারতের মুক্তিই যেন আমাদের একমাত্র ধ্যানধারণার বিষয়বস্তু হয়। অন্য সব দেবদেবীর কথা ভুলিয়া যাও—আমাদের দেশ ও জাতিই জাগ্রত দেবতা ইহা সর্বদা মনে রাখিবে।" [৫৩] এ সম্পর্কে স্বামীজীর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উক্তিও মনে পড়ে যা তাঁর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, শুদ্ধ তপশ্চর্যার আলোকে এবং

মহান হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে আরও গাঢ়, পরিব্যাপ্ত ও ভাস্বর। "...এ দেশের মতো এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই।...আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই।"[৫৪] "বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি।...আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন।...বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—যে যে-কাজ করুক না কেন, যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।"[৫৫] "একমাত্র জাগ্রত দেবতা হইলেন আমার নিজের জাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, তাঁহার পদ, তাঁহার কর্ণ প্রসারিত রহিয়াছে; তিনি সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। অন্যান্য সকল দেবতারা ঘুমাইতেছেন। যে বিরাট ভগবান্ আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটিব? আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন—সেই বিরাটের পূজাই আমাদের প্রথম পূজা হইবে।"[৫৬] শুধু তাই নয়, পরন্তু এই দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্র নিরন্ন জনসাধারণই যে দেশজননীর যথার্থ দেহ, তাদের সেবাই যে দেশসেবা স্বামীজীর কণ্ঠে তাও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত। অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, হৃদয়ের অপার অনুভবে এবং তপশ্চর্যার উদাত্ত শক্তিতে সেসব উক্তির প্রতিটি অক্ষর পরিশুদ্ধ বহ্নিশিখার মতো দীপ্তিমান। তিনি বললেনঃ "আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। ...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[৫৭]

কিংবা সেই আশ্চর্য আর্ষোক্তিঃ "ভারতের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের কুটিরে।" এরপর স্মরণ করা যেতে পারে আগ্নেয় অক্ষরে লেখা তাঁর সেই প্রবল দীপ্ত উজ্জ্বল মহান ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ অক্ষরে অক্ষরে সমস্ত প্রাচ্য এবং সমগ্র ভূবৃত্তে সত্য হতে চলেছে। "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে।"[৫৮] "স্বামীজী শূদ্র অভ্যুত্থানের আগমনী যখন গেয়েছেন তখন রাশিয়ায় লেনিন সর্বহারাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের চিন্তাও করেননি। চীনের মাও সে-তুঙের তখন অভ্যুদয় হয়নি।"[৫৯] আরও বললেনঃ "আমাদের mission (কার্য্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।"[৬০] "মনে রেখো, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। ...জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগের হৃত ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইতে পার? তোমরা কি সাম্য স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার?"[৬০ক] এই প্রফেটিক ভিশন (prophetic vision) বঙ্কিমের ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু সাধারণ চাষী-মজুরের কথা—তাদের জীবন, তাদের আশাভরসার কথা নিয়ে বঙ্কিমই প্রথম আমাদের সাহিত্যে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর "বঙ্গদেশের কৃষক", 'বিড়াল' এবং 'সাম্য' প্রবন্ধত্রয় শুধু তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের নয়, তাঁর দরদী মনেরও পরিচয় বহন করে। এছাড়া "কমলাকান্তের দপ্তরে" এবং অন্যত্রও তিনিই গ্রামের দুঃস্থ দুঃখী জনতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে বিবেকানন্দের তপশ্চর্যার শুদ্ধি ছিল না, ছিল না এই বিশাল ঐতিহ্যলালিত দেশ ও জাতিকে সৈনাপত্য দেবার মতো বিবেকানন্দের মহৎ শক্তি ও হৃদয়ের অর্জিত স্বাধিকার; তবু সহজাত বুদ্ধিতে ও সংশয়ী চেতনায় হলেও, তাঁর কাছেও দেশের এই যথার্থ স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ পরিণতির চিত্রটি ধরা পড়ে এবং ঈষৎ কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে, কখনও বা ব্যঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এ প্রসঙ্গ প্রকাশ করে গেছেন। এবং এইখানেই তিনি বিবেকানন্দের যথার্থ পূর্বসূরী।

বিবেকানন্দই প্রথম আমাদের এই গ্রামে গাঁথা সভ্যতায় গ্রামই যে মেরুদণ্ড সেকথা উচ্চারণ করেন এবং গ্রামের মানুষের উন্নতির উপরই যে জাতীয় উন্নতির

ভিত্তি তা ঘোষণা করেন। জনসাধারণের কথা এমন অকপটে স্পষ্ট করে তাঁর আগে বা পরে কেউ বলেননি সত্য, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন ও গ্রামের চাষী-মজুরদের উন্নতি প্রসঙ্গ নিয়ে বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র দত্ত দুজনেই আলোচনা করেন। জনসাধারণের শিক্ষার দিকেও, বিবেকানন্দের মতো সামগ্রিকভাবে না হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন। বিবেকানন্দের মতো যথার্থ মানুষ গড়ার তপস্যা ও সিদ্ধি তিনি কি করে অর্জন করবেন? সে শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি নিজেও তাঁর শক্তির সীমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই স্বামীজীর মতো শিক্ষিত যুবকদের ডেকে এমন গভীরতম প্রত্যয়ে বলতে পারেননিঃ "পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" অবহেলিত নিপীড়িত নির্যাতিত সাধারণ দুঃস্থ নিরন্ন মানুষের হয়ে এমন করে একদিকে অশ্রুপ্লাবিত এবং অন্যদিকে প্রচণ্ড ব্যথায় অভিমানে বলতে পারেননি বঙ্কিমঃ "যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি।"[৬১] কিন্তু শিক্ষাবিস্তারই যে বহু সমস্যার সমাধান করে দেশের মানুষের মধ্যে যথার্থ ঐক্য আনতে সক্ষম হবে এ বিষয়ে বঙ্কিমও নিশ্চিত ছিলেন। ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ সত্ত্বেও, বিবেকানন্দের মতোই মানবতাবাদ বঙ্কিমেরও অন্বিষ্ট ছিল। তাই সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির সঙ্গে বঙ্কিমের ধ্যানধারণার, সমাজ ও জীবনদৃষ্টির প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়ঃ "স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি মানুষ। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। এই মানবধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের উত্তরণ চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি তাঁর চোখে মানবসমাজের একটি অঙ্গ মাত্র। প্রধান অঙ্গ অবশ্যই নয়। মানুষের জীবনের আংশিক চাহিদা মেটানো ছাড়া রাষ্ট্র যে বেশী কিছু করতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই রাষ্ট্রের সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তাঁর সকল চিন্তার পিছনে ব্যক্তিত্বের বিকাশই মুখ্য।" তাই স্বামীজী যথার্থ মানুষ গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতেঃ "Education is the manifestation of the perfection already in man" এবং "Religion is the manifestation of the divinity already in man." শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, ধর্মান্দোলন, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পরিকল্পনা—সব কিছুরই

উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। এবং একই সঙ্গে ঐ perfection ও divinity অর্থাৎ পূর্ণতা ও দেবত্ব-জাগ্রত মানুষের সমষ্টিতে গড়ে উঠবে যে সমাজ তা-ই আদর্শসমাজ। আদর্শসমাজই প্রয়োজন হলে গড়ে তুলবে নিজেদের মতো করে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংহতি রেখে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশই শেষ কথা।

দেশপ্রেমঃ স্বামীজী, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্যঃ আধুনিক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বঙ্কিমচন্দ্র পরম পুরুষার্থ মনে করেননি। অবশ্য একথাও ঠিক "সমাজের আত্মরক্ষাকে তিনি খুব বড় প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলেও—স্বাধীনতার অর্থ করিয়াছেন অন্যরূপ। প্রত্যেক সমাজের স্বকীয় সংস্কৃতি ও স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া বাঁচিবার যে নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা, তাহারই নাম স্বাধীনতা... রাজার শাসন বা রাষ্ট্রীয় বিধান যদি তাহার প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার প্রতিরোধ অবশ্যকর্ত্তব্য; কেবল তাহা বিঘ্নকর না হইলেই হইল।"[৬২] স্বামীজীর স্বাধীনতাস্পৃহার পশ্চাতে কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীনতম সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শই ক্রিয়াশীল ছিল। এমন একটি সমাজব্যবস্থাই আদর্শ, যেখানে সকলের ব্যক্তি হিসাবে হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে, অথচ সে অধিকার অন্যের সম-অধিকার নষ্ট করবে না। অসুর ও দানবেরা যখন দেবতাদের এই হয়ে ওঠার অধিকারে হস্তক্ষেপ করল, তখনই দেবাসুর সংগ্রামের শুরু এবং দেবী দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী, মধুকৈটভবিধ্বংসী বিধাতৃবরদা-রূপে দেবতাদের সপক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণা এবং অসুরনিধনে তৎপরা। এই অসুরনিধন মাঝে মাঝে ইতিহাসের নির্দেশে একটি বেদনাদায়ক প্রয়োজন (painful necessity) হয়ে দাঁড়ায়। মহাভারতেও দেখি পাণ্ডবদের বেঁচে থাকার অধিকার যখন কৌরবদের হাতে লাঞ্ছিত তখনই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে পার্থসারথির তেজোময় দৃপ্ত প্রতিরোধ। এর নামই ধর্মস্থাপনা। নাহলে, কারও সঙ্গে শত্রুতা বা কারও প্রতি অকারণ বিদ্বেষের ভাব কোন দিক থেকেই কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। স্বামীজীরও জাতি হিসাবে ইংরেজের প্রতি সামান্য বিদ্বেষের ভাব ছিল না। কিন্তু যেহেতু স্বৈরাচারী ইংরেজ-রাজ জাতি হিসাবে আমাদের হয়ে ওঠার পথের প্রতিবন্ধক, বিঘ্নস্বরূপ, সেইহেতুই স্বামীজীরও ধর্মযুদ্ধ। এই কারণেই স্বামীজী এবং নিবেদিতা শেষ জীবনে দেশ থেকে দানবের বিতাড়নে, দেব-দানব সংগ্রামে, দেবতার সপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কারণ "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।"[৬৩] সেজন্যই দেখা

যায় সেযুগের স্বদেশীদের প্রতি তাঁর ছিল অন্তরের টান। শুধু শিক্ষা সেবা ও অন্যান্য সংগঠনকর্মেই নয়, গুরুর তিরোধানের পর নিবেদিতাকে দেখা গেল সারাটা জীবন উৎসর্গ করতে গুরুর দেশমাতৃকার চরণতলে। কারণ গুরুর কথা তিনি ভোলেননি, ভোলেননি তাঁর অসমাপ্ত জীবনসাধনা। "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।"[৬৪] তাই সাক্ষাৎ জগদম্বারূপেই যেন দেশের উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। এবং গুরু বেঁচে থাকলে সন্ন্যাসী হয়েও বিদেশী শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে তাঁকেও এগিয়ে যেতে হত নতুনতর কোন দেবাসুরসংগ্রামে সৈনাপত্য দিতে। একথা যে কেবল দেশবিদেশের বিপ্লবী চিন্তাবিদ্‌দের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত তা নয়, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও ঐ একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৫-এর পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীমা বলেছেনঃ "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত।"[৬৫]

কোম্পানি জেলে পুরে রাখত, না ফাঁসিতে জীবন উৎসর্গ করতে হত জানি না, কিন্তু জাতির সেই পরম ক্রান্তিলগ্নে স্বামীজী বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়ে একহাত লড়তেন, বীরের মতো সংগ্রাম করতেন এবং এগিয়ে এলে স্যার সুরেন্দ্রনাথের মতো "Surrender not" বলেও, settled facts-কে পুরোপুরি unsettle না করে পিছপা হটতেন না। ভূমার ভৈরব বিবেকানন্দ কখনও আপস রফা করে স্বল্পে সন্তুষ্ট থেকে moderate দলে যোগ দিতেন নাঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসনসংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে দিয়ে জাতির প্রতি শেষকৃত্য সম্পাদন করতেন না। এবং এখানেই নবজাগরণের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে স্বামীজীর মৌল পার্থক্য। প্রেমিক সন্ন্যাসী বলেই প্রেমের তপস্যায় কোন আপসের যাদুতে সস্তায় কিস্তিমাত করার পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। কি কারণে জানি না, আমাদের অনেক জ্ঞানী গুণী শিল্পী নেতাকেই দেখেছি ভাঙতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গড়ার দিকে, সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। অথচ একই সঙ্গে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই তো বিশ্বের স্থিতি ও সংহতি। সৃষ্টি ও প্রলয় নিয়েই স্থিতি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিয়েই ত্রিনাথ বা ত্রিমূর্তি। ভাঙার বিবিক্তি ছাড়া সৃষ্টির মমতা আসে না। আমাদের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয়

প্রায় প্রত্যেকেরই ইংরেজ বা ইউরোপ প্রীতি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ব্রিটিশ জাতি এবং বিদেশী রাজশক্তি সম্পর্কে সকলেরই কিছু কিছু দুর্বলতা ছিল। রামমোহন তো প্রকাশ্যেই ইংরেজ-শাসন এবং প্রত্যহজীবনে ইংরেজ-সাহচর্যকে আমাদের সভ্য ও উন্নত হবার পথ বলেই ঘোষণা করেছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও শেষ পর্যন্ত এদেশে ইংরেজ-রাজত্বের সুফল সম্বন্ধে আশান্বিতই ছিলেন। তাই বিদ্যাসাগরের সমস্ত কর্মপ্রয়াস শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার এবং সেবা-ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-রাজত্বকে সুশাসনের প্রতীক বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেনঃ "ইংরাজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।" ৬৬ "আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।" "ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।" ৬৭—এ সবই বঙ্কিমের উক্তি। "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে।" —একথাও বঙ্কিমের। ৬৮ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র সেনও ব্রিটিশ সরকারের গুণমুগ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত "ছোট ইংরেজ", "বড় ইংরেজের" পার্থক্যের অন্তরালে স্বৈরাচারী ইংরেজ-সরকারের সব রকম সমালোচনাই এড়িয়ে গেছেন। এবং শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের মহানুভব ইংরেজ-প্রশস্তির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। যদিও কবিতায়ঃ

"কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন!

* * *

মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!

উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

*　　*　　*

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর॥"

—একথা রবীন্দ্রনাথ অকম্প্রকণ্ঠে উচ্চারণ করে জাতির জীবনে বন্ধনমুক্তির প্রেরণা সঞ্চার করেছেন, "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" মহাজীবনের বন্দনা করেছেন। কিন্তু এই মহৎ জীবনসত্যকে জীবনে জীবনযোগ করার ধ্রুব অভিজ্ঞানে তাঁর প্রায় সমসাময়িক প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই কর্মে এবং প্রাণের অভীক আত্মপ্রকাশে রূপান্বিত করে তুলেছিলেন। তুলেছিলেন যে তা শুধু সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর তাৎপর্যময় উক্তিতেই প্রতিভাত নয়, পরন্তু তার সমর্থনে আরও অনেক ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব দেবার সম্ভাবনার কথা কেবল বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তই নন, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থেঃ তাঁর "দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী" প্রবন্ধে। দেশের বিপ্লবী যুবকদের তিনি "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে সম্বোধন করতেন। স্বদেশী যুগে বিপ্লবী দেশ-প্রেমিকদের আস্তানা সন্ধান করে অনেক সময়ই পুলিশ বোমা, গোলাবারুদ-বন্দুক-পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে খুঁজে পেত স্বামীজীর "বর্তমান ভারত," "ভাববার কথা," "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য," " ভারতে বিবেকানন্দ," 'পত্রাবলী' প্রভৃতি। এই সব কারণেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনও ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়েছিল এক সময়। কড়া নজর ছিল পুলিশের রামকৃষ্ণ মিশনের উপর।[৬৯] ইংরেজ-পুলিশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের রাজবন্দীদের, তাঁরা বৈদান্তিক কিনা, স্বামীজীর ভক্ত কিনা—এসব প্রশ্ন করত। "পুলিস সার্চ করে বিপ্লবীদের কাছে সব জায়গায় স্বামীজীর বই পেয়েছে। এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়ীতে স্বামীজীর কোনো না কোনো বই ছিল না।"[৭০] স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতা "নাচুক তাহাতে শ্যামা"র মন্ত্রের মতো প্রভাব ছিল বিপ্লবীদের জীবনে, তাঁদের প্রত্যহ জীবনচর্যায়। আর. বি. প্রধান তাঁর "India's struggle for Swaraj" গ্রন্থে বলেছেনঃ

"Swami Vivekananda might well be called the father of modern Indian nationalism; he largely created it and also

embodied it in his own life its highest and noblest elements."[৭১] বিপ্লবী এম. এন. রায় বলেছেনঃ স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হল আধ্যাত্মিক স্বরাজ্যবাদ কারণ স্বামীজীর ডাকে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একটি গোঁড়া জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলে এবং গুপ্ত সমিতি গঠন করে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়।[৭২] Wendell Thomas দেশের সমস্ত বিপ্লবী উত্থান ও সমস্ত রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের একক উৎস হিসাবে স্বামীজীর নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে স্বামীজীর মহাদর্শই সমস্ত "Anarchist movement in Bengal and the more recent drives for 'Civil Disobedience' which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale."[৭৩] এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। "বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনি ইহার প্রধান নেতা।" এ উক্তি শ্রীঅরবিন্দের। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেনঃ সে সময় আমার প্রায় প্রত্যহই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত—"ভারতের চিন্তাই ছিল তাঁহার ধ্যানজ্ঞান"।[৭৪] "যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতেই তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়, দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।" "The Master as I Saw Him" গ্রন্থে নিবেদিতা বলেছেনঃ

"The queen of his adoration was his Motherland." "India was his day-dream, India was his nightmare."

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি সত্ত্বেও একথা সত্য যে, স্বামীজীর সমগ্র কর্মপ্রয়াস প্রধানত শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও আত্ম-উদ্বোধনমূলক ও সংগঠনাত্মক ছিল। কারণ যেন-তেন প্রকারে একটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভকে তিনি কোন বিশেষ আত্যন্তিক মূল্য দিতেন না। মানুষ আগে, মানুষের জন্যই সমাজ, রাষ্ট্র, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। তবু যেহেতু সর্ববন্ধনমুক্তিই মানবজীবনের পরম কাম্য, সেইহেতু রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নও স্বভাবতই

এসে পড়ে। তিনি বলেছেনঃ "সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই-দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।"[৭৫] বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, তিনি আত্মার অখণ্ডত্ব এবং অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর মুক্তিবোধের পরিধি সাধারণ জাগতিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অনেক ব্যাপক ও গভীর। একথাও মনে রাখতে হবে যে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আদর্শ আরও বৃহতের অভিমুখে ছিল বলে, তাঁর বিশ্বাসের ভূমি আরও স্থির ও পরিব্যাপ্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল। সমগ্র জাতির নবনির্মাণে স্বামীজী মনুষ্যত্বের সাধনাকেই অনেক বড় মূল্য দিতেন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ও সামগ্রিকরূপে যে মহাজীবনের উদ্বোধনে তিনি আজীবন সর্বসমর্পিত ছিলেন, তা হল নিত্য মুক্ত শাশ্বত দিব্য জীবন। পথের বন্ধন দূরীভূত হলে সেই মহান আলোকাভিসারেই তার পরিসমাপ্তি। পূর্ণের প্রাঙ্গণেই তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত ও জাতীয় কৃত্যের উজ্জ্বল অবসান।

"Never forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which *I am.*"[৭৬] এই "I am He"-র সাধক বিবেকানন্দের কাছে জীবনও ইহপরত্রের সন্নদ্ধ সমাহার। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক মিলিয়েই তিনি এক মহাসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনায় মগ্ন ছিলেন। সীমিত অর্থে হলেও বঙ্কিমচন্দ্রও সেই মহাসঙ্গীতের সাধক, সেই মহামানবতারই উপাসক ছিলেন এবং বাঙালীর চিত্তে বাঙালীর চেতনায় মনুষ্য ধর্মের জাগরণের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন। তাই দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বঙ্কিম ও স্বামীজীর সমাজচেতনাঃ বস্তুত সমাজকেই দুজনে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। সমাজসংহতি দুজনেরই কাম্য। বঙ্কিম বলেছেনঃ "সমাজকে ভক্তি করিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে মানুষের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও

রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা।" বঙ্কিম আরও বলেছেনঃ যদি সমাজ ধ্বংসে ধর্ম ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গল ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ বশ করিতে হইবে। "বর্তমান ভারত"-এর শেষে স্বামীজীও এই সমাজকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেনঃ "ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।" এই সমাজের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাও স্বীকার করেছেন বঙ্কিম এবং প্রতিকূল অবস্থা হলে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা ও স্বদেশরক্ষার কাজ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলেও ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতির কোন বিরোধ নেই বলে আক্রমণকারীকেও প্রীতি জানাতে বলেছেন। এইখানেই স্বামীজীর সঙ্গে পার্থক্য। স্বামীজী এসব ক্ষেত্রে আপসহীন। তিনি বললেনঃ "আমি ধর্মপ্রচারক নই, আমার সত্যকার স্থান হিমালয়ে। কিন্তু আমি সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। এবং এই সংগ্রাম আমার দেশব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।" বললেনঃ "যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম?...আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না', 'আমায় ছুঁয়ো না'।"[৭৭] বললেনঃ "আমার দেশের একটি কুকুরও যতক্ষণ অনাহারে থাকিবে, ততক্ষণ আমার সমগ্র ধর্মের কর্তব্য হইবে তাহাকে খাইতে দেওয়া।" "ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখন্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"[৭৮] "দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না। সেক্ষেত্রে সংগ্রামই ভালো।" এরকম আরও অজস্র উক্তি উদ্ধার করে দেখানো যায় যে, স্বামীজী আজীবনই সমস্ত রকম সংগ্রামের সপক্ষে। "He was a born fighter." প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, একাধারে স্বদেশপ্রেম ও ইংরেজপ্রীতি—এই বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ ব্যাধি। একমাত্র বিবেকানন্দ ছাড়া প্রায় সেযুগের সমস্ত জ্যেষ্ঠদের চরিত্রেই অল্পাধিক এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে।

জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজের সঙ্গে বিশ্বমানব-কল্যাণের আদর্শ যুক্ত করে একটি সার্বিক সমন্বয় সম্পাদন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ তাঁর "Practical Vedanta"-কে ভিত্তি করে বিশ্বমানবতার অভেদত্ব প্রমাণ করে স্বদেশের ও স্বজাতির সর্বাত্মক মঙ্গল-

চিন্তায় সমর্পিত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর আদর্শ অনেক বেশী দর্শনভিত্তিক, ব্যাপক এবং সর্বজনগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাব ও আদর্শকে একটু গভীরভাবে গ্রহণ করেও যুগ ও সনাতনকে (অর্থাৎ চিরন্তন মানবিক সংস্কারকে) একই সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসেও এই ভোগ ও মোক্ষ বা যুগ ও সনাতনের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। বলা যায়, ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদ ও ভারতীয় ব্রহ্মবাদ এই দুয়ের একটি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন তিনি। বঙ্কিম প্রত্যহজীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার না করেও প্রত্যহকে এক বৃহতের অনুশাসনে, প্রত্যহের অতীত এক মহত্তম ধ্রুব আদর্শের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের হিতবাদ বা অনুশীলনধর্ম বেদান্তের মতো মহৎ ব্যাপ্ত কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই সার্বিক কোন সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি। অবশ্য এই পরা অপরা, এই ভোগ ও মোক্ষের দ্বন্দ্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে অপরূপ রূপলাবণ্যে এবং ভাবদীপ্ত বাস্তবের ঐশ্বর্যে পূর্ণশ্রী দান করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টি কিন্তু প্রসারিত ছিল না; হিন্দুত্বের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বলা কতটা সঙ্গত হবে জানি না, তবে বঙ্কিমের ধর্মনীতি, রাজনীতি, এক কথায় তাঁর জীবনদর্শন প্রধানত হিন্দুধর্ম প্রভাবিত ছিল। দেশটা যে শুধুমাত্র হিন্দুর নয়, পরন্তু মুসলমান, খ্রীষ্টানও যে দেশেরই মানুষ—এ সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকলেও তাঁর কর্মপ্রয়াসে বা চিন্তাভাবনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। অথচ নবজাগরণের সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নেই। এমন কি আনন্দমঠের ভবানী মন্দির পরিকল্পনায় মুসলমানদের প্রবেশাধিকার নেই। "এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?"[৭৯] যে আনন্দমঠ দেশে স্বদেশপ্রেমের বীজরূপে চিহ্নিত —সেই গ্রন্থ থেকেই উপরোক্ত উদ্ধৃতি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রয়োজন বঙ্কিমও বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে সংগ্রামের ভাষাও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিতঃ "যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে।...যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্মানুগত।...সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের. দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা নাপোলেয়ন পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে

অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও ধর্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম।"[৮০] বঙ্কিমরচনাবলী থেকে এরকম আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া চলে যাতে স্বভাবতই মনে হয় বঙ্কিম প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রয়োজন বুঝতেন এবং সংগ্রামের পথও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু এদেশের যথার্থ শত্রু কে—ইংরেজ, না মুসলমান—এ নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। এদেশের স্বৈরাচারী রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের মতোই সাধারণ দরিদ্র দুঃস্থ চাষী মজুর কুলি মেথর মুসলমান জনতারও যে কোন যোগ নেই, এ সত্য তিনি সব সময় উপলব্ধি করতে পারেননি। পরদেশ-আক্রমণকারী তাতার-তুর্কী-মোগল-পাঠান নবাব-বাদশাদের হিংস্রতা ও অমানবিকতা দেখেই বোধ হয়, দেশের সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরই তাঁর অপ্রেম প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু এদেশের মুসলমানেরা এদেশেরই মানুষ। তারা প্রায় কেউই ইরান ইরাক বা আরব দেশ থেকে আসেনি। যে দু-দশজন এসেছিল তারাও এখন এদেশেরই মানুষ। অথচ আশ্চর্য রামা কৈবর্তের সঙ্গে তিনি হাসিম শেখেরও দুঃখ-দুর্দশায় সমব্যথী ছিলেন (বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধ)। এই কারণেই সমগ্রভাবে কর্মে না হলেও, তত্ত্বের দিক থেকে বঙ্কিমকে অনেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। হিন্দুর ঐতিহ্যবোধে সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ছিলেন বলেই তিনি মূলত রক্ষণশীল ছিলেন এবং অনেক যুগোপযোগী সংস্কার-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা তো ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ছাড়াও নব্য বাংলার বহু সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্যাসাগর যদিও নানা প্রগতি-আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন, প্রত্যহজীবনচর্যায় সম্প্রদায়-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ দুঃখী আর্ত মানুষের জন্য যদিও তাঁর হৃদয়ের করুণা-ধারার অমল উৎস ছিল অবারিত, অবিরত এবং অবিশ্রান্ত, তথাপি বৃহত্তর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নানা ক্ষেত্রে দেখা যায় মূলত হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই তাঁর প্রায় অধিকাংশ কল্যাণকর্ম নিয়োজিত। "হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্ড মিউচুয়াল এন্যুইটি ফান্ড" নামক অর্থনৈতিক উন্নতিবিধায়ক সংগঠন হিন্দুদের জন্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে মুসলমান ছাত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জাতিভেদ প্রসঙ্গেও কোথাও কোথাও তাঁর অনুদারতার পরিচয় রয়ে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ গুহ সম্পাদিত "Unpublished letters of Vidyasagar" গ্রন্থের একটি চিঠি থেকে জানা যায় সংস্কৃত কলেজে একটি সোনার বেনে ছাত্রকে তিনি প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেননি। অথচ এই বিদ্যাসাগরই এক কালে "সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার

অধিকার দান করেন।" কারণ "তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না।"[৮১] শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি-ভোজের ব্যবস্থা ছিল। অথচ এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর উদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গির কোন তুলনাই হয় না। 'জীবশিব' তত্ত্বে বিশ্বাসী স্বামীজী শুধুমাত্র হিন্দুদের বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণীই নয়, মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। শুধু যে গুরুই ইসলাম ধর্ম সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাই নয়, শিষ্যও তাঁর সমগ্র জাতিগঠনের কর্মযোজনায় মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমভাবে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর কাছে হিন্দু কোন বিশেষ ধর্মীয় শব্দ নয়।[৮২] এই দেশে যারা বসবাস করে আসছে পুরুষানুক্রমে, এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি উদার সহিষ্ণু সার্বজনিক বোধ আছে, যারা মানবতার উপাসনা করে তারাই স্বামীজীর মতে হিন্দু বা ভারতীয়। স্বামীজীর ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের মিলিত দেশ। নববেদান্ত সর্ব-মানবের কল্যাণে ব্রতী। মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর পত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "কর্ম্মপরিণত বেদান্ত (practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে কখন পুষ্টিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে...যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী।...আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম-ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।...আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া...মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।"[৮৩] আর খ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তো স্বামীজীর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। "ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট" প্রবন্ধ[৮৪] শুধু নয়, আরও নানা জায়গায় তিনি খ্রীষ্টের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য জানিয়েছেন। আজও রামকৃষ্ণ মিশনে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

মুসলমানকেও স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসে দীক্ষার অনুমোদন করে গেছেন। বর্তমানেও রামকৃষ্ণ মিশনে এমন সন্ন্যাসী আছেন পূর্বাশ্রমে যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে সব ধর্মের লোক নিয়েই যে ভারতবর্ষ তাই নয়, তিনি সমস্ত ধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিতরই ভবিষ্যৎ মহাভারতের উন্নতি ও মুক্তি—একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। জোর করে কোনও নিয়ম চাপিয়ে বা একত্বের রোলার চালিয়ে না দিয়ে শিক্ষার সাহায্যে এবং যথার্থ উদার ধর্মচেতনার উদ্বোধনে মানুষের স্বাভাবিক উত্তরণের মাধ্যমে (growth from within) স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন চেয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদে অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী এক চিঠিতে লেখেন (১০-১০-১৮৯৭) "মুসলমান বালকও লইতে হইবে বইকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না।...হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাহাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে।" ধর্মের যে মৌল সর্বজনীন ভাবধারা শুধুমাত্র তাই শিখিয়ে মানুষকে বৃহৎ জীবনের অভিমুখে এবং পরিণামে যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব—এই ছিল স্বামীজীর আদর্শ জীবনপন্থা। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মহামিলনেই শক্তিশালী বীর্যবান সর্বসৌভাগ্যদায়ী মহাভারতের জন্ম সম্ভব। একথাও এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, কর্ম ও কথায় স্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের মতো শুধুমাত্র বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই আরাধ্যরূপে তাঁর মানসলোকে অধিষ্ঠিতা। যা কিছু কর্মপ্রয়াস সবই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত অখণ্ড এক মহা ভারতবর্ষকে নিয়ে। তিনি শুধু বঙ্গবাসীর পরিত্রাতা নন, তিনি একাধারে ভারতভাগ্যবিধাতা এবং বিশ্ব-জন-গণ-ঐক্যবিধায়কও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একথাও যে স্বামীজীর এই সর্বধর্মপ্রীতি, বিশেষ করে মুসলমান সমাজ ও ধর্মের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক সহানুভূতি ও অকৃত্রিম ভালবাসা, তা কিন্তু একালের পার্টিসর্বস্ব হৃদয়হীন সুবিধাবাদী রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মতো কোন আশু রাজনৈতিক বা অন্য কোন স্বার্থপর ফলশ্রুতির প্রত্যাশায় বা কোন বিশেষ মতলব হাসিল করার প্রয়োজনে নয়, পরন্তু এক মহান বিশ্বৈক্য-বোধের পরম আকর্ষণে এবং পরিপূর্ণ জীবন-অন্বেষার এক অনন্য পরাপ্রাপ্তিতে তার অমল উদ্বোধন।

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শঃ মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সকল বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতাই জীবনাদর্শ বলে বঙ্কিম মনে করতেন। প্রকৃতিকে স্বীকার করেই তাঁর প্রকৃতিবাদী ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলনধর্ম। দেহ-মন-প্রাণের

সমস্ত বৃত্তির সমানুপাতিক অনুসরণের মধ্যে যে অন্তিমে পূর্ণতা আসেই—তাকেই ঈশ্বর বলা যায়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরত্ব মানুষের জীবনের যতটুকু অনুগত ততটুকুই যথেষ্ট। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য প্রভৃতি অধ্যাপক ও পুরোহিত-নির্দিষ্ট ধর্মবিধিকে বঙ্কিম অস্বীকার করেছেন। এখানে স্বামীজীর সঙ্গে বহিরঙ্গে কিছু মিল আছে। স্বামীজীও ধর্মের এই কুসংস্কার, অন্ধ আচারবিচারকে নিন্দা করেছেন। স্বামীজীও বহুক্ষেত্রে pragmatic. "অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে",[৮৫] আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করতে হবে। বঙ্কিম যখন সমাজহিতসাধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবধর্ম বলেন তা মেনে নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু কেন যে মানুষ লোকহিতসাধনে উৎসাহ-বোধ করবে তার কোন সঙ্গত কারণ তিনি উল্লেখ করেননি; তার পশ্চাতে কোন দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত করতে পারেননি। স্বামীজীর Practical Vedanta এদিক থেকে অনেক স্থির দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া বঙ্কিম বৃহত্তর সমাজকল্যাণবোধে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। মানব-প্রকৃতিকে মেনে নিয়েই প্রকৃতিজয়ের পথ সন্ধান করেছেনঃ এদিক থেকে এ ধর্ম অবশ্যই সর্বজন-চিত্তমুগ্ধকর। কিন্তু সমাজে অধিকারভেদের প্রশ্নও তো থেকে যায়। সকলের জন্য একই পথের নির্দেশ দান মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা। তাছাড়া এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে মুনি-ঋষি সাধু-সন্তদের তপস্যালব্ধ সব সত্যোপলব্ধিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার এবং বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠার উৎসাহে রামমোহন যে ভুল করেছিলেন বঙ্কিমও এখানে সেই একই ভুল করলেন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নাগরিকদের সামনে রেখে তিনি যে অনুশীলনধর্ম স্থাপন করেছিলেন তা কোনদিনই সমগ্র জাতির কাছে গ্রাহ্য হতে পারেনি। পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি কথা ইংরেজিশিক্ষিত নগর-বাসীদের পছন্দ নয় বলে বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্ব থেকে এসব প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত সরলীকরণের ফলে যুক্তির দিক থেকে গ্রাহ্য একটি ধর্মমত হলেও এতে মানুষের ভিতরের আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হয় না। অবশ্য সেজন্য অনুশীলনধর্ম সৃষ্টও হয়নি। যে উদ্দেশ্যে বঙ্কিম

এই নব ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁর সেই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উন্নাসিক আত্ম-ভ্রষ্ট, নাস্তিক্যের নৌতির কবলে পতিত, পরধর্মলোলুপ তরুণ নব্যবঙ্গকে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্রত কিছু পরিমাণে সফল হয়েছিল। জাতিগতভাবে যেমন প্রত্যেক জাতির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। যত ভালই হোক, যত যুক্তিসঙ্গত এবং মানবপ্রকৃতির অনুমোদিত, কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে সকলের জন্য একমাত্র গ্রাহ্য বলে ঘোষণা করা ভুল। স্বামীজী কখনও এ ভুল করেননি। জোর করে স্বামীজী কারও উপরে কিছু চাপাতে চাইতেন না। নিজে সন্ন্যাসী হয়েও তাই বললেনঃ "আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর অপেক্ষা যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন।"[৮৬] দেশের অধঃ-পতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করে আরও বললেনঃ "যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!"[৮৭]

বঙ্কিম ও স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাঃ মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার উদ্বোধনকেই স্বামীজী যেহেতু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন, সেইহেতু শিক্ষার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও তিনি সমান সচেতন ছিলেন। আধুনিককালে বেঁচে থাকতে হলে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পবিদ্যা সবই আয়ত্ত করা দরকার। কারণ শিল্পোদ্যোগ ছাড়া জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নত করা সম্ভব নয়—একথা তিনি বুঝতেন। এমন কি সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত শিল্পশিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন। শিল্পের নানা জ্ঞানে শিক্ষিত, যন্ত্রশিল্পে নিপুণ বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসীরাই যুবশক্তিকে যন্ত্রশিল্পে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে পারেন বলে স্বামীজী মনে করতেন। তাঁরাই দেশের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন। তাহলেই দেশের যুবকেরা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। এ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা ও বর্তমান ভারত" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।[৮৮] ভারতকে এযুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে কারিগরি বিদ্যার (technical education) একান্ত প্রয়োজন বলে স্বামীজী মনে করতেন। এমন কি মিশনের উদ্দেশ্যের মধ্যে "মানুষের সাংসারিক উন্নতির জন্য" শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মঠের প্রাঙ্গণে একটি বৈদিক কলেজের সঙ্গে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনার কথা তিনি বার বার বলেছেন। "আমাদের চাই কি জানিস?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা)...যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"[৮৯] কেরানি-বানানো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্বামীজীর কোনদিনই আস্থা ছিল না। বিদেশী সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক কলেজী শিক্ষাকে তিনি শিক্ষা বলেই মনে করতেন না। "তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথা-মুণ্ড শিখেছিস? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ ক'রে মাথার ভেতরে পুরে পাশ ক'রে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরী—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হ'ল, আর দেশেরই বা কি হ'ল?. একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়।"[৯০] --উপরোক্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সত্যিকারের মানুষ গড়ার জন্য একটি সমন্বয়ী শিক্ষাদর্শই স্বামীজীর কাম্য ছিল। একদিকে অন্তরের ঐশ্বর্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ এবং অন্যদিকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ-সমৃদ্ধ ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক জ্ঞানের অধিকারে অধিকারী একজন "International man", "a citizen of the world" গড়ে উঠতে পারে এরকম শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলন করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী।

দেশের শিক্ষা সম্পর্কে এমন সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করলেও পূর্বসূরী হিসাবে বঙ্কিমের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্যগুলিও নানা দিক থেকে স্মরণীয়। যেহেতু তিনিও পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপাসক, সেইহেতু দুজনের চিন্তাভাবনার এত সাদৃশ্য। "যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ।" কিংবা "কলেজে ছেলে পাঠাইলেই ছেলে মানুষ হয় না, এবং কতকগুলি বই পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।" কিংবা "যে লেখাপড়া জানে না—তাহাকে মূর্খ বলিও না; আর যে লেখাপড়া করিয়াছে তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে।" এসব উক্তির সঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। "জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ এবং কার্যকারিণী বা চিত্ত-

রঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ"—সমস্ত অনর্থের মূল বলে বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন। তর্ককুশল বাগ্মী, সুলেখক বা বড় ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হলেই যে শিক্ষার শেষ চরিতার্থতা সম্পাদিত হল, বঙ্কিমচন্দ্র স্বামীজীর মতোই তা মনে করতেন না। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মানুষের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য অনুভব ও ভালবাসার উন্মেষঃ এই সবই সত্যিকার শিক্ষার ফলশ্রুতি। এই একই কারণে দুজনেই তাঁরা সমকালীন ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারেননি। অতিরিক্ত পুঁথিপড়া বিদ্যার দিকে নজর দিয়ে মুখস্থ করে পাশ করার দিকে জোর দিয়ে জাতি স্বাস্থ্যহীন, উৎসাহহীন ও নীতিহীন হয়ে পড়ে—বঙ্কিমচন্দ্রের এই observation স্বামীজীর মতোই অভ্রান্ত। কিন্তু "ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আরো নিকৃষ্ট ছিল"—বঙ্কিমের এই মতবাদ স্বামীজী কখনও স্বীকার করেননি। স্বামীজী চেয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল সবই আমাদের শিখতে হবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই নিজেদের সংস্কৃতিসভ্যতাকে অবহেলা বা অস্বীকার করে নয়। কিছুতেই পায়ের নীচে আমাদের স্বভূমি এবং স্বধর্ম ত্যাগ করা চলবে নাঃ

"I do not want my home to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuge to be blown off my feet by any."

গান্ধীজীর এই সমন্বয়ী জীবনদর্শন আসলে স্বামীজীরই উত্তরাধিকার। এমন কি স্বামীজীর বাক্যাবলীর সঙ্গে আক্ষরিক মিল রয়েছে এই উদ্ধৃতির (উদ্বোধন পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য)।

দয়ানন্দ সরস্বতী—আর্যসমাজ—অন্যান্যঃ আগেই বলেছি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গতভাবে অনেকেই সেদিন সেই দেশব্যাপী ভাববিপ্লবে আত্মশোধন এবং আত্মসাধন যজ্ঞে সমবেত হয়েছিলেন। সেই ভয়ানক স্বধর্মধ্বংসী ভাববন্যার প্রতিরোধ হিসাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ ও থিওজফিক্যাল সোসাইটির ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের কথা স্বভাবতই মনে আসে। দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) আর্যসমাজের বিশিষ্ট একটি ভূমিকা রয়েছে জাতির আত্মনিষ্ঠ হবার সংগ্রামের ইতিবৃত্তে। বেদের ধর্মকেই তাঁরা প্রকৃত ধর্ম মনে করতেন। বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের সর্বাত্মক কল্যাণ নিহিত। পৌরাণিক ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান, বিশেষ করে প্রতিমাপূজা ও হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে তাঁরা কুসংস্কার বলে মনে করতেন। এদিক থেকে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে মিল আছে। তবে আর্যসমাজ অদ্বৈতবাদ বা একতত্ত্ববাদ স্বীকার করতেন না। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা। কিছু

কিছু গোঁড়ামি থাকলেও, তাঁদের ধর্মগ্রন্থ 'সত্যার্থপ্রকাশে' যে আচরণীয় দর্শনীতির উল্লেখ আছে মূলত সেগুলি কিন্তু উজ্জ্বল মানবিকতায় এবং আদর্শ চেতনায় ভাস্বর। সত্য গ্রহণ, অসত্য বর্জন, প্রীতির প্রসার ও ন্যায়ধর্মের সমর্থন, সমগ্র মানবজাতির দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক হিতসাধন, অজ্ঞানের দূরীকরণ ও জ্ঞানের প্রসার, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণবোধের সঙ্গে আত্মস্বার্থ এক করে দেখার প্রজ্ঞাদৃষ্টির অনুশীলন, জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি, জাতির সর্বাত্মক কল্যাণ ও জাতীয় সংহতি সাধনা এই সবই বৃহৎ জীবনের অভিমুখী এবং মহৎ মঙ্গলবোধে সমুত্তীর্ণ। এদিক থেকে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে আর্যসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের নামও এখানে উল্লেখ্য। কুসংস্কার ত্যাগ, আন্তর্জাতিকতা-বোধ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির প্রাণে নতুন প্রাণবেগের সঞ্চার ছিল এ সমাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠ থেকে বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারেনি।

ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজ : নবজাগৃতি-আন্দোলনে ডিরোজিও, হিন্দু কলেজ এবং ডিরোজিও শিষ্য-অনুরাগীদেরও একটি শ্লাঘ্য ভূমিকা ছিল। উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেম, প্রবল জাতীয়তাবাদের প্রথম সূচনা ডিরোজিওর মাধ্যমেই ঘটে। স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করার গৌরবও সশিষ্য ডিরোজিও-গোষ্ঠীর। সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যাচর্চা, মানসপ্রকর্ষ ও মননশীলতার প্রসারেও এঁদের অসামান্য দান। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধান এঁদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এত সব মানবিক গুণের পরিচর্যা করেও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির, বিশেষ করে ইউরোপীয় জীবনচর্যার প্রতি এঁদের অন্ধ অনুরাগ ও আনুগত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের সমস্ত প্রাচীন আচারবিচার, দিনচর্যার প্রতি নিদারুণ অবহেলা, অবজ্ঞা এবং অকারণ আক্রমণ নবজাগরণ-আন্দোলনে এঁদের কোন স্থায়ী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। কারণ অতীতকে অস্বীকার করে ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে অবশ্য অনেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তবু নবজীবনরচনার দায়িত্বে তাঁদের ভূমিকা অস্পষ্টই থেকে গেছে। স্বাধীনতার সপক্ষে এবং কুসংস্কারভঙ্গের নাম করে এঁদের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচার ও অনেক সময় বালসুলভ আচার-আচরণ (অন্যকে অকারণ আঘাত করা প্রভৃতি) বহুজনের চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণকে এঁরা কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন বলে মনে করতেন। পরিণত যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় বলে এই সব আচরণকে সমর্থন করা যায় না। তবু একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, 'Parthenon'

ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ডিরোজিওই প্রথম ভারতজননীকে নিয়ে কবিতা লেখেন। ডিরোজিও-অনুবর্তিগণ অবশ্য সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বিধবাদের সামাজিক অবস্থা, জাতিভেদ প্রভৃতি দেশের তৎকালীন সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নিজেদের সমিতি "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"-এ এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। প্রথম যৌবনে নানা যৌবনচাঞ্চল্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে ডিরোজিও-সমর্থকদের অনেকেই দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে অংশীদার ছিলেন। কেউ কেউ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যও এঁদের অনেকের দানে সমৃদ্ধ। ডিরোজিও-অনুগামীদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দে, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার নবজাগরণ-আন্দোলনে এঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল; খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত বিদ্রোহী কৃষ্ণমোহনেরও বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান সামান্য নয়। ব্ল্যাক অ্যাক্টস-এর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে রামগোপাল ঘোষের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র সংস্কার ও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি একজন আদি পুরোহিত। অপর শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল"-এ কথ্য ভাষার ব্যবহার এবং তাঁর অন্যান্য রচনায় যে জীবনজিজ্ঞাসা তা আমাদের আত্মমুক্তি-আন্দোলনে পাথেয় সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরী ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি/অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের অনেকেই ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য বা অনুগামী।

প্যারীচাঁদ মিত্র-রাধানাথ শিকদারঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের সমস্ত সাহিত্যকৃতির মৌল উৎস হল স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণচিন্তা। "মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়" (১৮৫৯) মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রথম সামাজিক ঘোষণা। ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার, জনহিতকর নানা কর্মানুষ্ঠান ও নারীমুক্তি-আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ছিল অগ্রগামীর ভূমিকা। প্যারীচাঁদ তাঁর সাহিত্যকর্মে এবং জীবনচর্যায়ও নানা দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী ছিলেন। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যুক্তসম্পাদনায় প্রকাশিত "মাসিক পত্র" দেশের প্রগতি-আন্দোলনে একটি যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমকালীন সমস্ত সমাজসংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ। আদর্শ ভারতীয় নারীর পরিকল্পনা প্যারীচাঁদের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়।

শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রগতিবাদী হয়েও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্য—এই সব নিয়েই যে নারীর পূর্ণতা সে সম্পর্কে প্যারীচাঁদ সচেতন ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অক্ষম অনুকরণে আমাদের তৎকালীন জাতীয় চরিত্রের নানা হাস্যকর অসঙ্গতি, আমাদের হীনম্মন্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃত জীবনাচরণ সম্পর্কেও ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। দেশের মানুষের কল্যাণচিন্তা, স্বাজাত্যবোধ ও সেবাধর্ম, কর্মে পাশ্চাত্য রজোগুণের প্রকাশ, তার সঙ্গে আমাদের মহৎ মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের চিরন্তন উত্তরাধিকার অর্জন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সজ্ঞানতা এই সব নিয়েই যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সম্ভব—বিবেকানন্দের আগে প্যারীচাঁদের সাহিত্যে ও কর্মে তারই অস্ফুট প্রতিশ্রুতিঃ একথা বলেছেন অনেক সমালোচক। "প্যারীচাঁদের 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'অভেদী'তে যে আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান মেলে, বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী তার পূর্ণাঙ্গ রূপ"—এও সমালোচকের উক্তি।

ডিরোজিও-শিষ্য রাধানাথ শিকদারের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা এবং গবেষণা বহু দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারণার পথে দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁর অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

দেবেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দঃ ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রামমোহনের নাম ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখিত হলেও, ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ স্থপতি এবং ভাস্কর দুই-ই ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। নব্য হিন্দুধর্মের নবজাগ্রত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক রূপসম্মত এই দেশীয় ধর্মসভা ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণে সেদিন পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে আবিষ্ট দেশের বিপথগামী যুবশক্তি আবার স্বধর্মে ও স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতির আঙিনায় ফিরে এসেছিল। দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর ভক্তিবিনম্র শুদ্ধ চিত্ত ও উন্নত চারিত্রশক্তি নবজাত ব্রাহ্মসমাজের পশ্চাতে আলোকবর্তিকার মতো প্রোজ্জ্বল ছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেনঃ দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথ শাস্ত্রী-বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নানা বিতর্ক ও সংশয় থাকলেও সমসাময়িক সমাজজীবনে তাঁরা যে এক নির্লোভ নীতিপরায়ণতার বিশুদ্ধি সঞ্চার করেছিলেন তার সার্থকতা অনস্বীকার্য।[৯১]

দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়বোধ, সাধুত্ব, নীতিপরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠা অতুলন। এই মহৎ আদর্শদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অমোঘ আকর্ষণেই অধ্যাত্মবেদনায় ব্যাকুল যুবক নরেন্দ্রনাথ একদা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ঈশ্বরজিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রার্থনায়।

কালেও বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সশিষ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এই শুদ্ধাচারনিষ্ঠ আদর্শবাদী ভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে। যে ইহ-পর-সমন্বয়সাধনা ভারতবর্ষের আদর্শ ও পরম অন্বিষ্ট, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে, তাঁর কর্মে ও কথায়, তা অনেকটা সত্য হয়ে উঠেছিল। সত্যনিষ্ঠা, সত্যের অনুসন্ধান দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পরম আকূতি। সেই অবিশ্বাস, পরানুকরণ, হীনম্মন্যতা ও স্বাধীনতাহীনতার যুগে যখন চারিদিকে সব শুধু ভাঙনের পথে, বিনষ্টির ঝড় ও অন্ধকার, দেবেন্দ্রনাথ জাতির শিয়রে একটি শাশ্বত ধ্রুব নক্ষত্রের মতো কল্যাণ-আদর্শের প্রদীপ জেলে কোজাগর জেগেছিলেন। একদিকে হিন্দুধর্মের অন্ধ প্রথানুগত্য ও দেশাচার, অন্যদিকে রামমোহন প্রবর্তিত নির্বাণসর্বস্ব অখণ্ড অদ্বৈতবাদ, এই দুই পথই পরিত্যাগ করে তিনি ভক্তি-ধর্মের আশ্রয়ে "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি" লাভ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ-জীবন-সভ্যতা—সবই যে ধর্মাশ্রিত, বিবেকানন্দের এই সত্যোপলব্ধি তাঁর চেতনায়ও ধরা পড়েছিল। ধরা পড়েছিল বলেই পরধর্মলুব্ধ দেশের যুবশক্তিকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে আসলে তিনি জাতির বুকে স্বদেশানুরাগ, ঐতিহ্য ও স্বদেশপ্রীতির অংকুর-উদ্গমে সহায়তা করেছিলেন। রামমোহনের মতো তাই দেবেন্দ্রনাথকেও খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে (মসীযুদ্ধে) অবতীর্ণ হতে হয়েছিল আমাদের নামে অকারণ কুৎসা ও নিন্দা প্রচারকে স্তব্ধ করে দিতে। যুবশক্তির মধ্যে শুদ্ধভাবের সঞ্চার, স্বজাতি ও স্বদেশকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে তাঁর আত্মনিবেদন এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠা (১৮৩৯, ১৮৪৩ খ্রীঃ)। ঐ স্বধর্ম রক্ষার প্রয়োজনেই তিনি সনাতনপন্থী রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যুক্তভাবে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ডাফ সাহেবের "India and India's mission" গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে মিশনারীদের ভারত সম্পর্কে অপপ্রচার ও ভারতবিদ্বেষের কথা যে তুলে ধরেছিলেন দেশের মানুষের চোখের সামনে, তাও দেশের সমূহ বিনষ্টির সম্ভাবনায় বিচলিত হয়েই। সেকালের স্বধর্মপ্রীতি আসলে স্বজাতিপ্রীতিরই নামান্তর। বিদেশী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর উদ্যত খড়্গের নীচে দাঁড়িয়ে স্বধর্মনিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন আড়ালে থেকেই স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রীতির বীজ উপ্ত করতে হয়েছিল সেদিনকার পরাধীন *ভারতের নেতাদের বহু দিন পর্যন্ত।* দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসু সেই পথেরই পথিকৃৎ।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এবং মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতি দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাত্যাভিমান ও স্বধর্ম-স্বদেশপ্রীতিরই পরিচয়। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, কোন এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ইংরেজিতে লেখা পারিবারিক চিঠি তিনি

ফেরত দিয়েছিলেন। এবং বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে এই স্বধর্ম-রক্ষা ও স্বজাতির কল্যাণপ্রয়াসেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন সকল দল ও মতের সঙ্গে এবং তত্ত্ববোধিনীর সারস্বত সম্মেলনে ডাক দিয়েছিলেন দল মত নির্বিশেষে সকলকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ইহজীবনেও দেশ শক্তি ও সম্পদে বড় হয়ে উঠুক দেবেন্দ্রনাথ তা বরাবরই চেয়েছেন। এসব সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজ শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশকে সমন্বিত মহাজীবনের অভিমুখে পথ চলার নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্রাহ্মধর্ম সমগ্র দেশ ও জাতির কথা ভুলে শুধুমাত্র নব্যশিক্ষিত মুষ্টিমেয় নগরবাসীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তাই এই নবধর্ম দেশের দুঃখী দুঃস্থ অশিক্ষিত ইতর সাধারণকে সামান্যতম আশ্রয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রামমোহনের মতো অসহিষ্ণু ভাষায় আক্রমণ না করলেও হিন্দুর পৌত্তলিকতা, বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি দ্বৈত সাধনার পথ, হিন্দুর পূজা-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য লোকাচার প্রভৃতি কিছুই দেবেন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। অথচ জাতির নিজস্ব ইতিহাসের ধারায় যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যে নিয়ম-নীতি-ধর্মাচার, তার সব কিছু অস্বীকার করে, যত সুন্দর ও সার্থকই মনে হোক, নতুন কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এবং সংস্কৃতির মৌল লক্ষণই যে "unity in diversity" এবং অসীম সহনশীলতা ও সমন্বয়—তা অস্বীকার করেই ব্রাহ্মধর্মের নেতারা ভুল করলেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সমাজ ও জাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির কথা ভেবেই তাঁরা ব্রাহ্মধর্মনামক অজস্র উজ্জ্বল স্বর্ণখচিত, বহুবর্ণশোভিত, মোলায়েম, মসৃণ, স্পর্শসুখকর একটি অতিশয় সুদৃশ্য পরিচ্ছদও তৈরী করেছিলেন। নানা দিক-দেশ থেকে সংগৃহীত শিল্পকর্মে সে অপরূপ পোশাকের তুলনা মেলে না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও প্রকৃতি, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও জীবনচর্যার পটভূমি নির্বিশেষে সমগ্র জাতির সকলকেই এই নয়নাভিরাম পোশাকটি পরাতে গিয়েই অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় নেমে এল। একটি পোশাক—তা যত সুন্দরই হোক, যত নিখুঁত, সকলে কখনও পরতে পারে না। জোর করে পরাতে গেলে ছিঁড়ে যায়। ব্রাহ্মধর্মের সেই অবস্থাই হয়েছিল। সকল মানুষকে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন একই নবধর্মের অনুশাসনে আনতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। একেশ্বরবাদের মহিমাকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করি না। কিন্তু জাতির সমস্ত ঐতিহ্যপরম্পরাকে অস্বীকার করে একেশ্বরবাদের আধুনিক রূপসম্মত এই ধর্ম জোর করে সকলের উপর চাপাতে গিয়েই মুশকিল হল। অথচ বিবেকানন্দের Practical Vedanta জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আশ্রয় দিল। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী বললেন যে, তিনি এমন এক

মহান ধর্মের প্রতিনিধি, যে ধর্ম অন্য সব ধর্মকে কেবলমাত্র সম মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে না, বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতেই দেখে না, পরন্তু সমস্ত ধর্মমতকে পরম সত্যে পৌঁছাবার এক একটি পথ বলে বিশ্বাস করে।[৯২] এই উদার সার্বভৌম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই দেশ জাতি ও বিশ্বের সহজ সমীকরণ করা সম্ভব হয়েছিল স্বামীজীর পক্ষে, এবং একমাত্র স্বামীজীর পক্ষেই। শুধু বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মকেই যে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন তা নয়, স্বামীজী হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন পথ ও মতের মধ্যেও একটি সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করে সমস্ত বহির্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছেনঃ যেমন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত; তেমনি কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—সবই আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পথ। বিভিন্ন ব্যক্তির বাসনালোকের ও সংস্কারের তারতম্যানুসারে তাদের বিশেষ মানসপ্রবণতায় তারা ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব, আউল-বাউল সম্পর্কেও ঐ একই কথা। শুধু ধর্ম ও দর্শন নয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কেও স্বামীজীর এই উদার সমন্বয়ী অভিমতের কথা স্মরণ করেই নিবেদিতা বললেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয়, সমন্বয়; বিশেষ কোন উপাসনা মন্দির নয়, অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয়।"[৯৩] ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়; কিন্তু সে ধর্মমত গণসমর্থনের অভাবে অতঃপর নিজেই ইতিহাস হয়ে সময়ের প্রত্নশালার অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, অক্ষয়কুমারের সহযোগিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে নব্য 'ব্রাহ্মধর্ম' সঙ্কলন করলেন এবং তাতে যে সমন্বয়চিন্তা জাতির সম্মুখে তুলে ধরা হল সে সমন্বয় বাইরে থেকে আমদানি করা আরোপিত সমন্বয়, জাতীয় চেতনার গভীর থেকে (within) উৎসারিত সর্বগ্রাহ্য জীবনসমন্বয় সেখানে নেই। সেখানে যুক্তি আছে, নিষ্ঠা আছে, জ্ঞান আছে, অধ্যবসায় আছে, কিন্তু নেই শুধু বড় হৃদয়ের, মহৎ অনুভবের জীবন্ত সংযোগ, যাতে সব সোনা হয়ে যেতে পারে। বাইরে থেকে, বিভিন্ন ধর্ম থেকে আহৃত উৎকলিত মন্ত্রগুচ্ছ সেখানে সঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু ভিতরের কোন মহৎ প্রেরণার উৎস থেকে তা জীবনমন্ত্র হয়ে ওঠেনি। কারণ বিভিন্ন ধর্মের একত্রীকরণ বা বিভিন্ন ধর্মমতের মৌল সূত্রের সারাংশের উৎকলনের নাম ধর্মসমন্বয় নয়।

"ঈশ্বর অশেষ শক্তির আধার, তিনি বিশ্বমানবের পিতা-স্বরূপ, তাঁর নিজস্ব কোনও স্থূল রূপ নেই—এই মোটামুটি তাঁর ধর্মমতের মূল উপাদান। যিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, যাঁর প্রকট রূপ নেই, তাঁকে মৃন্ময় মূর্তিতে রূপ দেওয়া তাঁর সংস্কারে অত্যন্ত বাধত। তাই তিনি সাকার উপাসনা কোনো মতেই অনুমোদন করতে পারতেন না। ...উপনিষদের সর্বব্রহ্মবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। সেও কিন্তু সেই একই কারণে—ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক ভক্তি হেতু। যিনি ঈশ্বর, যিনি সব থেকে পবিত্র, দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় তিনি তাঁর সৃষ্ট জীব, মানুষ হতে পৃথক। মানুষ পাপ করে, মানুষ অপবিত্র, কাজেই মানুষ কখনও ঈশ্বরের অঙ্গ বা অংশ হতে পারে না।" [১৪] দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি তাই উপনিষদের এই অদ্বৈতবাদের 'তৎ-ত্বমসি' বাণীকে গ্রহণ করতে পারল না। না পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা, না উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, কোনটিই তাঁর সমর্থন পেল না। দেখা যাচ্ছে অনুভবময় নিরাকার ব্রহ্মসাধনা দেবেন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব ধর্মমত। তিনি তাঁর সেই ব্যক্তিগত ধর্মকেই একমাত্র সত্য মনে করে সকলের গ্রাহ্য বলে ভাবলেন। তাঁর মতো অধ্যাত্মসাধনায় প্রাগ্রসর পুরুষের পক্ষে যা সত্য ধর্ম, তা সাধারণের পক্ষে অনেক সময় অবোধ্য, অতএব অগ্রাহ্য হওয়াই স্বাভাবিক। মানবতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের মূল কথা অধিকারভেদের প্রশ্নটি ব্রাহ্মধর্মে অস্বীকৃত। তাছাড়া ভক্তিবাদ যে অদ্বৈত সাধনার পথে অন্তরায় নয়, এ সত্য তো তাঁর নিজের জীবনেই প্রমাণিত এবং দ্বৈত সাধনায় সাকার রূপকল্পনা অবশ্যম্ভাবী, অন্তত সাধারণ স্তরের মানুষের পক্ষে তো বটেই—এ সত্যটা যে কি করে তাঁর মতো মনস্বী লোক বুঝতে পারলেন না, কে জানে!

কেশবচন্দ্র সেনঃ অবশ্য তৎকালীন ব্রহ্মবাদীদের অন্তত একজন এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন—যাঁর চেতনায় নবযুগের সমন্বয়বাণী মন্ত্রের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। তাই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়েও খ্রীষ্টকে আরাধনা করতে তাঁর বাধেনি। আবার দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পুরুতঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আনন্দে আবেগেও তিনি সমান উদ্বেল। জীবন-অভিমুখী তাঁর ধর্মসাধনা—জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করেই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা ও সচ্ছল সমাধানে মুখর এই কেশবচন্দ্রই তাই তাঁর "সুলভ সমাচারে" মানবজীবন সম্পর্কিত অত্যন্ত সব দুর্লভ সুসমাচারের সঞ্জীবনী অভিজ্ঞান পরিবেশন করেছিলেন জাতির কাছে। স্বামীজীর মতে কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানযোগ, দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত, শাক্ত-বৈষ্ণব সব সাধনাই যে একই পরম সত্যের ঐক্যে

বিধৃতঃ কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই সত্যানুসরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই অতিরিক্ত খ্রীষ্টভক্তি ও খ্রীষ্টানুসরণ দেবেন্দ্রনাথের সমর্থন না পেলেও একই সংগে কেশবচন্দ্র যেমন দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলেন, ঠাকুরও তাঁকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। ঠাকুর তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তাই কেশবচন্দ্র সম্পর্কে উক্তি করেছিলেনঃ "তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কারুর হয় নাই।"[৯৫] যথার্থ জাতিধর্ম নির্বিশেষে উদার মানবতাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট দেবতা এবং তাঁর পায়েই তাঁর সমস্ত অঞ্জলি।

দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজঃ দেবেন্দ্রনাথ এবং সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে একটি কথা বিনীতভাবে নিবেদন করা যায়—তা হল এই যে, এ ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রবক্তাদের অনেকেই এসেছেন উচ্চ অভিজাত শ্রেণী থেকে। তাঁদের জাতকৌলীন্য বা born aristrocracy ও অন্তরায় হয়েছিল দেশের আপামর ইতর সাধারণের সংগে মিলনের পথে। দেশের বৃহৎ ব্যাপ্ত গণমানসের মর্মস্থলে পেঁছাবার প্রবেশদ্বার তাঁরা খুঁজে পাননি, কারণ তাঁদের জীবনযাত্রার বেড়াগুলি বাধা হয়েছিল মাঝখানে। যে অন্তর মিশালে অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, সে অন্তর তাঁরা মিশাতে পারেননি। তাই দেশ ও জাতির সংগে এঁদের ঘটেনি কোন একাত্ম অন্তরংগ পরিচয়, লাভ করতে পারেননি স্বামীজীর মতো প্রাণ-স্পর্শী আত্মীয়তার একান্ত অভিজ্ঞতা। ঠাকুর একেই বলেছেন অভিমান। "প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজোবাবুকে বললুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী'; বলে অভিমান থাকতে পারে?"[৯৬] অবশ্য বিবেকানন্দও কম aristrocrat ছিলেন না। তবে তা হল আত্মার aristrocracy। এই aristrocracy মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং কাছে ডেকে নেয়, হৃদয়ের সংগে হৃদয়ের, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সহজ মিলন ঘটিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের সার্থকতা ও সিদ্ধির মূল এখানেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ভেদমাত্রা আজকের মতো প্রকট ছিল না সেদিন সত্য, কিন্তু তবু উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মনেতারা কোনদিনই সমাজের উচ্চমঞ্চ থেকে নেমে এসে একই সামিয়ানার নীচে মাটির আসনে সহজ দর্শকের সংগে সংগী হয়ে পাশাপাশি বসতে পারেননি। অধ্যাত্মের মুক্তাকাশে বিচরণকারী ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাই দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পুরুতবামুনকে শুধুমাত্র যথোপযুক্ত কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আসতে পারবেন না বলে ব্রাহ্ম-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেও

সে নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। "অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হ'য়ে বললে, 'আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসব) আসতে হবে।' আমি বললাম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই অবস্থা দেখছো!--কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বললে, 'না, আসতে হবে: তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো...।' আমি বললাম, 'তা পারবো না...।' তার পর দিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো--আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ ক'রেছে। বলে-- অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না। (সকলের হাস্য)।"[৯৭] ওঁরা সেদিন হাসলেও ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হাসির নয়। যে দেশের অধিকাংশ লোকই "কটিতট বস্ত্রাবৃত"ও নয়, সে দেশের নেতার পক্ষে পোশাক নিয়ে এই সৌখিনতা সমর্থনযোগ্য কি না বিচার করতে হবে। এই মিথ্যা ভ্যানিটিই কি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যথার্থ গণসংযোগের অভাব সূচিত করে না? জীবন ও জগৎ প্রসঙ্গে এই ক্ষুদ্র খণ্ড দৃষ্টি নিয়ে যথার্থ মানবকল্যাণে ও দেশহিতব্রতে যুক্ত হওয়া যায় না। তাই ভারতসংস্কৃতির মূল মর্মবাণী বেদ-উপনিষদের চর্চা করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জীবনে জীবনযোগ করার অভাবে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-রাজনারায়ণ প্রভৃতির ব্রাহ্মধর্ম জাতিকে নবজীবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতে পারেনি। অথচ এই ব্রাহ্মসমাজের পতাকাতলেই কেশবচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "সংগত সভা" স্থাপন করে ব্রাহ্ম তরুণ সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন। উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ বঙ্গের দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যের জন্য সেবাদল সংগঠন করা হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষে সেই প্রথম যুব-আন্দোলন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতবর্ষে প্রথম নারী-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নারীদের নিয়ে। নাম ছিল 'ব্রাহ্মিকাসমাজ'। কেশবচন্দ্রের "ইন্ডিয়ান মিরর" (১৮৬১) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৬৪) সেকালের নানা প্রগতি-আন্দোলনের সক্রিয় মুখপত্র ছিল। দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের কালেই দেশের স্ত্রীশিক্ষা, শ্রমিকমজুর-সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীকল্যাণ, নানা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখ-বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নানা জনসংযোগ ও সেবাপ্রকল্পের উদ্বোধন, নারীকল্যাণ প্রভৃতি নানা কর্মপ্রয়াসে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীর ভূমিকা ইতিহাস ভুলবে না। পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বিদ্রোহী তরুণদের প্রতিষ্ঠিত "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে"র নেতৃত্বেও দেশের শিক্ষার প্রসার, নারীসমাজের সর্বাত্মক উত্থান ও উন্নয়ন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরী-করণে এবং পরিশেষে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ব্রাহ্মদের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্মরণীয়। তত্ত্বের দিক থেকেও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ উচ্চস্তরের। রবীন্দ্রনাথের

দৃষ্টিতেঃ জ্ঞান ও প্রেমসমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে; ইহা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।[৯৮]

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিবেকানন্দঃ যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় অক্ষয়কুমার রামমোহনের উত্তরাধিকারী। রামমোহনের মতো তিনিও প্রাচীন দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে, বিশেষ করে সংস্কৃত শিক্ষাধারাকে তীব্র অসহিষ্ণু ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেনঃ "দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখার জন্য সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত।" যা কিছু প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী তাই খারাপ এবং পরিত্যাজ্য--এ মতবাদ কেবল ডিরোজিও-শিষ্যদের নয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শ্রেণীর নেতাদেরও এই ঐকদেশিক চেতনায় আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। এই মনোবৃত্তি বৃহৎ সার্বিক নবজীবন রচনার অনুকূল নয়। অথচ অক্ষয়কুমারের মতো বৈজ্ঞানিক মন ও যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তানায়ক সেযুগে কমই ছিলেন। বোধ হয়, অতিরিক্ত বিজ্ঞানবোধ ও বিজ্ঞান-অনুসরণই তাঁকে এবংবিধ সিদ্ধান্তে পেঁছাতে সাহায্য করেছিল। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার মধ্যেই আমাদের জাতীয় মানসমুক্তি, রামমোহনের মতো এই ছিল তাঁরও আন্তরিক বিশ্বাস। যুক্তির কষ্টিপাথরে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যা প্রমাণ করা যায় না, অক্ষয়কুমার তা মানতে রাজী ছিলেন না। এপথেই তিনি অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ধর্মের ইতিহাস থেকে এবং জীবন থেকেও বর্জন করেছিলেন। তাই "ব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তাঁহার রচনায় ফুটিত বেশি।"[৯৯] অধ্যাত্মবাদ ও আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে স্বামীজীরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনিই প্রথম অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করে আধুনিক জড়বাদীদের কাছে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রমাণ করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর বিজ্ঞানচেতনার পশ্চাতে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনসাধনা ও তপস্যার অগ্নিশুদ্ধি ছিল বলে, ছিল বলে অখণ্ড অনুভাবী এক মহাহৃদয়ের অধিকার, উপলব্ধির দিগন্তে তাঁর কাছে ধর্ম ও বিজ্ঞান এক হয়ে গিয়েছিল। কারণ ধর্ম ও বিজ্ঞান আসলে একই পরম সত্য আবিষ্কারের দুটি ভিন্ন পন্থামাত্র। কিন্তু অক্ষয়কুমারের চিন্তাভাবনায়, তাঁর চেতনায় শেষ পর্যন্ত ধর্মের স্থান গৌণ হয়ে বিজ্ঞান মুখ্য স্থান অধিকার করে বসল। তিনি ঘোষণা করলেনঃ "বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থ পাঠই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ধর্মশিক্ষার

একমাত্র পথ।" তিনি বললেনঃ বিজ্ঞানও শাস্ত্র, পুরাতত্ত্বও শাস্ত্র—বিশ্বসংসারই শাস্ত্র। [১০০] আবার তিনিই বললেন যে, সব ধর্মের সার সত্যকে গ্রহণ করা কর্তব্য। এবং তাঁর সাহায্যেই সর্বধর্মের সার সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' সঙ্কলিত হয়েছিল। কিন্তু সার সত্য গ্রহণ কেন কর্তব্য, কেন এক বিশেষ ধর্মপথ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব গ্রহণে এক মনের বিশেষ প্রবণতা—তা কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ বিজ্ঞানচর্চা একথা মানলেও বিজ্ঞানচর্চা করেই সব জ্ঞানের অধিকার অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। আসলে মানুষের জন্যই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য মানুষ নয়ঃ এই মৌল সত্যটা অক্ষয়কুমারের মতো ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বাস্তবিকপক্ষে "...there is no conflict between science and religion. Both have the indentical aim of helping man to grow in spirituality, of ushering in a better social order which alone can provide him with stimulus to total life-fulfilment." [১০১] এই সত্য উপলব্ধি করলে তিনি অকারণ বিজ্ঞানকে এতটা স্থান দিয়ে আর সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে পারতেন না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি স্বীকার করে অক্ষয়কুমারের সপক্ষে একথাও বলা যায় যে, তিনি বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পরাজয় ও ব্যর্থতা দেখে যাননি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার যুগে—বিজ্ঞানের গতি ও শক্তিতে—তার দিগ্বিজয়ে মুগ্ধ আবিষ্ট হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিপ্রধান অক্ষয়কুমারের পক্ষে বিজ্ঞানকে সর্বার্থসাধকরূপে দেখাই স্বাভাবিক ছিল।

"Each by itself is insufficient and helpless. They have been tried separately with unsatisfactory results. The old civilizations took guidance solely from religion; their achievements were partial and limited. Modern civilization relies solely on science; its achievements also have turned out to be partial and limited." [১০২] কিন্তু তাই বা কি করে বলি? মনে রাখতে হবে, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতে তখনও অনেক বাকি। এবং স্বামীজীও তো প্রায় একই যুগের মানুষ। দেশে দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জয়যাত্রা তখনও অব্যাহত। তবু স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানকে বৃহত্তর মানবকল্যাণের প্রয়োজনে মিলিয়ে দেবার কথা চিন্তা

করেছিলেন। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় পরবর্তীকালের বিজ্ঞানের ব্যর্থতার বিবর্ণতা এবং অপূর্ণতার কথা আগে থেকেই ধরা পড়েছিল। তাই তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝতে পেরেছিলেনঃ

"The combination today of the spiritual energies of these two complementary disciplines in the life of man will produce fully integrated human beings and thus help to evolve a complete human civilization for which the world is ripe and waiting. This is the most outstanding contribution of Swami Vivekananda to human thought today."[১০৩]

নবজাগরণের অন্যান্য প্রগতিবাদী সামাজিক আন্দোলনের শরিক ছিলেন অক্ষয়কুমার। মানবকল্যাণের আদর্শে ও প্রত্যহের বাস্তবজীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন-পরিকল্পনায় অক্ষয়কুমারকে বলা যায় বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি তাঁর প্রধান সাহিত্যকীর্তি। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা তাঁর অপর অনন্য সারস্বত অবদান। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তৎকালীন জমিদারদের অত্যাচার, প্রজাপীড়ন, রাজ-পুরুষের হাতে সাধারণ মানুষের নির্যাতন-নিগ্রহ, নীলকরদের অমানুষিক বর্বরতা ও অত্যাচারের কাহিনী তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন। স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান তাঁর চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণায়ই দেশের শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি 'চারুপাঠ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে আজও যা অদ্বিতীয়। দেশের মানুষের নানা কল্যাণ প্রয়াসে ও কুশল কর্মেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সুন্দর সচ্ছল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব জীবনই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল। প্রমাণাভাবাৎ ঈশ্বরের অনস্তিত্ব তাঁর কাছে ছিল একান্ত সত্য এবং আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক সমস্ত অনুভবই তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন। আজকালকার অধঃপতিত মেরুদণ্ডহীন চরিত্রভ্রষ্ট বাঙালীর তথাকথিত উন্নাসিক আধুনিকতার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মানসগঠনের স্বারূপ্য দেখে একালের কৃতবিদ্য সমালোচক যতই পুলকিত হোন এবং অক্ষয়কুমারকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করুন, আমার কিন্তু সামগ্রিক বিচারে মনে হয়েছে, নবজাগরণের মূল সুরটি (spirit) অক্ষয়কুমার ধরতে পারেননি। যেমন ধরতে পারেননি ব্রাহ্মসমাজের আরও অনেকে। কারণ মনে রাখতে হবে, নবজাগরণের মূল উদ্দেশ্য হল মেষের দলে

মিশে থাকা সিংহশিশুকে আত্মমুখ-দর্শন করিয়ে তাকে তার সিংহরূপে ফিরিয়ে আনা। ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে নিজেদের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠ করাই নবজাগরণের পরম কৃত্য এবং ঐতিহাসিক নির্দেশ। তবে চিন্তাভাবনার জগতে তাঁর এই বিজ্ঞানবিদ্রোহ ভাবপ্রবণ বাঙালীজাতির চিত্তসংস্কারে প্রভূত সহায়তা করেছে। যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে অতিরিক্ত হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন বাঙালীর চেতনাকে কিছুটা ইহমুখী করে গড়ে তুলে তার মনোজগতের ভারসাম্য ফিরিয়ে দিয়েছিল।

রাজনারায়ণ বসুঃ বৃত্তিতে শিক্ষক, অক্লান্ত কর্মী রাজনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারসাধন এবং প্রচার ও প্রসারের জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। সেকালের অন্যান্য মনীষীদের মতো রাজনারায়ণও বহু সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা" ও "সুরাপান নিবারণী সভা"র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার। জাতির চেতনায় স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করাই এঁদের উদ্দেশ্য। "জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা"য় ইংরেজি ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মাতৃভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হোক এ তিনি চাইতেন। নিজে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলায় বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সমস্ত গ্রন্থে এবং তাঁর ভাবগর্ভ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাবলীতেও তিনি যে দেশপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতায় স্বধর্মের গৌরব ও মহিমা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। ধর্মান্দোলনের পশ্চাতে এই জাতীয় ভাব উদ্দীপনের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর অপর একটি বক্তৃতা "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"র মধ্যে তিনি যে একটি মহাহিন্দু সমিতির পরিকল্পনা করেছেন, অনেকের মতে তা-ই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়েছিল। তারই উপর গড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদের মহান সৌধশ্রেণী। হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করলেও রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদে সামান্যতম সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। পরবর্তীকালে নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' পরিকল্পনার পশ্চাতেও রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি সেকালের সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজনারায়ণের প্রবল সাহিত্যানুরাগ এবং কর্ষিত ও মার্জিত সাহিত্যরুচি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম রসবোদ্ধা সমঝদার ও সার্থক সমালোচক-ভাষ্যকার রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ এবং মধুসূদনের মধ্যে পরস্পর লিখিত পত্রাবলী আমাদের অন্যতম সাহিত্যসম্পদ। জীবন ও জগৎ

সম্পর্কে সদা-উৎসাহী রাজনারায়ণ নবজাগরণের একজন মহৎ কর্মী সন্দেহ নেই। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের কথা তিনিও বলেছেন। মাতৃভাষা চর্চা ও আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সুগভীর পরিচিতির মাধ্যমে স্বজাতি ও স্বদেশকে উন্নত করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন একথা সত্য, তবু তাঁর ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজ প্রীতিও সমানভাবে ছিল। তিনি মনে করতেনঃ "ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে।" আবার এই রাজনারায়ণই "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতায় বলেছেনঃ "ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না;...আমরা নিউজিল্যান্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্‌ কোট্‌ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি...।" সেকালের আরও অনেকের মতো রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্বের গভীরেও এই বিপরীতের দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি আমাদের বিস্মিত করে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভূদেবচন্দ্র তৎকালীন নব্যবঙ্গের সমস্ত রকম প্রগতিবাদী আন্দোলনেরই বিরোধী বলে অন্যায়ভাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ' অসমর্থনের ফলে তাঁকে তৎকালে বহুজননিন্দিত হতে হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তার সবটাই সত্য নয়। অন্তত শেষ সত্য তো নয়ই। যেহেতু ভালমন্দ পাপপুণ্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি ধারণা ছিল, সেইহেতু কারও কথায়ই হুজুগে পড়ে কোন কাজ তিনি করতেন না। যাতে তাঁর নিজস্ব বিবেকের সমর্থন নেই এমন কাজ সম্পাদন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই কারণেই অনেক সময় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি পথ চলতে পারেননি। তাছাড়া এদেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর আনুগত্য। চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানী তিনি জগৎ ও জীবনকে একটি পূর্ণায়তরূপে দেখতে চাইতেন। তাঁর ঐ অতীত ঐতিহ্যমুখিতার জন্যই সমকালের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝেছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে নতজানু হয়েও তিনি মুসলমান ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। জাতীয়তাবোধেরও ধারক ও বাহক ছিলেন। আমার তো মনে হয়, নিদারুণ সেই ভাববিপ্লবের যুগে, যখন চারিদিকে শুধু স্রোতের জলে ভেসে চলার আবেগ সঞ্চারিত, পরানুকরণ ও পরধর্মানুসরণের অন্ধতা জাতিকে গ্রাস করছিল, তখন ভূদেব-চরিত্রের এই অনমনীয় নৈষ্ঠিক সংযম, আত্মপ্রীতি ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যানুসারিতা, শক্ত পায়ে স্বধর্মে স্থিতির প্রতিশ্রুতি তৎকালীন যুবমানসে সঞ্জীবনীর কাজ করেছিল। কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) ও কেন্দ্রাভিগ (centripetal) শক্তির সমন্বয়েই যেমন সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব

সূচনা করে, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন সম্পর্কেও সেই একই সত্য। ভূদেব আমাদের নবজাগৃতির আন্দোলনে কেন্দ্রাভিগ শক্তির কাজ করে জাতিকে স্থিতির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

বক্তৃতা দেবার চেয়ে তিনি ব্যক্তিজীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও নীতিভাস্বর করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং দীর্ঘকাল "এডুকেশন গেজেট"-এর সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব লেখার মধ্যেই ভারতীয় আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণ থেকেই আমরা পেঁাছাতে পারি মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় এবং ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জিত হলেই তা থেকে জন্ম নিতে পারে পারিবারিক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যচেতনা এবং পরিশেষে তাই পূর্ণ হয়ে ওঠে যথার্থ স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তায়। "পারিবারিক প্রবন্ধ", "আচার প্রবন্ধ", "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে এসব তত্ত্ব ও তথ্যই তিনি আলোচনা করেছেন।

ঐতিহ্যের প্রতি প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই শ্রেয় এবং জাতীয় জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে স্বধর্মের স্থির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই যে ইউরোপীয় জীবনের সদ্গুণরাজি গ্রহণ করা উচিত, ভূদেবের এই দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রায় স্বামীজীর অনুরূপ। কিন্তু অপরের থেকে কিছু গ্রহণ করার ব্যাপারে ভূদেব এত রক্ষণশীল ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বহতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় জীবনের মহৎ কল্যাণের প্রয়োজনেও কোন পরিবর্তনকে ভূদেব মেনে নিতে পারেননি। সমাজ যে জঙ্গম, নিত্য নানা পরিবর্তন, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই যে জীবনকে এগোতে হয়, প্রাণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ঃ এই জীবনসত্য তিনি অস্বীকার করেছেন। "ইংরেজের কাছ থেকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও কর্মিষ্ঠ উদ্যমশীলতা ছাড়া আর কিছুই যে আমাদের শিক্ষণীয় নেই"—একথা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু ঐ গুণগুলি গ্রহণ করতে হলে আমাদের সমাজজীবনে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসতে বাধ্য তা তিনি মানতে পারেননি। জাতিভেদপ্রথার বিলুপ্তি তিনি সহ্য করতে পারেননি। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। একজাতি এক প্রাণ একতার প্রয়োজনে এযুগে যে বংশগত জাতিভেদপ্রথা অচল—এ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। অথচ স্বামীজী আসন্ন গণ-অভ্যুত্থানের স্থির পদধ্বনি শুনতে পেয়ে সেখানে যে জাতিভেদের কোন স্থান নেই, অ-দ্ব্যর্থক ভাষায় তা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আমাদের বহু জাতীয় পাপের মূল উৎস এই জাতিভেদপ্রথা। তবে "উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার

মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।"[১০৪] আমাদের সকলের সাধনা ব্রাহ্মণের সাধনা। স্বামীজী মনে করতেন ব্রাহ্মণত্বই মনুষ্য-সমাজের চরম আদর্শ, আর সত্যযুগ হচ্ছে বিভেদহীন আদর্শ সাম্য সমাজের যুগ। এবং এও স্বামীজী জানতেন নতুন ভারত বের হবে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, বের হবে মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বের হবে কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন জাতিভেদের সেখানে কোন স্থান থাকতে পারে না। স্বামীজীর এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি সকলের থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু যুগের প্রয়োজনে অনেক কিছু মেনে নিতে হয় সমাজকে। এ ইতিহাসের নির্দেশ। কিন্তু ভূদেব তাঁর অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার জন্য, অনমনীয় মনোভাবের জন্য ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন।

নবজাগরণ ও পারিবারিক সম্পর্কঃ অবশ্য ভূদেবের ঐতিহ্যচারিতা কোন কোন সময় গভীর বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নবজাগরণ-সংগ্রামের একান্ত অভিমুখী ছিল। ভূদেব বহির্মুখী রাজনৈতিক বা সমাজসংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হওয়া বা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার চেয়ে ব্যক্তিচরিত্রের শুচিতা রক্ষা ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণসাধনাকে অনেক বেশী শ্রেয় মনে করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেনঃ "উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্ম্মপ্রণালীই বল, সামাজিক-প্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানভূত।"[১০৫] পরিবারকে কেন্দ্র করেই যে একদা গড়ে উঠেছিল আমাদের সভ্যতা, এই প্রজ্ঞায় অভিষিক্ত ছিলেন বলেই নবজাগরণের একজন মহৎ কর্মী হিসাবে পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতিবিধানের দিকে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস। প্রত্যহ-জীবনচর্যায় অম্লান শুচিতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতৃভক্তি এবং স্বজন-পরিবারের প্রতি আনুগত্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পারিবারিক জীবনের শুচিতা ও পরিবারের সংহতি রক্ষার প্রয়াসে বঙ্কিমও সদাজাগ্রত ছিলেন। আপন আত্মীয়স্বজন, পরিবারের শ্রদ্ধেয়, প্রিয় সঙ্গীদের, প্রতিবেশীদের প্রতিই যদি হৃদয়ের অনুভব প্রসারিত না করা যায়, তবে দেশের বৃহৎ সমাজ ও জনজীবনকে মুক্তির পথ দেখাবে কোন্ অধিকারে, কোন্ আলোর অভিজ্ঞানে? তাই তিনি নতুন ভারতবর্ষের নবজীবন যোজনায় সুস্থ-সুন্দর পারিবারিক জীবন রচনায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। দেশ ও রাষ্ট্র তো ভুঁইফোঁড় কিছু নয়, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র।

বহুজনবিদিত হলেও বিদ্যাসাগরের মাতাপিতৃভক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্মরণীয় এই কারণে যে, আবহমানকাল থেকে ভারতবর্ষীয় সমাজে যে একটি সুমধুর শুচিশুভ্র পারিবারিক সম্পর্কের ধারা চলে এসেছে, নবজাগরণের মহান সংগ্রামী বিদ্যাসাগরের জীবনেও তার পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করি। ভারতীয় সভ্যতার মৌল উৎস পরিবার এবং পরিবারের মধ্যে আবার জননীর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই জননীকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের একক ঈশ্বরী বলে চিরকাল পূজা করতেন। সমগ্র পরিবার-পরিজনের প্রতিও বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহজ প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর জীবনে। কিন্তু দুঃখ ও নিদারুণ নৈরাশ্যের সঙ্গে বলতে হয়, নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বিশ্রুত ভারতপথিক রামমোহনের জীবনে এই শুচিশুভ্র পারিবারিক বন্ধন বা পরিবারের প্রতি কোন সামান্যতম সহানুভূতি, সহৃদয়তা বা আনুগত্য দেখা যায়নি। আদর্শরক্ষার জন্য অনেক সময় অতি প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সঙ্গেও জীবনের পথে ভাবসঙ্ঘাত ও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন অপমানে লজ্জায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, কিংবা হঠাৎ কোন দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েন, তখন অন্তত সচ্ছল বিত্তবান পুত্র বা ভ্রাতার অর্থের বিনিময়ে কারাগার থেকে তাঁদের মুক্ত করে আনার একটি মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়। রামমোহন সেটুকুও পালন করেননি। অথচ পারিবারিক পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে বিধৃত প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার স্পর্শে ও পরিচর্যায়ই আমাদের মধ্যে একদিন শুদ্ধ মানবতার উন্মেষ ঘটে—এ সত্য আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলেই আমাদের মহাকবি তাঁর মহাকাব্যের মধ্যেও আদর্শতম নানা পারিবারিক সম্পর্কের মহিমময় রূপটি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। পিতামাতার প্রতি, জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠের প্রতি, কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠের প্রতি, বধূর শ্বশ্রূর প্রতি, প্রভুর ভৃত্যের প্রতি—প্রভৃতি পরিবারবন্ধনের মধ্যে সমস্ত মানবিক সম্পর্কেরই এমন উজ্জ্বলতম আদর্শ পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই কোন কালে দেখা যায়নি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, দশরথ, কৌশল্যা, সীতা যে এদেশের মহাকাব্যেরই নায়কনায়িকা তা আমরা ভুলব কেমন করে? অথচ সেই দেশেরই প্রধান সমাজসংস্কারক, অদ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী রামমোহন পারিবারিক পবিত্র বন্ধনের কোন মর্যাদাই রাখেননি। অথচ নবজাগরণ মানেই ঐতিহ্য ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র প্রথম খন্ড থেকে জানা যায় ১৮০০ খৃীষ্টাব্দে ৩,৩৩৮৵৫-এর জন্য পিতা রামকান্ত রায় এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায় হুগলীর দেওয়ানি জেলে বন্দী হন। ১৮০৫ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত জগমোহন রায় জেল ভোগ করেন। অথচ "১৮০২ খৃীষ্টাব্দে তিনি (রামমোহন) কলিকাতার টমাস উডফোর্ড নামে

কোম্পানীর একজন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। ১৮০৩-এ তিনি উডফোর্ডের (ফরিদপুরে) দেওয়ান নিযুক্ত হন।" "আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার মধ্যে এই সময়ে (১৮০৩, মে-জুন) বর্ধমানের বাড়ীতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল।" আমরা জানি তখন রামমোহনের অবস্থা শুধু সচ্ছল নয়, তিনি রীতিমতো ধনী। ব্রজেন্দ্রনাথও লিখেছেনঃ "রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়পরিবার যখন দুর্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লাঙ্গুল পাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।" ব্রজেনবাবু এও লিখলেনঃ "রায়-পরিবারের এই ভাগ্য-বিপর্যায় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন।"[১০৬] শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক সাচ্ছল্যে রামমোহন যখন বিশিষ্ট ধনী এবং সমাজের একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি এবং যখন তিনি একই সঙ্গে দেশ ও জাতির হিতসাধনে এবং বিশ্ব-মানবতার উদ্বোধনে নানা কল্যাণকর্মে যুক্ত, তখন নিজের জননী "তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি একদিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে একজন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে...তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।"[১০৭] এর পরে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে পরলোক-গত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট অবধি মামলা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেও উন্নত উদার মানসিকতার পরিচয় মেলে না। কারণ শুদ্ধ মানবধর্মের মানদণ্ডে অর্থ ও বিত্তের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। কোন আদর্শের প্রয়োজনেই কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে পারিবারিক বিত্তসম্পত্তি নিয়ে বিদেশী ইংরেজ বেনিয়ার বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। "রায় পরিবারের চরম দুর্দিনে অনেক লেখালেখি, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর লিখিত তমসুকে অনেক চড়া হারে সুদের কড়ারে রামমোহন এক হাজার টাকা মাত্র কর্জ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়কে"ঃ এ সংবাদও আমরা জানতে পারি ব্রজেনবাবুর "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" প্রথম খণ্ড থেকে।

অথচ এই প্রসঙ্গেই ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন-আলেখ্য উন্মোচিত করলে ঠিক এর বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। সন্ন্যাসী হয়েও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর চরণপ্রান্তে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রণত থাকতে দেখেছি স্বামীজীকে।

আর সঙ্ঘজননী সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে যে ঈশ্বরীয় ও আধ্যাত্মিক আর এক সংসার গড়ে উঠেছিল, সেখানে তো প্রধান হয়েও নরেন্দ্রনাথের সহৃদয় উদার ভূমিকার কোন তুলনাই হয় না। আর ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েও ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলা যায় স্ত্রী, জননী ও অন্যান্য ভক্তপরিজন-পরিবার নিয়ে ঘর করে গেছেন দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমন্দিরে। স্ত্রী সারদাদেবীকে শুধু প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজাই করেননি, তাঁর প্রত্যহজীবনের প্রতিটি পথচর্যায় ছিল ঠাকুরের সতর্ক সজাগ স্নেহকোমল দৃষ্টি। সেবাপরিচর্যা করে আসতেন রোজ দুবেলা নহবতখানায় গিয়ে আপন জননী চন্দ্রাদেবীকে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও আপন জননী তাঁর কাছে পরম পূজ্যা পরম আরাধ্যা স্বর্গাদপি গরীয়সী। তন্ত্রসাধনার গুরু যোগেশ্বরী ভৈরবী মায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতা এবং অন্যান্য ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত সাধিকাদের কথা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনসাধনায় নারী কখনও নরকের দ্বার বলে নিন্দিত বা ধিক্কৃত হয়নি, পরন্তু মহামায়ারই জীবন্ত বিগ্রহরূপে শ্রদ্ধিতা ও নিত্যবন্দিতা।

কবি ঈশ্বর গুপ্তঃ অক্ষয়কুমার দত্তের গুরুস্থানীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু "সংবাদ প্রভাকর"-এর সম্পাদক "মধ্যপন্থী স্বভাবকবি" ঈশ্বর গুপ্তের কোন সক্রিয় উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল না নবযুগরচনায়, অন্তত কর্মযোগের দিক থেকে তো নয়ই। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হয়, নবযুগের আগমনী সংবাদ তাঁর কাছেও ধরা পড়েছিল—অন্তত তাঁর সাহিত্যকৃতিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক-পূর্ব যুগের উইলিয়ম কুপারের মতো ঈশ্বর গুপ্তও নতুন যুগের নতুন প্রভাতের আলোকচ্ছটা না হলেও, প্রাক্-প্রভাতীর শীতল হাওয়ার স্পর্শ হয়তো বুকের মধ্যে অনুভব করতে পেরে-ছিলেন। যদিও নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার পার হয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানাবার মতো মধুসূদনের বলিষ্ঠ ডানা তাঁর ছিল না, কিন্তু একটা অব্যক্ত আবেগ তাঁর কবি-চেতনাকে স্পর্শ করেছিল। অন্তত কাব্যের বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। যদিও জীবনে একান্ত রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত দেশের কোন প্রগতি-আন্দোলনেরই সহযোগী হতে পারেননি, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কড়া চাবুকে তিনি সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনকেই আঘাত করেছেন, তবু মাতৃভাষার প্রতি জাতির প্রেমসঞ্চারের জন্য তাঁর কাব্য-উদ্যোগ শ্লাঘ্য। "মাতৃভাষা যে মাতৃসম" এবং তার সেবাই যে পরম কৃত্য এই সুসমাচার তিনি তাঁর অনবদ্য কবিতা 'মাতৃভাষা'র মাধ্যমে জাতিকে দিয়ে গেছেনঃ "মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা, তুমি তার সেবা কর সুখে॥" এবং "স্বদেশের কুকুর"ও যে বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে অনেক আপন এই মহৎ অনুভবটি প্রকাশ করে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে গেছেন স্বদেশবাসীকেঃ "ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে,

দেখ দেশবাসিগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"[১০৮] আর কিছুর জন্য যদি নাও হয়, শুধু মাত্র এই দুটি কবিতার (মাতৃভাষা ও স্বদেশ) জন্য তিনি আমাদের নব-জাগরণ-আন্দোলনের অংশভাক্ হয়ে থাকলেন।

এই নবযুগ রচনায় আরও বহুজনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বহু সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ-আন্দোলন, প্রতি-আন্দোলন, অজস্র সংস্কারপ্রয়াস, উদ্দাম নানা বিপ্লবী বিদ্রোহ, আগ্নেয় কত চেতনার অভিসঞ্চার—কত চিন্তাভাবনার, আত্ম-ধ্বংসের কত আঘাত-অপঘাত, আত্মসৃজনের কত তপস্যা, কত আত্মশুদ্ধি, কত আত্মরক্ষার বিশ্বাসের কত বাঁধ নির্মাণ, অবিশ্বাসের অন্ধকারের প্লাবন অন্যদিকে, কত র্যাস্ত-সূর্যোদয়ের ইতিবৃত্তঃ এই সব নিয়েই সেদিনকার নবজাগরণের মহান বিশ্বরূপ। আমি আন্দোলনের কয়েকজন প্রাণ-পুরুষের সম্পর্কেই আলোচনা করলাম। প্রসঙ্গত এখানে নীল-বিদ্রোহের কথা মনে পড়ে।

নীল-বিদ্রোহঃ আমাদের ইতিহাসে নীলকর-বিদ্রোহ বিশেষ একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় জীবনে যে সংহতি এসেছিল, যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার তুলনা বিরল। নীলকরদের এই অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ-আন্দোলন আমাদের নাট্যকারকে প্রেরণা ও উপাদান জুগিয়েছিল প্রথম সার্থক জাতীয় নাটক রচনায়। সেই প্রথম আমাদের যথার্থ লোকজীবন সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করল। দীনবন্ধু মিত্রই সেই মহানাটকের অমর স্রষ্টা। এই নাটকের অভিনয় নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। এবং এই সাধারণ মঞ্চ থেকেই পরবর্তীকালে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের বহ্নি বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশের মৌনমুখর মর্মমূলে। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেই মধুসূদন তাঁর হাইকোর্টের চাকরি হারান। এই নাটকের প্রকাশক হিসাবেই অর্থদণ্ড হয় রেভারেন্ড লং সাহেবের। এবং সেই এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ শোধ করে দেন কোর্টের মধ্যেই। এবং নীলকর সাহেবদের দেশব্যাপী অনাচার, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই বজ্রলেখনী ধারণ করেছিলেন "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"-এর সুযোগ্য সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এবং এঁদের সকলের সংগ্রামনেতৃত্বেই ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নীল-বিদ্রোহ। এবং শেষ পর্যন্ত দেশ-ব্যাপী সেই আন্দোলনের চাপেই বন্ধ হয়ে যায় নীলকরদের অত্যাচার। ইতিহাস আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে তার। নবজাগরণ-আন্দোলন প্রসঙ্গে অর্থাৎ আত্মমুখ

দেখার প্রয়াসে ও সাধনায়, নিজেদের নতুন করে জানার ও চেনার তপস্যায়, জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বধর্মে স্থিত হবার সংগ্রামে এঁদের অবদান তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্য নানাদিক থেকেও এযুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। স্বামীজীর প্রিয় কবি মধুসূদনকে প্রথম আনুষ্ঠানিক জনসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে। কালীপ্রসন্নের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" তৎকালীন সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি, বিকৃতি, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্নতম একটি শ্লেষাত্মক দলিল হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমাদের জাতীয় সংহতি সম্পাদনে এবং জাতীয়তাবোধের অভিসঞ্চারে কালীপ্রসন্নের অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের অনুবাদকর্ম। কয়েকজন মহানুভব বিদেশীকে নিয়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আজও প্রচলিত থাকলেও,—("হেয়ার-কল্‌বিন-পামরশ্চ-কেরি-মার্শমেনস্তথা। পঞ্চ গোরাস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥") এদেশের ইতিহাসে পাদ্রী সাহেবদের সাধারণ ভূমিকা মোটেই সুখস্মৃতিবহ নয়। তবু এঁদের মধ্যে যে কজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছেন, রেভারেণ্ড লং তাঁদের অন্যতম। এই রেভারেন্ড লং সাহেবের প্রয়াসেই তৎকাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যসাধনার ইতিবৃত্ত পঞ্জীর আকারে প্রথম সংগৃহীত হয়েছিল। সেই পঞ্জীটি আজও "লং সাহেবের ক্যাটালগ" নামে খ্যাত হয়ে আছে। আর "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" সেদিন যে অগ্নি-অক্ষরে রচনা করেছিল সমকালীন জাতীয় জীবনের ইতিহাস, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে চিরকাল এর মহান সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম। আর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র! বাঙালীর আত্ম-আবিষ্কারের--আত্মজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে তাঁর কাহিনী।

অন্যান্য সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাঃ অন্যান্য দেশের মতো ভারতের নব-জাগরণেও তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মাদ্রাজের 'হিন্দু' ১৮৭৮ (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক), পুণার 'মারাঠা' ও 'কেশরী', বোম্বের "টাইমস অব ইন্ডিয়া", কলকাতার "ইন্ডিয়ান মিরর" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সম্পাদনায় 'হিন্দু' দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, ব্রিটিশ সরকার ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সমালোচনায় এবং সংগঠনাত্মক নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞেও অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। "টাইমস অব ইন্ডিয়া" অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা হলেও কৃতী ভারতীয়দের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চাৎপদ হত না। বালগঙ্গাধর তিলকের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের "Divide and rule" নীতি সম্পর্কে 'মারাঠা'

১৮৯৫ সনে জাতিকে সচেতন করিয়ে দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা "ইন্ডিয়ান মিরর" শুধু রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারেই নয়, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানেও তার তৎপরতা স্মরণীয়। সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন শুধু পত্রিকার মাধ্যমেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের শরিক ছিলেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তো বহুজনবিদিত। "মাদ্রাজ মেল", কলকাতার 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান', লাহোরের "সিভিল অ্যান্ড মিলিটারী গেজেট", এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তল্পিবাহক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিও অকারণ আক্রমণ এবং বিদ্বেষ প্রচার করে পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশনারী—খ্রীষ্টান পাদরী ও বিদেশীদের দানঃ খ্রীষ্টান পাদরীদল এদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ও নকীব হয়ে এলেও এবং সপার্ষদ উইলিয়ম কেরী ও শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বৈতভূমিকা স্মরণ করেও বলা যায়, সদ্যোজাত আমাদের বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে ও প্রসারে তাঁদের দান কম নয়। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা পরিবেশনায়, বাইবেল ও নানা ধর্মগ্রন্থের বাংলা রূপান্তরণে, আরও অসংখ্য অনুবাদকর্মে, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে-প্রকাশনায় নবজাগ্রত জাতির তরুণ গরুড়সম মহৎ জ্ঞানক্ষুধার মানস খাদ্য পরিবেশন করে তাঁরা পরোক্ষভাবে জাতির নবজাগৃতির প্রাণযজ্ঞে বহ্নি-সঞ্চারণায় সাহায্য করেছিলেন। এই শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকার ছেনি কেটে প্রথম বাংলা ছাপার অক্ষরের হাতিয়ার তুলে দেন বাঙালীর হাতে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হলেও, বাংলা গদ্যের পরিচর্যায় এই কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর অবদান স্মরণীয়। যদিও পাদরী নন, তবু এই প্রসঙ্গে আর একজন সাহেব-সন্তান, স্যার উইলিয়ম জোনস, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সংস্কৃতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রমাণ করে এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষাব চেয়েও শ্রীময়ী সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে আমাদের আত্মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। "এশিয়াটিক সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা ও আরও নানা সারস্বত কৃত্যের সম্পাদনায় এবং নানা সুন্দর কুশলকর্মে যুক্ত থেকে, বিদেশী হয়েও, তিনি আমাদের নবজাগৃতি-আন্দোলনের একজন অন্তরঙ্গ সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন।

স্বামীজী এবং জাতীয় কংগ্রেসঃ ভারতীয় নবজাগরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রধান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ বহু সংস্থা ও সংগঠনও এগিয়ে এসেছিল জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনে। ১৮৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলার

"ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন", বোম্বের "বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন", "ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন", পুণার "সার্বজনিক সভা", "ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন", মাদ্রাজের "মহাজন সভা", "বোম্বে প্রেসিডেন্সী অ্যাসোসিয়েশন"—ইত্যাদি নানান সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৮৫১ থেকে ১৮৮৫ সনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। দেশের প্রাগ্রসর চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে তখন থেকেই একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ার প্রয়োজন ও সংকল্প ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ১৮৮৩ সনে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই সংকল্পকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন। ১৮৮৫ সনের ডিসেম্বরে বোম্বেতে বসল অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রথম সভা। এই সভাটিকে কংগ্রেস বলে অভিহিত করা হল এবং শীঘ্রই এর নাম হল "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"। প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বোনার্জী। ১৮৮৫ সনের পর থেকে প্রতি বছরই কংগ্রেসের অধিবেশন হতে থাকে এবং তা ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল সেযুগের কংগ্রেসের ক্রিয়াকান্ড। পট্টভী সীতারামাইয়া এ কথাই "The History of the Indian National Congress," ১ম খন্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

"Congress resolutions and the addresses delivered by Congress Presidents...[were] that the English people are essentially just and fair, and that if properly informed they would never deviate from truth and the right,...Congress was essentially loyal to the British Throne,...English constitution was the bulwark of popular liberties everywhere and the English Parliament was the mother of Democracy all over,...Congress was not a seditious body,...Indians must be admitted into public services in larger measure..."

লক্ষণীয় বিষয়, ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে কংগ্রেসের ঠিক বিপরীত মত ও মনোভাব পোষণ করতেন স্বামীজী। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সম্পর্কে স্বামীজীর মন্তব্যঃ রাজনীতির নামে চোরের দল জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ "ত্রাসের রাজত্ব", "সাজানো তামাসা"। ইংরেজ-রাজত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসী মতের পাশাপাশি স্বামীজীর মন্তব্যঃ বণিকের রাজত্বে গরীবের ভিক্ষাপাত্রের কোনও দাম নেই। আর, অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, "কংগ্রেসের কাজকর্মে কি আপনার কোনো আস্থা নেই?" স্বামীজী তার উত্তরে বলেনঃ "না, তা নেই। তবে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। ঘুমন্ত জাতিকে সর্বদিক দিয়ে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু

বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে।"

বস্তুতপক্ষে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের অধীনে কিছু সুযোগ-সুবিধা-প্রত্যাশী উচ্চবৃত্তের মুষ্টিমেয় মানুষের সৌখিন সংস্থা থেকে কংগ্রেসের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ জাতীয় সভায় রূপান্তরিত হবার ইতিহাসে স্বামীজীর অপরিসীম অবদানের তুলনা নেই। উমেশচন্দ্র বোনার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত, পি. আনন্দ চার্লু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. এন. জি. চন্দ্রভারকর, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, হেনরী কটন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, গোখেল, বীর রাঘবচারী, এস. আর. পান্টুলু প্রভৃতি থেকে শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী, গান্ধীজী পর্যন্ত অনেক কংগ্রেসী নেতার উপরই স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল। এবং অনেকেই ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী। ফলত পরবর্তীকালের বিভিন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের বক্তৃতা ও কর্মধারায় স্বামীজীর গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুধ্যান লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীর আমেরিকা-বিজয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই কংগ্রেসের মধ্যেও ফিরে আসে আত্মশ্রদ্ধা. স্বাজাত্যাভিমান ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য। ১৮৯৫ সনের পুণা অধিবেশনে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে. ১৮৯৭ সনে অমরাবতী অধিবেশনে সভাপতি শঙ্করণ নায়ারের বক্তৃতায় এবং ১৮৯৮ সনে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি আনন্দমোহন বসুর ভাষণে স্বামীজীর আত্মবিশ্বাস, জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থারই একান্ত অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৯৬ সনে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের পর তৎকালীন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের তোষণনীতির সমালোচনা করে স্বামীজীর অনুরাগী মহামান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় লিখলেন (১২.১.১৮৯৬) যে, গত বারো বছর ধরে কংগ্রেসীরা বৃথা চিৎকার করে গেছেন যা ব্রিটিশ সরকারের কাছে মশকের ভনভনানি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি; এখন এমন পন্থা গ্রহণ করার সময় এসেছে যাতে আমরা সরকারকে আমাদের প্রতিবাদ শুনতে বাধ্য করতে পারি। ১৯০২ সনে স্বামীজীর লোকান্তরগমন এবং ১৯০৩ সনে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি লালমোহন ঘোষের কণ্ঠে আমরা তো প্রায় স্বামীজীর ঘোষণাই শুনতে পেলামঃ

"Let us remember that we can never hope to realise our aspiration unless the Congress is fully sensible towards the masses of our people, and shape its policy as to bring them in line with us." (Sixty years of Congress by Satyapal & Prabodh Chandra, Lahore, 1946, Page 153) আর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে স্বামীজীর শক্তি-সাধনার আহ্বান নেতা এবং জনতাকে যে সমানভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা

সর্বজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে প্রথম বিলেতী পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ সেন (ইন্ডিয়ান মিরর-এর সম্পাদক), তিনি ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী, শিষ্যপ্রতিম।

১৮৮৫-১৯০২ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের আঠেরোটি অধিবেশনের বারো জন ভারতীয় সভাপতির মধ্যে ছয় জনের সঙ্গে স্বামীজীর ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ ছাড়া আরও বহু কংগ্রেসের নেতার সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বামীজী ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্পোদ্যোগ এবং জনসাধারণকে কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত করার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এন. জি. চন্দ্রভারকরের সভাপতিত্বে ১৯০০ সনে লাহোর অধিবেশনে প্রথম এই শিল্পোদ্যোগ ও কৃষি-ব্যাংক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। এই এন. জি. চন্দ্রভারকরই স্বামীজীকে "ভারতীয় নবজাগরণের নায়ক" বলে অভিহিত করেছিলেন। জাতির ঐহিক উন্নতির প্রয়োজনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজী যে শিল্পমেলার কথা বার বার বলে গেছেন, ১৯০১ সনে কলকাতা অধিবেশন থেকে জাতীয় কংগ্রেসও সেই শিল্পমেলার অনুষ্ঠান শুরু করে। দেখা যাচ্ছে, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি-অপূর্ণতার কথা স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা থেকে মুক্ত হয়ে যা ছিল মুষ্টিমেয় বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৌখিন মজলিস, তা জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনতার সমস্যা সমাধানের সংকল্প নিয়ে সত্যিকারের সংগ্রামী গণপ্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বহুকাল "এশিয়াটিক সোসাইটি"র সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ও গবেষণার প্রথম পথ-প্রদর্শক। স্বদেশ ও স্বজাতির মহিমা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পটভূমিকায় প্রমাণ ও প্রচারেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনেও ছিল তাঁর অগ্রণীর ভূমিকা। 'তত্ত্ববোধিনী', "হিন্দু প্যাট্রিয়ট", "সারস্বত সমাজ"-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন"-এর সভাপতি এবং কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে "অভ্যর্থনা সমিতি"র সভাপতি ছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"র সম্পাদনা তাঁর অনন্য সাহিত্য কীর্তি, তাঁর অপূর্ব পাণ্ডিত্য এবং মনস্বিতার পরিচয়।

শিক্ষাবিদ্, খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক, প্রথম কোষগ্রন্থকার ও ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবিদ্যায় পারঙ্গম রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন পরধর্ম-প্রচার ছাড়াও দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই একজন উৎসাহী দেশকর্মী ছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্র না হয়েও প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান কৃষ্ণমোহন "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"-এর সভ্য

হিসাবে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব নির্ভীক মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। পরধর্ম গ্রহণ করেও দেশের কল্যাণচিন্তায় দৃঢ়চরিত্র কৃষ্ণমোহন বরাবরই সমস্ত প্রগতি-আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। "দি এনকোয়ারার", "সংবাদ সুধাংশু" প্রভৃতি সাময়িকপত্র-সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য সারস্বত কর্ম। তেরো খণ্ডে প্রকাশিত বাংলায় প্রথম কোষ-গ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য সংযোজন।

নব্য হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগঃ সন তারিখের হিসাব মিলিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের পর থেকে ব্রাহ্মযুগের পতন শুরু হয় এবং নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই যে পাশ্চাত্য সংক্রমণ ব্যাপক হতে থাকে, শতাব্দীর শেষের দিকে সে আক্রমণের তীব্রতা ও গতিবেগ স্তিমিত হয়ে আসে এবং চারিদিকে সর্বস্তরে সমন্বয়ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ইউরোপীয় সভ্যতা ও জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মোহমুগ্ধতাও ততদিনে অনেকটা কেটে গেছে, অন্তত সুস্থ শিক্ষিত জনমানসে আত্মসচেতনতা, আত্মাভিমান ও আত্মরক্ষার প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। নব্য হিন্দুধর্মের সনাতন সংস্কৃতির মহান প্রবক্তা ও আধুনিক ভাষ্যকার হিসাবে এই সময়ে আবির্ভূত হলেনঃ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি একালের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ। প্রথম যুগের সার্থক গদ্যরচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্যই প্রখ্যাত নন, তাঁর একটি সক্রিয় সমাজকর্মীর ভূমিকাও ছিল। সহমরণের বিপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত করে তিনিই প্রথম এর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। আর "মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত" ও "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"র লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত এই শতকের চিন্তানায়কদের অন্যতম। সরকারী চাকরি করেও তাঁর কর্মপ্রয়াসে ও রচনাবলীতে যে দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির সাক্ষ্য রয়েছে তা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বেদের বঙ্গানুবাদ ও রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় বহন করে। বিদেশী শাসনে ও শোষণে দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নিদারুণ সঙ্কটের চিত্রটিও রমেশচন্দ্র অসীম নৈপুণ্যে ও দরদের সঙ্গে তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর চোখের সামনে। ভূদেব-বঙ্কিমের কথা তো পৃথকভাবে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

এরই অত্যল্পকাল পরে শুরু হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের যুগ। ১৮৮০-১৯০৪—এই সময়কে ঐতিহাসিক কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সঙ্ঘটিত দেশের সমস্ত বিপরীত বিভিন্নমুখী আন্দোলন, বিদ্রোহ ও সমর্পণকে একটি বৃহৎ মানবিক আদর্শে পুষ্ট সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করে জাতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই নতুন যুগপ্রয়োজনের সংগে সমন্বিত করে নতুন এক ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, জগৎ-জীবন এবং জীবনাতীত এক সহৃদয় অথচ প্রজ্ঞাময় আধ্যাত্মিকতা বৃহৎ জীবনরচনার প্রয়োজনে শুদ্ধ অমল ঐকতানে এক হয়ে মিলেমিশে গেল—যে জীবনদর্শনে একই সংগে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র এবং বিশ্বজগতের সমস্ত সমস্যার সম্পন্ন সচ্ছল এক আধুনিক সমাধান সম্ভব হল। দেশ ও জাতি ততদিনে সত্যিই এক মানবিক আদর্শের মহৎ প্রত্যয়ে বহু নতুনকে গ্রহণ এবং বহু বিজাতীয় আদর্শকে আত্মসাৎ করেও প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমির উপর আত্মপ্রতিষ্ঠ হল—হয়তো ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই। এবং এই পথেরই ক্রমাভিসারে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনে মুক্তি-অভীপ্সার আগ্নেয় সংগ্রামে এগিয়ে চলল দেশ। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

এই কথাই অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীঃ "জাতীয় চাঞ্চল্যের শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ স্রোতধারা কখন মিলিত হইয়া, কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখন এক পথে, কখন বিপরীত পথে, কখন একটানা স্রোতে, কখন ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে।...শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক ও কেন্দ্র হইতে আহৃত ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল।"[১০৯]

নবজাগরণের পূর্ণ পরিণাম ও স্বামী বিবেকানন্দঃ নবজাগরণ সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করা গেল, তাতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান—বিগত শতকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাত সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে উদ্ভূত যে ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রভাব জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূত হয়েছিল। এবং এই সর্বাত্মক ঝড় ও বিপর্যয়ের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং দলবদ্ধভাবে সমাজের মহৎ জ্যেষ্ঠেরা সকলেই সমবেত হয়েছিলেন জাতির আত্মরক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে। কিন্তু বিগত আট দশক কাল পর্যন্ত প্রসারিত সময়ের এই সংগ্রামে—এই সমস্ত একক বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের পশ্চাতে যেন কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, ধর্মান্দোলন সবই হয়েছে; কিন্তু জাতির পরাজয় এবং অধঃপতনের মৌল কারণটি ঠিক ঠিক কেউ যেন সন্ধান করতে পারছিলেন না। ব্যক্তিগত এবং দল হিসাবে, সংস্থা বা সমিতির মাধ্যমে অনেকেই অনেক কর্মপ্রয়াসে যুক্ত

হয়েছিলেন নবজীবন রচনার সংগ্রামে; কিন্তু সমস্ত কর্মপ্রয়াস মিলেমিশে একটি অখণ্ড ঐকতানে যেন বেজে উঠতে পারেনি। কামান-বন্দুক, হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত—সব কিছুই যখন একজন নিপুণ নির্ভীক সেনাপতির সুদক্ষ পরিচালনায় সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ও পরিচালিত হয়, তখনই বিজয়ের আনন্দে সেই সমগ্র কর্মপ্রয়াস পূর্ণতায় পরিসমাপ্ত হয়। আমাদের নবজাগরণের এযাবৎ সমস্ত একক বা সঙ্ঘবদ্ধ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড কর্মপ্রয়াসকে একটি পূর্ণ পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে একজন দক্ষ নির্ভীক সেনাপতির প্রয়োজন ছিল। স্বামীজী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সহজাত ক্ষমতার অবাক উত্তরাধিকারে সজ্জিত দুর্জয় মহান সেনাপতি। দেহ-মন-আত্মার বিকশিত পূর্ণতায় স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এতই অনন্য ছিল, এমন কি শরীরী প্রতিভায়ও, দেখলেই তাঁকে সম্রাটের মতো মনে হত। রোমাঁ রোলাঁ তাই বলেছেনঃ

"...a pair of magnificent eyes, large, dark, and rather prominent, with heavy lids, whose shape recalled the classic comparison to a lotus petal. Nothing escaped the magic of his glance, capable equally of embracing in its irresistible charm, or of sparkling with wit, irony, or kindness, of losing itself in ecstasy, or of plunging imperiously to the very depths of consciousness and of withering with its fury. But his pre-eminent characteristic was kingliness. He was a born king and nobody ever came near him...without paying homage to his majesty." [১১০]

বস্তুত বীর্যবান মানসিকতায় এবং উদাত্ত কর্মের ব্যাপ্তিতে তিনি ছিলেন একাধারে রাজা ও ঋষি। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের রাজর্ষি ও Plato-র Philosopher King—এই দুইয়ের পরিপূর্ণ রূপায়ণ এবং সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল স্বামীজীর জীবনে ও চরিত্রে। পরাধীন ভারতের তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা, রাজার রাজা এবং ভারতজনতার "friend, philosopher and guide." তাই তিনি বহুধা বিচিত্র বিভিন্নমুখী জাতীয় আন্দোলনের, প্রতি-আন্দোলনের সমস্ত ধারাকে ভগীরথের মতো বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন মহত্তম মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে, আমাদের এই বিবর্ণ বিধ্বস্ত ধূসর ক্লান্ত নগ্ন বিষণ্ণ উপকূলে, আমাদের বিপন্ন সংস্কৃতির দগ্ধ ভস্মস্তূপে এবং ক্রমে আমাদের প্রত্যহের পথেপ্রান্তরে, গ্রামেগঞ্জে, নগরে বন্দরে জনপদে। সমস্ত বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, সব আন্দোলন, সব কর্মপ্রয়াস, সব সঙ্ঘটন, সব বহুধা

বিক্ষিপ্ত চেতনাকে তিনি সমন্বিত করে, একটি যুগোপযোগী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে সেই সংহত শক্তিকে প্রয়োজিত করেছিলেন সর্বাত্মক মানবকল্যাণে এবং একটি বিশেষ ভূখণ্ডের মানুষের সর্ববন্ধনমুক্তির প্রয়াসে। স্বামীজীর এই মহাসাধনা প্রত্যক্ষ করেই রোমাঁ রোলাঁ লিখলেনঃ

"The world finds itself face to face with an awakening India. Its huge prostrate body, lying along the whole length of the immense peninsula, is stretching its limbs and collecting its scattered forces. Whatever the part played in this reawakening by the three generations of trumpeters during the previous century —(the greatest of whom we salute, the genial Precursor : Ram Mohun Roy), the decisive call was the trumpet blast of the lectures delivered at Colombo and Madras.

"And the magic watchword was Unity. Unity of every Indian man and woman (and world-unity as well) ; of all the powers of the spirit—dream and action ; reason, love, and work. Unity of the hundred races of India with their hundred different tongues and hundred thousand gods springing from the same religious centre, the core of present and future reconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduism. Unity within the vast Ocean of all religious thought and all rivers past and present, Western and Eastern. For—and herein lies the difference between the awakening of Ramakrishna and Vivekananda and that of Ram Mohun Roy and the Brahmo Samaj—in these days India refuses allegiance to the imperious civilisation of the West, she defends her own ideas, she has stepped into her age-long heritage with the firm intention not to sacrifice any part of it, but to allow the rest of the world to profit by it, and to receive in return the intellectual conquests of the West." [১১১]

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বস্তুতপক্ষে জীবন ও জগৎ এবং পরাজগৎ সম্পর্কেও এই সর্বাত্মক সমন্বয়বাদই বিশ্বের কাছে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ সুসমাচার। একালের মহান দার্শনিক তাই স্বামীজী সম্পর্কে বললেনঃ

"...a great advocate of equilibrium between warring forces

of life : reason and faith, matter and spirit, individual and society, science and religion, the past and the present, the East and the West and last but not the least, haves and have-nots."[১১২]

স্বামীজীর কর্মপরিকল্পনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই অসাধারণ। জাতির প্রতিটি প্রয়োজনের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে আবার সঙ্গে সঙ্গে মহত্তম মানবিক আদর্শ অবিস্মৃত থেকে তিনি পরাধীন ভারতে প্রথম রচনা করেছিলেন একাধারে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ম্যাগনাকার্টা—আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বমানবের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান মুক্তিসনদ। সে সনদে কি আছে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

স্বামীজীর সর্বাত্মক উন্নয়ন-পরিকল্পনাঃ স্বামীজীর কর্মপ্রয়াস এতই বিচিত্র, বহুমুখী পরিব্যাপ্ত, একাধারে এত স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের সমন্বয়পথ রয়েছে সেখানে যে তাঁকে Unacknowledged Planning Commission-এর প্রথম Chairman বলে উল্লেখ করতে চাই। হ্যাঁ, তিনি আগামী পনেরো শত বছরের জন্য নির্দিষ্ট সব খুঁটিনাটি সহ একাধারে স্বল্প ও দীর্ঘ-মেয়াদী প্রাণ ও জীবন-পরিকল্পনা জাতির হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। স্বামীজী একাধারে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎসাদনের, যুগপৎ দেহ-মন-আত্মার চরম উৎকর্ষ বিধায়ক একটি সর্বার্থসাধক পরিকল্পনা তৈরী করে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্যঃ যা একাধারে জাতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবতাবোধে উদাত্ত, ভাস্বর। এবং যে পরিকল্পনা একাধারে সমকালীন এবং চিরকালীন মানুষের দেহে-মনে-আত্মায় পরিপূর্ণ অপাবৃত হয়ে ওঠার সাধনায় উজ্জ্বল দিশারী এবং প্রত্যহ পথপ্রদর্শক। এবং এমনি করেই ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সংশয় ও অবজ্ঞার মনোভাব এবং অসহায় আত্মসম্ভ্রমবোধহীনতা, পরানুকরণ ও পরধর্মলোলুপতার গ্রাস থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করলেন। যেহেতু স্বদেশ ও স্বসমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে বিশ্বধর্মস্থাপনের প্রয়াস, বিশ্বপ্রেমের সৌধনির্মাণ সবই ব্যর্থ, সেইহেতু স্বামীজী তাঁর পরিকল্পনায় সবচেয়ে আগে নজর দিয়েছেন নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি। স্বামীজীর এই স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও অকপট ভালবাসার প্রসঙ্গেই মনে পড়ে তাঁর গুরু, প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন দক্ষিণেশ্বরের সেই অবাক পুরোহিতটির কথা।

জীবন ও জগৎ অভিমুখী অভিসারঃ এ কেমন সন্ন্যাসী, স্ত্রীকে ত্যাগ করেননি, মাকে ত্যাগ করেননি; প্রায় একই সঙ্গে একই পরিধির মধ্যে বসবাস

করেন! শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে শাড়ী কিনে দেন, গয়না গড়িয়ে দেন, সকাল-সন্ধ্যায় মাকে সেবা করেন, মাকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বের হন! এ কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শন করে, ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হয়েও মানুষের সেবাকে "মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করেন! ...সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না।"[১১৩] সন্ন্যাসীর মুখে এ কি আশ্চর্য কথা? এমন অপূর্ব কথা তো এর আগে কেউ শোনেনি। এ কেমন গুরু, নির্বিকল্প সমাধির মাধ্যমে ব্রহ্মে লীন হতে আকাঙ্ক্ষিত শিষ্যকে ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেনঃ "এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি বীরত্ব! তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ!" বলেনঃ "তোর মন এত ছোট যে, তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!"[১১৪] এই আশ্চর্য গুরুর আশ্চর্য শিষ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। ইহ-পর, লৌকিক-আধ্যাত্মিক এই দুই নিয়েই সমগ্র জীবন। এবং এই সমগ্র জীবনের পূর্ণায়তির—নব জীবনবাদই বাংলার নবজাগরণের অত্যাশ্চর্য ঘোষণা। "আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈত-তত্ত্ব।"[১১৫] শ্রীরামকৃষ্ণ এই গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে একই দেশে ও কালে অভেদরূপে দেখলেন। ঠাকুরের অনবদ্য ভাষায়ঃ "বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল ব'লতে গেলে শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হ'লে যে ওজনে কম পড়বে।"[১১৬] এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই বিবেকানন্দের কণ্ঠে উৎসারিত হল নতুন যুগের প্রাণবার্তাঃ

"...may I be born again and again, and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls—and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor

of all races, of all species, is the special object of my worship."[১১৭] "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।"[১১৮] স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চেয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ "যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"[১১৯] বললেনঃ "আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি...সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোন লাভ নাই।"[১২০] "তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজ, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি।...যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী।"[১২১] এই হল নবযুগের রূপকার প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের যথার্থ রূপ। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছে এই জগৎ-জীবনও পরম সত্য রূপেই প্রতিভাত। বাস্তব জীবনের দুঃখব্যথা দারিদ্র্য মায়ামাত্র নয়। পরন্তু সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণ সেই বিশ্বময়ীরই রূপ। সেরূপেই তাঁকে সেবা কর। পূজা কর। গুরুর এ উপদেশ শিরোধার্য করলেন শিষ্য। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই শেষতম কৃত্য হলেও আগে মানুষকে মানুষের মতো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং একাজ শুরু হবে গৃহাঙ্গন থেকে। এবং সেভাবেই তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন এবং ধাপে ধাপে সর্বাত্মক মুক্তির পথে তাঁর পদক্ষেপ।

নবজাগরণের সংজ্ঞাঃ রেনেসাঁ সম্পর্কে মস্ত মস্ত পণ্ডিতদের তাবড় তাবড় কেতাব থেকে দুরূহ নিদারুণ সব উদ্ধৃতি উদ্ধার না করে রেনেসাঁর

যথার্থ অর্থোদ্ধারে স্বামীজী-কথিত বহু প্রচলিত গল্পটির পুনরুক্তি করছিঃ আসন্নপ্রসবা এক সিংহী শিকারের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক ভেড়ার পালে এবং সেখানেই তার ভূমিষ্ঠ হল একটি শাবক। রাখালদের সমবেত আক্রমণে নিহত হল সেই সিংহী। এদিকে ছোট সিংহের বাচ্চা ভেড়ার পালের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। ভেড়ার পালের সঙ্গে থেকে ভেড়ার আচার-আচরণ সে শিখল। ভেড়ার মতোই ঘাসপাতা খায়, এমন কি তাদের মতো ভ্যা ভ্যা করে ডাকে। কিছুদিন পরে আবার এক রক্তলোলুপ সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভেড়ার পালে শিকারের প্রত্যাশায়। সিংহের গর্জনে ভেড়ার পালের সঙ্গে শিশু সিংহও লেজ গুটিয়ে পালাতে গেল। আক্রমণকারী সিংহ ভেড়ার পালে নিজেদের জাতভাইকে দেখে আশ্চর্য হল। ঘাড় ধরে তাকে টেনে নিয়ে এল জলাশয়ের কাছে। সে তখন বড় সিংহের থাবার নীচে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বড় সিংহ বললঃ "দ্যাখ, ভালো করে নিজের মুখ চেয়ে দ্যাখ দেখি! কে তুই জানিস? চিনতে পারছিস নিজেকে? আমিও যা, তুইও তা। ডাক দেখি।" বড় সিংহ গর্জন করল। জলাশয়ে আত্মমুখ দেখে ভেড়ার পালের সিংহেরও আত্মবিশ্বাস ফিরে এল মনে। চিনল নিজেকে। সেও গর্জন করে উঠল। অর্ধমৃত শিকার ফেলে দিল তার মুখের কাছে। নে, খা। ছোট সিংহ প্রথম রক্তস্বাদ গ্রহণ করল। এবং বীরবিক্রমে শিকার মুখে বড় সিংহের সঙ্গে ঊর্ধ্বে লাঙুল তুলে উদ্দাম অরণ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। "Sinners? It is a sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature. Come up O lions, and shake off the delusion that you are sheep." অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত পরানুকরণপ্রিয় ভীরু দুর্বল পরমুখাপেক্ষী অসহায় আত্মভ্রষ্ট আত্মসম্ভ্রমহীন জাতিকে তার হারানো আত্মমুখ দেখানোর সাধনাই ছিল বিবেকানন্দের। ক্লীবতা হীনম্মন্যতা দূর করে হৃদয়ে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়েই এই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই ক্লীবতা, এই দুর্বলতা থেকে মুক্তির জন্য তিনি অর্ধমৃত জাতির শিয়রে দাঁড়িয়ে শিব-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বললেনঃ "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-৫৪) বললেনঃ "ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর, হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। অভীঃ অভীঃ অভীঃ। ভগবানকে বিশ্বাস করিবার আগে নিজেকে বিশ্বাস কর।" বললেনঃ "সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল ভাবা।" সমগ্রভাবে জাতির উদ্দেশ্যে বললেনঃ "কিছুতেই ভয় পাইও না, তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে

মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তি-হীন।...ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়।"[১২২] বললেনঃ "...কেবল বিশ্বাসী হও। ...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।...পশ্চাতে চাহিও না।...এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"[১২৩]

চিকাগো ধর্মসভা ও স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ঃ শুধু বক্তৃতায় আর রচনায় নয়, নিজের জীবনে আত্মবিশ্বাসের বিশ্ববিজয়িনী শক্তিকে প্রমাণ করে দেখালেন। নিঃসহায় নিঃসম্বল একজন সন্ন্যাসী হয়ে (এবং পূর্বাশ্রমে কলকাতার এক সহায়সম্বলহীন বি.এ. পাশ বেকার যুবক নরেন দত্ত) শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন। পরাধীন ভারতের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে, "The cyclonic Hindoo of India" বিশ্বধর্ম-মহাসভায় যে জগৎ-জয় করলেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমগ্র জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে পড়ল। এই একটি মাত্র কর্মসাফল্যে তিনি জাতির হৃদয়ে বিলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন। ভেড়ার পালে হারিয়ে যাওয়া স্বধর্মচ্যুত ভারত-বাসীকে সিংহশাবকের মতোই তিনি আত্মমুখ দেখাতে কৃতকার্য হলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪-এর সম্পাদকীয়তে লিখলেনঃ

"He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of West than what has hitherto been done by our political leaders put together."

এবং অনেকের মতে স্বামীজীর আমেরিকা জয়ের ঘটনা থেকেই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ উপ্ত হয় জাতির মানসচৈতন্যে। নিবেদিতাও বললেনঃ "চিকাগোয় প্রদত্ত স্বামীজীর ক্ষুদ্র ভাষণটি ভারতের নিকট স্বাধিকারলাভের সংক্ষিপ্ত সনদ।"[১২৪] প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী জাতি হিসাবে আমাদের 'অস্তি'কে, আমরা যে বেঁচে আছি এই সত্যকে সেই প্রথম বিশ্বের দরবারে বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেখালেন। সব রকম জড়ত্ব থেকে, তামসিকতা থেকে জাতিকে মুক্ত করতেও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন পৌরুষের মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে বেঁচে থাকবার একমাত্র সঞ্জীবনী। হীনম্মন্যতা, তামসিকতা ও জড়তায় আচ্ছন্ন জাতির উত্থানের জন্য রজোগুণকে এত প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন স্বামীজী যে, তিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেননিঃ

"হ্যাঁ, যতদিন যাচ্ছে, ততই দেখছি সব কিছু রয়েছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বার্তা। যদি পারো পাপ কর, পুরুষের মতো। বদমাস যদি হতে হয় বিরাট আকারে তা হও।"

আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনঃ আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠলেই জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে জাতীয় আদর্শের সত্য স্বরূপটি। কি ছিলাম—কি হয়েছি—কি আমাদের হতে হবে—এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি রেখাচিত্র তুলে ধরলেন চোখের সামনে। ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে হলে বর্তমানকে জানতে হবে। ঐতিহ্যের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। তবে শ্রদ্ধাশীলতা মানে অতীতের গৌরব নিয়ে ব্যর্থ কর্মহীন আস্ফালন অহংকার নয়, তাও স্বামীজী স্পষ্ট করে বললেনঃ "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান...চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।...ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে,...সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"[১২৫] পশ্চিম থেকে অমৃত আসছে, গরলও আসছে। আত্মশ্লাঘা ও আত্মবিশ্বাস যে এক জিনিস নয়—এ সম্পর্কেও সচেতন করে দিলেন স্বামীজী। আত্মশ্লাঘা তার নিজের ভিতরেই বহন করে ধ্বংসের বীজ। তাই ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপের কণ্ঠে "আর্যবাবাগণের জাঁক" করতে, প্রাচীন ভারতের গৌরব নিয়ে "ডম্ ম্ ম্ বলে ডম্ফই করতে" নিষেধ করলেন। কারণ "স্বধর্মে তীব্র অনুরাগবশে যদি কেউ পরধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয়জ্ঞান করে, কিংবা অপরের ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গুণগানকল্পে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে।"

নতুন দিগ্বিজয়ঃ উজ্জ্বল আশাবাদঃ অথচ ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামীজী সুনিশ্চিত। তিনি শুনতে পাচ্ছেন নবযুগের দৃপ্ত পদধ্বনি। তিনি বার বার বলছেন সত্যযুগ এসে গেছে। আর ভয় নেই। ভারতবর্ষ আবার দিগ্বিজয় করে ঘরে ফিরবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ দিগ্বিজয়ের যথার্থ অর্থ কি তাও বললেন। বললেনঃ মানুষের রক্তপাতে, অস্ত্রের ঝনৎকারে, পশুশক্তির আন্দোলনে এ দিগ্বিজয় নয়। কারণ ভারত-ইতিহাসে পররাজ্যলোলুপতার এরকম কোন

কলঙ্কজনক অধ্যায় নেই—যেখানে একজন রাজা-সেনাপতিও অস্ত্রের সাহায্যে বেরিয়েছিলেন পররাজ্য গ্রাস করে নিতে। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, উজ্জ্বল শুদ্ধ মানবতা এবং সর্বমানুষের কল্যাণসাধনাই তার দিগ্বিজয়ের একক হাতিয়ার। অতীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে, তবে এবারে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখন্ড, চীন জাপান মাত্র নয়, ভরত বের হবে সমগ্র বিশ্ববিজয়ে। বললেনঃ "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে।" [১২৬]

স্বামীজীর সমন্বয়ী কর্মযোগঃ স্বামীজী যে বিশ্বের কাছে আমাদের আত্ম-পরিচয় উন্মোচন করলেন, ভারতের যথার্থ রূপচিত্রটি তুলে ধরলেন, তাও ঐ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। অতীতের মহাভারতের যে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, তা ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের মিলিত ভারতবর্ষ। এবং ভবিষ্যতে যে মহাভারত গড়ে উঠবে তার দায়দায়িত্বও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের। সকলকে নিয়েই আমরা। ভারতবর্ষ বলতে বিশেষ একটি উদার সার্বভৌম শুদ্ধ মানবিক উত্তরাধিকার বোঝায়। সেই উত্তরাধিকার যিনি অর্জন করেছেন তাঁকেই ভারতবাসী বলতে পারি। সভ্যতার ঊষালগ্নে সিন্ধুনদ-তীরবর্তী মানুষের আদি সভ্যতার অমল উত্তরাধিকার বহন করছি বলে আমরা হিন্দু নামে অভিহিত। রেনেসাঁর মানবধর্মের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতার শাশ্বত বিরোধ। বস্তুত এই সমন্বয়ী মানবধর্মই ঠাকুর-স্বামীজী প্রবর্তিত যুগধর্মের সার্থকতম বার্তা। তা না হলে স্বামীজী তত্ত্বের দিক থেকে যা বলেছেন তা এমন কিছু নতুন নয়। নতুন যা, তা হল যুগের উপযোগী করে তার ভাষ্যরচনা এবং প্রত্যহ-জীবনচর্যায় তার প্রযুক্তি; ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মনুষ্যধর্মের সর্বাত্মক উদ্বোধনের প্রয়োজনেই তার অনিবার্য বিশ্বময় সম্প্রয়োগ। নিবেদিতা তাই বললেনঃ "...কেবল তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হননি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনকেন্দ্রও হয়েছেন। যদি এক ও বহু সম সত্য হয় তাহলে কেবল বিভিন্ন ধর্মই নয়, বিভিন্ন কার্য-রীতি, সংগ্রাম-রীতি, সৃষ্টি-রীতি—সকলই উপলব্ধির নানা পথ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আর আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে পার্থক্য করা চলে না। অতঃপর শ্রমে ও সাধনায় ভেদ নেই, জয়ে ও ত্যাগে ভেদ নেই। জীবনই ধর্ম। অর্জন এবং ধারণ—ত্যাগ ও বর্জনের মতই জীবনের কঠিন দায়িত্ব।" [১২৭] **ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর এই** অভিমতের প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও শুনতে পাইঃ "প্রাচ্যসভ্যতার

কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে।"[১২৮] আমাদের দেশের ধর্ম শব্দের কোন প্রতিশব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নেই। শুধু ভারতবর্ষের কাছেই নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছেই ঠাকুর-স্বামীজী প্রবর্তিত নতুন যুগের এই হল আধুনিকতম সুসমাচারঃ জীবনই ধর্ম। ভারতবাসীর কাছে এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন উপরোক্ত বাণীখণ্ডেরই অন্য রূপান্তরঃ ধর্মই জীবন। এই জীবন ও ধর্মের সমন্বিত ঐকতানই ভারতবাসীকে স্বামীজী নতুন করে শোনালেন। এই কারণেই বাস্তব জীবনেও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা চিত্রবিদ্যা প্রসঙ্গেও স্বামীজীর উৎসাহের শেষ ছিল না। শিল্পে সঙ্গীতে খেলাধূলায়ও ভারতবর্ষ নিজের যথাযোগ্য স্থান করে নিক স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। কারণ এ সবই যে সর্বাত্মক হয়ে ওঠার সাধনার অন্তর্গত। নবজাগরণের প্রাণগঙ্গা তাই সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য সঙ্গীত সংস্কৃতির আঙিনায় সর্বত্র প্রাণোচ্ছল বয়ে যাক। "জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে।"[১২৯] রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরই প্রাণসঞ্চার করতে।" আধুনিক চিত্রশিল্পের গতিপ্রকৃতি, রীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে। এবং নিবেদিতার কাছ থেকেই হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু প্রভৃতি আধুনিক শিল্পাচার্যগণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেনঃ এটি ঐতিহাসিক তথ্য। সাহিত্য, শিল্প, বিশেষ করে সঙ্গীত ও চারুকলা যে মানুষের আত্মপ্রকাশের বাহন এবং এর মধ্য দিয়ে যে আত্মিক উৎকর্ষ লাভ ঘটে, স্বামীজী এই জীবনসত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে শিল্পে সঙ্গীতে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নতুন কিছু করার অন্ধ মোহে স্বধর্মভ্রষ্ট হোক—এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ভারতসঙ্গীতের আত্মা লুকিয়ে আছে ধ্রুপদে। তাই কীর্তন বর্জন করে গভীর ভাবোদ্দীপক ধ্রুপদকে ভারতবর্ষ গ্রহণ করলেই তার সার্বিক উন্নতি হবে বলে স্বামীজী মনে করতেন। ভারতীয় সঙ্গীতে হারমনির অভাবের জন্য বীররসের স্বল্পতা স্বামীজীকে পীড়া দিত—যদিও আমাদের মার্গ সঙ্গীতের অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট গুণাবলী (cadence বা মিড়, মূর্ছনা প্রভৃতি) আছে যা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নেই, একথাও স্বামীজী খুব ভালভাবেই জানতেন। শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গীত শিল্প ভাস্কর্য চারুকলা সব কিছুতেই উৎকর্ষ

লাভ করবে নবজাগরণোত্তর ভারতবর্ষ এ বিশ্বাস স্বামীজী পোষণ করতেন। বস্তুত সব কিছু গ্রহণ করেই ভারতসভ্যতার পরিপূর্ণ অখন্ডতা। সবকে নিয়েই সর্বেশ্বর। জীবনের বিচিত্র রূপে রূপে সেই একেরই প্রকাশ। একেরই উপাসনা।

নিবেদিতা আরও বললেনঃ "এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারক করেছে। যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অপরপক্ষে তা জ্ঞান ও ভক্তিরই দ্যোতক। তাঁর কাছে কলকারখানা, পাঠকক্ষ, ক্ষেত-খামার —সাধুর কুঠিয়া বা মন্দিরদ্বারের মতই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎ মিলনের যথার্থ পটভূমি। তাঁর কাছে নরসেবা ও দেবসেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না—পার্থক্য ছিল না পৌরুষ-বীর্য ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে, ন্যায়বোধ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। একদিক দিয়ে তাই তাঁর সকল উক্তিকেই এক কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের ভাষ্য বলা যায়। একদা তিনি বলেছিলেন—শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।"[১৩০] তবে জীবনে ঐ সমন্বয়দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে মূলত কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মিলিত পরিকল্পনা পেশ করলেন স্বামীজী বর্তমান ভারতের কাছে। জনসেবা তো ঈশ্বর-আরাধনারই ব্যবহারিক প্রকাশ, কর্মে পরিণত বেদান্তের একালীন জীবন-ভাষ্যও বটে। তবে স্বামীজী কর্মের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তমো-গুণাশ্রয়ী জড়ত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিতদের জন্য কর্মযোগই যথার্থ মুক্তির পথ; ইহজীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একমাত্র উপায়। তাই স্বামীজী বললেনঃ "আলস্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। 'ক্রিয়াশীলতা' অর্থে সর্বদাই প্রতিরোধ বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্-ভাবের প্রতিরোধ কর।"[১৩১] নব্যভারতকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি—সর্বদাই যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয় আলোক দেখিতে পাইব।"[১৩২]

ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতির প্রতি আমাদের এত আসক্তি যে স্বধর্মত্যাগেও আমরা কুণ্ঠিত নই; তাদের জীবনে কিন্তু বহুধা ব্যাপ্ত সুগভীর কর্মপ্রয়াস। নিরলস শ্রমের বিনিময়েই তারা অর্জন করেছে এত সব ভোগসুখের স্বাচ্ছন্দ্য,

ইহজীবনের রূপবিলাস ও আনন্দস্বর্গ। অথচ আমরা তমিস্রাচ্ছন্ন, আলস্য-পরায়ণ ও ঘোরতর কর্মবিমুখ। ভারতও যদি এই কর্মকে গ্রহণ করে তবে একই সংগে ইহজগতে সুখসমৃদ্ধি এবং বৃহৎ জীবনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কর্মবিমুখ জাতি কি করে এই সর্বাত্মক কর্মপ্রয়াসে যুক্ত হবে? স্বামীজী বললেনঃ দেশকে ভালবাস, সমাজকে ভালবাস। নিজেকে সত্যিকার ভালবাসলেই আজকের যুগে সমাজ ও দেশকেও ভালবাসতেই হবে। তাই বলে দেশের সব নিয়ম নীতি মেনে চলাই শেষ কথা নয়। পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুবর্তী হওয়াই পরম পুরুষার্থ নয়। এমন কি গুরু ঈশ্বর দেবতা কাউকেই তিনি রেহাই দিলেন না। বললেনঃ "গুরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কর, কিন্তু তাঁহাকে অন্ধের মত অনুসরণ করিও না, তাঁহাকে মন্দিরের পাষাণমূর্তিতে পরিণত করিও না। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাস, ভক্তি কর। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ভুলিও না।"[১৩৩] সর্বাধিক মানুষের কল্যাণচিন্তা করে মানব-ধর্মের নিরিখে স্থির বিবিক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচারবিতর্ক করে সব কিছুর পুনর্মূল্যায়ন করে তারপর পথ চল। যুক্তিবাদকে বিসর্জন দিও না। কোন কিছুকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মানতে তিনি নারাজ। কারণ সংসারে শেষ সত্য বলে কিছু নেই। এমন কি তাই বললেনঃ "কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল!"[১৩৪]

একত্ব-অনুভবই যে সমস্ত জাগতিক শক্তিলাভের উৎস—এ সত্য স্বামীজী জানতেন। তাই তিনি শতধা বিভক্ত খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থায় একাত্মতা ও ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। জাতিভেদপ্রথা আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। তাই জাতিভেদপ্রথার অসারতা তিনি ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করলেন।

ইহ-পর জীবনের সমন্বয়ঃ স্বামীজী এটা সুনিশ্চিত বুঝেছিলেন যে, বাস্তব জীবনে সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া, অর্থাৎ কাত্যায়নী সভ্যতার উজ্জ্বল উৎকর্ষ ছাড়া আধুনিক পৃথিবীতে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের বেঁচে থাকার অন্য কোন উপায় নেই। এবং এই বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন, মানুষের মনে ভালবাসার অভিসঞ্চারে যত্নবান হয়েছিলেন তিনি। "বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!"—এ কাব্যপ্রার্থনার অনেক আগেই স্বামীজী, শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র জাতি হিসাবে ভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন

এবং এপথে কর্মপ্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। এই অখণ্ড জাতীয় ঐক্যবোধের প্রয়োজনেই জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা বর্জনে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে তাই ধরা দিয়েছিল ভারত-জননীর বিশাল ব্যাপ্ত মহান বিশ্বরূপ। সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে ভারতবাসী বলেই তিনি আহ্বান করে গেছেন সকলকে, হীন ব্রাত্য অন্ত্যজ চণ্ডাল মুচি মুদ্দাফরাস ভাঙ্গী সকলকেই তিনি সস্নেহে আহ্বান করেছিলেন তাঁর পতাকা-তলে। এবং শুধুমাত্র ধোঁয়াটে ভাবালুতার প্রশ্রয়ে ও উচ্ছ্বাসে হীন অন্ত্যজদের প্রতি তাঁর প্রেম প্রসারিত করেননি, পরন্তু তিনি একটি অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং দার্শনিক তত্ত্বের উপরে (Practical Vedanta) তাঁর মানবধর্মকে, তাঁর সেবাধর্মকে এবং জাতীয়তাকে স্থির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই তিনি এক নব সাম্যবাদের দীক্ষায় সমগ্র জাতিকে, সমস্ত পৃথিবীকে আকৃষ্ট করেছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর দরিদ্রনারায়ণ, হরিজনপ্রীতি, আর্তের সেবা এবং জাতীয় ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতাবর্জন-আন্দোলন স্বামীজীর ভাবাদর্শেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি—একথাটি এখানে স্মরণীয়। "মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলেও বিবেকবাণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।" গান্ধীজী নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। শুধু গান্ধীজীই নয়, তাঁর এই সেবাসুন্দর মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হল সারা ভারতবর্ষ। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়ঃ "The idea seized upon the imagination of India; and relief works for famine, flood, fire, and epidemic, such as were practically unknown thirty years before, Sevashramas and Seva-Samitis (retreats and societies for social service) have multiplied throughout the country." [১৩৫]

গান্ধীজীর সর্বোদয়-পরিকল্পনাটাই স্বামীজীর নব সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নারীশিক্ষা ও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাঃ এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনেই স্বামীজীর নারীমুক্তি-আন্দোলন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সমাজের অর্ধেককে অবহেলায় পিছনে ফেলে কোন জাতীয় উন্নতিই সম্ভব নয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন স্বামীজী গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার অর্জন করতেই হবে। এবং এজন্য সর্বপ্রথম চাই ব্যাপক নারীশিক্ষার প্রচলন। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোল সবই নারীকে শিখতে হবে। তবে সব শিক্ষাদীক্ষার পরও শেষ পর্যন্ত জাতীয়

আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। যেহেতু নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ সমাজ, তাই তাকে আদর্শ জননী হতে হবে। আদর্শ জননী ছাড়া আদর্শ সন্তান সম্ভব নয়। এবং এই আদর্শ সন্তানই একদিন হয়ে ওঠে আদর্শ নাগরিক। এই কারণেই তিনি বার বার সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আদর্শ তুলে ধরেছেন নারী জাতির চোখের সামনে।

নারীশিক্ষা, নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমাদের আত্মমর্যাদার সংগ্রাম, জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধন, সমাজসংস্কারের অন্যান্য সমস্ত কর্মপ্রয়াস, এমন কি তাঁর সেবাপ্রকল্প ও আত্মবিশ্বাসের ঘোষণাঃ সব কিছুর পিছনে একটিই উদ্দেশ্য ছিল—ভারতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এই man-making mission, মানুষ গড়ার দায়িত্বের কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন। "মানুষ তৈরীই আমার ধর্ম।" "আর সেই মানুষতৈরীর কাজ করছেন দিনের পর দিন, অব্যাহত পরিশ্রমে—গুরুরূপে, পিতারূপে, শিক্ষকরূপে—যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে।"[১৩৬] যেহেতু বিকশিত ব্যক্তিত্বই সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ স্থিতিবিধায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেইহেতু সমস্ত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন কাম্য ছিল বলেই সকলের প্রসঙ্গে সমস্ত বিষয়েই—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলকে স্বাবলম্বী করার নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নারীসমাজ সম্পর্কেও তাই তিনি বললেনঃ "...নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?"[১৩৭] সমস্ত মানুষ মূলত এক একথা স্বীকার করেও স্বামীজী প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র্য, তার রুচি, সংস্কৃতি ও যোগ্যতানুসারে হয়ে ওঠার পথকেই একমাত্র জীবনানুকূল সত্য পথ বলে মনে করতেন। নিজের আদর্শ, মত ও পথ যত সুন্দর ও সার্থকই মনে হোক, অন্যের উপর চাপাতে গেলেই সেখানে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য। তাই কারও ঘাড়ে কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবার স্বৈরনীতি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। নিজের দেশ সম্পর্কেও যেমন, অন্য দেশ, অন্য সমাজ প্রসঙ্গেও তাঁর ঐ একই নীতি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদ প্রতি ধর্মের, প্রতি সংস্কৃতির, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীল। বস্তুত স্বামীজীর এই সমন্বয়চেতনা প্রত্যেক মানুষকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালবাসতে শেখায় এবং পরধর্ম ও সংস্কৃতিকে আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও ভারতের স্বাধীনতাঃ সর্বমানুষের সাম্যের

উপরেই স্বামীজীর জীবন-অভিমুখী নয়া মানবতাবাদ এবং সার্বভৌম ধর্ম-সাধনার ভিত্তি। প্রতি মানুষের মধ্যেই এক পরম 'অস্তি'র আসন রয়েছে, শুধু তাই নয়, সেই একের সঙ্গে আমরা নিত্য যুক্ত। তিনিই আমি। আমিই তিনি। সোঽহং। অহং ব্রহ্মাস্মি। সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্ বলেই তো আমি নিত্যমুক্ত। বাস্তবেও এই নিত্যমুক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী বললেনঃ "এই মুক্তির প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।" এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে, কোন রকম অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই মানবধর্ম। এই মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া পাপ। স্বামীজীর বিভিন্ন আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শারীরিক ও মানসিক মুক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক মুক্তিরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং সেদিনকার বিদেশী রাজশক্তি যারা শাসনের নামে দেশজুড়ে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও স্বামীজী সমর্থন করলেন। তা না হলে একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবে সকলের সঙ্গেই তাঁর মৈত্রীর ভাব, কারও প্রতি তাঁর কোন বৈরিতা বা বিরূপতা থাকা সম্ভব নয়। এবং এই স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই হয়ে ওঠার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির সংগ্রাম—ভারতবর্ষের চিরকালীন জীবনাদর্শ। এই স্বাধিকার রক্ষার প্রয়োজনেই, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মহৎ দায়িত্ববোধেই ধর্মরাজ্যস্থাপনার জন্য ভগবদ্‌গীতায় পার্থসারথি পার্থকে ভারতব্যাপী এক মহা ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে সেই নিদারুণ উক্তি করেছিলেনঃ "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"[১৩৮] সব রকম শৃংখল মোচন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের আন্দোলন, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্তি, শিক্ষার সংস্কার ও নতুন প্রয়োগরীতি প্রভৃতি মানুষের যে কোন মুক্তিপ্রয়াস, প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকেই স্বামীজী মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনারই বিভিন্ন রূপ বলে মনে করতেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোন মুক্তি-আন্দোলনকেই আধ্যাত্মিক মুক্তির পূর্বপ্রস্তুতি বলে স্বামীজী মর্যাদা দিতেন। এই ভূখণ্ডের মানুষের বিদেশী শাসনশৃংখল মোচনের সমস্ত আন্দোলনে তাই স্বামীজীর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করে না ভারতবর্ষ। বৃহতের অভিমুখে—সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির অভিযাত্রার পথে সোপান মাত্র। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-ধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে মহাপ্রস্থানের অভিমুখেই মহাজীবনের গতিপথ চিহ্নিত হয়ে আছে।

স্বামীজী দেশের কোন স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেননি একথা সত্য, কিন্তু জাতির চেতনায় তিনিই প্রথম তীব্র স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রেমের শুদ্ধ বহ্নি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। মানসপ্রস্তুতি হিসাবে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সমবেত করেছিলেন তাঁর পতাকাতলে প্রত্যাসন্ন একটি মহৎ আন্দোলনের জন্য—তার দার্শনিক সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা-মালা ও রচনাবলীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলন। ১৮৯৭-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। এবং ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই মহাপ্রয়াণ। এবং এর আগের আট বছরের পরিব্রাজক জীবন—তাঁর কর্মযজ্ঞের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে। কারণ ঐ সময়েই দেশের সঙ্গে ঘটে তাঁর নিবিড়তম পরিচয়। একদিকে সর্বরিক্ত ভারতবাসীর প্রত্যহজীবনের ক্ষুধা মৃত্যুর সঙ্গে, দুঃখ ও ব্যর্থতার সঙ্গে পরিচয়, অন্য-দিকে আবার এদেশের সাধারণ মানুষেরই যথার্থ শক্তির উৎসের অভিজ্ঞানও লাভ করেন এই একই সময়ে। দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ, অসাধারণ সব মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের অন্তরঙ্গ একজন হয়ে তাদের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়েই এদেশের যথার্থ সত্য পরিচয় লাভ করলেন স্বামীজী। একেই বোধ হয় বলে জীবনে জীবন যোগ করা। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, অর্থনীতির ভাষায়, মাত্র একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই দেশের মানুষকে একটি সুমহৎ ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। প্রস্তুতিপর্বের যা কিছু কৃত্য সম্পাদন করে দেশ ও জাতিকে একটি মহৎ পূর্ণতা ও ব্যাপ্ত পরিণামের দিকে সুনিপুণ সেনাপতির মতো ডাক দিলেন। এবং সে ডাকে সমগ্র দেশ সাড়া দিল, সকলে সমবেত হল তাঁর গৈরিক পতাকাতলে। উৎকণ্ঠ উদ্গ্রীব হয়ে সকলেই যেন অপেক্ষমাণ নেতার কাছ থেকে একটি মাত্র আদেশের প্রত্যাশায়। একটা নতুন কিছু করার আবেগে, একটা অঘটন ঘটাবার জন্য সকলেই অতন্দ্র উদ্বেল হয়ে যেন তাকিয়েছিল সর্বত্যাগী নেতার মৌনমুখর মুখের দিকে। জাতির হৃদয়ে সেদিন যে ভাবনার ঝড় উঠেছিল, অপ্রতিরোধ্য যে যৌবনজলতরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল আমাদের অশান্ত উদ্দাম উপকূলে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই তার কিছুটা প্রকাশ সম্ভবঃ

"হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান ঝনন রনন—
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদাত্ত জয়ভেরি, করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব, অর্পিব পরান।

* * *

চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি॥"

কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার এই মহাসাধনা (মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,—কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তাঁরি কাছে আসে।) সত্য হয়ে উঠবার অবকাশ পেল না জাতির জীবনে। ঘনিয়ে এল মহাপ্রয়াণের দিন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। কিন্তু তবু কি সব শেষ হয়ে গেল? না। ইতিহাস বলছে, না। "যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে, নিশ্চয় সে জানি" স্বামীজীর এই অসমাপ্ত প্রাণযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে, জাতির সেই আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা ও হৃদয়াবেগকে কর্মে রূপান্তরিত করতে আরও প্রায় আটত্রিশ বছর সময় লেগেছিল। তাঁরই আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করলেন তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁরই মানসপুত্র নেতাজী। ১৯৪১—৪২ সনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবনে আবার ফিরে এল নবযৌবনের ঢেউ। যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?—সে অন্য প্রসঙ্গ। এজন্যই ঐতিহাসিক বললেন ঃ "Vivekananda did not die in 1902. He lived till 1946. His ideas, his sadhana flowed in different channels to enrich and vitalise the nation and enabled it to win the first round. With Gandhi and Bose closes the epoch which he had opened. A new chapter has begun. The future will show whether his soul has died or it will reincarnate to spiritualise the nation and to guide it to the conquest of mankind."[১৩৯]

আগেই বলেছি একটি মাত্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় হাতে পেয়েছিলেন স্বামীজী। তাতেই যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন, সঙ্গত কারণেই আশা করা যায় যে, অন্তত আরও দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় পেলে স্বামীজী নিশ্চয়ই জাতিকে তার অভীষ্ট লাভের পথে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরণের আগেই হয়তো স্বামীজীর ভাষায় 'পরস্বাপহারীদের' কালাপানি পার করে দেওয়া যেত। এবং সর্ববন্ধনহীন শোষণমুক্ত এক সুখী সচ্ছল মহা পৃথিবীর অভিমুখে উত্তরণের পথে শুরু হয়ে যেত হয়তো আমাদের অভিযাত্রা ঃ "চিত্ত

যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির জ্ঞান যেথা মুক্ত...যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু-রাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি", যেখানে "লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়" কিছুই নেই—"সেই উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে"—বহুকাঙ্ক্ষিত আমাদের সেই নন্দনলোকে। এ প্রত্যাশা ও বিশ্বাস কেবলমাত্র বর্তমান নিবন্ধকারেরই নয়, দেশে বিদেশে বহু অভিজ্ঞ বিপ্লবী, বিশ্রুত ঐতিহাসিক, নেতৃস্থানীয় ইতিহাসসচেতন রাজনীতিজ্ঞ সকলেরই ঐ এক অভিমত।

শূদ্ররাজত্বঃ সাম্যযুগ ও নয়া সাম্যবাদঃ আরও বেঁচে থাকলে স্বামীজীকে কোম্পানির জেলে যেতে হত, না কি ফাঁসিমঞ্চেই জীবন দিতে হত, অথবা সার্থকতার সূর্যদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেন দেশপ্রধানরূপে (Plato-র Philosopher King) — এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে অনেকের কাছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যে তিনি দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে আশ্চর্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে গিয়েছিলেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক নতুন যুগের আগমনী সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। কারণ "সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[১৪০] তিনি বুঝতে পারছিলেন ইতিহাসের নিয়মেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শূদ্রযুগ (proletariate dictatorship) আসছে। তিনি স্পষ্ট বললেনঃ "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...।"[১৪১] তিনি জানতেন ভারতেও এই গণ-অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। একদিন এদেশে ব্রাহ্মণের রাজত্ব ছিল, তারপর এল ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব; ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মানুষকে অপমান করে তাদের পতন হল। এল বৈশ্যযুগ; নির্মম শোষণ ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ফলে বৈশ্যযুগেরও শেষ লগ্ন সমাগত। এবারে শূদ্ররাজত্বের অভ্যুত্থান অপ্রতিরোধ্য! কিন্তু হিংসার পথে অকারণ মানুষের রক্তস্রোত বইয়ে ভারতের মাটিতেও গণ-বিদ্রোহ ঘটুক তা স্বামীজী চাননি। তাই তিনি উচ্চবর্ণের জাতিগুলিকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন—এই সব মূক মূঢ় অসহায় নির্যাতিতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, তাদের সহযাত্রী হতে। তাই তিনি বললেনঃ "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো

ভব।" বললেনঃ মুচি-মেথর চন্ডাল দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্র ভারতবাসীকে ভাইয়ের মতো ভালবাসতে, তাদের বুকে তুলে নিতে। শূদ্ররাজত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই এ দুর্ভাগা দেশকে অপমানিতের সঙ্গে একাসনে নেমে আসতে অনুরোধ করলেন। "সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ!" "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে—"ঃ ইতিহাসের নির্মম নির্দেশে কোথাও পরিত্রাণ মেলেনি প্রেমহীন অত্যাচারীর। কিন্তু স্বামীজীর সোনার ভারতবর্ষে সেই একই ইতিহাসের রক্তাক্ত পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য সকলের মধ্যে সেই "মানুষের নারায়ণে" শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নমস্কার করে ঘরে তুলে নিতে আবেদন জানালেন।

এবং এই শূদ্ররাজত্বের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই বোধ হয়, প্রত্যহের মৌখিক ভাষাকে, যথার্থ গণবাণীকে, সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন স্বামীজী। কথ্যভাষাকে সাহিত্যে সম্প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজী যে শুধু পথিকৃৎ তাই নয়, আমাদের বহু ব্যবহৃত প্রত্যহের লৌকিক ভাষার মধ্যে তাঁর মতো এমন শক্তির ও গতির সঞ্চার করতে পারেননি আমাদের সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ। এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ এমন সবল ওজঃশক্তিসম্পন্ন, এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী এবং এত ধ্বনিময় বাংলা কথ্য ভাষার একমাত্র তুলনা মেলে তাঁরই গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে। স্বামীজীর "ভাববার কথা," 'পরিব্রাজক', "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রভৃতি সাহিত্যকীর্তিগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, নবজাগরণের জন্মলগ্ন থেকেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই নবজাত জাতির আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত একটি ভাষার সন্ধান করে গেছেন। বস্তুত অক্ষরের হাতিয়ার হাতে করেই মানবসভ্যতার প্রথম সার্থক জয়যাত্রা শুরু এবং বাণীব্রহ্মই যে একালের সমস্ত মানবিক সংগ্রামের উজ্জ্বলতম শাণিত শস্ত্র—এই জীবনসত্য জানতেন বলেই বাংলায় প্রথম গদ্যসৃষ্টি এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নবজাগরণের আদি সংগ্রামীরা সকলেই সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন। বিবেকানন্দও সেই বাংলা ভাষাকেই যুগের প্রয়োজনে প্রথম গণরাষ্ট্রের আদর্শ ভাষায় রূপান্তরিত করে গেলেন এবং এখানেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যুগপ্রবর্তক স্বামীজীর সার্থকতম মহান ভূমিকা। এবং এই একই কারণে স্বামীজীর সাহিত্যসৃষ্টিতে লালিত্যের চেয়ে মননধর্ম এবং কল্পনার রামধনুচ্ছটার থেকে তথ্য ও বিষয়-বস্তুর প্রাধান্য। মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা। অন্যথায় তিনি যদি শুধুমাত্র কাব্য বা সাহিত্যসাধনা নিয়েও থাকতেন তাহলে আমাদের সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যরথী হতে পারতেনঃ এ মন্তব্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দঃ আমার বার বার মনে হয়েছে দুঃস্থ দুঃখী দেশের ইতর সাধারণ সম্পর্কে স্বামীজীর যে অনুভব ও অনুরাগ, এদের সম্পর্কে যে জীবনবাণী উচ্চারিত হয়েছে স্বামীজীর রচনাবলীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের 'অপমানিত' কবিতাটি যেন তারই কাব্যরূপমাত্র। দুই বছরের জ্যেষ্ঠ হলেও এযুগের মহা কবি এযুগেরই মহাযোগীর কাছ থেকে এই কবিতাটির ভাবঋণ গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর জীবশিবতত্ত্ব এবং নরনারায়ণবাদ প্রচারের পূর্বে এই ভূখণ্ডের কোন কবির পক্ষেই "মানুষের নারায়ণে" কথাটি ব্যবহার করা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা। গীতাঞ্জলি-যুগের আরও অনেক কবিতায় স্বামীজীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, এর আগের এবং পরের দেশ ও জাতি সম্পর্কিত কাব্যকবিতায়ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। 'চিত্রা' কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির প্রথম অংশ স্বামীজীর নব সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লিখিত—এতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আট বছর আগে কবিতাটি রচিত। স্বামীজীর ভাব ও ভাষার সঙ্গে পর্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায় এই কবিতাটির। স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র ("বর্তমান ভারত"-এর শেষাংশ) এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার ভাবসাদৃশ্যের প্রসঙ্গ অনেকেই আলোচনা করেছেন। অনেক পরবর্তী কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম"কেও মূলত, তাঁর কাব্যভাষা, কলাসৌন্দর্য এবং লিপিচাতুর্য বাদ দিলে, বিবেকানন্দের কর্মে পরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta) তত্ত্বেরই ভাষ্যান্তর বলে আমার মনে হয়েছে। এবং রোমাঁ রোলাঁর রচনায়ও দুজনের এই চিন্তাসাদৃশ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা পড়তে পড়তেও স্বামীজীর রচনা-বক্তৃতা ও পত্রাবলীর অনেক খণ্ডাংশ আমার মনে পড়েছে। এই সব কারণেই রোমাঁ রোলাঁ বললেনঃ "The twin star of the Paramahamsa and the hero who translated his thought into action, dominates and guides her present destinies. Its warm radiance is the leaven working within the soil of India and fertilising it. The present leaders of India : the king of thinkers, the king of poets, and the Mahatma —Aurobindo Ghose, Tagore and Gandhi—have grown, flowered, and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi."[১৪২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর-স্বামীজী সম্পর্কে বরাবরই নিবিড় একটি শ্রদ্ধিত অনুরাগে ও চেতনায় আশ্লিষ্ট ছিলেন। পণ্ডিচেরী আশ্রমের নীরদবরণের গ্রন্থ "শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা" থেকে জানা যায় শ্রীঅরবিন্দের মতো বিপ্লবীও তাঁর বিপ্লবীজীবনের চরম সংকটময় মুহূর্তে ধ্যানালোকে তাঁর চেতনার গভীরে বিবেকানন্দকে বার বার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সত্যপথের সন্ধান পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন আশীর্বাদ।

স্বামীজীর নয়া সাম্যবাদঃ আগেই বলেছি শূদ্রজাগরণ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের মাটিতেও ইতিহাসের রক্তাক্ত নাটক অভিনীত হোক স্বামীজী তা চাইতেন না। কারণ বিপ্লব অনেক ধ্বংসের উপরেই কল্যাণের বীজ রোপণ করে। তাই স্বামীজী শ্রেণীবিশেষের উত্থান অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করেও শ্রেণীসংগ্রামকে, বিশেষ করে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি হিসাবে তার যে অন্তিম রক্তাক্ত অধ্যায়টিও অনিবার্য বলে ঘোষিত—তা থেকে তিনি ভারতকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল যুগেরই বিশ্বের সভ্যতাসংস্কৃতির ভাণ্ডারে এমন অনেক অবদান রয়েছে যা মানুষের চিরকালীন সম্পদ। কোন কারণেই তার বিনষ্টি মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বিপ্লব মানেই অনেক ধ্বংস, অনেক বিনষ্টি—একথা স্বামীজী জানতেন বলেই একটি গঠনমূলক পথ উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছিলেন। শূদ্রশাসনের অকল্যাণকর দিকগুলি ও অন্ধকার পরিণামগুলি এই জাতিকে যাতে স্পর্শ না করে, সেজন্য শান্তিপূর্ণ একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে ইতিবাচক একটি পরিকল্পনা জাতির কাছে উপস্থাপিত করে গেছেন। দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধের প্রেরণায়ই শূদ্র-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে সব রকম রক্তাক্ত হানাহানি, সংঘাত ও ধ্বংস এবং অকারণ হীন পাশববৃত্তির উদ্দাম আত্মপ্রকাশ পরিহার করতে একটি সহজ মিলনের ও ঐক্যপথের সন্ধান দিলেন। ইউরোপের মতো শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য এবং শূদ্রধর্মকর্মের সহিত শূদ্ররাজত্ব স্বামীজী কখনও চাননি। মানুষেরই এক-দলকে নীচে নামিয়ে আর এক দলকে গায়ের জোরে টেনে তোলার আরণ্যক নীতি, একদলকে মেরে কেটে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আর এক দলের সিংহাসন-প্রাপ্তির পাশব পথ কখনও কোন সভ্য মানুষের গ্রাহ্য জীবনদর্শনের অন্তর্গত হতে পারে না। স্বামীজীর মতো বিশ্বমানবের কল্যাণকামীর পক্ষে তা কখনই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপে এবং চীনে যে পথে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এই মুহূর্তেও প্রভুত্বলোলুপতায় সাম্যবাদী চীনে যে উন্মাদ আরণ্যক হিংস্র জীবননীতির প্রসার ঘটছে স্বামীজী থাকলে তা সহ্য করতে পারতেন না। অথচ মানুষেরই হাতে নিপীড়িত নির্যাতিত ক্ষুধার্ত মানবতার যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্গতি চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে, যে

মনুষ্যত্বহীন সুবিধাবাদের আগ্রাসন, এসবের প্রতিকারেই তো শূদ্ররাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে। সকলে মিলেমিশে মানুষের ধর্ম বাঁচিয়ে রেখে, প্রীতিতে-ভালোবাসায়, সহযোগিতায়-সহমর্মিতায়, বিশ্বের বিশাল মানবগোষ্ঠী কি একসঙ্গে সর্বাত্মক মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সাধনায় বেঁচে থাকতে পারে না? স্বামীজী নিজেই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিলেনঃ

"আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।"[১৪৩] এই সত্যযুগের উপযোগী সমাধানই স্বামীজী জাতির কাছে তুলে ধরলেন। শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করতে হবে—এই তাঁর সাধনা। স্বামীজী কর্মানুগ জাতিভেদ বিশ্বাস করতেন কিন্তু জন্মগত জাতিভেদপ্রথার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণত্ব মানুষের একটি বিশেষ উন্নত অবস্থার নাম। এবং সাধনা দ্বারা সকলেই এখানে পৌঁছাতে পারে। তিনি বললেনঃ সত্যযুগে, "এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।"[১৪৪] অর্থাৎ স্বামীজী-পরিকল্পিত শূদ্ররাজত্বের চরম উৎকর্ষের অবস্থায় এই সব কোন ভেদাভেদই আর থাকবে না। কারণ স্বামীজী সত্যযুগ বলতে এক শ্রেণীবৈষম্যহীন সর্ব বিভেদমুক্ত আদর্শ সাম্যে স্থিত, সুস্থ সুন্দর সবল সচ্ছল সমন্বিত সমাজব্যবস্থার (millenium) কথাই বলতে চেয়েছেন। দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই তিনি এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা ও উজ্জ্বল রাষ্ট্রস্থাপনার পরিকল্পনা করলেন। তিনি বললেনঃ "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[১৪৫] অর্থাৎ "সবার-পরশে-পবিত্র-করা-তীর্থ-নীরে" জাতীয়তার মঙ্গলঘট পূর্ণ করেই স্বামীজী ভারতের মাটিতে স্বদেশের ঐতিহ্যানুগত নব সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্বোধন করলেন।

স্বামীজী ও আন্তর্জাতিকতাঃ স্বামীজীর সম্পন্ন সচ্ছল জাতীয়তার মধ্যেই সন্নিহিত উদার আন্তর্জাতিকতার বীজ। তাই তাঁর ধর্মরাষ্ট্রে স্বদেশ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। স্বদেশে যেমন সকল স্বদেশ-

বাসীর মিলন ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে, সব মত ও পথের সমন্বয়ে, মহৎ মানবধর্মে বিধৃত নতুন এক সমাজবাদী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও স্বামীজী তেমনি সকল দেশের সকল জাতির বৈচিত্র্য, বিশিষ্টতা ও অনন্য 'অস্তি'কে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে নয়, সমান শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলের উদ্দেশ্যে, সকল জাতির সকল দেশের মহামিলনের মহৎ ঐক্যের ভিত্তিভূমি রচনা করে গেলেন। তাঁর নির্মিত পথই জীবনের অভিমুখে এবং অতঃপর মহাজীবনের প্রসন্ন অভিসারে এগিয়ে গেছে পূর্ণের প্রাঙ্গণে অনন্ত অভিযাত্রায়!

দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই একই পরম 'অস্তি'র অম্লান অধিষ্ঠানঃ বেদান্তের এই মূল সত্যানুভবের উপরই ঠাকুর-স্বামীজীর সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক মানসিকতা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র জাগতিক প্রত্যয়ের দিক থেকেও ঠাকুর-স্বামীজীর সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা এবং "যত মত তত পথে"র ধর্মাদর্শ সর্বদেশের সর্বকালের সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের সহজ স্বীকৃতিদানের এক মহান মুক্ত সনদ। তাই ঠাকুর-স্বামীজীর সর্বধর্মসাধনা একদিকে যেমন স্বদেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয়তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষকেও একই ঐক্যসূত্রে বেঁধে মহৎ এক দার্শনিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্থাপনা করে গিয়েছে। বাইরে থেকে এক ধর্ম, এক ভাষা বা একটি আদর্শের ভার চাপিয়ে সব দেশ ও জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রাখার বহিরঙ্গ প্রয়াসে বস্তুত কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, পরন্তু প্রতিটি দেশের অনন্য অস্তিত্বকে মেনে, মেনে নিয়ে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা, অতঃপর অন্য জাতি ও ধর্মের সঙ্গে সহজ আদানপ্রদান, মেলামেশা ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সমন্বয় ও সহযোগিতার সম্পর্ক এবং পরিণামে সহৃদয় বন্ধুত্বঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়তত্ত্ব এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং এ পথেই বিশ্বমানবের যথার্থ ঐক্য এবং মিলন সম্ভব। "Instead of antagonizing, therefore, we must help all such interchange of ideas between different races, by sending teachers to each other, so as to educate humanity in all the various religions of the world ; but we must insist,...not to abuse others, nor to try to make a living out of others' faults ; but to help, to sympathize with, and to enlighten all." ১৪৬

বাইরে থেকে চাপানো আদর্শ ও ঐক্যের শ্লোগান যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ

হয় এবং স্বামীজী-প্রবর্তিত আন্তর্জাতিকতার নীতিই যে অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শক, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে তা বিগত পঞ্চাশ বছরেই প্রমাণিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ বলে আজকে আর পৃথিবীতে কিছু নেই। "সারা দুনিয়ার কৃষক-মজদুর এক হও"—শ্লোগান আজ অর্থহীন হয়ে পড়ছে, আর কার্যকরী হতে পারছে না বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এবং অন্যান্য ছোটবড় সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যেও, এমন কি খোদ চীনে নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত সাচ্চা কমিউনিজমের ধারক ও বাহক কে?—এ নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতর্ক, আন্দোলন, পরস্পর খুনোখুনি, খেয়োখেয়ি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে। অথচ শুদ্ধ মার্ক্‌সীয় দর্শনে ও নীতিতে এ বিবাদবিতর্কের কথা ছিল না। কথা ছিল না 'Fatherland'-এর দোহাই দিয়ে বর্বর নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করার। সাচ্চা মার্ক্‌স্‌বাদীর Fatherland সেখানেই যেখানে কৃষক-মজদুরের সংগ্রামী শিবির ঐক্যবদ্ধ। মুনাফাবাজ স্বার্থসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যর্থ জোটের হাস্যকর পরিসমাপ্তির কথা আর নাই বা বললাম; কারণ মার্ক্‌স্‌-এর মতে তারা তো নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজেদের সঙ্গেই বহন করে, ধ্বংসের বীজ তাদের নিজেদের মধ্যেই। অথচ রাজনৈতিক ভাষ্যকারের সাম্প্রতিককালের উক্তি হলঃ "আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে এখন আর কিছু নেই। সবই এখন জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে।" প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে রক্ষা করে, তার ধারাবাহিক ঐতিহ্যপরম্পরাকে স্বীকৃতি দিয়েই নতুন করে গড়ে উঠতে পারেঃ স্বামীজীর মতে এটাই বাঁচার পথ—নবজীবন রচনার যথার্থ নীতি। পরের ভঙ্গি নকল করে পরধর্ম গ্রহণ করে কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না।

একই পরিবারে যেমন স্বামী দ্বৈতবাদী, স্ত্রী অদ্বৈতবাদী, পুত্রকন্যারা কেউ খ্রীষ্টানুসারী, কেউ বৌদ্ধ, কেউ বা মুসলমান ধর্মের উপাসক হতে পারেন, তাতে যেমন কোন আপত্তি নেই, যে যার বিশ্বাসে আন্তরিক হলেই হল, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় আদর্শের দেশ ও জাতিসমূহ নিজের নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং একই সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণধর্মের আদর্শ সামনে রেখে, একই সঙ্গে একই পতাকাতলে মিলিত হতে পারেন।

পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখেঃ অন্য নানা কারণেও স্বামীজী সমস্ত দেশ ও জাতির পারস্পরিক উন্নতি ও সমঝোতার জন্য একটি মহামিলনপীঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যে ক্রমশ এক জাতি এক বিশ্বের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে স্বামীজী তা বুঝতে

পেরেছিলেন। "কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্মাদের চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্যন্ত...তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে?"[১৪৭] এককভাবে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন রাষ্ট্রই আর এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে একক প্রচেষ্টায় সব সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তাই স্বামীজী বললেনঃ "রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না।...আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই শুধু উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্বভাব কিভাবে বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।"[১৪৮] বিশ্বব্যাপী ক্রমবিস্তৃত এই একত্বভাব স্বামীজীর কাছে ধরা পড়েছিল বলেই এমন স্থির প্রত্যয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা উচ্চারণ করে গেছেন। "আমরা তাহাই চাই, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ...।"[১৪৯] স্বামীজীর এই নীতি সমষ্টির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, বিশ্বের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কোন কারণেই কারও অধিকার হরণ করা চলবে না। কাউকে প্রবঞ্চিত করে কোন জাতির বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা লাভ করা অপরাধ, কারণ সকলের জন্য সমান সুযোগ দান করাই স্বামীজীর আন্তর্জাতিকতার মৌল লক্ষ্য। "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"—বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে এই কথাই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য। তিনি আরও বললেনঃ "বিস্তৃতিই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। অতএব প্রেমই বাঁচিয়া থাকিবার রীতি।" এই বিস্তৃতির, এই বিশ্বপ্রীতি ও প্রেমের পথেই দু-দুটো মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরে স্থাপিত হয়েছে আবার জাতিসঙ্ঘ। নানা বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও ক্রমশই মানবকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে তার কর্মযোজনা। তবু চারিদিকে নানা বিরুদ্ধ শক্তির কর্মতৎপরতাঃ লোভ-স্বার্থপরতা-শাঠ্য-ষড়যন্ত্রঃ বর্ণবিদ্বেষ, জাত্যভিমান, কাঞ্চনকৌলীন্য, আগ্রাসী আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদ। তবু জানি, মানুষের শুভবুদ্ধিই পথ দেখাবে মানুষকে। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথ ধরেই ভালবাসার অভিজ্ঞান

বুকে করে মানুষের জন্যই মানুষের পৃথিবী ঘরে বাইরে আজ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে। সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মহৎ চেতনায় একজাতি একবিশ্বের নির্ভুল দুরন্ত অভিযাত্রা ক্রমশই এগিয়ে চলেছেঃ "on to the bound of waste, on to the City of God." ঋষি কবির কণ্ঠে আমরাও বলি "শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তুনঃ॥ আমাদের প্রেরণা সকল সম্মুখে চলুক, তাই দেবতার শক্তিরাজি শান্তির মধ্যে ফুটিয়া যেন ওঠে; জীবনের ধারা সব শান্তির মধ্যে প্রবাহিত হউক, আমরা যে উহা পান করিব। শান্তি শক্তি—শান্তির মধ্যে বিধৃত শক্তিধারা সম্মুখে যেন ছুটিয়া চলে।"[১৫০]

নতুন পৃথিবীর সন্ধানে মার্ক্‌স্‌ ও বিবেকানন্দ

মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এসিয়ান স্টাডিসের পরিচালক ডঃ ওয়াই চেলিসেভের

"...many years will pass, many generations will come and go, Vivekananda and his time will become the distant past, but never will there fade the memory of the man who all his life dreamed of a better future for his people ... Together with the Indian people, Soviet people who already know some of the works of Vivekananda published in the USSR, highly revere the memory of the great Indian patriot, humanist and democrat, impassioned fighter for a better future for his people and all mankind." ১

দুই সদৃশ বা আপাতসদৃশ ব্যক্তির মধ্যেই তুলনা চলে। কার্ল মার্ক্‌স্‌ ও স্বামী বিবেকানন্দের তুলনামূলক আলোচনা তাই অযৌক্তিক নয়। দুজনেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস মন্থন করে এই দুই জ্ঞানপুরুষ মুক্তির সোপান করে দিতে চেয়েছিলেন যা আজও অগণিত মানুষের মনে আশা জাগায়। মার্ক্‌স্‌ ও স্বামীজী উভয়েই বুঝেছিলেন, ব্যক্তিমানুষের প্রবুদ্ধ বিকাশের জন্য প্রয়োজন নতুন পৃথিবী; উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলির চাই বাস্তব প্রয়োগ। উভয়েই চেয়েছিলেন, দর্শনকে তার ভাবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে, বাস্তব কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় নামিয়ে আনতে। তাঁরা বললেন, মানুষকে বিচার করতে গেলে দর্শন আর নির্লিপ্ত চিন্তাসমষ্টিরূপে প্রকাশ পায় না, দর্শন তখন হয়ে ওঠে Programme of action. একদিকে মার্ক্‌স্‌ বললেনঃ The philosophers have only interpreted the world in various ways ; the point, however, is to change it ; অন্যদিকে স্বামীজীও আমাদের চোখ ফেরালেন Practical Vedanta-র দিকে। বললেন তিনিঃ "The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life."

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্ক্‌স্‌বাদ যে সুবিধে পেয়েছে, স্বামীজীর মতবাদ তা

পারেনি। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্ক্স্‌বাদ আজ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত, কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। যদিও পরিব্রাজককালে কয়েকজন রাজা তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন, তবুও বিশ্বপরিক্রমায় তাঁকে সাহায্য করেছিল সাধারণ মানুষই।

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব মতবাদ ধীরে ধীরে গড়ে তোলার ব্যাপারে মার্ক্স্ যে দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন, স্বামীজী তা পাননি। ১৮৪১ সনে মার্ক্স্ তাঁর ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তেইশ বছর বয়স থেকে লেখা শুরু করে চৌষট্টি বছর বয়সে তাঁর শেষ লেখা (সাম্যবাদী ইস্তাহারের রুশ সংস্করণের ভূমিকা) রচিত হয়। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর মতবাদকে গড়ে তুলেছেন। পক্ষান্তরে স্বামীজী সময় পেয়েছিলেন মাত্র আট বছর। বসে বসে 'থিসিস' লেখার সময় তিনি পাননি। বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে সূত্রাকারে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখে গেছেন।

কিন্তু নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন দুজনেই, যে পৃথিবীতে নিপীড়ন থাকবে না, শোষণ থাকবে না, ব্যক্তিসত্তা যেখানে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তীর্ণ হবে। একদিকে ভাবাদর্শের সংকট অন্যদিকে নেতৃত্বের দেউলেপনায় মানুষ যখন বিভ্রান্ত, সেই ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের আবির্ভাব। এই দুই মহানায়কের মতবাদে মিল আছে অনেক, অমিলও প্রচুর। লক্ষ্য ও গতি সম্পর্কেও দুজনে সব সময় একমত নন। এ সত্ত্বেও আগামী প্রজন্ম তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে; কারণ তাঁরা যে শুধু মানুষকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন তা নয়, নতুন পৃথিবী গড়ার পথে বৈজ্ঞানিক প্রণালীরও সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন।

মার্ক্সের মতবাদে মৌলিকতা কোথায়? তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

"What I did that was new was to prove :

1) that the existence of classes is only bound up with particular historical phases in the development of production,

2) that the class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat,

3) that this dictatorship itself only constitutes the transition to the abolition of all classes and to a classless society." [২]

এক বিশাল সর্বগ্রাহী ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বামীজীর আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

ভাষায়ঃ যে একটি শক্তি থাকলে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, নরেনের মধ্যে সেরকম আঠারোটা শক্তি রয়েছে। বাস্তবিকই ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজী যেসব বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি, তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভারই পরিচায়ক। মার্ক্স্ যেমন অর্থনীতিকে ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুর উৎস বলে ধরেছেন, স্বামীজীও তেমনি সব কিছুর একটি উৎস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতেঃ মুক্তির ইচ্ছাই সব কিছুর উৎস ; মানুষের সমস্ত কাজের পিছনে এই আকূতিই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতি ও সমাজ মানুষের সামনে নানান বাধার সৃষ্টি করছে, আর মানুষ সেই বাধাগুলিকে একের পর এক জয় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে।

প্রতিটি জ্ঞান বা কাজের কারণ অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, মানুষ তার সসীম সত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। তার ইন্দ্রিয়, তার মস্তিষ্ক, তার হৃদয়, তার পরিবেশ তাকে যে জ্ঞান এনে দিচ্ছে, বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ তাকে দেখাচ্ছে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। মানুষ চাইছে ভিতরে ঢুকতে, গভীরে সন্ধান করতে। সে বুঝতে পেরেছে—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"—সোনালি ছায়া দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা আছে। তাই তার প্রার্থনা—"তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"—হে বিশ্বধাতা, সত্যকে উপলব্ধি যাতে করতে পারি সেজন্য তুমি এই আপাতরূপ সরিয়ে নাও। এক টুকরো কাঠকে সকলেই কাঠ দেখে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাইরের রূপে সন্তুষ্ট নন, তিনি প্রবেশ করতে চান গভীরে। বাইরের রূপ অতিক্রম করে তিনি দেখেন সেলুলোজ। আরও ভিতরে ঢুকে খুঁজে পান কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন। আরও আরও গভীরে গিয়ে দেখেন ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন। যেমন করে একজন জ্যোতির্বিদ্ সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে যান ছায়াপথে ; পরে তাকেও অতিক্রম করে বাইরের নক্ষত্রজগতে। এমনি করেই শিল্পী চান মূর্ত বস্তুর অমূর্ত ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রজ্ঞার লীলায়িত গতিলক্ষ্য দেখতে পান, যেমন করে মনোবৈজ্ঞানিক সচেতন মন ছাড়িয়ে ধরতে চান অবচেতন মনকে।

হিমালয়ের চূড়ায় মানুষ কেন ওঠে? কেন যায় সমুদ্রের অতলে? সৌরমণ্ডল ভেদ করে কেন রকেট পাঠায় মহাকাশে? দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য—এমন কথা কেউ স্বীকার করবে না। আসলে মানুষ তার প্রকৃতিদত্ত শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, সসীম মানুষ অসীম হতে চায়। ডাক্তারী-বিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষ চাইছে মৃত্যুকেও জয় করতে। সুদূর অতীতে উপনিষদের যুগে ভারতেরই এক নারী মৈত্রেয়ী বলেছিলেনঃ "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না, যা আমাকে অসীমে প্রবেশ করতে দেবে না, তা দিয়ে আমি কি করব?

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য—সব কিছুরই উৎপত্তি ও গতি মানবমনের এই গভীর আকুতি থেকে। সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে। এই সাড়ে-তিন হাত শরীরটাই যে মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, চার দেওয়ালের মাঝের জায়গাটুকুতেই যে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ই যে তার উপলব্ধির একমাত্র দরজা নয়—এ কথাটাই মানুষ বলতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে।

কিন্তু কেন চাইছে? স্বামীজী বলছেন যে, মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম, স্বরূপত সে অসীম, অনন্ত, ভূমা। তার দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার সেই বাণী সে শুনতে পাচ্ছেঃ "ভূমা...সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি", অল্পে সুখ নেই, ক্ষুদ্রত্বে আনন্দ নেই, বৃহতেই সুখ, অসীমেই আনন্দ। কস্তুরী মৃগের মতো সে ছুটে বেড়াচ্ছে অন্তরাত্মার খোঁজে। এই অবিচ্ছেদ্য মুক্তি-অভিযানেরই আর এক নাম ইতিহাস।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ-মননালোকে কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে গেলে স্বামীজীর ইতিহাসচিন্তার তাত্ত্বিক দিকটির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" এবং "বর্তমান ভারত" গ্রন্থ দুটিতে (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খন্ড) স্বামীজী একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের বিকাশধারা ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন কালে ও দেশে রাষ্ট্রশক্তি কোন্ শ্রেণীর হাতে ছিল তাও আলোচনা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি শ্রেণী পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ব যুগে বিদ্যমান[৩] এবং রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করছে একাদিক্রমে এই শক্তিগুলিই। মানুষ তার সভ্যতার পরিপূর্ণতার পথে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তার সমাধান করার চেষ্টা করেছে চারটি উপায়ে—জ্ঞানের সাহায্যে, অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, অর্থের সাহায্যে আর কায়িক শ্রমের সাহায্যে। যুগপ্রয়োজনে এক এক সময় এক একটি পথ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং চারটি শ্রেণীর এক একটি সে সমাধানে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে। জ্ঞানের সাহায্যে যুগসমস্যার সমাধান করতে যে শ্রেণী এগিয়ে আসে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়শক্তি এগিয়ে আসে অস্ত্র ও ভূমির সাহায্যে, বৈশ্য অর্থের দ্বারা আর শূদ্র কায়িক শ্রমকেই প্রধান করে তোলে। জ্ঞান যেযুগে প্রধান হয়ে ওঠে, সেযুগে আবির্ভাব হয বড় বড় বাগ্মী, লেখক, চিন্তাশীল

মনীষীর। মানুষ তখন ব্যগ্র হয়ে ওঠে জ্ঞানপিপাসায় এবং চিন্তাশীল লোকেরাই সমাজে বেশী সম্মান পান। বস্তুত, সমাজব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই জ্ঞানীরাই তখন হন প্রধান নিয়ন্তা। শৌর্যযুগে প্রাধান্য ঘটে ক্ষত্রিয়শক্তির। মানবসমাজ তখন জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার চেয়ে রাজকীয় শৌর্য-বীর্যের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। আর্থিক যুগে ঘটে বৈশ্যশক্তির উদ্ভব। মানুষ তখন অর্থের পিছনে ছুটে চলে, বিদ্যাচর্চার মূল উদ্দেশ্য অর্থ, জ্ঞানীরা অর্থ-নীতির সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান করতে চান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বলে মনে করা হয়। এই বৈশ্যপ্রধান যুগের পর শূদ্রযুগ। কায়িক শ্রমকে যারা পেশা করেছে তারাই এযুগের নিয়ন্তা। এইভাবে চারটি শক্তির লীলাকেন্দ্র রূপে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী এক মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।[৪] চীন, মিশর, ভারত, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশে প্রাচীনযুগে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণীর হাতে। পরবর্তীযুগে সেই শক্তি এল ক্ষত্রিয়দের হাতের মুঠোয়। ইউরোপে এই যুগের ক্ষত্রিয়শক্তির পরে সমাজনিয়ন্তা রূপে আবির্ভূত হল বৈশ্যশক্তি। এই বৈশ্যশক্তির চমকপ্রদ উন্নতি ঘটাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লব যখন নিত্যনতুন আবিষ্কারে প্রবলভাবে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে, কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাব সেই আর্থিক যুগে, বৈশ্যশক্তির চরম অভ্যুদয়কালে। মার্ক্স্ তাই শিল্পবিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত, অভিভূত। আর্থিকযুগে তাঁর আবির্ভাব বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরেই তাঁর মূল দৃষ্টি। বৈশ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে, তাই আগামী শূদ্রযুগের প্রবল সমর্থক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব। বিবেকানন্দ-মননালোকে মার্ক্সের আবির্ভাবের তাৎপর্য এখানেই। শিল্প-

বিপ্লবের দ্বারা অভিভূত ছিলেন বলে তৎকালীন মূল্যবোধের সাহায্যে কার্ল মার্ক্স্ বিশ্বের সকল সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

স্বামীজী শূদ্র-অভ্যুত্থানকে আবাহন জানিয়েছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়েই। কিন্তু মার্ক্সের মতো কেবল এই শূদ্রশক্তিকে কেন্দ্র করেই স্বীয় বক্তব্য গড়ে তোলেননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে স্বামীজী দেখতে পেয়েছিলেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চারটি মৌলিক শক্তি। নতুন পৃথিবীর আবাহনে তাই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন, এই শক্তিগুলির কল্যাণকর দিকগুলি যাতে সম্মিলিত হতে পারে। তিনি এই শক্তি-নেতৃত্বসমূহের ভালমন্দ দুটি দিকই তুলে ধরেছিলেন এবং এই শক্তিগুলির সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে আগামী পৃথিবীর রূপান্তর দেখতে চেয়েছেন। মার্ক্স্ কিন্তু কেবলমাত্র একটি শ্রেণীর স্বার্থেই নতুন পৃথিবীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ব্যাখ্যা ও পথের মধ্যে একদিকে যেমন অতিসরলীকরণের দোষ থেকে গেছে, অন্যদিকে পরবর্তীকালে মার্ক্স্বাদীরা তাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ভাষ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়ে মূল চরিত্র বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। "ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে চরম শক্তি হল বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন" (২১।৯।১৮৯০ তারিখের এক চিঠিতে[৫] এঙ্গেলস) এই সিদ্ধান্তের উপরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মার্ক্স্ সমগ্র ইতিহাসকেই অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। পাশাপাশি স্বামীজী ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে[৬] মনস্তত্ত্বকে এক প্রধান স্থানে বসিয়েছেন। মানসিক গঠনানুসারে সমাজের পরিচালিকাশক্তি ও সাধারণ মানুষের যে বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তার উপরে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে তিনি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষের ইতিহাসে বস্তু এবং মনের মধ্যে মনই অধিকতর প্রভাব প্রয়োগ করেছে। সি-পি-আই তাত্ত্বিক নেতা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বলেনঃ "ইতিহাসের প্রকৃতি অনুধাবন করে যে-প্রতীতি তাঁর (মার্ক্সের) এসেছিল তা হল এই যে যুগে যুগে মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থার ছাপ পড়েছে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার আদর্শ, তার ধ্যানধারণার উপর। চিন্তা কর্মকে নির্ণীত করে না, কর্মই চিন্তাকে নির্ণীত করে, চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত

করে।”[৭] তখন আর এক মার্ক্স্‌বাদী অ্যাডাম শাফের বক্তব্যঃ “ব্যক্তি শুধুমাত্র পরম শ্রেয় এবং যাবতীয় ক্রিয়ার লক্ষ্য মাত্রই নয়, নিজের বিকাশের কর্তাও সে নিজে। তার নিজের জগতে যে-সব মূল্যবোধ তা অন্য কোনো জগৎ থেকে আহৃত নয়, তার নিজেরই তৈরী, সামাজিক ব্যক্তির তৈরী। এই মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করাও তার কর্তৃত্বাধীন। ব্যক্তি তার নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরী করে এবং সেজন্য সর্বতোভাবে দায়ী সে নিজেই।”[৮] মার্ক্সের মতবাদ নিয়ে যে বিভিন্ন ভাষ্য হয়েছে তার কারণ মার্ক্স্‌বাদ একটি বিশেষ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ফলে, একে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালোপযোগী, দেশোপযোগী করে নেবার চেষ্টা মার্ক্স্‌বাদীদের মধ্যে স্বতঃই লক্ষিত হয়। স্বয়ং লেনিন মন্তব্য করেছিলেনঃ “আমরা মনে করি না মার্ক্স্‌বাদ সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়।”[৯] ভারতের বিখ্যাত মার্ক্স্‌বাদী তাত্ত্বিক শ্রীভবানী সেন স্পষ্টরূপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন[১০] যেখানে লেনিন মার্ক্স্‌ থেকে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত, কেবলমাত্র বৈশ্যযুগ থেকে শূদ্রশাসনে উত্তরণের উপায় এবং দ্বিতীয়ত, বৈশ্যযুগের অর্থনৈতিক শোষণকেই শোষণের একমাত্র রূপ বলে গ্রহণ করা—এই দুটি বিষয়ের জন্য মার্ক্স্‌বাদে যে অপূর্ণতা দেখা দিচ্ছিল

তাকে এড়ানোর জন্যই মার্ক্স্বাদীরা বর্তমানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ধনতন্ত্রের পরবর্তী ধাপ সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে নতুন কতগুলি সমস্যা দেখা দিল তার সমাধানে মার্ক্স্বাদকে অর্থনীতির বদলে মানবতাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯২৩ সনে হাঙ্গেরীর দার্শনিক জর্জ লুকাস প্রথম বলেন যে, স্বরূপচ্যুতিকে (Alienation theory) ভিত্তি করেই মার্ক্স্বাদ দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তী যুগে পোল্যান্ডের দার্শনিক অ্যাডাম শাফ "A Philosophy of Man" বইটি লিখে প্রমাণ করলেন যে, মানবতাবাদই মার্ক্স্বাদের মূল বক্তব্য। তিনি বললেনঃ "বর্তমান যুগে, সমাজ প্রকৃতি এবং মানুষের মনের গতি এমন সব প্রেরণায় প্রভাবিত হচ্ছে যে, মানবতার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে মার্ক্সের মানবতাবাদের দিকেও নজর পড়ছে এবং মার্ক্সের আলোচনায় আজ নতুন একটা দিক খুলছে। মার্ক্সের সমস্ত রচনাই এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। বস্তুত মানবতাবোধ থেকেই মার্ক্স্বাদের জন্ম--এই চেতনারও জন্ম হয়েছে এবং মানবপূজারী মার্ক্সের চরিত্র 'আবিষ্কারে'র চেষ্টাই চারধারে আজকাল হচ্ছে।"[১১]

স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি 'মানুষ'। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। এই মানবধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের উত্তরণ চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি তাঁর চোখে মানবসমাজের একটি অঙ্গ মাত্র, প্রধান অঙ্গ অবশ্যই নয়। মানুষের জীবনের আংশিক চাহিদা মিটানো ছাড়া রাষ্ট্র যে বেশী কিছু করতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তাঁর সকল চিন্তার পিছনে ব্যক্তিত্বের বিকাশই মুখ্য হয়ে থাকত। ফলে তিনি মনে করতেন, সমস্ত রাষ্ট্রনীতি, সমস্ত সমাজনীতি গড়ে তুলতে হবে মানবতাবাদকে ভিত্তি করে। স্বামীজীর এই মানবতাবাদ কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবতাবাদ নয়। মিল, কোঁত, বেন্থাম চেয়েছেন 'নর'কে নরোত্তম করে তুলতে, স্বামীজী চাইলেন 'নর'কে তার স্বরূপ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে। পাশ্চাত্য মানবতাবাদ চেয়েছে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন গুণ প্রবিষ্ট করতে, স্বামীজী চেয়েছেন মানুষ তার স্বরূপ ফিরে পাক—যে স্বরূপ জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান এনে দেয়। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়ঃ "পাশ্চাত্য মানবতাবাদ লোহার খাঁচাকে সোনার খাঁচায় পরিণত করেছে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদান্তই তাঁকে সেই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়েছে;

তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ, একে অপরের পরিপূরক।"[১২] বেদান্তের যে রূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে মূর্ত হয়েছিল সেই "জীবই শিব"-তত্ত্বের ব্যবহারিক কর্মপ্রণালীকে ভিত্তি করেই স্বামীজীর মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত।

কোন জাতির উন্নতি করতে গেলে—স্বামীজীর মতে—সেই জাতির মূল ভাব অনুসারেই তা করা উচিত। তিনি বলছেনঃ "সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি; কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু।"[১৩] "...প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতি-নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতি-নীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না ; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।"[১৪] ফরাসী, ইংরেজ ও ভারতীয়দের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন এই বিষয়টি। তাঁর মতে, উন্নতির সময় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটিকেই জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বসংস্কৃতিতে সেই জাতির আসন নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বসংস্কৃতি যেন এক বিরাট বহুতন্ত্রী বীণা এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলি তার এক একটি তন্ত্রী। বীণার প্রতিটি তারের সুরবৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সমস্ত তারগুলি যখন স্বীয় সুরবৈশিষ্ট্যে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তখনই বহুতন্ত্রী বীণার সম্মিলিত সুরমাধুর্য এক অপূর্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করে।

এইভাবেই স্বামীজী আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন।[১৫]

বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এবং জাতীয় উন্নতির সময় সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে মার্কস্ সরাসরি কিছু বলেননি। যদিও তিনি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে চারটি সংগঠনের (এশিয়াটিক, স্ল্যাভোনিক, প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল এবং জার্মানিক) উল্লেখ[১৬] করেছেন, যদিও তিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রগতিতে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন গতিপ্রকৃতির কথা[১৭] বলেছেন, যদিও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজদ্বয়ের অগ্রগতিতে পার্থক্য লক্ষ্য[১৮] করেছেন, তবুও জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যাখ্যা তাঁর রচনায় নেই। কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর না দিয়ে বিপ্লবের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় আসা সম্ভব নয়; ফলে, পরবর্তী যুগে মার্কস্‌বাদের নানান ভাষ্যে বিভিন্ন দেশের মার্কস্‌বাদীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন।[১৯] ইতালীর এন্টনী গ্রামসী এবং পালমিরো তোগালিয়াত্তি, ফ্রান্সের মরিস থোরেজ এবং জর্জেস পুলিটজার, বুলগেরিয়ার তোদর পাভলভ, ব্রিটেনের মরিস কনফর্থ, জাপানের কেনজুরো ইয়ানাগিদ, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, উত্তর কোরিয়ার কিম-ইল-সুং প্রমুখের লেখা পড়লেই এ বিষয়টি ধরা পড়ে। মার্কস্‌বাদী গণতন্ত্রের রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও-সে-তুং সরাসরিই বলেছেনঃ

"This new-democratic republic will be different from the old European-American form of capitalist republic...On the other hand, it will also be different from the socialist republic of the Soviet type under the dictatorship of the proletariat which is... in the U.S.S.R. ...for a certain historical period, this form (i.e., Soviet type) is not suitable for the...colonial and semi-colonial countries. ...therefore, a third form of state must be adopted in...all colonial and semi-colonial countries, namely, the new-democratic republic."[২০]

"If such a republic (i.e., new-democratic) is to be established in China, it must be new-democratic not only in politics but also in its economy."[২১]

"New-democratic culture is national. ...It belongs to our own nation and bears our own national characteristics."[২২]

চীন ও রাশিয়ার গায়ে লাগানো মার্ক্স্‌বাদী রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া। তার প্রধান রাষ্ট্রনায়ক কিম-ইল-সুং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে বলেছেনঃ

"Some advocate the Soviet way and others the Chinese, but is it not high time to work out our own?"[২৩]

রুশ নেতৃবৃন্দের প্রতি সেই বিখ্যাত গোপন চিঠিতে প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনও একই কথা বলেছেনঃ

"To run a country like Russia you need to have a national policy and to feel constantly at your back all the eleven hundred years of its history, not just the last fifty-five—five per cent."[২৪]

॥ ৩ ॥

অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মার্ক্স্‌ ও স্বামীজীর মানবতাবাদ। উভয়ের মতে, জনগণই ইতিহাসের মহানায়ক। দুজনেই মনে

করতেন, স্বাধীনতার মধ্যেই মানুষের শ্রেয় নিহিত। তবে একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, মার্ক্‌সীয় মতে "স্বাধীনতা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ",[২৫] কোন আগন্তুক ধর্ম নয়। কথাটি ঠিক নয়।[২৬] বেদান্তদর্শন অনুযায়ী স্বামীজী মুক্তিকে স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। মার্ক্‌স্‌ কিন্তু এই ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর মতে, মানুষ জড়েরই এক পরিণাম এবং জটিল সংঘটনের মাধ্যমে তার চেতনা প্রকাশিত। এই চেতনার সাহায্যে মানুষ যখন একদিকে সব রকম শোষণ থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারবে, তখনই সে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হিসাবে রূপান্তর লাভ করবে।[২৭]

হেগেল তাঁর দর্শনে বললেন যে, মানুষ তার বিভিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে, আর সেজন্য মানুষের শ্রমই হল ইতিহাসের প্রধান সঞ্চালক শক্তি। এই শ্রম শুদ্ধ চেতনারই (pure spirit) আত্মচ্যুত অবস্থা। নির্বিশেষ প্রত্যয়ের (abstract categories) ছায়াই হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ, আর এদের সংঘাতই হচ্ছে ইতিহাস। মার্ক্‌স্‌ হেগেলের প্রথম বক্তব্যটিকে স্বীকার করে দ্বিতীয়টিকে করলেন প্রত্যাখ্যান। তিনি হেগেলের অপূর্ণতা দেখিয়ে বললেন যে, সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে অ্যালিয়েনেশনের যে যোগ আছে সেকথা স্বীকার করা সত্ত্বেও হেগেল দেখাতে পারলেন না কিভাবে এগুলির পরিবর্তন করে অ্যালিয়েনেশন নিরাকরণ করা যায়। মার্ক্‌স্‌ তাই বললেনঃ হেগেলের "alienation of Idea"-র জায়গায় বসাতে হবে "alienation of man" তত্ত্বকে।[২৮]

ফয়েরবাকের সঙ্গে মার্ক্‌স্‌ও একমত যে, নৃতত্ত্বই ইতিহাসের চাবিকাঠি, কিন্তু ফয়েরবাকের মতো মানুষের শাশ্বত সত্তাকে (human essence) তিনি স্বীকার করলেন না। মার্ক্‌সের মতে যদিও নিষ্প্রাণ জড় থেকেই চেতনার সৃষ্টি তবুও চেতন মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে।

সমাজেই মানুষ মনুষ্য-নামধারী প্রাণী হয়ে ওঠে, আবার এই সমাজই সময়ে সময়ে মানুষকে অমানবিক করে তোলে, পুঁজিবাদ তাকে করে তোলে আত্মচ্যুত।

স্বামীজী এই অ্যালিয়েনেশন বা স্বরূপচ্যুতির সমস্যাটি প্রধানত বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীব মূলত ব্রহ্ম—অসীম জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে সে নিজেকে সসীম ভেবেই স্বরূপচ্যুত হয়ে পড়েছে। এই অজ্ঞান বা মায়া যা খণ্ডরূপে ব্যক্তিমানসরূপে প্রতিভাত হয়, তার দ্বারাই পঞ্চকোষ-বিম্বিত ব্রহ্ম জীবরূপে আপাত-প্রতীয়মান হন। এই হচ্ছে স্বামীজী-বর্ণিত আত্মচ্যুতির মূল কথা। "...অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র।"[২৯]

মার্ক্স্-কথিত জৈবসত্তা থেকে মানুষকে ব্রহ্মসত্তায় টেনে নিয়ে গেলেন স্বামীজী। কিন্তু এই আত্মচ্যুতির পরিসরকে কেবল আধ্যাত্মিক জীবনেই সীমাবদ্ধ না করে স্বামীজী এর কার্যকারিতার প্রভাব রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ-জীবনে, অর্থনীতির বিষয়েও ব্যাখ্যা করে দেখালেন।

হেগেলের অনুসরণে মার্ক্স্ বললেন, অ্যালিয়েনেশনের উৎস শ্রমবিভাগ এবং এর ফলেই "ব্যক্তিগত সম্পত্তি"র আবির্ভাব। সমাজে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই শ্রমিকের দল নিজেদের শ্রমকে অন্যের স্বার্থে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমশই নীচে নামিয়ে আনে। এইভাবে শ্রমিকদের সৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার গ্লানি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমশই বেশীসংখ্যক মালিকের ভাগ্যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, যার ফলে সমগ্র সমাজই অ্যালিয়েনেশনের সর্বগ্রাসী গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। "The Holy Family" বইয়ে মার্ক্স্ বলছেনঃ

"The propertied class and the class of the proletariat present the same human self-alienation. But the former class finds in this self-alienation its confirmation and its good, its own power; it has in it a semblance of human existence. The class of the proletariat feels annihilated in its self-alienation; it sees in it its own powerlessness and the reality of an inhuman existence."[৩০]

পুঁজির সাহায্যে এভাবে অ্যালিয়েনেশন ঘটে সমগ্র সমাজে। মার্ক্‌সের মতে, এই আত্মচ্যুতি চার রকমের[৩১] ঃ

১) Alienation from the process of work —শ্রমিক যত বেশী শ্রম করছে, ততই সে শোষিত হচ্ছে।

২) Alienation from the products of labour —নিজের সৃষ্ট বস্তু পণ্যরূপে অন্যের ভোগে যাচ্ছে, কিন্তু শ্রমিক তা ব্যবহার করতে পারছে না।

৩) Alienation of the worker from himself —শ্রমিক ক্রমশই নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং মনের মধ্যে এক অবহেলিত দাসত্বের ভাব পোষণ করে।

৪) Alienation of the worker from others —শ্রমিকের চোখে তার মালিক সর্বময় নিষ্ঠুর প্রভু আর অন্যান্য শ্রমিকেরা হতভাগ্য ক্রীতদাস মাত্র। শ্রমিকের মনের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে এই ভাব গড়ে ওঠে।

এইভাবে অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে মার্ক্‌স্‌ কেবল অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখই করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতি কিভাবে মানুষকে অ্যালিয়েনেটেড করে তোলে, সেকথাই তিনি বুঝিয়ে গেছেন 'ক্যাপিটাল', "হোলি ফ্যামিলি", "ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানিউস্ক্রিপ্টস অব ১৮৪৪" বইগুলিতে।

সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে কিভাবে অ্যালিয়েনেশন প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌ কেবল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি অ্যালিয়েনেশনকে এক সামাজিক সমস্যা হিসাবেই ধরেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন যুগে এর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, তবুও তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজেই এর ব্যাপকতা দেখা যায়। স্বামীজী কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে অ্যালিয়েনেশনের ব্যাপক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, সমাজে শোষণ কেবল অর্থের সাহায্যেই হয় না। বলছেন তিনিঃ "বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ।...প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকারের চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের উপর একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে অধিকতর সুবিধার দাবি

করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ...যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহারা বেশী জানে, তাহারা অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবি করে।...কিন্তু বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়।" ৩২

স্বামীজীর চোখে তাই শোষণ বা নিপীড়নের চারটি রূপঃ

১) জ্ঞানবলে বা বুদ্ধিবলে বলীয়ানের অত্যাচার,
২) অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ানের অত্যাচার,
৩) অর্থশক্তিতে সম্পদশালীর অত্যাচার, এবং
৪) কায়িক শ্রমের শক্তিতে অত্যাচার।

স্বামীজীর মতে, এই চার রকম নিপীড়নই মানুষের স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক এবং সেজন্য এগুলির নিরাকরণ চাই। ইতিহাসের নিদর্শন দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ "মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্ত্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ব্যতীত বিদ্যা শিখবার কারও অধিকার নেই...এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

"ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্ব্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্ব্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়। সর্ব্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।" ৩৩

মার্ক্স্ যেহেতু মনে করতেন যে, একমাত্র অর্থনৈতিক শোষণই অ্যালিয়েনেশনের মূল, তাই তাঁর দাবি—সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুত, অন্যদিকে সে বিচ্যুত তার স্বীয় শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে। মানুষের আত্মজাগরণের পথ তাই একটিই—উৎপাদন-উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিষেধ হলেই ব্যক্তিমানুষ তার স্বরূপ খুঁজে পাবে। আর এই সমাজরূপান্তরের কর্মকাণ্ডকে মার্ক্স্ অভিহিত করেছেন "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" নামে, যে পথ নিয়ে যাবে আদর্শ মানবসমাজ communist society-র দিকে। তাঁর ভাষায়ঃ

"Communism as the positive transcendence of private properties as human self-estrangement, and therefore as the real appropriation of the human essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i.e., human) being a return accomplished consciously and embracing the entire wealth of previous development."[৩৪]

আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেনঃ "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[৩৫] কিন্তু সমস্ত সামাজিক দুর্দশার মূলে, স্বামীজী শিক্ষার অভাবকেই দেখতে পেয়েছেনঃ "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সংকুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসীরা) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন

এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট্ (Pat) তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' Pat ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।"[৩৬]

"সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে—সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।...পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইতেই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব বোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"[৩৭]

এই শিক্ষার অভাবেই সাধারণ মানুষ নিজের উন্নতির পথ বুঝতে পারে না। আর এর ফলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক অভাব, যেমন বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিম্নমানের জীবনযাত্রা, একতা ও উচ্চ আদর্শের প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি সহজেই এসে পড়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে—যেদেশে শিক্ষিতের হার প্রায় শতকরা একশ সেদেশে কি দুঃখকষ্ট নেই? এই প্রশ্নটি বিচার করার আগে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। (স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে এই গ্রন্থে ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন বলে আমরা আর এর আলোচনায় যাচ্ছি না।) শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর অর্থনৈতিক অত্যাচার যে কমবে তার কোন স্থিরতা আছে কি? স্বামীজীর চিন্তাধারা ও বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা আমাদের এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয়। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বেড়ে ওঠে। আর এর ফলে, দেশে প্রবর্তিত হয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, নানান রাজনৈতিক দল, আদালতগুলির অতিরিক্ত শক্তি এবং সর্বোপরি দেশের জাতীয় অর্থনীতি-পরিকল্পনায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। এইভাবে স্বামীজী দেখিয়েছেন, শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনে সকল রকম শোষণের নিরাকরণ করা যায়।

॥ ৪ ॥

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে যে নানান রকম শাসনতন্ত্র দেখা গেছে, তার কারণ কি? সমাজে শোষণের নিরাকরণ। সমাজনিয়ন্তারা যখনই জনসাধারণের চেয়ে কিছু বিশেষ সুবিধা বা অধিকার (special privilege) দাবি করেন তখনই শোষণের সূত্রপাত ঘটে। এই শোষণ একটা সীমা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠলেই ঘটে বিদ্রোহ বা বিপ্লব। সমাজনিয়ন্ত্রণের ভার যায় নতুন শাসকের হাতে, তৈরী হয় নতুন শাসনতন্ত্র। একচ্ছত্র রাজার যুগ শেষ করে প্লেটো চাইলেন আদর্শ শাসকের (Philosopher King) উপর শাসনের ভার দিতে। অ্যারিস্টটল একজন দার্শনিক রাজার উপর ভরসা না করে সমাজের জ্ঞানিগুণীদের নিয়ে অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাত ম্যাকিয়াভেলি পোপের কর্তৃত্ব নাশ করে রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানালেন। হবসের চিন্তায় আবার জনসাধারণের অধিকারের কথা উচ্চারিত হল। লক-এর বক্তব্যে তা আরও জোরদার হয়ে উঠে রুশোর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে তার পরিণতি ঘটল। হবস-লক-রুশোর চেষ্টায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর আবার দেখা গেল শোষণ। গণতন্ত্র মানুষকে যে স্বাধীনতা দেয় তার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা ক্ষমতা একচেটিয়া করা শুরু করল। ফলে, নতুন করে ধ্বনিত হতে লাগল সমাজতন্ত্রের বাণী। ফেরিয়ান সোশ্যালিজম থেকে শুরু করে নাইহিলিজমে এর চূড়ান্ত রূপের কথা ঘোষিত হল। স্বামীজী বলছেনঃ সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতখানি হওয়া উচিত এবং সমাজের জন্য ব্যক্তি কতখানি আত্মত্যাগ করবে, এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টাই হচ্ছে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস। যে মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে চায় তা গণতন্ত্র, আর যে মত সমাজকেই মুখ্য বলে ধরে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্র।[৩৮]

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে লেনিনের মত হচ্ছেঃ "প্রভু শ্রেণীর কোন্‌ লোকটি পার্লামেন্টে জনগণকে দমিত ও দলিত করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা স্থির করা—এই হল বুর্জোয়া পার্লামেন্টপ্রথার আসল মর্মার্থ, এবং সেটা শুধু পার্লামেন্টী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও।"[৩৯] রাষ্ট্রকে মার্ক্‌স্‌ দেখেছেন শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে। নির্বাচনের নামে অর্থ দিয়ে এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ধনীরা। পরে বিরাট আমলাবাহিনী এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে সমগ্র দেশটাকে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে আসে।

আমলাতন্ত্রকে দিয়ে তারা দেশের শাসনব্যবস্থা চালায়, শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদন চালু রাখে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনী দিয়ে নিজেদের আসন অটুট রেখে এরা কোন কাজ না করেই নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; ফলে, নামে গণতন্ত্র হলেও দেশটি পরিণত হয় ধনীদের অবাধ লীলাক্ষেত্রে যেখানে ধনীরা আরও ধনী হয় আর গরীবেরা আরও গরীব হয়। মার্ক্স্ তাই সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন।[৪০] প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলির দুর্বলতা দেখিয়ে তিনি নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা গড়ে তুললেন। অন্যান্য সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে তিনি বললেনঃ "সমালোচনামূলক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক যুক্তি হারায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মতবাদের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে।...তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যেন শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন শ্রেণী-বিরোধ আপসে মিটে যায়।...আর এই আকাশ-কুসুম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায় বুর্জোয়াশ্রেণীর সহানুভূতি ও টাকার থলির কাছে। ...আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত।"[৪১] মার্ক্স্‌বাদী সমাজতন্ত্রের তাই আবশ্যিক অঙ্গ হবে "প্রলেতারিয়েত ডিক্টেটরশিপ" এবং কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে জমিমালিকানার অবসান, সব রকমের উত্তরাধিকার বিলোপ, রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ, যোগাযোগ, পরিবহণ, উৎপাদন-উপকরণের রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি।[৪২] মার্ক্সের মতে, এই ধরনের সমাজতন্ত্রেই ঘটবে মনুষ্যত্বের বিকাশঃ

"The transformation, through the division of labour, of personal powers (relationships) into material powers, cannot be dispelled by dismissing the general idea of it from one's mind,

but can only be abolished by the individuals again subjecting these material powers to themselves and abolishing the division of labour. ...In the previous substitutes for the community, in the State, etc., personal freedom has existed only for the individuals who developed within the relationships of the ruling class, and only insofar as they were individuals of this class. The illusory community, in which individuals have up till now combined, always took on an independent existence in relation to them, and was at the same time, since it was the combination of one class over against another, not only a completely illusory community, but a new fetter as well. In the real community the individuals obtain their freedom in and through their association."[৪৩]

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়। বরং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতালাভে সহায়তা করবে এইটিই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন, রাষ্ট্র যেহেতু বৈচিত্র্যময় অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সমষ্টি, সেহেতু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তো বটেই, পরন্তু ভাবাদর্শের মুক্তি বা স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির প্রধান দাবি। বিভিন্ন সংঘাত ও মিলনের মধ্য দিয়ে সমাজকে দ্রুতবেগে অগ্রসর করিয়ে দেবার জন্য চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক।

স্বামীজীর লেখাগুলি পড়লেই মনে হয়, গণতন্ত্রের এত বড় পূজারী দুর্লভ। নিজেও তিনি বলছেন, "আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"[৪৪] যে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ ঘটাতে চায়, সে রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধনে তিনি আহ্বানও জানিয়েছেন,[৪৫] কারণ তাঁর মতে, ব্যক্তিত্ববিকাশের একমাত্র শর্ত

হচ্ছে—স্বাধীনতা। "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা; সেই আত্ম-নির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।"[৪৬] তাঁর মানসপটে যে আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি ভেসে উঠেছিল, সে রাষ্ট্রের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধনব্যবস্থা-শ্রমে থাকবে জনসাধারণের অবাধ সমান-অধিকার। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ববিকাশের স্বকীয়তা আছে বলে তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এই সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় চাই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা।

গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী এর দুটি ত্রুটিরও উল্লেখ করেছেন। একটি আসে প্রজাদের দিক থেকে, অন্যটি শাসকদের কাছ থেকে। গণতন্ত্রের অত্যধিক প্রয়োগে প্রজাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বার্থপর স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়—"বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে,"[৪৭] আর শাসকেরা? স্বামীজী বলছেনঃ "ও তোমার 'পার্লেমেন্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র!...শক্তিমান্ পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকি-গুলো ভেড়ার দল।...রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে...সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।"[৪৮]

সমাজতন্ত্রের ভাল দিকটি কি? স্বামীজীর মতে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের কাছে নতি স্বীকার করানোর কঠোর শিক্ষার মস্ত বড় গুণ হচ্ছে—সমাজনির্দেশিত কাজে ব্যক্তির নিপুণতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ নিজের স্রোতে চলে।[৪৯] আর এর দোষ কি? সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের পরিণামে উৎসাহ-উদ্যম, মননশীলতা, তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই সব

হতভাগ্য লোকেরা বুঝতে পারে না স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু। বলছেন স্বামীজীঃ "(সমাজ-নির্দেশিত কর্ম) মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে...নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। ..এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।"[৫০]

স্বামীজী তাই এই দুই মতবাদের বিশ্লেষণ করে যথার্থ কল্যাণকর রাস্তাটি বেছে নিতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হবে। ইতিহাসচেতনার সাহায্যে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে রেজিমেন্টেড সমাজ সভ্যতার অনুকূল নয়। বৈচিত্র্যকরণের উপরে গণতন্ত্রী যে অধিক গুরুত্ব দেন তা যেমন সংগত, তেমনি সমাজতন্ত্রীর যৌথস্বার্থের গুরুত্বও সংগত। এই জায়গাতেই স্বামীজী বেদান্তদর্শনের উপরে ভিত্তি করে সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এক ব্রহ্ম থেকেই বৈচিত্র্যময় জগৎ বেরিয়ে এসেছে যাতে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মই জড়িয়ে আছেন। বহুত্বের মধ্যে একত্ব আর একত্বের মধ্যে বহুত্ব—এই বৈদান্তিক তত্ত্বকেই তিনি রাষ্ট্রনীতির মূলে লাগিয়েছেন। বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে যেমন বৈষম্য ও বিশেষ-সুবিধারূপী অন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি একত্বের ভিত্তিতে জীবনের ধর্ম প্রাণের খেলা রুদ্ধ হয়। তাই দুইয়েরই প্রয়োজন রাষ্ট্রসংগঠনে। "ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণ"—এই নীতির সাহায্যেই তিনি যুগসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। আর এ সার্থক হবে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা, আত্মিক অনুশীলনের সাহায্যে যখন মানুষ স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ হতে পারবে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ "বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ...বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? ..আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল।...বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে?...সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে?...যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে; তার দানে কি ফল?...একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়।"[৫১] আর এ সম্ভব হবে একমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতে মানুষ যখন সর্বপ্রাণীকে স্বীয় আত্মারই বিভিন্ন রূপ বলে

ভাবতে শিখবে। আত্মিক চেতনার সাহায্যেই কেবল মানুষ এই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য করতে পারে।

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্য—এই ছিল স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে। হেগেল-মার্ক্‌স্‌-বোসাঙ্কে-গ্রীন প্রমুখের সঙ্গে মিল-বেন্থাম-স্পেন্সারের চিন্তাধারার একটি সার্থক সমন্বয় তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই তিনি যুগসমস্যার অপূর্ব সমাধান দিলেনঃ "ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর।"[৫২]

মার্ক্‌স্‌বাদীরা আজ ক্রমশ এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারছেন। পোল্যান্ডের ভিয়েলোভিয়েস্কি লিখেছেনঃ

"Socialism will become a stimulating ideal for the people only if it is closely identified in their consciousness with democratization. People are willing to undertake great efforts and accept new sacrifices only when social goals are determined with their active participation."[৫৩]

মার্ক্‌স্‌বাদী রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী শাসনক্ষমতা যে মানুষের স্বকীয় উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এ কথাটি আজ মার্ক্‌স্‌বাদী তাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করতে পারছেন না। অস্ট্রিয়ার মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিত আর্নেস্ট ফিশার ব্যথিত হৃদয়ে মন্তব্য করেছেনঃ

"...a new alienation is created when power passes, by institutionalization and bureaucratization, from revolutionary organs into the hands of a central authority."[৫৪]

আজ এজন্যই বিভিন্ন মার্ক্‌স্‌বাদী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।